দেবেশ রায়

মানুষ খুন করে কেন

মনীষা

কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৬৫

প্রকাশক : দিলীপ বসু, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ৪।৩ বি বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০১২

মুদ্রক : শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র, বোধি প্রেস, শঙ্কর ঘোষ লেন। কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : হাঙ্গেরীয় শিল্পী ভিকটর ভাসারেলির 'দার্জিলিং' চিত্র (১৯৫৭) অবলম্বনে সুবোধ দাশগুপ্ত

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধু ও শিক্ষক-কে

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পথটি অতিরিক্ত বনময়। অতিমাত্রায় কুটিল। সেই আরণ্যক কুটিলতা ফণাধরা সাপের মতো ওপরে ওঠে, যেন ঋজু হতে। দশদিকেই পাহাড়। এক-একটা বাঁকে, নিচে, উপত্যকাদেশের পাহাড়চূড়াগুলি দেখা যায়—অন্যত্র উর্ধ্বের চূড়াকীর্ণ শূন্যতা। পেছনে পরিত্যক্ত গিরিশীর্ষ আবর্তমান অরণ্যে টুপ করে ডুবে যায়। গভীর এত খাদ এক ক্ষীণ যোগসূত্রে গ্রথিত, বিচ্ছিন্ন এত পাহাড় এক অদৃশ্য যোগসূত্রে গাঁথা, এত দ্রুত এত বিবিধ দিক পরিবর্তন যে, দিক-দিগন্ত উচ্চতা বেগ ইত্যাদির আনুষঙ্গিক বনেদী ধারণাগুলি বাসটার ভেতরে ঘুরন্তশান্ত প্রক্রিয়ার মতো থরথরায়। কিন্তু যান্ত্রিক কম্পনও নিয়মে বাঁধা।

চারপাশে অপরিচিতপূর্ব মুখরেখার জটিলতা, পথ বন পর্বতচূড়া-বিচ্ছিন্ন আকাশের ছোট ছোট টুকরো, দূরবর্তী পাহাড়ের ধূসর সানু-দেশ, চারদিকে অজ্ঞাতপূর্ব ভাষার দেওয়াল, পাহাড়ের শরীরের ভেতর সেঁদিয়ে যাওয়া সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকার, নিরন্তরনির্ঝর ঝর্ণার কুয়াশা, সাঁকোর তলা থেকে বা পাহাড়ের গা বেয়ে মাটি শুঁকতে শুঁকতে গড়িয়ে উঠে আসা কুয়াশা, মাথার চুল ও পায়ের নখ থেকে নিম্নগ ও উচ্চগ শীতলতা, পাহাড়ের গায়ের গাছ-গাছালি ঝোপঝাড়ের সবুজ, বর্ষা বলেই কালচে, পাথরের গায়ে শ্যাওলা, সর্পিল লতা, শূন্যতা ফুঁড়ে ওঠা গাছগুলির ফাটা বাকল, শষ্প-শৈবালে কোমল তলদেশ, পাতায় পাতায় দ্বিতল ত্রিতল পরিপ্রেক্ষিত, ধীরে ধীরে রৌদ্রের স্মৃতি হয়ে যাওয়া, ছায়ায় ছায়ায় পথ ছেয়ে যাওয়া,—ছায়া গাঢ় থেকে গাঢ়তায় নেমে যায়, গাঢ়তা পাথর হয়ে যায়, পাথরে

জলের পিচ্ছিলতা—সব মিলিয়ে যেন অধঃপতন, অধঃপতন—ঘোর হয়ে যাওয়া সবুজের মধ্যে, প্রাচীন সভ্যতার নররক্তলোভী দেবতার মতো নৈর্ব্যক্তিক পাথরের চাঙড়ের মধ্যে।

সেই ছুটন্ত বাসের ভেতর সবাই নীরব। চারদিকের ছায়াচ্ছন্নতার রঙ দেখে মনে হয় এই অসমতল উচ্চতা থেকে নিচের সমতলে রাত্রি গড়িয়ে যায়।

পাহাড়ের এদিকে-ওদিকে জ্বলে উঠে আলো হারিয়ে যায়। কোথাও বা একসারি আলো, যেন আকাশ থেকে ছিটকে আসা কোনো তারামণ্ডলী, পাহাড়চূড়ার ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে তলিয়ে যায়। পায়ের তলে খাদের গায়ে আকাশের তারা, দূরে কোনো বস্তিতে জ্বালানো আগুন। আকাশে নক্ষত্রতরঙ্গের আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে বাসটা মুখোমুখি হয়ে পড়ে দুহাত দুদিকে মেলা, গ্রীবা তোলা এক রাজনর্তকীর—তার সারা অঙ্গের অলঙ্কার আলো হয়ে জ্বলছে। দার্জিলিঙ।

চোরাগোপ্তা খুনের পর আত্মগোপনের প্রয়োজনেই একটা উঁচু পাহাড়ের বাঁক থেকে গড়িয়ে বাসটা দার্জিলিঙে টুপ করে হারিয়ে গেল।

দুই

দরজায় কুলিটিই টোকা দিল। অশ্বিনী ও খোকন-কোলে গোলাপ কুলিটিকে অনুসরণ করে বাস থেকে এই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

দরজার মাথায় আলো জ্বলে উঠলো। তারপর দরজা খুললো। সামনেই কুলিটিকে দেখে টগর বোধহয় হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে একটুখানির জন্য। তারপরই কুলিটির পাশ কাটিয়ে "এসো এসো", বেরিয়ে এসে গোলাপকে জড়িয়ে ধরে "আয়" বলে ভেতরে ঢুকলো।

ঘরের ভেতর কার্পেটটার ওপর কুলিটি তখন মাল নামাচ্ছে। টগর

গোলাপকে দুহাতে ধরে, একটু দূরে সরিয়ে বললো, "দাঁড়া, তোকে একটু দেখি, ঈস, বিশ্বেসই হচ্ছে না সত্যি তুই, বা বা, এত বড় ছেলেও। এসো বাবা।" খোকন গোলাপের হাঁটু জড়িয়ে ধরলো। গোলাপ বললো, "যাও খোকন মাসির কোলে।" টগর কার্ডিগানের ওপর থেকে আঁচলটা এনে চোখ মোছে। তারপর আঁচল নামিয়ে হেসে ফেলতেই বুড়ি কুলিটি অসংখ্য কাটাকুটিতে ভরা সাবেকি একটা ছোট্ট মুখ তোলে। অশ্বিনী মনিব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিচ্ছে——টগর এসে তার সামনে দাঁড়ায়—"ঈস্, এ-যে একেবারে বাচ্চা জামাই", ফলে কুলিটির হাতে টাকা দেবার সময় অশ্বিনীর মুখে অপ্রাসঙ্গিক হাসি ফুটে ওঠে। টাকাটা নিয়ে বুড়ি কুলিটি যেন আকারে আয়তনে একটুখানি হয়ে বেরিয়ে যায় যতক্ষণ সে একটা দড়ির বাঁধনে তার মাথার সঙ্গে ঝুলিয়ে স্যুটকেস-ট্রাঙ্ক-হোল্ড্অল্ বয়ে আনছিল তার চাইতে।

টগর দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বলে, "উনি আর বেণু লুস্থু-বেবিকে নিয়ে স্টেশনে গেলেন তোমাদের আনতে" তারপর ফিরে "তুমি বসো, অশ্বিনী" অশ্বিনীকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে, খোকনসহ গোলাপকে জড়িয়ে এনে আর একটাতে বসে পড়ে। সে চেয়ারটা দুজন বসার মতো।

টগর গোলাপকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে "দেখ, দেখ, আর-জন্মের দিদিকে দেখ, আর-জন্ম ছাড়া আর কি? এক বাপের মেয়ে অথচ কেউ কাউকে দেখি নি।" বলতে থাকার সময়টুকুতে এত প্রকাশ্য আদরে অনভ্যস্ত গোলাপকে স্বস্তি বা টগরকে আদরের অভ্যাসের সুযোগ দিতে অশ্বিনী দেখে নেয় ক্যাম্বিশের শাদা পার্টিশনের গায়ে সবুজ লতা—মনিপ্ল্যাণ্ট, নিজের পেছনে গ্রিলের জানলার পর্দা, টেবিলঢাকা, চেয়ারঢাকা, তার সামনে ভেতরের ঘরে যাবার দরজার পর্দা, এক রঙে—হলুদ, এক নক্সা—লালে। সেই দরজার পাশে জুতোর র‍্যাকে সারি সারি জুতো দেখেই অশ্বিনীর ঠাহর হয় সাজানো

গোছানো ঘরটা হোল্ড্অল্-ট্রাঙ্ক-স্যুটকেসে বড় নোংরা দেখাচ্ছে। সে উঠে ট্রাঙ্কে হাত দিতেই টগর বলে ওঠে, "থাক না, পরে করলেই হবে।"

"না, গুছিয়ে রাখি" ট্রাঙ্কটাকে দরজার পাশে সরিয়ে তার ওপর হোল্ড্অল্ আর পাশে স্যুটকেস রেখে নিজের চেয়ারে অশ্বিনী বসতে, ততক্ষণে খোকন কোলে টগর বলে, "অশ্বিনী কিছু মনে করো না ভাই, বোন পাওয়ার আনন্দে তোমার সঙ্গে আর কথা বলা হচ্ছে না।"

"না, না, সে তো বুঝতেই পারছি।"

"ছাই বুঝতে পারছ" গোলাপ সূত্র ধরে "জানো দিদি, কিছুতেই আমাকে নিয়ে আসতে চায় না, বলে নতুন জায়গা, আমি জোর করে তোমাদের চিঠি লিখি, তোমাদের চিঠি পেয়েও…"

টগর অশ্বিনীর দিকেই তাকিয়ে থাকে। তার কথায় যে গোলাপকে থেমে যেতে হয় তা খেয়াল না করেই বলে, "তোমাদের চা করে দি, ওরা আসতে এতো দেরি করছে কেন"

"না, না, আসুক না সবাই"

"জানিস গোলাপ, একবার ভেবেছিলাম শিলিগুড়ি গিয়ে তোদের নিয়ে আসি, তা সে-ও তো সাতহাঙ্গামা, কেউ কাউকে চিনি না, আর এক কেলেঙ্কারি। সকাল থেকে আমরা তিনজনই ঘরবার করছি। বর্ষাকালে এ-রাস্তার তো কোনো বিশ্বাস নেই, কোথায় ধ্বসে আটকা পড়ে আছে। তোমার দাদার মতো মানুষও ব্যাঙ্ক থেকে ফোন করেছেন রাস্তা ঠিক আছে কিনা জানতে, বেণু খুব খেপাচ্ছিল—ওঁকে"

"বেণু কে" গোলাপ প্রশ্ন করলো।

"আমার ননদ। এই তো বছর দুই স্বামী মারা যাবার পর আমার এখানে এসে আছে। এই বয়সে…। তাও লুসু-বেবিকে নিয়ে আছে"

"তোমার দুটিই মেয়ে ?"

"হ্যাঁ। আর এই যে একটা বাবা জুটলো" টগর খোকনকে

বুকের ওপর টেনে তোলে আর চেয়ারে এলিয়ে যায়। খোকন টগরের কোল থেকে পাশে মায়ের কাঁধে মুখ ডুবোয়।

"ঐ তো ওরা এসে গেছে, দরজাটা খুলে দে তো গোলাপ" খোকনের মাথাটা সরিয়ে গোলাপের দরজা খোলার মাঝখানে টগর আরো বলে, "তোর নাম রাখার সময় বাবার তাহলে আমার কথাটা মনে হয়েছিল।"

তিন

সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দে অশ্বিনী চিনে ফেলে ছোট ছোট পায়ের ছুটেছুটে ওঠা, একটা স্যাণ্ডেলের শব্দ আর একটা ধীর-স্থির আওয়াজ—শুধু এইটুকু শুনেছে বলে—লুম্নু-বেবিকে নিয়ে বেণু আর গোবিন্দবাবু স্টেশনে গেছেন।

লুম্নু-বেবি হুড়মুড়িয়ে ঢুকেই থেমে যায়, টগরের কোলে খোকন বাঁ হাতের আঙুলগুলো মুখের কাছে নিয়ে ঘুরে, বেণু ঘরে ঢুকে অশ্বিনী-গোলাপের দিকে এক নজর তাকিয়ে লুম্নু-বেবির মাথা ছুঁয়ে এগিয়ে কার্পেটের ওপর বসে পড়তে পড়তে বলে—"বাঃ বাঃ, আমাদের পাঠিয়ে দিলে বৃষ্টিতে ভিজতে আর নিজে বসে বসে বোন ভগ্নীপতির সঙ্গে গল্প করছো। লুম্নু, ছাতাগুলো রেখে আয়।" বেণুর পাশে শোয়ানো, আর ততোক্ষণে দরজায় গোবিন্দবাবুর হাত থেকে ছাতা ছুটো নিয়ে লুম্নু তড়বড়িয়ে ভেতরের ঘরে ঢোকে। গোলাপ গোবিন্দবাবুকে প্রণাম করে। অশ্বিনী উঠতেই গোবিন্দবাবু এগিয়ে তাকে বসিয়ে নিজে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। লুম্নু ভেতরের ঘর থেকে এসে বেণুর পাশে কোমরেহাত দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলে, "মা তুমি মাসিকে চিনলে কী করে?"

"লুম্নু-বেবি, প্রণাম কর্" বেণু বলে।

গোবিন্দবাবু অশ্বিনীর দিকে ঘুরে বললেন, "বাসে এলে, না ট্যাক্সিতে?"

"বাসে। শুনলাম ট্রেনের অনেক অসুবিধে"

"ভালোই করেছ। আমিও তাই ভাবছিলাম অবিশ্যি।" গোবিন্দবাবু টগর-গোলাপের দিকে তাকিয়ে বললেন "বাঃ, তোমাদের তো এখন বেশ বোন-বোনই মনে হচ্ছে।"

"তো হলাম বোন, দেখাবে আবার কিরকম" টগর গোলাপের দিকে তাকিয়ে।

"গোলাপদি দার্জিলিঙে ছমাস থাকলে বৌদির চাইতে ফর্সা হয়ে যাবে"

"আচ্ছা সে হোক, ওদের কিন্তু চা টা কিছুই দিই নি, তুই একটু স্টোভটা জ্বাল, আমি যাচ্ছি।"

বেণু উঠতে উঠতে "তোমাকে আর আসতে হবে না," পেছন ফিরতেই লুসু বেণুকে জড়িয়ে ধরে মাথা তুলে "পিউমণি, মা কি মাসিমণিকে চিনতে পেরেছে।"

"চিনতে না পারলে ওরকম আদর করে না কি" বেণুর কথা শুনে টগর লুসুকে দেখিয়ে গোলাপের মাথা বাঁ-হাতে টেনে নেয় আর লুসুকে কোলে টেনে তুলতে তুলতে বেণু "আমারও লুসু টুসু ঠুসু, লুসু টুসু ঠুসু" গুনগুনিয়ে বেরিয়ে যায়।

গোবিন্দবাবুর "তোমরা কি আবার স্নানটান করবে নাকি"-র উত্তরে গোলাপ "বাবা এমনিতে ঠাণ্ডায় হাতে পায়ের খিল ধরার যোগাড়, আবার স্নান", আর অশ্বিনী "আমার কেমন একটা মাথা ধরেছে।"

টগরের হাসির সঙ্গে গোবিন্দবাবুর উত্তর "পাহাড়ের মাথা ধরা, কদিন থাকবে। তাও একটা ওষুধ খাও।"

ক্যাম্বিশের যে পার্টিশনটুকুর জন্য স্বর প্রায় না তুলে গোবিন্দবাবু বললেন "বেণু, অশ্বিনীকে মাথা ধরার একটা ওষুধ দিস," সেটুকুর বাধা বেণুকে পেরতে হয় প্রায় চিৎকারে "চায়ের সঙ্গে দিচ্ছি" বলে।

টগর বলে, "জুন মাসে ঠাণ্ডা কিরে গোলাপ? ডিসেম্বর জানু-য়ারিতে দেখবি, অবিশ্যি বর্ষাটা একটু তাড়াতাড়িই নেমেছে।"

গোবিন্দবাবু "নেমেছে, বোলো না। বলো নামছে। এখনো তো বর্ষা শুরুই হয় নি।"

লুসু এসে খোকনের হাত ধরে টানলো, "চলো ও ঘরে।"

খোকন লুসুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে টগরের ঘাড়েই মুখ গুঁজলো। লুসু কোমরে হাত দিয়ে বললো, "পিউমণি যে ডাকছে।"

"যাও খোকন, তোমার খাবার দিয়েছে"—গোলাপ।

খোকন মাথা তোলে না দেখে "চলো, আমিই যাচ্ছি খোকনকে নিয়ে, চল্ গোলাপ" বলে টগর উঠে দরজা পর্যন্ত যেতেই পেছনে বেবি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে।

"স-র্ব-না-শ" টগর থেমে যেতেই গোলাপ এসে বেবিকে কোলে তুলে নিলেও বেবি হাত পা ছোঁড়ে আর কান্না বাড়ায়।

লুসু বিরক্তির স্বরে বলে, "বেবিটা এমন না, ও নতুন এসেছে," বেণুর গলা ওঠে "কি হলো বেবির?"

"আর কতোক্ষণ সইবে? খোকনকে কোলে নিয়েছি!"—টগর।

"তাতে কী হয়েছে। বেবি-ও তো মাসির কোলে উঠেছে। লুসু, বেবি-কে মাসির কোলে কী সুন্দর মানিয়েছে, দেখ্, দেখ্।"

গোবিন্দবাবু অশ্বিনীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার যেন কোন বাগান?"

খানিকটা ভেবে অশ্বিনী জবাব দিল, "অনেকগুলো বাগানকেই তো আমার চার্জে দিয়েছে, তবে হেডকোয়ার্টার হবে প্লেনভিউ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্লেনভিউ, প্লেনভিউয়ের বড়বাবু আমাদের ব্যাঙ্কে পরশু-দিন এসেছিলেন, তাঁকে বলে দিলাম তোমার কথা, তা ভদ্রলোক বেশ ভালো, ওদের ট্র্যানজাকশান তো আমাদের ব্যাঙ্কের সঙ্গেই, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না"

"আপনি যখন বলে দিয়েছেন তখন তো কোনো কথাই নেই, কত দূর হবে এখান থেকে ?"

"আমি তো ও-সব খবরই রাখি না, তোমার চিঠি পাওয়ার পর দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সেদিন ঐ ভদ্রলোকও তাই বললেন, মাইল বারোচোদ্দ হবে কিন্তু পাবলিক রোডের ওপর তো নয়, সেজন্যই যাতায়াতের অসুবিধে, এক ভরসা বাগানের গাড়ি, তবে এ-সব বাগানের গাড়ি তো দিনে একবার দুবার দার্জিলিঙে আসেই—"

পার্টিশনের ওপারে পেয়ালা-পিরিচের শব্দ হচ্ছিল। সেখান থেকে উচ্চকণ্ঠে গোলাপের "আর বলবেন না জামাইবাবু, যেদিন থেকে চিঠি এসেছে দার্জিলিঙে যেতে হবে সেদিন থেকে কতো দুশ্চিন্তা, আমার তো ভয় হলো আসবে কিনা শেষ পর্যন্ত। ভাগ্যিস আপনাদের বিজয়ার চিঠিটা ছিল, আমি তো ওকে লুকিয়ে চিঠি দিয়েছি" শুনে অশ্বিনী ভাবতে থাকে জন্মে না দেখা বৈমাত্রেয় দিদির বাড়িতে এই-টুকু সময়ের মধ্যেই এত জোরে কথা বলে কী করে গোলাপ !

"তোমাদের ওখানকার বাড়িতে কে কে থাকেন" গোবিন্দবাবু।

"জ্যাঠামশাই, জ্যেঠিমা আর মা"

"তুমি তো আগেই চাকরি করতে, নাকি এটাই প্রথম ?"

"না, না। আমি তো রেফ্যুইজি রিহ্যাবিলিটেশনে ছিলাম, চার বছর। এটা তো—"

"সে তো স্টেট গভমেণ্টের ? টেম্পরারি না ?"

"হ্যাঁ, অবিশ্যি অ্যাবজর্ব করতো, তবে ফুডের লোকজন ছিল। এ চাকরিতে তো আমার এজ-বার ছিল, কিন্তু আমাদের একজেমশন দিল"

"ফুডের শনি সর্বত্র। এখানে তো স্কেল ভালো"

"হ্যাঁ, অ্যালাওয়েন্স আছে, টি-এ-ও আছে, তবে দুটো এস্ট্যাব-লিশমেণ্ট হলো তো ?"

চায়ের ট্রে নিয়ে বেণু ঢুকলো। পেছনে পেছন টগর গোলাপ। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়েই ফিরতে ফিরতে বেণু বললো, "বৌদি

চা-গুলো দাও, আমি ওদের রাখি, নইলে তোমাদের গল্প করতে দেবে না।" বেণুর কথা শেষ হলো ও ঘরে গিয়ে।

"তুমি কি কালই যাবে?" গোবিন্দবাবু।

"হ্যাঁ, আমি গিয়ে জয়েন করে দেখে টেখে আসি, তারপর ওদের নিয়ে যাব।" বেণু এসে অশ্বিনীর হাতে একটা ট্যাবলেট দিয়ে যায়।

অশ্বিনীর হাতে চা ধরিয়ে দিতে দিতে টগর বললো, "ওরা এখুনি ঐ বনবাসে যাবে নাকি, কদিন থাকুক এখানে, ঘুরুক, ফিরুক, দেখুক, তারপর যাবে।"

"অশ্বিনী খাবে কি, থাকবে কোথায়, তোমার কি এক গোলাপ-ই সব নাকি, অশ্বিনীরটাও তো একটু দেখবে নাকি, একা একা কি ওখানে হাত পুড়িয়ে খাবে?" গোবিন্দবাবু।

টগর গোলাপ চেয়ারে বসার পর গোলাপ যোগ করলো "তা একটু করুক না। আমার বাড়ি হলে দিদিকে নিয়ে যাব। তখন আপনিও নিজে রেঁধে খাবেন"—গোলাপ চায়ে চুমুক দেয়। অশ্বিনী চোখ ফিরিয়ে নেয়। গোলাপের অভ্যেস ডিসে ঢেলে খাওয়া, এখানে কাপে খেতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলছে বোধ হয়। দুজনের পক্ষেই একটা অপরিচিত পরিবেশে যার যার মতো সে সে যখন খাপ খাইয়ে নিচ্ছে তখন দৃষ্টি দিয়েও তাকে অসুবিধেয় ফেলতে চায় না অশ্বিনী।

এত আপন করে নেওয়াটা এঁদের স্বভাবই বোধ হয়—এই এতটুকু সময়ের মধ্যে, গোলাপ অশ্বিনীকে। কিন্তু এত মনোযোগ পাবার অভ্যেস গোলাপের বা অশ্বিনীর নেই বলে গোলাপ হয়তো এটাকে তার মাটি ভাবছে কিন্তু অশ্বিনী সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে—যদিও টগরের চোখের জলটা সে ভুলতে পারে না। নিজের আর কোনো ভাই বা বোন নেই বলে অশ্বিনী এমন সিদ্ধান্তের ঠেকা দিতে চায়, হতেও তো পারে, বোন-ই তো। বৈমাত্রেয় হলেও। আসলে, নিজের মা আর জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে অশ্বিনী এতকাল এতরকম ফন্দিফিকির করতে

বাধ্য হয়েছে যে আত্মীয়তা ব্যাপারটা ক্রমেই তার বোধগম্যতার বাইরে চলে যাচ্ছে। বাপকেই পাঁচ-ছ বছরের পর দেখেনি টগর, গোলাপকে তো জন্মেও না, বিজয়ার চিঠি ছাড়া কোনো যোগসূত্রই নেই, হঠাৎ তার বোনের প্রতি ভালবাসা আসতে পারে কি না এমন প্রশ্নের কোনো জবাবই খুঁজতে চায় না অশ্বিনী।

পার্টিশনের ওপারে বেণুর গলা শোনা যায়, "আয় রে আমার চাঁদসোনা।"

ভেতরের ঘর থেকে লুস্থুর গলা ভেসে আসে "না পিউমণি, এখানে এসো, নইলে খেলা হবে না।" ধাতুর ওপর জলপতনের শব্দে লুস্থুর কথার ধ্বনি গোলমাল হয়ে যায়, টগর ওঠে "দাঁড়া বেণু, আমি ভাত চড়াচ্ছি, গোলাপ আয়, অশ্বিনী জামা-কাপড় বদলে নাও।"

"নাও, জামা-কাপড় ছেড়ে এ-ঘরে এসো, সব শোনা যাক" বলে গোবিন্দবাবুও উঠে অন্য ঘরে গেলেন।

চার

গোবিন্দবাবুর সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনী উঠে দাঁড়িয়েছিল, চলে যাবার পর সে মালপত্রের দিকে তাকাল। বাড়িতে পরার এক লুঙি আছে তার, সেটিই পরবে, নাকি এই প্যান্টটাই পরে থাকবে।

লুঙির প্রসঙ্গে হোল্ড্অলের ভেতরটাও সে দেখতে পায়। ওটাও খুলতে হবে। এত বিছানা পাওয়া যাবে কোত্থেকে। একটা ওয়াড় ছাড়া পাতলা লেপ, একটা তোশক, দুটো ময়লা বালিশ আর খোকনের কিছু কাঁথা। এ বাড়ির অন্য কোনো ঘরে পা না দিয়েও অশ্বিনী বুঝে ফেলতে পারে ব্যাঙ্কের অন্তত মাঝারি ধরনের চাকরির ভিত্তিতে তৈরি নিজেদের এই সংসারের সম্পূর্ণতায় তাদের একান্নবর্তী জীবনের এইসব মালপত্র বেমানান।

"স্যুটকেস-ট্রাঙ্ক খুলে দেব নাকি?" হলুদে লাল কাজের পর্দার

পাশে গোলাপ। অপরিচিত শাড়ি আর গরম জামাতে অশ্বিনীকে কিছুটা চেয়ে থাকতে হয়।

"দিদি বললো তোর জিনিস আর ভাঙতে হবে না।"

"ঠিক আছে। চাবিটি দাও।"

"চাবি তো তোমার কাছেই।"

"ও" প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে চাবি খোঁজে অশ্বিনী। স্যুটকেসের সামনে নিচু হয়ে বসতেই গোলাপের চলে যাওয়াটা পর্দায় দোলে। গোলাপ জানে না কথা কী বলতে হয়।

আর একবার পরখ করেও অশ্বিনী নিজেকে নোংরা না ভেবে পারে না—গোলাপের পরিষ্কার জামা-কাপড় দেখার পর, আরো। ও-ঘর থেকে গোবিন্দবাবুর গলা পাওয়া যায়, "কই অশ্বিনী, এসো।"

লুঙি পরে চাদর গায়ে ও-ঘরের দিকে এগুতে অশ্বিনী ভাবে কী পায়ে দিয়ে যায়। বাড়িতে পরার স্যাণ্ডেল তার নেই। বাড়িতে খড়ম পরতো। একান্নবর্তী পরিবারে অনির্দিষ্ট একটা চাপে থাকে বলে নিজের নিজের মতো চলার একটা চোরাপথ-ও খুলে যায়। কিন্তু এখানে, এইটুকু ঘরে, এইটুকু পরিসরে পালাবার কোনো পথ নেই। অশ্বিনী ঘরের চৌকাঠ অগত্যা পেরয়।

পাশের ঘরে বাচ্চাদের সঙ্গে বেণুর গলা, রান্নাঘরে বাসনপত্রের টুংটাঙের শব্দে টগর গোলাপের গলা, গোবিন্দবাবু লেপের ভেতর থেকে বললেন, "বোসো, পা তুলে বোসো, একটা লেপ টেনে নাও না, আরাম লাগবে।"

"না ঠিক আছে" অশ্বিনী পা তুলে বসলো—কিন্তু বিছানায় যেন পা না লাগে সে-বিষয়ে সতর্ক। গোবিন্দবাবু তাঁর বালিশের পাশ থেকে একটা কম্বল এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নাও আরাম করে বোসো। তুমি খুব ভালো করেছ এই অ্যাসাইনমেণ্টটা অ্যাকসেপ্ট করে। এই সব জায়গায় বাধ্য না হলে সাধারণত কেউ আসতে চায় না কিন্তু যারা আসে তারা চাকরিক্ষেত্রে রেকগনিশনও পায়।"

"আমি তো কোনোদিন আসি নি, সেই যা অসুবিধে ছিল, তা না হলে—"

"আমাকে যখন বছর ছয়েক আগে এখানে বদলি করলো, তার আগে বছর পঁচিশের এক ছোকরাকে, সে এখানে আসার ভয়ে চাকরিই নিল না, আমি চলে এলাম, শুনছি তো সামনের বছর গ্যাংটকে একটা ব্রাঞ্চ খুললে আমাকে চার্জে দেবে।"

গ্যাংটকের আনুষঙ্গিক বন্ধুরতা ঠাণ্ডা ইত্যাদির সঙ্গে অশ্বিনী গোবিন্দবাবুর থলথলে মুখটা মেলাতে না পেরে শুধিয়ে বসে, "আপনাদের ব্যাঙ্কের তো খুব ব্যবসা। কিন্তু গ্যাংটকে টাকা জমা দেবে কে?"

"টাকা যাদের আছে তারা। গ্যাংটকের ইণ্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স। এক মাউন্টিনিয়ারিংয়ের জন্যই তো অনেক ফরেন কান্ট্রি গ্যাংটকের ব্যাঙ্কে টাকা রেখে যেতে চায়, তার ওপর সম্পূর্ণ হিলট্রেড। উলের ব্যবসা। টাকা জমার পরিমাণ দিয়েই তো আর আমাদের কাজ ঠিক হয় না, পলিটিক্যাল রিজন্‌স্‌ও থাকতে পারে।"

পাহাড় পর্বতে ওঠার সঙ্গে ব্যাঙ্কের সম্পর্কের সূত্রে গোবিন্দবাবুর গ্যাংটকে বদলি হওয়ার কথায় অশ্বিনীর ভুরু কুঁচকে যায়। যেন একটা জটিল অঙ্কের মুখোমুখি পড়ে। তারপরই গোবিন্দবাবুর গলায় শোনে "তোমার চাকরির অবশ্যি একটা সুবিধে আছে, নিজের মতো কাজ করতে পারবে।"

"না, ইনস্পেকশন আছে, সুপারভাইজার আছে।"

"আরে, সে তো আর রোজকার ব্যাপার না, আর কতো যে সব ইনস্পেকশনে যাবে জানা আছে। দার্জিলিঙ বেড়িয়ে টি-এ মারবে।"

অশ্বিনী ভেবে নেয় এ-কথাগুলির পেছনে ভাবনা-চিন্তা-অভিজ্ঞতার ভার আছে। সে বলে, "হ্যাঁ, তাতো বটেই।"

"আমাদের ব্যাঙ্কের একটা মেথড ডিপার্টমেণ্ট আছে, কলকাতায়। দিল্লি. বোম্বাইয়েও থাকতে পারে। জানি না। তাদের কাজ

ব্যাঙ্কিঙের প্রসেসগুলি নিয়ে রিসার্চ করা। অর্থাৎ চাকরির ব্যাপারটা আর শুধু কতকগুলি মানুষ নিয়ে নয়—কতকগুলো প্রসেস নিয়ে। প্রসেসের কোরিলেশন এমন যে, তুমি জানতেও পাবে না, কিন্তু কাজটা হয়ে যাচ্ছে, তোমার কাজটা এতো ছোট করে গুটিয়ে দেওয়া হবে। জব স্যাটিশফ্যাকশন কাকে বলে জানো?"

"আজ্ঞে না"—পেছনের পায়ের শব্দে মুখ ঘুরিয়ে দেখে টগর গোলাপ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টগর বললো—"কি, ভায়রাকে চাকরি শেখান হচ্ছে?" গোবিন্দবাবু হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে থাকলেন।

টগর—"শোনো অশ্বিনী, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। কোনোদিন ছুটি নেবে না, তোমার নিচে যারা তাদের কাজ করে দেবে, কোনোদিন এক মিনিট লেট করবে না, অফিস আর বাড়ির বাইরে কোথাও পা বাড়াবে না—এর নাম চাকরি।"

"আর বাড়িতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক খেলবে"—ও-ঘর থেকে বেণু যোগ দিল। গোবিন্দবাবু জবাব দেন "জব স্যাটিশ-ফ্যাকশন।"

"মামারাও তো কম বড় বড় চাকরি করেন না, কিন্তু তোমার মতো কাউকে দেখি নি। মেজমামার তো ট্যুরেরই চাকরি। এখন তো ওদের গ্রেডে উনিই একমাত্র ইণ্ডিয়ান। মাসে পঁচিশ দিনই বাইরে। তাও কেমন হৈ হৈ করে থাকেন, সব জায়গায় যাতায়াত।"
—টগর

"ওঁর চাকরিটাই তো টো টো করার" গোবিন্দবাবু ফোড়ন দেন।

"আর তোমার চাকরিটা কিসের! অফিসে বসে থাকার আর বাড়িতে শুয়ে থাকার?"

"এ-বিষয়ে গোলাপের মত কি?" গোবিন্দবাবু শুধোন।

"আমার আবার মত কি। বাবা তো আর চাকরি করতেন না,

ব্যবসা, এখন ভাইরা বড় হয়েছে, ওরা দেখাশোনা করে, বাবা একটু জিরতে পারেন, আগে একদম সময় পেতেন না, আর শ্বশুরবাড়িতে আমি সারাদিন রান্নাঘর বা ভাঁড়ার ঘরে—ইনি কখন আসেন, কখন যান জানতেই পারি না।"

"এবার তো ওদের বিয়ে থাওয়া দিতে পারে" টগর বলে।

"দেবে তো, পাত্রী খুঁজছে, আছে নাকি তোমার খোঁজে?"—গোলাপ।

"তোমার বড়মামার মেয়ের সঙ্গে দেখো না"—গোবিন্দবাবু।

একটু চুপ করে থেকে টগর বলে, "তোমার হয়েছে কি? আমার মামাতো বোন হলে ওদের কি হয়?"

গোবিন্দবাবু একটু থমথত খেয়ে শুধরে নিতে বলে ওঠেন—"ধ্যত ছাই, কী বলতে কী বললাম—"

বেণু পাশের ঘর থেকে যোগ করে "যে রকম হিসেব করছো চাকরিটা তোমার থাকলে হয়।"

টগর—"তাও তোর কাছে সব খবর জানা গেল। আমাকে তো কিছু জানায়ও না।"

"যাও না, দু বোন বাপের বাড়ি ঘুরে এসো"—গোবিন্দবাবু।

"হ্যাঁ, এখন কতো বলছো! গত দু বছরে তো একবার মামা-বাড়িতে যেতে দাও নি, এখন বলছো বাপের বাড়ি যেতে—"

"কী, রান্নাটান্না কিছু হয়েছে? ওদের খাইয়ে দি, খোকনের ঘুম পেয়েছে" বেণু এসে দরজায় দাঁড়ায়।

"হ্যাঁ চল্" টগরের সঙ্গে গোলাপ বেণু ঘর ছেড়ে যাওয়ার পর তার শরীরটা শিথিল হচ্ছে দেখে অশ্বিনী টের পায় গোলাপ কথা শুরু করতেই, সে ক্রমে কঠিন হয়ে উঠেছিল। গোবিন্দবাবুর হঠাৎ ভুলে ধরা পড়ে যায় যে-সম্পর্কের জোরে সে এখানে দিব্বি বসে, সেটা কতো অবাস্তব। "যখন আমি প্রথম চাকরিতে ঢুকি তখন যে-কাজ একজনে করতো, এখন সে কাজ পাঁচজনে করে। মানে মোট কাজ

নয়। কাজের লোড এত বেড়েছে যে আস্ত একটা কাজ আর কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই নতুন সমস্যা—কাজ সম্পর্কে কারো কোনো আইডেনটিফিকেশন তৈরি হচ্ছে না।"

অশ্বিনী চুপ করে থাকলো। একটু বিরতির পর গোবিন্দবাবুই আবার বললেন, "যেমন শাশুড়ীর সংসারে বউয়ের কোনো ইনি-সিয়েটিভ তৈরি হয় না। তোমাকে যদি টোট্যালিটির সঙ্গে যুক্ত না রাখা যায় তবে তোমার কিছুতেই জবস্যাটিশফ্যাকশন গ্রো করবে না। তোমার চাকরিতে সেই সুবিধেটা আছে। খানিকটা তো নিজেই নিজের মালিক—"

টগর এসে বলে, "বেণু-গোলাপ-আমি বাচ্চাদের নিয়ে এই ঘরে শুই, তুমি বরং বেণুর খাটে শোও, অশ্বিনীর বিছানা করে দি"

অশ্বিনী বলে ওঠে, "আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, ও এসে করে নেবে।"

"গোলাপ খোকনকে খাওয়াচ্ছে, আমিই করে দিচ্ছি।"

অশ্বিনী উঠে দাঁড়ালো। বারবার তাকে নিজের হাতেই নিজেকে খুলে খুলে দেখাতে হয়।

বসার ঘরে গিয়ে হোল্ড্অল্ খুলতে গেলেই গোলাপ পার্টিশনের ওপার থেকে বলে ওঠে, "দিদি, আমি বিছানা করে নেব, খোকনকে নিয়ে আমরা ও-ঘরেই শুই, খোকন রাতে বিরক্ত করবে, তোমাদের অসুবিধে হবে।"

লুসু বলে ওঠে, "মা, খোকন আমাদের কাছে শোবে।"

গোলাপ বলে, "আজ থাক মা, কাল শোবে, নইলে রাতে ও কাউকে ঘুমোতে দেবে না।"

টগর "তাহলে থাক, তোমরা খেতে এসো" বলে চলে যায়।

অশ্বিনীকে জড়িয়ে ধরার জন্য গোলাপকে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করতে হয়। চার বছরের একটি ছেলে নিয়েও আসলে এই

প্রথম তারা জ্যাঠামশাইয়ের সেই বাড়ির বাইরে। তার সঙ্গে আসার জন্য বাড়িতে গোলাপ যে জিদ ধরে সেটা শেষের দিকে বেখাপ্পা হয়ে যায় দেখে অশ্বিনী নিজেই ঘোষণা করে সে গোলাপকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। নতুন আত্মীয়তার উত্তেজনা এতটুকুতে কেটে যায়, নাকি আসলে অশ্বিনীকে খানিকটা নিজস্ব ধরনে পাওয়াটাই গোলাপের কাছে অশ্বিনীর নতুন চাকরির চিঠি আসার পর থেকে একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অশ্বিনীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোবার মতো নতুন ব্যাপারের উদ্যোগ গোলাপ খোয়াতে চায় না, অথবা ঘুমের মতো অভ্যেসের ব্যাপারটা নতুন লোকজন-বিছানার সঙ্গে মেশায় না। গোলাপের গায়ের শাড়ির অপরিচিত স্পর্শ গন্ধ অশ্বিনীকে শেষ পর্যন্ত পাশ ফিরিয়ে দেয়। তারপর সে কানের ভেতর কট কট শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। বিকেল থেকে কানে ধাপা লেগেছে।

পাঁচ

সকাল বেলা প্রথমেই বেণু অশ্বিনীকে জিজ্ঞেস করে "কাল মাথাধরা সেরেছিল? ঘুম হয়েছিল?" অশ্বিনীকে খানিকটা থতমত খেয়েই জবাব দিতে হয়—"অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ ঘুম হয়েছিল, আসলে মাথা ধরাই নয়, কানেও ধাপা লেগেছিল, নাকও কি রকম বন্ধ লাগছিল।"

"পাহাড়ে এলে প্রথমে ও-রকম হয়, তা-ও তো আপনাদের বমি-টমি হয় নি, বাঁচোয়া।"

পরে চায়ের টেবিলে গোবিন্দবাবু বললেন, "দেখো, বিয়ের পরপরই শালাশালী যা জোটার জুটে যায়, আমার মতো এদ্দিন পরে ক'জনের জোটে? যখন জুটেই গেল তখন তার হাতের রান্নাটাও খেতে হয়—আজ গোলাপই রাঁধুক।"

গোলাপ খোকনকে পাউরুটি খাওয়াতে খাওয়াতে বলে, "আহাহা কোনো দিন খোঁজ নিয়েছেন শালীর? এখন কতো আদর দেখানো হচ্ছে।"

গোলাপের কথার শুরুতেই অশ্বিনী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, শেষে স্বস্তি বোধ করে। না, গোলাপ এখনো অভিমান করতে গিয়ে অভিযোগ করে বসে। গোলাপের কণ্ঠে অভিমান নেই।

টগর—"অশ্বিনীকে তো আজই ওর কাজের জায়গায় যেতে হবে?"

গোবিন্দবাবু—"আমি বলি কি, অশ্বিনী সকাল সকালই বেরিয়ে যাক, তাহলে বেলায় বেলায় পৌঁছতে পারবে। যদি জয়েন করে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরতে পারে ভালো, নইলে কাল সকালে আসবে।"

অশ্বিনী সায় দিলে গোবিন্দবাবু যোগ করেন "তাহলে অশ্বিনীকে একটা ছোট প্যাকেট করে দিও কম্বল টম্বল পাজামা টাজামা দিয়ে, যদি থেকে যেতেই হয়।"

ঘরের ভেতর থেকে লুম্বুর গলা শোনা যায় "পিউমণি।"

"যাই" উঠতে উঠতে বেণু—"কে রাঁধবে সে ঝগড়া মেটাও, কী কুটনো দেব বলো।"

"জামাইবাবু যখন খেতে চাইলেন মুখ করে, আর না বলি কি করে। মুখে তুলতে না পারলে কিন্তু আমার দোষ নেই।"

"দেখো গোলাপ, আমি তোমার কর্তার মতো এক্সাইজ ইনস্পেক্টর নই যে সব সময় সন্দেহ করে বেড়াব, কোনো কিছুতেই নিশ্চয়তা নেই। আমি ব্যাঙ্কের লোক। দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাবই। জ্যাঠশাশুড়ীর সংসারে যে-বউ থাকে সে রান্না না শিখে পারে না। এ কী আর তোমার দিদির ব্যাপার? যা নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিলেন তাই গিলতে হবে" গোবিন্দবাবু বেরতে গেলে লুম্বুকে কোলে নিয়ে দরজায় বেণু এসে দাঁড়ায়। বেণুর কোলে লুম্বুর মোজা পরা লম্বা পা দুটো ঝুলতে থাকে।

"আরে আমাদের এ দিদিটিকে নিয়ে তো মহা বিপদ হলো। সে এখন ভাইকে ছাড়া থাকবেই না। বলছে ভাইকে পড়াব।" লুম্বু বেণুর ঘাড়ে মাথা গোঁজে।

"ভাইয়ের তাহলে খুব হুর্দিন।" টগর উঠতে উঠতে "বেণু, কুটনো-টুটনো কেটে রাখ, আমি দেখি মাছ পাই কি না। আর একজন কোথায়?"

বেণু—"লেখা পড়া হচ্ছে।" বেণুর পাশ দিয়ে টগর ভেতরে যেতে অশ্বিনী গোলাপকে বলে, "আমি বরং এখুনি বেরিয়ে যাই, আবার দেরি টেরি হয়ে যাবে।"

"যাও না, জামাই বাবুকে বলো।"

টগর ব্যাগ আর ছাতা নিয়ে বেরচ্ছে, অশ্বিনীকে দেখে বললো, "যাবে নাকি অশ্বিনী, চলো, বাজারটা ঘুরে আসবে।"

"আমি এখন রওনা দিলেই তো ভালো হতো।"

"আরে যাও, বাজারটা ঘুরে এসো, তোমাকে তো গাড়ি-টাড়ি ধরে দিতে হবে" গোবিন্দবাবু টগরকে বলেন "দেখো তো, ওদিককার কোনো গাড়ি পাও নাকি?" বাইরের ঘরে ঢুকে অশ্বিনী ভাবতে বসে কালকের ছাড়া প্যাণ্টটাও পরা যায় না অথচ একঘণ্টা পরে নতুন প্যাণ্ট পরে রওনা হতে হবে, এখন আবার প্যাণ্ট ভাঙা? বাইরে টগরকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভাবনাচিন্তার সময় কোথায়, অগত্যা অশ্বিনীকে ভাঁজ-ভাঙা প্যাণ্ট, শার্ট আর এক ও অদ্বিতীয় সোয়েটারটি পরতে হয়।

অশ্বিনীকে দেখে টগর বললো, "একটা ছাতা নাও।"

অশ্বিনী এদিক ওদিক তাকাতে টগর দরজার আড়াল থেকে নিজেই একটা ছাতা বের করে দেয়।

কাল সন্ধ্যাবেলায় এসে এ বাড়িতে ঢুকেছিল, তখন টেরই পায় নি,—এখন দেখলো সিঁড়ি উঠে গেছে, হুদিকে ফ্ল্যাট। নিচে নেমে বুঝলো আরো বড় বাড়ি। অশ্বিনী মন্তব্য করে "বাবা, বেশ বড় বাড়ি তো? কাল রাত্তিরে টেরই পাই নি।"

"এখানকার কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের। আরো কটা বাড়ি আছে, হোটেল আছে।"

চুপ করে খানিকটা গিয়ে টগর বলে, "কী-রকম লাগে, না-অশ্বিনী—"

অশ্বিনী "হ্যাঁ, আমি তো আগে কখনো পাহাড়ে আসি নি—"

"না, আমি বলছিলাম, নিজের ছোটবোন-ভগ্নীপতি, বোনপো, অথচ কোনো পরিচয়ই ছিল না।" প্রসঙ্গ ভুল বুঝবার ভয়ে অশ্বিনী মুখ খোলে না। হঠাৎ অশ্বিনী গোলাপের গন্ধ পায়। একটু চকিত হয়ে বোঝে টগরের গা থেকে মাঝে মাঝে সেই গন্ধটা আসছে কাল রাতে যেটা গোলাপের গা থেকে পেয়েছে। কাল রাতে গোলাপের গায়ের শাড়ির যে-গন্ধটা স্বচ্ছন্দে টগরের বলে মনে হয়েছে, সেটা এতক্ষণে দার্জিলিঙের রাস্তায় সত্যি সত্যি টগরের গা থেকে পেল।

"আসলে, এখন বুঝি, বাবা কোনো দোষই করেন নি। আমাকে একেবারে কোলে রেখে মা মারা যান। বাবার তখন কম বয়েস। ব্যবসার সব দিক নিজেকে সামলাতে হয়। একা মানুষ। বাড়িই বা দেখে কে। ব্যবসাই বা দেখে কে। বিয়ে না করে উপায়টা কি বলো। অথচ আমার বড়মামা এতো রেগে গেলেন, কিছুতেই আমাকে বাবার কাছে রাখলেন না, তখন তো আমার দিদিমা বেঁচে, তিনিও জিদ ধরলেন, আমাকে নিয়ে এলেন। অথচ এখন বুঝি, বাবা তো আমাকে না-ও দিতে পারতেন।"

"তা তো বটেই"

"তুমি আমাদের, মানে গোলাপদের বাড়িতে ঘনঘন যাও তো?"

"ঘনঘন কি আর শ্বশুরবাড়ি কেউ যায়।"

"না, বাবাকে তো দেখি নি, তাই জিজ্ঞেস করছি, খুব বুড়ো হয়েছেন?"

"বুড়ো তো হয়েইছেন, তবে খুব খাটুনির শরীর তো, ভাঙে নি।"

"আমার নতুন মা কি রকম?"

"খুব ভালো।"

"তোমাকে আদর যত্ন করেন?"

"বাঃ, জামাইকে আদর যত্ন করবেন না ?"

"তাই বলছিলাম। আমার মামাবাড়িতে তো বাবার নাম করাও নিষেধ। নতুন মা যে খুব খারাপ তাতো ধরেই নেওয়া। আমার বিয়ের সময় পর্যন্ত বাবাকে জানানো হবে না ঠিক ছিল। শেষে আমি জিদ করায় বড়মামা লিখেছিলেন। বাবা আসেন নি। আমার নামে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

"আমাদের শুনতে কি রকম লাগে। ছোটবেলা থেকে তো একান্নবর্তী সংসারে মানুষ।"

"সে তো আমিও মানুষ। আমার মনে হয় বাবা বোধহয় তাঁর মেয়ে হিসেবে আমাকে স্বীকারই করেন না। কিন্তু এখন কেন যেন ভাবি আমাকে যদি মামারা নিয়ে না আসতেন তা হলে নতুন মা কি আমাকে ফেলে দিতেন ? আমাকে তো ভালোও বাসতে পারতেন, তাই না ?"

টগর মুখ ফিরিয়ে হাসে আর চোখে জল চিকচিক করে। টগর যতক্ষণে গলা পরিষ্কার করে চোখে আঁচল বুলিয়ে কথা শুরু করে ততক্ষণে অশ্বিনীর ধারণা হতে থাকে যে তারা এসে পড়ায় অন্তত টগরের একটা নতুন অথচ পুরনো সম্পর্ক উদ্ধারের ব্যাপার হয়েছে। টগরের গন্ধটা আবার নাকে লাগায় অশ্বিনী সেই ছকটা বুঝতে চেষ্টা করে— টগরের মনের ভেতর তাদের সম্পর্কের যে-ছকটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

"অথচ জানো", টগর আবার শুরু করে, "মামাবাড়ি থেকে বাবার কত বিয়ে ভেস্তে দিয়েছে, নইলে বাবা হয়তো একটু বুঝেশুনে বিয়ে করতে পারতেন। পরে বুঝেছি আসলে আমার বাবা কোনো সময়ই মামাদের পেয়ারের জামাই ছিলেন না। দাদুর খুব পড়ন্ত অবস্থায় মায়ের বিয়ে হয়। তখন বাবার চাইতে ভালো জামাই জোটানোর ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু মায়ের বিয়ে হওয়ায় দু-চার বছর পরেই অবস্থা রাতারাতি পাল্টে যায়, যুদ্ধ-টুদ্ধের কী সব ব্যবসায়। তখন নতুন টাকার গরম। নিয়ে এলেন আমাকে।"

কাল সন্ধ্যাবেলায় যেটা ছিল অস্পষ্ট এবড়ো-খেবড়ো অনিশ্চিত, আজ সকালে সেটা স্পষ্ট, মানুষে মানুষে জীবন্ত অথচ পরিপ্রেক্ষিত আজন্মের সমতলতার অভিজ্ঞতার বিপরীত। চারপাশই শুধু নয়, পথের ঢালু বেয়ে নামতেও অশ্বিনীর সম্পূর্ণ নতুন লাগবারই কথা। টগরের কথাগুলো আর চারপাশ মিলে-মিশে অশ্বিনীকে দু-দিক থেকেই অভিজ্ঞতার এমন মাটির ওপর ঠেলে, যেখানে দু-পা এক থাকে না আর মাটিরও অনেকগুলো তলা এক সঙ্গে।

"আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে কি মামারা টাকার গরমে বোন-ভগ্নীপতিকে ঠেলতেন? কী জানি। তবে আমাকে মেয়ের চাইতেও বেশি মানুষ করেছেন। আমার বিয়ের জন্য বড়মামা যেমন পাত্র যাচাই করেছেন, নিজের মেয়ের বেলায়ও তা করেন নি" বাক্যটা শেষ হওয়ার আগেই টগর চেঁচিয়ে নেপালী ভাষায় কিছু বলে, কয়েকজন লোক এগিয়ে আসে, অশ্বিনী বোঝে ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ড। কথাবার্তার পর টগর অশ্বিনীকে বলে, "ওদিকে যাবার জন্য এখনো কোনো গাড়ি নেই। তুমি একটা গাড়ি নিয়ে যেতে পার, সেই গাড়িতেই ফিরে আসবে, চল্লিশ টাকা লাগবে, যাবে?"

অশ্বিনীকে চুপ করে থাকতে দেখে টগর যোগ করলো, "তাহলে তুমি শুধু যাও, বাগানের গাড়িতে ফেরার ব্যবস্থা হবে কিনা বুঝে ফেরারটা ঠিক কোরো।" অশ্বিনীর "আচ্ছা" শুনবার পর টগর আবার ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করে। খানিকটা বিতণ্ডার পর অশ্বিনীকে জানায়—"কিন্তু শুধু গেলে, না-ফিরলেও ও ত্রিশ টাকা চাইছে, বেশি বেশি, ভীষণ ইয়ে এখানকার এই ড্রাইভাররা, বুঝেছে নতুন লোক, এখন একজন যখন বলেছে আর কেউ-ও যাবে না, এমন না, বিচ্ছিরি।"

সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভঙ্গিতে অশ্বিনী বলে দেয়, "তাহলে বলে দিন চল্লিশ টাকাই দেব যাতায়াত, কিন্তু আমার সুবিধে মতো ফিরতে হবে, সন্ধ্যেও হতে পারে।"

টগর সে কথা জানিয়ে দিয়ে বারবার অশ্বিনীকে দেখিয়ে দেয়। অশ্বিনীকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বলে, "যাবে না আবার, ঠিকই যাবে, সিজন শেষ প্রায়, লোক পাবে কোথায়"—মাছের বাজারের সিঁড়িতে পা দিয়েই টগর প্রায় চিৎকার-ই করে ওঠে, "বাব্বা, আজও মাছ এসেছে, খুব ভাগ্য বলতে হবে তোমাদের, চলো, চলো, ফুরিয়ে যাবে।"

মাছ, আলু, টোম্যাটো আর কী একটা শাকপাতার মতো কিনল টগর, অশ্বিনী নাম জানে না।

"দিন, আমাকে দিন।" "জামাইকে দিয়ে বাজার বওয়ানোটা কি ভালো হবে" বাক্য বিনিময়ের পর অশ্বিনীই ঝোলা ধরে ছিল। বাজার থেকে বেরিয়ে পথে নেমে অশ্বিনী বললো, "আমার দু-একটা জিনিস কিনে নিলে হত।"

"কি?"

"এই একটা পাজামা আর তিনজনারই বাড়িতে পরার স্যাণ্ডেল।"

"চলো, তাহলে এই দিক দিয়ে যাই, বাটা থেকে স্যাণ্ডেল কেনা যাবে, তিন জনের আর স্যাণ্ডেল কিনতে হবে না, খোকনের দেখবে জুতো পরার অভ্যেস হয়ে যাবে।"

"ওর তো পায়ের মাপ?"

"আমি ঠিক বুঝবো।"

জিনিসপত্র কিনে ওপরে ওঠার সময় অশ্বিনীর হাঁফ ধরছিল। টগর বললো, "তাড়াহুড়ো করো না, আস্তে আস্তে ওঠো, পাহাড়ে শর্টকাট করতে গেলেই বিপদে পড়বে।"

হৃৎপিণ্ড নিয়ে অশ্বিনী এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, চারপাশ, এমন কি টগরও তার নজরে আসে না। যেন চারপাশটাই তার বুকের ওপর চেপে বসেছে। সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। খানিকটা সমতলে এসে নিজের অবস্থাটা লুকোবার জন্যই অশ্বিনী প্রশ্ন করে, "আপনারা নিচে নামেন না?"

"যাই মাঝে মাঝে শীতের সময়, তবে, সত্যি কথা বলতে কি, মন টেকে না, পাহাড়ের একটা নেশা আছে দেখবে তোমাকেও ধরবে" টগর হাঁফাচ্ছিল। অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে টগরের মুখটা জ্বলজ্বল করছে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই টগর গোবিন্দবাবুকে বলে, "অশ্বিনীর গাড়ি ঠিক করে দিয়েছি। তুমি ব্যাঙ্কে যাওয়ার সময় নিয়ে যেও ওকে, তুলে দিও। গোলাপ নে, মাছটা কোট। আচ্ছা, আমিই কুটছি।"

"মাছ পেলে নাকি, তাহলে তো আবার মাছের তরকারি কুটতে হয়"—বেণু।

"দে, তাড়াতাড়ি দুটো কুটে। ওদের দেরি হয়ে যাবে।"

গোলাপ মাছ নিয়ে কোথায় বসবে খুঁজছিল। কলের পাশটা দেখিয়ে টগর বললো, "এখানে বোস।" কলটা খুলে হাত দুটো ধুয়ে নিল। বেণু খাবার টেবিলের নিচে বঁটি নিয়ে বসে গেছে। "বেণু নিরামিষ তরকারি কুটে দিয়েছিস?" "হ্যাঁ" শুনে টগর রান্নাঘর থেকে কেটলিটা নিয়ে উঁচু গলায়, "অশ্বিনী, চা খাবে না কি।"

"না, এখন আবার চা?"

"আরে দাও না এক কাপ, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?" ভেতর থেকে গোবিন্দবাবু বললেন। গলার স্বর না তুলে। এক গোবিন্দ-বাবুরই হিসেব আছে কোন কণ্ঠস্বরে কতটুকু শোনা যায়।

গোলাপের কাঁধের ওপর দিয়ে কেটলিতে জল ভরে রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে টগর গোলাপের কাটা মাছের টুকরোগুলো দেখে বললো, "আর একটু বড় বড় টুকরো কর।"

"মা" বলে খোকন এসে দাঁড়াতে গোলাপ ঘাড় ঘোরায়, টগর বলে "এসো মানিক।" "মা।" "কিরে" গোলাপ আবার ঘাড় ঘোরায়। "আমি পায়খানায় যাব।" "আয়, আমি খুলে দিচ্ছি।" টগর খোকনকে কাছে টেনে প্যান্টে হাত দেয়। দরজায় লুম্বু-বেবিকে দেখে খোকন প্যান্ট চেপে ধরে। লুম্বু-বেবি মুখে হাত দিয়ে হাসে।

"ও বাবা, ছেলের. আবার লজ্জা ষোল আনা, এই, তোরা যা"—খোকনকে কোলে নিয়ে টগর বাথরুমে ঢুকলে গোলাপ বলে, "ও নিজেই সব পারে দিদি।" টগর বাথরুমের দরজাটা ভেজিয়ে বাইরে আসে।

উনুনে চায়ের জল চাপানো, বেণু কুটনো কুটছে, গোলাপ মাছ। গোবিন্দবাবু, অশ্বিনী ঘরে। চারপাশটা হঠাৎ চুপ হয়ে যায়।

চোখের সামনে এবড়ো-খেবড়ো শান বাঁধানো জায়গায় নোংরা জল, হাতে মাছের ঠাণ্ডা রক্ত, পিত্ত, নাড়ী, মাছের মৃতচোখ, ক্ষয়ে যাওয়া নখ, শিটনো হেজে যাওয়া আঙ্গুল,—এই আনুষঙ্গিকের ওতপ্রোত গোলাপের জ্যাঠশ্বশুরের সংসার, দীর্ঘ বৈধব্যে পরমুখাপেক্ষী শাশুড়ী, সংসারে যার ভূমিকা অনিশ্চিত এমন এক স্বামী, দিনরাত শুধু চালধোয়া আর মাছ কোটা আর আঁচ দেওয়া আর খুন্তি নাড়া আর ফোড়ন দিতে গিয়ে হেঁচে ফেলা, কেশে ফেলা। অভ্যাসেই মাছের টুকরো যদি গোলাপের হাতে ছোট হয়, টগর বড় করতে বলে।

প্রতিজনের জিভের স্বাদ অনুমান করে, মাছের রান্নার স্বাদ কল্পনা করে বেণুকে যদি তরকারি কুটতে হয় তাহলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তার অবান্তর হয়ে যাওয়া পছন্দ-অপছন্দের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সে অন্যমনস্ক না হয়ে কি করে।

খোকন বাথরুমে গেছে, তাই দরজায় দাঁড়িয়ে টগর নতুন এক সম্পর্কের ছাঁচের মুখোমুখি হয়ে পড়ে।

টগর কেটলি তুলে চায়ের পাতা ভিজিয়ে ভেতর থেকে "মা" শুনে বাথরুমে গিয়ে খোকনকে ধোয়ামোছা করে ঘরে চৌকির ওপর বসিয়ে দিয়ে এসে চা বানাতে বসতে গোবিন্দবাবু এসে বললেন, "আমি স্নানে যাই।"

টগর মুখ তুলে বলে, "সে কি, রান্না-ই তো চাপে নি।"

"ও হয়ে যাবে, স্নানটা সেরে নি।"

"চা-টা খেয়ে নাও"—গোবিন্দবাবু ঘরে ফিরে যেতে অশ্বিনী ভাবে কাল রাতে বোঝা যায় নি, আজ সকালে কাজের চাপে বোঝা যাচ্ছে—, এ বাড়ির একটা নিজস্ব অভ্যেস বা নিয়ম আছে। তারা সেই নিয়মের বাইরে। নিয়মটা অবিশ্যি গোবিন্দবাবুকে ঘিরে। অশ্বিনীর চিন্তা ঢোকে এতদিন তার জীবনের তো কোনো নিয়ম ছিল না। তাকে নিয়ে নিয়মটা কেমন তৈরি হবে। সে নিয়মে গোলাপ কেমন খাপ খাবে।

"গোলাপের স্যাণ্ডেল পায়ে হয়েছে?" চা দিতে আসা টগরকে অশ্বিনী শুধোয়।

"এম্মা, ভুলেই গেছি, দেখছি, নাও" চা দিয়ে টগর চলে গেলে অশ্বিনী গোবিন্দবাবুকে শুধোয়, "আপনার বুঝি দেরি হয়ে যাচ্ছে?"

"না না, এখুনি তো স্নানে যাব তুমিও চলো।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ল্যাণ্ডরোভারে বসে ঝাঁকুনির চাইতেও অশ্বিনীর বেশি অসুবিধে হচ্ছিল তাল সামলাতে না পেরে। এত স্পিডের ওপর ড্রাইভার একবার ডান, আর তার পরই বাঁ মোড় নিচ্ছে যে অশ্বিনী স্থিরভাবে বসতেই পারছে না। প্রথমে বেশ কায়দা করে পায়ের ওপর পা তুলে বসে জীবনে এই প্রথম একটা সম্পূর্ণ গাড়ি ভাড়া করে যাওয়ার বিলাসিতা ভোগ করতে গিয়েছিল। পায়ের ওপর থেকে পা বহুক্ষণ আগেই খসে গিয়েছে। এখন অশ্বিনী দুই হাতে সামনের রডটা ধরেও টাল সামলাতে পারে না। স্টিয়ারিঙটা যেমন একবার বাঁদিকে আর একবার ডানদিকে ঘুরে যায় তাতে ড্রাইভারটা তাকে নিয়ে মজা মারছে এই প্রাথমিক সন্দেহটা উপে যায়।

নেহাত নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টায় অশ্বিনীর দেহ-মন-প্রাণ সমর্পিত, নইলে সন্দেহ তাকে কুরে কুরে খেত, ট্যাক্সিটা ঠিকমতো যাচ্ছে কি না, প্লেনভিউ বাগানেই পৌঁছবে কি না, ড্রাইভারটা বদমায়েশ বা মাতাল কি না, প্লেনভিউ বাগানে পৌঁছলে যদি তাকে জয়েন করতে না দেয়, যদি বলে ওপর থেকে টেলিগ্রাম এসেছে এ-অশ্বিনী সরকার সে-অশ্বিনী সরকার নয়।

নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে অশ্বিনী সন্দেহ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আসলে হয়তো সন্দেহ করে বলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দুটোরই মূল তার জ্যাঠামশাইয়ের পরিবারে। দশ-এগার বছর বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে এসে অশ্বিনীকে বাড়ির সব লোকজনের চোখমুখ দেখেই ব্যাপার বুঝে নিতে হয়েছে—নইলে যথাসময়ে কেটে পড়া ও হাজির হওয়ার

মতো কায়দাকানুন করে সে পরিবারটির সঙ্গে থেকেও দরকার মতো একা হয়ে যেতে পারত না। জ্যাঠামশাইয়ের তিনটিই মেয়ে। তাদের বিয়ের পর অশ্বিনী বাড়ির একমাত্র ছেলে হয়ে ওঠার সুযোগ পেলেও আলগা থেকেছে। বাড়ির ছেলে হয়ে ওঠার নানারকম সুবিধে নিশ্চয়ই আছে। অশ্বিনীর সন্দেহ সে-সুবিধেই তার ওপর নতুন দায়িত্ব চাপাবে। সন্দেহ থেকে অশ্বিনী আর মুক্ত হতে পারে না।

তাই তার নিজের মতলব যখন হাসিল করে তখন বোধহয় তার রক্তও সেটা টের পায় না। কিন্তু এমন কইমাছের মতো লাফাতে লাফাতে যদি কোথাও যেতে হয়, সমস্যাটা যদি হয় নিজেকে ঠিক রাখা, তাহলে সন্দেহ করারই বা সময় কোথায়।

দার্জিলিঙ পেরোবার পরও অনেকটা রাস্তা ছাড়া-ছাড়া বাড়িঘর ফেলে এসে, কিছুটা উঠে, একটা ছোটমতো বাজারের ভেতর ঢুকে হঠাৎ বাঁ-দিকে ঘুরে গেলে অশ্বিনী বোঝে সেটা রাস্তা। দু-পাক ঘুরতেই সে পথ এত নির্জন, গা ছমছমাতো, যদি ল্যাণ্ডরোভারের গর্জন চারপাশের পাহাড় থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে তিন গুণ হয়ে না উঠত। রাস্তাটা সরু। একপাশে পাহাড়। খাদ আর পাহাড় দু-দিকেই বিরাট বিরাট লম্বা গাছ। একটু ওপরে বন দেখে অশ্বিনী চিনতে পারে পাইন। এক একটা গাছের গায়ে হঠাৎ হঠাৎ এক একটা সাইনবোর্ডে চা-বাগানের নাম লেখা। প্লেনভিউ অনেকক্ষণ ধরেই দশ মাইল, নয় মাইল, আট মাইল হয়ে ঐ সাইনবোর্ডে সাইনবোর্ডে কাছে আসছিল।

একটা বাঁক নিতেই গাড়িটাকে থেমে যেতে হল। সামনে তিনজন পুলিস, পেছনে আরও একজনকে দেখে অফিসার মনে হয়।

পুলিসের কথার জবাবে ড্রাইভারটা "প্লেনভিউ" বলায় পুলিসটি পেছনে দাঁড়ানো অফিসারকে ডাকে। সে ড্রাইভারকে কিছু জিজ্ঞেস করায় ড্রাইভার ডান দিকের জানালায় তাকিয়ে বাঁ দিকে আঙুল

হেলিয়ে অশ্বিনীকে দেখিয়ে দেয়। অফিসার অশ্বিনীর সামনে এসে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করে—"কোত্থেকে আসছেন?"

"দার্জিলিঙ"।

"কোথায় যাচ্ছেন?"

"প্লেনভিউ টি এস্টেট।"

"কবে প্লেনভিউ থেকে গিয়েছেন"—এই প্রশ্নটার ঠিক মানে বুঝতে না-পেরে অশ্বিনী বলে দিল, "আমি সেন্ট্রাল একসাইজের ইনস্পেক্টর। কাল দার্জিলিঙে এসেছি। আজ প্লেনভিউয়ে যাচ্ছি জয়েন করতে।"

উত্তরটা শুনে অফিসারটি একটু ভাবে। তারপর বলে, "সঙ্গে কাগজপত্র কিছু আছে?"

কাগজপত্র পকেটেই ছিল। বের করে দেখাবার জন্য গাড়ি থেকে নামতে হয়। তাকে নামতে দেখে ড্রাইভার স্টার্ট বন্ধ করে। হ্যাণ্ডব্রেকটার চাপে হঠাৎ তীব্রতর শব্দ তুলে ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেলে চারপাশ থেকে উন্মত্ত ঝিঁঝিঁর ডাক কানে এসে লাগায় অশ্বিনীর ঠাহর হয় ছ-ছটি মানুষ থাকা সত্ত্বেও চারপাশের নিস্তব্ধতা কী রকম প্রবল। একটা সোঁদা গন্ধও তার নাকে লাগে,—পেট্রলের গন্ধে এতক্ষণ নাক ঝাঁঝাঁ করার পর বলেই হয়তো। গায়ে রোমাঞ্চ হয়।

কাগজপত্র দেখে অফিসার আবার কিছু ভাবে। তারপর জিজ্ঞেস করে, "তুমি প্লেনভিউ বাগানের কাউকে চেন?"

"কোনোদিন যাই নি, চিনব কী করে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, অশ্বিনীর দিকে না-তাকিয়ে, অফিসারটি বলে, "প্লেনভিউ বাগানে কাল একটা খুন হয়ে গেছে।"

মুখ থেকে "খুন?" বেরিয়ে যেতেই অশ্বিনী ঠোঁট আটকে দেয়। সম্পূর্ণ চুপ হয়ে গিয়ে দেখে ড্রাইভারটি পুলিসের সঙ্গে বেশ জমিয়ে গল্প করছে। নিশ্চয়ই খুনটির গল্পই। যে-খুনের গল্প ড্রাইভার হাসিমুখে শুনতে পায়, সেই খুনের কথা শুনেই অশ্বিনী চুপ করে যায়।

কাগজপত্র ফিরিয়ে অফিসার যাবার অনুমতি দিয়ে পুলিসদের দিকে হেঁটে যায়। এই গাড়ি চলে গেলে এত একলা যে পুলিসের সঙ্গে অফিসারটিকে এক হয়ে যেতেই হয়। "খুন" বলার পরও কেউ যে তার বর্ণনা না দিয়ে থাকতে পারে সেটা বুঝে অশ্বিনী এসে গাড়িতে বসল।

বেশ খানিকটা এসে বাঁয়ে মোড় নিয়ে সোজা ওপরে উঠতেই আবার পুলিস গাড়িটাকে থামাল। ড্রাইভারকে হঠাৎ গিয়ার বদলাতে হওয়ায় স্লিপ করল। জায়গাটা এত চড়াই যে সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ডব্রেক কষেও ড্রাইভারকে লাফিয়ে নেমে পেছনের চাকার নিচে একটা পাথর ঠেকাতে হল। ড্রাইভার একটা খিস্তি করল। অশ্বিনী এবার প্রথমেই কাগজপত্র বের করে দেখাল।

গাড়িটা যেন একটা চিৎকার করে লাফিয়ে সামনের চড়াইটাতে উঠতেই সামনে সমতল পথ, বড় সাইনবোর্ডে লেখা "প্লেনভিউ টি এস্টেট," নিচে কোম্পানির নাম, ডান পাশে কোয়ার্টার, একটু পরে ডান বাঁ দু-দিকেই, তারপর একটু চড়াই, আর তার ওপরেই অফিস। ফ্যাক্টরির শব্দ পাওয়া যায়। কাঁচা চায়ের গন্ধ।

দুই

গাড়ির শব্দ শুনে অফিসের ভেতর থেকে যে দু-তিনজন বেরিয়ে এসেছে, অশ্বিনীকে তাদের দিকে আসতে দেখে একজন এগিয়ে এসে বললো, "স্যার, বড় বাবু তো পুলিস ফোর্স নিয়ে স্পটে গিয়েছেন, আপনি কি এখানে বসবেন স্যার।"

"আমি সেন্ট্রাল এক্সাইজ ইনস্পেক্টর, আজ এখানে আমার জয়েন করার দিন।" অশ্বিনী প্রথমেই ওদের ভুল ভাঙায়।

"ও, আসুন, আমরা ভেবেছিলাম…"

ওদের তিনজনের সঙ্গে ভেতরে যেতে-যেতে অশ্বিনী শুনল, "মানে আমাদের এখানে কাল একটা মার্ডার হয়েছে। আমাদের

বাগানেরই কি না এখনো ধরা পড়ে নি, পুলিস সাহেবেরও নাকি আসার কথা, সেজন্য, আপনি বসুন, বড় বাবুর ফিরতে তো দেরি হবে।"

একটা এগিয়ে দেওয়া চেয়ারে অশ্বিনী বসতেই বাকি সবাই দরজার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, "একী?" "দর্জি?" "তুমি যাও নি?"

দর্জি ঘরে ঢুকে অশ্বিনীর সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে, অশ্বিনীর দিকে তাকিয়েই বললো, "দর্জির কাজ তো ভালো জ্যান্ত লেবারদের দেখ্‌ভাল্‌ করা, তো এখন মরা লেবারের পেছনেও ছুটতে হবে নাকি?" দর্জির উচ্চারণ একটু ভাঙা, বাঙলা নির্ভুল। সে অশ্বিনীকেই জিজ্ঞেস করে, "আপনি কি পুলিসের…" "না, উনি আজ, এখুনিই এলেন, সেন্ট্রাল একসাইজের ইনস্পেক্টর, জয়েন করতে এসেছেন।"

বেশ খানিকক্ষণ হো হো হেসে দর্জি বললো—"এবার কোম্পানির বউনি খুব খারাপ গুদামদা। শালা একই দিনে একই ক্ষণে বাগানে পুলিস আর সেন্ট্রাল একসাইজ ইনস্পেক্টর! হা-হা।" বাকিরাও হাসিতে যোগ দেয় দেখে, অশ্বিনীও।

"দর্জি, তোমাকে বড়বাবু সঙ্গে নিয়ে যান নি? আমরা তো ভাবলাম তোমাকে না-নিয়ে যাবেনই না"—

"বড়বাবুও তা-ই ভাবেন, আমার কাছে লোক গিয়েছিল, আমি বলে দিলাম মুদ্দা দেখে বেড়ানো আমার কাজ না—"

অশ্বিনীর সন্দেহ হয় দর্জি কিছু একটা পোজ দিচ্ছে যেন, নাকি লোকটাই একটু দেখানে?

"তোমাকে পুলিস ইনস্পেক্টর ডাকে নি?"

"দাদা, আপনারা সব সিনিয়র লোক থাকতে পুলিস ইনস্পেক্টর আমাকে ডাকবে কেন। আমি তো তার চাকরি করি না। সে যদি মনে করে আমি খুন করেছি, তাহলে বড় জোর অ্যারেস্ট করতে পারে।"

দর্জি আবার পুরনো হাসি দিল, কিন্তু আর কেউ যোগ দিল না। কিছু একটা বলতেই যেন অশ্বিনী বলে, "আমার গাড়িটা দু-বার আটকেছে।"

"এত বুদ্ধি না হলে পুলিশ!" দর্জি বেশ চেঁচিয়ে বলতে থাকে, "শালা বডি আইডেন্টিফাই হল না, কেউ দেখেও নি, অত নিচে গিয়ে কে দেখে আসবে, বডি দার্জিলিঙে নিয়ে যাবে কিনা তার ঠিক নেই, বডি আছে কিনা কে জানে, পরশু রাতে প্রথম গুরুং বস্তি থেকে খবরটা বেরয়। তারপর কাল সারাদিন সারারাত, আজ সকাল। গুরুং বস্তি-ই কদিন পর খবর পেয়েছে কে জানে! আর শালা পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়ি ঠেকাচ্ছে।"

দর্জির কথার মাঝখানেই যে অন্যেরা গম্ভীর হয়ে খাতাপত্র খুলে বসে গেল, একজন তো বেরিয়ে গেল, এটা অশ্বিনীর নজর এড়ায় না।

দর্জির কথা থামতেই একজন অশ্বিনীকে বলে, "আপনার কিন্তু দেরি হবে, বড়বাবু ওখান থেকে ফিরে কি আর অফিসে আসবেন? এই ওবেলায়।"

"উনি তো জয়েন করতেই এসেছেন। রাত্রিতে আমার ওখানে থাকবেন"—দর্জি।

"না আজ আমাকে ফিরে যেতেই হবে, গাড়িটাও সেই শর্ত করে নিয়ে এসেছি, আমার স্ত্রী ছেলে দার্জিলিঙে আছে, ওদের আনতে হবে,—আচ্ছা আমার কোয়ার্টার তো···"

"বড়বাবু এলেই সব ব্যবস্থা হবে।"

"বড়বাবু মানে ম্যানেজার?"

"ম্যানেজারের সঙ্গে তো আপনার দেখা হওয়ার কথা না, বড়-বাবুর কাছেই সব করতে হবে, মানে হেডক্লার্ক। আপনি দুপুরে খাবেন তো—"

"না, না, আমি খেয়ে এসেছি।"

দর্জি একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিলে অশ্বিনী নেয়।

টেবিল থেকে, দর্জি যাঁকে গুদামদা ডাকে, বললেন, "আপনি তো অন্ ট্রান্সফার ?"

"না, এটাই আমার ফার্স্ট পোস্টিং। এর আগে স্টেট গবমেণ্টে ছিলাম।"

"ও। আমাদের এখানে আগে কোনো ইনস্পেক্টর পোস্টিং ছিল না। দার্জিলিঙ হেড কোয়ার্টার থেকেই ঘুরে ঘুরে সব করত। এখন হল, বেশ সুবিধে—"

"গুদামদা, কেন ভাই ন্যাকামি করছ। এইটাই তোমাদের দোষ, তুমি আছ গুদামে, সেন্ট্রাল একসাইজ এলে তোমার সুবিধে হবে কেমন করে ?" দর্জি কথাটা শুরু করেছিল গুদামবাবুর দিকে তাকিয়ে, শেষ করে অশ্বিনীকে।

গুদামবাবু উত্তর দেবার আগেই অশ্বিনী মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে দর্জিকে বলে, "আপনি এত ভালো বাঙলা শিখলেন কোত্থেকে ?"

আর এক টেবিল থেকে মন্তব্য, "ঐ তো ওর কাল, একে পাহাড়ী গোঁ, তার সঙ্গে মিলেছে বাঙালী প্যাঁচ, দর্জি এখন সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।" দর্জি ডোণ্ট পরোয়া গোছের জবাব দেয়, "গুপ্তদা, দর্জি তোমাদের প্যাঁচাপেঁচির মধ্যে নেই বুঝলে। সে তুমি খুব ভালো করেই জান। প্যাঁচ কষলেও সিধে প্যাঁচ। প্যাঁচ জেনেও তোমার সাধ্য নেই খোলো। দেখতেই তো পাচ্ছ বাবা। আবার আমাকে কেন ঘাঁটাও।"

"তা অবিশ্যি দেখতে পাচ্ছি-ই ভাই। তা এবার যখন বর্ষার শুরুতেই প্যাঁচটা দিলে তোমার বোনাসটা ভালোই হবে"—গুদাম-বাবু।

"কি করব দাদা, দর্জি তো লেবার অফিসারও নয়, গুদামবাবুও নয়। কী যেন আমার ডেজিগনেশন ? লেবার ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। না-লেবার, না-বাবু। না-ঘরকা না-ঘাটকা। নিজের ব্যবস্থা নিজেরই করতে হয় !"

"ব্যবস্থা তুমি ভালোই কর। শেষ সামলাতে পারলে হয়!"

"কী আর হবে, আজ আমি খতম করছি, কাল না হয় আমাকে খতম করবে।"

অশ্বিনী দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু এটুকু বোঝাতে যে সে এ-আলোচনায় নেই। তার সামনে গুদামবাবুকে আক্রমণ করায় হয়তো গুদামবাবু দর্জিকে ছাড়ছে না, কিন্তু দর্জি আসার পর থেকেই কোনো একটা বিষয় এড়াতে যাঁরা টেবিলে চলে গিয়েছিলেন তাঁরাই টেবিল থেকে সেই অস্পষ্ট বিষয়টা নিয়েই কথা বলতে শুরু করেছেন। অশ্বিনী এইটুকু সময়ের মধ্যে বুঝে উঠতে পারে না দর্জির ডোণ্ট কেয়ারি ভাবটা আসলে ওর চরিত্রগত না-কি ভেতরের কোনো অস্বস্তি চাপা দিতে চাইছে সে। এত বাহাদুরি কেন দর্জির। একটু কি ভয় পেয়েছে। কেন।

কথা না বলেও সে ওদেরই আলোচনায় অংশ নিচ্ছে বুঝে অশ্বিনী মুখ ফিরিয়ে আবার বলে, "কই, বললেন না, এত ভালো বাঙলা শিখলেন কোত্থেকে?"

"কলকাতায় ছিলাম, কলেজে পড়তাম, তখন শিখেছি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতও শুনিয়ে দিতে পারি।"

গুদামবাবু, গুপ্তবাবু টেবিল ছেড়ে এসে বললেন, "তুমি তাহলে ওঁকে গান শোনাও, আমরা খেতে যাই। আপনি একটু বসুন। বড়বাবু না এলে তো কিছু হবে না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনারা যান, আমি আছি।"

গুদামবাবু, গুপ্তবাবু বেরিয়ে যাওয়ায় অশ্বিনী দর্জিকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি খেতে গেলেন না?"

"খেলেই হবে এক সময়। আপনি খেলে আপনাকে নিয়ে যেতাম।"

"না, না, আপনি যান না, আমার কোনো অসুবিধে হবে না।"

দর্জি ওঠাতে অশ্বিনী ভাবল সে বেরিয়ে যাচ্ছে। দর্জি গিয়ে দুটো চেয়ার নিয়ে এসে, নিজে একটাতে পা তুলে দিয়ে বললো, "নিন, আরাম করে বসুন।"

নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে দর্জি গুন গুন করে। একঘেয়ে সুর। দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। অশ্বিনী ভাবতে শুরু করে দর্জি যতটা অন্যমনস্ক তাতে মনে হচ্ছে না সে শুধু অশ্বিনীর জন্যই এখানে থেকে গেছে। আবার এ-ও হতে পারে এমন অন্যমনস্কভাবে কর্তব্য করাই দর্জির স্বভাব। না বুঝতে পেরে অশ্বিনী কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করে না।

মুখ ফিরিয়ে হেসে ফেলে দর্জি বলে, "আপনি আগে কখনো পাহাড়ে এসেছেন ?"

"না।"

"চা-বাগানেও না ?"

"না।"

"দার্জিলিঙে কাল কখন পৌঁছলেন ?"

"সন্ধ্যের পর।"

"তাহলে তো আজ আপনার শুভদৃষ্টি। সত্যি সত্যি শুভদৃষ্টি। পাহাড় তো কোনোদিন দেখেন নি।"

"হ্যাঁ, বেশ মজা লাগছে।"

"মজা ? আপনাকে না বাগানে ঢোকার সময় দু-বার পুলিশ আটকেছিল বললেন, তবু মজা ?"

অশ্বিনী ভুলে গিয়েছিল। হেসে শুধরালো "সেটাও তো মজা। তবে এ জায়গাগুলো বড় নির্জন"—

"এত নির্জন যে এরপর দার্জিলিঙে গেলেও আপনার অস্বস্তি হবে।" দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দর্জি বললো, "আবার কলকাতায় যে দু-বছর ছিলাম, এখানে, মানে দার্জিলিঙে এলেও হাঁফিয়ে উঠতাম। আপনি কি কলকাতা থেকে ?"

"না।"

"তাহলে আসলে কলকাতা-ই আপনাকে বাঙলা শিখিয়েছে।"

"আই-এস-সি পড়তে গিয়েছিলাম সিটি কলেজে। বি-এস্ সি পড়তে দার্জিলিঙে চলে আসি। বাবার ব্যবসার কী গোলমাল হল। মনটন খারাপ। পড়াশোনা আর করা হল না।"

"চাকরি শুরু করে দিলেন?"

"আমার সবই ঐ রকম। একবার এই বাগানে কী একটা গোলমাল হল যেন, আমি খুব লড়ে গেলাম, লেবারদের খুব বোঝালাম, রায়টটা আর লাগল না। ব্যস, ম্যানেজমেন্ট ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়ে দিল। নিয়ে নিলাম।"

"বাঃ, আপনার ভাগ্য। আর আমাদের চাকরির জন্য কী না করতে হয়!"

"সব চাকরিই তাই ইনস্পেক্টর"—অশ্বিনী একটু চমকে গেল, এটাই কি তার নতুন দাম, দর্জিই প্রথম ডাকল? "আমাকে কেন এরা চাকরি দিল জানেন? আমি ভালো বাঙলা জানি। বাবুদের প্রায় সবাই বাঙালী। আমি পাহাড়ী। লেবাররা সবাই পাহাড়ী। আই অ্যাম এডুকেটেড এনাফ টু রাউজ দিজ্ পাহাড়ী লেবার্স্ কনফিডেন্স। বাট আই অ্যাম নট এডুকেটেড এনাফ টু গেট ক্লাশ থ্রী গ্রেড। এই সাহেব জাত মশাই, সবসময় বাঙালী-পাহাড়ী টেনশন রেখে বাগান চালাচ্ছে। আমাকে রেখে দিয়েছে শিখণ্ডী। আই কম্যাণ্ড নো কনফিডেন্স অফ বোথ দি পার্টিজ। এটাই আমার একমাত্র কোয়ালিফিকেশন।"

"তা বলছেন কেন। সবাই নিশ্চয়ই আপনাকে বিশ্বাস করে, নইলে আর আপনাকে···"

"আরে মশাই, কে কী ভাববে সেটা তো ঠিক করবে সাহেবরা। লেবারদের ভাবাবে---দর্জি তোমাদের লোক আছে ম্যানেজমেণ্টে। আর বাবুদের বোঝাবে—দর্জি ওদের লোক, তাই বাবুদের বাদ দিয়ে

শুধু লেবারদের ডিমান্ড মেটাতে হচ্ছে। তাই আমাকেও একটা নিজস্ব স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হয়েছে।"

পাছে দর্জি তার সেই স্ট্র্যাটেজি এখুনি ব্যাখ্যা করতে বসে, অশ্বিনী বলে ফেলে, "আপনি তো এখানে কোয়ার্টারে থাকেন?"

'হ্যাঁ, কোয়ার্টার একটা আছে। তবে আমি একটু ঘুরেই বেড়াই। পাশের কটা বাগানে ইউনিয়ন আছে। তবে চাকরি তো আমার এখানেই।"

"আমারও তাই। প্লেনভিউটা হেডকোয়ার্টার, আশ-পাশের বাগান মনপুরান, সানিভ্যালি, আর একটা যেন কী, এগুলোও আমার চার্জে।"

"আপনার তো সরকারি চাকরি। চাকরিটাই চার বাগানের। আমার চাকরিটা এই বাগানেই। আর অন্য বাগানের ইউনিয়নগুলি আমার নিজের।" দর্জি ব্যাখ্যা করে।

তিন

বেলা তিনটার সময় বড়বাবু আসেন। তার আগে অনেকেই এসেছেন, গেছেন। অশ্বিনী প্রায় প্রত্যেককেই বড়বাবু ভেবেছে, এক গুদামবাবু আর গুপ্তকে ছাড়া। কিন্তু এবার দর্জিই বলে উঠল, "বড়বাবু"। দর্জি "বড়বাবু" ডাকা সত্ত্বেও বড়বাবু কোনোদিকে না তাকিয়ে ঘরের অপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেছন ঘুরে অশ্বিনী শুধু তার ধুতির নিচে পরা ড্রয়ারটা দেখল। দর্জির দিকে তাকাতে সে নিচের ঠোঁটের একটা ভঙ্গি করে দু-হাত ওল্টায়।

সহসা অশ্বিনীর সন্দেহ হয় বড়বাবু তাকে দেখেন নি, দরজার বাইরে থেকে দর্জিকে দেখে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন। এতক্ষণ তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য দর্জির প্রতি কৃতজ্ঞতাটুকু মুহূর্তেই একটা দায় হয়ে পড়ে। অশ্বিনী বলে, "ঠিক আছে, আপনি এখন যান, বহুক্ষণ আমার জন্য কষ্ট করলেন, আমি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে নিচ্ছি।"

"চলুন না, আমি নিয়ে যাচ্ছি।" দর্জি পা বাড়িয়ে বসায় অশ্বিনীর অস্বস্তি আরো ভেতরে সেঁধায়।

'আমার বোধহয় একা যাওয়াই ভালো, চাকরির জয়েনিং তো—" অশ্বিনী বলে বটে, পা না-ফেলার কোনো কারণ পায় না।

"আরে রাখুন ইনস্পেক্টর, এ হচ্ছে চা বাগান, এখানকার আইন-কানুন সব আলাদা, দেখবেন বড়বাবু হয়তো আইনের ফ্যাকড়া তুলে আপনাকে জয়েন করতেই দেবে না।"

ভেতরে একটা বারান্দা। বারান্দার দু-দিক থেকে দু-সারি ঘর সমান্তরালে। দর্জি বাঁ দিকের একেবারে শেষের ঘরটাতে গিয়ে ঢুকতে বড়বাবু চোখ তুলে নামিয়ে নিতে গিয়ে অশ্বিনীকে দেখে বলেন, "আপনি? বসুন।"

এবার আর অশ্বিনীর সন্দেহের মধ্যে থাকে না, দর্জিকে সে এড়াতে চায়। বড়বাবু দর্জিকে দেখতে চাইছেন না—এ ব্যাপারটা আর সন্দেহের ভেতর নেই, প্রমাণ হয়ে গেছে। অশ্বিনী একটা চেয়ার টেনে বসতেই দর্জি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে, "উনি সেন্ট্রাল এক্সাইজ ইনস্পেক্টর, বহুক্ষণ এসেছেন, আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, জয়েন করবেন।"

বড়বাবু অশ্বিনীর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, দর্জির কথা শেষ হওয়ার পর বললেন, "আপনি তো গোবিন্দবাবুর ভায়রা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"গোবিন্দবাবু আপনার কথা বলছিলেন সেদিন, তো আমাদের একজন সঙ্গী বাড়ল, এই বনবাসে, বাঙালী ছেলেরা তো আর আসছেই না এ দিকে"—অশ্বিনী বোঝে দর্জি যদি না থাকত বড়বাবুর কথাগুলো হয়তো এতটা শুকনো শোনাতো না। বাঙালী ছেলেদের প্রসঙ্গ এনে কি বড়বাবু দর্জির উপস্থিতি অস্বীকার করতে চাইলেন।

"তো যাক্ গে সে-কথা, আপনার জিনিস-পত্র?"

"আমি তো গোবিন্দদার বাড়িতেই উঠেছি। আজ জয়েন করে

সব ব্যবস্থা করে ফিরে গিয়ে ফ্যামিলি নিয়ে আসব। আমার তো একটা কোয়ার্টার পাওয়ার কথা।"

"সে-সবই ঠিক আছে, তবে পরিষ্কার করে দিতে হবে তো, আপনি যদি একটা চিঠি দিয়ে আসতেন তবে কোনো অসুবিধেই হত না। অবিশ্যি আমাদের এখন একটু ঝামেলা যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, শুনলাম কী একটা মার্ডার, আমার গাড়িটাও পুলিশ দু-বার আটকেছিল, ডেড বডিটা কি আইডেন্টিফায়েড হয়েছে?"

নিঃশব্দ হাসিতে বড়বাবুর ঠোঁট ছড়িয়ে থাকায় অশ্বিনী ভাবে তাঁর দাঁতগুলি নিশ্চয়ই বাঁধানো। "আইডেন্টিফাই করবার মতো কিছু কি আর আছে? মুখের চামড়াটা নিপুণভাবে চেঁছে তুলে নেয়া, যে-ভাবে সিদ্ধ আলুর খোসা চেঁছে নেয়, মাথার খুলির চামড়া-সহ, ইনস্পেক্টর বলছিল কোনো সার্জেনও অত নিপুণভাবে চামড়া তুলতে পারবে না, তার ওপর বডিটা আধপোড়া, কী দিয়ে আইডেন্টি-ফাই করবেন—তিন দিনের পচা মড়া? আপনি আজ এলেন, দেখবেন আমরা কী নিয়ে বাস করি। লেবাররা নিজেদের মধ্যে মাতলামি মারামারি করে তো মরেই, সে বাদ দিন, আপনার আমার লাভের জন্যই কে কাকে খতম করে দিচ্ছে। চার পাশে এত চা-বাগানের হাজার হাজার লেবার। মেরে একবার ফেলে দিতে পারলে এখানে কে কাকে ধরে। পুলিশ কুকুর আনবে।" বড়বাবু এই প্রথম দর্জির দিকে চোখ তুললে অশ্বিনী দেখে দর্জি বড়বাবুর চোখে চোখ রেখে কথা শুনছে, বড়বাবু চোখ সরিয়ে অশ্বিনীর ওপর এনে কথা শেষ করলেন, "কুকুর আনবে বলেছিল, কিন্তু বডির অবস্থা দেখে বললো, আর লাভ নেই।"

খুব তাড়াতাড়ি অশ্বিনী বুঝে নিতে চায় মৃতদেহ সনাক্ত হয়েছে কিনা এর এক কথার জবাবের বদলে এত বিস্তৃত বর্ণনা কেন দেন বড়বাবু। যেমন জ্যাঠামশাইয়ের ডাক ও প্রথম শব্দ কয়েকটি শুনেই সে বুঝে নিত কোথায় শেষ, জ্যাঠামশাই কোন কথাটি বলবেন না।

কিন্তু আবাল্য পরিচিত জ্যাঠামশাই সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে কি আর কয়েক মিনিটের চেনা বড়বাবুর মতলব ধরা যায়, যখন জানেই না বেশি কথা বলাটা তাঁর স্বভাব কিনা—দর্জির সঙ্গে কথা না বলা, তার দিকে না তাকানো যতই কেন ইঙ্গিত দিক যে বড়বাবুর ভাবভঙ্গি কথাবার্তা খুব অচেতন নয়।

খুলি আর মুখমণ্ডলসহ সমস্ত মাথাটার চামড়া দক্ষতার সঙ্গে চেঁছে নেয়া আধপোড়া মৃতদেহটা কিন্তু অশ্বিনীর কল্পনায় ধরাই পড়ে না।

দর্জি বলে ওঠে, "আমি অবিশ্যি ইনস্পেক্টরকে বলছিলাম···"

"ইনস্পেক্টর?" বড়বাবু ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণভাবে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারাটা শরীর টেবিলের ওপর হাতের ভরে এগিয়ে আসে—তিনি যেন দাঁড়িয়ে পড়বেন।

খুব ঠাণ্ডা গলায় দর্জি বলে, "সেনট্রাল এক্সাইজের। অশ্বিনীবাবু।"

"ও", বড়বাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন।

"আমি বলছিলাম ওকে আমার সঙ্গে থাকতে, কিন্তু উনি তো ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন, আমার কোয়ার্টারটা ওঁকে ছেড়ে দিতে পারি—"

"কেন। আমার কোয়ার্টার কি ঠিক নেই?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। তবে সেটা ঠিকঠাক করতে দু-চার দিন সময় লাগবে তো। তার ওপর এই হাঙ্গামা। দর্জি যদি ছেড়ে দেয়, আপনি ঐ কোয়ার্টারটা নিয়ে নিন, তাড়াতাড়ি ফ্যামিলি নিয়ে আসুন।"

"না, না, আমার জন্য মিঃ দর্জির—"

"ওটা কোনো ব্যাপার না। কোয়ার্টারটা খালি ছিল বলেই আমি ছিলাম, আমাকে এমনিতেই খালি করতে হত"—দর্জি।

"ঠিক আছে" বড়বাবু বললেন, "আপনি তাহলে সব দেখেশুনে যান, আপনাকে তো আবার আজই ফিরতে হবে, রাস্তায় বৃষ্টি নামলে মুশকিল। বাইরে যে-গাড়িটা দেখলাম সেটা আপনার?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে তো জয়েনিং রিপোর্ট করতে হবে।"

"জয়েনিং তো সুপারিনটেনডেন্ট অফিসে। আমরা তো ডাইরেক্টলি ওদের আণ্ডারে।"

"সে কি, আমাকে যে লিখেছে প্লেনভিউ-এ জয়েন করতে।"

"তাই নাকি? দেখি। দাঁড়ান রাধারমণবাবুকে ডাকি"—শুনে দর্জি বেরিয়ে গেল ডাকতে।

বড়বাবু দু-হাতের আঙুল জড়িয়ে, কনুই পর্যন্ত টেবিলের ওপর রেখে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাকে দর্জি নিয়ে এল কেন? আপনি কি ওকে আগে চিনতেন?

"না। আজ এখানে আলাপ। তখন থেকে উনি আমার সঙ্গে..."

"তা-ও ভালো। মানে আপনি নতুন লোক। চার পাশে একটু নজর রেখে চলবেন।" বড়বাবু থামলেন। অশ্বিনীর মনে হল পায়ের শব্দ না শুনলে বড়বাবু আরও কিছু বলতেন। রাধারমণবাবু আর দর্জি ঢুকল।

"আচ্ছা রাধারমণবাবু, উনি সেনট্রাল এক্সাইজ ইনস্পেক্টর, জয়েন করতে এসেছেন, তা আমরা ওঁর জয়েনিং রিপোর্ট নেব কী করে, সুপারিনটেনডেন্ট অফিস নেবে না?" প্রশ্নটাকে বড়বাবু এমন একপেশে করে ফেলেন অশ্বিনী বিরক্ত হয়। দর্জি বা রাধারমণবাবু না বসায় বড়বাবু ও তাদের দু-জনকেই দেখতে অশ্বিনীকে চেয়ারে কোণাকুণি বসতে হয়।

"সুপারিনটেনডেন্ট অফিস থেকে কোনো চিঠি আসে নি?" রাধারমণবাবু।

"না। এলে তো জানতেই পেতেন।"

"কেন, গেল মাসের প্রথমে একটা এল না? ইনস্পেক্টরের কোয়ার্টার হবে প্লেনভিউ বাগানে, বি-টাইপের, একজিসটিং কোয়ার্টারের লোড চাইল।"

বেঁটে মোটা রাধারমণবাবুর গলায় মাফলার জড়ানো বলেই হয়তো মনে হয় কোনোদিকে না তাকিয়ে তিনি মনে মনে চিঠিটা পড়ে ফেলছেন। বড়বাবু রেগে উঠলেন, "আরে সে তো মশাই কোয়ার্টারের কথা, তার সঙ্গে জয়েনিং-এর সম্পর্ক কি?

"না, তা, কোনো সম্পর্ক নেই, তবে সুপারিনটেনডেণ্ট অফিস জানে যে ইনস্পেক্টর আসবে।" রাধারমণবাবু কথাই বলেন আস্তে আস্তে।

"তো, তারা যখন জানে তাদের কাছেই যাক, আমার কাছে কেন", বড়বাবু টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলেন।

মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা শুনতে শুনতে-ও অশ্বিনী খেয়াল করে বড়বাবু যদিও ধরেই নিয়েছেন রাধারমণবাবু অশ্বিনীর এখানে জয়েন করার পক্ষে, রাধারমণবাবু কোনো মত দেন নি। অশ্বিনী প্রশ্ন করে, "সুপারিনটেনডেণ্ট অফিসটা কোথায়, সেটা কিসের অফিস?"

"আমাদেরই অফিস, মানে আমাদের কোম্পানির এদিককার বাগানগুলো নিয়ে"—রাধারমণবাবু।

"সেটা কোথায়?"

"কাছেই। আপনি যে-রাস্তায় এলেন"—রাধারমণবাবু।

"তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি?" মুখ ঘুরিয়ে করা প্রশ্নটার কেউ কোনো জবাব না দেওয়ায় অশ্বিনী আরো বার দুয়েক মুখ ঘোরায়।

"আমিও সেটাই ভাবছি," খুব আস্তে রাধারমণবাবু বলেন।

"আপনিও সেটাই ভাবছেন? তো ভাবুন। আমি কোথাকার কে মশাই যে ওঁকে জয়েন করতে দেব?" বড়বাবুর রেগে ওঠার জবাবে রাধারমণবাবু নিজের সঙ্গে আলাপের সুরে বলেন, "সেনট্রাল এক্সাইজের ব্যাপারটা তো বাগানের সঙ্গে, সুপারিনটেনডেণ্ট অফিসের সঙ্গে ওঁর কি?"

"ওঁর সঙ্গে আমার কি? উনি কি আমার এমপ্লয়ি? বড় অফিস কি জানিয়েছে ওঁকে জয়েন করতে দিতে?"

"আমাদের বড় অফিস কি চিঠি দিয়েছে, দেয় নি, সেটা তো আর ওঁর জানার কথা নয়।" নিজের সঙ্গে তর্ক করে রাধারমণবাবু কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করছেন বটে, তবু তিনি একবারের জন্যও বলেন নি অশ্বিনীর এখানে জয়েন করা উচিত—বড়বাবু যতোই কেন না সেটা ধরে নিন।

অশ্বিনী সতর্ক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা যেন স্বস্তি পায়—চাকরিতে জয়েন করা সম্পর্কে আশঙ্কা আর সন্দেহে তৈরি তার ধারণাটা এমন সত্যি হয়ে যায় দেখে। অশ্বিনী জানেও না মনের সেই আশঙ্কা আর সন্দেহ তাকে কখন এমন প্রস্তুত করে ফেলেছে যে অবস্থাটা চেনামাত্র সে সতর্ক হয়ে উঠতে পারে।

দার্জিলিঙে আসা দূরের কথা, নিয়োগপত্র পাওয়ার পর থেকেই অশ্বিনী জানে যেন এমন একটা অবস্থা শেষ পর্যন্ত তৈরি হবে।

মনের বা কল্পনার কাছে যেটা সত্য তার জন্য তৈরি হয়ে ওঠা আর তৈরি থাকতে পারার এমন ক্ষমতা তার আছে, সে তা নিজেই জানে না।

পকেট থেকে চিঠিটা বের করার সময় তার ভঙ্গিটা খুব কাটা-কাটা হয়। এতক্ষণ মুখ ঘোরাঘুরির সময় যেমন অসহায় তাকে মনে হচ্ছিল, সেটা কেটে যায়, তাকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হয় "এই তো লিখছে, মনপুরান, রাঙতি, সানিভ্যালি আর প্লেনভিউ আমার বাগান, প্লেনভিউ হবে হেড কোয়ার্টার।"

চিঠিটা বড়বাবু পড়ে, রাধারমণবাবুকে দিলেন। রাধারমণবাবু একটু বেশি সময় নিয়ে পড়ে আবার উল্টে কী দেখে অশ্বিনীকে চিঠিটা ফেরত দিলেন। "কি। ঐ চিঠির মধ্যে কোথায় লেখা আছে যে আমাকে জয়েন করতে দিতে হবে?"

"এই তো লেখা আছে প্লেনভিউ-এ হেড কোয়ার্টার হবে", অশ্বিনী বলে বটে কিন্তু বড়বাবু বা রাধারমণবাবু কেউই তার দিকে চোখ ফেরায় না। অশ্বিনী এটা বুঝে গিয়েছে রাধারমণবাবুর মতটাই

এখানে টিকবে—তাই বড়বাবু এত চেঁচামেচি করে তাঁর নিজের কথাটা বোঝাতে চান।. রাধারমণবাবু কোনো মত এখনো দেন নি —অন্তত অশ্বিনী তেমনই বুঝেছে।

কিছুটা নীরবতার পর বড়বাবু দু-হাতের আঙুলগুলি জড়িয়ে, কনুইয়ে ভর দিয়ে টেবিলের ওপর একটু এগিয়ে এসে বলেন, "আপনি এক কাজ করুন রাধারমণবাবু। সুপারিনটেনডেন্ট অফিসে একটা চিঠি লিখে দিন।"

"তা লিখতে পারি"—রাধারমণবাবুকে বেরুতে দেখে অশ্বিনী বুঝতে পারে, সে যে আজ চাকরিতে যোগ দিয়েছে সেটা সব প্রমাণের বাইরে চলে যাচ্ছে। অশ্বিনী বলে ফেলে, "তার চাইতে এক কাজ করুন না।" রাধারমণবাবু দাঁড়িয়ে পড়েন। "আমি আমার অ্যাপয়েন্ট লেটারের নম্বর দিয়ে আপনাকে চিঠি দিচ্ছি যে আজ আমি সেনট্রাল এক্সাইজের ইনস্পেক্টর হিসেবে জয়েন করলাম। আপনি সেই চিঠি আপনাদের বড় অফিসে পাঠিয়ে দিন। আর আমাকে একটা চিঠি দিন। আর কিছু না লেখেন অন্তত এইটুকু লিখুন যে আমি জয়েন করলাম জানিয়ে যে-চিঠি দিয়েছি সেটা পেয়েছেন।"

"কি বলেন রাধারমণবাবু", বড়বাবু জিজ্ঞাসা করেন।

"আপনি তো ওঁর জয়েন করার ব্যাপারটাই মানছেন না। বলছেন, বড় অফিস থেকে চিঠি আসে নি, আপনাদের বড় অফিসের সঙ্গে আবার ওঁর কোনো সম্পর্কই নেই।"

"আমিই বা বড় অফিসের চিঠি ছাড়া ওঁকে জয়েন করতে দেব কেন?"

"সে অবশ্য ঠিকই।"

অশ্বিনী বোঝে আবার প্রথম থেকে সমস্ত কথা শুরু হবে। চিঠি লেখার কথাটা তার মাথাতে যখনই এসেছে, তখনই সেটা থেকে নানা সুতো বেরিয়ে তার মাথার ভেতরে জাল বোনার কাজ শুরু

করেছে। সেটা বুঝতে পারামাত্র অশ্বিনী অহঙ্কারী, জোরালো আর রোখা হয়ে ওঠে। ওপরে নমনীয়, শান্ত, বাধ্য অশ্বিনী ভেতরে ভেতরে সবার আড়ালে কাজ হাসিল করার ব্যাপারে ক্ষিপ্র হয়ে উঠতে পারে, যদি সে বোঝে, তার নিজের ভেতরে সেই প্রক্রিয়াটি চলছে।

অশ্বিনী খুব শান্ত গলায়, কোনোদিকে না তাকিয়ে বলে ওঠে, "আপনাদের ইচ্ছে না হলে আমাকে জয়েনও করতে দেবেন না, চিঠির জবাবও দেবেন না। কিছুরই দরকার নেই। আমি এখুনি আপনাদের পাতি ওজনের জায়গায় গিয়ে খাতা দেখতে চাইছি। আপনারা খাতা না দিলে সমস্ত পাতি ওজন আর মাল ডেসপ্যাচ বন্ধ করার নোটিশ আপনাদের ম্যানেজারকে দেব। তারপর দার্জিলিঙে ফিরে গিয়ে কলকাতায় টেলিগ্রাম করব যে আপনারা আমাকে কিছু দেখান নি।"

কথা শেষ হওয়ার পরও অশ্বিনী চোখ সরায় না। দর্জি গলা খাকারি দেয়। বড়বাবু দর্জির দিকে তাকান। তারপর টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তাহলে আপনি চিঠি দিন, আপনি যে-রকম বললেন, আমি সেই রকম জবাব দিচ্ছি, তবে আপনি আমাদের ওপর মিছিমিছি রাগ করছেন, আমরা তো আইন অনুযায়ী চলব।"

"সে আপনাদের আইন আপনারা দেখুন। আমি চিঠিপত্র কিছুই দেব না। দেখি একটা কাগজ"—অশ্বিনীর বাড়ানো হাতের সামনে বড়বাবু একটা প্যাড ফেলে দেন।

পরপর দুটো কাগজে অশ্বিনী ফসফস করে কী লিখে বড়বাবুর সামনে দিয়ে বললো, "একটাতে রিসিভ করে দিন।"

বড়বাবু পড়ে বললেন, "ফোরনুন ? জয়েনিঙ রিপোর্টই দিলেন !"

"আমি তো ফোরনুনেই এসেছি—"

চার

বড়বাবু একটাতে সই করে দিলে অশ্বিনী কাগজটা নিয়ে উঠে পড়ে, "আমি দু-চার দিনের মধ্যেই আসব।" ঘরে বড়বাবু ও রাধারমণবাবুকে ফেলে রেখে দর্জি আর অশ্বিনী বেরিয়ে যায়। দর্জিকে তার সঙ্গে আসতে দেখে অশ্বিনী একটু বিরক্ত হয়। "আমি এখন দার্জিলিঙে ফিরব—" "হ্যাঁ, ঐ পথেই কোয়ার্টারটা দেখে যাবেন।"

অফিসঘর দিয়ে বেরবার সময় অশ্বিনী গুপ্তবাবুকে দেখতে পেয়ে হেসে বললো, "যাচ্ছি।"

কোয়ার্টারের সামনে গাড়িটা দাঁড়াল। ভেতরের ঘরে ঢোকামাত্র দর্জি অশ্বিনীকে জড়িয়ে ধরল—"ওঃ ব্রিলিয়ান্ট পারফরমেন্স, সিম্পলি ব্রিলিয়ান্ট, ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে সারাদিন ছিলাম নইলে আজ আমি কী মিস-ই করতাম!"

সাফল্যের সাক্ষীর প্রথম অভিনন্দনে অশ্বিনীও হেসে না ফেলে পারে না। বিশেষত ভেতরে ভেতরে অশ্বিনী তখনো আলোড়িত—চাকরির দরখাস্ত করার পর থেকে সমস্ত অনিশ্চয়তা এতদিনে যেন শেষ হল, আর সবটাই তার নিজের হাতে করা। এখন আর কারো বলার সাধ্যি নেই—সেই সে-অশ্বিনী সরকার নয়। সামনে পিছনে দুটো বারান্দাওয়ালা পাশাপাশি দুটো ঘর আর রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, কলঘর দেখাতে দেখাতে দর্জি প্রশ্ন করে, "আমি শুধু এটুকু বুঝছি না, আপনি প্রথমেই ওটা বললেন না কেন?"

"মাথায় আসে নি", অশ্বিনী একগাল হেসে ফেলে।

দর্জিও জিপে চেপে বসলে অশ্বিনী প্রশ্ন করে, "কী ব্যাপার?"

"চলুন আপনাকে এগিয়ে দি খানিকটা, পরের বাগানে নেবে যাব। আপনার সঙ্গ ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।"

"আমার জন্য আপনাকে কোয়ার্টার ছাড়তে হচ্ছে কেন?"

"আমার তো ঐ টাইপের কোয়ার্টার পাওনাই নয়। তাছাড়া আমি কোয়ার্টার ছেড়ে না দিলে আপনার আর ফ্যামিলি আনা হতো না।"

গাড়িটা কখন নীরবে বৃষ্টির ভেতরে ঢুকে গেছে, চারপাশের পাহাড়ের গাছপালা থেকে শেষ বিকেলের মরা আলোও বিচ্ছুরিত হয়। দর্জি যাতে না ভেজে অশ্বিনী একটু সরে যায়।

চাকরির প্রথম দিনই পাশে একজন চৌকশ অ্যাড্‌মায়ারার নিয়ে অশ্বিনী ফিরতে পারবে ভাবে নি। চাকরিটা পাওয়ার জন্য গত কয়েক মাসের সমস্ত চেষ্টার সাফল্যের স্বীকৃতি আজ যেন দর্জি তার পাশে বসে দেয়।

চাকরিটা অশ্বিনীর বড় বুদ্ধি করে পাওয়া। বুদ্ধির জোরেই পেয়েছে .কিনা জানে না কিন্তু বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। চাকরিটাতে অস্থায়ী ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারীদের দরখাস্ত করার সুবিধে আছে বলে তাদের অফিসে বিজ্ঞাপন আসায় প্রায় সকলের সঙ্গে সে-ও একটা দরখাস্ত ঠোকে। মাস তিন পর আর সবার সঙ্গে তারও একটা ইণ্টারভিয়ু-কার্ড জোটে। অশ্বিনী নানা গুজবের ভেতর জানতে পায় তাদের জেলা থেকে কয়েকজন চাকরি পাবে। ইণ্টারভিয়ুর দিন যত এগোয় অশ্বিনীর কাছে সেই চাকরি পানে-অলাদের নামও পৌছে যায়। তার কাছে এই নামগুলো পৌছনোর পরও অশ্বিনী মাথা খাটাতে শুরু করে। সে এই হিসেব থেকে এগোয় যে যদি সত্যি এই জেলা থেকেই ক-জনকে নেয়, যাদের নেওয়া হবেই সেটাও যদি ঠিক হয়েই থাকে, তাহলেও দু-একজনকে অন্তত নিরপেক্ষভাবে নেয়ার চেষ্টা হবে আর সে-চেষ্টাটা যদি দেখাবার মতলব থাকে তাহলে অস্থায়ী ডিপার্টমেণ্ট থেকেই নেয়া হবে।

তাদের শহরে যেদিন ইণ্টারভিয়ু হওয়ার কথা তার আগের দিন অশ্বিনী খবর পেল কলকাতা থেকে এক বড় কর্তা আর জেলার কর্তারা

বোর্ডে থাকবেন। সন্ধ্যাবেলায় পাবলিক কল অফিস থেকে সার্কিট হাউসে টেলিফোন করে আর-আর অফিসারের নামে নিজের পরিচয় দিয়ে সে-ই বড়কর্তাকে বলে, "আমার অফিসের কয়েকজন কাল আপনার কাছে ইণ্টারভিয়ু দিচ্ছে। তারা আমাকে ধরেছিল তাদের নামগুলো ফরোয়ার্ড করতে। আমি তাদের রিফিউজ করেছি। পরে ভাবলাম, দু-একটি ছেলে খুব ভালো আছে, তাদের যদি একটা ব্যবস্থা হয়, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড—"

টেলিফোনে কি বলবে সেটা অশ্বিনী রাতদিন আউড়ে-আউড়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিল। গলার স্বর কী রকম হবে, কী রকম জায়গায় থামবে, কোন্ কোন্ ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবে। এমন হয়েছিল অবস্থা, মাঝরাতে যদি অশ্বিনীর নতুন কোনো ভাষা মনে পড়ত, বিছানা ছেড়ে উঠে, বাইরে গিয়ে, পুরোটা একবার বলে আসত। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড—এই পর্যন্ত বলেই অশ্বিনী থেমে ছিল। ফোনের ওপাশের কথা শুনে অশ্বিনীর মনে হয়েছিল সে-ই যেন প্রম্পট করে দিয়েছে—"আপনি আমাকে অফিসিয়ালি জানাতে পারেন।" অশ্বিনীও সঙ্গে সঙ্গে তার নির্ধারিত পরের অংশ শুরু করে, "ইন ছাট কেস আমাকে সব নামই পাঠাতে হয়। আমি ভেবে ছিলাম যারা যথেষ্ট ভালো মানে এফিসিয়েন্সি দেখিয়েছে তাদের দু-একজন অ্যাবজর্বড হলে আপনাদের ডিপার্টমেণ্টেরও"—ফোনের ওপাশ থেকে নাম চাওয়ায় অশ্বিনী পর পর বলে যায়, "রমেন্দ্রনাথ সাহা, অশ্বিনী সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত।" নামগুলো বলেও অশ্বিনী ফোন নামায় না; যেন টুকে নেওয়ার সময় দেয়, যতক্ষণ না ওপাশ থেকে "আচ্ছা, ঠিক আছে" শোনে।

নানারকম সম্ভাবনা দুর্ভাবনার হিসেব-নিকেশের জটিলতা থেকে, অনেক ক-দিন ধরে, রমেন্দ্রনাথ সাহার ভুয়ো নাম, আর দুটো খাঁটি নাম বেরিয়ে এসেছিল। সুরেন জানতও না, টেলিফোনটাকে ভুয়ো সন্দেহ হলে সে-দায় তাকে পোয়াতে হতে পারত। সুরেনও চাকরি

পেয়েছিল। অশ্বিনীও জানে না, সেটা তার সেই ফোনের জন্যই কি না।

গলা শুনে যা সন্দেহ হয়েছিল, ইন্টারভিয়ু দিতে এসে অশ্বিনী সেটা আরো বুঝল, কলকাতার বড়কর্তা খুশি হন নি। তবে সেটা এ কারণেও হতে পারে যে এক জেলা অফিসার তাঁকে ফোন করে অথচ দেখা করে না।

পুলিশ ভেরিফিকেশন আর মেডিক্যাল একজামিনেশনের জন্য নির্বাচিত হওয়ায় এই প্রথম অশ্বিনীর অভিজ্ঞতা হল সকলের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াটা কি রকম। কিন্তু সে কোনো ফাঁক রাখে নি। তাদের পাড়ার রিটায়ার্ড কোর্ট ইনস্পেক্টর রাধেশ্যামবাবু আর জ্যাঠা-মশায়ের পরিচিত রমণীবাবুর ছেলে অনুপ ডাক্তারকে মুরব্বী ধরার সাবেকী পথ ছাড়াও গোলাপের গহনা বন্ধক দিয়ে দু'শ টাকা জোগাড় করে, পুলিশ ভেরিফিকেশনে আটকাতে পারে এমন কাজ কোনো দিন না করলেও আর একটা ভেজাল শরীর থাকা সত্ত্বেও থানার ও-সি'কে একশ আর সি-এম-ও-এইচ অফিসের বড়বাবুকে একশ টাকা দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

অশ্বিনী জানে না কেন তার চাকরি হল। আর কয়েকজনেরই বা কেন। আরো অনেকেরই বা নয় কেন। ভুয়ো ফোন আর ঘুষের জন্য? সবাই-ই তো আর তা করতে পারে না। নাকি ও-সব কিছুর দরকারই ছিল না। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর সেনট্রাল এক্সাইজ অফিসে গিয়ে মিলিয়ে দেখেছে। ক-মাস ট্রেনিঙ নিতে হয়েছে। তবু অশ্বিনী জানত এখানে এসেও গোলমাল হতে পারে। গোলমাল কেন হতে পারে না, সেটাও অশ্বিনী জানে না। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করে বা না-করে সেই বুদ্ধিতে কি পাওয়া গেল আর গেল না, তার হিসেব জানার কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু আজ এমন একটা সোজাসুজি জিত ঘটে যায় দুটো কথার জোরে যে সেটাকে অশ্বিনী বেশ একটা ব্যক্তিগত সিদ্ধি বলে ধরে নিতেই

পারে, বিশেষত দর্জির অভিনন্দনের পর, বিশেষত দর্জি আবার খানিকটা সঙ্গ দেয়ার পর। গায়ে গা লাগিয়ে এমন একজন অ্যাড-মায়ারার, অশ্বিনী একটু তৃপ্তি বোধ করে।

বৃষ্টি আছে বলে দর্জি তার নির্দিষ্ট মোড়টাতে নামল না। অশ্বিনী বলে, "আপনার কি এ সবই ঘরবাড়ি ?"

"আমার দেশ, জন্ম, কর্ম, সব এখানে, চেনা হবে না ?"

নেমে যাবার সময় দর্জি বলে, "আচ্ছা ইনস্পেক্টর, আবার দু-এক দিনের মধ্যেই তো দেখা হবে ?"

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তার নতুন নামটা দর্জি যেন শেষেও মনে করিয়ে দিল। দার্জিলিঙে পৌঁছনোর আগেই অশ্বিনী যাচাই করে নিতে চায় নতুন পরিচিত সবার মুখে ইনস্পেক্টর ইনস্পেক্টর শুনতে কি তার ভালো লাগছে। অন্তত লাগল যখন দর্জি ব্যবহার করল ? অফিসের কাজের সময় অশ্বিনীর এ অভিজ্ঞতাটা ছিল না, বড় জোর কেউ 'সরকার' ডাকত। যে-চাকরির জন্য এত বুদ্ধি খাটানো, সেই চাকরির ডাকনাম অশ্বিনীকে খুশি করে না কেন।

অশ্বিনীর নজরে পড়ে যায় বাঁ দিকের এক গাছের গায়ে আট-কানো সাইনবোর্ড, কোম্পানির নাম লিখে, "অফিস অফ দি সুপারি-নটেনডেণ্ট।" পাশ দিয়ে পাথর ফেলা একটি রাস্তাও চলে গেছে। এই সেই সুপারিনটেনডেণ্ট অফিস। সমস্ত ঘটনাটাই অশ্বিনীর মনে পড়ে যায়। কথাটা আগে মনে হলেই ব্যাপারটা চুকে যেত। আসলে মনেই পড়ে নি যে সে সরকারি প্রতিনিধি। এমন একটা বুদ্ধি বের করার পর অশ্বিনী এতক্ষণ মনে মনে যে-খুশি হচ্ছিল, সেটা কেমন থিতিয়ে যায়। এতক্ষণ সে যেটাকে ব্যক্তিগত সিদ্ধি বলে ধরে নিয়েছিল, সেটা আসলে সেন্ট্রাল এক্সাইজের আইনের ব্যাপার। এক্সাইজ আইন অনুযায়ী বাগান সব কিছু দেখাতে বাধ্য। অশ্বিনী সেই আইনটা ব্যবহার করতে চেয়েছিল। আইন ব্যবহারের অধিকার তার আছে বলে।

চাকরিটা থেকে যায় আসলে চাকরিটার জোরেই। অশ্বিনীর নিজের জোরটা কোথায় তা বোঝা যায় না।

মোটরটা পাক খেয়ে খেয়ে, শব্দ তুলে তুলে ঘোরার আলোড়নের ভেতর অশ্বিনী খুব আস্তে নিজেকে একবার নিজের নতুন নামে ডাকে—"ইনস্পেক্টর।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠিক ছটার সময় প্রথম ভোঁ বাজে। মাত্র মাস দুই সময়ের মধ্যে এ ভোঁ ধাতস্থ হয় না। অশ্বিনীও এখন ভোঁ বলে না, বলে "কুকুর কাঁদছে" বা "কৃষ্ণের বাঁশি"। গোলাপ আজকাল বলছে শুধু "বাঁশি"। ভোঁ-টা কার জন্য, প্রথম দিকে সেটা জানা থাকার ফলে অশ্বিনী তাড়াহুড়ো করে ছুটত। দু-মাসের মধ্যে কেউ বলে নি ভোঁ-টা তার জন্য নয়। অভিজ্ঞতায় অশ্বিনী বোঝে যে তার কাজ কোনো দিন বেলা দশটার আগে থাকে না, সব দিনও থাকে না। অশ্বিনী অফিসে যাবার সময়টা পাল্টে দিয়েছে।

বাকী তিনটি বাগানে ইতিমধ্যে দেড়পাক দু-পাক ঘুরে এসেছে। সব বাগানেই ছটায় ভোঁ বাজে। কোনো বাগানেই ভোঁ-এর সঙ্গে অশ্বিনীর সম্পর্ক থাকার কথা নয়। তবু অশ্বিনী এত লম্বা, একটানা তীব্র চিৎকার শুনে না জাগে কি করে। না-জাগতে পারার মতো বনেদিয়ানা মাত্র দু-মাসে হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু ভোঁ অনুযায়ী কাজে না ছোটা ধাতস্থ হতে সপ্তাহ দুয়েকই যথেষ্ট।

কিন্তু ধাতস্থ হতে যে-দুমিনিট ধরে ভোঁ বাজে অশ্বিনী, গোলাপ কেবল এপাশ ওপাশ করে, খোকন লাফিয়ে ওঠে। এখন আর বাবাকে ডেকে দেয় না। "বাবা ওঠো, বাবা ওঠো" বলে, প্রথম দিকে দিত। দু-মাসেও ভোঁ-র বৈচিত্র্য খোকনের কানে ফুরোয় না বলে সে এখনও উঠে বসে, দরজা-জানলা বন্ধ ঘরের ভেতর কান পেতে,—দু-কানে তুলো গুঁজলেও যে-শব্দ এড়ানো যায় না, সেই শব্দ কান পেতে খোকন শুনতে থাকে। তার বাবা-মা ক্রমাগত লেপের গভীরে ঢুকে যায় শুধু শব্দের হাত থেকে বাঁচতে। প্রতিদিনই তো

বৃষ্টি, কোনো কোনো দিন ঝোড়ো বাতাস, কখনো বা সারারাতের মেঘডাকা সকালেও থামে না—কিন্তু সব শব্দ ভেদ করে ভোঁ-টা নিশ্চিত উঠবেই।

প্রথম দিকে অশ্বিনী বিশ্বাসই করত না দু-মিনিটের ব্যাপার। পরে একদিন ঘড়ি ধরে মিলিয়ে সন্দেহ কেটেছে। কিন্তু দু-মিনিট সময়ের দীর্ঘতা তো মাত্র দুটি মিনিট দিয়ে মাপা যায় না।

গোলাপ প্রথম-প্রথম লাফিয়ে নামত। দ্বিতীয় ভোঁ বাজার আগে গোলাপ অশ্বিনাকে বিছানায় চা দিয়ে মুখ ধোয়ার জল গরম করে ফেলত। দ্বিতীয় ভোঁ বাজলে অশ্বিনী উঠত। মুখ হাত ধুতে ধুতে খাবার তৈরি হয়ে চলে এলে অশ্বিনী ধীরে-সুস্থে খেয়ে তৃতীয় ভোঁ বাজতেই বাড়ি থেকে বেরতো।

এখন, অশ্বিনী তার কাজের ধাতটা বুঝে ফেলার পর, গোলাপ প্রথম ভোঁতে ওঠে না বটে তবে তৃতীয় ভোঁ বাজার আগেই সে নিজে তৈরি হয়ে অশ্বিনীর জন্য খাবার বানাতে বসে যায়। মোটামুটি এটাই স্থায়ী রুটিন হবে বুঝে ফেলার পর গোলাপ বলতে শুরু করেছে, "ভোঁ-টা কিন্তু অনেক সুবিধে করে, দেখো, সব কিছু কেমন সময় মতো করে ফেলা যায়, প্রথম যখন ঘুম ভাঙে তখন একটু রাগ হয় অবশ্য, কিন্তু কাজকর্মের খুব সুবিধে।"

"তোমার সুবিধে নিয়ে তুমি থাকো, আড়াই জনের সংসারের কাজ, তা ওঁর ভোঁতে সুবিধে"—অশ্বিনী গোলাপকে আরো বলে, "এখানে এসে যেন তোমার কাজ বেড়েছে, ওখানে তো পারলে কুটোখানা ভেঙে দুটো করতে চাইতে না।"

"দেখো, মিথ্যে কথা বোলো না, তোমার মা-জ্যাঠাইমা মিলে এত আমাকে খাটাতেন, সকাল ছটায় উঠে রাত এগারোটায় শোয়া, মাঝখানে একবারও দু-পা জোড়া করতে পারতাম না।"

গোলাপ এত কথা শিখল কি করে ভেবে অশ্বিনী বলে, "এখানে তো আর মা-জ্যাঠাইমা নেই, তো সারাদিন খুট খুট কর কেন।"

"কি করব বলো, ওখানকার এত কাজের পর, এ-বাড়িটাই কেমন ফাঁকা ফাঁকা হালকা লাগে, তাছাড়া ওখানে তো আমি ছিলাম ঝি-চাকরের মতো, কোনো দায়িত্ব তো ছিল না, এখানে সব দায়িত্বই তো আমার।"

জ্যাঠাইমার সংসারে যে-গোলাপ একটি ডিস-ছাড়া কাপে চা এনে ঘরের একমাত্র টেবিলটার ওপর চল্‌কে রেখে বেরিয়ে যেত সে-যে কেমন করে মাত্র দু-মাসের ভেতর অশ্বিনীর জলখাবার খাওয়ার সুবিধের জন্য একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার যোগাড় করে ফেলে। দু-একদিন রাতে তার ওপর অশ্বিনী ভাত খেলেও গোলাপ যে ঢাকনিটা ধোয় না তা কি বর্ষাকালে রোদ ওঠে না বলেই শুধু। হঠাৎ কোনো সময় বৃষ্টিটা একটু ছাড়লে খোকনকে নিয়ে গোলাপ বারান্দায় বা পথে একটা চাদরে কেমন নতুন হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে গোলাপের কোনো নতুন শাড়ি কেনা না হলেও চাদরেই সে কেমন অপরিচিত ঠেকে—এত নতুন অবস্থার সঙ্গে। সবটা মিলিয়ে নিতে অশ্বিনীর নিজের অসুবিধে হয়।

অবস্থা বুঝে সেই অনুযায়ী চলার যে-অভ্যেসটা জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে অশ্বিনীকে সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার থেকে দূরে রাখত সেটা যে আসলে নিজেকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে ফেলা কোনো কিছুই যেখানে সাড়া জাগায় না তা কি অশ্বিনী বুঝতে পারত যদি এখানে পাহাড়ে, বর্ষায়, নতুন চাকরিতে শুকনো খটখটে দাম্পত্যটাতেও, নতুন পাতা যদি না-ই হয়, খানিকটা শ্যাওলার নতুনত্বও না লাগত।

পাছে সে বুঝে ফেলে তাই খুলে, মেলে ধরে, অশ্বিনী ধরতে না ধরতেই গোলাপ চলে যায় কিন্তু ছাতাটা অশ্বিনীকে নিতে না দিয়ে রান্নাঘরের সব কাজ ফেলেও তাকে আসতে হয়। তাই বারান্দা পর্যন্ত এসে অশ্বিনীর অফিস যাওয়াটুকু দেখার ব্যবস্থা গোলাপকে করে দিতে বাইরের বারান্দায় পা দিয়ে "কই ছাতাটা কই" হাঁকতে

হয় সেই অশ্বিনীকেই, যে রান্নাঘর থেকে খেয়ে বেরনো আর অফিস যাওয়ার মাঝখানের ফাঁকটা রোজই নতুন নতুন কায়দায় ভরিয়ে ফেলত পাছে জ্যাঠাইমা, মা বা জ্যাঠামশাই সারা দিনের কোনো কাজ চাপান। গোলাপের জন্য অশ্বিনী চিন্তিত ছিল না। গোলাপ কোনোদিন অশ্বিনীর অফিস যাওয়া দেখে নি, এর আগে। বিয়ের এতদিন পর নতুন করে এ-অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে অসুবিধে বোধ করা তো অশ্বিনীর পক্ষে স্বাভাবিক-ই। তারও চেয়ে স্বাভাবিক হয়ে যায় গোলাপের নতুন হয়ে ওঠা।

দুই

গোলাপ-অশ্বিনীর দাম্পত্য জীবনের এটা দ্বিতীয় ভাগ। বিয়ের পর থেকে জ্যাঠামশাইয়ের সংসারেই তো তারা এতদিন ছিল। সে-সংসারে নিজের ভূমিকা বা স্থান সম্পর্কে অশ্বিনীর নিজের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তার বউ হিসেবে গোলাপের স্থানটাও খুব নির্দিষ্ট বা পরিষ্কার ছিল না। বাপ-মরা ভাইপোর বউ হিসেবে সে তো পুত্রবধূতুল্য। কিন্তু সারাদিন খাটাখাটুনির পর রাতে নিজের ঘরটুকুতে ফেরার সময় অবশিষ্ট থাকত নেহাত নিজের সুখটুকুর বিনিময়ে পরিবারের একজন হয়ে যাওয়ার বোধটাই। এমন-কি অশ্বিনীও সেখানে নেহাত অদরকারি হয়ে পড়ত।

পরিবারে নিজের সম্পূর্ণ উপস্থিতিটাই যার কাছে লুকনো ছাপানো একটা টিকে যাওয়ার ব্যাপার, সেই অশ্বিনী রাত্রিবেলা নিজের বউকে ঘরে একলা পেয়ে, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ির আর পাঁচটা জিনিসের মতো, যেন অনধিকার ভোগ করতে চাইত।

কিন্তু এখন সাত-সকালে ভোঁ বাজলেও গোলাপকে যেন নিজের জন্যই উঠতে হয়। দুপুরে অশ্বিনী খেতে আসার আগে সব গুছিয়ে গাছিয়ে স্নান পর্যন্ত সেরে গোলাপকে অপেক্ষা করতে হয়। খোকন তাদের দুজনার মাঝখানে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকে। বৃষ্টি নেই

তেমন বিকেলে খোকনকে মাঝে রেখে দুজনকে বেড়াতেও হয় একটু।

এটা দুজনার কাছে এতই নতুন যে দু-মাসেও দৈনন্দিন হয়ে ওঠে না। পরন্তু অশ্বিনীর কাজকর্মটা খুব ধরাবাঁধা না হওয়ায় তেমন একটা রুটিনের ভেতরেও তারা ঢুকে যেতে পারে না।

চাদরে বা সোয়েটারে গোলাপকে হঠাৎ নতুন মনে হয়ে গেলে অশ্বিনীর দুঃখও এসে যায় জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে ঝিয়ের কাজ না করতে হলে গোলাপের হাঁটাচলার ভেতর একটু কোলকুঁজো ভাবটাও হয়তো থাকত না। বা গোলাপের দাঁতের গোড়ার নোংরাগুলো জমতে পারত না। অশ্বিনী গোলাপের জন্য সহানুভূতি বোধ করে, নাকি চাকরির জন্য গৌরববোধ থেকে নিজেরই অতীত সম্পর্কে কিছুটা ক্ষোভে, অথবা আসলে সোয়েটার বা চাদরে নতুন ঠেকা গোলাপকে কেন্দ্র করে সে অন্য কোনো রকমের নতুন কিছু দেখতে চায়।

চাওয়া ব্যাপারটা পরিষ্কার না-বুঝলেও অশ্বিনী এটুকুই বোঝে জ্যাঠামশাইয়ের সংসার গোলাপের দাঁতে ময়লা জমিয়েছে, পিঠ নুইয়ে দিয়েছে।

কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের সংসারেও গোলাপকে খাটতে হয়েছে। খাটুনির প্রসঙ্গটাই তাই গোলাপের কাছে অন্তত বদলে যায়। অশ্বিনীর জন্য খাটুনিটাকে গোলাপ আগের খাটুনির চাইতে আলাদা করে ফেলতে পারে, জেগেও চোখ-বোজা অশ্বিনীর বিছানার কাছে রাখা চায়ের কাপটা অশ্বিনীর আলস্যে জুড়িয়ে গেলে আবার এককাপ চা এনে দেওয়ার ডবল খাটুনি স্বীকার করে। আগেও অশ্বিনী ফিরতে রাত করত। অন্য বাগানে ডেসপ্যাচ থাকলে আর সে-রাত্রিতেই ফিরতে গেলে এখানেও রাত হয়ে যায়। গোলাপকে বর্ষার মেঘবৃষ্টিতেও বারবার তাকাতে বা কানখাড়া করতে হয়—অশ্বিনী কোথায় গেছে জেনেও, গাড়িতে ফিরবে জেনেও। কোথায়

গেছে-না-গেছে কোনো খবরই রাখত না তো গোলাপ। ভোঁ বেজে গেলে, ভোঁ অনুযায়ী অশ্বিনীর কাজ নয় জেনেও গোলাপ যদি এসে লেপের ভেতর ঠাণ্ডা হাত ঢুকিয়ে অশ্বিনীর গলায় সুড়সুড়ি দিয়ে অশ্বিনীকে তুলতে চায়, তাহলে, অশ্বিনী ঠিক ঠাহর পায় না এমন একটা ব্যাপার নিয়ে কী করতে পারে, বিশেষ করে যখন গোলাপের হাতটা গলার কাছে অথচ হাসিটার শব্দ তেমন প্রাঞ্জল নয়। এমন করে হাসতে তো আর গোলাপ শেখে নি।

যেমন যেমন অশ্বিনীর, তেমনি তেমনি গোলাপের, ধীরে ধীরে জানা হয়ে গেছে কাজকর্মের ধরন-ধারণ, সময়, পদ্ধতি। এখন বাগানের নাম শুনলেই গোলাপ আন্দাজ করতে পারে অশ্বিনী কতটা নাগাদ ফিরতে পারে। এক প্লেনভিউয়েই অশ্বিনী যেন খানিকটা বাগানের কর্মচারী না হয়ে পারে না।

তিন

খুব বেশি বৃষ্টি থাকলে গোলাপ দাজুকে পাঠাতে চায় খোঁজ নিতে অশ্বিনীকে কখন যেতে হবে। আধঘণ্টা একঘণ্টা আগে পরে যখনই যেতে হোক, চামড়ার জুতোটা ভিজিয়ে ভিজিয়ে গায়ে বৃষ্টির ছাঁট লাগিয়ে যাওয়া ছাড়া অশ্বিনীর গত্যন্তর থাকে না। এমন বর্ষায় গামবুট, হাফপ্যাণ্ট, ওয়াটার-প্রুফ আর ছাতা যে অপরিহার্য সেটা বুঝে উঠতেই দু-মাস পেরিয়ে যায়। রাস্তার পাশে তার কোয়ার্টার থেকে অশ্বিনীকে ঢালু বেয়ে নামা জলরেখা উত্রে উত্রে উঠতে হয়।

পি-ডবলু-ডি-র রাস্তা থেকে বাগানে ঢোকার রাস্তা বেরিয়ে দক্ষিণ ঢালু দিয়ে উঠে গেছে। এই পথটুকু অন্যান্য কোয়ার্টারের সঙ্গে অশ্বিনীরও। দক্ষিণ ঢালু গিয়ে ওপরে যেখানে শেষ, সেটাই পাহাড়ের মাথার সমতল অংশ। তার পুবদিকে—বাগানের অফিস আর ফ্যাক্টরি পর পর, পশ্চিমদিকে বাবুদের ক্লাব, খেলার মাঠ, বড়বাবুর কোয়ার্টার, তার পেছনে নতুন একটা কোয়ার্টার। পুব-উত্তর আর

পশ্চিম ঢালুর সবটা জুড়েই চা-বাগিচা। পুব, উত্তর আর পশ্চিম ঢালুতে চা-বাগিচাগুলোরও শেষে, লেবার লাইন। পাহাড়ের মাথার সমতলটুকুর পরে, উত্তরে অনেকখানি, পাহাড়ের মাথার ওপর দাঁড়ালে যতটা চোখ যায়, খুব ধীরে ধীরে ঢালু। সেই অংশটিতে চা-বাগিচার মাঝে মাঝে অনেকটা জায়গা কাঁটাতারে ঘিরে সাহেবদের কোয়ার্টার।

ফ্যাক্টরির পেছনে, পাহাড়ের মাথার পুব-সীমানায় দাঁড়ালে মাঝখানে বিরাট খাদটার ওপারে ধূসর একটা পাহাড়ের মাথা। দক্ষিণ ঢালুর সামনে, বাগারের রাস্তাটার শেষে, পি-ডবলু-ডি-র রাস্তার বাঁক। তারপরই গাছে-গাছে আর কিছু দেখা যায় না। বড়বাবুর কোয়ার্টারের পেছনে গভীর খাদ। এক এক সময় মনে হতে পারে, এখান থেকে বেরবার উপায় নেই, বিশেষত বর্ষায়, যখন মেঘ প্রায় ঘরের ভেতরে এসে অন্ধকার করে দেয়, চার পাশ দেখা যায় না, গভীর বৃষ্টিপাতের শব্দের ভেতর কখনো কখনো গুমগুম ধ্বনি, অভিজ্ঞরা বলে কোথায় ধস নামছে, হঠাৎ হঠাৎ দ্রুতবেগে জল-স্রোত ছুটে যাওয়ার ধ্বনি।

খুব ঘুরেফিরে, দেখেশুনে, অশ্বিনী বাগানটিকে চেনে নি। যখন ভোঁ বাজলেই ফ্যাক্টরি ছুটত, তখন দেখত, বা এখন ভোঁ বাজলে ফ্যাক্টরি থেকে বেরবার সময় দেখে, বৃষ্টি বা মেঘের মধ্যে অস্পষ্ট কতকগুলো ছোট ছোট দলে ছাতা মাথায় উঠে আসছে বা নেমে যাচ্ছে শয়ে শয়ে মজুর। পাহাড়ের ঢালের জন্যই নিশ্চয়, উঠে আসা বা নেমে যাওয়াটা দেখায় যেন মাটি ফুঁড়ে ওঠা বা মাটির ভিতর সেঁধানো। ওয়েইং শেডে পাতি ওজন বা হাজরি ছাড়া সবগুলো মজুর একজোট হয় না। পাতি ওজন বা হাজরির সময় সবার কেমন একটা আয়েসী ভাব, যেন সবটাই মেলাগোছের কিছু, বাজারও বসে। কিন্তু রুমাল ঝুলিয়ে ছাতা নিয়ে সকালে ওরা যখন ঢালু থেকে ঢালুতে নেমে যাঁয় তখন বৃষ্টি মেঘ বা এতগুলো মানুষের এক-

সঙ্গে চলার জন্যই হোক কেমন একটা অস্বস্তি আসে। সংখ্যাটাই যেন অস্বস্তির কারণ।

অশ্বিনী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে মোট লেবার কত। বার-বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও কোনো স্পষ্ট জবাব না পেয়ে অশ্বিনী যখন প্রায় অবাক হতে শুরু করেছে এত বড় বাগানের এত কারখানা অথচ কেউ বলতেই পারছে না মোট লেবার কত তখনই দর্জি বলে উঠেছিল—"ইন্‌স্পেক্টর, ঐটা ভাই আমাদের স্মাগলিং-এর ব্যাপার। কোনো সময় আপনি ঠিক বলতে পারবেন না—কত লেবার বাগানে খাটছে।"

"বাঃ, তাদের কোয়ার্টার আছে, রেশন আছে, হাজরি আছে, আর হিসেব নেই?"

"ওটা তো আপনাদের সরকারি বুদ্ধি। হিসেব না থাকলে কি আর সাহেব আমার ঘাড়ে দুটো মাথা রাখবে? তবে আমি ওজন দিলে এক হিসেব, বাগানবাবু দিলে আরেক হিসেব।"

পরে অশ্বিনী জেনেছে, কেউ না বললেও, জানতে না চাইলেও, যেন হাওয়া থেকেই—যে, মিথ্যে নাম দেখিয়ে রেশন বা হাজরি নিয়ে নেয়া এখানকার নিয়মের মধ্যে পড়ে। হাজার দেড়-হাজার লেবারের হিসেব কে কষতে যাচ্ছে। আর কত রকমের কাজ, ফাড়ুয়া চালানো, মাঝেমধ্যে শ্ল্যাসিং, কখনো বা নালিকাটা, বাড়িঘরের কাজে পাঠানো হয়। বর্ষার সময় তো কথাই নেই। কোনো জায়গায় হয়তো মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে, কোথাও বা নতুন ঝোরার জল, সেগুলো জরুরী কাজ, বাগানের দক্ষ পরিচিত শ্রমিক ছাড়াও বাইরের লোক নিতে হয়, দু-এক জায়গায় পাথর পর্যন্ত ফেলতে হয়। এত সাত রকমের কাজে কিছু হিসেব-নিকেশের গোলমাল হবে এটা জেনেই ব্যবস্থা হয়েছে প্রতি সপ্তাহে হাজরি একজনই দেবে না, এক-একজন এক এক সপ্তাহে দেবে।

বাগানের হাজারটা কাজ বা চা উৎপাদনের ব্যবস্থাটারই নানা

রকমফেরের জটিলতা যেমন ওপরে ম্যানেজারিয়াল বা কর্তৃপক্ষের দল, মাঝখানে বাবুরা আর তলায় লেবাররা এই তিন ভাগে চলে, লেবারদের মধ্যে বইদার—মুন্সি এইসব থাকা সত্ত্বেও, তেমনি হাজরিটাও। কিন্তু নগদ পয়সার ব্যাপারটা হাজরির ওপর বাবুদের সবারই কর্তৃত্ব যেন প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে।

দার্জিলিঙ, ডুয়ার্স আর আসামের প্রায় কুড়িটি বাগানের মালিক যে-স্কচ কোম্পানি তার ডিরেক্টরদের কেউ কোনোদিন চোখেই দেখে নি, ডিরেক্টররাও সবাই বাগানগুলো দেখেনই নি। একজন কলকাতার আর একজন বোম্বাইয়ের, তাছাড়া সব ডিরেক্টরই ইংল্যাণ্ডের।

বোম্বাইয়ের ডিরেক্টর নিয়ে একটা গল্পও অশ্বিনী শুনেছে। কে শুনিয়েছে তা অশ্বিনী বলতে পারবে না। আসলে গল্পটা বাগানে এত চালু যে নানা জনের আলাপে নানা অংশ শুনে শুনে গল্পটা হয়তো অশ্বিনীর নিজের ভেতরই তৈরি হয়েছে।

নতুন আইন পাস হল ভারতীয় ডিরেক্টর অন্তত দু-একজন রাখতেই হবে। তারও প্রায় বছর দুই পর খবর এলো এই কোম্পানির প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর বোম্বাই থেকে বাগান দেখতে আসছেন; বোম্বাইয়েরই কোনো একটা জায়গা থেকে ভদ্রলোক পার্লামেণ্টের মেম্বার। ভদ্রলোক তো এলেন। বাবুদের সঙ্গে মিটিং করলেন; তিনি হুকুম দিলেন বাবুদের প্রত্যেকের বাড়িতে একটি করে রেডিও আর জলের কল দিতে। সেই হুকুম অনুযায়ীই প্রত্যেক কোয়ার্টারে জলের কল এলো, লেবার বস্তিতে ও কয়েকটি মোড়ে। রেডিও-র ব্যাপারটা অবশ্যি আর এক গল্প।

রেডিও কেউ পান নি। তার নানা কারণ অশ্বিনী নানা জনের কাছ থেকে শুনেছে। কেউ বলেছেন ডিরেক্টরই নাকি ম্যানেজারকে টিপে দিয়েছিল না দিতে। কারও মতে রেডিওগুলি কেনার জন্য টাকা মঞ্জুর হয়েছিল, খরচও হয়েছিল, রেডিও আর কেনা হয় নি। কোন ডিরেক্টর আবার যাচাই করতে আসছে ভেবে তখনকার

ম্যানেজার আর এখনকার বড়বাবু টাকাটা মেরেছিলেন। বড়বাবু নাকি পনেরটি রেডিওর ক্যাশমেমো জোগাড় করেছিলেন। সাহেব ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিলেন না। শুধু টাকাটা নিয়েছিলেন। দু-এক জনের অবিশ্যি ধারণা সাহেব কিছুই জানতেন না, কারণ সাহেবরা কখনও এ-সব চুরি-ছ্যাচ্চোড়ির মধ্যে থাকে না, সবটাই বড়বাবুর কারসাজি। যা হোক ডিরেক্টরের হুকুম সত্ত্বেও রেডিও বাজে নি।

ডিরেক্টর নাকি ছ-দিন ছিলেন। তিন দিনের দিন সকালে দল-বলসমেত তাঁর মেয়ে এলে গুজব রটল যে মেয়ে এক সিনেমার নায়িকা, স্যুটিং করতে দার্জিলিঙে এসেছিল, ডিরেক্টরমশাইয়ের ফ্লিম কোম্পানিও আছে।

ডিরেক্টর সাহেব চলে গেলে আরো একটা খবর রটেছিল যে আসলে তিনি দেখতে এসেছিলেন যে এ-রকম একটা পেছিয়ে পড়া জায়গা থেকে পার্লামেণ্টে দাঁড়ানো যায় কিনা, বোম্বাইয়ে তাঁর আসনটা নাকি নিরাপদ ছিল না। লেবারদের সঙ্গে তিনি, একদফায় হলে অনেক লোক হয়ে যায় বলে, দুই দফায় মিটিং করেছিলেন। তাতে নাকি ভোট-টোটের কথা তুলেওছিলেন। অনেকের অবিশ্যি ধারণা ভোটে দাঁড়াননি বলেই রেডিওটা আর দেন নি। অশ্বিনী মাত্র দু-মাসের মধ্যেই গল্পগুলো জেনে ফেলে, কিন্তু কোনো সন-তারিখের উল্লেখ ছাড়াই। ঘটনাটা ঘটার বা গল্পটা চালু হবার পর এখানকার পাতলা বাতাস, ভারী মেঘ আর কুয়াশায় আর উড়ে ছড়িয়ে যেতে না পেরে পাথরের মতো থুবড়ে গেছে—সন-তারিখ-সময়ের প্রশ্নটা অবান্তর করে দিয়ে।

চার

এই কোম্পানির বা বাগানের ব্যাপার-স্যাপারের সঙ্গে অশ্বিনীর কোনো আইনগত সম্পর্ক নেই। প্রতি পাউণ্ড চায়ের ওপর নির্ধারিত আবগারি শুল্ক দেয়া বা হিসেব মতো উৎপাদন হচ্ছে কিনা দেখাটাই

তার কাজ, যেটাকে উল্টো করে বললে দাঁড়ায় আবগারি শুল্ক যেন না-দেয়া না-থাকে, উৎপাদন যেন বেহিসেবী না-হয়।

সরকারের পক্ষ থেকে এমন পাহারাদারির দায় তার। অথচ সে চা'ক না-চা'ক বাগানের সঙ্গে সে বাঁধা পড়েই যায়, সকালে ভোঁ বাজলেও বেলা দশটায় অফিসে আসা না-আসার স্বাধীনতা তার যতই থাক।

দেড় মাস দু-মাসে তো সে পুরনো। এখানে আসার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই অশ্বিনী জেনে গিয়েছিল বড়বাবুর বাড়ির পেছনের নতুন কোয়ার্টারটাই তার পাওয়ার. কথা কিন্তু সেটাতে বড়বাবুর বড়ছেলে যেতে চায় বলে আর বড়বাবুকে সন্তুষ্ট করা দর্জির পক্ষে খুব জরুরী হয়ে পড়ে বলে দর্জির কোয়ার্টারে ঢুকে অশ্বিনীকে না-জেনেই এমন স্বীকৃতি দিতে হয়েছে যেন সে ইচ্ছে করেই নতুন কোয়ার্টারে যায় নি। নেপালী মেয়ে বিয়ে করে বসায় দশ বছরের মধ্যে বড়বাবুর বড়ছেলের সঙ্গে পরিবারের গোলমাল একদিনের জন্যও মেটে নি—বড়ছেলে আলাদা বাড়িতে যেতে চায় নি বলেই। বড়বাবুর বাড়ির পাশে কোয়ার্টার হলে তার আর যেতে আপত্তি থাকে না। সম্পত্তির বা পরিবারের, যার প্রতি টানেই হোক ব্যাপার-টার এমন সমাধান তো আর হাতছাড়া করা যায় না, বিশেষত এ-বাগান ঘোরাঘুরিতে অশ্বিনীর গাড়ি-টাড়ির জন্য বড়বাবুকে লাগবেই। কোয়ার্টারের জন্য অশ্বিনীর কোনো দুঃখ না-থাকলেও, ব্যাপারটা যখন সে জেনেছে আর এটাও জেনেছে যে সে যেন এ ব্যাপার নিয়ে কিছু না করে। নিজের কোয়ার্টার ছেড়ে দেবার মতো কোন দরকারটা দর্জির ছিল এই কথাটার কোনো স্পষ্ট জবাব পায় নি অশ্বিনী, কিন্তু সে যেন বুঝে যায় ব্যাপারটা কি। কাউকে বলার মতো করে বোঝে না। তবু বোঝে যেন।

কোয়ার্টারের ব্যাপারটা না-হয় অশ্বিনী জেনে যেতে পারে কিন্তু সেই কোয়ার্টারটিই যে কয়েক বছর আগে, প্রতি বাগানে একজন

লেবার অফিসার রাখতে হবে, এমন একটা হাওয়ায় শোনা আইনের পর, তৈরি হতে শুরু হয়ে, চারটি বাগানের জন্য একজন গ্রুপ লেবার অফিসার নিযুক্ত হবে এই আচমকা সিদ্ধান্তের পর বন্ধ হয়ে, আবার অশ্বিনীর জন্য শেষ হয়েছে—এটাও তার কানে আসে কি শুধু এ-টুকু বোঝাতে সরকারি প্রতিনিধি হলেও আসলে সে এ-বাগানের বাবুদের সমান, এ-বাগানের লেবারবাবু আর তার কোয়ার্টার এক হতে পারে কিন্তু লেবার সাহেবের কোয়ার্টার হয় উত্তর ঢালুতে। অশ্বিনী গত দু-মাসে বুঝে গেছে এখানে যা জানাবার তা জানানো হয়, এখানে সবাই সব কিছু জেনে ফেলে। তাই অশ্বিনী চুপচাপ থাকে। যেন নিষ্ক্রিয়।

কিন্তু পরিবেশটার নিজেরই বোধহয় একটা ক্রিয়া আছে। নইলে হাজার দেড়েক লেবারের শুধু সংখ্যাগত দিকটাই যখন তাকে অভিভূত করে ফেলে, বাগানের অনেক বাবুই নাম ধরে ধরে লেবারদের ডাকে কি করে এ-রহস্য দূর হতে-না-হতেই---ফ্যাক্টরির কয়েকজন লেবার তার মুখচেনা হয়ে গেছে দেখে, তারপর তাদের নামও জেনে ফেলে।

সমস্ত বাগান জুড়ে একটা নেশা লেগেছে যেন। সারা রাত ফ্যাক্টরি চলে। মণ মণ পাতা এসে জমা হতে না-হতে জল ঝরবার শুকোবার জালের ওপর থেকে ড্রায়ারে চলে যায়। মানুষগুলোর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ ভেজা অথচ বারবার আঁচে হাত শুকিয়ে তবে শুকনো চা-পাতিতে হাত দেয়। মরা মরা চা-পাতি ভাজা ভাজা হয়ে পড়ে থাকে। বেলচায় বেলচায় উঠে যায় ঝাঁঝরিতে ঝাঁঝরিতে। গ্রিন লিফ আর নতুন ম্যানুফ্যাকচারিং-এর গন্ধে সারাটা বাগান মাতাল। চায়ের ধুলোয় পা-মাথা ঢাকা সাহেব-বাবু-কুলি কাউকেই চেনা যায় না। বাগানের কোন সীমায়, কোন ঢালুতে, কখন পাতি তোলা হচ্ছে, কে তুলছে কে জানে, কোন জায়গা দিয়ে বৃষ্টির জল বয়ে গিয়ে নতুন নালী হচ্ছে সে-সব অশ্বিনী

জানে না। এ-বাগানের সীমা সম্বন্ধেও তার জানা নেই। কে বা কারা কোথায় কোথায় পাতি তোলায় বা তোলে। কিন্তু ফ্যাক্টরিতে যারা ঢোকেও না, ওজন করে পাতাগুলি ঢেলে ফেলে দিয়ে চলে যায় তারা থেকে শুরু করে ফ্যাক্টরির মজুররা, বাবুরা, ম্যানেজার পর্যন্ত যেন একটা নেশায় চলছে—এক ঘণ্টা নয়, একদিন নয়, দিনের পর দিন, এই দুই মাস। অশ্বিনী শুনেছে এমনি চলবে পূজো পর্যন্ত। এখন সবার মুখেই এককথা কত প্রোডাকশন হল, গেল বছর থেকে কত অ্যাহেড, কত ডেসপ্যাচ হল। পাতি তোলা থেকে শুরু করে ট্রাকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অতিদ্রুত অথচ অপরিবর্তনীয় এক ছন্দে যেন বাঁধা পড়ে গেছে।

এই ছন্দের ভেতর অশ্বিনীর কোথাও থাকবার কথা নয়। এই ছন্দের স্রোতে যেন কর ফাঁকি দিয়ে চা না বানানো হয় বা বেচা হয় সেটা যাচাই করে বরং ছন্দ সে ভেঙেই দিতে পারে। কিন্তু সকালের ভোঁ-টা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঢালু বেয়ে উঠে আসা মজুরেরা বা ফ্যাক্টরির বাবুরা সব কিছুর সঙ্গে অশ্বিনী এখন একটা অন্বয় বোধ করতে চায়!

"দাজুকে তো পাঠিয়েছি, কখন যেতে হবে শুনে আসুক না, আগেই রওনা দিচ্ছ কেন"—গোলাপ এখন বললেও যেন অশ্বিনী খানিকটা অস্থিরই হয়ে ওঠে। তারপর গোলাপের এগোনো ছাতা নিয়ে গোলাপের চোখের সামনে বাতাস, বৃষ্টি আর মেঘের আবরণের ভেতর ছপছপিয়ে যেন আরেক রাজ্যে চলে আসে। তখন পথে কেউ থাকে না। অবিরাম বৃষ্টিপাতে পাহাড়, মাঠ, ফ্যাক্টরি, বাড়ি-ঘর সব যেন গলে গলে যাচ্ছে। অশ্বিনী দেখে ফ্যাক্টরির দরজায় সার বাঁধা ট্রাক। ত্রিপলের ঢাকনির ওপর মোটা মোটা দড়ি ফুলে উঠেছে। অশ্বিনী মাঠ ভেঙে ফ্যাক্টরির দিকে এগোয়। ফ্যাক্টরির কাচের জানলাটা কুয়াশার মতো।

পাঁচ

দুই ট্রাকের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে অশ্বিনী গলে যায়। বাইরের ভেজা চা পাতা আর ভেতরের চায়ের গন্ধ অশ্বিনীর নাকে এসে লাগে। ছাতার শিক ট্রাকের ত্রিপল বাঁধা দড়ির সঙ্গে আটকে যাওয়ায় খোলার জন্য হাত বাড়াতে অশ্বিনীর ডান হাতটা খানিকটা ভিজে যায়।

সে ফ্যাক্টরি অফিসে ঢোকার আগেই ফ্যাক্টরিবাবুর গলা উঠেছে, "আরে ইনস্পেক্টরের আর কি, তাকে তো আর কোম্পানির চাকরি করতে হয় না, এই মাল যদি বিকেলে শিলিগুড়ি না পৌঁছয়, সাহেব এসে আমার চাকরি খাবে।"

ফ্যাক্টরিবাবু তাকে ইচ্ছে করেই কথা শোনাচ্ছেন—অশ্বিনীও হাসিহাসি মুখে ঢুকে চেয়ার টেনে নেয়। কথার পাল্টা কথা অশ্বিনীর ঠিক যোগায় না। কিন্তু তার শান্ত প্রায় নীরব উপস্থিতিতে বোঝা যায় লোকটি কথা বুঝতে পারে।

ফ্যাক্টরিবাবুর এখন চব্বিশ ঘণ্টায় ঘুমোবার সময়ও প্রায় নেই। আর সঙ্গে চলছে মুখ। "এক বছর একটা লটে পাউণ্ডে আধা-পয়সা যদি দাম কম ওঠে দেখবেন বিলেত থেকে বইদার পর্যন্ত কেঁপে যাবে। যতক্ষণ লাভ দিচ্ছ, দাম দিচ্ছ, কোটা ফুলফিল করছ, ততক্ষণ তুমি ভালো, টেরটিও পাবে না মালিক আছে কি নেই, যেমনি প্রোডাকশন একটু কম হল, দাম একটু কম উঠল আপনার ওপরের নিচের চোদ্দ-পুরুষ টের পেয়ে যাবে মালিক কাকে বলে।" ফ্যাক্টরিবাবু খাতা খুলে অশ্বিনীর দিকে এগিয়ে দেয়, "নিন, আমার ছাড়-চিঠিটা আগে সই করে দিন।"

আর-জি ওয়ান খাতাটা টেনে নিয়ে টিক দিয়ে সই করতে করতে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "এত ডেসপ্যাচ একসঙ্গে—?"

"কথা তো ছিল না, কিন্তু বৃষ্টি যা নেমেছে, মাল রাখতে ভরসা

পেলাম না। শেষ বর্ষার ধাক্কা। এ-তো দিন পনর বিশের আগে থামবে না। আবার কখন ধস-টস নেমে রাস্তা আটকায়, তার চেয়ে চলে যাক।"

"একটা চেস্ট দেখাবেন।"

ধনবাহাদুর একটা চেস্ট নিয়ে এলে অশ্বিনী সেটা সোজা করে ধরিয়ে দেয়। চেস্টের গায়ে নানা লেখা মিলিয়ে ই-বি ফোরের পাতায় অশ্বিনী টিক দিচ্ছিল।

ই-বি ফোর খাতায় লেখা শেষ হলে ফ্যাক্টরিবাবু কার্ডগুলো এগিয়ে দিলেন। কার্ডগুলোতে একটা স্বাক্ষর দিয়ে অশ্বিনী এক্সাইজ ডিউটির ডেইলি এ্যাকাউন্টে আবার সেই অঙ্কগুলোই লেখে। কত মাল জমা, কত ছাড়া, কত ডিউটি।

অশ্বিনী গুদামবাবুকে জিজ্ঞেস করে, "ইন-ভয়েস নাম্বার ?"

"জি, থ্রি টু ফাইভ···"

খাতা বন্ধ করে অশ্বিনী এগিয়ে দেয়া ইন-ভয়েসগুলি নেয়। ই-বি ফোর খাতা খুলে মিলিয়ে নেয় চেস্টের গায়ে কি কি লেখা, মোট বাক্স, মোট ওজন, বাক্সের ওজন বাদে চায়ের নেট ওজন,—শাদা কাগজে একবার হিসেব কষে মোট ডিউটি কত।

গত দু-মাস ধরে একটু একটু করে অশ্বিনীকে চা-উৎপাদনের ও তার চাকরির ব্যাপার, দুটোকেই আয়ত্তে আনতে হচ্ছে। প্রতিটি বাগানের প্রতিটি ডেসপ্যাচের সময় তাকে যখন নানা খাতা, কার্ড আর ফর্মগুলো ভর্তি করতে হয়—তখন সে পরোক্ষভাবে তার পেছনে সরকারের জটিল সংগঠনের উপস্থিতি যেন টের পায়—যার প্রতিনিধি হিসেবে সে এই বাগানগুলিতে আছে। এত হিসেব-নিকেশের জন্য সে একটু সশঙ্ক থাকে। প্রায় দু-মাস সময় পেরতে চললো কিন্তু এখনো খাতাপত্রের ব্যাপারটা তার এত বেশি ধাতস্থ হয় নি যাতে ফ্যাক্টরিবাবুরা যত অনায়াসে হিসেবটা মেলাতে চায় তার সঙ্গে সে তাল দিতে পারে। সব কিছুতেই অঙ্ক মেলাবার একটা দায় থেকেই

যায়। গ্রিন লিফের ওপেনিং ব্যালান্স, কোয়ানটিটি এক্সপেণ্ডেড থেকে শুরু করে ড্রায়ার মাউথে কত চা বেরচ্ছে, প্রতিদিন কত চা তৈরি হচ্ছে, কেজি প্রতি তিরিশ পয়সা হারে কত ডিউটি হচ্ছে, প্রতিদিনের ডিউটির হিসেব, ম্যানেজিং এজেন্সি থেকে কী পরামর্শ এসেছে—এই সব হিসেব-নিকেশ এত শ' শ' কেজির ওপর করতে হয় আর ডিউটির টাকার হিসেব হাজারের অঙ্কে রাখতে হয় যে অশ্বিনীকে খুব চেষ্টা করে তথ্যের ব্যাপারটা আয়ত্তে আনতে হয়। সে নতুন, অথচ ব্যাপারটা পুরনো। এই চা-বাগানের সংগঠনের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তার উপায় নেই। চা-বাগানের সংগঠনের নিজস্ব একটা গতি আছে। অশ্বিনীকে তার সঙ্গে তাল রাখতেই হয়। ফলে সরকারি নিয়ম-কানুন হিসেব-নিকেশ আর চা-বাগানের সংগঠনের মধ্যে একটা লড়াই আর সামঞ্জস্য অশ্বিনীকেই করে নিতে হয়।

এখন অশ্বিনী বুঝে গিয়েছে গ্রিন লিফের হিসেবটা ঠিক কি ভুল এটা তার ভাবার বিষয়ই নয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ওপর গ্রিন লিফের ওজন বাড়ে কমে। গ্রিন লিফের পরিমাণ অনুযায়ী ড্রায়ার মাউথের হিসেব চলে। ড্রায়ার মাউথের পরিমাণ অনুযায়ী ম্যানু-ফ্যাকচারিং-এর হিসেব চলে। ম্যানুফ্যাকচারিং-এর হিসেব অনুযায়ী গুদামের হিসেব। সেই অনুযায়ী ডেসপ্যাচের হিসেব। এই হিসেবটা যাতে ঠিক থাকে সেটুকু দেখাই তার কাজ। আসলে এর বেশি দেখা তার পক্ষে সম্ভবই নয়।

গ্রিন লিফ থেকে ডেসপ্যাচ পর্যন্ত যদি কোনো কারচুপি ঘটে যেতে পারে, তবে সেটা অশ্বিনীর ধরবার উপায় নেই। তবে অশ্বিনীর হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর যদি কোথাও ধরা পড়ে তবে সে দায়-দায়িত্ব অশ্বিনীরই। এই একটা একটা ট্রাকে করে যে চা বাইরে যাচ্ছে তার বিক্রি আর মুনাফার ওপরই তো এত বড় একটা সংগঠন চলছে।

অশ্বিনী ইন-ভয়েসগুলো পরীক্ষা করছে যখন, হঠাৎ ফ্যাক্টরিবাবু

উঠে দাঁড়ান। অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে দরজায় ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সাহেব। অশ্বিনীও দাঁড়িয়ে পড়ে।

"ইয়েট নট ফিনিশ্‌ড্‌?"

"ইনস্পেক্টর দেখতা হ্যায়।"

"আ-চ্ছ-ছা। ইনস্পেক্টর দেখো দেখো।"

সাহেব সরে যাবার পর অশ্বিনী বসে পড়ে। ইন-ভয়েসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেও সে সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা খানিকটা যেন থতমত খেয়ে ভাবতে বসে, বাবুদের পাড়ায় কোয়ার্টারে থাকে বলেই কি সে-ও মনে মনে সাহেবের অধীনস্থ। নাকি এতবড় উৎপাদন ব্যাপারটায় যারা মালিকপক্ষ তাদের সামনে অশ্বিনী সব সময়ই নোকরপক্ষ। তা সে যত বড় সরকারের যত বড় চাকরিই করুক না কেন।

যদি ট্রাকে বেশি চা পাচার হয়ে যায়, যদি চায়ের পরিমাণ কম করে দেখিয়ে বেশি চা পাচার হয়ে যায় তাহলে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তো সব দায়িত্বই অশ্বিনীর। সবগুলো বাক্স একবার দেখা যায় কি না ভাবতেই যেন অশ্বিনী একবার বাইরের ট্রাকের সারির দিকে তাকায়—ট্রাকের পর ট্রাক মাল বোঝাই দাঁড়িয়ে, এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও বেরিয়ে যাবে, এমনভাবে ঢাকা, এমনভাবে বাঁধা যে এত বাতাস, এত বৃষ্টি কোনো কিছুতেই কিছু হবে না। বাইরে থেকে বৃষ্টি আর ফ্যাক্টরির মিলিত গর্জন পাক খেয়ে ওঠে।

অশ্বিনী ট্রাকগুলো পরীক্ষা করতে চাইতে পারে। অশ্বিনী ইন্‌-ভয়েসগুলো স্বাক্ষর না করে উঠতে পারে। কিন্তু যদি মাল নষ্ট হয়। কোম্পানির কি ক্ষতি হবে সে-চিন্তা যদি অশ্বিনী না-ই করে, নষ্ট মাল বাবদ সরকারের কত টাকা ডিউটি মার যাবে সেটা তো ভাববার কথা। যদি কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে নষ্ট মালের ক্ষতিপূরণ দাবি করে। এই মুহূর্তে অশ্বিনী সরকার হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তখন।

ভোঁ বেজে উঠল গমকে গমকে। ফ্যাক্টরি আর বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে সাইরেনের শব্দটা উঠতে লাগল। ফ্যাক্টরির ভেতর বসে থাকলে সাইরেনের শব্দটা এমন বিদীর্ণ করে দেয়। সাইরেনটা নেমে এসে আবার উঠতে থাকে, উচ্চতম কিছুটা বোঝা যায় না—অশ্বিনী ইন্‌-ভয়েসগুলিতে সই করতে শুরু করে।

ছাতা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখে ফ্যাক্টরি, বাবুদের কোয়ার্টার সব কিছুর পেছন থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে এক একটা পাহাড়ের মতো উঠে আসছে লেবাররা। মাথার সঙ্গে বাঁধা রুমাল। ছাতা। মাথা নিচু। বাগানের আর সকলের মতো অশ্বিনীও দুপুরে বাড়ি ফিরেছে।

হঠাৎ অশ্বিনীসহ সেই ভিড় ভেদ করে পেছন থেকে পাহাড়ের মতো মাল বোঝাই তিনটি ট্রাক মাঠ পেরিয়ে দক্ষিণের ঢালু দিয়ে যায় ক্রম-বিলীয়মান একটানা তীব্র গর্জনে। আবার তীব্রতর গর্জনে বোঝা যায় ট্রাকগুলো পি-ডবলু-ডি-র রাস্তায় মোড় নিল।

ছয়

খোকন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল। অশ্বিনীকে নামতে দেখেই হাত তুলে চেঁচাচ্ছিল। অশ্বিনী সেটা দেখেছে, বুঝতে পারে নি। ভেতরে ঢুকবার জন্য ভেজা জুতোটা খুলে রাখতে নিচু হলে তার কানে এতক্ষণে পাশেই খোকনের চিৎকার কানে আসে, "মা ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে।"

অন্যমনস্ক থেকেই অশ্বিনী প্রশ্ন করে, "মা কী বলেছে, খোকন?"

"ট্রাকের শব্দ শুনেই মা বলেছে এবার বাবা আসবে।"

"তাই নাকি" খালি পায়ে ভেতরে ঢুকতেই গোলাপ এনে স্যাণ্ডেল রাখে। খোকন পিছু পিছু এসে জড়িয়ে ধরলে অশ্বিনী বলে, "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"এবার ঘুমু হবে ?"

"ঘুমু হবে না।"

"কেন ?"

"ঘুমু রাত্তিরে হবে।"

"আমি ঘুমুবো, মা ঘুমুবে, তুমি ঘুমুবে না ?"

"তুমিও ঘুমুবে না—"

"ঐ যে বাঁশি বাজল। বাঁশি বাজলে ঘুমোতে হয়। না হলে চৌকিদার এসে ধরে নিয়ে যাবে।"

"বাবা, তুমি না বললে ট্রাকগুলো যায় না ?"

"কে বললো ?"

"মা বললো, বাবা বললে তবে ট্রাক যায়, ট্রাক গেলেই বাবা আসবে।"

অশ্বিনী চুপ করে যায়। গোলাপ বলে, "তুমি স্নান করবে না ?"

"তোমার স্নান হয় নি তো ?"

"না। তুমি তাহলে করে এসো। গরম জল দিতে বলি।"

"তুমি করে এসো তো। তারপর দেখা যাবে—"

গোলাপ ফিরতে গিয়ে শুধোয়, "তোমার সর্দিটর্দি লাগে নি তো ?"

"না।"

"যে-বৃষ্টি বাবা, দেখে মনে হয় না কোনোদিন থামবে। আসার পর থেকে—" বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অশ্বিনী বিছানার ওপর আধশোয়া এলিয়ে পড়ে। মেঝেয় দাঁড়িয়ে খোকন বলে, "বাবা" "উঁ" "বাবা" "উঁ" আমাকে একদিন অফিসে নিয়ে যাবে ?"

"তুমি তো রোজই অফিসে যাও" অশ্বিনী চোখের ওপর হাত ঢাকা দেয়।

"না, দাজুদাদার সঙ্গে না, তোমার সঙ্গে।"

"আমার সঙ্গে গিয়ে কি করবে, আমি তো কাজ করি।

"তুমি যখন বলবে আমি তখন ট্রাকগুলোকে ওয়ান-টু-থ্রি বলবো, ট্রাকগুলো ছেড়ে দেবে।"

"হুঁ"।

"নিয়ে যাবে তো?"

"হুঁ"।

"কবে, বাবা।"

"হুঁ"।

"বলো না, কবে?"

"হুঁ।"

"কি হুঁ হুঁ করছো। বলো না বাবা।"

"খোকন দাজুদাদার কাছে যাও, আমি এখন শুয়ে আছি।"

চুপচাপ শুয়ে থাকার সময়টুকুতে তন্দ্রা এসে পড়ার আগে অশ্বিনী ভাবে গোলাপ কি ছেলেকে শিখিয়েছে আমি বাগানে বাগানে ট্রাক ছেড়ে বেড়াই। মেঝেতে ভিজে পায়ের চিহ্ন এঁকে এঁকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে গোলাপ অশ্বিনীর কপালে হাত রেখে "তোমার কি শরীর খারাপ" জিজ্ঞাসা করা পর্যন্ত তন্দ্রাটুকুতে অশ্বিনী শুধু ট্রাকই ছাড়তে থাকে, চায়ের বাক্স সাজানো পাহাড়ের মতো ট্রাক।

"কেন, শরীর খারাপ করবে কেন, জল দিয়েছে?" অশ্বিনী বাথরুমের দিকে এগোয়।

গোলাপের চুল টান করে পেছনে গোঁজা, কপালে কানে ফোঁটা ফোঁটা জল, কাপড়টা পরা হয় নি, পেঁচিয়ে ঘাড়ের ওপর, ঘাড়টা যদি এমন নুয়ে না যেত গোলাপকে তাহলে দেখতে ভালোই লাগত। নিজের স্ত্রীকে এতদিন পর নতুন করে দেখতে হয় অশ্বিনীকে।

মেঝের ওপর সতরঞ্চি ভাঁজ করে বসে খাওয়া। গোলাপ বসে খবরের কাগজের ওপর। গোলাপ ঠিক করে ফেলেছে সামনের মাসে একটা খাওয়ার টেবিল আর গোটা দুই চেয়ার সে করবেই। এ মাসেই হতো। কিন্তু দার্জিলিঙ থেকে আনা আর এখানকার মিস্ত্রী

দিয়ে বানানো—ওই দুটোর মধ্যে কোনটা করবে ঠিক করতে করতেই সময় চলে গেল।

খাওয়াটা সত্যি কষ্টদায়ক। এই বর্ষায় মাঝেমধ্যে ডিম ছাড়া, প্রতিদিনই আলু আর স্কোয়াশ। ক্বচিৎ কদাচ মাংস। মুরগির মাংস গোলাপ রাধতে চায় না। খোকন এসে অশ্বিনীর পাশে বসে। "খাবি" গোলাপ শুধোয়। খোকন নাকমুখ কোঁচকালে গোলাপ হেসে ওঠে। অশ্বিনী ঘাড় ঘুরিয়ে খোকনকে দেখে।

খোকন নাকমুখ কুঁচকিয়েই আছে। "কেন ? খা না", "নাঃ, গন্ধ, পচা।"

"দিদি যখন বলেছিল খাওয়ার কষ্ট তখন বুঝি নি, এখন টের পাচ্ছি।"

"ওখানকার বাড়ির পর এ-খাবার যে কী করে মুখে তুলছি !"

"ওখানকার খাওয়ার কথা আর বোলো না, রাক্ষসের মতো শুধু গেলা, এক রকম মাছ হলে হবে না, এক রকম ডাল হলে হবে না। সেজন্যই আর কিছু হয় না।" খোকন উঠে বারান্দায় দাজুর কাছে যায়।

"আর কি আবার হবে ?"

"শুধু খাওয়া দিয়েই তো আর সব নয়। দেখতো দিদির বাড়িতে। সব কেমন গুছিয়ে করে। তোমাদের ও বাড়িতে খেতেই সব চলে যায়, শেষে লেপের ওয়াড় দেয়াও হয় না।"

"তুমি এতকথা ভাবতে কখন। দেখে তো মনে হতো সাতচড়ে রা কাড় না।"

"যেখানে রা কেড়ে লাভ নেই, সেখানে কাড়বো কেন ?" গোলাপ ভাত দেয়।

"বিয়ে হওয়ার পর থেকে দেখছি বিধবা শাশুড়ী আর স্বামী যেন চোর ধরা পড়েছে। আমিও তাই। বাব্বা। কোনোদিন ভাবতেও পারি নি ওখান থেকে ছাড়া পাব।"

"তুমি বসো। আমার আর কিছু লাগবে না। যতই বলো বাবা, এ-সব ছোট ছোট ডিসে আমাদের খাওয়ার অসুবিধে। কাঁসার থালায় খাওয়ার অভ্যেস।"

"কে মাজবে এখানে বলো। আরো কটা ডিস কিনতে হবে। বৃষ্টি না ধরলে তো দার্জিলিঙ যাওয়ারও উপায় নেই। দিদিরা যে কি ভাবছে ?"

"এখানে যে-রকম সংসার পাতছ, মনে হচ্ছে, ভুলেই গেছ যে বদলির চাকরি। হুট বলতেই রওনা দিতে হবে।"

"সবে তো দু-মাস হল। এখুনি বদলি ? দু-তিন বছর যাক।"

বাঁ হাতে জল খেয়ে গ্লাসটা রাখতে গোলাপ অশ্বিনীকে বলে, "তোমার খাওয়ার খুব কষ্ট হচ্ছে। শরীর খারাপ না করে।"

"আমার শরীর নিয়ে ভাবতে হবে না। খোকনটা তো বোধহয় কিছুই খাচ্ছে না।"

খেতে খেতে এমন গল্প করা গোলাপ-অশ্বিনীর অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে খাওয়াটা ছিল অশ্বিনীর কাছে সবচেয়ে তাড়াহুড়োর সময়। যত ছোটই হোক একটা ঘোমটা তুলে গোলাপ ভাত দিত। অশ্বিনী যত তাড়াতাড়ি পারে মুখে পুরতো। জ্যেঠিমা বা মা এই সুযোগটা ছাড়তে চাইতেন না। খেতে অশ্বিনীর যতটুকু সময়ই লাগুক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সংসারের ব্যাখ্যান শুরু করতেন। তার হাত থেকে রেহাই পেতে অশ্বিনীর তাড়াহুড়ো ছাড়া উপায় কি। কিন্তু মাত্র মাস দুই সময়ে গোলাপ ও তার গল্প করতে করতে খাওয়াটা এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে যে অন্য বাগানে গেলে, ফিরতে দেরি হলেও গোলাপ আগে খেয়ে নিতে পারে না।

অশ্বিনীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। গোলাপ খাচ্ছিল। প্রতিদিনের মতো আজও অশ্বিনী না বলে পারে না, "আস্তে আস্তে খাও না, এত তাড়া কি ?" গোলাপ একগাল ভাত নিয়ে মুখ উঁচু করে ঠোঁট টিপে হাসে, তারপর বাঁ হাতটা গলায় দেয়, অশ্বিনী দেখে গোলাপের

খাওয়ার জল নেই, তাড়াতাড়ি জলের কেটলিটা এগিয়ে দেয়। গোলাপ গলা উঁচু ও ঠোঁট ফাঁক করে ওপর থেকে ঢেলে ঢকঢক করে জল খায়। এত টান টান গলায় অশ্বিনী কণ্ঠমূলের দবদবানিটা দেখতে পায়।

কেটলি নামালে অশ্বিনী বলে, "জল নিয়ে বসতে পারো না, রোজ রোজ এক ব্যাপার—"

গোলাপ মুঠো করে ভাত ঢোকায়। সবার শেষে একা একা সারাদিনের নাড়াচাড়া ভাত-ডাল-তরকারি নিয়ে কোনোরকমে মুখে ঠেলে ওপর থেকে জল ঢেলে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে দেবার স্বভাবটা কি গোলাপ এত তাড়াতাড়ি বদলাতে পারে? এতদিন হুকুম শুনে যাবার পর যত অবলীলাতেই সে বলুক না কেন "দাজু, এঁটো নিয়ে যাও—"

"তোমার এঁটোকাঁটার ব্যাপারটা তাহলে গেছে, এবার মুরগি রান্নাটাও ধরে ফেল"—মুখ ধুয়ে এসে অশ্বিনী সোজাসুজি বিছানায় ঢুকে লেপটা টেনে নেয়।

"মোটেই না তোমাদের মতো না। এঁটোকাঁটা আবার কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই হল" বাথরুমের দরজায় গোলাপ।

"শোয়ার ঘরেই খাওয়া, গোবর দিয়ে মোছা হচ্ছে না, বাঁ হাতে জল খেলেও আপত্তি নেই।"

"আ-হা-হা। এখানে গোবর পাওয়া যায় নাকি। আর কাচের গ্লাসে হাতের এঁটো লাগলে ধুতে বাবা খুব অসুবিধে" গোলাপ-বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে।

"তাই তো বলছি, মুরগিটা শুরু করলেই তো আমরা বাঁচি। প্যাকেটটা দাও।"

সাত

অশ্বিনীকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই সুপুরি দিয়ে, বাইরের দরজাটায় ছিটকিনি লাগিয়ে, ভেতরের দরজাটা আবজে, কলম আর কাগজ নিয়ে গোলাপ অশ্বিনীর গা-ঘেঁষে বসে চিঠি লিখতে শুরু করে। গোলাপের পাশে বসে খোকন একটা বল দেয়ালে ছুঁড়ে ছুঁড়ে লোফবার চেষ্টা করে, কোনোবারই পারে না, বারবারই বলটা মেঝেয় পড়ে, খোকন লাফিয়ে নেমে বল কুড়িয়ে আবার ওপরে ওঠে। সিগারেটের ধোঁয়া সহজে নড়ে না। গোলাপ মাঝে মাঝে হাত নাড়িয়ে ধোঁয়া সরায়। প্রায় স্থির সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী যে নানা-রকম আকারে ঘোরে অশ্বিনী সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখ জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু সিগারেটটা শেষ করতে হয়।

চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমের আসন্নতায়। শরীর মনের সেই শিথিলতায় অশ্বিনীর যেন বোধগম্য হয় ভালোই করেছে আজকের ডেসপ্যাচ না আটকে। সাহেবের সামনে অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়েছে বলে ডেসপ্যাচ তো আর বন্ধ থাকতে পারে না। সাহেব তো আর তাকে দাঁড়াতে বলে নি। দাঁড়িয়েছে বলে তো আর অশ্বিনীর রাগ হয় নি। আসলে কার অধীনে কাজ করছে সেটা না বুঝতে পেরে একটু দ্বিধায় পড়েছে মাত্র। আর আর অফিসে কাজের সময় ফাইল আর কাগজ-পত্তরের স্তূপের ওপারেই অফিসার ছিল। এখানে তা নেই। অথচ অশ্বিনীকে তো একটা প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে জায়গা করে নিতে হবে—হুকুম শোনার আর হুকুম চালানোর জায়গা।

হাত বাড়িয়ে জানলার কাঠে সিগারেটটা নিবিয়ে অশ্বিনী লেপের ভেতর গুটিয়ে যেতে যেতে বলে, "খোকন তো ঘুমোতে দেবে না। খোকন, ফ্যাক্টরিতে যাবে?"

"হ্যাঁ, দাজুদাদাকে ডাকবো" খোকন বেরিয়ে যায়।

"এই বৃষ্টির মধ্যে···" গোলাপ বলে।

"সারাদিন বাড়িতে আটকা থাকে না।" দাজু এসে দাঁড়ায় "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"খোকনকে নিয়ে একটু ফ্যাক্টরিতে যাও।"

খোকনকে নিয়ে ভেতরের দরজা দিয়ে বেরবার সময় দাজু দরজাটা আবার ভেজিয়ে দেয়।

চোখ বুঁজতে গিয়ে অশ্বিনী দেখে গোলাপ আবার চিঠি লিখছে।

"কাকে লিখছ?"

"চিঠি আবার কাকে লিখব। ও-বাড়িতে।"

অশ্বিনী দেখে গোলাপের ব্লাউজটা ঝুলে পড়েছে—স্তনের আভাস দেখা যায়। কোল পর্যন্ত লেপ দিয়ে ঢাকা। অশ্বিনী গোলাপের লেপে ঢাকা উরুর ওপর হাত রাখে। গোলাপ চিঠি লিখে চলে। অশ্বিনী দেখে কলম চালাবার তালে তালে গোলাপের বাহুর মাংসে দোলা। অশ্বিনী হাত বাড়িয়ে আঁচলটা সরিয়ে দেয়। "উঁ" বলে গোলাপ লিখতেই থাকে। গোলাপ কি ব্রা পরে নি, কেমন ঝুলে গেছে। অশ্বিনী লেপের ভেতর হাতটা গোলাপের কোলের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। গোলাপ তাকায়-ও না, কিছু বলেও না। লেপের ভেতর অশ্বিনী গোলাপের তলপেটে হাত বোলায়। "উঁ" বলে গোলাপ একটু সরে চিঠি লিখতে থাকে। অশ্বিনী আর একটা হাত বের করে গোলাপকে টান দেয়। কাগজটা আর কলমটা পড়ে যায়। অশ্বিনী হ্যাঁচকা টানে গোলাপকে লেপের ভেতর ঢুকিয়ে নেয়। "আরে, আরে, আমার চিঠিটা গেল।" অশ্বিনী গোলাপকে শুইয়ে দেয়। একহাতে ব্লাউজটা টান দিতেই গোলাপ "উঁ" করে ওঠে। নিচে ব্রা ছিল না। গোলাপের স্তনে সেফ্‌টিপেনের খোঁচা লেগেছে। অশ্বিনী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে খোলা জামার ভেতর স্তনের ওপর সেই খোঁচাটা রক্তে ভরে ওঠে। বেশ এক টুকরো ছোট

পাথরের মতো হয়ে উঠতেই তার ওপর অশ্বিনী দুই ঠোঁট চেপে ধরে শুষতে থাকে। দুই হাতে গোলাপের বাহু আর ঘাড়ের মাংস পিষতে থাকে। "লাগছে লাগছে" বলে গোলাপ পায়ের চাপে পেছু হটে। তার মাথাটা চৌকির সীমানায় আসে। অশ্বিনী মুখ না সরিয়ে স্তনে এক ধাক্কা দিতেই মাথাটা ঝুলে যায়। গোলাপের মাথাটা তোলার সুযোগ না দিয়ে অশ্বিনী তার সমস্ত শরীরের ভার তার ওপর চাপিয়ে দেয়। গোলাপ শূন্যে মাথাটা এদিকে ওদিকে দুলিয়েই যায়।

তার ওপর থেকে অশ্বিনী নেমে গেলে, গোলাপ প্রথমে মাথাটা চৌকির ওপর তোলে। বাঁ হাতটা অশ্বিনীর মাথা ছুঁয়ে ফেলে রেখে। অশ্বিনী তার বুকের ওপর আঁচলটা ছুঁড়ে দিলে গোলাপ শাড়িটা ঠিক করতে করতে পায়ের চাপে একটু এগিয়ে যায়। অশ্বিনীর মুখটা ধরে বলে, "পারোও বটে। এইজন্য খোকনকে বৃষ্টির ভেতর বাইরে পাঠালে।"

গোলাপের দিকে পেছন ফিরতে ফিরতে অশ্বিনী জড়িত কণ্ঠে বলে, "নিচের জামা পরো না কেন, এমনিতেই তো যা শরীর, একটু যত্ন নিলে তো পার।"

অশ্বিনীর পিঠে নাক ঘষে গোলাপ বলে, "এতেই তো তোমার এই। যত্ন নিলে তো আর দেখাই যাবে না—"

"সরো। ঘুমোতে দাও।" গোলাপ সরে না। ধীরে ধীরে ওরা দুজনই ঘুমিয়ে পড়তে থাকে।

বিয়ের পর অশ্বিনী চায় নি তার বাচ্চাকাচ্চা হোক। জ্যাঠা-মশাইয়ের কোনো ছেলে না থাকা আর তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে যাওয়ার সুযোগে বিয়ে করাটা অশ্বিনীর পক্ষে স্বাভাবিক হলেও ছেলের বাপ হয়ে যাওয়ার মতো সাহস তার ছিল না। কিন্তু একজন পুরুষ আর একজন নারী বিয়ের পর একসঙ্গে থাকছে, মেয়েটি বাচ্চা চায়—সে অবস্থায় অশ্বিনীর হেরে যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল

না। নিজের আপত্তি বিরোধিতা সত্ত্বেও অশ্বিনী গোলাপের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে বসেছিল।

গোলাপ যে-রাত্রিতে অশ্বিনীকে এটা টের পাওয়ায় গোলাপের তলপেটে লাথি মেরে জিতে যাওয়ার সহজ লোভটা দমন করে এই সহজ হিসেব থেকে যে তাতে হাঙ্গামা অনেক বাড়তে পারে। কিন্তু হাসতে হাসতে, যেন খুশি হয়েই, গোলাপের শরীরটাকে তলায় ফেলে হাঁটু দিয়ে নিচে আর কনুই দিয়ে ওপরে এমন গুঁতিয়েছিল যে পরে উঠে গোলাপের চোখে মুখে জল ছিটোবার দরকার হয়।

অশ্বিনী কর্তৃক যে ভ্রূণ হন্তব্য ছিল সেই এখন দাজুর সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে যায়।

আর খুব প্রত্যক্ষ একটা ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে গুঁজে দিতে, হুকুম মানার আর হুকুম চালাবার মতো একটা জায়গায় নিজেকে গুঁজে দিতে, অশ্বিনীকে ডেসপ্যাচ সই করে, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে, সাহেবকে সেলাম বাজিয়ে, দুপুরে ঘুমিয়ে পড়তে হয়।

আট

ভোঁ শুনে গোলাপ অশ্বিনী দুজনারই ঘুম ভাঙে। অশ্বিনী নড়াচড়া করে না। গোলাপ ঘুরে ডাকে “খোকন”। জবাব না পেয়ে লেপ থেকে বেরতে বেরতে “দাজু”। “ফেরে নি নাকি” বলতে বলতে গোলাপ খাট থেকে নেমে ভেতরের দিকের দরজাটা খুলে একবার তাকিয়ে, বাইরের দরজাটা খুলে বারান্দায় যায়। “এখনো ফিরল না” বলতে বলতে গোলাপ ফিরে, ঘর দিয়ে, রান্নাঘরে চায়ের জল চাপিয়ে বাথরুমে, বেরিয়ে বাইরে বারান্দায়।

“ওরা তো এখনো ফেরে নি। তুমি গিয়েই কিন্তু ওদের পাঠিয়ে দিও”, ঘর পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে গোলাপ বলে যায়।

“চা” শুনেই অশ্বিনী লেপ জড়িয়ে উঠে বসে। গোলাপ অশ্বিনীর কাপটা ধরিয়ে দিয়ে নিজের কাপটা নিয়ে চুমুক দেয়, তারপর বসে,

"এখানে এসে আর সব কিছু খাওয়ার সুখ ঘুচেছে, চা খাওয়ার সুখটা বেড়েছে—"

"ঠোঁট থেকে কাপ নামিয়ে অশ্বিনী বলে, "বাবা এর নাম দার্জিলিঙ টি। বাজারে কিনতে যাও বিশ টাকার কম দাম নেই।"

"আমি তো সুযোগ পেলেই চা, নেশা ধরে গেছে।"

"এই নেশা ধরানোর জন্য এত সব। শুনেছি শরৎ কালের শেষে, শীতের আগে নাকি সবচেয়ে ভালো চা তৈরি হয়। ফ্লাওয়ারি অরেঞ্জ পিকো। অরেঞ্জ পিকো—"

"বা বা তুমি তো খুব নাম শিখে গেছ। মনে হচ্ছে চা বাগানেই চাকরি করি। আর এক কাপ খাবে?"

"দাও।"

গোলাপ আবার দু-কাপ চা নিয়ে আসতে আসতে বলে, "সামনের মাসে একটা টি-পট আর কাপডিশ কিনতে হবে। কতকগুলো চেয়ারও লাগবে। বিছানা ছাড়া বসার জায়গা নেই, বিশ্রী।"

হাত বাড়িয়ে জানলা খুলে বাইরে তাকিয়ে অশ্বিনী বলে, "তুমি তো তা-ও সামনের মাস বলে ভাবতে পারছ, এই বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমার তো কখনো মনে হয় না এ-বৃষ্টি ছাড়বে। দু-মাস ধরে মেঘ আর বৃষ্টি, বৃষ্টি আর মেঘ, আর পারা যায় না।"

এ বেলা অশ্বিনীর কোনো কাজ নেই। অন্য বাগানে ডেসপ্যাচ থাকলে এখন থেকে আগের দিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে রওনা দেয়, সারা বিকেল সন্ধ্যে কাজ করে, সব ঠিক থাকে, সে চলে আসে, পরদিন সকালে ওদের ডেসপ্যাচ চলে যায়। প্রথম দিকে অশ্বিনী একটু ভয় পেত। ইন্‌-ভয়েস সই করে দেবার পর গাড়ি সারারাত থাকছে, মাল যদি আরো চাপিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে ভয়টা কেটে গেছে। দিলে দেবে, কী আর করা যাবে। এখানকার গুদামবাবু বলেন, "যতই হোক ইনস্পেক্টর, আমাদের ওপর নির্ভর তো আপনাকে করতেই হবে। কো-অপারেশনে কাজ চললে সবারই সুবিধে।"

বিকেলটা অশ্বিনী অন্য বাগানের জন্য খালি রাখে। প্লেনভিউয়ের কাজ সকালে। তবু ভোঁ বাজলে একবার ফ্যাক্টরিতে যায়, সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, গল্পগুজব চলে। বর্ষাকালে ক্লাবে বড় একটা কেউ যায় না এখন, মাঝেমাঝে অশ্বিনীরা দু-একজন ছাড়া। বেকার হয়ে ফ্যাক্টরি আর গুদামে ঘুরে বেড়াতে অশ্বিনীর ভালোও লাগে।

অশ্বিনী হাফহাতা সোয়েটারটা গায়ে দিতে যাচ্ছিল। গোলাপ সেটা নিয়ে ফুলহাতা সোয়েটারটা দেয়। সেটা পরে চিরুনি চালিয়ে অশ্বিনী পকেটে হাত দিয়ে গোলাপের কাছে কিছু রেজগি চায়। তারপর গোলাপের হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে বেরয়। বারান্দা থেকে গোলাপ বলে দেয়—"গিয়েই ওদের পাঠিয়ে দিও। এত দেরি করছে কেন।" গোলাপের কথা শুনতে অশ্বিনী ঘাড় ঘুরিয়ে গোলাপকে দেখে, চলতে চলতে ভাবে কোন জিনিসটা গোলাপের নেই, শরীরে বা মনে।

ফ্যাক্টরিতে ঢুকে অশ্বিনী জিজ্ঞেস করে, "দাজু আর খোকন কোথায়।" ফ্যাক্টরিবাবু বা আর কেউ তাদের দেখেন নি। অশ্বিনী একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফ্যাক্টরিবাবু বললেন, "দেখুন কারো বাড়ি-টাড়িতে আছে, যাবে কোথায়।" অশ্বিনী একজন লেবারকে ডেকে বলে, "সায়লা, একটু দেখো তো এখানকার কোনো বাড়িতে আছে কি না, থাকলে বাড়িতে দিয়ে এসো।"

সায়লা ছাতা নিয়ে ছুট দেয়। ফ্যাক্টরিবাবু বলেন, "আপনি তো দিব্বি ফ্যাক্টরি লেবারদের চিনে গেছেন। এখন থেকে আপনাকে নাইট ডিউটি দেব।"

"দিতে তো আর আপত্তি নেই, কিন্তু চা বানাতে হবে যে—"

"এ আর কি, শিখে নেবেন।"

"এ-আর-কি বলেই তো দেখছি আপনার দু-মাস হল নাওয়া-খাওয়া নেই, মনে হচ্ছে এক হাজার চোখ নিয়ে কাজ করছেন।"

ফ্যাক্টরিবাবু খুশি হন—"বসবেন না ?"

"না, দেখি ও-দিকে", অশ্বিনী পা-বাড়ালে ফ্যাক্টরিবাবুও সঙ্গ নেন।

"জানেন ইনস্পেক্টর, চেষ্টা করি ফাঁকি দিতে, পারি না। মনে হয় দেই আর এক ছাঁকনি। আর একটু রোস্ট করি। আর একটু শুকিয়ে নি। ডুয়ার্সে আর তরাইয়ের সব ইণ্ডিয়ান কনসার্নে তো নাকি আজকাল কাঁঠালপাতা দিয়ে চা হচ্ছে।" ফ্যাক্টরিবাবু হঠাৎ একটা স্তূপ থেকে একমুঠ চা তুলে নিয়ে, চশমাটা খুলে মুঠো ভরা চা চোখের কাছে নিয়ে দেখে বললেন, "কি রে লাল সিং, তোর কি বাড়িতে মেয়ের বিয়ে আটকা নাকি, স্পিড কমিয়ে দে।" মুঠো খুলে স্তূপের মধ্যে চা ফেলে দিয়ে ফ্যাক্টরিবাবু আবার চলতে শুরু করেন। এপাশে ওপাশে চায়ের স্তূপের ভেতর ঝকঝকে মেঝের ওপর দিয়ে ওরা চলছিলেন। "ইয়োরোপিয়ান কনসার্নে এইটি পাবেন না। ওদের টপ-প্রায়োরিটি ম্যানুফ্যাক্চারিং-এ। তেমন গোলমাল হলে প্রোডাকশন করবে না সো ভি আচ্ছা কিন্তু কোয়ালিটি খারাপ করবে না।"

"আপনিই না সকালে বলছিলেন যা-ই হোক না কেন এরা প্রোডাকশন বন্ধ করবে না ?"

"বটেই তো। প্রোডকশনও বন্ধ করবে না, কোয়ালিটিও খারাপ করবে না।" ফ্যাক্টরিবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটু নিচু হয়ে একটা বিরাট জাঁতার মতো যন্ত্রের তলাটা দেখলেন। সায়লা ছুটে এসে বললো, "ইনস্পেক্টর সাব, খোকা আর দাজু বড়বাবুর বাড়িতে ছিল, এখন বাড়ি ফিরে গেছে।"

ফ্যাক্টরিবাবু আবার চলতে শুরু করেন—"আপনি বেশ এসেই সাহেব হয়ে গেছেন।"

"কেন ?"

"আপনার ওপরে তো আর কোনো সাহেব নেই। আমাদের

সবার ওপর সাহেব আছে, ফ্যাক্টরি সাহেব, কল সাহেব, বাগান সাহেব।"

একটু পর ফ্যাক্টরিবাবু বললেন, "আমি বছর দশেক আগে এক বার এক ইণ্ডিয়ান কনসার্নের ম্যানেজার হয়ে প্লেইনসে গিয়েছিলাম। এক বছর যেতে না যেতেই পালিয়ে এলাম।"

"কেন ?"

"ধ্যুৎ মশায়, জন্মে কোনোদিন শুনবেন না দার্জিলিঙের কোনো বাগানের লোক প্লেইনসে গেছে। দার্জিলিঙের এই অল্‌টিচিউডে আমরা যে পাতি দেখতে অভ্যস্ত, প্লেইনসে সে পাতি কোথায়। ও পাতা দেখলে মনে হয় চা আর হবে না। তার ওপর ম্যানুফ্যাকচারিং। যেটা আমার ইণ্ডিয়ান কনসার্ন বলবে তাড়াতাড়ি মাল ছাড়ো। ওদের আর কি, চা দেবে লোক্যাল সেল করে। পাউণ্ড প্রতি কিছু উড়চণ্ডি খেয়ে নিল। গ্রিন টি পর্যন্ত বেচে। আমি জানি না, টাকা নিশ্চয়ই হয়। নইলে আর বেচবে কেন। ওরাও তো টাকার জন্যই করে। এরাও তাই করে। কিন্তু আমার মন টিকল না। মশাই, চা বানাতে দেবে না তো আমি কী করব। যাও-বা বানালাম কিনবে এসে লোক্যাল কোনো দালাল। কিসের সঙ্গে কি মিলিয়ে কোথায় বেচবে। কিন্তু এখানে অন্তত এই শান্তিটা তো আছে। প্রত্যেকটা লটের মাল আমার মুখস্থ। কলকাতায় এদের মাল অকশন হয় না। হয় লণ্ডনে। কাগজে, স্টেট্‌স্‌ম্যানে, যখন দেখি বা পরে হেড অফিসের রিপোর্ট পাই অমুক বাগানের চা—এত টাকা ডাক উঠেছে, তখন একটা স্যাটিশফ্যাকশন আসে তো।"

"ইয়োরোপিয়ান কনসার্ন কি লোক্যাল সেল করে না ?"

ফ্যাক্টরিবাবু চোখ টিপলেন, "তলে তলে সবই করে। আপনি যখন আছেন সবই জানতে পারবেন। আপনাকে টপকে তো আর ঘাস খেতে পারবে না। মরতে মরি আমরা। তা সে যা-ই হোক। চায়ের ব্যাপারটাই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মার্কেটের ব্যাপার। এরাও সেই

ওয়ার্ল্ড মার্কেটটা রেখে আর সব কিছু করে। এদের এখানে সেই টি-ওয়ার্ল্ড-এর খবরটা পাওয়া যায়। আপনি যান। আমি একটু এদিকটা দেখে যাই।"

নয়

রোজই এই সময় কলবাবুর এই জায়গাটাতে একটা ছোটো আড্ডা বসে। বিকেল বেলায় সমস্ত কলকব্জাগুলো একবার দেখে দেয়া হয়। সন্ধ্যে থেকে নাইট শিফটের জন্য নির্ধারিত এঞ্জিন চলতে শুরু করে। দিনের বেলা যে-গুলো চলেছে সেগুলো রাত্রির মতো বন্ধ থাকে। রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত সেগুলোর দরকারি দেখাশোনা চলে। ফলে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত কলবাবু এখানে থাকেন, মিস্ত্রীরা কাজকর্ম করে। শেষ বিকেলে পাতিটেপার কাজ থাকে না। বাগানের অ্যাসিস্ট্যাণ্টরা আসে। দর্জি থাকলে আসে। ফ্যাক্টরি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দু-একজন আসে। থাকলে অশ্বিনীও এসে এখানেই বসে।

গুপ্ত—অফিস অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, লামা আর বাগানবাবু ছিলেন। পাশেই কলবাবু একটু ব্যস্ত। অশ্বিনীকে দেখেই লামা বললো, "ব্যস, ইনস্পেক্টরের সাজেশন নাও, যা বলবে তা-ই ফাইন্যাল, ইনস্পেক্টর বসো ভাই, আগে বসো। নাও, সিগারেট খাও। এবার বলো তো ভাই পুজোর সময় কি থিয়েটার হবে, মাইথলজিক্যাল না-কি হিস্টরিক্যাল—"

"কোথায় তুমি পুজো দেখছ লামা, গত দু-মাসের মধ্যে তো জল ছাড়া কিছুই দেখলাম না, আর তুমি পুজোর থিয়েটার করছ—" অশ্বিনী একটা সিগারেট ধরায়।

"সে বর্ষার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। লাস্ট ফেজ চলছে। আর বড় জোর দশ দিন পনের দিন। ফট করে একদিন এমন রোদ্দুর উঠবে তোমার মনেই হবে না দু-মাস ধরে শুধু

জল চলছে। এ তো আর তোমাদের প্লেইন্‌স্‌ না। নো কাদা, নো জলজমা বিজনেস। এখন বলো, কী বই হবে। রিহার্সেল-টিহার্সেল শুরু করতে হবে।"

বাগানবাবু বলেন, "বেটার মুখ দিয়ে 'ত' বেরয় না, উনি বসাবেন রিহার্সেল। আচ্ছা লামা, কেদার রায়ে কার্ভালোর পার্ট ছাড়া তুমি আর কোন পার্ট পারবে?"

লামা—"এক কেদার রায় ধরে রেখেছ বাগানদা। টিপু সুলতান করো। মঁসিয়ে লালি করে দেব। সুলটান, সুলটান তুমি হামাকে এক-বার হুকুম ডাও, হামি শ্রীরংপটন হইটে ফিরিঙ্গিডের টাড়াইয়া ডিবে।"

কলবাবু একজন নেপালী মিস্ত্রীর সঙ্গে উবু হয়ে বসে একটা হুইলের ভেতরটা অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলেন। তিনি চোখ তুলে সিগারেটটা নামিয়ে বললেন, "লামা, এটা তোমার রিহার্সেলের জায়গা নয়।"

মুখ তুলে হাসায় বোঝা যায় যাকে এতক্ষণ মিস্ত্রী বলে মনে হচ্ছিল সে ইন্দ্রজিৎ। আঠার উনিশ বছরের নেপালী ছেলে কলবাবুর ডান হাত। ঢুকেছিল ক্যাজুয়াল লেবার হয়ে। এক বছরের মধ্যে কলবাবু ওকে অ্যাপ্রেন্টিস করে নিয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে ইন্দ্রজিৎ এখন সবারই প্রধান নির্ভরস্থল। ফ্যাক্টরি সাহেব এসেই ডাকবেন, "ইন্দ্রজিট কিয়া রিপোর্ট?"

বাগানবাবু বললেন, "এবার ইন্দ্রজিৎকে মেয়ের পার্ট দেব।"

একগাল হেসে ইন্দ্রজিৎ মুখ ঘুরিয়ে আবার হুইলের ওপর নজর ফেলে।

গুপ্ত বলে, "আমি কিন্তু ভাই লামার দলে। হিস্টরিক্যাল হলে তা-ও বানানোর চান্স থাকে, মিথলজিক্যাল বইয়ে ঐ ব্ল্যাঙ্ক ভার্স মুখস্থ করবে কে?"

"কে আবার ব্ল্যাঙ্ক ভার্স মুখস্থ করল?" একটা চেয়ার হাতে করে দর্জি এসে বসে পড়ল।

গুপ্ত বললো, "কথা হচ্ছিল এবার পূজোয় কি থিয়েটার হবে। লামা আর আমার একমত। হিস্টরিক্যাল। মিথলজিক্যাল বই মুখস্থ করা যায় না।"

দর্জি বলে, "আচ্ছা, আমাদের দেশে তোমরা এসেছ, আমাদের ভাষাতে থিয়েটার হবে, গান হবে, কেন শুধু বাঙলা ভাষায় হবে ?"

বাগানবাবু বলেন, "কেন, ইংরেজরা তো আমাদের দেশে এসেছিল, তা তারা বাঙলা বলতো না-কি আমরাই ইংরেজী শিখেছি।"

দর্জি মাথা ঝাঁকায়—"বাগানদা, এই সব মাথায় নিয়ে আছেন বলেই তো দু-বছরে একবার নেপালী-বাঙালী মারামারি।"

লামা বলে ওঠে, "এই দর্জিটাকে নিয়ে আর পারা গেল না, আমরা করছি মিথলজিক্যাল আর হিস্টরিক্যাল। ও এর মধ্যে নিয়ে এলো নেপালী-বাঙালী।"

দর্জি হেসে উঠে বলে, "তুমি তো বাগানবাবুর থেকে ভালো বাঙালী। অন্তত নিজেকে তো বাঙালী-ই ভাবো।"

লামা একটু জোর গলায় বলে, "বিকজ দার্জিলিঙ ইজ এ ডিস্ট্রিক্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল।"

"তাতে তোমার কি সুবিধে লামা ভাই। আমি তোমার চাইতে কিছু কম বাঙালী নই। নেপালী থিয়েটার হবে শুনেই তোমরা এত রেগে গেলে কেন ?"

গুপ্ত বললো, "বাদ দাও, সে যা হবে দেখা যাবে, তোমাকে ফিমেল পার্ট করতে হবে।"

কলবাবু দাঁড়িয়ে উঠে "তোমাদের হলো কি, সবাইকেই ফিমেল পার্ট দিয়ে যাচ্ছ। তা আর যাকেই দাও, বড়বাবুকে আবার দিয়ে বোসো না।"

কিছুটা হাসির মধ্যে গুপ্ত "বড় বাবুকেও দেব, আপনার অপজিটে।"

"আমি ভাই তাহলে ক্লীবলিঙ্গ হয়ে যাব।"

"কী হল লামা, তুমি যে চুপ মেরে গেলে"—বাগানবাবু।

"লামা ভাই আমার উপর চটেছে" দর্জি বললো। "আরে নাও, নাও, ইয়ার্কি ঠাট্টাও বোঝো না। নেপালী নাটক হলে কি আর বাঙলা নাটক হবে না নাকি?"—দর্জি বলে।

বিজলির দুজন লোক এসে কলবাবুকে কি বলতেই তিনি ইন্দ্রজিৎকে পাঠিয়ে দেন। বাগানবাবু বলেন, "এবার কিন্তু একবারো ব্রেকডাউন হয় নি, খুব বাঁচোয়া। একদিন ব্রেকডাউন থাকলে আর দেখতে হবে না।"

কলবাবু খুব বিরক্তির স্বরে বলেন, "আপনার মুখে কি কোনো ভালো কথা আসে না। এমন করে বলছেন যেন ব্রেকডাউন হওয়াটাই স্বাভাবিক। দেখুন শ্রীমুখ থেকে যখন বেরল আজ রাত্রিতেই কোনো কাণ্ড হয় না কি।"

দর্জি মুচকি হেসে বলে, "কলদা, এবার তো বাগানে তেমন ধসও নামে নি, না?"

বাগানবাবু বললেন, "দর্জি, খবর তো এখন ধস আর ব্রেকডাউন নয়। যতই কেননা কলবাবু তেল দিয়ে যান আর আমি ধস ঠেকিয়ে যাই—তুমি যদি তোমার বানর সৈন্যদল নিয়ে একবার দয়া কর তাহলে সব ধস, সবই ব্রেকডাউন।"

দর্জি বাধা দিয়ে বলে, "দাদা, আপনাদের মধ্যে হচ্ছিল, আবার আমাকে টানাটানি কেন?"

গুপ্ত—"দর্জির কিন্তু ঐ একটা মস্ত সুবিধে। নিজেকে কিছুই করতে হয় না। সবই অন্য পাঁচজনে বলে যায়।"

কলবাবু—"একদিন ছিল যখন বাগান চালাত ফ্যাক্টরি তারপর একদিন এলো যখন বাগান চালাত পাতিটেপার দল। কিছুদিন আগেও বাগান চালাত গুদামবাবু। এখানো চালায়। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে লেবার।"

বাগানবাবু—"তবে দর্জির লেবার ব্যাপারটা একটু আলাদা। ভাই বয়স কম, দেখতে সুন্দর, পড়াশোনা জানে, চোখেমুখে কথা, মেয়েগুলো একেবারে পারলে দর্জিকে গিলে খায়। এ শুধু লেবার নয়, একেবারে লেবারপেন করিয়ে ছাড়বে।"

একটু হাসি। দু-একজন সিগারেট ধরায়। ফ্যাক্টরির ভেতরটা প্রায় সবসময় এত অস্পষ্ট অন্ধকার থাকে যে সবসময়ই লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ভেতরে বসে আলো দেখে বোঝাই যায় না সময় কত। বাইরে রাস্তার আলোগুলোতে চোখ পড়ায় সবাই বোঝে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরির শব্দটা কেমন চাপা গর্জন হয়ে যায়।

বাগানবাবু বললেন, "কলবাবু, আপনাদের দশ জনের সামনে একটা কথা বলে রাখি। পরে বিপদ হলে আমাকে ফাঁসাবেন না। আমাদের তুষার শ্রীমান। বর্ষার শুরু থেকে দেখছি তিন নম্বর তারপর পাঁচ, মানে ঐ একই দলে ছাড়া কোথাও ডিউটিই নেয় না। আমি ইচ্ছে করে বদলে দিয়েছি। ও আবার কাকে ধরে টরে ঠিক করে নিয়েছে। তারপর আমার কী রকম সন্দেহ হল। ঠিক তাই। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম শ্রীমান তো টিকটিকির মুখে পড়েছেন।"

"মানে? কে?" গুপ্ত জিজ্ঞাসা করে।

"আরে কী নাম মেয়েটার, মালা বোধ হয়, লাল সিং-এর শালী, তার সঙ্গে শ্রীমানের নিয়মিত চলছে।"

"মানে তুষার এখন রাত্রিতেও পাতি টিপছে—এই তো, তো টিপুক", কলবাবু বললেন।

"না, তা-ও আপনাদের জানিয়ে রাখলাম"—বাগানবাবু।

"তুষারের মতো একটা পাত্র যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, আমাদের মেয়েদের হবে কি। কী যে পায় সব আমাদের মেয়েদের ছেড়ে ঐ চোখ ছোট নাকথাঁদীদের কাছে"—গুপ্ত বলে বসে। দর্জি হাততালি

দিয়ে ওঠে, "ব্রেভো, ব্রেভো, দারুণ দিয়েছ গুপ্ত, আমাদের মেয়েদের কি হবে।—"

ইন্দ্রজিৎ এসে একটা খবর দিতেই কলবাবু উঠে ফ্যাক্টরির ভেতরে চলে গেলেন। আর সবাইও উঠল। দর্জি বললো, "চলুন ইনস্পেক্টর ক্লাবে গিয়ে খানিকক্ষণ তাস পেটাই, এখুনি ফিরবেন কি?"

অশ্বিনী বলে, "চলুন।"

"চালো গুপ্তদা, লামাভাই চলুন।" "না, বাড়িতে যেতে হবে।"

দশ

ওরা কোণাটা থেকে একসঙ্গেই বেরলো। ফ্যাক্টরির ভেতরে সবাই নানাদিকে ছিটকে গেল। ফ্যাক্টরি গম্‌গম্ করছে কাজের তাড়ায়। নাইট শিফ্‌টে কাজ খুব ভালো হয়। কারো অন্য কোনো দিকে খেয়াল থাকে না। এখন, এই সন্ধ্যাতেই অশ্বিনী, দর্জি আর গুপ্ত যখন ফ্যাক্টরির সদর দরজার দিকে এগোচ্ছে, কেউ ফিরেও তাকাল না। অন্য সময় হলে জনকয়েক তো সেলাম জানাতই। দূরে এক কোণে কলবাবু আর ইন্দ্রজিৎকে দেখা গেল।

দরজাটা খুলে বেরিয় ওরা আবার আবজে দিল। বাইরে আসার পর যেন টের পাওয়া যায় ভেতরটা চায়ের গন্ধে ম ম। ফ্যাক্টরির ভেতরে বাইরে যাতায়াত করতে বারবার দু-তিনটে গন্ধের সীমান্ত পার হতে হয়। প্রথমে বৃষ্টি-ভেজা পাতাগুলোর ভারী গন্ধ। ওয়েইং-শেডের পাশ দিয়ে। তারপর জল ঝরাবার জালের টানা ঘরগুলোর পাশ দিয়ে যেতে জলছাড়া সবুজ চা পাতার কাঁচা গন্ধ। তারপর ফ্যাক্টরির ভেতরে তৈরি চায়ের গন্ধ। অশ্বিনী শুনেছে ফ্যাক্টরির ভেতরেও নাকি নানা গন্ধ আছে। ছাকনিতে, ড্রায়ারে, ডাস্টের, পাতির। সে বুঝতে পারে না। একই পাতির চা নাকি দিনের কোন্ সময়ে করা হচ্ছে তার ওপর গন্ধের ফারাক হয়। অশ্বিনী শুধু দেখে সাহেবরা আর বাবুরা মুঠো মুঠো চা তুলে চোখের

সামনে খুঁটিয়ে দেখে আর গন্ধ শোঁকে আর বলে কী করতে হবে।

মাঠটা কোনাকুনি পার না হয়ে রাস্তা ধরে ওরা এগোচ্ছিল। স্ট্রীট লাইটগুলোর ছায়া পড়েছে রাস্তার জলে। দর্জি বলে, "বাগানবাবুর এক মেয়ের জন্য তুষারকে পাকড়েছিল, গুপ্ত তাই বাগানবাবুকে ঠুকে দিল, দারুণ দিয়েছে গুপ্ত।" অশ্বিনী যে তখন কথাটা ধরতে পারে নি তা এতক্ষণ পরেও দর্জির মনে আছে দেখে অশ্বিনী দর্জির দিকে ফিরে তাকায়।

বাইরে এসে বোঝা যায় বাগানটা নিঝুম। ফ্যাক্টরির শব্দ পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে। রাস্তার শেষে বড়বাবুর কোয়ার্টারে, বারান্দায়, ঘরে আলো জ্বলছে। একটা হেডলাইটের আলো পড়ল। তার পেছু পেছু একটা মোটর বেরিয়ে গেল।

বড়বাবুর কোয়ার্টারের সামনে বাঁয়ে বেঁকতেই বারান্দা থেকে বড়বাবু ডাকলেন, "ইনস্পেক্টর নাকি, একটু শুনে যাবেন।" অশ্বিনী দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা দুজন বাঁয়ে ফিরতে গুপ্ত বললো, "আমরা ক্লাব খুলে বসছি, আপনি আসুন।"

বড়বাবু অশ্বিনীকে বারান্দা থেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। অশ্বিনী ছাতাটা দরজার পাশে রাখতে গিয়ে ছাতার জল বারান্দাটা ভিজিয়ে দেবে দেখে সিঁড়ির পাশে থামটায় ছাতা রাখে।

দেয়ালে লাগানো একটা ছোট টেবিল। তার দু-পাশে দুটো চেয়ার। দরজার পাশেই। বড়বাবু আর অশ্বিনী বসে।

"আজ মনপুরান—রাঙতিতে যান নি?"

"না। পরশু-ই তো ঘুরে এলাম। দু-একদিন পর আবার যাব।"

"যাবার আগে বলবেন। ওদিকে তো গাড়িটাড়ি সবসময়ই যায়। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

"সে তো যখনই বলি তখনই পাচ্ছি।"

"না, না, সে আর কি। আপনার বাড়িঘরের খবর তো কিছু নিতেই পারছি না। এই পূজো পর্যন্ত বুঝলেন না, আমাদের মরবারও সময় নেই, দেখতেই তো পাচ্ছেন।"

"না, না, তাতে কি হয়েছে, দরকার হলে আমিই বলব।"

"চা খাবেন নাকি ?"

"না, এখন আর খাব না।"

"কোথায় যাচ্ছিলেন ? ক্লাবে ?"

"হ্যাঁ। কি আর করব। একটু তাসটাস খেলে বাড়ি ফিরব।"

"এখন তো ক্লাব বন্ধই থাকে। বৃষ্টিটা ছাড়লে দেখবেন ক্লাবে ভিড় হবে। পূজোর পর থেকে রাত্রিতে ব্যাডমিণ্টন খেলাটেলা হবে। তখন দেখবেন ভালো লাগবে।"

"এখনই বা খারাপ কি।"

"যে-বৃষ্টি, আপনি একেবারে এদিককার সবচেয়ে খারাপ সিজ্‌নে এসেছেন। অবিশ্যি চা-বাগানের তো আবার এটাই বেস্ট সিজ্‌ন।"

"সে তো বটেই।"

দুজনাই চুপ করে গেল। অশ্বিনী টেবিল-ক্লথটার ওপর একটু হাত চালায়। বড়বাবু একটু সামাজিকতা করতে ডেকেছিলেন।

"একদিন বাড়ির সবাইকে নিয়ে আসবেন আমাদের ওখানে।" অশ্বিনী ওঠার উপক্রম করে।

বড়বাবু উঠে পড়ে বলেন, "তার আগে আপনিই একদিন আসবেন, বৌমাদের নিয়ে।" অশ্বিনীর পেছু পেছু চৌকাঠ পেরিয়ে বড়বাবু বললেন, "আজ আপনার পুত্রকে আমার মেয়েরা ধরে এনেছিল।"

ছাতাটায় হাত দিয়ে অশ্বিনী বলে, "হ্যাঁ, শুনলাম। ওর সব সময় ফ্যাক্টরিতে আসার ঝোঁক।"

"আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেবেন। ছেলেপিলেদের সঙ্গে থাকবে। বাড়িতে একলা একলা কি-ই-বা করবে।"

"আচ্ছা" বলে অশ্বিনী ছাতাটা খুলে সিঁড়িতে পা দিতেই

"আচ্ছা" বলে বড়বাবু ভেতরে চলে যান। বারান্দার আলোটা নিবে যাওয়ায় অশ্বিনী থতমত খেয়ে পরের সিঁড়িটাতে একটা পা দিতেই পেছন থেকে বড়বাবু ডাকেন, "ইনস্পেক্টর"। অশ্বিনী মুখ ফিরিয়ে দেখে বড়বাবু, হাত বাড়িয়ে, "খামটা রাখুন। বাড়িতে গিয়ে দেখবেন। দেড় হাজার আছে।" বড়বাবু আবার পেছন ফিরে ভেতরে সম্পূর্ণ চলে যাওয়ার পর অশ্বিনী আর একটা পা-ও নিচের সিঁড়িতে নামায়। বড়বাবুর কোয়ার্টারের গেটটা পার হয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে, অশ্বিনী সোয়েটারের ভেতর জামার বুক পকেটে খামটা ঢোকাবে ভেবেও, প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে—পাছে দূরে এমপ্লয়িজ ক্লাবের খোলা দরজা দিয়ে রাস্তার আলোতে গুপ্ত-দর্জি কিছু দেখতে পায়।

অশ্বিনীর হঠাৎ সংশয় হয় বড়বাবু দেড় হাজার বললেন, না-কি দেড়শ'। পকেটে হাত ঢুকিয়ে খামটা কতটা মোটা পরীক্ষা করতে গিয়ে, একশ' টাকার, না-কি দশ টাকার নোট না দেখে কী করে বুঝবে ভেবে, হাত বের করে আনে। ঘুষের টাকা যে এমন অতর্কিতে আসে অশ্বিনী যেন সেটা বুঝে উঠতেই পারে না, এ চাকরিতে ঘুষ আছে এমন অজস্র ইঙ্গিত প্রথম থেকেই, এখানেও, আজও বিকেলে ফ্যাক্টরি বাবুর মুখে, শোনার পরও। এদের কোনো কাজ তো অশ্বিনীকে করে দিতে বলে নি। খাতাপত্র হিসেবনিকেশ তো অশ্বিনী খুব মিলিয়ে মিলিয়েই দেখেছে। টাকাটা অশ্বিনী কিসের জন্য পেল—এটাই অশ্বিনী বুঝে উঠতে পারে না।

এগার

ভাঁজ করা বড় সতরঞ্চিটা একটু খুলে দর্জি আর গুপ্ত বসে বসে তাস সাফ্‌ল করছিল। চার দিক অব্যবহারে নোংরা। এক এই সতরঞ্চিটাই পরিষ্কার। বারান্দায় ছাতা রেখে অশ্বিনী ঢুকতেই দর্জি বলে,"আমরা আবার ভাবলাম আপনাকে বোধহয় বুড়ো ছাড়লই না।"

"নাঃ। আজ খোকন দাজুর সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে এসেছিল। তখন বড়বাবুর বাড়ির ছেলেপিলেরা বোধহয় ওকে নিয়ে গিয়েছিল। তাই বলছিলেন আপনার কোনো খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে না, কোনো অসুবিধে…" কত অনায়াসে সে বলে যেতে পারছে যেন তার তারিফেই অশ্বিনী বাক্যটা শেষ করে না। তার খুব ইচ্ছে হয় একবার পেছন ফিরে দেখে বড়বাবুর বারান্দার আলোটা আবার জ্বলেছে কি না। কিন্তু ঘাড় ঘোরানোর কোনো ছুতো পায় না।

"এতই যখন দুশ্চিন্তা, নেমন্তন্ন করে খাওয়াক-দাওয়াক একদিন —গুপ্ত তাস বিলি করতে করতে বললো। তাস দেয়া হয়ে গেলেই ওরা হঠাৎ চুপ হয়ে যায়।

ওরা তিনতাস খেলছিল। এখানে আসার পর থেকে ক্লাব তো অশ্বিনী বন্ধই দেখেছে। দর্জি বা গুপ্ত বা তুষার বা আর কেউ প্রথম প্রথম তাকে ডেকে আনত। তখনই দেখত ক-জন মিলে যতক্ষণ পারা যায় তিনতাস খেলে উঠে যায়। অশ্বিনীও বসত। ধীরে ধীরে অশ্বিনীরও ভালো লেগে গেছে। বাগানে থাকলে সে সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে এসে তাস খেলে। প্রায় নিয়মিতই।

প্রথম কটা দান দর্জি হারল। "ইনস্পেক্টর ভালো করে সাফ্‌ল করুন।" অশ্বিনী হেসে বেশ কয়েকবার সাফ্‌ল করার পর তাসটা আবার গুপ্তের দিকে এগিয়ে দিল। বিলি হওয়ার পর তাস না ছুঁয়ে দর্জি হঠাৎ উঠে যায়। ফিরে এলে অশ্বিনী বলে, "কি, মন্ত্র পড়ে এলে নাকি?" দর্জি জবাব দেয় না। গম্ভীর হয়ে বসে পড়ে। গুপ্ত হারুক-জিতুক গুন্‌গুন্ গান গেয়ে যায়। অশ্বিনীর ঠোঁটে একটা অস্পষ্ট হাসি লেগেই থাকে।

পয়সাগুলো সবাই হাঁটুর তলে রাখে। সবাই-ই জানে এই বর্ষায় ক্লাবের দরজা খুলে কী খেলা চলতে পারে তবু পয়সাটা হাঁটুর তলে রেখে নিয়মটা বাঁচানো।

দর্জি একটা নোট দেয় "ভাঙিয়ে দিন তো।" নোটটা দেখে

পকেটে খামটার কথা মনে পড়ে যায়। নোটটা হাঁটুর তলেই রেখে দেয়। গুপ্ত তাস সাফ্‌ল করে অশ্বিনীর দিকে এগিয়ে দেয়। অশ্বিনী বিলি করে।

মাত্র তিনজন মিলে এক পয়সা আর দু-পয়সার এই খেলাটাতে অশ্বিনী মজা পায়। অন্যের হাতে কী আছে তার আন্দাজেরও কোনো উপায় নেই, নিজের হাতটাও ইচ্ছে করলে দেখা না যেতে পারে। শুধুমাত্র মনের জোর বা আন্দাজের জোর দিয়ে তারা জিতে নিতে চায়। অশ্বিনী ভাবে ইচ্ছা শক্তির জোর খাটানো যায় না? যে ইন্দ্রিয়গুলি সবসময় ব্যবহারে লাগে, সেগুলো যে এখানে কোনো কাজেই লাগে না, কিছু কল্পনা আর অনুমানের মতো অতীন্দ্রিয় শক্তিকে কাজে লাগাতে হয়—তিনতাসের রোমাঞ্চ অশ্বিনীর কাছে এখানেই। যেন মন-আন্দাজ-ইচ্ছাশক্তির মতো ভেতরের ব্যাপার গুলিকে ইন্দ্রিয়ের মতো ব্যবহার্য করে তোলা যায়।

"নাঃ, অনেক রাত হল, ওঠা যাক" গুপ্ত বলে। যে যার পয়সা পকেটে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। অশ্বিনী পকেট থেকে হাত বের করে না। মোটা খামটা ছুঁয়ে থাকে। গুপ্ত পা দিয়ে সতরঞ্চিটাকে গুটিয়ে দেয়। দর্জি আর অশ্বিনী বাইরে আসে। "আরে" বলে দর্জি একটু এগিয়ে ঝুঁকি দিয়ে আকাশের দিকে তাকায় "তারা বেরিয়ে গেছে" হাত বাড়িয়ে বলে "বৃষ্টি নেই।" ততক্ষণে দরজায় তালা এঁটে ফেলে গুপ্ত। তিনজন ছাতা নিয়ে মাঠে নামে। সারা আকাশ ভরা তারা। তিনজনই একবার চার পাশ ঘুরে ঘুরে দেখে। ক্লাব আর নতুন কোয়ার্টারটার মাঝখানে যেন খাদের ভেতর তারা।

"বাব্বা বিশ্বাসই হচ্ছে না, ছাতা খুলতে হচ্ছে না", গুপ্ত বলে।

"দেবে আরো দু-এক পশলা", দর্জি বলে। ওরা হেঁটে রাস্তায় পা দিতেই দর্জি তার ছাতাটা একবার ঘুরিয়ে বলে, "বুঝলেন ইনস্পেক্টর, আপনি তো নতুন এসেছেন, দেখবেন এবার বোনাস মুভমেন্ট কাকে বলে। সব বার-কে ছাড়িয়ে যাবে এবার।"

অশ্বিনী প্রশ্ন করে বসে—"কেন।"

"কেন, তা, আমি কি জানি। আমি একশ' পঁচিশটাকা মাইনের লেবার ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট। কি বলেন গুপ্তদা। গেল-বার আমার মাইনে বাড়াতে বলেছিলাম। ম্যানেজার শুনল না। বললাম একটা স্কেল দাও। তা-ও দিল না। এবার দেখবেন আমি কী করে মাইনে বাড়িয়ে নি। আমি জানি এখানে লাইনে লাইনে পার্টির লোক যাতায়াত করছে। এর মধ্যেই তো একটা মার্ডার হয়ে গেছে। পূজোর আগেই বোনাস মুভমেণ্ট করে এখানে ইউনিয়ন বানাবার তাল করছে। এই তো বর্ষা শেষ হচ্ছে। তারা বেরিয়ে গেছে। এখন শুরু হবে খেল্। এক আমাকে দেখিয়ে লেবারদের বোঝাবে তোমাদের লোক লেবার ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। উটি আর চলবে না।"

গুপ্ত একটু আলগা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বললো, "চলুন ইনস্পেক্টর, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"ঠিক আছে, নাইট"—দর্জি বাঁ দিকে ঘুরে যায়। গুপ্ত আর অশ্বিনী ডাইনে ঘুরে দক্ষিণ ঢালু দিয়ে নামতে থাকে।

"এই লোকটা বাগানে আসার পর থেকে সব শান্তি গেছে। কী যে লাগাবে কিছুই বলা যায় না। অবিশ্যি সব ফাঁকিও হতে পারে।"

"কেন?"

"আমার সামনে আপনাকে বললো। যাতে কথাটা বড়বাবু মারফত ম্যানেজারের কানে ওঠে। তাহলে হয়তো কিছু টাকা এমনিতে বাড়বে আর গোলমাল করতে হবে না। তবে ওর অসাধ্য কিছু নেই।"

"তাই বুঝি।"

আমাদের বাগানের মার্ডারটা তো ওরই ব্যাপার। অথচ কারো সাধ্য হল না ধরে। আসলে বাড়বাবুও ওকে হাতে রাখতে চায়। নইলে ধরুন না, আপনার কোয়ার্টারের ব্যাপার।"

"হুঁ" বলে অশ্বিনী চুপ করে যায়। হঠাৎ ফ্যাক্টরির শব্দ, প্রতিধ্বনিসহ কানে আসে। খাঁচায় পোরা বাঘের গর্জনের মতো। কিন্তু একটানা। শব্দটা যেন নিজের চার পাশে ঘোরে। গুপ্তের কোয়ার্টার আগে পড়ে। "আচ্ছা চলি। কাল দেখা হবে" বলে গুপ্ত চলে যাবার পর অশ্বিনী আবার পকেটে হাত দিয়ে খামটা দেখে বটে কিন্তু ভাবে না কোন্ কাজটুকুর জন্য টাকাটা তার পকেটে। আকাশে তারা দেখে রাত চেনা যাচ্ছে। গত দু-মাস দিন আর রাতের কোনো পার্থক্য ছিল না। সকাল-দুপুর-বিকেল ছিল ফ্যাক্টরির বাঁশিতে। পাহাড়ের মাথাগুলো জুড়ে কালো কালো মেঘের সার। বাড়িঘর, মানুষজন সব কিছু ভেজা। দরজায় টোকা দেবার আগে অশ্বিনী একবার পেছনে ফিরে আকাশটায় ঝকঝকে তারাগুলোকে দেখল। টাকাটার কথা আজ গোলাপকে বলব না ভাবার পর গোলাপ দরজা খুললে অশ্বিনী "দেখ কী রকম তারা উঠেছে" বলে তার পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকে। ঘুমন্ত চোখ কুঁচকে দেখে, ঘুম কাতুরে গলায় গোলাপ যখন "ওমা তাইতো" বলে —অশ্বিনী জামা কাপড় বদলানো শুরু করে। রেজগিগুলো বের করে প্যান্টটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দেয়।

গোলাপ তাড়াহুড়ো করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় লেগে যায়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে অশ্বিনী আর গোলাপের জন্য অপেক্ষা করে না—আগেভাগে গিয়ে লেপের তলায় সেঁধিয়ে যায়। গোলাপ এতক্ষণ শুয়ে ছিল বলে লেপ আর বিছানা দুটোই গরম।

এঁটো সেরে, দরজা দুটো ছিটকিনি লাগিয়ে আলো নিবিয়ে গোপাল খাটে পা দিতেই লেপের ভেতর থেকে মুখ বের করে অশ্বিনী বলে, "আমার প্যান্টের পকেটে একটা খাম আছে, ওটা ট্রাঙ্কে তুলে রাখো তো।" গোলাপ পা-টা নামালে বলে, "লাইট জ্বালিয়ো না, টর্চ নাও।"

চোখ বুজেই অশ্বিনী শব্দগুলো শুনতে আর আলোর আভাস

দেখতে পায়। ট্রাঙ্কটা খাটের তলা থেকে টেনে বের করল। চাবি লাগাল। ডালা খুললো।. খামটা খুলে গোলাপ দেখছে। দেখছে। দেখছে। এখনো বন্ধ করছে না কেন। শুনছে? না। দেখছে। টর্চের আলো শুধু নোটগুলোর ওপর। দেখছে। হঠাৎ ডালা বন্ধ করার, চাবি ঘোরাবার, ঠেলে দেবার শব্দ। অশ্বিনী নোটগুলো দেখে নি।

গোলাপ খুব আস্তে করে খাটে ওঠে। টর্চ জ্বালিয়ে একবার খোকনকে দেখে। লেপটা ঠিক করে দেয়। টর্চটা নিবিয়ে বালিশের পাশে রেখে অশ্বিনীর লেপের ভেতরে ঢুকে যায়। পেছন থেকে অশ্বিনীকে হাত পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে। তারপর জোর করে তার দিকে ঘোরাতে চায়। অশ্বিনী চুপ করে থাকে। গোলাপ অশ্বিনীর তলপেটে হাত দিয়ে টানলে ঘুরতে ঘুরতে অশ্বিনী বলে, "আবার? এ বেলাতেও?"

অশ্বিনীর মনে পড়ে যায়—কাল গোলাপকে সবচেয়ে ভালো ব্রেসিয়ার এক ডজন কিনে দিতে হবে, বুকটা যাতে ভালো দেখায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এত ঝকঝকে তকতকে রোদ দেখে মনেও হয় না মাত্র কয়েকদিন আগেও বর্ষা ছিল। চার পাশের গাছ-গাছালি থেকে রোদ যেন ছিটকে পড়ছে। পায়ের তলার ঘাস থেকে রোদ পিছলে যায়। চার দিকের পাহাড়ের গা থেকে সব ধূসরতা যেন রোদ একটু একটু করে ধুয়ে দিচ্ছে। রোজ সকালে ফ্যাক্টরির পেছনে দাঁড়িয়ে মাঝ-খানের খাদের ওপর দিয়ে পুবে তাকালে ওপারের পাহাড়টার মাথাটা আগের দিনের চাইতে বেশি স্পষ্ট দেখায় যেন। আড়াই মাসের বৃষ্টিতে গাছের পাতা, ঘাস, ফ্যাক্টরি বা কোয়ার্টারগুলির টিনের চাল থেকে যেন সব ময়লা ধুয়ে গেছে। ঝকঝক করছে সব দিক। প্রথম প্রথম রোদের দিকে তাকালে অশ্বিনীর চোখ জ্বালা করত। এখন আর করে না। বরং ইচ্ছে করে চার পাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে। ফ্যাক্টরি থেকে বেরবার সময় তার চোখ আটকে যায় বড়বাবুর বাড়ির পেছনে নতুন কোয়ার্টারটির পেছনে খাদের ভেতর থেকে সটান পাইন গাছে। এতদিন তার নজরেই পড়ে নি ওখানে এ-রকম একটা গাছ ছিল। কোনো সময় ঘরের ভেতরে থাকতেই ইচ্ছে করে না। মাথা নামিয়ে কাজ করে গেলেও বোঝা যায় চোখ তুলতেই মাঠ ভরা রোদ। রোদের সঙ্গে সঙ্গে যেন চোখ মেলবার সীমানাটাও অনেক বেড়ে গেছে। এখন আর সামনাসামনি কোনো কিছুর ওপর নজর পড়ে না, অনেক দূর তাকানো যায়, অনেক দূর পর্যন্ত দেখাও যায়।

বাগানে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কাজ পুরোদমে চলছে। পূজোর আগে পর্যন্ত নাকি দম ফেলবার ফুরসত মিলবে না কারো।'

তারপরও চলবে। তবে অনেক ধীরে ধীরে। অশ্বিনীকেও খুব খাটতে হচ্ছে। প্লেনভিউয়ের বড় বড় ডেসপ্যাচ তো আছেই। কোনো কোনোদিন সকালে মনপুরান, দুপুরে রাঙতি করে আবার রাত্রিতে প্লেনভিউয়ে কাজ সেরে পরদিন সকালেই সানিভ্যালি যেতে হয়েছে।

অশ্বিনী বুঝতে পারে নি বর্ষা শেষ হয়ে রোদ উঠলে কাজের গতিটা আপনা থেকে বেড়ে গেছে, ছন্দটা বদলে গেছে। এতদিন যেটা ছিল মাথা গুঁজে চোখ না তুলে কাজ করার ব্যাপার, এখন সেটা দাঁড়িয়েছে, মাথা তুলে চোখ খুলে চার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে কাজ করা আর করানো।

চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর চার বাগানে ছুটোছুটিতে অশ্বিনী ক্লান্ত তো বোধ করেই না, যেন এই ছুটোছুটিতে তার পেশীগুলো মুক্তি পায়। পেশীর মুক্তি বলে অশ্বিনী হয়তো সেটাকে বুঝতে পারে না, কিন্তু কাজ করতে যে তার ক্লান্তি লাগছে না, অনিচ্ছা বোধ হচ্ছে না— সেটুকু তো বুঝতে পারে। শরীরের মতো এমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটা ব্যাপার অশ্বিনীর বোঝার বাইরে থেকে গিয়ে মনটাকে সামনে এনে নেয়। অশ্বিনী নিজের মনটাকে দেখতে পায়। চার পাশের রোদ বা রাতে আকাশ-পাতাল ভরা তারা দেখে তার যে দার্জিলিঙে ছুটতে ইচ্ছে করে সেটাও যেন মনেরই ব্যাপার। কিন্তু কাজের এত চাপ যে, অশ্বিনী মনের ব্যাপারটাকে বুঝতে পারলেও, পাত্তা দিতে পারে না।

দার্জিলিঙে যাওয়ার কথা গোলাপও ক-দিন ধরে বলছিল। বাগানের জিপ যাবে শুনে অশ্বিনী সেদিন যাবে ঠিক করে ফেলে। বড়বাবুর বদান্যতায় এই সুবিধেটুকু অশ্বিনী পেয়েছে।

দার্জিলিঙে ঢুকতে দেখে লোকজন গমগম করছে, যেন কারো কোনো কাজ নেই, সবাই-ই বেড়াচ্ছে। একেবারে গোবিন্দবাবুর বাড়ির সামনে জিপটা গিয়ে দাঁড়াল। হৈ হৈ করে নামলেও টগররা

আগে টের পায় নি। সিঁড়ি ভেঙে আগে ছুটল খোকন। খোকনের ছোট ছোট হাতের ঠোকায় ভেতর থেকে টগর দরজা খুলে দেয়—তখনো গোলাপ-অশ্বিনী সিঁড়ি ভাঙছে। খোকনকে কোলে নিয়ে টগর চৌকাঠ পেরিয়ে চেঁচায়—"বেণু দেখে যা, কারা এসেছে।" ইস্কুলে যাবার পোশাকে লুস্থু এসে দরজায় দাঁড়ায়, পাশে বেবি। লুস্থুর মাথায় লাল রিবন, কোমরে লাল বেল্ট। অশ্বিনী বলে, "এত ডাকাডাকি করে দেখাবার কি আছে, আমরা কি বাঘ-ভালুক নাকি?"

"বাঘ-ভালুকই তো! বা-বা, আমরা ভাবলাম এদ্দিনে একটা জামাই জুটল—একটু বেড়ানো যাবে। সেই ভয়ে জামাই একেবারে বেপাত্তা।"

ঘরে গিয়ে দাঁড়াবার পর গোলাপ বলে, "যে-বৃষ্টি যে-বৃষ্টি। এর মধ্যে মানুষ বেরতে পারে নাকি?"

বেণু দরজা থেকে বলে, "কি গোলাপদি, যাবে নাকি আমার সঙ্গে, লুস্থুকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে বেণুর চুল পাট করে আঁচড়ানো, চাদর জড়িয়ে নিয়েছে। সে বলে বসে, "আপনি বসুন না, আমি লুস্থুকে দিয়ে আসি।" শুনে লুস্থু বেণুকে জড়িয়ে মুখ লুকোয়। হাত দিয়ে তাকে টেনে এনে বেণু বলে, "বাঙাল মানুষ, শেষে পথটথ হারিয়ে ফেলবেন, চল্‌, লুস্থু"—বেণু দরজা ডিঙিয়ে গোলাপকে বলে একটু বসো গোলাপদি, আমি এখুনি আসব—"

"অশ্বিনী একটা চেয়ারে বসে বলে, "গোবিন্দদা তো ব্যাঙ্কে?"

"সে আর বলতে, তোমরা চা খাবে তো?"

"আপনি বসুন, আর অত ভদ্রতা করতে হবে না"। তারপর অশ্বিনী গোপালকে বলে, "তুমি গেলেই পারতে ওঁর সঙ্গে, জিনিসপত্র কিনে ফেলতে পারতে—"

"তোমরা কি বাজার করতে দার্জিলিঙ এসেছ?"

"আর বোলো না দিদি, এখান থেকে তো গিয়ে উঠলাম ঘোর বর্ষায়, একটা জিনিস গোছাতে পেরেছি? অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম দার্জিলিঙ এসে কটা টুকিটাকি জিনিস কিনে নিয়ে যাব। তো যে বর্ষা, ওরও কাজের যা চাপ, তো কোনো রকমে আজ আসতে পারলাম।"

"তোরা কি আজই ফিরে যাবি নাকি আবার?"

গোলাপকে ঠেকিয়ে অশ্বিনী জবাব দেয়, "সে দেখা যাবেখন পরে। বাগানের গাড়ি বিকেলে একবার আসবে, তখন ঠিক করলেই হবে।"

"দার্জিলিঙের সিজন্ শুরু হয়ে গেল। সপ্তা খানেক আগে বোধহয় প্রথম ট্যুরিস্ট ট্রেনটা এলো। আজ নাকি তিন গাড়ি এসেছে।"

"হ্যাঁ, ঢুকতেই তো দেখলাম লোকজনের ভিড়। তোমরা তা-ও তো লোকজনের মুখ দেখতে পাও, আমরা একেবারে পাহাড়ে বন্দী। এদ্দিন তো ঘর থেকেই বেরতে পারতাম না, এখন অন্তত সেটুকু পারি।"

"রোদ উঠলেই সব কেমন বদলে যায় এখানে, তবে এবার বর্ষাটাও একটু লম্বা যেন"—টগর।

টগর গলায় চিবুকে হাত দেয়, গলাটা একটু তোলে, শুধু দুটো আঙুলে হাত বোলায়। কেমন করে যেন অশ্বিনীর নজরে পড়ে গেছে—ওটা টগরের একটা অভ্যেস। এটাও অশ্বিনী কেমন করে কখন একসময় বুঝে গেছে—টগর যখন কিছু করার পায় না বা একটু অস্থির হয়, তখনই তার আঙুল দুটো চিবুক বেয়ে গলায় নেমে যায়।

অশ্বিনী বলে—"তাহলে চলুন না টগরদি, আমরাও একটু ঘুরে আসি।"

"কি? বাজারে? সে যাওয়া যাবেখন। অশ্বিনী, তোমার চাকরি লাগছে কেমন?" টগর তারপরই খোকনের দিকে তাকিয়ে বলে, "এসো, খোকন, আমার কাছে।" খোকন আর বেবি ভেতরের ঘরে ঢুকেছিল। বেবির একটা দোল-খাওয়া পুতুল নিয়ে খোকন এ-ঘরে

আসতেই পেছনে পেছনে বেবি এসে বলে, "না, ওটা আমি দেব না।" খোকন দুই হাতে পুতুলটা বুকের কাছে ধরে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে টগরের কাছে চলে যায়। টগর খোকনকে কোলে টেনে বলে, "তোমার তো আরো অনেক আছে বেবি, ভাইকে এটা দিতে হয়।" টগরের কোলের ভেতর আরো নিরাপদ হতে খোকন ঘুরে যায় পুতুলটাকে তার আর টগরের শরীরের মাঝখানে রেখে। ঘাড় ঘুরিয়ে খোকন বেবির দিকে তাকাতেই বেবি কেঁদে ফেলে। অশ্বিনী একবার খোকনের দিকে, একবার বেবির দিকে তাকায়, কিছু বলে না। গোলাপ বলে ওঠে, "নিক ওটা খোকন, আমি তোমাকে কত খেলনা কিনে দেব, এসো আমার কাছে।" গোলাপ উঠে বেবিকে কোলে তুলে নিতে গেলে বেবি হাত পা ছুঁড়ে আরো জোরে কান্না শুরু করে। টগর অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, "তোমার কোয়ার্টারটা কেমন।" প্রশ্নটা শুনেও অশ্বিনী পাশে গোলাপ আর বেবির দিকে তাকায়, তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ না বেবিকে চেপে ধরে গোলাপ ভেতরের ঘরের দিকে চলে যায়। গোলাপের নুয়োনো পিঠটা সোজা হয়ে গেছে। দেখতে-দেখতে অশ্বিনী ভাবে টগর আগের প্রশ্নটার জবাব পাওয়ার আগেই আর একটা প্রশ্ন করেছে—কোনো উত্তর কি সে চায়। টগর খোকনের হাতের পুতুলটা ধরে আছে, চেয়ারে তার পিঠ হেলানো, দৃষ্টি অশ্বিনীর পাশ দিয়ে। হঠাৎ করে অশ্বিনীর মনে হতে পারতো তাদের এই আসাযাওয়াটায় টগরের যেন কোনো আগ্রহ নেই। সেটা টের পেয়ে যেন টগর হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে ওঠে, "তোমারা তো স্নানটান করবে?"

"না, না, আমরা স্নানটান করেই বেরিয়েছি।"

টগর আবার এলিয়ে যায়। খোকন আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরের ঘরে বেবি-গোলাপকে দেখার চেষ্টা করছে। টগরের হাতটা খুব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে খোকনের কাঁধে। টগর বলে, "এত সকালে তোমরা স্নান করে বেরলে কি করে?" এই কথাটি

যদি একটুখানি আগে টগর বলত তাহলে অশ্বিনীর মনে এই সংশয়টুকু জাগতো না যে টগর কথা হাতড়ায়। ভেতর থেকে গোলাপ বলে, "বা-বা দিদি, এতো আরাম! স্নান সেরে গাড়িতে চড়লাম, দার্জিলিঙ। আর রোজ যে একহাতে ছেলে সামলাতে হয়, ওঁর তো কোন্‌দিন কখন নাওয়া-খাওয়া কিছু ঠিক নেই, রান্নাবান্না, বাসন-কোসন সব একহাতে।"

"কেন, কাজের লোক পাও নি", টগর অশ্বিনীকে শুধোয়।

অশ্বিনী হেসে বলে, "ওকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"কি রে কাজের লোক পাস নি?"

"সে আছে একজন, থাকাও যা, না-থাকাও তাই।"

অশ্বিনী মুখ টিপে হেসে টগরকে বলে, "জিজ্ঞাসা করুন তো ঠিকে, না সারাদিনের?

"কি রে, ঠিকে, না সারাদিনের?"

"সারাদিনের-ই, তবে, সে তো খোকনকে ধরলেই হল, আর কোনো কাজে হাত দেবে না।"

খোকন টগরের কোলের ভেতর থেকে বেরিয়ে ভেতরের ঘরের দিকে যায়। "তাহলে এক হাত কেন, চার হাত বল"—টগরের কথা শুনে অশ্বিনী শব্দ তুলে হাসে।

টগরের আঙুল চিবুকে। এখানে বেড়াতে আসামাত্র হৈ হৈ পড়ে যাবে—এমনি যেন একটা আশা কোথাও ছিল। কিন্তু অশ্বিনী বুঝে উঠতে পারে না টগর যে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না সেটা কি তার স্বভাবেরই অঙ্গ, না-কি অন্য কিছু।

গোলাপকে দেখতে পায় না। অশ্বিনী ভাবে গোলাপ কি কিছু বোধ করছে। নাকি অশ্বিনী একাই। তবে অশ্বিনীর মনে এমন একটা কল্পনা জুটে গিয়েছে কখন যে দার্জিলিঙে এলে হৈ হৈ হবে। টগরকে কি নিজেকে স্বস্তি দিতে অশ্বিনী বলে, "বরং একটু চা খাওয়া যাক। আপনি বসুন না, ও বানাক।"

"কেন ও বানাবে কেন, এখানেও খাটাবে", উঠতে উঠতে টগর উচ্চ কণ্ঠে বললো, "গোলাপ তুই চা খাবি তো ?"

"কেন, এই না বললে চা খাবে না—" ভেতরের ঘর থেকে গোলাপ।

"কি করব আর, চা-ই চলুক।"

দুই

শব্দ শুনে অশ্বিনা গিয়ে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢোকার আগেই বেণু বলে ওঠে, "এঃ, আপনারা এখনো ঘরে বসে আছেন, দেখুন গিয়ে, সারা দার্জিলিং পথে, সবাই একেবারে গাদাগাদি করে রাস্তায় হাঁটছে. আমি তো ভাবলাম, আপনারা বেরিয়ে পড়েছেন" সিঁড়ি ভেঙে আসার পর একসঙ্গে এত কথা বলে হাঁফিয়ে পড়ায় বেণুর মুখটা উদ্ভাসিত দেখায়। সে যেন বাইরের রোদ আর পথটা ঘরের ভেতর ছড়িয়ে দিল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে টগর বলে ওঠে, "চলো অশ্বিনী, একটা কাজ করি, আমরা এখন বেরই, রাস্তায় কোথাও খেয়েটেয়ে নেয়া যাবে, একেবারে বিকেল বা সন্ধ্যার পর ফিরব।"

"বাঃ! লুম্বু ইস্কুল থেকে, দাদা অফিস থেকে ফিরবে না ?"

দরজা থেকে টগর বলে ওঠে, "একজন সে-সময় চলে এলেই হবে।"

অশ্বিনী উঠে পড়ে "আর কোনো কথা নেই, ফার্স্ট ক্লাশ প্রোগ্রাম, চলুন, চলুন সব।"

টগর ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলে, "কিরে গোলাপ ?"

"তোমরা যা করবে, তা-ই হবে, এই দেখ, তোমার পুত্রের কাণ্ড।" গোলাপ টগরের হাতে ধরা পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরের ঘর থেকে অশ্বিনীকে বলে, "আমি বেবিকে পুতুল কিনে দেব শুনে পুতুল ফিরিয়ে দিয়ে বলছে ওকে কিনে দিতে হবে।"

"পুতুল-টুতুল সব হবে, এখন চল।"

"আরে এতো আচ্ছা লোক, যাবো বললেই যাওয়া নাকি? আপনি বসুন, আমরা ঠিকঠাক হয়ে বেরচ্ছি।" বেণু ভেতরে ঢুকে যায়। টগরের গলা শোনা যায়, "অশ্বিনী বোসো, তোমার চা দিচ্ছি।"

"চা আর লাগবে না, এখন তাড়াতাড়ি বেরন, সব বাইরে হবে।"

বেণু-টগরের মিলিত হাসি শুনে অশ্বিনীও আপন মনে মুচকে হেসে ফেলে। বড়বাবুর দেওয়া টাকাটা সে ভাঙে নি। সঙ্গে নিয়ে এসেছে। গোলাপের কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে। সেটা বড় কথা নয়। এমনিতেও কিনতে হতো। কিন্তু অতগুলো টাকা পকেটে থাকার ফলেই কি অশ্বিনীর মনে হয়েছিল যে দার্জিলিঙে এলে খুব ফূর্তি করে ঘুরে বেড়ানো যাবে। নাকি এতদিন একটানা কাজের পর এমন হঠাৎ পাওয়া ছুটিতে একটু খুশি হতে চাওয়ার ইচ্ছেটাই অশ্বিনীর ভেতর কাজ করেছে।

বেণু এসে বলে, "জামাই, উঠুন খেয়ে নেবেন।"

চেয়ারের ভেতরই ঘুরে অশ্বিনী বলে, "মানে, এইমাত্র বললেন এখুনি বেরবেন, বাইরে খাওয়াদাওয়া হবে, আর এখন খেতে বলছেন, টগরদি।" অশ্বিনী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। টগর ভেতর থেকে বলে, "ভেবেছিলাম তো তাই, কিন্তু বেণু বললো, তাহলে আর বেড়ান হবে না, বেরিয়েই খেতে হবে, সঙ্গে তো বেবি খোকনও আছে। খেয়ে-দেয়েই বেরনো যাক।"

বেণু হেসে ওঠে, "কেমন মজা, টগরদির কাছে নালিশ করে কোনো লাভ হল? এ-বাড়ির ম্যানেজার হচ্ছি আমি, বুঝলেন, টগরদি-টগরদি করে কোনো লাভ হবে না,—আসুন।"

বেণুকে অনুসরণ করার সময় অশ্বিনীর খেয়াল হয় আসলে সমস্তটা বেণুরই প্রোগ্রাম। কিন্তু খাওয়ার টেবিলে বসতে বসতে টগরের দিকে তাকিয়ে দেখে সে তাড়াতাড়ি ডিস-গেলাস দিচ্ছে। টগরও বুঝি অশ্বিনীর মতোই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, বেরতে। টগর বলে, "আর

রান্না করলাম না, বাচ্চাদের যা-হোক পেট ভরিয়ে খাওয়াও, আমরা দু-মুঠ দু-মুঠ খেয়ে চল, পরে খিদে পেলে দেখা যাবে।" গোলাপ বসতে বসতে বলে, "খেয়েদেয়ে আবার বেড়াতে যাব কি করে, ঘুম পাবে তো?"

"সর্বনাশ করেছে! সিজন্ টাইমে দার্জিলিঙে এসে, না বেড়িয়ে ঘুমোবে?" বেণু বলে, "বেরোও তো, দেখবে ঘুম পালাবে।"

অশ্বিনী দেখে তাকে জলের গ্লাস দেওয়া হয় নি। টেবিলের ওপর থেকে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে উঠে সে কল খুলে জল ভরতে শুরু করলে বেণু-টগর একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, "এই সেরেছে, জামাই গিয়ে জল ভরছে।"

"ধ্যুত্তোরি জামাই, এরা এ-সব করতে করতেই দেরি হয়ে যাচ্ছে, আর বেড়াতে যাওয়া হবে কখন?" অশ্বিনী চেয়ারে ভালো করে না বসেই ভাত মাখতে শুরু করে দেয়। টেবিলে তার বিপরীত দিকে বসে বেণু বেবিকে খাওয়াচ্ছে, তার পাশেই খোকনকে গোলাপ। অশ্বিনীর ডানদিকে বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে টগর সবাইকে ভাত তরকারি দিচ্ছে।

"এত তাড়া তো বসে বসে গল্প করছিলেন কেন, বেরুলেই পারতেন", বেণু বেবির মুখে একদলা ভাত ঢুকোতে ঢুকোতে বলে, "এখন উঠলো বাই তো কটক যাই করলে হবে না।"

"টগরদি আপনি খেয়ে নিন না, ওঁরা তারপর খেয়ে নেবেন।" অশ্বিনী টগরের দিকে মুখ তোলে।

বেণু তাড়াতাড়ি ভাতের দলা পাকিয়ে, একটা মাছের কাঁটা বেছে, ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে বেবির মুখে তুলতে তুলতে বলে, "এই সেরেছে, এখন তো জামাই আর শ্যালিকা আমাদের ফেলে বেরিয়ে যাবে দেখছি। জামাই-ও তো বৌদির মতোই।" বেণু টগরের দিকে মুখ ফেরালে টগর হেসে ফেলে। অশ্বিনী বোঝে টগরের স্বভাবের এমন একটা দিক নিয়ে বেণু কথা বলেছে যা তার কাছে এখনো স্পষ্ট নয়।

গোলাপের দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী বলে, "তুমি খোকনকে খাওয়াতে খাওয়াতে নিজে খেয়ে নাও না।"

"হ্যাঁ, সেই তো ভালো" টগর দু-হাতা ভাত গোলাপের ডিসে তুলে দেয়।

"বেশ তাই ভালো, খোকনের খাওয়া অবিশ্যি হয়েই গেছে" বলে গোলাপ ডালের হাতাটায় হাত দিতে টগর ডাল ঢেলে দেয়।

"আমার ভাতটা ঐ ডিসে দিয়ে তুমি খেতে শুরু করো বৌদি।" বেণু মাছের কাঁটা বাছে।

বেণুর জন্য একটা ডিসে দু-হাতা ভাত রেখে আর দু-হাতা দিয়ে ডালের পাত্রটাতে টগর দু-হাতা ভাত নিয়ে মাখতে শুরু করলে, গোলাপ ভাত মুখে তাকিয়ে বলে, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবে নাকি, বসে বসে খাও"—টগর বসে পড়েই মুখে ভাত গোঁজে। অশ্বিনীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে দাঁড়িয়ে উঠে ঢকঢক করে জল খেয়ে ডিস আর গেলাসটা তুলতেই টগর ঝুঁকে পড়ে বাঁ হাত দিয়ে তার সোয়েটারটা চেপে ধরে। টগরের মুখভর্তি ভাত। উঁ উঁ করা ছাড়া কথা বলতে পারে না। অশ্বিনী বলে, "আরে আমি ধোব না, রেখে দিচ্ছি কলতলায়।" টগর একটা ঢোক গিলতে পেরে বলে, "উঁ হুঁ, রাখো।"

বেণু বেবিকে নিয়ে কলতলায় গিয়ে মুখ ধুইয়ে-মুছিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে ফিরে এসে একটা আধাভাঙা মাছ আর মাখা ভাত টগরের সামনে দিয়ে বলে, "খেয়ে নাও।" তারপর হাত ধুয়ে নিজের ডিসটি টেনে নেয়।

মুখ ধুয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অশ্বিনী ছড়ানো ছিটানো জিনিসে ভরা টেবিলটা লক্ষ্য করে বাইরের ঘরে চলে যায়। বেণু সবার সঙ্গে এক টেবিলে বসেই খাচ্ছে, সেদ্ধ চালের ভাত একই পাত্র থেকে তুলে নিয়ে—শুধু মাছটা খায় না বেণু, মাছ দিয়ে ভাত মাখা হাত ধুয়ে নেয়।

অশ্বিনী-গোলাপের সঙ্গে টগর-বেণু-র সম্পর্কের ভেতর যে একটা আনুষ্ঠানিকতা থেকেই যাচ্ছিল, বেড়াতে যাওয়ার হৈ হৈ-এ খাওয়ার টেবিলে হঠাৎ সেটা ভেঙে গিয়েছে যেন। রান্নাবান্না হয়ে যাওয়ার পর অশ্বিনীরা আসা সত্ত্বেও নতুন রান্না না-চড়িয়ে যা আছে তা-ই ভাগ করে খেয়ে সবাইয়ের বেরিয়ে পড়াটায় তারা সবাইয়ের কাছাকাছি এসে যায়। খোকন যদি টগরের হাতে খেত তাহলেও একটু আনুষ্ঠানিকতা থেকে যেত। সেটুকুও নেই। নিজের হাতে জল ভরে নেবার ঘটনাটায় অশ্বিনীও যেন একটা ধাক্কা দিয়েছে।

তিন

পথে বেরিয়েই গোলাপ বলে, "বাবা, খেয়ে-দেয়ে কি হাঁটতে ভালো লাগে। একটু ঘুমিয়ে-টুমিয়ে বিকেলে বেরলেই হত?"

"এই এত লোক সব কি না খেয়ে বেরিয়েছে", অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে। সারা পথ ভর্তি লোক। অশ্বিনী রঙের বাহার দেখছিল—কত রঙের পোশাক পরে কতজন ঘুরছে। তার নজর এড়ায় না বেবির তুলনায় খোকনের পোশাকটা কত মলিন দেখাচ্ছে। খোকনের কয়েকটা নতুন পোশাক কিনতে হবে। হন হন করে নিচে নামতে নামতে অশ্বিনী মনে মনে একটা হিসেব কষে কি কি জিনিস তাকে কিনতে হবে। একটা খাওয়ার টেবিল, গোটা কয়েক চেয়ার, ডিস ইত্যাদি, খোকনের পোশাক, গোলাপের কিছু। কেনাকাটার ব্যাপারটা কার সঙ্গে একটু আলাপ করা যায় ভাবতে ভাবতে অশ্বিনী দেখে তারা সিঁড়ি ভেঙে নামছে। নিচে বাজার দেখা যাচ্ছে। বাঁধানো আঙিনাতে নানা রঙের নানা সওদা দেখা যায়। বিপরীত দিকে তরকারির বাজারে ছোট ছোট থুপরি। চার পাশে মানুষজন। সবার গতি খুব শ্লথ। আসলে এই শ্লথ ভঙ্গিটার সঙ্গেই অশ্বিনী পরিচিত নয়।

বাজারে নেমেই গোলাপ বলে ওঠে, "ঈস, কী সুন্দর, আমাকে একটা টি-সেট কিনতে হবে। দিদি, দাও তো পছন্দ করে।"

"এখুনি কিনবি ? চল।" গোলাপকে নিয়ে টগর পা বাড়ালে দুই হাতে খোকন আর বেবিকে ধরে রেখে বেণু বলে, "এখন কি এই কেনাকাটি চলবে নাকি, তাহলে বেরনো কেন বাবা, গোলাপদি এখন চলো, পরে আমি সব কিনে দেব, এখন চলো একটু ঘুরে আসি।"

"সেই ভালো। বেণু এসব খুব ভালো বোঝে। তা কোথায় যাওয়া হবে ?" টগর মাঝখানে বেণু-র ওপর দিয়ে পেছনে অশ্বিনীকে প্রশ্ন করে। অশ্বিনী দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা দেখছিল। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে বললো, "আপনাদের ফটো তুলছে।"

অশ্বিনীর দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই দেখল রাস্তার বিপরীত কোণায় দাঁড়িয়ে এক সাহেব মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলছে। গোলাপ মুভি ক্যামেরা চেনে না। সে জিজ্ঞেস করে বসে, "ওটা আবার কি রকম ছবি তোলা ?"

"সিনেমা তোলা হচ্ছে", অশ্বিনী জবাব দেয়। সিনেমা শুনেই খোকন বেণুর হাত ছাড়িয়ে অশ্বিনীর কাছে এসে তার হাত ধরে টানাটানি করতে করতে বলে, "বাবা সিনেমা কোথায়, বাবা ?"

অশ্বিনী বলে, "সিনেমা নয়, তোমার ছবি তুলছে, তাহলে কোথায় যাওয়া হবে ?"

বেণু বলে, "চলুন না বোটানিকসে যাই, যা সুন্দর রোদ্দুর।" টগরও বলে, হ্যাঁ, তাই চল, ভালো হবে।" ওরা হাঁটা শুরু করতে খোকন অশ্বিনীর হাত ধরে টানতে টানতে বলে, "বাবা, তুমি যে বললে, সিনেমা, সিনেমা কোথায় ?" অশ্বিনী বলে, "সিনেমায় যে-রকম ছবি তোলে, সে-রকম ছবি তুলছিল, সিনেমা নয়, তুমি যাও বেবির সঙ্গে।"

কথাটা শুনতে পেয়ে বেণু পেছন ফিরে খোকনকে ডাকে,

"এসো।" খোকন যায় না। বেণু আর অশ্বিনী খোকন আর বেবিকে নিয়ে আগে আগে হাঁটতে থাকে। গোলাপ টগর পেছিয়ে পড়ে।

বেণু বলে, "দার্জিলিঙে এলে এইটি বড় খারাপ অভ্যেস হয়ে যায়, এই বেড়ানো, দু-মিনিট ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না।"

"আমার অবিশ্যি বেড়ানো হয়-ই নি বলতে গেলে, পৌঁছনোর পরই চাকরি আর সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা।"

"বর্ষার সময়টা ভারি বিচ্ছিরি। তবে প্লেন্‌স থেকে অনেক ভালো। বৃষ্টিটা একটু বেশি, আর যখন-তখন এই যা, আর রোদের মুখ দেখা যায় না দুই মাস-আড়াই মাস, কিন্তু প্লেন্‌সের মতো কাদা প্যাঁচপ্যাঁচ তো আর নয়, আর কথায় কথায় জলও দাঁড়ায় না, বলুন?"

"শুনেছি ধস-টস নামলে খুব সাংঘাতিক হয়।"

"সে তো অ্যাক্সিডেণ্টের ব্যাপার, সব জায়গাতেই হতে পারে।"

"তার মানে আপনি দার্জিলিঙের বিপক্ষে একটা কথাও সইবেন না।"

বেণু হেসে ফেলে, "আসলে কি জানেন, দার্জিলিঙটা ভালো লেগে যায়। দেখবেন।"

"হ্যাঁ, আমি তো সবে এসেছি। দেখি। খারাপ তো লাগছে না।"

"আমিও তো বেশিদিন আসি নি, মাত্র বছর দুই, তা-ও প্রথম প্রথম তো আসতাম যেতাম। এখন মনেই হয় না দাদা এখানে ছিলেন বলেই এসেছি। যেন আমরা পছন্দ করেই এসেছি।"

"গোবিন্দদা বদলি হয়ে গেলে।"

"ভাবতেই পারছি না।"

ওরা নামছিল। পথটা বেশ ঢালু। যারা ওপরে উঠে আসছে তারা খুব ধীরে ধীরে হাঁটছে, যেন জিরিয়ে। যারা নিচে নামছে তারা একেবারে তরতরিয়ে এগোচ্ছে—যেন পেছন থেকে কেউ ঠেলা দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে। যারা উঠছে তাদের এত বেশি জোর খাটাতে হয় আর যারা নামছে তাদের গতি এত অনায়াস যে রাস্তার ভিড়ের

ভেতরও কোনো ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে আবার কেউ রেলিঙ ধরে অকারণে একদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ একটা পাথরের চাঙড়ের ওপর মিছিমিছি বসে, মাঝে মধ্যে দু-একটা গাড়ি উঠছে বা নামছে বটে কিন্তু তাতে চার পাশে কোনো ব্যস্ততা জাগছে না। দু-একটা ঘোড়া সওয়ারি নিয়ে উঠে যায়,নেমে যায়।

এত লোকজন অথচ কোনো ব্যস্ততা নেই, সমবেত ছুটি যেন, যে যার খুশি মতো ঘুরছে-ফিরছে—দূরে খাদ পেরিয়ে নীলসাদা মেলানো পাহাড়ের মাথা, হাসি, গান, হঠাৎ মোটরের এঞ্জিনের আওয়াজ বা কোনো গোপন ঝর্ণার বা হয়তো পাইন বনে বাতাসের। নিজের খুশির এমন স্বাধীনতা অশ্বিনীর অভিজ্ঞতায় ছিল না। একটা বাঁক পেরিয়ে, রেলিঙের পাশে পাশে পাইন গাছের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ওরা চলছিল। পেছন ফিরে বেণু দেখে টগর-গোলাপকে দেখা যাচ্ছে না। বললো, "একটু দাঁড়াই, বৌদি গোলাপদি পেছিয়ে পড়েছেন।" বেণু রেলিঙে হেলান দিল। অশ্বিনী তার সামনে দাঁড়িয়ে তলার রেলিঙটাতে পা তুলে দেয়। বেবি আর খোকন ওদের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যায় নিচের দিকে। রাস্তাটা যে এমন নেমে গেছে, একটু গা ছেড়ে দিলে রাস্তাটাই যেন টেনে নামাতে পারে—সেটাই বেবি আর খোকনের মজা। খোকন আগে আগে ছুটছিল। পেছনে পেছনে বেবি। বেবির পরনে ভারী সোয়েটার। ও ঠিকমতো দৌড়তে পারছিল না। হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ল। কেউ-ই দেখে নি। হঠাৎ বেবির কান্না শুনে বেণু আর অশ্বিনী দুজনই একসঙ্গে তাকায়। বেণু অশ্বিনীর সামনে দিয়ে-ই ছুটে যেতে গিয়ে থেমে যায়। তারপর অশ্বিনীকে ঘুরে ছুটতে গেলে অশ্বিনীই তার আগে দৌড়ে যায়। অশ্বিনী গিয়ে বেবিকে তুলে কাঁধে নিতেই হাত পা ছোঁড়া শুরু করে বেবি। ততক্ষণে বেণু এসে যায়। বেণুর কোলে বেবিকে দিতে দিতে অশ্বিনী বলে, "দেখুন তো, কোথাও কেটে- কুটে গেল নাকি।" মাথাটা জড়িয়ে ধরে তার ঘাড়ে এমনভাবে মুখ গোঁজে বেবি যে বেণু একটুও

ঘাড় ঘোরাতে পারে না, "কাঁদিস না, কাঁদিস না, এটুকু পড়ে গেলে কাঁদে নাকি, দেখি কোথাও কাটল কিনা, দেখতে দে, দেখো মেয়ের কাণ্ড, দেখুন তো আপনি একটু।"

পা দিয়ে বেবি বেণুর কোমর জড়িয়ে ধরে ছিল। অশ্বিনী হাত দিতে সে চিৎকারও বাড়িয়ে দেয়, বেণুকেও আরো জড়িয়ে ধরে। সামলাতে বেণুকে একটু পেছু হঠতে হয়। অশ্বিনী বেবির বাঁ পা-টা টানটান করে দেখে, তারপর একটু ঝাঁকিয়ে দেয়। তারপর ডান পা-টা ধরে বলে, "একটু ছড়ে গেছে। রক্ত বেরয় নি," পা-টা ধরে টেনে দেয়। বেণুর গলা জড়ানো বেবির হাতটা টেনে নিতে বেণুর চুলে টান পড়ে, বেবিও জড়িয়ে ধরে। "আঃ চুলে লাগছে, লাগছে" বলে বেণু একটু স্বর উঁচু করতেই অশ্বিনী ছেড়ে দিয়ে বলে, "নাঃ, কোথাও কাটে নি, ঐ ডান পায়ের হাঁটুটা একটু ছড়ে গেছে।" হঠাৎ খোকনের গলা শোনা যায়, "কত বললাম, তুই দৌড়স না, পড়ে যাবি। কিছুতেই কথা শুনলো না।"

"তোর তাতে কি, আমি আবার দৌড়ব, আমার কিছুই হয় নি"—বেবি হঠাৎ সোজা হয়ে জলভেজা চোখেই খোকনকে ধমকে ওঠে। বেণু আর অশ্বিনী দুজনাই হেসে ওঠে। বেণু ডান হাতটা খালি করে চুলটা ঠিক করার চেষ্টা করে। চাদরটা ডান কাঁধ থেকে পড়ে গিয়েছিল। ডান হাতটা ঘুরিয়ে সেটা ধরবার চেষ্টা করতেই অশ্বিনী আলগোছে তুলে বেণুর কাঁধের ওপর ফেলে দেয়। পেছন থেকে টগরের গলা শোনা যায়, "কী হলো কি?"

বেণু ঘুরে বলে, "যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। মেয়ে আছড়ে পড়েছেন—"

টগর-গোলাপকে আসতে দেখে খোকন সোজা তাদের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, "আমি না করলাম মাসীমণি, তা-ও বেবি কথা শুনল না, ছুটতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আবার কাঁদছে।"

"বেবিটা একেবারে বোকা, তুমি দাদা তো—" টগর খোকনকে কোলে তুলে নেয়। গোলাপ জিজ্ঞেস করে, "তুমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও নি তো ওকে?"

"বাঃ, ও নিজে নিজে পড়ে গেল, জিজ্ঞেস করো না বাবাকে, পিউমণিকে।" লুস্থু-বেবির দেখাদেখি খোকনও বেণুকে পিউমণি বলে।

ওরা বেণু-অশ্বিনীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বেণু বলে, "ধরো তো একটু মেয়েকে—।" গোলাপ হাত বাড়ায়, বেবি টগরের দিকে ঘুরে যায়। খোকনকে নামিয়ে দিয়ে টগর বেবিকে কোলে নেয়। বেণু শাড়িটা ঠিক করে। চুলটা দু-হাতে গুছিয়ে নেয়। চাদরটা জড়িয়ে নেয়। তারপর বেবিকে বলে, "কোলে আসবি, না-কি হেঁটে যাবি।" উত্তর না দিয়ে বেবি দুই হাত বাড়িয়ে বেণুর কোলে চলে যায়। বেণু হাঁটা শুরু করতেই ওরা সবাই আবার চলে। গোলাপ খোকনের মাথায় হাতটা দিয়ে রাখে।

"কোথায় তোমাদের বোটানিক্স্ না কি, হাঁটতে হাঁটতে যে পা ধরে গেল।"

"নামার সময়ই পা ধরে গেল? তাহলে ফিরবি কি করে?" টগর বলে। অশ্বিনী ওদের পেছনে। টগর বাঁ হাতটা রেলিঙ ছোঁয়া পাইন গাছের মাথার দিকে ঘুরিয়ে বলে, "এই তো।" যে রাস্তাটা নিচের দিকে নেমে গেছে তার মুখে দাঁড়িয়ে বেণু পেছন ফিরে তাকায়। ওরা কাছে পৌঁছলে অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, "ডেটল-টেটল না দিলে কিছু খারাপ হবে না তো?"

বেণু কোল থেকে বেবিকে নামালে টগর বলে, "কেটেটেটে গেছে নাকি?"

"না, না, ছড়ে গেছে, রক্ত পড়ে নি তো, কিছু হবে না"—অশ্বিনী বলে। টগর বসে পড়ে বলে, "কোথায়?"

"ডান হাঁটুতে"—বেণু।

"নাঃ নাঃ, কিছুই হয় নি। আর কোলে ওঠে না বেবি, এবার হাঁটো, যাও।" বেবি হাঁটতে শুরু করে।

চার

ওরা এবার এত বেশি ঢালু বেয়ে নামে যে দেখতে দেখতে রোদ মাথার ওপরে, দু-পাশের লম্বা গাছের সারির মাথায় মাথায় আর তলায় সবুজ মাঠের ওপর। হঠাৎ চার পাশটা কেমন অন্ধকার ঠেকে।

"আমার সবচেয়ে ভালো লাগে এই রাস্তাটা দিয়ে নামতে।" বেণু রেলিঙে হাত দিয়ে চলছিল। সে বাঁ পাশে তাকিয়ে কথাটা বলে দিল। অশ্বিনী কোনো জবাব দেয়ার আগেই টগর বলে উঠে, "উঠতেও ভালো লাগে তো?"

"নামতেই তো আমার দম ফুরিয়ে যাচ্ছে"—গোলাপ।

"বা-বা" খোকনের গলাটা তলা থেকে তীব্র ভাবে উঠে এসে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই অশ্বিনীর পেছন থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে তীব্রতর হয়ে খোকনের মাথার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে যায় আর বেবি চিৎকার করে ওঠে, "পিউমণি।" কান্নাকাটির জন্য বেবির গলাটা ধরে ছিল। গলা ধরায় চিৎকারটা যেন লাফিয়ে ওঠে, যেন সেটা প্রতিধ্বনিত হবে না। একটা নিঃশ্বাস ফেলার বিরতির পর সেটা কেমন একটু ভারী হয়ে ছড়িয়ে যায়। বেণু দুই হাতে রেলিঙ চেপে ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে সবার দিকে তাকায়। বেবি এলোমেলো করে দেবার পর বেণুর চুল আগের মতো আঁচড়ানো নয়। বেণুর এলোমেলো সিঁথির দিকে তাকিয়ে টগর হাসে। অশ্বিনী দাঁড়িয়ে পড়ে। টগর হাঁটতে হাঁটতে ডেকে ওঠে, "খো-ক-ন।" খুব চুপচাপের ভেতর ডাকটা যেন ভাসতে ভাসতে চলে যায়। ধ্বনির এই ভেসে যাওয়াটুকু শুনতেই অশ্বিনী দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রায় সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাওয়ার পর অনেক দূর থেকে ধ্বনিটা ফিরে আসতে থাকে

—"খোক"-টা তেমন বোঝা যায় না, কিন্তু "ওন"-এর রণনটা কাঁপতে কাঁপতে যেন এগোতেই থাকে, এগোতে এগোতে কখন একসময় মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে যায়। ধ্বনিটা শোনার জন্যই যেন চার পাশটা এত চুপ।

বেণু আর অশ্বিনী একসঙ্গেই গাছের মাথা থেকে চোখ নামায়। হঠাৎ খোকন আর বেবির একসঙ্গে হাসির শব্দ ধাক্কা খেতে খেতে উঠে আসতে থাকে। কোথায় যে ওরা লুকিয়ে দেখা যাচ্ছে না। টগর-গোলাপও বাঁক বেয়ে নেমে যায়, গাছ-গাছালির আড়ালে। খোকন আর বেবি এতক্ষণ টগরের গলার "খোকন" ডাকটা শুনে চুপ করে ছিল—সম্পূর্ণ শোনার জন্য। তারপর ধ্বনিটা মিলিয়ে যেতে ওরা একসঙ্গে হেসে উঠেছে। ওরা থামিয়ে দেবার পরও হাসিটা থামল না। একে দুজনের কচি গলার হাসি। তীব্র স্বরে হাসিটা কাঁপতে লাগল। এমনভাবে কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে পড়ে যেন মনে হয় আকাশ ভরে অজস্র শিশু হেসেই চলেছে। হেসেই চলেছে।

খোকন আর বেবি যে-ই বুঝেছে ওদের হঠাৎ হাসিটা এমন বিরতিহীন, অমনি জোর করে হা-হা হাসতে শুরু করে। এখন আর প্রতিধ্বনি শোনার জন্য অপেক্ষা করে না, নিজের প্রতিধ্বনির সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতায় মাতে।

বেণু দুই হাতে রেলিঙ চেপে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু নিচে, পথের মাঝখানে অশ্বিনী। বেণুর ঘাড়টা শুধু অশ্বিনীর দিকে ফেরানো। খোকন আর বেবির জোর করা হা-হা হাসি আর প্রতিধ্বনির জড়াজড়িতে ধ্বনির আবর্ত সৃষ্টি হয়। তারপর খোকন আর বেবি থেমে যায়। আবর্তটা থিতিয়ে আসে। অশ্বিনী এই থিতনো ব্যাপারটা যেন বুঝতে চায় এমন সতর্ক শোনে। হঠাৎ বেণু জিজ্ঞাসা করে, "ডাকি?" "ডাকুন না।"

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রেলিঙের ওপারের বনের দিকে তাকায় বেণু।

যেন ডাকার উদ্যোগ নিচ্ছে। আবার মুখ ঘুরিয়ে অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করে, "কাকে ডাকবো ?" তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে গলাটা একটুখানি তুলে ডেকে ওঠে, "গো-লা-প-দি-ই"—ডেকেই বেণু তরতরিয়ে নিচে নামতে থাকে। বেণু তার গলা খুব উঁচুতে তোলে নি। তার নিজের যেন একটা হিসেব ছিল প্রতিধ্বনি শোনার জন্য কতটা জোরে ডাকতে হবে। প্রথমটুকুর চাইতে শেষেরটুকু জোরে হয়ে যাওয়ায় বেণুর ডাকটা যেন ঢেউয়ের মতো নাচতে নাচতে, কিনারায় চলে গিয়ে ভেঙে যায়, তারপর একাধিক রেখায় রেখায় ফিরে আসতে থাকে। তার মাথার ওপর দিয়ে "ই-ই-ই"টা কাঁপতে কাঁপতে ভেসে চলে যাবার পর অশ্বিনী ধীরে ধীরে নামতে শুরু করে।

একা একা ধীরে ধীরে নামার অবকাশটুকুতে যেন অশ্বিনীর মনে পড়ে যায় এমন যে অকারণে বেড়ানো যায়, এমন যে অকারণে হাঁটা যায়, ধ্বনি যে এমন অকারণ তরঙ্গ তোলে, সে তরঙ্গ যে এমন শোনা যায় তা-কি তার বা গোলাপের জানার কথা। যেখানে পরিবার বা সমষ্টি—চিরকাল তো সেখান থেকে অশ্বিনী পালিয়েই গেছে। ধীর পায়ে হেঁটে এখন অশ্বিনী চলেছে তো সেখানেই যেখানে তার স্ত্রী, তার ছেলে, তার স্ত্রীর বৈমাত্রেয় বোন, তার বিধবা ননদ, বেবি। অশ্বিনী বোঝে না সে যে এমন ধীরে ধীরে হেঁটে নামে তা-কি কেউ তার নাম ধরে ডাকবে আর সে সাড়া দেবে এই আশায় ? আকাশ-ভরে নিজের নাম শুনে সাড়া দেবার সাধ হয়েছে অশ্বিনীর ?

পাঁচ

রাস্তা থেকে মাঠে পা ফেলে অশ্বিনী দেখে টগর আর গোলাপ মাটির ওপর বসে আছে। লিলি পুকুরের চার পাশে বেবি আর খোকন পাক খাচ্ছে। বেণু গিয়ে পুকুরের পাড়ে বসে পড়ল। মাঠটা পেরিয়ে এদের কাছাকাছি আসতে আসতে অশ্বিনী দেখে বেণু

পুকুর পাড়ে বসে পড়ার পর খোকন আর বেবির দৌড়দৌড়ি যেন বেড়ে যায়। বেণুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বেণুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। অশ্বিনী তাদের কাছাকাছি হতেই বেণু মাথা ঘুরিয়ে বলে, "রুমাল আছে?"

"আছে। নোংরা"—অশ্বিনী একটা কোঁচকানো রুমাল বের করে।

"ধ্যুৎ। এই গোলাপদি, তোমার বরকে রুমাল কিনে দিও।" তারপর বেবি আর খোকনকে বলে—"বেবি, খোকন, তোমারা দুই পাড়ে বসো, খেলা হবে।" "খেলা হবে, খেলা হবে" বলতে বলতে খোকন আর বেবি ছুটে গিয়ে বসে পড়ে। বেণু তার রুমালটা ঝুলিয়ে নিয়ে ওদের পেছন দিয়ে পুকুরটাকে পাক দিতে থাকে। বেবি বলে, "কী খেলা পিউমণি?" "এই খবরদার, পেছনে তাকাবে না"— বেণু রুমালটা খোকনের পেছনে ফেলে দিয়ে একপাক ঘোরে। খোকন জোড়াসনে কোলের ওপর দুই হাত নিয়ে বসে আছে। বেণু এবার গিয়ে খোকনের পেছনে বসে আস্তে আস্তে গুপ গুপ করে তার পিঠে কিল মারতে থাকে। খোকন হকচকিয়ে পেছন ফিরলেই বেণু বলে, "রুমাল চোর, রুমাল চোর।" খোকনকে রুমালটা ধরিয়ে দিয়ে বেণু বলে, "দৌড়ও দৌড়ও"।

অশ্বিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর টগর-গোলাপ বসে বসে দেখছিল। খোকন তাদের ঘিরে দৌড়চ্ছে। বেণু পুকুরপাড়ে জোড়াসনে বসে। সে টগর-গোলাপকে বলে ওঠে, "এই তোমরা এসো না, দু-তিনজনে কি খেলা যায়।" তারপর অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, "আসুন না।" অশ্বিনী গিয়ে পুকুর পাড়ে বসে পড়তেই, টগরও উঠে বলে, "চল গোলাপ।" পুকুর পাড়ে বসে পড়তে পড়তে টগর বলে, "পারিসও তুই।" গোলাপ টগরের পাশেই বসে পড়েছিল। বেণু চেঁচিয়ে ওঠে, "এই গোলাপ দি, ওখানে নয়, ওখানে নয়, এদিকে বসো।" গোলাপ উঠে এসে বেণু যে-জায়গাটা দেখায়, বসে পড়ে।

"খোকন রুমাল ফেলো, দেখো টের পায় না যেন।" খোকন সবাইকে ঘিরে পাক খেতে থাকে।

অশ্বিনী গোলাপের দিকে তাকায়। জোড়াসনে এমন বসে থাকতে কোনো দিন কি দেখেছে অশ্বিনী। গোলাপ ঘোমটা তুলে দিয়েছিল। টগরের খোঁপা ভেঙে ছিল ঘাড়ের ওপর। গোলাপকে টগরের চাইতে বয়স্কা মনে হয়। হঠাৎ পেছনে কিল খেয়ে অশ্বিনী দেখে খোকন মারছে। "আরে ব্যাটা, বাপকে চোর সাজালি? লাফিয়ে উঠে রুমাল নিয়ে অশ্বিনী দৌড়তে থাকে।

সেই বেড়াতে আসার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারই অশ্বিনী বা গোলাপের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। রুমাল হাতে নিয়ে খামোখা দৌড়নোর মতো ব্যাপারে তাকে মাততে হবে এমন কথা কি অশ্বিনী ভাবতে পারত? দৌড়তে তার লজ্জা করবে ভেবে অশ্বিনী দাঁড়িয়ে উঠেই দৌড়নো শুরু করে। সে যখন ওদের সবাইকে ঘিরে দৌড়য় বেণু-টগর-খোকন-বেবি সবাই-ই তাকিয়ে থাকে তার দিকে—কার পেছনে রুমাল ফেলল বোঝার জন্য। এক তাকায় না গোলাপ। গোলাপ যেন দেখেও বিশ্বাস করতে চায় না যে তার এত পরিচিত এই মানুষটি এমন অদ্ভুত একটা কাজ করছে। তিন পাক ঘুরে যাবার পর অশ্বিনী নিজের ছায়াটাকে যেন বিশ্বাস করতে চায় না যে সেটা এমন অকারণে লাফিয়ে চলতে পারে। কিন্তু গোলাপকে যেন অশ্বিনী বুঝতেই দিতে চায় না যে তার পক্ষে এই ব্যাপারগুলো এত বেশি নতুন। তাদের সমস্ত ব্যাপাটাই এত বেশি নতুন যে গোলাপ-অশ্বিনী নিজের মনে মনেই বুঝে নেয় পরস্পরের নতুনত্বে তাদের চমকানো চলে না। চার পাক ঘুরতে ঘুরতে অশ্বিনীর ইচ্ছে হয় গোলাপ কী করে দেখতে। রুমালটা সে গোলাপের পিছনে ফেলে দেয়। গোলাপ টের পায় না। পরের বার এসে গোলাপের পেছনে দাঁড়িয়ে চেঁচায় "তোমার পেছনে রুমাল।" বেণু বলে ওঠে, "মারতে হবে, মারতে হবে।"

অশ্বিনী গুপ করে একটা ছোট্ট কিল বসিয়ে দেয় গোলাপের পিঠে। "ধ্যুৎ" বলে উঠে লজ্জায় আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকতে গিয়ে সকলের হাততালির শব্দে গোলাপ আঁচল ছেড়ে দেয়। অশ্বিনী বসে পড়ে, "দৌড়ও দৌড়ও" বলে বেণু চেঁচায়। লজ্জায় চলচ্ছক্তিহীন হয়ে গোলাপ বলে ওঠে, "আমি পারি না।"

"পারবে পারবে মাসীমণি, তুমি দৌড়ও, কেউ টের পায় না যেন" বেবি চকমকিয়ে গোলাপকে বলে। গোলাপ একটু একটু দৌড়য়। অশ্বিনী সেদিকে তাকায় না। গোলাপের ছায়া দেখে যায়। গোলাপের পিঠ সোজা না। গোলাপের হাঁটায় সপ্রতিভতা নেই। এমন করে সবার সামনে তাকে নাচিয়ে দিল অশ্বিনী? গোলাপের একপাক ঘোরা শেষ হতে হতেই হঠাৎ বেণু পেছনে হাত দিয়ে রুমাল নিয়ে উঠে দৌড়তে গেলে গোলাপ যেন বেণুকে ধরতেই ছুট দেয়। তারপর বেণুর জায়গায় বসে পড়ে হাসতে থাকে। বেণুর দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী ভাবে গোলাপ আর আমার আলাদা আলাদাভাবে দার্জিলিঙে আসা উচিত ছিল। তাহলে দুজন নিজের মতো করে সব জেনে নিতে পারতাম।

বেণু বেবির পেছনে রুমাল ফেলেছিল। বেবি আগেই টের পেয়ে রুমাল তুলে নিয়ে দৌড়তে থাকে। "কেউ পেছনে দেখবে না কিন্তু, কেউ দেখবে না', বলতে বলতে বেবি ঘুরতেই থাকে। খোকন বলে, "আমাকে দিস না কিন্তু বেবি।" বেবি আবাব ঘুরতে থাকে। টগর বলে, "তুই কি ঘুরতেই থাকবি?"

"দেব, দেব, কেউ পেছনে তাকাবে না" বলে বেবি আরও এক পাক ঘোরে। কিন্তু বেবির তাকানো দেখেই টগর টের পেয়ে যায় তার পেছনে রুমাল। সে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করে। টগরের ছোটা দেখে কে বলবে সে গোলাপের বড়। দুই পাক ঘুরেই টগর ফিরে এসে অশ্বিনীকে কিলোতে শুরু করে। "আরে, সবাই মিলে আমাকেই চোর সাজাচ্ছে।" অশ্বিনী উঠে ছোটে। অশ্বিনী ভাবে

গোলাপ সেবারে একেবারে শেষ মুহূর্তে যেন সত্যি খেলেছিল, যখন বেণুকে ধরার জন্য ছুটেছিল। অশ্বিনী বেণুর পেছনে রুমাল ফেলে দেয়। এসে বেণুর পিঠে একটা কিল মারতেই সবাই একসঙ্গে হাতে তালি দিয়ে হেসে ওঠে। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে বেণুর চাদরটা গড়িয়ে যায়। বেণু সেটা ফেলে দিয়েই ছুটতে থাকে। গোলাপের পেছনে কিল পড়তে গোলাপ তাড়াতাড়ি রুমাল তুলে ছুটতে গেলে তার আঁচল এলোমেলো হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি সেটা কোমরে গুঁজে দেয়। এতক্ষণে যেন গোলাপকে সত্যি খেলছে মনে হয়। টগরের পেছনে রুমাল ফেলতে গিয়ে গোলাপ সেটা টগরের কাঁধে ফেলে দেয়। টগর গোলাপের পেছনে ছুট লাগাতেই গোলাপ টগরের জায়গায় বসবার জন্য পড়িমড়ি করে ছুটে এসে বসে পড়ে। টগর খোকনের পেছনে রুমাল ফেলে। খোকন টের পায় না। ঘুরে এসে খোকনকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আর এক হাতে আস্তে আস্তে কিল মারে টগর। টগরের হাত থেকে খোকন বেরিয়ে যায়। "কেউ পেছনে তাকিও না কিন্তু, কেউ টের পাবে না" বলে খোকন। খোকন ঘুরতেই থাকে। "বেবিকে দেব না, বেবিকে দেব না"—বেবি ভয়ে ভয়ে পেছনে হাত দিয়ে দেখে সত্যি রুমাল পড়ে আছে। বেবি তুলে নিয়ে দৌড়তেই খোকন চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, "ও কেন পেছনে হাত দিল, আমি খেলব না।"

"মোটেই আমি পেছনে হাত দিই নি, মোটেই না"—রুমাল হাতে নিয়ে বেবি চেঁচায়।

"খোকন ওঠো, এভাবে খেলা হয় না", গোলাপ বলে। খোকন পা ছড়িয়ে কাঁদতেই থাকে।

"তাহলে থাক, আর খেলা হবে না", বলে হাই তুলে টগর উঠে দাঁড়ায়। গোলাপ উঠতে উঠতে বলে, "বোকা ছেলে, খেলতে খেলতে কাঁদে।"

বেবি রুমালটা নাড়িয়ে খোকনকে ধমকায় "আর কোনোদিন তোর সঙ্গে খেলব না।"

বেণু বলে ওঠে, "হয়েছে, আর ওকে ধমকাতে হবে না। চলো একটু ঘুরে ফেরা যাক।"

খোকন বসে বসে কাঁদতে থাকে। অশ্বিনী সবার শেষে ওঠে। টগর বলে, "চল গ্লাস হাউসটা দেখে আসি।" বেণু বলে, "চলো।" গোলাপ গিয়ে খোকনকে বলে, "ওঠ্"। খোকন তবু কাঁদছে দেখে গোলাপ খোকনকে কোলে তুলে নেয়। খোকন গোলাপের ঘাড়ে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে।

খেলাটা, খোকন ভেঙে না দিলেও, আর একটু পরই একঘেয়ে হয়ে উঠত। মজাটা ছিল কিছুটা গোলাপকে নিয়ে আর কিছুটা অশ্বিনীকে নিয়ে। গোলাপ আর বেণুকে চোর বানিয়ে অশ্বিনী খেলার সে মজাটা পুরিয়েছিল। তারপর আর খেলাটা জমার কথা নয়।

গ্লাস হাউসের ভেতরে দু-দিকের গ্যালারিতে সারি দিয়ে সাজানো টবে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে।

"জানেন, এই ফুলের জন্য কত সাধ্যিসাধনা। কোনোটা হয়তো এ-বছরই প্রথম ফুটলো, কোনো অর্কিড হয়তো এ-বছরই প্রথম এসেছে।" বেণু অশ্বিনীকে বোঝাচ্ছিল। গোলাপ খোকনকে কোলে নিয়ে চালের দিকে তাকিয়ে ছিল। দু-তিনটে জায়গায় কাচ ভাঙা। অশ্বিনী বললো, "আরে খোকন তো ঘুমিয়ে পড়ছে, খো—ক—ন।"

গোলাপ ঘাড় ঘুরিয়ে খোকনকে দেখতে চেষ্টা করে বলে, "দুপুরে তো ঘুমোয় নি, তারপর এতটা হেঁটেছে, এখন ওকে নিয়ে এতটা ফেরাও তো মুশকিল হবে—"

"চলো, চলো, এখুনি ফিরি" টগর ঘুরে যায়।

"পিউমণি, কোলে নাও" বেবি দুই হাতে বেণুকে জড়িয়ে ধরে।

"এই সেরেছে", টগর বলে "এদের নিয়ে বেড়াতে বেরোলেও বিপদ।"

বেণু বেবিকে কোলে তুলে নেয়।

ছয়

ফেরার পথে কিছু দূর উঠেই গোলাপ হাঁপিয়ে পড়ে। অশ্বিনীকে বলে, "নাও-না একটু", অশ্বিনী খোকনকে নেয়। খোকন ঘুমিয়ে কাদা। টগর বেণুকে বলে, "আমার কোলে দিবি ?"

"না, চলো তো, না-পারলে দেব।"

টগর-গোলাপ আগে আগে উঠে যায়। তাদের পেছনে রেলিঙ ধরে ধরে বেণু ওঠে—বাঁ হাতে বেবিকে জড়িয়ে রেখে। বেবি-ও ঘুমিয়ে পড়েছে। বেণুর পেছনে অশ্বিনী খোকনকে নিয়ে। দুজনেই হাঁপিয়ে পড়েছে। ভারী নিশ্বাস পড়ছে।

বেণু দাঁড়িয়ে পড়ে। খুব জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে। অশ্বিনী বলে, "আমার কাছে দিন, আমি দুজনাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে যাই।" কথা বলতে গিয়ে বেণু আগে মাথা ঝাঁকায়। তারপর বলে, "পারবেন না, খুব চড়াই।" অশ্বিনী নিজে হাঁপিয়ে উঠে সেটা বোঝে। আরো বুঝে ফেলে যে বেবিকে বইতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেলেও বেণু কাউকে দেবে না। এটা বোঝার পর অশ্বিনী বেণুর পেছন-পেছনই চলে, যদিও সে তাকে পার হয়ে যেতে পারতো। আস্তে আস্তে উঠবার পর অশ্বিনীর নিশ্বাসটা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এলে বেণু বলে, "আপনি এগিয়ে যান না, আমি ধীরে ধীরে উঠছি।"

অশ্বিনী জবাব দেয় না। দাঁড়িয়ে, জিরিয়ে, আস্তে হেঁটে বেণুও খানিকটা স্বস্তি ফিরে পায়।

"এটুকুই ভীষণ খাড়াই।"

"আমাদের তো বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে।"

বাঁকের মুখে গোলাপ-টগর, গোলাপ রেলিঙে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে, টগর পথের মাঝখানে। "দে, আমার কোলে।"

"না, ঠিক আছে। চলো তোমরা।"

"পারিস নাকি এতটা ওকে নিয়ে উঠতে? শেষে বাড়িতে গিয়ে বুক ধড়ফড় করবে।"

"কিছু হবে না, চলো না।"

"উঠলি তো এতটা, একটু আমি নি, আবার তুই নিস", টগর হাতদুটো একটু বাড়াতেই বেণু খুব ঠাণ্ডা গলায় "তাহলে তুমি-ই বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাও, আমি একটু ঘুরে-ফিরে ফিরব" বলে বেবিকে তুলতে যেতেই টগর বলে ওঠে, "থাক বাবা, কষ্ট হচ্ছে তাই বলছিলাম।"

অশ্বিনী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সে কণ্ঠক্ষেপ করে, "দিদি, আপনারা চলুন এগিয়ে, আমরা উঠছি ধীরে ধীরে।"

"এসো, তাই।"

টগরকে তো সে টগরদি বলত, এখন দিদি ডেকে ফেলেছে। সেটা অশ্বিনীর মতো আর কি কেউ খেয়াল করে। বেবিকে যে বেণু কোল থেকে নামায় না তার সহজ কারণ তো স্বামী-সন্তানহীন জীবনেই মিলে যেতে পরে। অশ্বিনী সেটা চায় না। আসলে, কারণটাই জানতে চায়-না। বেণুর স্বামী খুব অকালে মারা গেছে —এ-ছাড়া আর কিছুই না জেনেও বেণুর দ্রুত নিশ্বাস শুনেই সে যে বুঝে ফেলতে পেরেছে যে বেবিকে বেণু কিছুতেই আর কারো কোলে দেবে না—সেটাই অশ্বিনীর কাছে ভালো ঠেকে। টগরও জানে। কিন্তু সেটা অভিজ্ঞতায়। অভিজ্ঞতা ছাড়াই অশ্বিনী জেনেছে।

যে-খাড়াই তারা উঠে আসে তার তুলনায় বড় রাস্তাটাকে সমতল মনে হয়। টগর-গোলাপ একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পাশ দিয়ে পরপর দুটো ফাঁকা গাড়ি চলে যায়। ড্রাইভার মুখ বের করে চাওয়ায় অশ্বিনীর সন্দেহ হয়। "এগুলো কি ট্যাক্সি নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"একটা নিলে হত না? অনেকখানি তো উঠতে হবে—"

বেণু দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখে অশ্বিনীও। পরের গাড়িটায় লোক ভর্তি। "চলুন, এগোই, পেলে নেব" বলে বেণু চলতে শুরু করে। অনুসরণ করতে করতে অশ্বিনী বারবার পেছন ফিরে দেখে।

একটা ফাঁকা গাড়ি এসে পড়ে। অশ্বিনী দাঁড় করালে টগর-গোলাপ এগিয়ে আসে। দরজা খুলে আগে অশ্বিনী বেণুকে ঢুকতে দেয়। নিজে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে। টগর, তারপর গোলাপ উঠলে খোকনকে গোলাপের কোলে দিয়ে অশ্বিনী ওঠে। টগর ঠিকানা বলে।

ট্যাক্সিতে বসে অশ্বিনী টের পায় সে কতটা হাঁপিয়ে গেছে। বেণু বেবিকে জড়িয়ে ধরে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে। নেহাত শারীরিক ক্লান্তিতে নিজেকে এলিয়ে দিতে পারে কিন্তু সবার সামনে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে কি-না সেটা দেখা অশ্বিনীর পক্ষে যেন নিতান্তই জরুরী। অশ্বিনীকে এমন করে তাকাতে দেখে বেণু হেসে ফেলে।

"কী ভাবলেন? মরে গেছি? অত না। আমাদের এ-সব অভ্যেস আছে।"

"বা বা, এত হাঁটা আমার মরে গেলেও অভ্যেস হবে না।"

বাজার পার হয়ে ট্যাক্সি যাচ্ছিল। গোলাপ বললো, "এ-য্-যা আমার যে কিছুই কেনা হল না।"

টগর জবাব দেয়, "এখন তো মোটে তিনটে বাজে। সন্ধ্যের দিকে বেরিয়ে কিনলেই হবে।"

"তিনটে বাজে? লুস্নুকে আনতে যেতে হবে তো—"

"আনতে আর যেতে হবে না, ও একাই ফিরতে পারবে"—টগরের কথার কোনো জবাব বেণু দেয় না।

ট্যাক্সিটা দাঁড়ালে অশ্বিনী নেমে খোকনকে নেয়। ঘুম ভেঙে

খোকন একবার চার পাশে তাকিয়ে আবার মাথা গোঁজে। টগর নেমে ভেতর থেকে বেবিকে নেয়। গোলাপের কোলে খোকনকে দিয়ে অশ্বিনী পকেট থেকে ব্যাগ বের করে। বেণু বেরিয়ে বলে, "তোমরা ওপরে যাও, আমি লুস্মুকে নিয়ে আসি।"

অশ্বিনী জিজ্ঞেস করে, "কত দিতে হবে।"

টগর—"তিন টাকা দিয়ে দাও।" দিতে গেলে ড্রাইভার পাঁচ টাকা দাবি করলে টগর নেপালী ভাষায় খেঁকিয়ে ওঠে। ড্রাইভার হেসে তিনটে টাকা নিয়ে চলে যায়। টগর মন্তব্য করে, "সবাইকেই সিজ্‌নার ভাবে।"

বেণু রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করলে অশ্বিনী বলে, "চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।"

গোলাপ বলে ওঠে, "তুমিই তো নিয়ে আসতে পারবে, বেণুদি, এসো না—।" বেণু ঘাড় ফিরিয়ে বলে,"ঠিক আছে, একখুনি আসছি।"

ওরা অনেকটা চলে এসেছিল। অশ্বিনী হঠাৎ পেছন ঘুরে চেঁচায়, "শুনছো?" গোলাপ তাকালে বলে, "বাগানের গাড়ি এলে বলে দিও, আজ ফিরব না," পেছন থেকে বেণু যোগ করে দেয়— "কালও না—"

ঘুরে আবার পথ চলতে শুরু করে অশ্বিনী বলে, "কি ব্যাপার, আমার চাকরি খাবেন নাকি?"

"এমন চাকরি করেন কেন যে একদিন দার্জিলিঙ থাকা চলে না—"

"ওব্ বাবা, তা গোবিন্দদাকে একদিন ছুটি নেয়ালেই পারেন।"

"দাদার তো তাহলে অসুখ হয়ে যাবে, আপনার তো আর চাকরি করতে দাদার মতো ভালো লাগে না—"

"কে বললো। আপনি কি আমাকে চাকরি করতে দেখেছেন? এই ক-মাস একবার চোখ তুলবার সময় পাই নি।"

"এই সেরেছে, আপনি কি আবার এখন চাকরি বোঝাতে শুরু

করবেন নাকি ?" অশ্বিনীও হেসে ওঠে। বেণু বলে, "আপনাদের তো এখনও ম্যলই দেখা হয় নি, না ?"

"এমন হুড়হুড় করে দেখতে ভালো লাগে না—ঘুরবো ফিরবো, যখন যা চোখে পড়বে দেখবো।"

"বাঃ এদিকে শখ তো ষোল আনা, তাহলে আবার চাকরির ভয় করছেন কেন ?"

দোকানগুলোর সামনে চেয়ার-টুলে দোকানিরা রোদ পোয়ায়, মেয়েরা সোয়েটার বোনে। নানা দেশী লোক উঠছে নামছে। লুস্থুদের ইস্কুলটা সাহেবি। কালো রোব-পরা মেমসাহেবরা বেরিয়ে এলেন। স্ল্যাক্‌স্ পরা কিছু মেয়ে মাঠে ছোটাছুটি করছিল। কারো কারো স্কার্ফ পরা। সবচেয়ে ভারতীয় পোশাক পাজামা। শাড়ি একজনেরও পরনে নেই। লুস্থু বেরিয়ে এসে পিসী আর মেসোকে দেখে খুশি। দু-জনার হাত দু-হাতে ধরে লুস্থু ফিরতে থাকে।

"লুস্থু তোকে ফাঁকি দিয়ে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

"কোথায়, কোথায় মেসো ? কোথায় ?"

"বটানিক্‌সে ? তুমি দেখো নি ?"

"কত—"বলে বেণুর দিকে তাকিয়ে লুস্থু হাসে। অশ্বিনীর হাত ছেড়ে বেণুর আর এক হাত ধরে লুস্থু বলে, "পিউমণি আমি নাকি বটানিক্‌সে যাই নি।"

বেণুও হাসে। লুস্থু আবার অশ্বিনীর হাত ধরে—"জানো মেসো, আমি আর পিউমণি কাউকে না জানিয়ে কতদিন বটানিক্‌সে যাই।"

"তুই যে সে-কথা মেসোকে বলে দিলি ?"

"মেসো কাউকে বলবে না, এরপর মেসোকেও নিয়ে যাবো, মেসো যাবে তো ?"

"কাউকে না জানিয়ে যদি যাও যাবো।"

"কী মজা—আ" বলে লুস্থু বেণু আর অশ্বিনীর হাত ধরে মাটি ছেড়ে দোল খায়। বেণু-অশ্বিনী দুজনেই হেসে ওঠে।

"কী হচ্ছে—এই লুম্বু" বেণুর কথায় আরও হেসে উঠে লুম্বু পা গুটিয়ে ফেলে। বেণু-অশ্বিনী ঝুলন্ত লুম্বুকে নিয়ে দু-পা এগিয়ে যেতেই লুম্বু পা নামিয়ে ফেলে।

"জানো পিউমণি, মালহোত্রারা না পার্টি দেবে, সেই পার্টির পরে, মাদাম বলছিল ···।"

"বলছিলেন", বেণু সংশোধন করে।

"হ্যাঁ, বলছিলেন, আমাদের আউটিঙ।"

"কোথায় আউটিঙ এবার ?"

"সে এখনো ঠিক হয় নি।"

"এখানে কি সবই মিশনারি স্কুল ?"

"না, অন্য স্কুলও আছে। তবে ভালো স্কুল সবই মিশনারি। এটা তো রাজধানী ছিল—"

সাত

গোলাপ ঘুমের চোখে দরজা খুলে দেয়। ওরা ঢোকার পর অশ্বিনী বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে পড়ে, লুম্বুকে নিয়ে বেণু ভেতরে চলে যায়। গোলাপও ভেতরে চলে গেছে। বসে পড়ার পর অশ্বিনীর একটু ক্লান্তি বোধ হয়। খুব হাঁটা হয়েছে। একটুক্ষণ বসে থেকে জুতো-মোজা খুলে পা ছড়িয়ে বসতে সাধ হয়। চোখটাও জড়িয়ে আসে। অশ্বিনী জুতো-মোজা খুলে পা-টা টান করে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বোজে। ভেতরে কলের জলের আওয়াজ, বেণু-লুম্বুর গলা শোনা যায়।

এই সব সময় বোঝা যায় এই পরিবারটাতে তারা অতিথি। এদের একটা নিজস্ব অভ্যেস আছে। এদের প্রয়োজন অনুযায়ী ঘর। রাত্রিবেলা অশ্বিনী বাইরের ঘরের মেঝেতে বিছানা পাততে পারে, দিনের বেলায় তো আর পারে না। অবিশ্যি অশ্বিনী যদি এখন ভেতরে যায় বা শুতে চায় তাহলে কি আর কেউ বাধা দেবে, বরং

ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে। হয়তো বা ব্যবস্থা হয়েই আছে। অশ্বিনীর যেটা ভালো লাগে তা-ই করছে—এটাই সবাই ধরে নিয়েছে। আসলে অশ্বিনীই লজ্জা পায়। বা অশ্বিনীর অভ্যেস নেই—এমন করে পরিবারের মধ্যে ঢোকার। বরং তার অভ্যেস পরিবার থেকে সরে যাওয়ার।

তাই যে-অশ্বিনী বেড়াতে যাওয়ার পথে হৈ হৈ করে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, সে-ই এখন জিরোবার সময় ভেতরে ঢোকে না। কারো মনে হতে পারে যে অশ্বিনী লাজুক।

দরজায় ঠক ঠক শুনে অশ্বিনীর তন্দ্রা টুটে যায়। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয়। শব্দ শুনে বেণুও ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। অশ্বিনী খুলছে দেখে বেণু পর্দাটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। গোবিন্দবাবু দরজায় দাঁড়িয়েই বললেন, "আরে বাঃ, তোমরাও এসে গেছ দেখছি।" বেণু এগিয়ে এসে পর্দাটা তুলে ধরে—"শুধু কি আসা? এর মধ্যে কত বেড়ানো হলো।" গোবিন্দবাবু বসে জুতো খুলছিলেন। অশ্বিনীর তন্দ্রার ভাব কাটে নি। ঠিক কী করতে হবে তা-ও যেন সে বোঝে না, দাঁড়িয়ে থাকে। বেণু অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, "দাদা, এমন লাজুক জামাই নিয়ে আমাদের চলবে না—"

গোবিন্দবাবু জুতো জোড়া হাতে তুলতেই বেণু এসে নিল। দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে গোবিন্দবাবু বললেন, "তাহলে বদলে নে না।"

দু-হাতে অশ্বিনী মুখ ঘষে হাত দুটো কোথায় রাখবে ঠিক করতে পারে না, শেষে দুই কাঁধের ওপর আড়াআড়ি রেখে একটু বোকা বোকা হাসে। বেণু বলে, "বদলানো তো আর আমার কাজ নয়, সে তো গোলাপদিকে রাজি করাতে হবে। কিন্তু দেখো না, এত ঘুম পেয়েছে, তবু ভেতরে গিয়ে বিছানায় শোবে না—" স্যাণ্ডেলটা পায়ে গলিয়ে প্যান্টের কোমরের বোতামে হাত দিয়ে গোবিন্দবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, "আরে ও তো আবগারি দারোগা, ওকে ওরকম চোখ বোজার ভান করে পড়ে থাকা অভ্যেস করতে হয়।

বোসো অশ্বিনী, হাত মুখ ধুয়ে আসছি”—গোবিন্দবাবু ভেতরে চলে গেলে অশ্বিনী মুখের লেগে থাকা হাসিটা আরও বিস্তৃত করে। বেণু বলে, “আচ্ছা, সত্যি আপনি কী বলুন তো! আমি লুস্টুকে খাবার দিয়ে আপনাকে বলতে এসেছি ভেতরে গিয়ে শুতে, এসে দেখি আপনি সোফায় গা এলিয়ে মাথা ঝুলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।”

‘না, ঘুমোইনি, মানে।”

“এত বিচ্ছিরি লাগছিল না, ডাকতেও পারছি না, অথচ—”

“তাহলে বেণু, বোকা জামাইকে একটু চা খাওয়া, তোর বউদি আর গোলাপ তো যা ঘুমুচ্ছে কাল সকালের আগে উঠবে না” —গোবিন্দবাবু এসে বসলেন, “তারপর অশ্বিনী, কী রকম চুরি-টুরি ধরেছ বলো।”

“না, চুরি-টুরি বুঝতেই পারি না। আমি আমার খাতা-পত্রের কাজ ঠিক রেখে দি।” “ব্যস। ঐটাই হচ্ছে সার কথা, বুঝেছ? খাতা-পত্র ঠিক রেখে দেবে। তারপর যা হয় হোক। আর তোমাদের এক্সাইজের চুরিটা খুব মজার ব্যাপার, বুঝলে? যদি চোর না হও চুরি ধরতে পারবে না। আর চুরি যদি ধরতে পার, তাহলে চোর না হয়ে উপায় নেই।”

“আবার চুরি না ধরেও চোর হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই,” অশ্বিনী ধীর গলায় আস্তে আস্তে বলে। বক্তব্য সম্বন্ধে সে নিশ্চিত নয়, না-কি গোবিন্দবাবুর কথার জবাব কি ভাবে দেবে সে সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত—বোঝা যায় না। কিন্তু তার কথায় এমন একটা ধীরতা এসে যায় যে কথাটা যেন চিন্তা বা অভিজ্ঞতার ফল মনে হতে পারে। এটা যখন অশ্বিনী বোঝে, তখন গোবিন্দবাবু বলছেন, “চুরি না ধরে চোর হওয়াটা তো সবচেয়ে সহজ ব্যাপার হে, চোখ বুজে থাকলেই হল।” একটু আগে তার চোখ বোজার ব্যাপার নিয়ে গোবিন্দবাবুর রসিকতা আর এখন আবার তার কথার জবাবে সেই চোখ বোজার কথাই আসা—গোবিন্দবাবু ঠারে-ঠোরে কিছু বোঝাতে চান কিনা

অশ্বিনী ঠাহরের চেষ্টা পায়। কিন্তু তার কথাটা যে নেহাতই বলার জন্য বলা, কিছু ভেবে নয়, কোনো অভিজ্ঞতা থেকেও নয়, সেটা বোঝাবার জন্য অশ্বিনীকে মিছিমিছি একটা হাই তুলতে হয়, তারপর দু-হাত ওপরে তুলে আড়মুড়ি ভাঙতে হয়, তারপর গোবিন্দবাবুকে সম্মান দেখাবার জন্য সোফার কিনারায় বসা ভঙ্গি থেকে হেলান দিয়ে কাত হয়ে পড়ে। তাতে যে তার ভঙ্গির এতক্ষণকার অর্থটাও বদলে যায়, এটা অশ্বিনীর মগজে ঢোকে না।

বড়বাবুর দেওয়া টাকাটা অশ্বিনী নিয়ে এসেছে। তা দিয়ে সাংসারিক জিনিসপত্র যেমন কিনবে তেমনি একটু বেড়ানো-টেড়ানোও হবে। বড়বাবু তাকে কেন টাকা দিয়েছেন অশ্বিনী সেটা জানে না। কিন্তু একবার যখন দিয়েছেন, আরো নিশ্চয়ই দেবেন। অন্যান্য বাগানেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আসলে যদি জানা যেত টাকাটা পাওয়া যাবে তাহলে অশ্বিনী একটা হিসেব কষতে পারতো। কিন্তু চুরির ব্যাপারটা তো অশ্বিনী জানে না।

অশ্বিনী টান হয়ে বসে। তার বাক্যটা হওয়া উচিত ছিল "আবার চুরি না-জেনেও···"

অশ্বিনীর অভিজ্ঞতা প্রকাশের মতো ভাষা যেন তার আয়ত্তে নেই। গোবিন্দবাবু জিজ্ঞাসা করছেন, "তোমরা কখন এসে পৌঁছেছ ; আর বেড়াতেই বা গেলে কখন—"

"আমরা এই দশটা-এগারোটার মধ্যে এসে পৌঁছেছি, তারপরই বেরিয়েছি।"

"দশটা আর এগারোটার মধ্যে তো একটা ঘণ্টা হে, লুস্থুর স্কুলে যাবার পর ?"

"হ্যাঁ", অশ্বিনী বলে দেয়। তারপর শোধরায়, "হ্যাঁ, মানে লুস্থু তখনই বেরচ্ছিল।"

"ও, তাহলে তোমরা এই ফিরলে—"

"এ-ই না। এই কিছুক্ষণ।"

"লুস্থু স্কুল থেকে কখন ফিরল ?"

"আমি আর" অশ্বিনী হঠাৎ বুঝতে পারে বেণুকে সে কোনো সম্বোধন করে না. করছেও না, "উনি গিয়ে নিয়ে এলাম, দিদি আর ও বাড়িতে থেকে গেল, এসে এই একটু ঝিমোচ্ছিলাম, আপনি এসে গেলেন।"

হিসেব দিয়ে অশ্বিনী যেন একটু স্বস্তি পায়। পেয়ে তার মনে হল গোবিন্দবাবু হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছেন এরকম চিন্তা তার মাথায় এলো কেন।

"আপনার ব্যাঙ্কের চাকরিই ভালো, যা কিছু সব নগদ-নগদ, পাকা হিসেব" বলার পর অশ্বিনী বোঝে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে হিসেবের ব্যাপারটাকে সে এক করে রেখে দিয়েছে।

"হ্যাঁ তা যা বলেছ, ব্যাঙ্কে আমার যা-চাকরি আর ব্যাঙ্কের সঙ্গে তোমার যা সম্বন্ধ তাতে খুব পাকা হিসেবের ব্যাপার। কিন্তু আসল জায়গায় সবটাই বেহিসেবের ব্যাপার। হিসেব করার জন্য তো লোকে আর ব্যাঙ্ক খোলে না"—গোবিন্দবাবু অশ্বিনীর দিকে তাকিয়েই কথা বলছিলেন। গোবিন্দবাবুর নিজস্ব কতকগুলি অভিজ্ঞতা অনুভূতির জায়গা আছে। সেটা হয়তো সঙ্কীর্ণ কিন্তু এক-চেটিয়াভাবে তাঁর নিজস্ব। সেই অভিজ্ঞতা অনুভূতির বাইরে তিনিও পা দেন না, আর সবাই যতক্ষণ তার বাইরে থাকে তিনিও ততক্ষণ তাদের নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু একবার যদি কেউ সেই নিজস্ব একচেটিয়া পরিধির মধ্যে এসে পড়ে তাহলে গোবিন্দবাবু তাঁর এক-চেটিয়া অধিকার দেখাতে কিছুমাত্র রেয়াত করেন না। তিনি যে এমন একটা নিজস্ব জগৎ বানিয়ে বসে আছেন সেটা চট করে বোঝাই যায় না—অফিসের বাইরে কোনো সামাজিকতার দায়দায়িত্ব না মানা, বাড়ির ও বাইরের সব কিছুতেই ঘাড় হেঁট করে সম্মতি দিয়ে যাওয়া বা নিজেকে অপ্রত্যক্ষ করে ফেলা, চুপচাপ দিন কাটানোর ভেতর বরং যেন খানিকটা পালানোর বা আত্মরক্ষার

ভাবই ধরা পড়ে। আসলে এ-সবটাই তাঁর সেই নিজস্ব জগৎকে রক্ষার অস্ত্র।

তাঁর অভিব্যক্তির দুটো ধরন আছে। সাধারণভাবে যেটা প্রকট সেটা খানিকটা স্মিত হাসি, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কখনো, কখনো বিশিষ্ট সময়ে তাঁর ঠোঁট দুটো চাপা, তাতে অনেক ভাঁজ পড়ে, চিবুকটাতে একটা শাণিতভাব আসে।

আট

ব্যাঙ্ক-ব্যাপারে অশ্বিনীর কথায় তিনি যে গাম্ভীর্যে ও ধীরতায় জবাব দিলেন তাতে আবগারি চুরির ব্যাপারে অশ্বিনীর কথার সুরের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কিন্তু অশ্বিনীর মতো তিনি অভিজ্ঞতার যোগ্য ভাষা ব্যবহারে অপারগ নন।

"ব্যাঙ্ক খুলেছে, মানে মালিকদের কথা বলছেন?" অশ্বিনীর প্রশ্নটা খুব ছেলেমানুষী শোনায়। এত ছেলেমানুষী যে গোবিন্দবাবু সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দেন না। তারপর কী ভেবে শুরু করেন, "ব্যাঙ্ক তো কেউ খোলে, সবাই তো আর খুলতে পারে না, যাদের ক্ষমতা আছে তারাই খোলে। সারা দেশে যত বাড়তি টাকা আছে, মানে সঙ্গে সঙ্গে খরচা হওয়ার বাইরে কিছুদিনের জন্য জমানো টাকা আছে, সেটাকে হাতে আনাই তো ব্যাঙ্কের আসল ব্যাপার। আর হাতে এনে তো বসিয়ে রাখা যায় না, টাকা তো আর ডিম পাড়ে না, টাকা খাটাতে হয়। খাটাতে হবে ব্যবসায়, ইণ্ডাস্ট্রিতে, এগ্রিকালচারে, মানে যেখানে রিটার্ন আসবে। তাহলে ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যবসা, ইণ্ডাস্ট্রি, এগ্রিকালচারের যোগ থাকা দরকার। যোগটা হতে পারে দুইভাবে। গবমেণ্ট করে দিতে পারে। আবার ওসবের মালিকরা ব্যাঙ্কের মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। কিন্তু অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে ব্যাঙ্কের টাকাটা আসলে আয়ড্‌ল্ হয়ে পড়ছে, দিনকে দিন। এত চোরাই টাকা ব্যবসাদার

আর ইণ্ডাস্ট্রির হাতে এসে গেছে যে সে-সব টাকাই তারা রোল করাচ্ছে।”

“মানে?”

“ধরো তোমার বাগানের মালিক তোমাকে ঘুষ দেবে। সে তো আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তোমাকে দেবে না। তাহলে তো হিসেব দিতে হবে ঐ টাকার। সে তাহলে হিসেবের বাইরের টাকা থেকে হিসেবের বাইরের খরচা করবে তো। হিসেবের টাকাটা সে পাবে কোথায়। ধরো আজকাল ইণ্ডিয়ান কনসার্নে আর অকশনে চা না পাঠিয়ে লোক্যাল সেল করছে। লোক্যাল সেলে যা লেখা দাম, খদ্দের পাউণ্ড পিছু তার চাইতে এক বা দুই পয়সা বাড়তি দিল। সেটা হচ্ছে মালিকের বা ম্যানেজিং এজেন্সির হিসেবের বাইরের পুরো চোরাই লাভ। তা থেকে তোমার ঘুষের টাকা দিচ্ছে। তুমিও যে টাকা পাচ্ছ সেটা তো আর ব্যাঙ্কে রাখবে না। হয় খরচ করবে, না হয় ঘরে রেখে দেবে। তাহলে দেখো ব্যাঙ্কের টাকায় হাত না দিয়ে বা ব্যাঙ্কে টাকা না জমিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি চলবার একটি পথ তৈরি হয়েছে। সেটাই এখন ব্যাঙ্কিং ইণ্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় সমস্যা। হাউ টু হার্নেস্ দি ফ্লোটিং মানি?”

বেণু ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে বললো, “অন্ধকারে বসে বসে কী হার্নেস্ করছো?” বেণুর হাত থেকে চা নিয়ে গোবিন্দবাবুর গম্ভীর মুখটার দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী প্রথম আবিষ্কার করে বেণুর আর গোবিন্দবাবুর চিবুকের গঠনটা একরকম।

“এই বৌদি, এই গোলাপ দি, ওঠো, কত ঘুমোবে, চা হয়ে গেছে”, বেণু হাঁকাহাঁকি করে।

চা হাতে নিয়ে টগর-গোলাপ এ-ঘরে এসে বসে। গোবিন্দবাবু গোলাপের দিকে তাকিয়ে বলে, “তুমি এসেছ বুঝে আমি আজ এক ঘণ্টা আগে অফিস থেকে চলে এলাম, এসে দেখি তুমি ঘুমোচ্ছ! খুব বেড়িয়েছ বুঝি?”

"হ্যাঁ, বটানিকাল গার্ডেনে গিয়েছিলাম, বাবা, হাঁটতে গেলে হাঁফ ধরে।" গোলাপ চায়ে চুমুক দেয়। টগর চায়ের কাপটা ধরে দরজার দিকে চোখটা মেলে ধরে।

চায়ে চুমুক দিয়ে গোবিন্দবাবু বললেন, "খবর দিলেই পারতে, আমি তাহলে ছুটি নিতাম।" হেসে উঠল বেণু। তার দেখাদেখি লুম্নু।

"বৌদি। দাঁড়াও, দাদাকে জব্দ করবো। গোলাপদিকে আর অশ্বিনীবাবুকে একদিন ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব, দাদাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবে বলে"—বেণু বলে।

"জব্দ আর কি করবি? বেড়াতে বেরোব। আমি কি বেড়াই না নাকি?"

এতক্ষণে টগর কাপে চুমুক দেয়, তারপর বলে, "সেই উপলক্ষে তোমার ব্যাঙ্কের সবাই বেশ একদিনের ছুটি পাবে।"

"কেন" গোলাপ জিজ্ঞাসা করে।

"উনি ছুটি নিলেন সেই উপলক্ষে"—টগর একটা লম্বা চুমুক দেয়। কাপটা টেবিলে রেখে টগর বলে ওঠে, "আরে, কটা বাজে, আজ তো মিঃ সান্যালের ওখানে দুর্গাপূজোর মিটিঙ আছে, যেতে হবে।"

"আগে জানলে তো তোমাকে ঘুম থেকেই তুলতাম না"—বেণু বলে।

"তাতে কোনো ক্ষতি হত না বেণু। তোর বৌদির হাঁটার পরি-শ্রমটুকু বাঁচতো। স্বপ্নের মধ্যেই মিটিঙ অ্যাটেণ্ড করতো ঠিক"—গোবিন্দবাবু পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসেন।

"আহা-হা, তা-ও তো আমি লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগটা রাখি। তোমার মতো হলে তো আর পাশের বাড়ির লোককেও চিনতে পারতাম না। দুর্গাপূজোর মিটিঙ, সেই কবে নোটিশ দিয়েছে, যেতে হবেই, নইলে বিচ্ছিরি হবে। অশ্বিনী যাবে নাকি, চলো"—টগর ওঠার উদ্যোগ করে।

গোলাপ বলে, "জিনিসপত্রগুলো কেনাকাটা করবে না? কাল সকালেই তো বাগানে ফিরবে।"

টগর শুধোয়—"কি কিনবে? টি সেট?"

গোলাপ বলে, "ঐ আর কি, কিছুই তো কেনা হয় নি, সংসারে কত কি লাগে। আর এখানে দু-চারজন বাড়িতে আসে, বসতে দেয়ার পর্যন্ত কিছু নেই।"

"তো ও সব জিনিস কেনাকাটায় অশ্বিনী গিয়ে কি করবে, ও গেলে তো তোকে খরচার কথা বলে জিনিসপত্র কিনতে দেবে না। তার চাইতে তুই আর বেণু যা, মনের সুখে জিনিস কিনে নিয়ে আয়।"

গোবিন্দবাবুও যোগ দেন, "সেই ভালো। তাছাড়া অশ্বিনীর সঙ্গে ওখানে লোকজনের দেখা-সাক্ষাৎ-ও হবে, আলাপ-পরিচয় হবে। যাও না অশ্বিনী তোমার দিদির সঙ্গে মিটিঙেই যাও।"

অশ্বিনী বুঝতে পারে না গোবিন্দবাবু ঠাট্টা করছেন কিনা। "তাহলে অশ্বিনী তৈরি হয়ে নাও", বলে টগর ভেতরে চলে যায়।

তৈরি হওয়ার কথা শুনেই অশ্বিনী একটু ভড়কে যায়। আজ বিকেলেই বাগানে ফিরবে ঠিক ছিল, কোনো বাড়তি জামা-কাপড়ও সঙ্গে আনে নি।

বেণু বলে, "গোলাপদি, ঘাবড়িয়ো না, বৌদি আর অশ্বিনীবাবু আগে বেরোন, তারপর আমরা বেরোব, একেবারে বাজার সুদ্ধ কিনে আনবো।"

"পিউমণি আমি যাবো?" লুসু বেণুর কোল ঘেঁষে বলে। বেণু লুসুর গাল টিপে দিয়ে বলে, "তাহলে তুমিই মাসীমণিকে নিয়ে যাও, আমি বাড়িতে থাকি, বেবি আর খোকন ঘুম থেকে উঠলে ওদের দেখবে কে?"

নয়

ভেতরে বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ পাওয়ার পর অশ্বিনী ওঠে। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে টগর নিচু হয়ে পা মুছছিল। সরে, অশ্বিনীকে জায়গা দিয়ে বললো, "নাও, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।"

টগরকে পেরিয়ে গিয়ে অশ্বিনী ফিরে বলে, "তৈরি হওয়াটাই তো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। আজ বিকেলে ফিরবো বলে বাড়তি জামা প্যাণ্টও তো আনি নি।"

গামছাটা হাতে টগর খাড়া হয়, কোনো কথা বলার আগে অশ্বিনীকে দেখে নিয়ে বলে, "তাহলে আর করবে কি, এতেই হবে, চলো।" মুখহাতে জল দিয়ে অশ্বিনী ঘরে এসে দেখে আয়নার সামনে টগর। আয়না থেকে মুখ না সরিয়েই টগর বলে, "এসো, তুমি চুল আঁচড়ে যাও।" বলার পরও টগর আয়না থেকে সরে না, ভুরু কুঁচকে চোখের তলায় আঙুল দিয়ে কী একটা ঘষে। দু-ঠোঁট চেপে ভেতরে নিতে নিতে টগর 'এসো' বলায় কথাটা একটু অন্যরকম শোনায়। তদুপরি কথাটা বলার সময় টগর অশ্বিনীর দিকে তাকায় না। অশ্বিনী কাছে গিয়ে দাঁড়ালে টগর মুখ তুলে সরে দাঁড়ায়। মুহূর্তের জন্য অশ্বিনীর চোখে পড়ে টগরের মুখের রঙটা পাল্টে গেছে। আয়নায় চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অশ্বিনীর নজরে পড়ে যায় টেবিলের ওপর নানা রকম শিশি। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অশ্বিনীর মনে হয় গোলাপ কি খেয়াল করে এ-সব কিছু কিনবে, না-কি তাকে কিনতে হবে। অশ্বিনীর আরো মনে হয়, এ-সব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ী হয়ে কি বেণু বা টগরের সঙ্গে কিছু কেনাকাটা করা চলে, না-কি কাল বাগানে ফেরার জন্য যখন বেরবে, তখন দুজনা মিলে কিনে নেবে অথবা কোনো সময় অশ্বিনী একাই?

টেবিল থেকে অশ্বিনী সরে যেতে গেলেই টগর বলে ওঠে, "দেখি

এদিকে ফেরতো।" অশ্বিনী ঘুরে দাঁড়ালে টগর যখন ঘাড় উঁচু করে চুল, তারপর ঘাড় নিচু করে প্যান্টের ভাঁজ দেখে তখন অশ্বিনীও যেন টগরের গলার মুখের বদ্‌লে যাওয়া রঙ, আঁচড়ানো চুল দেখে। বোধহয় সাজগোজ করার প্রয়োজনে, শাড়িটার আঁচল কাঁধ থেকে সরানো। শাড়িটা জামাটা বদলানো হয় নি। বোধহয় প্রসাধন শেষ হয়েছে। ফলে অশ্বিনীর থিয়েটারের গ্রিনরুমের কথা মনে হল। "একটু স্নো মেখে নাও, মুখের তেলতেলে ভাবটা থাকবে না।

"ধ্যুত্‌ আমি ও-সব কখনো মাখি না।"

"আরে মাখোই না, কী হবে মাখলে" আঙ্গুলে করে স্নো তুলে টগর অশ্বিনীর কপালে, নাকের পাশে, আর চোয়ালের হাড় দুটোর ওপর লাগিয়ে দিয়ে বলে, "নাও মেখে নাও।" লাগিয়ে দেবার সময় টগরকে উঁচু হতে হয়। অশ্বিনী যেন লক্ষ্য করে টগরের ঠোঁটের রঙও পালটেছে।

অশ্বিনী যখন দুই হাতে মুখে স্নো ঘষছে টগর বলে ওঠে, "দাঁড়াও, তোমাকে একটা সোয়েটার পরিয়ে দি, বেণু।"

জবাব না দিয়ে বেণু দরজায় এসে দাঁড়ায়। তারপর বলে ওঠে, "আরে গোলাপদি দেখে যাও, দেখে যাও, তোমার জংলী বরকে বৌদি কেমন সভ্যভব্য করে নিচ্ছে।"

গোলাপ-লুস্থু এসে বেণুর পাশে দাঁড়ায়। বেণু খিলখিল করে হাসে। গোলাপ মুখে আঁচল চাপা দেয়। লুস্থুও হাসে।

টগরও হেসে বলে, "করবো কি, জামাই যে আর প্যান্ট-শার্ট আনে নি—"

"দাদারটা পরিয়ে দাও, খুব ফিট করবে।"

"জামাইবাবুরটা পরলে তো ওর হাঁটুর নিচে সবটাই খালি থাকবে, বেশ লাগবে"—গোলাপ বলে।

"কেন, কী এমন জায়গায় যাচ্ছি, এতে চলবে না?" অশ্বিনী নিজেকে দেখে।

"খুব চলবে", টগর বেণুকে বলে, "ওঁর ঐ সোয়েটারটা দে-তো, গেল বছর রঙ করা হলো, ওটা তো একটু ঝোলা, অশ্বিনীর লেগে যেতে পারে।"

বেণু একটু ভেবে অন্য ঘরে গেল। একটা ট্রাঙ্ক খোলার আওয়াজ আসে। টগর জিজ্ঞাসা করে, "পেলি?"

বেণু দুই হাতে সোয়েটারটা ঝুলিয়ে দেখতে দেখতে এ-ঘরে আসে —"ঠিকই বলেছ, অশ্বিনীবাবুর গায়ে লেগে যাবে।" অশ্বিনীকে ডিঙিয়ে বেণুর হাত থেকে সোয়েটার নিয়ে টগর তলার দিকটা ফাঁক করে অশ্বিনীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "পরো তো···"

হাত দুটো আর মাথাটা গলিয়ে দিলে টগরই বুক থেকে সোয়ে-টারটা টেনে নামিয়ে দেয়। টগরের একহাতে চিরুনি ধরা। হাতটাও সে টেনেটুনে ঠিক করে। তারপর দু-পা পেছিয়ে দেখে বলে, "ঠিক হয়েছে। ঠিক হয় নি বেণু?"

"হ্যাঁ। ফিট করেছে।"

"কিরে গোলাপ?"

"ছোকরা ছোকরা লাগছে।"

"বাঃ বাঃ, বুড়োর সোয়েটার গায়ে দিয়ে ছোকরা হয়ে গেল।"

টগর চিরুনিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "নাও চুলটা ঠিক করে নাও।"

এবার আর অশ্বিনী যত্ন করে চুল আঁচড়ায় না। তাড়াহুড়ো করে চিরুনি চালিয়ে টগরকে দিয়ে বলে, "নিন হয়েছে, এখন চলুন,"

"আপনার হয়েছে, বৌদির তো আর হয় নি।"

"না, আমি শাড়িটা বদলেই যাচ্ছি।" অশ্বিনী বাইরের ঘরে ঢুকতে গিয়ে গোলাপের সামনে দাঁড়িয়ে খুব আস্তে আস্তে বলে, "আমার কাছে কিছু টাকা দাও আর যদি পারো তোমার ব্রেসিয়ার আর ভালো স্নো পাউডার কিনো।"

"টেবিল-চেয়ার কিনবে বলেছিলে যে?"

"দেখি, কাল সকালে।"

"তাহলে এ-সবও কাল সকালেই কেনা যাবে।"

অশ্বিনী বাইরের ঘরে গিয়ে বসে। গোবিন্দবাবু বলেন, "বাঃ, তুমি তো রেডি, তোমার দিদির কদ্দুর।"

"হচ্ছে। আপনি এ-সব মিটিঙে যান না?"

"কোনো মিটিঙেই যাই না। আসলে তোমার দিদি এগুলো করেন বলে আমার আর দরকার হয় না। তুমি যাও। লোকজনের সঙ্গে আলাপ হবে, ভালো লাগবে; তাছাড়া থাকছ যখন এখানে, একটু পরিচয় করে রাখা ভালো।"

গোলাপ এসে দরজায় দাঁড়ালে অশ্বিনী গিয়ে তার হাত থেকে টাকা নিয়ে পকেটে রাখে। তারপর আবার গিয়ে চেয়ারে বসে।

টগর পর্দা ঠেলে ঘরে এসে সোজা গিয়ে দরজার ছিটকিনিতে হাত দেয়। অশ্বিনী উঠে দাঁড়িয়ে গোবিন্দবাবুকে বলে, "তাহলে মিটিঙ করে আসি—"

"হ্যাঁ, এসো।"

দরজাটা খুলে প্রথমে টগর অশ্বিনীকে বেরতে দেয়, তারপর নিজে বেরয়। গোবিন্দবাবু দরজাটা বন্ধ করেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মোড়টায় এসে টগর বলে, "দাঁড়াও তো।" অশ্বিনী দাঁড়ায়। টগর ব্যাগসহ তার হাতটা দিয়েই অশ্বিনীর সোয়েটারের হাতাটা জামার হাতার ওপর টেনে মাঝামাঝি তুলে দেয়। তারপর দেখে বলে, "এ-রকম থাক।"

বাকি সিঁড়িটা নামার সময় ও পথে নামার পরও অশ্বিনী দেখে টগর তাকে আপাদমস্তক দেখার জন্য বারবার মাথা তুলে তাকাচ্ছে। গোবিন্দবাবুর সোয়েটার পরেছে, দার্জিলিঙে একটা মিটিঙ করতে যাচ্ছে, তার সাজগোজের ব্যাপারে খানিকটা প্রস্তুতি তো নিতেই হয়েছে, একটু অস্বস্তি থেকে অশ্বিনীও নিজেকে দেখছিল। কিন্তু সে দেখাটা আসলে টগরের দৃষ্টির অনুসরণমাত্র। যেন টগর যাচাই করে নিচ্ছে অশ্বিনীর পোশাকের ওপর আরো কিছু করা যায় কি না।

টগরের এই বারবার তাকিয়ে দেখার ব্যাপারটা কিন্তু অশ্বিনীকে এ-চিন্তায় ঠেলে দেয় না যে টগর যাচাই করে দেখছে অশ্বিনীকে নিয়ে সেই মিটিঙে ঢোকা যাবে কি না। ঠেলে যে দেয় না তার কারণ টগর নিজে থেকে অশ্বিনীকে যেতে বলেছে, নিজে থেকে অশ্বিনীকে সাজিয়েছে। উদ্যোগটা টগরের। অশ্বিনীকে যদি এখন টগর বলত, না, অশ্বিনী তোমাকে দিয়ে হবে না,—কিছু মনে না নিয়েই অশ্বিনী ফিরে যেত। কারণ এই মিটিঙের ব্যাপারটার সঙ্গে অশ্বিনী নিজেকে এখনও জড়িয়ে ফেলে নি। জড়িয়ে ফেলে নি বলেই টগরের দৃষ্টি অনুসরণ করে সে নিজেকেই দেখে। পরিবেশ বা পরিস্থিতির এত অনুগত অশ্বিনী যে সে তার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণতই ছেড়ে দিতে পারে।

দশ

চৌমাথায় এসে টগর অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, "যাক, তুমি যে তোমার দাদার মতো নও রক্ষে, তোমাকে নিয়ে সামাজিকতা ইত্যাদি রাখা যাবে। লোকের সঙ্গে যত পারো মিশবে, মেশার ব্যাপারে ভালোমন্দ বিচার করবে না, দেখবে, কখন যে কে কাজে লেগে যায়—"

বারবার মুখ ফেরানোয় অশ্বিনী বুঝতে পারে টগরের ঠোঁটে মুখে চোখে বা ভুরুতে যে পরিবর্তনগুলির আভাস সে ঘরের ভেতরে দেখেছিল তা এই সম্পূর্ণ পোশাকের পর বাইরে এসে যেন শেষ হয়েছে। সম্পূর্ণ চেহারাটাই যেন বদলে গেছে, হাসলে টগরের দাঁতগুলো বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। অশ্বিনীর বড় ভালো লাগল। টগরের কথা যখন শেষ হয়ে গেছে, মুখ যখন ফিরে ফিরে আর অশ্বিনীর দিকে উঠছে না, তখনো টগরের চুল আঁচড়ানো, ঘাড়, ঘাড়ের দু-পাশের উড়ো চুল, ঘাড়ের নিচে পিঠের বেশ কিছুটা, চাদরটা এমনভাবে হাতের ওপর ফেলা যেন সেটাও পোশাকের

একটা অঙ্গ—এইসব অশ্বিনী দেখছিল। দেখতে দেখতে অশ্বিনীর দেখার ইচ্ছে জাগে। টগরের মুখটা সে দেখতে চায়। সারা দুপুর যে-টগরের সঙ্গে বেড়িয়েছে তার মুখটা এমন বদলে গেল কী করে। অশ্বিনী বলে, "যেখানে যাচ্ছি সেটা কোথায়?" টগর মুখ না তুলে জবাব দেয়, "মিঃ সান্যালের বাড়ি।" "ওর বাড়িতে মিটিঙ?" "হ্যাঁ, তুমি কি ভেবেছিলে পাবলিক মিটিঙ"—এ-কথাটা বলার সময়ও টগর মুখ তোলে না, "সিলেকটেড্ গ্যাদারিং, বলতে পারো দার্জিলিঙের এলিটদের গ্যাদারিং।" এতক্ষণে টগর তার হাসি হাসি মুখটা তোলে। অশ্বিনী তার মাথাটা বেশ ঝুলিয়ে যেন খুঁটিয়ে দেখতে চায় টগরের মুখের বা ঠোঁটের রঙ ছাড়াও আর কি কি পরিবর্তনের ফলে তার হাসিটা এত ঝকঝকে আর দৃষ্টি এত চকচকে দেখাচ্ছে।

অশ্বিনী হাঁটার গতিটা একটু কমিয়ে দিয়ে দু-পা পেছিয়ে যায়। তারপর টগরকে দেখে। টগর একটু চড়াই রাস্তাটার ওপর দিয়ে যেন লতিয়ে উঠে যাচ্ছে। অশ্বিনীর নজর পড়ে যায় হাঁটার সময় টগরের ঘাড়-পিঠের একটা ছন্দ আছে। টগরের পাশে চলে যায় অশ্বিনী। যেন টগর জানে দু-পা হঠাৎ পেছিয়ে গেল কেন অশ্বিনী, এমনি ভাবে ঘাড় তুলে বলে, "এসে গেছি, আর বেশি হাঁটতে হবে না।" তারপর একটু থেমে বলে, "প্লেইন্স্ থেকে পাহাড়ে এসে লোকে এই অসুবিধেটা খুব বোধ করে, এখানে হাঁটাটাই একমাত্র উপায়, কোনো যানবাহন নেই।" অশ্বিনী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না হাঁটাটা অসুবিধেজনক কেন হবে, বিশেষত এখন, যখন তার হাঁটতে এত ভালো লাগছে, সে বলে বসে—"না, আমার তো এখন হাঁটতে ভীষণ ভালো লাগছে।"

টগর ঘাড় তোলে "তুমি দেখো অশ্বিনী, তোমার দার্জিলিঙ ঠিক স্যুট করবে, মানে তুমি ঠিক মিশ খেয়ে যাবে, আমার তোমাকে দেখেই মনে হয়েছিল, বেণুর মতো—"

"কেন, আপনি মিশ খান নি ? আপনার মতো না কেন ?"

"তা না, মানে দার্জিলিঙের একটা ব্যাপার আছে, দেখো। ঐ তো, এসে গেছি"—ওপর দিকে আঙুল তুলে টগর বলে। জানলায় আলো। সব জানালাগুলিই কাচের। ফলে মনে হচ্ছে ঘরটাই যেন আলোর। বাড়িটার তলা দিয়ে, পেরিয়ে গিয়ে তারা ওপরের তাকটাতে উঠে তারপর বাড়িটার দিকে ফিরল। গাড়ি বারান্দার নিচে একটা গাড়ি থেকে প্রথমে ভদ্রলোক, তারপর মহিলা নামলেন। গাড়ির সামনে এগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আরো গাড়ির সারিতে গেল। ভদ্রলোক টগরকে দেখে দাঁড়ালেন, "ইয়েস টগরদি, ভালো তো ?" ভদ্রমহিলা ততক্ষণে সিঁড়িটা টপকে ভেতরে ঢুকছেন। তাঁর পরনে গভীর নীল রঙের ওপর সোনালি কাজ করা শাড়ি। তিনিও ঘাড় ঘুরিয়ে মাথা নোয়ালেন। ওঁরা ভেতরে ঢুকে গেলে টগরদি হাঁটতে হাঁটতে একটা হাত উঁচু করে বললেন, "ইভ্‌নিং, ইভ্‌নিং।" ওরা সদর দরজা পেরলেন। টগর ঘাড় উঁচু করে ফিসফিসিয়ে বললে, "মিঃ পেটালিকর, বিরাট প্ল্যান্টার, বোম্বাই না গুজরাট না-কি কোথাকার লোক যেন, মাঝে মাঝে এসে মাস দুই তিন থাকেন।"

সিঁড়ি দিয়ে দরজা পেরলে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। টগর-অশ্বিনী যখন সিঁড়িতে পা দেয়, পেটালিকররা তখন প্রথম বাঁকের মাঝপথে। অশ্বিনী দেখে ওরা খুব ধীরে ধীরে উঠছেন। মিসেস পেটালিকর এক সিঁড়ি এগিয়ে, মিঃ পেটালিকর এক সিঁড়ি পেছিয়ে। মিঃ পেটালিকর দু-হাত দিয়ে কিছু একটা ধরে আছেন, তাঁর ঘাড়টাও জিনিসটার ওপর নোয়ানো। সিঁড়ির বাঁকটায় মিসেস পেটালিকর পা দিতেই মিঃ পেটালিকর তাঁর ডান হাতটা একটু বাড়িয়ে দেন। ধীরে ধীরে ওঁরা বাঁকের আড়ালে চলে যান।

টগর-অশ্বিনী মিঃ ও মিসেস পেটালিকরের পেছন-পেছন উঠছিল বলে ওদের গতিও কমে আসে। সিঁড়ির বাঁকটা পেরিয়ে দু-ধাপ উঠতেই ওরা দেখে মিঃ পেটালিকর পেছন থেকে পর্দাটা

তুলে ধরেছেন, তাঁর ডানহাতে একটা পাইপ—এতক্ষণ পাইপেই তামাক ভরছিলেন,—মিসেস পেটালিকর ঘরে ঢুকলেন।

বাইরে থেকেই ওরা শুনতে পেল পেটালিকররা ভেতরে ঢুকলে কলস্বরে তাঁদের সংবর্ধনা করা হল।

সিঁড়ির ধাপ প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। অশ্বিনী টগরের কনুই ধরে একটু টান দিতে টগর তাকায়। "একটু পরে ঢুকুন, ওরা বসে নিক।" ভেতরে ক-জন আছে, কারা আছে, পেটালিকর কে, তার সঙ্গে আর সবার সম্পর্ক কি—এ-সব সাত-সতের না জেনেও অশ্বিনী টগরকে যে একটু পরে ঢুকতে বলে, ওদের বসার সময় দিতে চায়—তা এমন অনিশ্চিত অবস্থার সামনে তার স্বাভাবিক সঙ্কোচের জন্য, নাকি, কোন্ মুহূর্তটি তার ঢোকার পক্ষে সবচেয়ে ভালো সে-বিষয়ে অশ্বিনীর একটা সহজ জ্ঞান আছে। টগর গতিটা একটু শ্লথ করে দেয়।

দরজার পর্দা তুলবার জন্য টগর হাত বাড়াতে পেছন থেকে অশ্বিনী পর্দাটা তুলে ধরে, টগরও হাতটা নামায় না, পর্দার কিনারায় আঙুল ছুঁইয়ে সে ভেতরে ঢোকে।

পেটালিকররা তখনো বসেন নি। লম্বা ঘরটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাইপটা মুখে গোঁজা, দেশলাইটা জ্বালছেন। তাঁদের ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে। বোঝাই যায়, দরজায় তাঁদের দেখে সবার উঠে আসা আর তাঁদের এগনোর ফলে ঐ জায়গায় তাঁরা মিলে ছিলেন। পেটালিকর দেশলাইটা জ্বেলে পাইপ ধরাতে গিয়েই বোধহয় টগর-অশ্বিনীর ঢোকাটা বুঝতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে, পাইপ জ্বালাতে জ্বালাতেই একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, "টগরদি আসুন"। তাঁর এই কথাটুকুর জন্যই টগরের পক্ষে সম্ভব হল—"আপনি এসেই সবাইকে রিসিভ করা শুরু করে দিয়েছেন?" বলে ঐ দলের ভেতর গিদে দাঁড়ান। অশ্বিনী ছোট্ট, ছোট্ট, দু-পদক্ষেপে দলটির সীমান্তে দাঁড়ায়। পেটালিকর পাইপ চিবিয়ে টানতে টানতে

বলেন, "হোয়াই নট। আপনাদের তো একটা রিসেপশন সাব্-কমিটি হবে নিশ্চয়ই।" কাঠিটা নিবে যায়, সেটা ফেলবার জন্য পেটালিকর একটু এদিক-ওদিক তাকাতেই তাঁর ডানদিকের দু-একজন সরে যায়, ডানদিকের দেয়ালে সোফার সারির সামনে সেণ্টার টেবিলের ওপর রাখা অ্যাসট্রেতে কাঠিটা ফেলে ফিরতে ফিরতে পেটালিকর বলেন, "আমি সেই সাব-কমিটির মেম্বার হবো।"

ঘর, লোকজন, কথাবার্তা—এই সব ব্যাপারটা অশ্বিনী ক্রমে ক্রমে দেখে। তার দেখার ভেতরে একটা পদ্ধতি আছে। নইলে সে দরজা দিয়ে ঢুকে হুড়মুড়িয়ে সব দেখে নিল না কেন। ততক্ষণ পর্যন্ত অশ্বিনী কিছু দেখতে বা শুনতে চেষ্টা করে নি, যতক্ষণ তার কিছু করণীয় ছিল। আবার সেই করণীয়টুকুও অশ্বিনী দেখে-শুনেই নিচ্ছিল। এই যেমন, টগরকে আগে ঢুকতে দেয়া, পর্দাটা তুলে ধরা, পেটালিকরকে ঘেরা দলটার সীমান্তে দাঁড়ানো। দেশলাইয়ের কাঠি ফেলবার জন্য বৃত্ত থেকে পেটালিকরের নিষ্ক্রমণ অশ্বিনীকেও পেটালিকর ছাড়া অন্যদিকে তাকাবার সুযোগ দেয়। বৃত্তের ভেতরে পেটালিকরের পুনঃপ্রবেশও তখন আর অশ্বিনীকে তার কাজ থেকে বিরত করতে পারে না। কারণ তখন অশ্বিনী বুঝে গেছে ঐ মুহূর্তে তার কিছু করণীয় নেই, সে একটু একটু করে ঘর, লোকজন, কথাবার্তা দেখে-শুনে নিতে পারে।

এগার

ঘরটা বেশ লম্বা চওড়া। পরে, যখন মিটিঙ চলবে অশ্বিনী মনে মনে মাপবে। উত্তর দেয়ালের সবটা জুড়ে সোফা। পুব দেয়ালের ততটা পর্যন্ত, যেখানে ভেতরে যাবার করিডর। প্রায় বাইরের দরজাটা পর্যন্ত। এটাও পরে অশ্বিনী মনে মনে মাপবে। দক্ষিণ দেয়ালে, পেটালিকরের পেছনে, বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গার পরে

একটা খুব উঁচু ফায়ার প্লেস। ফায়ার প্লেসের ওপরে পাটাতনের ওপর যিশুর একটি মূর্তি। ছু-পাশে ধূপদানি। দোতলার মেঝেটি কাঠের। সিঁড়িটিও কাঠের। সিঁড়ি, মেঝে ও ফায়ার প্লেসের ওপরের পাটাতনের রঙ একই। বেগুনি বার্নিশ পুরনো হয়ে গেলে যেমন হয়। অশ্বিনীর জ্যাঠামশাইয়ের বিয়ের খাটটার মতো। অশ্বিনী বোঝে না এ-রকমই রঙ করা, না-কি ময়লায় এ-রকম। মেঝের রঙটা দেখার জন্য অশ্বিনীকে খোঁজাখুঁজি করতে হয়েছে। এ-ঘরের সবটাই পাতলা চটের কার্পেটে ঢাকা। করিডরের ভেতরে মেঝের রঙটা দেখতে হয়েছে অশ্বিনীকে। দেয়ালটা আর্চের মতো —তার নিচে করিডরের দরজা। সিলিংটাও ঢেউ খেলানো। দেখে অশ্বিনীর মনে প্রশ্ন জাগে ছাদের ওপরটাও কি এমনি ঢেউ খেলানো। সোফার মাথার একটু উপরে সারি সারি কাচের জানলা। এই কাচের জানলাই অশ্বিনী রাস্তা থেকে দেখেছিল। উত্তরের দেয়ালে জানলা। পশ্চিমের দেয়ালে খানিকটা। দক্ষিণের দেয়ালের ফায়ার প্লেসের ছু-পাশে। জানলার ওপরে বারবার আর্চ হয়ে দেয়ালটা ঢেউ খেলে গেছে। প্রতিটি জানলার ওপরে একটি ফুলদানি। ঘরের উত্তর-পুব ও উত্তর-পশ্চিম কোণে লম্বা টুলের ওপর ঝকমকে পেতলের টবে পাতাবাহারের গাছ। উত্তরের দেয়ালের ঠিক মাঝখানে লম্বা বাঁধানো একটি ফোটো—পর্বতমালার। ছাত থেকে লম্বা লম্বা তারে বাতি ঝুলছে। করিডরের আর্চের ও বাইরের দরজার ওপরে ছুটো নিয়ন বাতি।

দেয়ালজোড়া সোফাগুলিতে কেউ কেউ বসে আছে। পশ্চিমের দেয়ালে, অশ্বিনীর ঠিক পেছনে, একজন ধুতি পাঞ্জাবি শাল পরিহিত। পুরুষদের মধ্যে একমাত্র ইনিই বাঙালী পোশাকে। উত্তর-পশ্চিম কোণে পাতাবাহারের টবের নিচে ছুজন। করিডরের পাশের সোফাটায় ছু বা তিনজন বসে—তা অশ্বিনী দেখতে পায় না। আর সবাই-ই দাঁড়িয়ে। সবার দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে অশ্বিনীর মনে হয়

পেটালিকরদের দেখেই সবাই উঠে এসে সংবর্ধনা করেছে, তার এই অনুমানটা সঠিক নয়, সঠিক না-ও হতে পারে, অন্তত উত্তরের দেয়াল আর করিডর—এর ভেতরে দুটো দল দাঁড়িয়ে, আবার এ-দিকটাতে, যদিও যখন অশ্বিনীরা ঢোকে তখন একটা দলই ছিল, এখন আবার দুজন বা তিনজন করে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এমন হওয়া স্বাভাবিক যে পেটালিকদের ঢুকতে দেখে বাইরের দরজার কাছাকাছি যারা ছিল তারা তাঁদের সংবর্ধনা করেছে। কিন্তু পেটালিকর পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে যে-ভাবে টগরদিকে ডাকলেন তাতে মনে হয় পাছে সবাই তাঁর দিকে মন দিয়ে আর কাউকে উপেক্ষা করে ফেলে এ-বিষয়ে পেটালিকর একটু সতর্ক ছিলেন।

ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজন বাদে আর সবারই কম্‌প্লিট স্যুট। মেয়েদের অধিকাংশই শাড়ি তবে কয়েকজনার পরনে সালোয়ার কুর্তা। ওপরের জামাটা নানা রঙের। পরে, অশ্বিনী বুঝতে পাবে কমবয়সী মাত্র চার-পাঁচটি মেয়েরই অমন পোশাক ছিল। মেয়েদের মুখগুলো অশ্বিনী দেখতে থাকে। কমবয়সী মেয়েদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অশ্বিনীর মনে হয় কোনো একটা কারণে তারা হিল্লোলিত। মুখ চোখগুলো তাদের যেন সদ্য-ধোয়া। মাঝে মাঝেই তারা ভুরু তুলে এদিকে ওদিকে তাকায়। বয়সী মহিলাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে অশ্বিনীর মনে হয় তাঁদের প্রত্যেকেরই যেন একটা ভূমিকা আছে। পরে, অবিশ্যি অশ্বিনীর মনে হয়েছে বোধহয় ঐ ধরনের মিটিঙে তাঁদের খুব একটা কাজ না থাকায় কমবয়সী মেয়েদের অমন হিল্লোলিত দেখায়। অশ্বিনী জানে সবাইকে আলাদা করে না দেখে, একজোট করে গড় হিসেবের দোষ আছে। সে তাই সবাইকে আলাদা করে বুঝতে চায়, অন্তত মনের হিসেব অনুযায়ী, তারজন্য সে অপেক্ষা করে কখন সবাই বসবে।

"স্ন্যাক্‌স্, ড্রিঙ্কস্‌" মেয়েলী গলায় টানা উচ্চারণ শুনে অশ্বিনী তাকায়। দেখে করিডর দিয়ে ভেতর থেকে একজন মহিলা ও একটি

মেয়ে দুটো ট্রেতে, গেলাসে সরবৎ জাতীয় কিছু আর ডিসে চানাচুর, কাজুবাদাম, ছোট বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল। সবাই মিলে কিছু একটা বললো—অশ্বিনী সেটা অনুসরণ করতে পারল না। কিন্তু খুব চাপা অথচ সমবেত কিছু একটা ধ্বনি উঠল।

"নিন, সবাই মিলে গ্লাস নিয়ে মিটিঙ শুরু করে দিন", বলতে-বলতে হাসতে-হাসতে মহিলাটি ও মেয়েটি প্রত্যেকের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, প্রত্যেকেই একটা গ্লাস ও হাতে দু-একটা কিছু তুলে নিচ্ছে। কেউ কেউ সোফার দিকেও এগোচ্ছে। এতক্ষণ যে-ভাবে সবাই দাঁড়িয়ে বা বসেছিলেন, সেই ব্যবস্থাটা পাল্টে যাচ্ছে। অশ্বিনী বুঝল মিটিঙটা এখুনি শুরু হবে।

মহিলাটি ও মেয়েটি অশ্বিনীর সামনে এসে হেসে দাঁড়ালেন। অশ্বিনীও হেসে একটা গ্লাস আর দুটো কাজুবাদাম তুলে নিল। অশ্বিনী হাসল বটে কিন্তু সে তাকিয়ে ছিল মহিলাটি ও মেয়েটির দিকে। ওদের যে-হাসিটা দূর থেকে অশ্বিনীর মনে হচ্ছিল খুব ব্যক্তিগত, এত কাছ থেকে সে দেখে হাসিটা শুধুই একটা ভঙ্গিমাত্র। ওঁদের চোখটা ট্রে আর মানুষটির মাঝামাঝি কোথায় অনির্দিষ্ট থাকে। এমন কি অশ্বিনী যে তাদের পূর্ব পরিচিত নয়, সেটাও বুঝি তারা খেয়াল করে না।

অশ্বিনী গেলাসটা হাতে নিয়ে চার পাশে একবার তাকাল। প্রত্যেকেই দু-এক পা করে সোফার দিকে এগোচ্ছে, মেয়েটি ও মহিলাটি ট্রে নিয়ে একবার পাক খেল। হঠাৎ অশ্বিনীর মনে হল সে কোথায় যেন ঠিক এই ব্যাপারটি দেখেছে, অবিকল এই দৃশ্য, সে শুধু দেখেছে, সে সেখানে ছিল না। কিন্তু কোথায় দেখেছে? এই দৃশ্যটি দেখার স্মৃতির সঙ্গে যেন তার শুয়ে থাকার কোনো সম্পর্ক আছে। শুয়ে শুয়ে দেখেছে? অলসভাবে, শুয়ে শুয়ে, দেখেছে? অশ্বিনী গেলাস নিয়ে পেছনের সোফাটার দিকে ফিরল। ধুতি পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক ডাকলেন, "আসুন।" সোফাটা যথেষ্ট বড়। অশ্বিনীকে

জায়গা দেবার জন্য ভদ্রলোকের সরে বসার ভঙ্গি করার কোনো দরকার ছিল না। তবু তিনি করলেন। স্মিত মুখেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি, নতুন মনে হচ্ছে ?"

"আজ্ঞে" বলে অশ্বিনী একবার তার হাতে ধরা গ্লাসের দিকে আর একবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাল। তারপর সারাটা ঘরেই চোখ বুলিয়ে নিল। এতক্ষণ সবাই ঘরময় নানা দলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এখন কেউ কেউ সোফায় গিয়ে বসেছে, কেউ কেউ সোফার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ঘরটা যেন হঠাৎ ফাঁকা হয়ে যায়। কথাবার্তাও যেন এতক্ষণ খুব চড়া গলায় চলছিল। এখন যেন থিতিয়ে গেল।

করিডর দিয়ে সেই ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে বললেন, "তাহলে এবার মিটিও শুরু হোক।" সোফায় বসার আগে ভদ্রমহিলা তাঁর দু-হাত তুলে পেছনে চুলটাতে চাপ দিলেন। দুটো হাতই ঐ ভঙ্গিতে উঠে থাকায় অশ্বিনীর মনে হয় এখুনি হয়তো নাচ শুরু হবে, অথবা, ভদ্রমহিলা যেন তাঁর ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। আঁচলটা কোমরে গোঁজা বলেই হয়তো জামার আর কাপড়ের মাঝখানে সরু এক ফালি মাংসের জন্য নাচের কথাটা মনে আসে। ভদ্রমহিলা কিন্তু হাতটা নামিয়ে আঁচলটা খুলে ডানা ঢেকে দিয়ে পেছনের সোফাটায় বসে পড়ে হেলান দেন। তখন তাঁর আঁচলটা এমন ছড়িয়ে এলিয়ে থাকে! এই দৃশ্যটাও অশ্বিনীর খুব পরিচিত যেন, কোথায় দেখেছে ঠিক মনে করতে পারে না, সেখানে সে একা ছিল আর এই দৃশ্যটি।

পাশের ভদ্রলোক অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলেন, "দার্জিলিঙে আগে কখনো বেড়াতে-টেড়াতে আসেন নি ?"

অশ্বিনী বসে ছিল দুই হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর আর দুই করতলের মাঝখানে গ্লাসটা রেখে। ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁর বাঁ দিকে সোফার কোণায় হেলিয়ে। ফলে জবাব দেবার জন্য অশ্বিনীর ঘাড়টা একটু বেশি পেছনে ঘোরাতে হয়। "আজ্ঞে না।"

ভদ্রলোক হয়তো আরও কোনো প্রশ্ন করতেন, কিন্তু তাদের প্রায় বিপরীত দিকে, করিডর দিয়ে সেই মেয়েটি বেরিয়ে এল। খুব আস্তে আস্তে। তার নখের দিকে, পায়ের দিকে তাকাতে তাকাতে। একটু আগে এই মেয়েটি, মহিলাটির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গেলাস ইত্যাদি হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। যেন হাতে ট্রে নিয়ে অমনি করে নাচের পাকের মতো ঘোরা তাকে অনেকদিন ধরে অভ্যেস করতে হয়েছে। আর, অমনি দ্রুত পাক ঘোরার পর এমন ধীরে ধীরে, বাগানে বেড়াবার গতিতে ফিরে আসার ছন্দটাও তাকে অনেক চিন্তার পর বের করতে হয়েছে।

মেয়েটি ঘরের ভেতর পা দিয়ে মুখে একটা হাসি নিয়ে দু-পাশে তাকাল। তারপর এমনভাবে সে পায়ে পায়ে এগলো যে কেউ বুঝতে পারে না কোনদিকে যাবে। মেয়েটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে অশ্বিনীদের বিপরীত দিকের সোফাটায় গিয়ে বসে। সেখানে কমবয়সী আরও কয়েকজন বসে ছিল। মেয়েটি মাঝখানে গিয়ে বসে পড়ে মুহূর্তে কথায় আত্মমগ্ন হয়ে যায়। করিডর দিয়ে হেঁটে আসা, ঘরে ঢুকতে একটু দাঁড়ানো, অন্যমনস্ক পা ফেলে ফেলে ঘরের মাঝখানে আসা, তারপর যেন হঠাৎই পেছন ফিরে খানিকটা ছুটে যাওয়া—এ-সবটাই ভেবেচিন্তে করা, গতিভঙ্গিতে এই পরিবেশের কোনো প্রভাব স্বীকার না-করে করা।

তার বিপরীত দিকের সোফায় মেয়েটির ওদিকে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী মনে মনে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চায় যে এখন মেয়েটি যেমন কথায় আত্মমগ্ন আর মহিলাটি বসায়, তাতে একটা মিল আছে —কিন্তু মহিলা তাঁর চুল ঠিক করা বা আঁচল খোলার জন্য কোনো আলাদা প্রস্তুতি নেন নি। মেয়েটি সব প্রস্তুতি নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। দু-জনার দিকে বারে বারে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অশ্বিনী বোঝে তারা মা আর মেয়ে। যেন এটা বোঝাবার জন্যই একজন তখন সোফায় আত্মমগ্ন, আর একজন কথায়।

বারো

অশ্বিনী হঠাৎ লক্ষ্য করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে গল্প-গুজব চলছিল, সেটাই এখনো বসে বসে চলছে। সোফায় সোফায় এক একটা যেন দল হয়ে গেছে। সেই দল নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে অন্যান্য দলের কথা যেন তাদের মনেই নেই। অশ্বিনীদের বিপরীত দিকে কমবয়সীদের জটলা। তার পাশে করিডর। তার পাশে দুই মহিলা আর এক ভদ্রলোক। নিজের লাইনের অন্যান্য সোফার কাউকে অশ্বিনী দেখতে পাচ্ছে না। শাড়ির রঙ দেখে অশ্বিনী টগরকে বুঝতে পারে। আর এতদূর থেকে এই প্রথম অশ্বিনী টগরের পায়ের জুতোটা দেখে।

একজন কমবয়সী ভদ্রলোক এসে অশ্বিনীর পাশের ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, "তাহলে মিটিঙ শুরু করি, কী বলেন।" অশ্বিনী শুনতে পায় "করুন।"

"প্রেসিডেণ্ট কাকে করি, মিঃ সিন্‌হাকে করব ?"

"যাকে ইচ্ছে করুন, এ-মিটিঙের ব্যাপারে আবার প্রেসিডেণ্ট, যাকে ইচ্ছে করুন না।"

"তাহলে…"

"মিঃ প্রধান, সিন্‌হা এঁরা, আমরা তো সব মিটিঙেই প্রেসিডেণ্ট-গিরি করি, অন্য কাউকে করুন না।"

ভদ্রলোক "আচ্ছা" বলে সরে যান। অশ্বিনী দেখে তিনি আর একজনের কাছে গিয়ে আলাপ করছেন। পেছন থেকে প্রশ্ন শোনে অশ্বিনী।

"কেমন লাগছে দার্জিলিঙ, আপনার ?"

ঘাড় ঘুরিয়ে খুব সহজ স্বরে অশ্বিনী জবাব দেয় "ভালো"—তারপর ঘাড়টা আবার সোজা করে। কিন্তু সোফাটা দুলিয়ে ভদ্রলোক মিটিঙের অন্যান্যের দিক থেকে মুখটাকে অশ্বিনীর দিকেই

বেশি ঘ্‌রিয়ে বলেন, "একটু ক্রিটিক্যালি বলুন। কত তো গল্প শুনেছেন আসার আগে? তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন?"

যতটা ঘাড় ঘুরিয়ে অশ্বিনীকে জবাব দিতে হবে তাতে তার পক্ষে বেশিক্ষণ ওভাবে বসে থাকা সম্ভব হয় না। ভদ্রলোকের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে হয় তাকে সোফায় হেলান দিয়ে বসে পড়তে হয়, নয়তো একটু ঘুরে যেতে হয়। সে-জন্য, আর ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাবটা ভেবে নিতে অশ্বিনী গেলাস ঠোঁটে তোলে। ঠিক এ-ভাবে প্রশ্নটা তার কাছে আসবে বলে অশ্বিনী যেন প্রস্তুত ছিল না। এই অপ্রস্তুতিতে সে বুঝে ফেলে লোকের মুখে-মুখে শুনে দার্জিলিঙের জন্য কোনো প্রত্যাশা মনে মনে তৈরি হয়ে উঠতে পারে নি। চাকরির জন্য তাকে দার্জিলিঙ আসতে হয়েছে। যেমন অন্য কোথাও যেতে হতে পারতো। এখনো যেতে হতে পারে। এখানে আসার পর দার্জিলিঙের সঙ্গে তার দেখাশোনা পরিচয় হচ্ছে।

"আমি তো এখনো সব দেখে উঠতে পারি নি, তবে এমনিতে তো বেশ ভালো লাগছে।"

ভদ্রলোক হেসে ফেলে বললেন, "দার্জিলিঙ এসে দার্জিলিঙের কি কি নিন্দে শুনেছেন?"

এবার অশ্বিনীকে হেলান-ই দিতে হয়—"কিছু শুনি নি তো।"

"তাহলে আমিই বলে দি, শুনবেন আগে দার্জিলিঙ আরো ভালো ছিল, সাহেবদের আমলে সবই ভালো ছিল, দার্জিলিঙ ঝকঝক করত, শুনবেন তখন আরো কতো কী হতো, শুনতে শুনতে আপনার মনে হবে তখন কাঞ্চনজঙ্ঘাও যেন আরো সুন্দর ছিল আর এখন সবই খারাপ, ব্যবস্থাও খারাপ, লোকগুলোও খারাপ, মায় কাঞ্চনজঙ্ঘাও যেন সায়েবরা চলে যাওয়ার পর খারাপ হয়ে গেছে—কী আশ্চর্য, এসব কিছুই আপনি শোনেন নি!"

"না-তো!" নেহাত হঠাৎই অশ্বিনীর বেণুর কথা মনে পড়ে যায়।

"বরং একজন তো আমাকে বলেছেন আমারও নাকি দার্জিলিঙ ভালো লেগে যাবে।"

"তাহলে তো আপনি খুব ভালো গাইড পান নি।" ভদ্রলোক হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠেন। "এখনো লোকে দার্জিলিঙের প্রশংসা করে? এটা তো একটা খবরের মতো খবর—"

হেসে ওঠার পর ভদ্রলোকের দিকে সবাই তাকান। তার কথা নিয়েই হাসি। অশ্বিনী যেন ঘটনার মধ্যবিন্দু হয়ে যায়। সে দেখে সেই কমবয়সী ভদ্রলোক একটা সোফার সামনে দাঁড়িয়ে। মিটিঙটা যেন শুরু হতে গিয়েও হাসির জন্যই থমকে গেল। একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, "কী ব্যাপার বিনয়বাবু, এত হাসছেন যে?"

"একটা অদ্ভুত খবর শুনে।"

"কি ব্যাপার?"

"এই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করছিলাম আপনি দার্জিলিঙে এসে দার্জিলিঙের নিন্দে শোনেন নি যে সায়েব আমলে অমুক অমুক ছিল আর এখন এই এই হয়েছে। উনি এ-সব তো শোনেন-ই নি, বরং ওঁকে একজন বলেছেন দার্জিলিঙ নাকি ওঁর ভালো লেগে যাবে!"

বিনয়বাবুর কথা শুনে একটা চাপা হাসি ছড়িয়ে গেল। সেই কমবয়সী ভদ্রলোক যেন কিছু বলতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হাসির জন্য তাঁকে থেমে যেতে হয়। ওপাশ থেকে মিঃ পেটালিকর উঠে দাঁড়ান। "মিঃ ভৌমিক, ওঁকে কে দার্জিলিঙের সঙ্গে ইনট্রডিউস করাচ্ছেন, তাঁকে তো আমাদের ধন্যবাদ দেয়া উচিত।···টগরদি" মিঃ পেটালিকর হাত বাড়ান। টগর সেই হাতটায় প্রথমে হাত রাখে তারপর হাসিমুখে উঠে দাঁড়ায়। অশ্বিনীর বিপরীত দিকের সোফায় কমবয়সীরা হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠে। টগর বসে পড়ে। মিঃ পেটালিকর নিজের জায়গায় ফিরে যান। অশ্বিনীর মন্তব্যটা যে এমন ছড়িয়ে যাবে সে ভাবেই নি। সে এদিক-ওদিক তাকাতেই শোনে সেই কমবয়সী ভদ্রলোক বলছেন, "আমাদের আজকের

সভায় মিঃ সান্যাল সভাপতিত্ব করুন”—একটা চাপা করতালি বেজে উঠল।

বিনয়বাবু, যেন মিটিঙটার দিকে পেছন ফিরেই, অশ্বিনীকে বলেন, “আপনাকে পরিচয় করিয়ে দি, এঁদের নাম তো মনে রাখতে পারবেন না, পরে চেনা-পরিচয় হবে, ঐ ডানদিকে যে-দেখছেন সিগারেট মুখে মিঃ প্রধান, এখানকার এম. এল. এ , তারপরের সারিতে মিঃ সিংহ, এখানকার কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট, ঐ সারিতেই চশমা-চোখে মিঃ সেনগুপ্ত, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স, তার পাশে মিঃ সাহা, এখানকার হাসপাতালের আই স্পেশালিস্ট, উনি মিঃ ছেত্রী—এখানকার কয়েকটি হোটেলের মালিক, মেয়েদের মধ্যে মিসেস সিনহাকে চিনে রাখুন, এই লাইনের তিন নম্বর সোফার প্রথমে।”

“আপনার নাম তো জেনেই নিলাম শ্রীবিনয়কুমার ভৌমিক। আমার নাম অশ্বিনী সরকার।”

তের

কথা শুনতে-শুনতে বলতে-বলতে অশ্বিনী দেখে মিটিঙটা শুরু হয়ে গেছে। যদিও বিনয়বাবু গলাটা খাটো করে ছিলেন তবু অশ্বিনীর সন্দেহ ঘোচে না যে বিনয়বাবু মিটিঙটাকে যেন একটু কম পাত্তা দিচ্ছেন। তাঁর বিপরীত দিকের সোফায় কমবয়সীদের দলটা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি কথা বলছে, চাপা গলায় হাসছে। মিঃ সান্যাল উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন, “আমার মনে হয় আমরা একটা কমিটি করে দি তারপর সেই কমিটি মিট করে যা করার করবে, বাজেট-টাজেট ইত্যাদি পেশ করবে।”

একজন জিজ্ঞাসা করেন, “কিন্তু গত বছরের অ্যাকাউন্ট্‌স্‌টা একবার সাবমিট করতে হবে না?”

মিঃ সান্যাল বলে ওঠেন, “ওঃ, ইয়েস, গত বছরের অ্যাকাউন্টস্‌টা—মিঃ মিত্র।”

কমবয়সী যে-ভদ্রলোক মিটিঙ শুরু হওয়ার আগে বিনয়বাবুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "গত বছরের অ্যাকাউন্টস্ পেশ করার দায়িত্ব ফর্মালি অবিশ্যি আমার নয়, কিন্তু গত বছরের সেক্রেটারি মিঃ তালুকদার বদলি হয়ে যাওয়ায় অ্যাসি-স্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে আমারই ওপর দায়িত্ব বর্তেছে। অ্যাকা-উন্টস্ প্রপারলি অডিটেড হয়েছে"—মিঃ মিত্র হিসেবের তালিকা পড়তে শুরু করেন। বিনয়বাবু তাঁর ভঙ্গি বদলান নি। যেন তিনি মিটিঙের দিকে কোণাকুণি ঘুরে আছেন, যেন মিটিঙটায় তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। মাঝেমাঝে শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। মিঃ মিত্র ইংরেজীতে যে-হিসেব দিচ্ছিলেন তার দিকে কান পেতে রেখে অশ্বিনী ভাবে বিনয়বাবু কি কোনো কারণে সবাইকে দেখাতে চান যে তিনি একটু উদাসীন। না-কি সবাই যেখানে প্যান্ট পরে, সেখানে ধুতি পরা বৈশিষ্ট্যে তিনি সর্বদাই একটু আলাদা। নিজের সেই পার্থক্য যেন তিনি একটু লালনও করেন। না-কি এ-সব মিটিঙের ধাতই হচ্ছে যে-যার মতো মিটিঙ শোনে বা শোনে না। বিপরীত দিকের দেয়ালের গায়ে লাগানো সোফায় মেয়ে-কটি একটি ছেলের সঙ্গে বসে চাপা গল্পে মেতেছে। মিটিঙে যে-কী চলছে সে বিষয়ে ওদের কোনো আগ্রহও নেই। মিঃ মিত্র যেখানে দাঁড়িয়ে হিসেব পড়ছিলেন সেখানেই কেউ এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছে, কেউ-কেউ কাছাকাছি বসে নিচু গলায় গল্প করছে। একমাত্র মিসেস পেটা-লিকর ঘোমটার রেখায় ঢাকা মুখটি তুলে মিঃ মিত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। সেটা লক্ষ্য করে অশ্বিনীও মিঃ মিত্রের দিকে তাকায়। মিঃ মিত্রও যেন যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি পড়ে যাবার চেষ্টা করছেন। যে মহিলা গেলাস আর স্ন্যাক্স বিলি করেছিলেন তিনি নিজের ডান হাতের আঙুলগুলি বাঁ হাতে ধরে পরীক্ষা করছেন। "তাহলে গত বছরের অডিটেড অ্যাকাউন্টস্ অ্যাকসেপ্টেড ?" শুনে অশ্বিনী চমকায়। কোথাও থেকে একটা "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইয়েস" ধ্বনি

উঠল। "তাহলে, লেট্ আস প্রসিড টু ফর্ম এ কমিটি ফর দিস ইয়ার।"

মিঃ সান্যাল বসা মাত্রই বিনয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। অশ্বিনী তাকায়। কারণ মুহূর্ত আগেও সে বুঝতে পারে নি সভায় বিনয়বাবু কিছু বলবেন। অশ্বিনী বুঝতে পারে নি বলেই তার মনে হল আর সবাইও কিছুটা ত্রস্ত যেন। বিশেষত তার বিপরীত দিকের কমবয়সীদের দলটা নিজেদের ভেতর কথাটা থামিয়ে দিয়েছে। বিনয়বাবু বললেন, "আমার মনে হয় অন্যান্য বারের মতো বড় কমিটি না করে, এবার একটা ছোট কমিটি হোক, নইলে কমিটির মিটিঙ ডাকাই এক হাঙ্গামা হয়ে পড়ে, যাঁদের, আমাদের মতো এত নানা ঝামেলায় থাকতে হয়, তাদের কমিটিতে না রেখে নতুন কাজের লোক দিয়ে কমিটি করা হোক। আমি মনে করি কমিটি সভ্যের সংখ্যা সাত বা আটের বেশি হওয়া উচিত নয়"—বিনয়বাবু আগের ভঙ্গিতেই বসে পড়লেন। অশ্বিনী সবার মুখের দিকে তাকায়। সবাইকে কেমন যেন খানিকটা উত্তেজিত মনে হয়। মিঃ প্রধান বলেন, "আপনি নাম বলুন, হোয়াট্স্ ইয়োর সাজেশন?" আর এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "মিঃ ভৌমিকের প্রস্তাব আমি হোল হার্টেডলি সাপোর্ট করি। একটা আন্‌উইল্‌ডি বডি করার কোনো মানেই হয় না। আর আমরা মানে উই ফিল অকোয়ার্ড যে আমরা যথেষ্ট টাইম ডিভোট করতে পারছি না।" আবার খানিকটা নীরবতা। মিঃ সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন, এদিক-ওদিক তাকালেন, "বলুন, আপনারা, ছোট কমিটি হবে না-কি বড় কমিটি হবে।"

একজন উঠে দাঁড়াতেই মিঃ সান্যাল বসে পড়লেন—"আমি কিন্তু বুঝছি না হোয়াটস্ দ্য হার্ম ইন্ হ্যাভিং এ-বিগ কমিটি। এটা ঠিক যে এভ্রিওয়ান অন্ দি কমিটি ক্যাণ্ট অ্যাফর্ড টু গিভ মাচ টাইম ফর দিস পারপাজ, পার্টিকুলারলি মিঃ ভৌমিকের মতো যাঁরা পাবলিক ডিউটিতে ব্যস্ত, কিন্তু দেয়ার নেম্স্ আর প্রেসাস, তাঁদের নাম

থাকাটাই তো একটা বড় ব্যাপার।" কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পর একটুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকালেন ভদ্রলোক, বোঝা যাচ্ছিল না উনি আবার শুরু করবেন না-কি শেষ করলেন। কিন্তু তারপরই উনি বসে পড়লেন।

"আপনি যা বললেন তার অনেকগুলো পয়েন্টের সঙ্গে আমি একমত, বাট, আই অ্যাম ইন ফেভার অফ এ স্মল কমিটি, অ্যাজ প্রোপজ্‌ড্‌ বাই মিঃ ভৌমিক।" আর একজন উঠে বলে যেতে থাকেন। অশ্বিনী তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শোনে। কিন্তু শুনতে শুনতে এক সময় অশ্বিনী খেই হারিয়ে ফেলে। আসলে হয়তো অশ্বিনী প্রসঙ্গটি বুঝতে পারে না, বা ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচিত নয় বলে যুক্তির পরম্পরা ধরতে পারে না। অথবা এমনও হতে পারে যে আসলে খুব মনোযোগ দিয়ে অন্যের যুক্তি পরম্পরা অনুসরণের ধাতটাই অশ্বিনীর নেই। মিসেস সিন্‌হা বলতে উঠলে অশ্বিনী মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে। তার ভঙ্গিতেও তখন মনোযোগ ফুটে ওঠে। সোফায় হেলান দিয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে ভুরু পাকিয়ে অশ্বিনী শুনে যায়। শুনে যায়, কিন্তু বুঝতে পারে না মিসেস সিন্‌হা একটা বড় কমিটি চাইছেন, না ছোট কমিটি। "স্মল কমিটি" শব্দটা খুব বেশি বার উচ্চারিত হতে থাকে। মিসেস সিন্‌হা বসলে আর একজন ওঠে। তখন মাঝে মধ্যে "স্মল কমিটি" শব্দটি, উচ্চারিত হলে, অশ্বিনীর কানে আসে আর কিছুই প্রায় আসে না। আবার একজন বলতে উঠলে অশ্বিনী তার দিকেও মুখ ফেরায়।

কিন্তু একসময় অশ্বিনী বক্তার দিকে মুখ ফিরিয়েও মনে মনে ঘরটা মাপতে শুরু করে দেয়। উত্তর দেয়ালে তিনটি সোফা। একটি সোফা কত লম্বা হবে। অশ্বিনী বক্তার মুখ থেকে চোখটা একটু সরিয়ে নিজের বসার জায়গাটা লক্ষ্য করে আবার চোখটা বক্তার ওপর তুলে নেয়। সে যদি শুয়ে পড়ে তাহলে কি সোফাটায়

আঁটবে—-বক্তা বসে পড়লে এটাই অশ্বিনীর প্রধান দুশ্চিন্তা হয়। আর একজন উঠলে তার দিকে চোখ সরিয়ে অশ্বিনী বক্তার পেছনের সোফাটার মাপ অনুমান করার চেষ্টা করে। অশ্বিনীর নিজের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। হ্যাঁ, সে সোফাটাতে আনায়াসে শুয়ে পড়তে পারে। তাহলে নিশ্চয়ই সোফাগুলি ছ-ফুট করে। উত্তর দেয়ালে তিনটি সোফা। তাহলে আঠার ফুট। দু-দিকের ফুলদানির জন্য এক ফুট করে জায়গা যোগ করলে কুড়ি ফুট। অশ্বিনীর ধারণা ঘরের মাপ এরকম দশ, বিশ, ত্রিশ হয় না। হয় অর্ধেক হয়, নয় একটা মাঝারি অঙ্ক হয়। তাই মনে মনে মাপজোখ করা সত্ত্বেও সে কুড়ি ফুট চওড়া ঘরকে একুশ ফুট ধরে। একুশ ফুট চওড়া। তারপর অশ্বিনী দৈর্ঘ্যটা মাপতে চেষ্টা করে। ছ-ফুট সোফা এক, দুই, বারো ফুট, তারপর করিডর। করিডরের মাপটা কত হতে পারে সেটা আন্দাজ করতে না পেরে অশ্বিনী নিজের দিকে ফিরে আসে। চারটি সোফা। তার মানে চব্বিশ ফুট। তারপর দরজাটা নিশ্চয়ই চার ফুট। আঠাশ ফুট। দু-দিকের একফুট দেড়ফুট জায়গা ধরে সাড়ে ত্রিশ বা একত্রিশ ফুট। তাহলে ঘরটা একুশ বাই একত্রিশ। আন্দাজ মতো একটা হিসেব পাওয়ার পর অশ্বিনী আরো সূক্ষ্ম হিসেব করতে চায়। চোখের আন্দাজে সে করিডর আর বাইরের দরজাটার মাপ একেবারে সঠিক নিতে চায়। সে যদি করিডরের মুখে শুয়ে পড়ে তাহাল কি আঁটবে। অশ্বিনীর যেন মনে হয় পা-টা টান-টান করা যাবে না, লেগে যাবে। তাহলে কি সাড়ে পাঁচ ফুট হবে। কতটা লেগে যাবে। না, অশ্বিনীর মনে হয় হাঁটুটাকে টান করতেই পারবে না। তাহলে চার ফুট হবে। তাহলে দরজা আর করিডরটা সমান সমান হয়ে যায়। একবার করিডর আর একবার দরজার দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী মাপ ঠিক করবার চেষ্টা করে। দরজা-টাকেই বড় মনে হচ্ছে। আবার করিডরের দিকে তাকালে করিডর আর দরজা সমান মনে হচ্ছে। দুটোকে একসঙ্গে দেখতে পারলে

মাপটা ঠিক করা যেত। একসঙ্গে দেখতে হলে এই সোফাটার কোণায় বসতে হয়। অশ্বিনী কোণায় তাকায়। বিনয়বাবু বসে। অশ্বিনী ঘরের চার পাশে তাকায়। দেখে সবাই চুপ। অশ্বিনীর হঠাৎ আশঙ্কা হয় দার্জিলিঙ সম্পর্কে মন্তব্য যেমন তাকে সবার সামনে নিয়ে গিয়েছিল—এখন আবার তেমনি কিছু হল কি না। মিঃ সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন—"তাহলে কি ভোটে দেব প্রস্তাবটি ?"

"না, না, নিজেদের মধ্যে আবার ভোট কিসের, ঠিক করে নিন, একটা। "না, না ভোট হোক, ভোট" বলে অশ্বিনীর বিপরীত দিকের সোফায় বসা ছেলেমেয়েরা মৃদু হাততালি দিয়ে ওঠে আর হেসে ফেলে। এতক্ষণে যেন ওরা মিটিঙে একটা মজা পেয়েছে।

করিডরের পাশ থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি প্রস্তাব করছি লোক্যাল এম্. এল্. এ-কে প্রেসিডণ্ট করে, সমীরেন্দ্র-বাবুকে সেক্রেটারি করে মিঃ সান্যাল, মিঃ থাপা, মিঃ ছেত্রি, ডাঃ বসু, ডাঃ সেন, মিসেস থাপা, সরলাদি—এই ন-জনকে নিয়ে একটা কমিটি হোক ।"

"সে কি মিঃ ভৌমিক, মিঃ সিনহা, মিসেস সিনহা—এরা না থাকলে" একজন এই পর্যন্ত বলতেই অশ্বিনীর সামনে ছেলেমেয়ের দল হাততালি দিয়ে উঠল, "পাস্ড্ পাস্ড্।" তারপর মাঝখানের ছেলেটির দু-হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল। অশ্বিনী বুঝল এরই নাম সমীরেন্দ্র।

মিঃ সান্যাল বললেন, "তাহলে এবার আলোচনা করা যাক, কী কী ফাংশান হবে, কি ভাবে কী হবে।"

মিঃ পেটালিকর উঠে দাঁড়ালেন—"মিঃ সান্যাল, আমি একটু যেতে চাই, একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে, আপনারা মিটিঙ করুন।" বিনয়বাবু না উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, "সে-সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম নতুন কমিটি দিক না, আজকের মিটিঙ এখানেই শেষ হোক।"

মিঃ সান্যাল সবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "সবার যদি তা-ই

মত হয়···।” সামনের সারির ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে “ইয়েস, ইয়েস, মিটিঙ ইজ ওভার” বলে উঠে পড়ল।

চোদ্দ

প্রায় সবাই-ই উঠে দাঁড়ালেন। মিঃ সান্যালের সামনে পেটালিকর, তাঁর স্ত্রী, আরো দু-চারজনের একটা দল হয়ে গেছে। মিসেস সিনহা, আরো দু-চারজনের সঙ্গে। মিঃ প্রধান, মিঃ সিনহা এঁরা বসেই আছেন। বিনয়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “চলুন, সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।”

অশ্বিনী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, “না, না, ঠিক আছে।”

“আরে চলুন না মশাই, কী আছে, আলাপ-পরিচয় না করলে দশজন থাকবে কি করে।”

পেটালিকরের পেছনে দাঁড়িয়ে বিনয়বাবু বললেন, “মিঃ পেটালিকর।” সঙ্গে সঙ্গে পেটালিকর “ইয়েস” বলে ঘুরে দাঁড়াল। “আমাদের নতুন বন্ধু মিঃ সরকার, সেণ্ট্রাল গবমেণ্টের অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে এসেছেন।”

“কিন্তু ওকে ইনট্রডিউস করে দেয়ার সৌভাগ্য তো আমারই হওয়া উচিত ছিল, আপনার আগে আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয়, তাই না?” বলে পেটালিকর অশ্বিনীর দিকে মাথা ঝোঁকায়। অশ্বিনী বলে, “হ্যাঁ।”

“আপনি কোন ডিপার্টমেণ্টে আছেন”, মিঃ সান্যাল জিজ্ঞাসা করেন।

“এক্সাইজে” বলার সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীর মাথায় চিন্তা ঢোকে সে তার সঠিক পরিচয় দেবে কি-না, এদের সামাজিক মানমর্যাদার তুলনায় যে-পরিচয় নিশ্চয়ই লজ্জার। কিন্তু যদি মিথ্যে কথা বলে বা গোপন করে তাহলে সত্যি কথা জানতে এদের কয়েক মিনিট লাগবে মাত্র। অশ্বিনী তাই আরো বলে, “আমি সেণ্ট্রাল এক্সাইজ ইনস্পেক্টর হয়ে মাস কয়েক হল জয়েন করেছি।”

"আচ্ছা, সে কথা আগে বলেন নি কেন, তাহলে তো আপনাকে দেখে আমাদের সবারই ভয় পাওয়ার কথা"—বলে পেটালিকর হো হো করে হেসে ওঠেন—"কি বলেন মিঃ সান্যাল ?"

"সে কথা বলতে ? চা তো আছেই, লিকার, গাঁজা, ভাঙ, কী না।"

"ইউ আর ইন দি প্যারাডাইজ অফ এক্সাইজ" বলে পেটালিকর আবার হো হো হেসে ওঠেন।

"আপনি কি চা-বাগানে অ্যাটাচ্‌ড্‌ ?" পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন। বিনয়বাবু পরিচয় দেন, "মিঃ ভট্চায।"

"হ্যাঁ, চারটি চা-বাগানের চার্জে আছি, প্লেনভিউ, রাঙতি, মন-পুরান, সানিভ্যালি।"

"সবই তো সায়েব কনসার্ন !"—ভট্টাচার্য

"হ্যাঁ, তাই তো।"

"তা মহাপুরুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে ?" বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করেন।

"না, আমার তো আর ওঁদের সঙ্গে কোনো দরকার নেই।"

"দরকার থাকলেও লাভ হত না। ঐসব বাগানে গেলে আপনার মনেও হবে না যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে !"—বিনয়বাবু বললেন।

মিঃ ছেত্রি বলে ওঠেন, "অ্যাজ ইফ সেটা অন্য সব জায়গায় বোঝা যায় !"

পেটালিকর একটু জোরের সঙ্গে বলে ওঠেন, "নিশ্চয়ই বোঝা যায়। আপনি কি বলছেন মিঃ ছেত্রি। সারা ভারতবর্ষে কোথাও যদি ইন্‌ডিপেনডেন্‌স্‌কে সেন্‌সুয়ালি বোঝা যায় দ্যাটস দার্জিলিং অ্যাণ্ড দ্যাটস্‌ হোয়াই আই কাম হিয়ার সো অফন্‌।"

চাপা স্বরে বললেও পেটালিকরের উত্তেজনাটা চাপা ছিল না। সেই চাপা উত্তেজিত স্বরে আরও দু-একজন এসে ভিড় করে। বিনয়-

বাবু বলে ওঠেন, "মিঃ পেটালিকর যে-উত্তেজিত হয়েছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে।"

"কেন, কেন, আমি মোটেই উত্তেজিত হই নি।"

"উত্তেজিত না হলে আপনি ইংরেজি বলতেন না।"

পেটালিকর হো হো করে হেসে ওঠেন। হাসির দমকে ঘাড়টা উঁচু করে তোলেন। মিসেস পেটালিকরের চোখ দুটো স্বামীর মুখের ওপর। মুখে তাঁর হাসি। হাসি থামিয়ে পেটালিকর বলেন, "ওটা আপনি যা বলেছেন বিনয়বাবু, ইংরেজি উত্তেজনার ভাষা, হিন্দী গালাগালির আর বাঙলা?" সবাই চুপ করে গেলেন। এ-ওর মুখের দিকে তাকান। মিসেস পেটালিকর তাঁর স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, "ভালোবাসার।" একটু চুপ করে থেকে সবাই মিলে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে পেটালিকর বলেন, "আমি ওঁকে প্রথম বাঙলাতেই প্রপোজ করেছিলাম, অবশ্যই বিয়ের পর, আমাদের সময় তো বিয়ের পর প্রেম শুরু হতো" থেমে পেটালিকর আবার শুধোন, "আর নেপালী?" সবাই-ই চুপ করে থাকেন। পেটালিকর নিজেই জবাব দেন, "চাঁদের আর গানের! জ্যোৎস্নারাতে পাহাড়ে গান শুনেছেন?" মিঃ পেটালিকর যেন সুর ভাঁজবার জন্য বুড়ো আঙুল আর তর্জনী মিলিয়ে বাঁ হাতটা তোলেন।

পনর

কড়া সুরে একটা ইংরেজি বাজনা বেজে ওঠে। সবাই তাকান। প্লেয়ারে রেকর্ড চড়ানো হয়েছে। পেছনে মেয়ের দলটি টুইস্ট নাচতে শুরু করেছে। "বাঃ বাঃ" বলে পেটালিকর এগিয়ে যান, তারপর তালে তালে হাততালি দিতে থাকেন। দেখতে দেখতে নাচের দলটাকে ঘিরে সবাই দাঁড়ান। গান চলতে থাকে। যাঁরা ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁরা কেউ কেউ হাততালি দিতে থাকেন। মুহূর্তে নাচটা জমে যায়। অশ্বিনী দেখে এতক্ষণ যারা একটা দুটো সোফায়

ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে চাপা স্বরে হাসি-গল্পে মেতে ছিল, মিটিঙ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা যেন নিজেদের খেলায় মেতে উঠেছে। মিঃ পেটালিকর হাততালিতে মেতেছেন। অনেকে পা দিয়ে তাল দিচ্ছেন। অশ্বিনী একটা সারির পেছন থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে। তার কনুই ধরে কেউ টানে। তাকিয়ে দেখে টগর। একমুখ হাসি নিয়ে টগর ফিসফিস করে অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করে, "কেমন লাগছে।" প্লেয়ারে চাপানো বাজনাটা প্রবলতর হচ্ছে। "ভালো।" নাচিয়েদের কোমর আর নিতম্বের আবর্ত ঘনতর হচ্ছে। যে-মেয়েটি ট্রে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার পাট করা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে মুখময় ছড়িয়ে পড়ছে আর সে বার বার ঝাঁকিয়ে চুলগুলো পেছনে ঠেলছে। দেখতে দেখতে নাচিয়েদের মুখগুলো পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে, তাতে আলো ঠিকরে যাচ্ছে। বাজনা প্রবলতর। এখন আর নাচিয়েরা কোনোদিকে চাইছে না, নিজের সঙ্গীর দিকেও না। রেকর্ডে যে বাজনাটা তীব্রতর হচ্ছে, নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেই গতিটাকে ধরার ব্যগ্রতায় এখন শুধু গতি আছে আর রেকর্ডের বাজনাটা আছে। অশ্বিনী লক্ষ্য করে যারা হাতে বা পায়ে তাল দিচ্ছে তারাও শরীরটাকে দোলাচ্ছে। ফলে ঘরের ভেতর একটা তীব্র গতি আর ছন্দের কেন্দ্র থেকে চারপাশে ছন্দ আর গতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার ভাব তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ, যেমন অশ্বিনী, ছন্দ-গতির কেন্দ্রে নেই, তার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া চৌহদ্দির ভেতরেও না থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার পক্ষে শরীরের ভার রাখা, পা বদলাবার সময় বা একটু হাঁটার সময় তাল গতি অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। অশ্বিনী ঘুরে ফিরে দেখে যারা আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, নাচ ঘিরে নেই, তারাও ঘনঘন পা বদলায়, ঘাড় ঘোরায়, মেয়েরা চুলে হাত দেয়। আর এদিকে নাচের বৃত্তে তখন ঝড় উঠেছে। পেটালিকর-ও যেন খানিকটা নাচের ভেতর ঢুকে গেছে। হাত, কোমর, নিতম্ব দোলাবার সময় মুখের

হাসিটুকু কেউ মিলিয়ে যেতে দিচ্ছে না। একটা প্রবল শব্দ তুলে রেকর্ডটা থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে নাচ, সমবেত একটা করতালি ধ্বনি। নাচিয়েরা সবাই থেমে গেল। হাঁফাচ্ছে। পেটালিকর তাদের ভেতর ঢুকে প্রত্যেককে ধন্যবাদ দিচ্ছেন, যেন নাচের পার্টিটা তিনিই ডেকেছেন।

বিনয়বাবু বললেন, "তাহলে চলা যাক্, চলি মিঃ পেটালিকর।" "হ্যা, হ্যাঁ চলুন, আমিও যাচ্ছি," পেটালিকর আর এক কোণায় তাঁর স্ত্রীর দিকে এগোতে থাকেন।"

পেছন থেকে টগর অশ্বিনীর কনুই ধরে "চলো, চলা যাক।"

একে একে সবাই বেরচ্ছেন। প্রথমে মিঃ পেটালিকর, বিনয়বাবু ও মিসেস পেটালিকর। পেটালিকর পর্দা তুলে ধরলেন। সবার নিষ্ক্রমণ পর্যন্ত তুলেই রাখতেন যদি না অশ্বিনী ধরে ফেলত।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিনয়বাবু বললেন, "মিঃ পেটালিকর, আপনি আজকের মিটিঙে একটু আনকমফর্টেবল্ বোধ করছিলেন, না?"

"না তো, কেন এ-রকম মনে হলো আপনার।"

"আপনি মাঝখানে একবার রওনা হয়েই গিয়েছিলেন প্রায়। আপনি বোধহয় ভাবছিলেন কমিটি নিয়ে আমাদের ভেতর খুব দলবাজি চলছে—"

"না, না, আমি ও-সব কমিটি-টমিটি খুব ভালো বুঝি না"—বাঁকের মুখে মিঃ পেটালিকর তাঁর স্ত্রীকে ঘিরে বাঁ হাতটা রাখেন, না ছুঁয়ে "তা-ছাড়া আই এনজয়েড দিস ড্যান্স ভেরি মাচ। যদি যুবক থাকতে চান সব সময় যুবকদের সঙ্গে মিশবেন।"

গাড়ি এসে দাঁড়ায়। দরজা খুলে ধরে মিঃ পেটালিকর স্ত্রীকে প্রবেশ করতে দেন, তারপর নিজে ঢোকেন। "আচ্ছা"। গাড়ি বেরিয়ে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে টগব-অশ্বিনী বাঁক নিয়ে বাড়িটার নিচের রাস্তায় এসে পড়ে। টগর অশ্বিনীর কনুইটা ছাড়ে নি। অশ্বিনীকে টগর

বলে বসে—"অশ্বিনী।" "বলুন।" "তুমি একটা কম্‌প্লিট স্যুট বানাবে?"

একটু চুপ করে থেকে অশ্বিনী বলে, "একটা বানানোই ভালো, না? একটা ভালো পোশাক না থাকলে চলে না।"

"তোমার ফিগারটাও তো ভালো, দেখবে, মানাবে চমৎকার, চলো।"

ওরা তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করে। খানিকটা যাবার পর পেছন থেকে ডাক আসে, "টগর দি।" টগব পেছন ফিরে দেখে ভট্‌চায।

"আরে আপনারা কখন বেরিয়ে এসেছেন টেরই পাই নি। আমি এদিকে আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। মিঃ সরকারের সঙ্গে নতুন আলাপ হল, ভাবলাম গল্প করতে করতে ফিরি, তো দেখি, আপনারা রওনা হয়ে গেছেন। চলুন"—ভট্‌চায ওদের সঙ্গে হাঁটা শুরু করে। তারপর বলে, "দেখলেন, আজ বিনয় ভৌমিক সিংগিকে কী ল্যাংটা দিল।"

টগর জিজ্ঞেস করে, "কেন?"

"আরে সিংগি প্রভিন্‌সিয়ালি মুভ করে ঠিক করেছে যে সামনের ইলেকশনে ও দাঁড়াবে, প্রধানও অত কাঁচা ছেলে নয়, ভৌমিকের সঙ্গে ষড় করে সব লোক্যাল ব্যাপার থেকে সিংগিকে সরিয়ে ওপর-ওয়ালাদের ওপর প্রেসার তৈরি করবে। যতই বলুন বুদ্ধি আছে ভৌমিকের। সারাটা মিটিঙে একবার মাত্র কথা বলেছে, তাতেই সব ফ্ল্যাট। তবে দেখলেন তো মিসেস সিন্‌হাকে, একটুও টসকায় নি। আরে এখুনি ফিরবেন কি? চলুন, একটু চা খেয়ে যাবেন।"

টগর দাঁড়িয়ে পড়ে। "না, মানে, অশ্বিনী একটা কম্‌প্লিট স্যুট বানাবে, বলুন তো কোন্ দর্জির কাছে যাওয়া যায়।"

"আরে এই কথা, চলুন আমার সঙ্গে"—ভট্‌চায পথ দেখায়।

ষোল

যদিও অশ্বিনীর কোনো ভুমিকা নেই, তবু দার্জিলিঙের সমাজ-জীবনের ভেতরের দ্বন্দ্বটা সেদিনের মিটিঙেই ধরা পড়ে যায়। এককালে বাঙলাদেশের লাটসাহেবের গ্রীষ্মাবকাশ আর সারাটা বাঙলাদেশেরই গ্রীষ্মকালীন রাজধানী থাকায় দার্জিলিঙের সারাটা শরীর আর মনে সেই রাজধানীর স্মৃতি লেগে আছে। লাটসাহেবের বাড়ি আজও আছে। দার্জিলিঙের কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠান লাটসাহেবকে কেন্দ্র করেই আজও চলছে—রোটারি ক্লাবের বাৎসরিক লাঞ্চ, জিমখানা ক্লাবের টেনিস টুর্নামেন্টের ফাইন্যাল, লেবঙের গভর্নরস কাপ খেলা, ফ্লাওয়ার শো প্রভৃতি। ফলে দার্জিলিঙের রাজধানীর জীবন দার্জিলিঙের পক্ষে শুধুই স্মৃতি নয়, অনেকটা বর্তমান।

কিন্তু আবার একটি জিলার প্রধান শহর হিসেবে সরকারি ও আধা-সরকারি নানা প্রতিষ্ঠান দার্জিলিঙে অফিস করেছে, সেই সূত্রে অনেকে এসে দার্জিলিঙের বাসিন্দে হয়েছেন, জনসংখ্যা বেড়েছে, জনসমষ্টির বৈচিত্র্যও বেড়েছে। এই নতুন যাঁরা এসেছেন তাঁরা দার্জিলিঙের পুরনো জীবনযাত্রার কোনো পরিচয় রাখেন না।

ফলে দার্জিলিঙের সমাজজীবনে রাজধানী বনাম জিলাশহরের একটা সংঘাত জন্মে গেছে। কেউ কেউ চান পুরনো রাজধানীকেই দার্জিলিঙের একমাত্র সত্য বলে ধরতে। কেউ কেউ চান দার্জিলিঙের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর অংশের যোগাযোগ চাকরি-ব্যবসার সূত্রেই। ঘটনাটা এমন নয় যে দুই দলে ভাগ হয়ে এই সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। আসলে এই দুটি মনোভাব সবসময়ই সক্রিয় আছে। কেউ কখনো রাজধানীর স্মৃতিতে মগ্ন হন, অন্যসময় তিনিই জিলাশহরের নতুন গতিবেগকে গ্রহণ করেন।

ফলে দার্জিলিঙের সামাজিক জীবনেরও দুটি খাত তৈরি হয়।

জিমখানা ক্লাব, বিভিন্ন মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদেশী ব্যাঙ্ক, বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিদেশী চা-বাগান, লেবঙ ঘোড়দৌড়, লাট-সাহেবের বাড়ি—এইসব নিয়ে দার্জিলিঙের বনেদী সামাজিক জীবন। আর, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়িজ ক্লাব আর অ্যাসোসিয়েশন, লাইব্রেরি, অফিস-কর্মচারীদের দুর্গোৎসব, নতুন দোকান-পসারের মালিক—এদের নিয়ে দার্জিলিঙের নতুন হাল আমলের সামাজিক জীবন।

• এ-দুটো জীবনের ভেতরের বিরোধটা নিশ্চয়ই বৃহত্তর অর্থে সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্তর্গত। কিন্তু সেই বিরোধ নতুনতর জটিলতা পায় যখন সাবেকী বনেদী হালফ্যাশানের মিলিত প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন এম্. এল্. এ হিসেবে মিঃ প্রধান বা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার-ম্যান হিসেবে বিনয় ভৌমিক। বা স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, বিচ্ছিন্ন অংশে মিঃ প্রধান আর মিঃ সিন্হার ভেতর বিরোধ থাকলেও, তাঁরাই আবার বিভিন্ন চা-বাগান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। ফলে তাঁদের ভেতরের বিরোধের ব্যাপারে বাইরের উপাদান মিশে যাওয়াটাও খুব সম্ভব।

রাত্রিতে বাড়ি ফিরে দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে যায় আর খুলে যেতেই টগর-অশ্বিনী চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেখে একটা নতুন টেবিলের ওপর সারি সারি নতুন প্লেট, ডিস, কাপ, গেলাস সাজানো। বেণু বলে ওঠে, "দেখো, কেমন সারপ্রাইজ।"

"বাঃ বেশ হয়েছে" বলে অশ্বিনী এগোয়।

"অশ্বিনীও তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দেবে" টগর ভেতরের ঘরের দিকে এগোয়।

গোলাপ বলে, "সব বেণুদি পছন্দ করে দিয়েছে।"

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাগানে যেন একটা উৎসবের প্রস্তুতি চলেছে। পূজো একেবারে এসে গেছে—সুতরাং দিনগুলোতে আগামী উৎসবের আভাস থাকতেই পারে। দার্জিলিঙে এখন পুরো মরশুম, পূজোর ছুটির শীত শুরু হয়ে যাওয়ার আগে পড়িমরি মরশুম, বাগানে তার প্রভাব তো পড়তেই পারে, যখন রোজই দু-একবার গাড়ি দার্জিলিঙ যাতায়াত করে। এতদিনের টানা বর্ষার পর এই ঝকঝকে তকতকে রোদ, দূরের পাহাড়ের স্পষ্টতা, খাদগুলোর ভেতরে অনেক গভীর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া—এ-সবও তো মানুষজনকে উৎফুল্ল করতে পারে, বিশেষত, যখন এই আবহাওয়ার সঙ্গেই বোনাস, পূজো, ছুটি, শীতকালের কম খাটনি বা বার্ষিক ছুটি জড়িত।

যে-কারণেই হোক বড়বাবু থেকে শুরু করে মজুররা পর্যন্ত এই উৎসবের আভাসে যেন একটু বদলে যায়। এমন-কি ম্যানেজার, আর সুপারভাইজার সাহেবরা পর্যন্ত। অথচ বর্ষার সময় বাগানের কাজের যে গতি ছিল তা অব্যাহত রাখা হচ্ছে। সেই সকাল থেকে বিকেল পাতি টেপা চলছে। সেই রাতদিন ফ্যাক্টরিও চলছে।

বর্ষা থেমেছে প্রায় মাস দুই হল। বর্ষা থামার পর বাগানের চেহারাটায় একটা স্বস্তির ভাব এসেছিল। ধীরে ধীরে সেই স্বস্তির ভাবটা কেটে গেছে। এখন এই পরিবেশ-পরিস্থিতির নিজস্ব একটি ভাব তৈরি হয়েছে—সেই ভাবটাই উৎসবের আনুষঙ্গিক।

এমন একটি উৎপাদন ক্ষেত্র, যেখানে প্রতিটি মানুষের অবস্থান উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত--সে স্কটল্যাণ্ড থেকে আসা প্রায় চল্লিশ বছরের সাহেবই হোক আর মিরিক বস্তির গুরুং-ই হোক—যেখানে

প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রা সরাসরি উৎপাদনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত— স্ত্রীর সঙ্গে শোয়ার সময় দুপুর না রাত্রি বা বাচ্চাকে আদর করার সময় সকাল না বিকাল তা-ও নির্ভর করে ডিউটি কখন তার ওপর— যেখানে সামাজিক, বা মানবিকও হয় যদি, সম্পর্কগুলোর ওপর উৎপাদনের সম্পর্কগুলি, কোনো রকম আভাস-ইঙ্গিত বা ঢং-টং ছাড়াই, একেবারে সোজাসুজি, কোণে কোণে মিল রেখে বসে পড়ে, যেমন তের-চোদ্দ তলা বাড়ি তৈরির লোহার ছাঁচের ভেতর রি-ইন-ফোর্স ড্ কংক্রিটের চাঙড়, যেখানে মাথা নিচু করে ভুরু কুঁচকে বা মাথাটা পেছনে ঠেলে দৃষ্টি বিস্তৃত রেখে হাঁটা চলা দাঁড়ানোর মতো নিতান্ত ব্যক্তিগত অভ্যাসও নির্ভর করে কাজ করার জায়গাটি ফ্যাক্টরি না বাগিচা তার ওপর, সেখানে উৎসবের আভাসের সঙ্গে বাগিচা-ফ্যাক্টরি আর বাজার মেলানো জটিল ব্যাপারটিরও একটি সম্পর্ক থেকেই যায়।

ঋতুটা তখন পাহাড়ে মধ্যশরৎ। কিন্তু মধ্যবিন্দুটা প্রায় পার হতে চলেছে। ঋতু পরিবর্তনের মতো অপ্রত্যক্ষ ব্যাপারেও আগ্রহবোধ করে যে-মানুষ তার পক্ষে সাত-আট হাজার ফুট উঁচু এই নির্জন পাহাড়ের দীর্ঘ একটানা বর্ষা আর দীর্ঘ একটানা শীতের মধ্যবর্তী একটা দেড়-মাস দু-মাসের অস্থায়ী, সঙ্কীর্ণ শরতের প্রথম সঞ্চার, তার পূর্ণতা, কখন একসময় তার অবসন্নতা আর শীতের উপক্রম বা টুপ্ টাপ শিশিরপাতের শব্দ অনুধাবন করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু সেটা তো এই হাজারের ওপর মজুরের বা প্রায় শ'য়ের কাছাকাছি সাহেব আর বাবুদের সমবেত উৎসব সৃষ্টি করতে পারে না।

কিন্তু ঋতুটা মধ্যশরৎ আর মধ্যবিন্দুটা প্রায় পার হতে চলেছে, সেটা যেন বাগানের অফিসে নোটিশ দিয়ে টাঙানো হয়েছে। এখনই হচ্ছে বাগানের পাতি তোলার আর চা-বানানোর প্রায় শেষ সময়। মাটির ওপরের জমা জলেই নয়, মাটির নিচের জমা জলেও চা-গাছ নষ্ট হয়ে যায়। সারা বছরের আকাশভাঙা বৃষ্টির জল মাটির ওপর

দিয়ে গড়িয়ে শুধু চলে যায়। বৃষ্টির জলের নানা উপাদান লেগে থাকে শুধু ঘাসে। শেকড়ের সুতোয়-সুতোয় বেঁধে বেখে তৃণদল বৃষ্টির জলে মাটি ধসতে দেয় না। আবার সেই সুযোগে আগাছা-কুগাছা মাথা তুলে চা-গাছের বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। আকাশের মেঘ থেকে মাটির ঘাস পর্যন্ত এমনভাবে পাতি তোলা আর ম্যানুফ্যাকচারিং আর চালান আর নিলামের সঙ্গে বাঁধা।

দুই

বর্ষার শেষে শরতের টানা বোদে কয়েকদিনের মধ্যেই গাছগুলো শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। ধীরে ধীরে চেহারাটা হয় যেন চা-গাছ-গুলোর জলের অভাব। তখন সবার নজর পড়ে যে-ব্লকগুলির পাতি টেপা হয়ে গিয়েছে, সেই ব্লকগুলোর ওপর। গাছগুলো কেমন বুনো চেহারা ধরে। তারপর একটু-আধটু সকালে ঘাসভেজা শুরু হয়, সারা বাগানে পাতাগুলোর ওপরে শিশির ঝিকিয়ে উঠতে থাকে। দু-দিন যায় কি যায় না, সারাটা বাগানে নতুন কচি পাতার বান ডাকে আর ম্যানেজার থেকে মজদুর পর্যন্ত হুমড়ি খেয়ে পড়ে ব্লকে ব্লকে, গাছে গাছে। শুরু হয়ে যায় দার্জিলিঙের চা-বাগানের অটাম-টি-র ঋতু। সবচেয়ে হ্রস্ব ঋতু। সবচেয়ে ভালো চা-পাতির ঋতু। সবচেয়ে ভালো চা ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ঋতু। সবচেয়ে বেশি দামের চায়-এর ঋতু। ফ্লাওয়ারি অরেঞ্জ পিকো গ্রেডের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ চায়ের ঋতু।

তাই ঋতুটা যে শরতের মধ্যবিন্দু আর সেই মধ্যবিন্দুটা যে প্রায় পার হতে চলেছে—এটা প্রায় নোটিশ বোর্ডেই টাঙানো। বর্ষার পরের টন্‌টনে রোদে খটখটে শুকনো পাতা আর শিশিবে শিশিরে যে-কটা দিন লুটোপুটি খাবে, আর মাত্র ক-দিন পর শীতের শুরুতে একেবারে চুপসে না যাওয়া পর্যন্ত, সে-কদিন প্রায় রাতদিন পাতি টেপা আর রাতদিন ম্যানুফ্যাকচারিং। এখন যে সুটটা (Shoot) মাথা তুলেছে

কি তোলে নি, সেটাও তোলা যাবে। এখন আর পাতি টেপার জন্য কোনো মাপ নেই। মাপের নিচেও টেপা যাবে। সবচেয়ে কম সময়ের এই সবচেয়ে ভালো পাতি সবচেয়ে ভালো চা বানিয়ে সব চেয়ে বেশি দাম পাবে। কারণ চা-টা তো আর ফ্যাক্টরির মেশিনে নেই, আছে গাছের পাতিতে। একবার যদি পাতি নষ্ট হয়, হাজার ম্যানুফ্যাকচারিং-ও সে পাতি থেকে ভালো চা বানাতে পারবে না। যতই কেন না ভালো করে বেছে বেছে পাতি তোলা হোক, আকাশের মেঘ, মাটির ভেতরের রস, রোদের তাপের আর বাতাসের জলকণার মাত্রার হেরফেরে যে-পাতিতে রস বেশি জমে গেছে, পাতি ভারী হয়ে গেছে, পাতির রং কালচে ধরছে বা যে-পাতিতে রস তেমন ধরতেই পারে নি, বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে চিপে ধরলে যে-পাতি কাগজের মতো ঠেকে সে পাতিতে ভালো চা হয় না, হবে না। কিন্তু শীতকালে গাছের ছাঁটাই-কাটাইয়ের পর বসন্তের শুরুতে যখন পাতা গজানো শুরু হয়, তখন যদি ওপরে-ওপরে পাতি টিপে যাওয়া যায়, তখন যদি রাশি রাশি নতুন পাতা আর শিষ গাছে থেকেই যায়, তাহলে এ-সব গাছে দ্বিতীয় বার পাতা গজানোর সময় পেছিয়ে যায়, আর যাও-বা গজায়, সে-ও আস্তে আস্তে, খুব দুর্বল পাতা। মাটির যা কিছু রস বা হাওয়া বা রোদ সবই তো সেই বাঁজা পাতাগুলো খেয়ে নেয়, শুষে নেয়, যেগুলো টেপা হয় নি, গাছের উপর থেকে গাছের প্রাণশক্তি শুষে নেওয়া ছাড়া সেগুলোর আর কি-ই-বা করার আছে। কিন্তু শীতকালে যতটা ছুরি চালিয়ে ডালপালা ছাঁটা হয়েছে, সেই ছাঁটাইয়ের লাইন পর্যন্ত যদি বসন্তের শুরুতেই টিপে দেয়া যায়, তাহলে গাছ, গাছের সর্বাঙ্গ সেই ক্ষতিপূরণ করার জন্য প্রাণপণে লড়তে থাকে। মাটির ভেতরের রস, আর নানা খনিজ উপাদান, আলো, হাওয়া, সব মিলিয়ে গাছের টিস্যুতে টিস্যুতে আলোড়ন তোলে নতুন পাতা গজাতে। সেই পাতা গজানো যখন শুরু হয়, ছাঁটাই-কাটাইয়ের

পর শরীর ভরে তোলা নতুন পাতাগুলোকে আবার সেই ছাঁটাই-কাটাইয়ের লাইন পর্যন্ত টিপে নেয়া গাছে যখন দ্বিতীয় বার পাতা গজানো শুরু হয়, তখন সেই পাতায় থাকে গাছের শিকড়ের সর্বোত্তম প্রয়াস, যে-পাতা তুলে নেয়া হয়েছে সেই শূন্যতা পূরণের সর্বোত্তম প্রয়াস।

সেই প্রয়াসটি যাতে গাছ করতে পারে, গাছের সর্বাঙ্গ যাতে একরাশ পাতা ফোটাবার কাজে নিয়োজিত হয়ে যেতে পারে, যাতে শেকড় থেকে কাণ্ড বেয়ে মাটি থেকে নানা খনিজ লবণ আর রস, এক এক অনুপাতে নাইট্রেট, সালফেট, পটাসের ফসফেট, লাইম, ম্যাগনেশিয়া, সোডা ইত্যাদি জলে মিশে তরল স্রোতে গাছের পাতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যাতে বাতাস থেকে যে-কার্বনডায়োক্সাইড আর আলোকরশ্মি থেকে যে-ক্লোরোফিল পাতাগুলো টেনে নেয়, সেগুলো গাছের ভেতরের জলে মিশে গিয়ে শর্করা ইত্যাদি, কার্বো-হাইড্রেট বা মাটি থেকে টানা নাইট্রেট ইত্যাদির সঙ্গে মিশে প্রোটিন হয়ে যেতে পারে, যাতে এই প্রোটিন আর কার্বো-হাইড্রেট পাতা ফোটাবার সময় ব্যবহার করার জন্য গাছ নিজের ভেতর জমিয়ে রাখতে পারে, আবার তাই বলে এমন জমানো খাদ্যের ভারে গাছের শরীরে যাতে মেদ না জমে, পাতা ফোটাবার ঋতুতে গাছের নতুন পাতাগুলোকে তাড়াতাড়ি বেশ গভীর করে তুলে নিলে গাছ যাতে খানিকটা উপোসী থেকে যায় কারণ মাটিতে আর আকাশে-বাতাসে যত খাদ্যই থাক পাতা যদি শিষ লকলকিয়ে তা টেনে না নেয় তাহলে সে খাদ্য আর গাছের জোটে না, সেই উপোসী গাছ যাতে সেকেণ্ড ফ্লাসে. দ্বিতীয় বারের পাতা ফোটাবার সময়, নিজের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে পাতা ফুটিয়ে দিতে পারে,—সেই পাতা—কচি কলাপাতা রঙের বা খানিকটা হলদেটেও, বুনটে মোটা, কিন্তু খানিকটা যেন সবটুকু বেড়ে-না-ওঠা ধরনের কচি,—যে-পাতায় তৈরি হয় দার্জিলিঙের সবচেয়ে দামি চা—তারই জন্য তো এই বৃষ্টি, এই সূর্যালোক, এই হাওয়ায়

হাওয়ায় উৎসব। মালিকেরও দরকার পাতা, গাছেরও দরকার পাতা —পাতা নইলে কেউই যখন বাঁচে না, তখন এই দুই দরকারকে মিলিয়ে দিতে পারলে গাছ বাঁচে; গাছ বাঁচলে মালিকও বাঁচে, মালিক বাঁচলে হাজারের ওপর মজুর আর প্রায় শ'-ছোঁয়া সাহেব আর বাবুরাও বাঁচে। এই কোম্পানিতে যাঁদের শেয়ারের কাগজটুকুমাত্র আছে, যাঁরা ছড়িয়ে আছেন ভারতবর্ষের দু-একটি জায়গায় দু-একজন আর ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ডের নানা জায়গায় নানা জন, সেই শেয়ারের কাগজের জোরে যাঁরা ডিরেক্টর তাঁদের কাছে হয়তো কোম্পানি বলতে সেই কাগজটুকু, কাঠুরের কাছে যেমন বনের আর কিছুই নেই কাঠটুকু ছাড়া। কিন্তু গাছ থেকে সব পাতা যদি ঝরিয়ে দেয়া যায়, কাঠও আর তৈরি হবে না। পাতার অভাব পূরণ করতে শেকড়ে জল আর সার ঢাললে, গাছের কাণ্ডটাই জলে জলে ফুলে ফেঁপে ফেটে যাবে। আঙুরের লতার পাতা ঝরিয়ে দিলে ফলে আর কোনো রস জমবে না। আলু গাছের পাতা খসিয়ে দিলে মাস আর ফুলবে না। ডাল-পাতা মেলে কত ঝেঁকে উঠেছে তারই ওপর নির্ভর করে একটা গাছের স্বাস্থ্য কতটা। গাছ যদি হাঁফিয়ে যায়, গাছের ডাল-পালা কেটে একটু হালকা করে দিতে হবে। গাছ যদি ফুর্তিতে নেচে-কুঁদে নিজের সব শক্তি খরচ করে ফেলতে চায়, তাকে একটু উপোসী রাখতে হবে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে সেই রসে-ভরা পাতা তাকে ফলিয়ে যেতে হবে, যে-পাতা রোদে ঝরিয়ে, তাপে শুকিয়ে, ভেজে, ছেঁকে, ভিজিয়ে, শুকিয়ে, প্যাক করে, চালান পাঠিয়ে, বেচে, মুনাফা —এ-দেশ ও-দেশে যারা শেয়ারের কাগজ নিয়ে আছে তাদের জীবন, বাগানে যারা পাতি টিপছে আর তদারকি করছে তাদের বাঁচন।

আর এ-পাতা তো কখনো শেষ হতে দেখা যায় না, যাবে না। চিরহরিৎ এই গাছ সারা বছর ধরেই তো পাতা ঝরায়, পাতা ফোটায়। আজ একটা পুরনো পাতা ঝরে গেলে ডাঁটিটুকু থেকেই গেল। দু-এক মাসের মধ্যে ডাঁটিটা একটা ফেঁকড়ি হয়ে বেরয়। দু-এক

বছরের মধ্যে সেই ফেঁকড়ি একটা পাকাপোক্ত ডাল হয়ে ওঠে। দু-এক বছরের মধ্যে সেই ডালটা প্রায় একটা আলাদা গাছ হয়ে উঠবে। এ-পাতার তো শেষ নেই, এ-পাতা ফিরে ফিরে নতুন, বারেবারে নতুন।

ষাট-সত্তর বছর পরমায়ু নিয়ে গাছটা পাতা গজিয়ে যায়, নতুন কলম গজিয়ে যায়, ফল দিয়ে যায়। তিন হাজার বর্গফুট এলাকায় শ' দেড়েক মতো গাছ বা এক একরে দু-হাজার দু'শ পঞ্চাশটা গাছ—এই হিসেবে দু, পাঁচ, সাত-শ, হাজার, দেড় হাজার বা দু-হাজার একরের চা-বাগিচাগুলোর হাজার হাজার গাছ ব্যক্তিগত ইতিহাস সৃষ্টি করে, সমবেত ইতিহাসও গড়ে তোলে, সে-সমবেত ইতিহাস শুধু একটি গাছের সঙ্গে আর একটি গাছের সম্পর্ক দিয়েই তৈরি নয়, একটি গাছের জন্ম থেকে শুরু করে তার সবগুলো পর্বের সঙ্গে পরিচিত মানুষজনেরও সঙ্গে মিলিতভাবে সেই সমবেত ইতিহাস তৈরি হয়। সারাটা বাগানের একটা জীবন আছে—রোদ-বৃষ্টি-হাওয়া থেকে শুরু করে বাগানের পশু-পাখি কীট-পতঙ্গের দ্বারা গঠিত মিলিত জীবন। বাইরের লোকের কাছে এই মিলিত জীবটাই সবচেয়ে আগে ধরা পড়ে,—উৎপাদন কেন্দ্রের সূত্রে মিলিত জীবন। তার সমবেত অভ্যাস, নিয়ম, আনন্দ-বিষাদ, তার গাছগুলোর নতুন পল্লববিকাশ, তার ফ্যাক্টরির নতুন চা তৈরি, তার মানুষজনের পাতি টেপা থেকে শুরু করে প্যাকিং করা, তার ফলনের হিসাব, বোনাসের হিসাব দিয়ে তৈরি এই মিলিত সংসার। বোধহয় উৎপাদনের সূত্রে বাঁধা বলে, বোধহয় অন্য কোনো বিকল্প জীবনযাত্রা নেই বলে, বোধহয় পারিবারিক-সামাজিক-মানবিক সম্পর্কগুলো উৎপাদনের সম্পর্কের ছাঁচে খাঁজে খাঁজে এঁটে যায় বলে—এই মিলিত সংসার বাইরের মানুষজনের বা এই সংসারের নিয়মের বাধ্যত অন্তর্গত নয় এমন কারো, যেমন অশ্বিনীর, প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

কিন্তু এই সংসারে বাগিচা আর কারখানার তো আলাদা অস্তিত্ব

আছে। বয়লারের যে-উত্তাপ বা বিজলির যে-সঞ্চার মেশিনগুলোকে চালু রাখে তারও একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে। বাগিচায় যে-মজুর পাতি টেপে বা গাছ কাটাই-ছাঁটাই করে—তার কাছে বাগিচাটাই শুধু প্রত্যক্ষ, রং-ঘরে যে-মজুর চা-পাতার অক্সিডাইজেশনের পরিমাণের হিসেব রং দেখে করতে থাকে তার কাছে রং-ঘরের নিয়ন্ত্রিত তাপ, জলের হিসেব, ভিজে থাকার হিসেবটাই শুধু প্রত্যক্ষ। মিলিত সংসারের ভেতর একজনের জগতে শুধু সবুজ পাতা, কচি পাতা, জনম পাতা, বাঁজি পাতা। আর একজনের জগতে শুধু চা-পাতি—কালো, গোটানো, ডাস্ট, স্ন্যাটস্, নির্ভাজ, মোটা, পাতলা। এই ভেতর সংসারটার নিয়মকানুন বাইরের লোকের চোখে ধরা পড়ে না, আসলে এই সংসারের নিয়মের বাধ্যত অন্তর্গত নয় এমন কারো, যেমন অশ্বিনীর, অভিজ্ঞতায়ই আসে না।

আবার এই ভেতর সংসারের ভেতরে নিজের সংসার থেকে যায়—সেই এক অদ্ভুত নিয়মের জোরে যে-নিয়মে দুনিয়ার হাজার মানুষের ভেতর দুজনই শুধু বন্ধু হয়ে পড়ে, দুজনই শুধু ভালোবেসে ফেলে। পাতি যখন টেপা হয় তখন দু-হাতে দশ আঙুলের খেলায় কোনো পাতি রুমালে ওঠে, কোনো পাতি ওঠে না, চোখ আর আঙুল মিলিয়ে বাছাই আর টেপা চলতেই থাকে, একটা গাছ তার পাতার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে-টিপছে তার সামনে সত্য হয়ে ওঠে, এমন বিচিত্র জটিল ব্যক্তিগত সত্য, যা পাশের লাইনের পাতি যে-টিপছে তার কাছে চির অন্ধকার। শীতকালে গাছ যখন কাটাই-ছাঁটাই হয় তখন কলম ছুরি যার হাতে সেই মজুর আর তদারকি করছে যে সেই বাবুর চোখের সামনে ডালপালা সমেত গাছটা তার অতীত, তার ডালপালার বাকলের ভেতর, গাঁটের ভেতর, কাণ্ডের ভেতর বাঁকাচোরা বেড়ে ওঠার গোপন প্রবণতা, ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জীবন আর পাতি-ফোটাবার অনির্ণেয় ক্ষমতা নিয়ে—ভাস্করের চোখের সামনে শূন্য দেশ যেমন—দেখা দেয়। ঐ গাছের

সঙ্গে ঐ মানুষের যে-সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় তা, এমন কি, নিজের হাতে বোনা গাছের সাবালকতা দেখবার অভিজ্ঞতার উচ্ছ্বাস আবেগের সঙ্গেও তুলনীয় নয়। কয়েক হাজার বা প্রায় লক্ষ পেরনো গাছের ভেতর এক-একজনের চোখের সামনে শুধু ভেসে ওঠে কয়েক শ' বা হাজার পেরনো গাছ, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির থেকে আলাদা, বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র। প্রত্যেকটির সঙ্গে সেই মানুষটির একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে, সে সম্পর্ক এত ব্যক্তিগত যে মানুষটি জানে আগামী বছর ঐ গাছটির কোন্ ডালটি কাটতে হবে, আগামী দু-বছর পর ঐ গাছটিতে কত পাতার ফলন হবে, আগামী ঋতুতে ঐ গাছের গোড়ায় কোন সার কতখানি দিতে হবে। হঠাৎ যেন সত্য হয়ে পড়ে দেহযন্ত্রের একই উপাদানে যেমন কোটি কোটি হয়েও মানুষ চোদ্দ পোয়া পাঁজরায় আটকানো দেহতত্ত্বের সেই বিষণ্ণ একা পাখি, তেমনি হাজারে লাখে গাছগুলো উদ্ভিদতত্ত্বের সব নিয়মবিধির ভিতরেও আলাদা আলাদা। পাতা বিক্রির অর্থনীতির খাঁজে খাঁজে যে-উৎপাদন ক্ষেত্রের এমন-কি মানসিক সম্পর্ককেও এঁটে যেতে হয়, সে উৎপাদন ক্ষেত্রে ষাট-সত্তর বছরের পরমায়ুতে বাঁধা এক-একটা গাছ আর মানুষের কী এক-একটা নিজের সংসার গড়ে ওঠে—রামী-চণ্ডীদাসের অসামাজিক অহৈতুক অকৈতব অকাম ভালোবাসার প্রসিদ্ধ সংসার যেন।

তিন

এই, একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপারটি এ-উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো সময়ই স্পষ্ট হয় না, প্রত্যক্ষ তো হয়ই না। সবার কাছে সোজাসুজি ধরা পড়ে বাইরের মিলিত সংসারটাই। তার টানাপোড়েন, তার নানা সংঘাত-মিলনে সবার অংশ থাকে। উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি-সম্পর্কের দিকটাও প্রায় সবসময় ওপরেই থাকে বা ওপরের স্তরের ঠিক নিচেই, যে-কোনো সময় ভেসে উঠতে পারার মতো।

বর্ষার পর বাগানে যে-পরিবর্তন এসেছিল সেটা যেন লম্বা বর্ষার হাত থেকে মুক্তিবোধের ফল। রোদ, আকাশ, শুকনো মাটি ধাতস্থ হতে হতে মুক্তিবোধটা ফিকে হয়ে যায়। পরিস্থিতির নতুনত্বটুকু ঘুচে গিয়ে উৎপাদনের নতুনত্ব আসার মাঝখানে ক-টি দিনে যে-যার জায়গা বেছে নেয় যেন—শিশির পড়তে না পড়তে যে-নতুন পাতা গজাবে, সেই সূত্রে নতুন চা-এর যে-উৎপাদন শুরু হবে—সেখানে কে কোথায়।

এই ঋতুর স্থায়িত্ব খুব কম বলেই হয়তো উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে জড়িত মানুষজনের ভেতরে বোঝাপড়াটা থিতিয়ে যাওয়ার সময় পায় না। আর, বছরের সেরা চা উৎপন্ন করা হচ্ছে—এরকমের একটা তত-স্পষ্ট-নয় অনুভূতিও সবার ভেতর কাজ করে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি কাজ করে নিশ্চয়ই বাগানবাবুর ভেতর। কারণ পাতি টেপার ব্লক তিনিই ঠিক করেন, কত তাড়াতাড়ি সমস্ত বাগানের রাউণ্ড শেষ হবে সেটাও তাঁরই মাথায় থাকে, কোন্ ব্লকে পাতির ফলন কি রকম সেটা চোখ-আন্দাজে তাঁকেই বুঝে নিতে হয়। ফলে বাগানবাবু মানসিক দিক থেকে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পাতি টেপা তো বার মাসের ভেতর আট মাস চলছেই। কিন্তু এই দেড়-মাস দু-মাসের পাতি টেপার ভেতর যে সতর্কতা থাকে, সেটা আর কোনো সময়ই থাকে না। সাধারণভাবেই বাগানের কাজ যাঁরা তদারকি করেন সেই সব বাবুর মধ্যেও সতর্কতা ও সচেতনতার সংক্রমণ ঘটে। বাইরের কারো পক্ষে সেটা বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু কাজে যাওয়ার সময়ে বাবুদের তরফ থেকেই তাড়া, সময় পেরবার পরও একটা হিসেবের কাজ শেষ করতে লোকজন নিয়ে একটু থেকে যাওয়া,—এ-সব থেকে যেন আভাসে বোঝা যায় যে শিশিরের ছোঁয়ায় এই যে নতুন পাতা গজাচ্ছে, শিষ বেরচ্ছে, এগুলোর একটা সামগ্রিক প্রভাব পড়ছে, যত অস্পষ্টই হোক না কেন।

ফ্যাক্টরিবাবুর ভেতর এই নতুন পাতার প্রক্রিয়াটা একটু স্বতন্ত্র। তাঁর ব্যবস্থাগুলোর কোনোটারই তো পরিবর্তন ঘটাতে হয় না। খারাপ পাতির চা বানানোর জন্য যে-যে প্রক্রিয়া, ভালো পাতির চা বানানোর জন্যও সেই একই প্রক্রিয়া। জল শুকোবার জন্য পাতা-গুলোকে যাতে বেশিক্ষণ ফেলে রাখা না হয়, সময় ও তাপের মাপটা যেন ঠিক থাকে,—এ সব তাঁকে সব সময়েই দেখতে হয়। কিন্তু পদ্ধতি অপরিবর্তিত হলেও, যখন উন্নততর ফল মেলে, তখন এক ধরনের বিশেষ গৌরববোধ মনে বাসা বাঁধে। কিন্তু সারাটা ঋতু ফ্যাক্টরিতে যে ব্যস্ততা থাকে, এখন তা নেই। এখন যেন খানিকটা হাঁফ ছাড়ার ভাব। ফলে ফ্যাক্টরি বাবু থেকে শুরু করে ফ্যাক্টরির মজুর পর্যন্ত একটা বিশ্রান্ত ব্যস্ততা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গত বছর থেকে প্লেনভিউয়ে এই অটাম-টি-এর সময় মনপুরান থেকেও পাতি আনা হচ্ছে। এই কোম্পানির অধীনে কুড়িটি চা-বাগান আছে —আসামে, ডুয়ার্সে, দার্জিলিঙে। দার্জিলিঙে কাছাকাছি এই দুটি বাগান—প্লেনভিউ আর মনপুরান। দূরে আরো একটা বাগান আছে। মনপুরান অপেক্ষাকৃত ছোট বাগান। গত বছর প্রথম অটাম-টি-র সময় মনপুরানের পাতি প্লেনভিউয়ের কারখানায় আসতে শুরু করে। কেউ-ই কিছু জানতো না। একদিন বেলা এগারটা নাগাদ এক ট্রাক ভর্তি পাতি দক্ষিণ ঢালু বেয়ে ফ্যাক্টরির সামনে এসে দাঁড়ায়। ট্রাকের ভেতরে তিনজন মজুর এসেছিল, তারা পাতিগুলো নিয়ে উইদারিং হাউসে বিছিয়ে দেয়া শুরু করতে বোঝা গিয়েছিল ফ্যাক্টরি-বাবু আগে থাকতেই জায়গা ঠিক করে রেখেছিলেন। ঋতুর বাকি সময়টা উইদারিং হাউস থেকে শুরু করে চা-পাতি প্যাকিং হওয়া পর্যন্ত প্লেনভিউ আর মনপুরানের পাতি আলাদা আলাদাই থাকল বটে কিন্তু প্লেনভিউয়ে সব করা হল।

পরে জানা গেল মনপুরানের ফ্যাক্টরির চাইতে প্লেনভিউয়ের ফ্যাক্টরির যন্ত্রপাতি নাকি আধুনিক বলে মনপুরানের অটাম-টি-টা প্লেনভিউয়ের ফ্যাক্টরিতে বানানো হচ্ছে। আসলে দেখা হচ্ছে বানানো সম্ভব কি-না বা কী কী অসুবিধে হয়। সেইজন্য কয়েক লট্ এখানে আনা হয়েছে। এ-বছরের ফলাফল দেখে তারপর পাকাপাকি ব্যবস্থাটা কী করা যায় তা নিয়ে মাথা ঘামানো হবে। আর মাত্র তো কয়েক ট্রাক চা, পরে আর কেউ ও নিয়ে মাথাই ঘামায় না।

এই খবরগুলো যে কী করে সবার জানা হয়ে যায় সেটা একটা রহস্য। কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না কিন্তু তারপর এক সময় সবাই মিলে যখন কথা বলতে শুরু করে তখন সবাই-ই যেন সব জেনে বসে আছে। কেউ কারো কাছে কোনো খবর জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গিতে জানতে চায় না। যেমন কেউ কারো কাছে কোনো খবর জানাবার ভঙ্গিতে দিতে চায় না। প্রত্যেকেরই বোধহয় খবর দেবার ও নেবার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে।

গেল বছর মনপুরানের ব্যাপারটা নিয়ে যখন সবার কথা বলার সময় হল তখন দেখা গেল সকলেই যেন ভাবছে যে আসলে এটাতে বাবু ও মজুরদের লাভ হবে, সুতরাং কোম্পানি এটা কিছুতেই করতে পারে না। মনপুরানের পাতি প্লেনভিউয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং হলে চায়ের বেশি দাম মিলবে, মনপুরানের ফ্যাক্টরি খরচ বাঁচবে, ফলে বোনাস ইত্যাদি দিতে হবে। এটাও তখন সবার জানা হয়ে গেল যে আসলে নাকি এ-সব কিছুই না, সুপারিনটেনডেন্ট হাচিন সাহেবের সঙ্গে প্লেনভিউয়ের ম্যানেজার কল সাহেবের নাকি ভেতরে ভেতরে আদা-কাঁচকলা। হাচিন সাহেবকে কোনোরকমে একবার এখান থেকে সরাতে পারলে কল সাহেব নাকি সুপারিনটেনডেন্ট হবে। তাই এই বিষয়টি আলোচনার জন্য দুই বাগানের ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের যে-মিটিঙ ডেকেছিল হাচিন সাহেব, সেই মিটিঙে কল সাহেব নাকি প্রস্তাবটিকে খুব জোরের সঙ্গে সমর্থন করে। ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নাকি বলেছেন প্লেনভিউয়ের উৎপাদনের এতে ক্ষতি হবে, কল সাহেব তাকে ধমকে বসিয়ে দিয়ে বলে, 'প্রোগ্রামিং করলে সবই সম্ভব। সুপারিনটেনডেন্টের প্রস্তাব, কল সাহেবের মতো সিনিয়র ম্যানেজারের সমর্থন, সুতরাং ঠিক হয় যে সেইবার কিছুটা পরীক্ষামূলকভাবে দেখা হবে। আসলে সবটাই নাকি কল সাহেবের চাল। যতদিন পরীক্ষামূলকভাবে চলবে, ততদিন নাকি সে লাভ দেখিয়ে দেবে, দরকার হলে নিজের পকেট

থেকেও টাকা দিয়ে। আর যেমনি এটা পাকা ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হবে, অমনি পরপর দু-বছর এমন লস্‌ কল সাহেব ঘটিয়ে দেবে যে হাচিনের চাকরি যদি না-ও যায়, বদলি সুনিশ্চিত।

মুশকিল হচ্ছে, কল-এর এই চক্রান্ত সবাই জেনে ফেললেও হাচিন সাহেব কিছুটি টেরই পায় না যেন কেন।

কিন্তু, মনপুরানের পাতা আসার পর থেকেই ফ্যাক্টরিবাবুর ব্যস্ততা সবার নজরে পড়েছিল। একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব তার ঘাড়ে পড়েছে—সেই কারণে কিছুটা ব্যস্ত তো তিনি হতেই পারেন। কিন্তু ফ্যাক্টরিবাবুর ভেতর নাকি এ-রকম একটা ধারণা তৈরি করানো হয়েছে যে গত ক-বছর ধরে প্লেনভিউ-এর চা এত ভালো দাম পাচ্ছে যে কোম্পানি ফ্যাক্টরিবাবুর কৃতিত্ব সম্পর্কে একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ফ্যাক্টরিবাবু থেকে প্রমোশনের কোনো পদ নেই। তাছাড়া চা-শিল্পে একমাত্র এই কারণেই ইনসেনটিভ্‌ বোনাস চালু করা সম্ভব নয় যে উৎপাদনটা কার কেরামতিতে বাড়ছে তা নির্দিষ্ট করা যায় না। সেইজন্য, যদিও চা-এর ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ব্যাপারে ফ্যাক্টরিবাবুর কৃতিত্ব সব সন্দেহের বাইরে, তবু আইন না থাকায় ফ্যাক্টরিবাবুকে পুরস্কৃত করা না গেলেও অধিকতর দায়িত্ব দিয়ে কোম্পানি তাকে স্বীকৃতি দিতে চায়। তাই মনপুরানের পাতি প্লেনভিউয়ে আসছে।

মুশকিল হল এই কোম্পানিটি কে তা কেউই জানে না। সুপারিন-টেনডেন্ট, ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, সুপারভাইজার এরাই আপাতত সব ব্যাপারে কোম্পানি। আবার মজুরদের কোনো কোনো গোলমালের সময় বাবুরাও কোম্পানি হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো সময় বাবুরা তো দূরের কথা, সাহেবরাও মজুরদের মতন তনখামেলা চাকরে হয়ে যায়। তখন কোম্পানিটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। যখনই কোনো একটা ব্যবস্থা বর্ষার সময়ের ঝর্ণার মতো অনিবার্য বেগে নেমে আসে তখনই তার উৎস

হয়ে যায় কোম্পানি। একবার যদি 'কোম্পানি' নামটি উচ্চারিত হয়ে যায়, তাহলেই যেন সব প্রশ্ন, সন্দেহ, তর্ক, আপত্তির শেষ। প্রশ্ন উঠতে পারে, সন্দেহ প্রকাশ হতে পারে, তর্ক চলতে পারে, —কিন্তু জবাব দেবার কেউ নেই, সবই কোম্পানির হাতে, ফ্যাক্টরি-বাবুর কোম্পানিটির হদিস না মেলা পর্যন্ত তাঁকে কোন কোম্পানি কী করতে বলেছে তার নিকেশ সম্ভব নয়, বিশেষত, কারো কারো মতে ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজারের তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর কিছুই যখন করার ছিল না।

দুই

সব কিছু মিলে গেল বছর মনপুরানের পাতির ব্যাপারটা সবার মধ্যে এমনি একটা কৌতুক সৃষ্টি করেছে যে হাচিন বুঝছে না—কল তাকে জাঁতা কলে ফেলছে, হাচিন আর কলের এই বিড়াল-ইঁদুর খেলার মাঝখানে ফ্যাক্টরিবাবু নিজের ভেতর নিজে ফুলে বসে আছে—নিশ্চয়ই কেউ তাকে ফুলিয়ে ছেড়েছে।

কিন্তু এ তো গেল কৌতুকের দিক। কৌতুকটুকু আরো বেশি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে ব্যাপারটাকে নিয়ে কৌতুক ছাড়া কিছু করারই নেই যেন। হাচিন-কল বিরোধই হোক, আব ফ্যাক্টরিবাবুর ফুলে ওঠাটাই হোক, আসলে মনপুরানের পাতি প্লেন-ভিউয়ে এসে ম্যানুফ্যাকচারিং হওয়াটা তেমন দরকারি কথাই নয়, একটু মজা করা ছাড়া, এ নিয়ে করার আর কি-ই বা আছে—এই ধারণাটা গেল বছর কী করে যেন তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

এ-বছর অটাম-টির শুরুতেই প্রতিদিন মনপুরান থেকে পাতি আসা শুরু করল, গতবার এসেছিল পরীক্ষামূলকভাবে মাত্র কয়েক ট্রাক। ফলে মুশকিল বেধে গেল উইদারিং হাউসে জায়গা নিয়ে। গেলবার কয়েকটা মাত্র র‍্যাক খালি রাখা হয়েছিল মনপুরানের পাতির জন্য। কিন্তু এবার যখন প্রতিদিনই ট্রাকের পর ট্রাক পাতি

আসতে লাগল তখন দেখা গেল মনপুরান থেকে কত পাতি আসবে, এখানকার উইদারিং হাউসে জায়গা কুলোবে কি-না, এখানে কত পাতি উঠছে, মনপুরানেই বা কত, এত পাতির ম্যানুফ্যাকচারিং সম্ভব হবে কি-না, পাতি নষ্ট হয়ে যাবার কোনো আশঙ্কা আছে কি-না —এ-সব হিসেব-নিকেশ কার মাথায় কে জানে, কিন্তু পাতাগুলো শুকোবার জায়গা করে দেবার দায়িত্বটা ফ্যাক্টরিবাবুর, একার।

সেটাও বড় কথা নয়। দায়িত্বটা যে ফ্যাক্টরিবাবুকে বহন করতে হবে এবং সেদিন থেকেই হবে—সেটা তিনি কেন, কেউ-ই জানতে পারেন নি। ফলে, সেদিন সকালে এক ট্রাক পাতি মনপুরান থেকে আসতে, যে ছোকরা ওখানে ছিল, সে ফ্যাক্টরিবাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই দুটো র‍্যাকে পাতাগুলো বিছিয়ে দিয়েছে। ঘণ্টা চারেক পরে ফ্যাক্টরিবাবু দুপুরবেলা খেতে যাবার সময় দেখেন আর এক ট্রাক পাতি আসছে। তিনি উইদারিং হাউসে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করে খেতে চলে গেলেন। কিন্তু বিকেলে যখন একসঙ্গে দুই ট্রাক এসে হাজির তখন ফ্যাক্টরিবাবু বিপদে পড়েন। অন্য কেউ হলে হয়তো সাহেবদের জানিয়ে দিয়ে দায়িত্বের হাত থেকে নিজে বাঁচত। কিন্তু ফ্যাক্টরিবাবু সে পাত্রই নন। চাকরি বরখাস্ত হওয়ার আশঙ্কা নিয়েও তিনি তাঁর সামনে হাজির সমস্যার সমাধান নিজের বুদ্ধিতে করবেন। প্লেনভিউয়ের উইদারিং হাউসে জায়গা আছে দুই লক্ষ বর্গফুট, গড়ে দৈনিক আশি-নব্বই মণ পাতি তোলা হয় এই হিসেবে। যদি কোনো বছর পাতি খুব ভালো উঠতে থাকে সে-টুকু বাড়তি পাতি এর মধ্যে আঁটিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু গড় ফলনের এই বছরে যদি মনপুরানের পাতি এইভাবে আসতে থাকে তাহলে উইদারিং হাউসে জায়গা কুলোতেই পারে না।

সে তো গেল হিসেব-নিকেশের ব্যাপার। এখন দুই ট্রাক পাতির ব্যবস্থা ফ্যাক্টরিবাবুকে করতে হবে। ফ্যাক্টরিবাবু ট্রাকের সঙ্গে যে-মজুররা এসেছে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "ওজন কোথায় হয়েছে।"

ওরা জবাব দেয় বাগানেই হয়েছে। ফ্যাক্টরিবাবু প্রথমে বুঝে নিতে চান সমস্যাটা সমাধানের জন্য তাঁর হাতে কতটা সময় আছে। যদি পাতি তুলে এনে ফ্যাক্টরির সামনে ওজন সেরে এখানে পাঠানো হয়ে থাকে তাহলে আর এক মিনিট সময়ও নষ্ট করা যাবে না, এখুনি পাতিগুলো বিছিয়ে দিতে হবে, নইলে লাল্চে হয়ে যাবে, চায়ের বারোটা বেজে যাবে। কিন্তু জবাব শুনে ফ্যাক্টরিবাবু বোঝেন কিছুটা সময় তিনি পাবেন। প্লেনভিউ বাগানে এই তারের তাক দিয়ে উইদারিং হাউস বানানো হয়েছে বছর বারো-চোদ্দ আগে। ফ্যাক্টরি-বাবু তখন ছোকরাবাবু হিসেবে ফ্যাক্টরিতে আসেন। তার আগে ছিল হেশিয়ান কাপড়ের উইদারিং র‍্যাক। তাতে পাতাগুলো ভালো-ভাবে ও তাড়াতাড়ি শুকোতো বটে কিন্তু হেশিয়ানগুলো বড় তাড়া-তাড়ি পচে যেত। সেইজন্য পরে এই তারের র‍্যাক বসানো হয়। হেশিয়ানগুলো ফ্যাক্টরির গুদামে রাখা ছিল। ফ্যাক্টরিবাবুর যদ্দুর মনে পড়ে সেগুলো এখনো ওখানে আছে। নিশ্চয়ই পোকায় কেটে নষ্ট হয়েছে তবু দুটো একটা কি আস্ত পাওয়া যাবে না।

দশ-পনের মিনিটের মধ্যে ফ্যাক্টরিবাবু গুদাম থেকে হেশিয়ানের বাণ্ডিলগুলো খুঁজে বেরই শুধু করলেন না, ফ্যাক্টরির সামনে বিছিয়েও ফেললেন। তারপর এই রোলের অর্ধেকের সঙ্গে আর-এক রোলের খানিকটা জুড়ে সেলাই করে দুটো রোল বানিয়ে ফেললেন। উইদারিং হাউসের ভেতরে দু-দিকে দুটো দুটো চারটে খুঁটিতে রোলগুলো টান টান করে বেঁধে তার ওপর মনপুরানের পাতিগুলো বিছিয়ে দিতে বললেন।

ফ্যাক্টরির দরজায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফ্যাক্টরিবাবুর সম্ভবত চিন্তা হচ্ছিল—কাল সকাল দশটায় যদি আরো দুটো ট্রাক আসে, তাহলে ব্যবস্থাটা কি হবে। কাল সকালে আরো পাতি আসবে কি-না, এই সিজ্‌নে মনপুরানের সব পাতি-ই প্লেনভিউয়ে আসবে কি-না, তাহলে দৈনিক পাতির পরিমাণ কী হবে—এ-কথা-

গুলো জেনে নিয়ে সমস্যাটা তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পেশ করলেই ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। এই সহজ সমাধানটাই ফ্যাক্টরিবাবু দেখতে পেলেন না।

তিন

বিকেলে প্লেনভিউয়ের শেষ পাতির বোঝা নিয়ে মজুররা আর বাবুরা যখন ফিরলেন, তখনই বোঝা গেল ফ্যাক্টরিবাবু সহজ সমাধানের পথে না গিয়ে ফ্যাসাদ আরো বাড়িয়েছেন। মজুররা উইদারিং হাউসে পাতা বিছোতে গিয়ে হেশিয়ান ক্লথের নতুন কায়দা দেখে নিজেদের ভেতর হাসাহাসি করছিল। তাই শুনে বাগানবাবুর দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট গিয়ে কথাটা তুললো বাগানবাবুর কানে। বাগানবাবু হনহনিয়ে ফ্যাক্টরিবাবুর সামনে এসে চিৎকার শুরু করলেন, "আমার পাতি হেশিয়ানের ওপর ছড়াবার রাইট আপনাকে কে দিয়েছে?"

ফ্যাক্টরিবাবু কিছুটা থতমত খেয়ে জবাব দিলেন, "ওটা তো মনপুরানের পাতি, আপনার পাতি তো র‍্যাকেই আছে।"

"মনপুরানের পাতি হোক আর যেখানকার পাতিই হোক, এ উইদারিং হাউস কি এই বাগানের জন্য না-কি অন্য বাগানের জন্য?" বাগানবাবু ফ্যাক্টরিবাবুর চোখের সামনে আঙুল নাচাতে থাকেন।

"সে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করছেন কেন, বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করুন—" ফ্যাক্টরিবাবুও ততক্ষণ গলা চড়িয়েছেন। ইতিমধ্যে ফ্যাক্টরির ভেতর যে-বাবু আর মজুররা ছিল তারা বেরিয়ে এসেছে, বাইরে যারা পাতি নিয়ে গিয়ে উইদারিং র‍্যাকে বিছিয়ে দিচ্ছিল তারাও কাজ ফেলে এসে ভিড় করেছে।

"তাই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনাকে হেশিয়ানে পাতি বিছোতে কে বলেছে, ফ্যাক্টরিসাহেব বলেছে, না ম্যানেজার বলেছে?"

"তার কৈফিয়ত আমি আপনাকে দেব না। আমার কাছে

পাতি এসেছে, আমার যে-ভাবে খুশি পাতি শুকবো, আপনার তা নিয়ে মাথাব্যথা কেন, হেশিয়ান থাকলে হেশিয়ানে বিছোবে, র‍্যাক থাকলে র‍্যাকে বিছোবে।”

“কী? আমি কি আপনার আণ্ডারে চাকরি করি? তারপর বলবেন বাগানবাবু পাতি পচিয়েছে—চা ভালো হয় নি। আমার পাতির উইদারিং-এর জায়গায় অন্য কোনো পাতি বিছনো চলবে না, ব্যস। এই—কেউ পাতি ফেলবে না, দেখছি আমি ফ্যাক্টরিবাবুর মাতব্বরি কত?

“ঠিক আছে, আমিও বলে দিলাম পাতি যদি এখুনি বিছনো না হয় তা হলে ঐ পাতি আমিও ফ্যাক্টরিতে ঢুকতে দেব না, দেখি আপনার কত মুরদ”—ফ্যাক্টরিবাবুও চিৎকার করে বললেন।

মুহূর্তের মধ্যে বাবুরা মজুররা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল, যারা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, বলতে লাগলো—কোথায় কী-ভাবে কত পাতি শুকোবে তা নিয়ে তো বাগানবাবুব মাতব্বরি করার কোনো মানে হয় না। আর একদল বললো ফ্যাক্টরিবাবু কোথাকার কে যে সে র‍্যাকের বদলে হেশিয়ানে পাতা শুকোবার কথা বলে। এ-বাগানে কি ম্যানেজার-ট্যানেজার নেই নাকি। ফ্যাক্টরির দরজার ভেতরে-বাইরে যখন তুমুল গোলমাল বেধে গিয়েছে তখন পেছন থেকে দুটো ভারী গলায় ধমক উঠলো—“এই, কেয়া হুয়া, হোয়াট হ্যাপেন্ড”---ফ্যাক্টরি আর বাগানের দুই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারসাহেব এসে উপস্থিত। প্রথমে সবাই চুপ করে যাবার পর একসঙ্গে কথা বলা শুরু করতেই ফ্যাক্টরিসাহেব ধমকে উঠলেন। আবার সবাই চুপ কবলে সাহেব ফ্যাক্টরিবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছে।” ফ্যাক্টিবিবাবু তাঁর বিবরণ দেয়া শুরু করলেন। যখন তিনি বললেন যে পুরানো হেশিয়ান নিয়ে তিনি মনপুরানের পাতা শুকোবার ব্যবস্থা করেছেন---সাহেব ভুরু কুঁচকে ঠোঁট ফাঁক করে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা তিনি এই প্রথম জানলেন। যেন

সেই ইঙ্গিতটা বুঝেই সঙ্গে সঙ্গে বাগানবাবু বলে উঠলেন, "তোমাকে জিজ্ঞেস না করে ফ্যাক্টরিবাবুকে এ-মাতব্বরি করতে বলেছে কে?" বাগানসাহেব বাগানবাবুকে একটা চোখ মটকে বললেন, "নো হার্ম ইন ইট।"

বাগানবাবু আবার চিৎকার করেন, "নো হার্ম? এরপর বলবে বাগানবাবু পাতা পচিয়েছে বলে চা খারাপ হয়েছে, ও-যে কত ম্যানু-ফ্যাকচারিং জানে আমার জানা আছে, সব তাতে মাতব্বরি।"

ফ্যাক্টরিবাবুও চিৎকার করে ওঠেন, "খবরদার বাগানবাবু, মুখ সামলে কথা বলবেন।" আবার দুই সাহেব মিলে দুজনকে ঠাণ্ডা করেন। বাগানসাহেব ঘুরে সবার দিকে চোখ ফিরিয়ে একটা চোখ মটকে বলেন, "লেট আস অল্ এগ্রি, বাগানবাবু গোল্ডেন পাতি টিপতা, ঔর ফ্যাক্টরিবাবু গোল্ডেন চা বানাতা—ব্যস"—সবাই একসঙ্গে হেসে হাততালি দিয়ে ওঠে।

ফ্যাক্টরি সাহেব বলেন, "হোয়াটস্ দ্য পয়েন্ট। মনপুরানসে পাতি আনেসে কই বাত নেহি হ্যায়, লেকিন সেপারেট স্পেস মাস্ট বি ক্রিয়েটেড ফর দ্যাট একস্ট্রা পাতি?"

চার পাশ থেকে সম্মতিসূচক ধ্বনি ওঠে। "ঠিক হ্যায়, ফ্যাক্টরি-বাবু, আভি লিখ দোও, তোমকো উহদারিং স্পেসকো জরুরৎ হ্যায় ফর মনপুরান পাতি, আই অ্যাম গিভিং অর্ডার, মনপুরান পাতিকো দফে সেপারেট উহদারিং র‍্যাক উড বি কনস্ট্রাকটেড ফ্রম দিস্ ইভনিং—ব্যস।"

একটা ছোট্ট হাততালিও উঠলো। বাগানসাহেব মজুর আর বাবুদের দিকে ঘুরে দু-হাত তুলে বললেন, "ব্যস, আভি খুশ্ তো? ব্যস লাগাও, পাতি বিছাও র‍্যাক পর।"

ফ্যাক্টরিবাবু ও মজুররাও পেছন ফিরেছিল ফ্যাক্টরির ভেতর যাবার জন্য। তাদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে ফ্যাক্টরি-সাহেব আস্তে একটা মন্তব্য করলেন যেটা সবাই-ই শুনতে পেল, "আগারি জান্‌নেসে

অ্যারেঞ্জমেন্ট কুড বি মেড আরলিয়ার।" এই মন্তব্যে যেন এই ইঙ্গিতটুকু থেকে যায় যে সাহেবরা এ-সব ব্যাপার জানতই না, সবই ফ্যাক্টরিবাবুর কাণ্ড।

সেদিন বিকেল থেকেই ফ্যাক্টরি-সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রীকে দিয়ে উইদারিং হাউস এক্সটেনশনের কাজে হাত দিলেন। মাঝখানে একবার ম্যানেজার এসে ঘুরে গেলেন। বাঁশের মাথায় তার টাঙিয়ে কাজের জায়গায় লাইটের কানেকশন এল। সন্ধ্যে থেকে যে-শব্দগুলো এখানে অভ্যস্ত-পরিচিত, কাঠ চেরা আর খুঁটি পোঁতার আওয়াজে সেটা একটু বদলে যায় মাত্র।

উইদারিং র‍্যাক বাড়াবার জন্য হুকুম দেয়ার আগে ফ্যাক্টরি-সাহেব তাঁর হাতে লেখা মনপুরান পাতির জন্য উইদারিং র‍্যাক বাড়ানো দরকার এই দরখাস্তটা যে তাগাদা দিয়ে চেয়ে নিয়েছেন সেই সুবাদে ফ্যাক্টরিবাবুও অনেক রাত পর্যন্ত কাজের জায়গায় থাকলেন। শেষে ফ্যাক্টরি-সাহেব "বাবু, তোমার চায়ের বারোটা বেজে গেল, এখন ফ্যাক্টরিতে যাও," বলার পর ফ্যাক্টরিবাবু খেয়ে এসে রাত্রির জন্য ফ্যাক্টরিতে ঢোকেন।

বাগানে আর একটা কৌতুকের বিষয় জুটে যায়—বাগানবাবু আর ফ্যাক্টরিবাবুর ঝগড়া—উইদারিং র‍্যাক বেড়ে গেল, আবার ঝগড়া লাগিয়ে দিলে কোয়ার্টারে দোতলা উঠবে।

আসলে ফ্যাক্টরিবাবু আর বাগানবাবুর ভেতর একটা দ্বন্দ্ব সব সময়ই চাপা থাকে। বাগানবাবুর ধারণা গাছে পাতি ফলাবার দায়িত্ব তাঁর, আর সেই পাতি খানিকটা এদিক-ওদিক করে কি না-করে কৃতিত্ব নেয় ফ্যাক্টরিবাবু। ফ্যাক্টরিবাবু না থাকলেও চা ম্যানুফ্যাকচারিং হতো আর একই রকম হতো। ফ্যাক্টরিবাবু ফাঁকতালে বাহবা মারে। তাছাড়া ফ্যাক্টরিবাবুর একটা বড় বাঁচোয়া, বলে দিলেই হলো পাতি খারাপ ছিল, তখন তো দেখা যাচ্ছে না পাতি সত্যি ভালো ছিল না-কি খারাপ। আসলে, উৎপাদনের শেষ স্তরের সঙ্গে

যুক্ত বলে ফ্যাক্টরিবাবু বাগানবাবুর ওপর একহাত ঘোরাতে পারেন বলে বাগানবাবুর ধারণা।--দু-জনার মধ্যে এই দ্বন্দ্বটা বরাবরই আছে।

মনপুরানের পাতি এবার প্রথম থেকে আসা শুরু করাতে ফ্যাক্টরি-বাবু শুধু মাত্র বাগানবাবুর পাতি নিয়েই কাজ করেন না, তাঁর কাছে অন্য বাগানের পাতিও আসছে—এই ঘটনাটা ভেতরে ভেতরে যেমন ফ্যাক্টরিবাবুকে ফুলিয়েছে, তেমনি বাগানবাবুর সঙ্গে ফ্যাক্টরিবাবুর বিদ্যমান পারস্পরিক দাহ-ও বাড়িয়ে দেয়। বাড়াবার ব্যাপারে বাগানবাবুর নিজের মনের নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ছাড়াও ফ্যাক্টরিবাবুর আচার-আচরণও নিশ্চয়ই অনেকাংশে দায়ী। শেষে যখন অবস্থাটা এমন পর্যায়ে ওঠে, প্রায় নাটকের মতো স্তর পরম্পরায় ওঠে, যে, বাগানের প্রচলিত ব্যবস্থাটা বদলে দেয়ার মতো স্বাধীনতায় ফ্যাক্টরি-বাবু পৌঁছে যান তখন বাগানবাবুর পক্ষে ফ্যাক্টরিবাবুকে আক্রমণ করা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। ফ্যাক্টরিবাবু যদি ম্যানেজার, অ্যাসি-স্ট্যান্ট ম্যানেজারের হুকুম মতোই হেশিয়ান ঝোলাতেন, তাহলেও বাগানবাবুর পক্ষে ফ্যাক্টরিবাবুর ওপর রাগে ফেটে পড়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না। ফ্যাক্টরিবাবুর ওপর বাগানবাবুর রাগে ফেটে পড়াটা অনিবার্য তৈরি হয়েই ছিল। তিনি তো জানতেনও না হেশিয়ান র‍্যাকে পাতা শুকোবার হুকুমটা উপর মহলে থেকে এসেছে কি-না। তাঁর পক্ষে এটা অনুমান করাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ছিল যে হুকুম ম্যানেজার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-ই দিয়েছেন। গোল-মালের সময় ফ্যাক্টরি-সাহেবের শেষ প্রায় স্বগতোক্তি ছাড়া কোথাও তো কর্তৃপক্ষীয় কেউ এমন কথা বলেনও নি যে ফ্যাক্টরিবাবু তাঁদের ব্যাপারটা জানান নি। ফলে ব্যাপারটা বাইরের দিক থেকে দেখলে দাঁড়িয়ে যায় যে ফ্যাক্টরিবাবু আর বাগানবাবুর ভেতরকার উত্তেজনা মনপুরানের পাতির ব্যাপার নিয়ে ফেটে বেরনোয় সাহেবরা রাতারাতি আলাদা উইদারিং র‍্যাক বানিয়ে ফেলেন। ফ্যাক্টরিবাবু

যথাসময়ে জানালে সেটা আগেই বানানো যেত—এটাও ঘটনাটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ; কারণ পাতি যখন অনুপাতে বেশি আসছে, জায়গা আনুপাতিক হারে বাড়াতে হবেই—কর্তৃপক্ষের কোনো উদারতার জন্য নয়, বেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাতা শুকিয়ে না নিলে, চাপাচাপি হলে, পাতি নষ্ট হয়ে যাবে, পাতি নষ্ট হলে সর্বনাশ। সুতরাং কর্তৃপক্ষের করণীয় কাজটিই কর্তৃপক্ষ করছেন, ফ্যাক্টরিবাবুর জন্য আগে থাকতেই করে ওঠা হয় নি—এটাও এই ঘটনার নির্যাসের অন্তর্গত হয়ে যায়।

অথচ সমস্ত ব্যাপারটা, একসঙ্গে দেখলে, এত সাজানো-গোছানো মনে হয়! কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা আসবে তার হিসেব কোথাও একটা না থাকলে গেলবারের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি নোটিশ ছাড়া পাকা পদ্ধতিতে এমনই হঠাৎ এমন কায়দায় বদলে যায় কি করে, যেন ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাররা কেউ উপস্থিত না থাকলে ফ্যাক্টরিবাবু নিজের বুদ্ধিতে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বাগানবাবুর সঙ্গে তাঁর স্থায়ী ঝগড়াটা উসকে দিয়ে সাহেবদের ঢোকার ও পাকা সমাধান বের করার পথ খুলে দেবেন। গেলবার মনপুরানের অটাম-টি-র অতি সামান্য অংশ পরীক্ষামূলকভাবে এসেছিল। এবার অটাম-টি সম্পূর্ণ আসছে। তার জন্য যখন উইদারিং র‍্যাকও তৈরি হয়ে যাচ্ছে তখন আগামীবার প্রায় সারা বছরের পাতি এখানে না আনাটা তো বেহিসেবী কাজ হবে। আর, একবার যদি সমস্ত পাতি প্লেনভিউয়ে এসে পড়ে তাহলে বছর খানেক পরে দেখা যাবে, মনপুরানে লোকজন যন্ত্রপাতি সমেত আস্ত একটা ফ্যাক্টরি রাখা তো ঘোরতর বেহিসেবী কাজ, এমন বেহিসেবী যে কোম্পানির লাভ কমবে ; কোম্পানির লাভ কমলে তো ম্যানেজার থেকে শুরু করে মজুর পর্যন্ত সবারই ক্ষতি। তারই সঙ্গে বা বড়জোর আর এক বছর পর দেখা যাবে মনপুরানকে আলাদা বাগান হিসেবে রাখাটাই একটা মস্ত

বেহিসেবী কাজ, তখন মনপুরান প্লেনভিউয়ের একটা ডিভিশন হয়ে যাবে।

চার

পরদিন সাত সকালে এসে ফ্যাক্টরি-সাহেব আবার মিস্ত্রীর সঙ্গে কাজে লেগেছেন। বেলা দশটা নাগাদ মনপুরানের পাতা নিয়ে প্রথম ট্রাকটা এসে হাজির। ফ্যাক্টরিবাবু উইদারিং হাউসের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। ট্রাকটা আসবে এটা যেন সাহেবের জানাই ছিল, মিস্ত্রীর কাছ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফ্যাক্টরিবাবুর সামনে এসে দাঁড়ান। "তোমার তো আর জায়গা নেই, চলো পাতি কেমন আছে, দেখি।" ফ্যাক্টরিবাবু আর সাহেব ভেতরে ঢুকলেন। হেশি-য়ানের র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে সাহেব হেসে উঠে ফ্যাক্টরিবাবুর হাত চেপে ধরে বললেন, "বাবু, তোমার মাথায় এ-বুদ্ধিটা এল কি করে। ফর দিস ইউ শুড গেট এ রিঅআর্ড। দিজ পিপ্‌ল ডু নট আণ্ডার-স্ট্যাণ্ড দ্যাট ইন প্রোডাকশন, ইমার্জেন্সি বা আনফরসিন সিচুয়েশন ট্যাক্‌ল করার নামই এক্সপারটাইজ। রুটিন কাজ তো তোমার আমার চাইতে যে-কোনো লেবার ভালো করতে পারে। অ্যাণ্ড ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস হেশিয়ান র‍্যাক উইদার্স ফার বেটার দ্যান ইয়োর অয়্যার র‍্যাক।" হেশিয়ানের ওপর থেকে সাহেব একমুঠো পাতা তুলে মুঠোতে চেপে রেখে ছেড়ে দিল। পাতাগুলো বলের মতো হয়ে তারপর ধীরে ধীরে খুলতে লাগল। পাতার বলটা ফেলে দিয়ে সাহেব হাতটা নাকের কাছে ধরলেন। টেনেটেনে কয়েকবার গন্ধ শুকলেন। তারপর হাতটা ফ্যাক্টরিবাবুর নাকে কাছে ধরলে ফ্যাক্টরিবাবুও গন্ধ শুকলেন। তারপর দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "বাবু আর কতক্ষণ লাগবে।"

"ঘণ্টা দুই-আড়াই।"

"ততক্ষণে তো যে-পাতি এল তা নষ্ট হয়ে যাবে।"

"তা তো যাবে-ই।"

সাহেব আর বাবু বাইরে এসে পড়লেন। মিস্ত্রীদের কাজের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে সাহেব বললেন, "দিনে কত পাতি আসে, মনপুরান থেকে?"

"কাল তো সত্তর মণ মতো এসেছিল।"

"ও। আই স্যুড গেট ফোর র‍্যাক্‌স্ রেডি বাই দিস্ ইভনিঙ। ওয়েল, বাবু, তোমাকে আজকের দিনটা ম্যানেজ করতে হবে। সাম্ হাউ। বাই ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স অ্যাণ্ড এক্সপারটাইজ।"

"কিন্তু হেশিয়ানের তো আর কোনো রোলও নেই যে টাঙাব।"

সাহেব খানিকক্ষণ ভেবে হেসে বলেন, "আমি কোনো পরামর্শ দিলে তুমি কি শুনবে? এক কাজ করো। তোমার ঐ পাতিগুলো তো প্রায় শুকিয়েই গেছে। এই বাইরের মাঠে একটা ত্রিপল বিছাও, রোদে। পাতিগুলো সেই ত্রিপলের ওপর ছড়িয়ে দাও। জাস্ট ফর ফিফ্‌টিন মিনিট্‌স্। ইউ স্যুড রিমেইন দেয়ার। ইফ ইউ ফিল ইট ইজ অল রাইট, লিফট ইট ইন টেন অর টুয়েলভ মিনিট্‌স। বাট আই থিঙ্ক ইট উড টেক ফিফটিন অর টুয়েন্টি মিনিট্‌স। আই সে, ওভার-উইদার ইট। একটু বেশি শুকোও। দেন টেক ইট টু দি রোলার। অ্যাণ্ড ইন দি রোলার পোর সাম ওয়াটার এগেন, সে, এক রোলার টু-থার্ড অফ এ গ্যালন। দেন ইউ সি। আর আজকের পাতির জন্য তোমার হেশিয়ানে ব্যবস্থা করো।"

ফ্যাক্টরিবাবু দাঁড়িয়েই থাকেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, "কি হলো? এনি ট্রাব্‌ল?"

ফ্যাক্টরিবাবু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, "শুখা পাতির ওপর আবার জল ঢালব? তাহলে শুকোচ্ছ কেন? পাতি তো নষ্ট হয়ে যাবে—"

হা-হা করে হেসে ওঠেন সাহেব—"ধোবি তাহলে শুখা কাপড়ের উপর জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে ইস্ত্রি করে কেন? ইউ মাস্ট ওভার-

উইদার দি লিফ, টু অ্যাড সাম ওয়াটার ইন দি রোল, অ্যাণ্ড ইউ গেট এ ব্ল্যাক টি উইথ গোল্ডেন অর ক্রমি টিপ্।"

ফ্যাক্টরিবাবু তা-ও দাঁড়িয়ে আছে দেখে সাহেব তার পিঠে হাত দিয়ে বলেন, "যাও, গো, ডু ইট, অ্যাণ্ড আই সে, ইউ উড গেট এ ফেয়ার প্রাইস ফর দিস। বাট রিমেমবার দিস মেথড ইজ অ্যান এক্সেপ্শন এ্যাণ্ড নট্ এ রুল। ইউ আর অ্যাডাপটিং দিস এক্সেপশনাল মেথড টু প্রোটেক্ট ইয়োর লিভ্স। ইট উড গিভ ফেয়ার রেজাল্ট বাট দেন ডোণ্ট অ্যাডাপ্ট ইট অ্যাজ এ রুল।"

সাহেব আবার মিস্ত্রীর কাজের জায়গার দিকে হাঁটা শুরু করেন। সারা জন্ম বাগানে কাটিয়ে এক ছোকরা সাহেবের কাছে ফ্যাক্টরি-বাবুকে চা বানাবার নতুন কায়দা শিখতে হয়! উইদারিং হাউসে জায়গা না থাকলে পুরনো হেশিয়ান জোড়া লাগিয়ে ফ্যাক্টরিবাবু জায়গা বানাতে পারেন, কিন্তু পাতি বাঁচিয়ে দাম বাঁচিয়ে চা বানাবার কায়দাটা বদলে দিতে পারেন না। এ-দেশে আসার আগে যে-ছোকরা সাহেব চা-গাছ দেখেনি সে-ও চা-গাছ, পাতি আর চা-বানাবার নাড়ী-নক্ষত্র জানে আর ফ্যাক্টরিবাবু শুধু চেনেন। অ্যাসি-স্ট্যাণ্ট ম্যানেজার হওয়ার জন্য সাহেবকে টোকলাই চা-ট্রেনিঙ সেণ্টারে শিখে-পড়ে আসতে হয়েছে আর ফ্যাক্টরিবাবু হওয়ার জন্য প্রায় জন্ম থেকে ফ্যাক্টরিবাবুকে চা-গাছ চা-বানানো দেখতে হয়েছে।

সাহেব ফ্যাক্টরিবাবুকে যেমন করে বলেছিলেন, ফ্যাক্টরিবাবু মজুরদের আর তেমন করে বলেন না। শুধু বলেন—দুটো ত্রিপল বিছিয়ে হেশিয়ানের পাতিগুলো ছড়িয়ে দিতে। পাতাগুলো ঘন করে ছড়াতে হবে, না-কি পাতলা করে, সেটা জিজ্ঞেস করার জন্য ফ্যাক্টরিবাবু আবার সাহেবের কাছে যান।

পাঁচ

উৎপাদন কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি ব্যক্তি যখন উৎপাদনের সঙ্গে সুতোতে বাঁধা, তখন এক অশ্বিনী আর দর্জি যেন উৎপাদন সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন।

বাগানের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে অশ্বিনীর সম্পর্কটা কিছুটা দর্শকের, কিছুটা শ্রোতার। প্লেনভিউ বাগানে তার কোয়ার্টার বলে, প্লেনভিউ বাগানের ভোঁ অনুযায়ী তার জীবনযাত্রা চলে বলে, প্লেনভিউ বাগানের বাবুরা তার প্রতিবেশী বলে, প্লেনভিউ বাগানে তার সামাজিক জীবন বলে—প্লেনভিউ বাগানের ব্যাপারে অশ্বিনী অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা বোধ করতে পারে, কিন্তু এই বাগানের কোম্পানি তাকে চাকরি দেয় নি, তাকে মাইনে দেয় না বা এদের পাতি, ওজন বা চা উৎপাদনে তার কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই শুধু এটুকু ঘটনাই তাকে এমন বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

দর্জিকে চাকরি দিয়েছে এই কোম্পানি, এই বাগান তার কর্মক্ষেত্র, সে কি কাজ করবে বা না-করবে তা এই বাগানের কর্তৃপক্ষই নির্দিষ্ট করে দেয়, সে কত মাইনে পাবে তা-ও এই বাগানই ঠিক করেছে, তার মাইনে বাড়াবার দরকার হলে সেটাও এই বাগানই স্থির করবে, আবার এই বাগানটি তার সামাজিক জীবনেরও আধার বটে। কিন্তু দর্জির কাজ নামে মজুরদের সুখ-সুবিধের তদ্বির করা আর কাজে কোম্পানির পক্ষে মজুরদের রক্ষা করা, যাতে তারা সন্তুষ্ট থাকে, যাতে তারা কারো প্রভাবে মাথা নাড়া না দেয়। এ-বাগানের হাজার-দেড়-হাজার মজুর আর শ'য়ের কাছাকাছি সাহেব আর বাবু যখন চা গাছের গড়ন বাড়াবার জন্য মাটির তদ্বির করছে, চা-গাছের কাণ্ডের সেবা করছে, পাতার তদারকি করছে, কচিপাতার রস নিঙড়ে, শুকিয়ে, ভেজে, ভিজিয়ে কালো চা-এ পরিণত করার পদ্ধতির মদত জোগাচ্ছে তখন সে কি-না পাহারা দিচ্ছে

মজুরদের মনের। এই ব্যাপারটাই তাকে এমন বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

তাই, নতুন ঋতুর সূত্রপাতে সমস্ত বাগানে উৎসবের যে-ছন্দ সৃষ্টি হয়, শিশিরে ভিজে নতুন পাতা গজাচ্ছে, যে-পাতায় সবচেয়ে ভালো চা, শুধু এ-টুকু একটা ঘটনাকে ঘিরে, তা থেকে অশ্বিনী আর দর্জি বাদ পড়ে যায়। অশ্বিনীর হিসেবের খাতায় কাঁচা পাতার জলীয় অংশ যে বৃষ্টি শেষ হতেই কমে গিয়েছে আর শিশিরপাত শুরু হতেই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বাঁধা পড়েছে—তার ভেতরের সূক্ষ্ম পার্থক্যটা চাপা পড়ে যায় হিসেবের এই স্থূলতায় যে বর্ষাকালে পাতায় যখন শতকরা আশি-একাশি ভাগ জলীয়তা তখন একশ পাউণ্ড পাতি শুকোবার পর দাঁড়ায় পঞ্চান্ন থেকে ষাট পাউণ্ড আর শরতের মাঝখানে শিশির-ভেজা পাতার জলীয়তা যখন শতকরা পঁচাত্তর ভাগ তখন একশ পাউণ্ডের পাতি শুকোবার পর দাঁড়ায় পঁচাত্তর পাউণ্ডের মতো। শুকনো পাতির এই হিসেব অনুযায়ী উৎপাদিত চায়ের আবগারি শুল্ক নির্ধারিত হবে।

সব শুল্ক-টুল্ক শোধবোধের শেষে যে-মুনাফা মালিকের ঘরে আসে অন্তত মজুরদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য যে-দর্জি মাইনে পায় তার কাছে তো বৃষ্টিপাত-শিশিরপাত সমস্ত কিছু বাস্তব হয়ে ওঠে একমাত্র বছর শেষে ব্যালান্স সিটে, তার বাইরে নয়।

ফলে, এই উৎপাদনকেন্দ্রের ভেতরের ব্যাপারটা দর্জি আর অশ্বিনীর বাইরেই থেকে যায়। পরিবেশ-পরিস্থিতির বাইরের পরিবর্তন তাদের জীবনযাত্রাকে নিশ্চয়ই অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু শিশিরপাত কেন উৎসব আনে, ফুলবনে মৌমাছির মতো ম্যানেজার থেকে মজুর কেন নতুন ফোটা পত্রপল্লবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কেন কাজে হঠাৎ ছন্দ আসে, অনুপস্থিতি কমে যায়, শীতের কোটরে সেঁধবার আগে গুল্মে-ঘাসে-পথে সাপের শেষ স্বাধীন বিচরণের মতো মানুষজন কেন নেশাগ্রস্ত ঘোরে ব্লকে ব্লকে,—তা দর্জি

বা অশ্বিনার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না, যেমন বাগানবাবুর পক্ষে ফ্যাক্টরিবাবুকে বরদাস্ত করা সম্ভব হয় না, যেমন ফ্যাক্টরিবাবুর পক্ষে সাহেবকে বরদাস্ত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু উৎপাদনেরই প্রয়োজনে উৎপাদনের খণ্ড বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থার কোনো একটি অংশের সঙ্গে তো কাউকে না কাউকে যুক্ত রাখতেই হয়, সেই যোগাযোগের ক্ষীণ নালী থেকে উৎপাদনের সামগ্রিকতা রক্তে এসে যায়। কিন্তু অশ্বিনী আর দর্জির সঙ্গে উৎপাদনের যে-সেটুকু যোগও থাকে না।

তাই বর্ষা থামার পর, আকাশে তারাদল যখন উজ্জ্বল, দুই পাহাড়ের অন্তর্বর্তী খাদের ওপরে ছায়াপথের আলোকসেতু, যামিনী-ব্যাপী শিশিরপাত, চা গাছের শিকড়ে শিকড়ে নতুন পাতার উদ্গমের উদ্যম, তখন দর্জিকে বার্ষিক বোনাসের গোলমালে জড়িয়ে পড়তে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্লেনভিউ চা-বাগানের ইউনিয়নটা কোম্পানির হাতে আর এই ইউনিয়নের কাজকর্ম দেখাটাই দর্জির চাকরি। সেই কয়েক বছর আগে বাগানের একটা গোলমালের সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে মিটমাট করে দেয়ার দৌলতে একই সঙ্গে মজুরদের আস্থা ও কোম্পানির চাকরিটা যখন দর্জি পায় তখন থেকেই প্লেনভিউ শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট সে, সেক্রেটারি এখানকারই একজন মজুর। সেই গোলমালটা উস্‌কেছিল বাইরের পার্টির লোকজন এসে। গোলমাল মিটে যাওয়ার পর বাইরের পার্টি আর প্লেনভিউ বাগানে ঢুকতে পারে না। ফলে প্লেনভিউ বাগানের ইউনিয়ন কোনো পার্টির বা কোনো কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নয়। সেই গোলমালের সময় থেকে "বাইরের পার্টি বাইরের লোককে বাইরে রাখো" এটা প্লেনভিউ শ্রমিক ইউনিয়নের প্রায় স্থায়ী রণধ্বনি।

ফলে প্লেনভিউ শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্কটা ভালো। যে-সব দাবি প্লেনভিউ বাগানে দুই পক্ষের মুখের কথাতেই মিটে যায়, যেমন, বস্তিতে জ্বালানি কনট্রাক্টরের গাড়িতেই পৌঁছনো, ঠিকে কাজের পরিমাণ আগে ইউনিয়নের সঙ্গে বসে ঠিক করা, সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বছরে দু-দিন বস্তিতে আলো দেয়া ও কোম্পানির তরফ থেকে দুটো খাসি দেয়া, তিন বছর পরপর আর চার বছর পরপর সোয়েটার দেয়া।

এ ছাড়াও বড় কথা, বোনাসের সময় কোম্পানির সঙ্গে ইউ-নিয়নের কিছু দর-কষাকষি চলে বটে কিন্তু মীমাংসাটা আপসেই হয়। আগে থাকতেই জানা হয়ে যায় কী রকম বোনাস দেয়া হবে, কথা-

বার্তা চালাচালির পর তারই একটু উনিশ-বিশ করে মীমাংসা হয়। অন্য বাগানে যখন বোনাস নিয়ে মারদাঙ্গা, পুলিশ, অ্যারেস্ট এইসব পর্যন্ত ঘটে যায়, প্লেনভিউ বাগানে সেখানে কোনো গোলমালই নেই—এ ব্যাপারটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। এর কারণ এটা নয় যে, প্লেনভিউয়ের কোম্পানি খুব ভালো আর অন্য বাগানের কোম্পানি খুব খারাপ। আসল ব্যাপারটা এই—অন্য সব বাগানে যাদের ইউনিয়ন তাদের যেমন ইউনিয়নটাকে রাখার জন্যই মোটা দাবি দিয়ে, সেই দাবি আদায়ের জন্য বড় লড়াই করতে হয়, প্লেনভিউ বাগানের কোম্পানিকেও তেমনি ইউনিয়নকে হাতে রাখার জন্যই একটু বেশি হারে সুযোগ-সুবিধে বোনাস ইত্যাদি দিতে হয়।

সেটুকু বিনিয়োগ কোম্পানি করতে পারে, কারণ এর ফলে দার্জিলিঙে, ডুয়ার্সে বা আসামে এই কোম্পানির যে-বাগানগুলি আছে, সেই সব বাগানে কোম্পানির একটা সুনাম হয়, মজুররাও আলাপ-আলোচনায় মীমাংসার চেষ্টা না করে অন্য পথে পা বাড়ায় না। যদি বাইরের কোনো পার্টির ইউনিয়ন হয় তাহলে একটা ছোট্ট দাবি আদায়ের জন্যও অনেক গোলমাল পোয়াতে হয় অথচ প্লেনভিউয়ের মতো বাগানের নিজের ইউনিয়ন থাকলে খুব তাড়াতাড়ি দাবি-দাওয়া মিটে যায়—এই ধারণাটা প্লেনভিউয়ের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করাতে পেরে কোম্পানির সব দিক থেকেই লাভ। প্লেনভিউ বাগানটি বড় আর কোম্পানিটিও চা-শিল্পে পুঁজি খাটানো প্রায় সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলির ভেতর পড়ে। ডুয়ার্স, আসাম, দার্জিলিঙে ছড়ানো ছোট-বড়-মাঝারি নানা মাপেব বাগানের লাভ-ক্ষতির নানা হিসেবের জের গিয়ে শেষ হয় লণ্ডনের হেড অফিসে। যাদের জাবেদা খাতা এত লম্বা তারা একটা বাগানে একটু উদার হওয়ার ভান অন্তত করতে পারে—বিশেষত প্লেনভিউয়ের আপাত উদারতার মূল্য হিসেবে কোম্পানির ছোট ছোট বাগানগুলিতে শ্রমিকদের কোনো দাবি-দাওয়া-ই না-মানার সুযোগ যেখানে কোম্পানির আছে।

তাছাড়া এই কোম্পানিটি এত বড়, দেশ-বিদেশে এত নানারকম ব্যবসায়ে এই কোম্পানির পুঁজি খাটে, দেশ-বিদেশের নানা পত্র-পত্রিকায় এই কোম্পানির বিভিন্ন ব্যবসাপাতি নিয়ে এত লেখালেখি চলে, এই কোম্পানির নিজস্ব হাউস-ম্যাগাজিনে এত নানারকম ছবি ও খবর ছাপতে হয় যে এখনকার সমাজবিজ্ঞানে শ্রমিক-সম্পর্কের মতো জরুরী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোম্পানির এমন একটা উদাহরণ থাকা দরকার যার সাহায্যে প্রমাণ করা চলে আধুনিককালে পুঁজি-খাটানো আর সাবেকী মানুষ-খাটানো নেই, শ্রমিক-মালিকের যৌথ উদ্যোগ হয়ে উঠেছে। মালয়ে রবারের বাগান, সেই সুবাদে টায়ার-টিউবের আন্তর্জাতিক কারখানা, সিংহলে চা ও কফি বাগান, ভারতবর্ষে চা-বাগান, পশ্চিম এশিয়ায় তেলের ব্যবসা আর দক্ষিণ আমেরিকায় কলা বাগান—এই সব শিল্পের প্রায় শ-খানেক কোম্পানির দুনিয়া-জোড়া ব্যবসা যে কোম্পানির মাত্র গুটিকয়েক মালিকের স্বার্থে নয়, শ্রমিক-কর্মচারীর মিলিত স্বার্থেই চালানো হচ্ছে—এত বড় একটা তত্ত্ব সারা দুনিয়ার সামনে কাগজেপত্রে প্রচার করার জন্য প্লেনভিউয়ের মজুরদের দু-একটা সুবিধে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। দুনিয়াব্যাপী এই ব্যবসাদারির হাউস-ম্যাগাজিনে একবার প্লেনভিউয়ের ছবি ছাপা হয়েছিল—একটা গোলটেবিল ঘিরে সাহেবরা আর মজুররা বসে আলোচনা করছে। দর্জি বসে আছে ম্যানেজারের পাশেই। তেল-তেলে সিল্কের মতো কাগজে ছাপা সেই ছবির ও প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল—"ইয়েস, এ কোম্পানি, নট জাস্ট এ জয়েন্ট স্টক, জয়েন্টলি মেড এণ্ড রান।"

প্লেনভিউয়ের যে-শ্রমিক সম্পর্ক নিয়ে এত নাচাকোঁদা সেটা তো আসলে দর্জির মতো একজনকে পাওয়া গেছে বলেই তৈরি ও রক্ষা করা গেছে। গোলমালের সময় জড়িয়ে গিয়ে দর্জি যখন প্রথম এ-বাগানের চাকরিতে বহাল হয় তখন তার মাথায় ছিল, চাকরি যখন একটা পাওয়াই গেছে তখন মজুরদের ভালোমন্দের তদ্বির করা যেতে

পারে। গ্লেনভিউ বাগানের ম্যানেজারও দর্জির প্রায় কোনো কথাই তখন ফেলত না। মালিকদের কাছ থেকে দাবি আদায়ের ব্যাপারে দর্জির এই দক্ষতার কথা দেখতে দেখতে সব জায়গায় রটে যায়, এতটাই রটে যায় যে অন্যান্য বাগান থেকে তার ডাক আসে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশের সময় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। দেখতে দেখতে এমনিভাবে কয়েকটি বাগানে ইউনিয়নের ওপর দর্জির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়—দর্জি নেতা হতে চেয়েছে বলে নয়, শ্রমিকদের একজন নেতা দরকার ছিল, দর্জিকে তারা নেতা বানিয়েছে বলে। মালিকরা যখন দর্জিকে নেতৃত্বের স্বীকৃতি দেয়, তখন ইউনিয়নের নেতা হিসেবে সে স্বীকৃতি আসে না, বরং দর্জির নেতৃত্বাধীন বলেই ইউনিয়নের স্বীকৃতি আসে।

এ-রকমভাবে বছর দুই যেতে না-যেতেই এইসব বাগানের ইউ-নিয়নের ব্যাপারে দর্জির একটা স্বার্থ তৈরি হয়ে যায়। স্বার্থটা প্রথম-দিকে হয়তো শুধুই নেতৃত্বের ছিল, পরের দিকে টাকা-পয়সার সম্পর্ক তৈরি হয়। ইউনিয়নগুলির কাজকর্ম, মামলামোকদ্দমা, চার্জশিটের জবাব লেখা, তদ্বিরতদারকি, দার্জিলিঙে কনসিলিয়েশনে যাওয়া ইত্যাদি বাবদ দর্জির কিছু আয় হতে থাকে। নেতৃত্ব ও নগদপ্রাপ্তি মিলিয়ে ইউনিয়নগুলির ব্যাপারে দর্জির স্বার্থটা বেশ পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

দুই

এর মধ্যে একটা ভোট এসে উপস্থিত হলে দেখা যায় এতগুলি ইউনিয়নের নেতা অথচ কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকায় সবার কাছেই দর্জির কদর খুব। সেই সময়ই দর্জিকে নিজের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি ভেবে তার ইউনিয়নগুলি নিয়ে কাকে সমর্থন দেবে সেটা স্থির করতে হয়েছিল। অর্থাৎ সেই প্রথম ইউনিয়নের ব্যাপারটা দর্জির পক্ষে শুধুই নেতৃত্ব বা সামান্য নগদপ্রাপ্তির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত না হয়ে তার জীবনের সঙ্গেই জড়িত হয়ে গিয়েছিল। যে-অর্থে

আদর্শের সঙ্গে জীবন জড়িত হয়ে যায়, সেই অর্থে নয়। যে-অর্থে ব্যক্তির জীবনের নেহাত সঙ্কীর্ণ বেঁচে থাকাটাও অজস্র মৃত্যুর মূল্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে যায়—সেই অর্থে। যে মুহূর্তে দর্জি বুঝতে পেরেছিল তার সমর্থনের ওপর একজন প্রার্থীর হারা-জেতা অনেকখানি পরিমাণ নির্ভর করে—সেই মুহূর্তে তার প্রথম ও প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল ইউনিয়নগুলির ওপর তার নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা। কাকে সমর্থন করবে সেটা গৌণ প্রশ্ন হয়ে যায়। দর্জি সোজা হুকুম জারি করে দিয়েছিল তার ইউনিয়নের বাগানগুলিতে কোনো পার্টিকে মিটিঙ করতে দেয়া হবে না। কাকে ভোট দেবে সেটা পরে মিটিঙ করে তারা নিজেরা ঠিক করবে কিন্তু কোনো পার্টির ঝাণ্ডা কোনো বাগানে গাড়তে দেবে না। সাধারণ জ্ঞান দিয়েই দর্জি এটা বুঝতে পেরেছিল যে বৃহত্তর সংগঠনের বিপুলতার শক্তি নিয়ে যদি কোনো পার্টি একবার ঢোকে তবে দর্জি হেরে যাবে। ইউনিয়ন গড়বার লড়াইটা দর্জিকে মালিকের সঙ্গে লড়তে হল না, লড়তে হল বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে।

প্রথম কয়েকদিন, কাকে সমর্থন করবে সেটা স্থির করতে পারার আগে দর্জিকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে বাগানে বাগানে এই শ্লোগানটা পৌঁছে দেয়ার জন্য যে বাইরের ঝাণ্ডা বাইরে রাখো। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতেই দর্জি বুঝে যায় অতিদ্রুত সে যদি একজনকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত না নেয় তাহলে সে বাগানগুলিকে রাখতে পারবে না। বাইরের এত দলের এত নানারকম ধাক্কা সামলাবার ক্ষমতা একা তার নেই। কোনো পার্টি যদি নিশ্চিত বোঝে যে এই বাগানগুলি তাদের ভোট দেবে তাহলে তারা নিজেরা যেমন স্বচ্ছন্দে কোনো বাগানে মিটিঙ না করার শর্ত মেনে নেবে তেমনি নিজেদের দায়িত্বেই আরো স্বীকার করে নেবে যে বাইরের লোক এইসব বাগানে ঢুকতে পাবে না। দর্জি যে মিঃ প্রধানকে সমর্থন করবে বলে স্থির করে ফেলে তার প্রধান কারণ তিনটি। প্রার্থীদের মধ্যে নেপালী যে দু-

জন ছিলেন, তার ভেতর মিঃ প্রধানই নির্ভরযোগ্য। মিঃ প্রধানের পার্টির ইউনিয়ন আছে আশপাশের বাগানে, সুতরাং দর্জির বাগানগুলিকে রক্ষা করার ব্যাপারে সেই সব বাগানের মজুররা দরকার হলে নিজেদের স্বার্থেই এগিয়ে আসবে। মিঃ প্রধান তাঁর পার্টির হয়ে চা-বাগান মজদুরদের ইউনিয়ন করেন, দর্জিও তো ইউনিয়ম করা শুরু করে দিল,—সুতরাং দর্জিরও ভবিষ্যতের জন্য একটা খুঁটি দরকার।

দর্জির ইউনিয়ন বলে যে বাগানগুলির সমর্থন পাওয়ার জন্য এত দরবার মিঃ প্রধান সেই এবং আরো সব সমর্থনের জোরে ভোটে জিতে যাবার পর বাগানগুলি যেন দর্জিরই থাকে, তারই জন্য যেন ব্যগ্র হয়ে পড়েন। যে শক্তিগুলোর হাত থেকে ইউনিয়নগুলিকে বাঁচাবার জন্য দর্জি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, সেই শক্তিগুলিরই একটি দর্জির প্রধান সমর্থক আর অবলম্বন হয়ে ওঠে। দর্জির সমর্থনের জোরে এম্.এল্.এ. হওয়ার পর, মিঃ প্রধানের জোরে দর্জিকে ইউনিয়ন করতে হয়—ঘটনাটা এমনি করে বদলে যাবার পর দর্জির সঙ্গে ইউনিয়নের সম্পর্কটা শুধু নেতৃত্বের বা কিছু নগদপ্রাপ্তির না থেকে হয়ে ওঠে জীবিকা-জীবন জড়ানো দৈনন্দিন বেঁচে থাকার মতো স্বাভাবিক আর সেই বেঁচে থাকার মতোই নেহাত ব্যক্তিগত।

এই ব্যাপারটা হওয়ার পর থেকেই প্লেনভিউয়ের সাহেবরা দর্জির সম্পর্কে আচরণে একটু তফাত ঘটালো। যতদিন পর্যন্ত দর্জি ছিল শুধু তাদেরই বেতনভুক ট্রেড ইউনিয়নকর্মী, ততদিন দর্জির উপস্থিত করা দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সাহেবদের যেন খানিকটা আগ-বাড়ানো সহানুভূতি ছিল। আর যেমনি ট্রেড ইউনিয়নের পরিচয়টা দর্জির কাছে বেতনের মতোই প্রাধান্য পেয়ে যায় অমনি সাহেবরাও যেন তার ট্রেড ইউনিয়ন নেতার পরিচয়টাকেই প্রাধান্য দিয়ে বসে।

কিন্তু আচরণের এই পরিবর্তনটা ছিল এতই সূক্ষ্ম যে তাতে প্লেনভিউ ইউনিয়নের প্রতি মালিকদের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ধরা পড়তো না। বরং প্লেনভিউ ইউনিয়নের ব্যাপারে মালিকদের

মনোভাব এ-রকমই যে ইউনিয়নটাকে তারাই বহাল রেখেছে। দর্জির পক্ষ থেকেও কোনো সময় প্লেনভিউ ইউনিয়নের ব্যাপারে তার নেতৃত্ব অবিসংবাদিত করার কোনো চেষ্টা সচেতনভাবেই ছিল না। তার কারণ প্লেনভিউয়ের দাবি-দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে তার সাফল্যই অন্য বাগানের মজুরদের কাছে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে—এ হিসেবটা দর্জি কখনোই ভোলে না। পরন্তু কোম্পানির মাইনের নিশ্চয়তাটুকুকে সে কোনোপ্রকারেই বাধাগ্রস্ত করতে চায় না। খুব স্পষ্ট না হোক, দর্জি এ-রকম অস্পষ্ট ভাগ নিজের মনে মনে করে নিয়েছিল যে প্লেনভিউয়ের ব্যাপারে সে চাকরি করে, অন্য বাগানে সে ইউনিয়ন করে।

কিন্তু নিজের কাছে দর্জি এ-রকম ভাগ করলেও মালিকদের ভেতর অন্য রকম একটা হিসেবও কাজ করে। দর্জিকে কেন্দ্র করে ইউনিয়নের সঙ্গে মালিকদের যে-সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, সেটাকে সম্ভবত মালিকরা এখন দর্জি-নিরপেক্ষ সম্পর্কে পরিণত করতে চায়। অথবা এমনও হতে পারে মজুরদের ওপর ইউনিয়নের সূত্রে দর্জির যে অতিরিক্ত প্রভাব আছে, সেটাকে যাতে দর্জি তার নিজস্ব চাকরি ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে না পারে সেই ব্যাপারে মালিকদের একটু সতর্কতা ছিল।

বেশ কয়েক বছরের চাকরি হওয়া সত্ত্বেও মালিকরা দর্জিকে একটা ইনক্রিমেণ্ট মাত্র দিয়েছে আর তাকে কোনো নির্দিষ্ট স্কেলও দেয় নি। বাইরের দিক থেকে তার কারণ হিসেবে দেখানো হয় যে দর্জির পদটা আগে থাকতে তৈরি ছিল না, দর্জির কাজটাও বাগানের বিদ্যমান অন্য কোনো পদের সমতুল্য নয়, সুতরাং যে-কটি স্কেল বাগানে চালু আছে, তার কোনোটি দর্জিকে দেয়া যায় না। দর্জির পদটিকে নির্দিষ্ট স্কেলে স্বীকৃত পদ হিসাবে গ্রহণ করার এক্তিয়ার নাকি ম্যানেজারের নেই, সুতরাং সমস্ত ফাইল কোম্পানির কাছে পাঠানো হয়েছে।

কোম্পানির কাছে ফাইল গেছে কি যায় নি সেই সন্দেহ-সংশয় ঘুচে গিয়ে দর্জির মনে এই ধারণাটাই শেকড় গাড়ে যে তার চাকরির অনিশ্চয়তাকে তার ওপর চাপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং দর্জিকে চাকরিতে রাখার একমাত্র হেতু মজুরদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রক্ষা। চাকরির শর্ত দিয়ে ঐ দরকারী হেতুটা কোম্পানি নাকচ করতে চায় না।

এটা বুঝতে দর্জির খুব বেশিদিন লাগে নি, কোম্পানি, এক্ষেত্রে ম্যানেজার, তার সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত মিটমাট করবে না। এটা বুঝে ফেলার পর দর্জি গেলবারের বোনাস আলোচনার সময় নিজের মাইনের ব্যাপারটাও জুড়ে দিয়েছিল। সেটা যে মজুরদের পক্ষ থেকে শুরুতেই দাবি হিসেবে রাখা হয়েছিল তা নয়। কিন্তু যে-আলোচনার একদিনেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা সেটা দুই দিনেও শেষ হল না। আর সেই অবস্থায় দর্জি নতুন একটা দাবি জুড়ে দিল যে কোম্পানি কাউকে স্কেল ছাড়া রাখতে পারবে না, সব অস্থায়ী চাকরি স্থায়ী করতে হবে। কোম্পানি এর উত্তরে বলে মজুরদের সঙ্গে তো এর আগেই একটা চুক্তি হয়েছে যে শতকরা কত জন নতুন লোক নেয়া হবে ও কীভাবে নেয়া হবে। দর্জি পরিষ্কার বলে—শুধু মজুরদের বেলা নয়, বাবুদের বেলাতেও এই নিয়ম খাটবে। বাবুদের পক্ষ থেকে ইউনিয়নের কথা বলার অধিকার কোম্পানি, এ-ক্ষেত্রে ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এস্ট্যাবলিশমেণ্ট)—মানতে না-চাইলে দর্জি বলে এমন অনেকে আছে যারা বাবুদের সমান স্কেল পায় না, তাদের পক্ষ থেকে ইউনিয়ন কথা বলছে।

কোম্পানি প্রস্তুত ছিল না, না-কি ব্যাপারটা নিয়ে তখন এগোতে চায় নি, যে-কারণেই হোক দর্জি এ-রকম আশ্বাস পায় যে আগামী বছর তাকে যদি স্কেল দেয়া না-ও হয়,—কারণ সে-ব্যাপারে হেড্ অফিসের অনুমতি দরকার—মাইনেটা তার বাড়ানো হবেই। দর্জিও হয়তো এই ব্যাপারটিকে বোনাস আলোচনার প্রধান বিষয় করতে

চায় নি পাছে কোম্পানি মজুরদের বুঝিয়ে ফেলে যে বোনাসের ব্যাপারে কোম্পানি তো রাজি হয়েই গেছে, দর্জি-ই নিজের ব্যাপারে মীমাংসা আটকে রেখেছে। তাই সে-ও রাজি হয়ে গিয়েছিল।

এ-বছর সিজ্‌নের গোড়ায় দর্জি চাকরি-বাকরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করেছিল তার মাইনের কি হল। কোনো জবাব পায় নি। সিজ্‌নের মাঝামাঝিও জিজ্ঞাসা করেছিল। জবাব পেয়েছিল, হবে। এখন সিজ্‌নের শেষাশেষি দর্জিকে বলা হয়েছে তার মাইনে পাঁচ টাকা বাড়ানো হবে। দর্জি আপত্তি করায় তাকে আরো জানানো হয়েছে এর বেশি কিছুতেই সম্ভব নয়। দর্জি পাঁচ টাকা ইনক্রিমেণ্ট নিতে অস্বীকার করায় তাকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে চাকরিটা কোম্পানির শর্তে করতে হয়, নিজের মর্জিতে নয়।

এই শেষ কথাটা দর্জিকে নিশ্চিত করেছে কোম্পানি তার সঙ্গে প্রথমেই কোনো আপসে আসতে চায় না। দর্জি যেটা বুঝে উঠতে পারছে না সেটা হল কোম্পানি কি মজুরদের ব্যাপারে দর্জির কোনো বিকল্প খুঁজে পেয়েছে।

তিন

এটা পাকাপাকি বুঝতে পারে নি অথচ সন্দেহটা একবার ঢুকেছে যখন তখন দর্জি কোনো অনিশ্চয়তার ভেতর যেতে চায় না। তাছাড়া এত ক-বছর ট্রেড ইউনিয়ন করে দর্জি এটুকু বুঝেছে কুস্তিতে যেমন প্রথমেই হাঁকের পাল্টা হাঁক দিতে হয়, এখানেও তেমনি। পরে যখন উভয় পক্ষই প্যাঁচে জড়িয়ে গিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য হাঁসফাঁস করবে তখন ঠিক বুদ্ধি বেরবে।

তাই বাগানের লোকজনের কাছে দর্জি বেশ কিছুদিন হল বলে বেড়িয়েছে এবার বোনাসের সময় খুব গোলমাল হবে। এই কথার ওপর তাকে কেউ ধরতে পারবে না যে সে গোলমাল পাকাচ্ছে। কর্মচারী হিসেবে তো তার একটা ঘটনা আন্দাজ করার অধিকার

আছে। আসলে হাতের কাজটা করে দেয়াটা মজুরদের কর্তব্য, আগামী কালের কাজটা বা সপ্তাহের কাজটা মনে রাখাটা বাবুদের কর্তব্য আর আগামী সিজন্ বা তার পরের সিজ্‌নের কথাটাও ভেবে রাখাটা সাহেবদের কর্তব্য। সুতরাং দর্জি তো তার সহকর্মীদের কাছে বলতেই পারে এবার বোনাসের সময় সে গোলমাল আশঙ্কা করছে।

কিন্তু এ-কথার পরও তার কাছে কর্তৃপক্ষের কেউ জিজ্ঞাসা করল না অবস্থাটা কি। কথাটা নিশ্চয়ই বড়বাবু ও সাহেবদের কানে উঠেছে তবু যখন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হল না তখন দর্জি বুঝতে পারে কোম্পানি আরও কিছুদূর যাবে।

সে পাঁচ টাকা প্রত্যাখ্যান করার পরও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বোনাসের ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে আগে কোনো কথাবার্তাই উত্থাপন করল না। দর্জি কিছুদিন অপেক্ষা করল। তারপর একদিন সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে বলেই বসল যে বোনাসের ব্যাপার নিয়ে কবে কথাবার্তা হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার খুব অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেয় যে হিসেব-নিকেশ করে কোম্পানি একটা বোনাস ঘোষণা করে দেবে, এর মধ্যে আবার আলাপ-আলোচনার কী আছে।

এ-রকম জবাব পাওয়ার আশঙ্কা আছে জেনেও দর্জি ইচ্ছে করেই কথাটা তুলেছিল। সে আসলে বুঝে নিতে চায় কোম্পানির মতলবটা কি। দর্জির মাইনে পাঁচ টাকা মাত্র বাড়বে আর তা-ও অনিয়মিতভাবে, দর্জির চাকরি অস্থায়ী থাকবে, শুধু এ-টুকুই কি কোম্পানি চায়। না-কি বাগানের মজুরদের ওপর দর্জির কোনো ব্যক্তিগত নেতৃত্ব তৈরি হতে দিতে কোম্পানি চায় না। না-কি দর্জির কাজ ফুরিয়েছে সুতরাং দর্জিকে বাদ দাও, আর একটা দর্জি তৈরি কর—এটাই কোম্পানির মতলব।

সুতরাং দর্জি বাগান, কোম্পানি ও মজুরদের সমস্ত ব্যাপার থেকে

নিজেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে ঘটনাটাকে একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ দিতে চায় যেন। দর্জি জানত সারা বছরে মধ্যে এই সময়টাতেই সবচেয়ে সতর্কতা দরকার। এই সময়েই ইউনিয়নগুলো ভাঙে। পাশাপাশি বাগানে ইউনিয়ন আছে যে-সব পার্টির তারা তো চেষ্টা করেই চলে আরও একটা ইউনিয়ন যাতে দখল করা যায়। তাদের সবচেয়ে বেশি সুযোগ মেলে এই বোনাসের সময়। খুব ভালো লড়াইয়ের ইউনিয়ন না হয়ে যদি দর্জির মতো একটা লোকের ইউনিয়ন হয় তাহলে বেশি বোনাসের দাবি আদায় করে অন্য কেউ এসে স্বচ্ছন্দে ইউনিয়ন দখল করে নিতে পারে, বিশেষত যদি কোম্পানির কোনো গোপন সায় বা মতলব থাকে। যদি কোম্পানি চায় যে দর্জি সরে যাক তাহলে অন্য একটা ইউনিয়নের বেশি দাবিও মেনে নেবে। অন্য সব বাগানে, যেখানে দর্জির ইউনিয়ন আছে, সেখানে যদি এ-রকম কোনো ঘটনা ঘটত তা হলে দর্জি প্রথম চালটা কোম্পানির কাছ থেকে আসার অপেক্ষা না-করে, নিজে দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করে দিত। প্লেনভিউ-এ সে সেটা করতে চায় নি। প্লেনভিউয়ের ইউনিয়নের সঙ্গে তার চাকরির ব্যাপারটা যদি পৃথক হয়ে যায় তাতে দর্জির তো কোনো ক্ষতি নেই। সুতরাং, দর্জি যদি একটু সরে গিয়ে ঘটনাটাকে তার নিজের নিয়মে এগোতে দেয় তাতে অন্তত এ-রকম একটা প্রত্যক্ষ অভিযোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথই তার খোলা হয়ে যায় যে সে কোনো গোলমাল পাকিয়েছে। তাতে একটা পরোক্ষ অভিযোগ খাড়া হতে পারে আর যত বেশি সাক্ষ্যের অভাব—কল্পনায় অভিযোগ তত বেশি সত্য হয়ে ওঠে। তবু দর্জি হয়তো প্রত্যক্ষ অভিযোগের দায় থেকে পরোক্ষ অভিযোগের কাল্পনিক লক্ষ্য হতে বেশি পছন্দ করে।

বোনাস আলোচনার ব্যাপারে তাই অন্যবারের পদ্ধতির সঙ্গে এবারের পদ্ধতির ফারাক ঘটল। অন্যবার কোম্পানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে মোটামুটি একটা নীতি স্থির হয়। তারপর

ইউনিয়নের একটা সভায় সেই নীতি উপস্থিত করা হয়, আলোচনা হয়, খানিকটা উনিশ-বিশ করে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেটা ম্যানেজারের কাছে পাঠানো হয়, দরকার হলে আর একবার আলোচনার পর পাকাপাকি একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এবারও দর্জি এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার জবাব দিয়েছে আলাপ-আলোচনার কিছু নেই। প্রথম স্তরটি পেরনো যায় নি, সুতরাং বাকি স্তরগুলির কোনো প্রশ্নই আসে না।

কোম্পানি বোনাসের পরিমাণ ঘোষণা করার আগেই, সারা বাগান যখন নতুন পাতি তোলার উৎসবে মেতেছে, ফ্যাক্টরিতে যখন অটাম-টির গন্ধ ম-ম, মনপুরান আর প্লেনভিউয়ের পাতি নিয়ে একটা ছোটখাট লড়াই বাগানবাবু আর ফ্যাক্টরিবাবুর ভেতর হয়ে যাবার পর নতুন উইদারিং র‍্যাক যখন তৈরি হচ্ছে, তখন বাগানের উৎপাদনের ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন কথাটা চালু হয়ে গেল যে গেলবছর কোম্পানির খুব ভালো লাভ হয়েছে, সুতরাং এ-বছর গেলবারের দেড়া বোনাস পাওয়া যাবে।

এমন একটা কথা কোত্থেকে চালু হল তা নির্ণয় করা দুরূহ। বোনাসের ব্যাপারে বাবুদের ও মজুরদের সমান স্বার্থ। সুতরাং এমন বিস্তৃত জনসমষ্টির কোন্ জায়গাটা থেকে কথাটা বেরল তা স্থির করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেখা গেল অটাম-টির উৎপাদনের শারদ আবহাওয়ার সঙ্গে কথাটি খুব খাপ খেয়েছে। যার ফলে মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে কথাটা কখন একসময় মানসিক সত্যে পরিণত হয়ে যেতে পারে যেন। মনে-মনে টাকাটাকে নিজের পকেটে বা হাতের তালুতে দেখতে না পেলে কেউ লটারির টিকিট কেনে না। বাগানের বাবুরা বোনাসের টাকাটাকে যখন মনে মনে দেখতে পাচ্ছিলেন আর যে-কোনোদিন বোনাস ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেই সময়

ইউনিয়নের নামে অফিসে ফ্যাক্টরিতে পোস্টার পড়ল—মুনাফা অনুযায়ী বোনাস দিতে হবে, গেলবারের ডবল বোনাস দিতে হবে।

যদি এই কথাগুলি দিয়েই শুধু পোস্টার পড়ত তাহলেও ভাবা যেত যে হয়তো মজুররা দাবি দাওয়ার জন্যই একটা দাবি রেখেছে। কিন্তু গেলবারের আগেরবারের মোট উৎপাদনের পরিমাণ আর লাভের পরিমাণের সঙ্গে গেলবারের মোট উৎপাদন আর লাভের পরিমাণকে এমন তুলনামূলকভাবে চোখের সামনে ধরা হয়েছে যে প্রথম দেখলে মনে হতে পারে এর কোনো পাল্টা জবাব হয় না। তাতে বাবুরা যেমন খুশি হয় তেমনি একটা প্রমাদ গণে যে অন্যবারের মতো এবার যখন আপসে মীমাংসা হল না, তখন এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে পূজোর আগে বোনাস দেয়া হলই না। পোস্টারটা দেখে বেশি বোনাস পাওয়ার সম্ভাবনায় খুশি হয়ে দর্জিকে দুষবার জন্য একটা যুক্তিও সবার মনে মনে যেন তৈরি হয়ে থাকে—যদি বোনাস পাওয়া নিয়ে কোনো গোলমাল হয়, তার জন্য দর্জিই দায়ী হবে।

যখন যে-কোনোদিন বোনাস ঘোষণা করার কথা তখন আরো দু-দুবার নতুন পোস্টারে আরো বেশি বোনাসের দাবিটাই উঠল শুধু, কোম্পানি তা-ও রা কাড়ল না। দিন সাতেক ধরে এই পোস্টার পড়া সত্ত্বেও বাগান-ফ্যাক্টরিতে কাজের সময় মজুরদের ভেতর কোনো উত্তেজনার আভাস মিলল না। বারোটি মাসের প্রতিটি দিন, রোদ-জল-ধস-ঝড় তুষারপাতে যাদের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, কাজকর্ম এক-সঙ্গে, হোক না তাদের একদলের বস্তি পশ্চিম আর পুব ঢালুর আনাচে-কানাচে, আর-এক দলের কোয়ার্টার দক্ষিণ ঢালুতে, তবু মজুরদের রকম-সকমে কোনো পরিবর্তন বাবুরা গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারে। বেশি বোনাসের দাবিতে পোস্টার দুবার তিনবার পড়ে যাওয়ার পরও মজুরদের ভাবসাব বদলায় নি দেখে কেমন সন্দেহ হয়—হয়তো এত সব দাবি-দাওয়া সব মজুরদের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছয় নি, গুটিকয়েকের

ভেতর এখনও আছে। এতে বাবুদের স্বস্তি দুই কারণে। প্রথম কারণে তেমন কোনো গোলমাল বেধে না-ও উঠতে পারে, যাতে বোনাস দেয়াটাই বন্ধ হয়। দ্বিতীয় কারণ, এখানকার যে-কোনো গোলমালের ভেতর একটা প্রবণতা থাকে বাঙালী-নেপালী দাঙ্গার দিকে যাওয়ার, গোলমাল না-হলে সে আতঙ্কটাও আর থাকে না।

কোম্পানি আসলে ইউনিয়নের, এক্ষেত্রে দর্জির, দৌড়টা পরীক্ষা করতে চায় কি-না আর তারই জন্য বোনাস ঘোষণা আটকে রেখেছে কি-না এ-সব প্রশ্ন যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে, তখন-ই এতদিনের পোস্টারের দাবিটা ইউনিয়নের মিটিঙের প্রস্তাব হিসেবে কোম্পানির কাছে আসে। সে-মিটিঙে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট দর্জি উপস্থিত না-থাকলেও আর সবাই-ই উপস্থিত ছিল। অধিকাংশ মজুরের উপস্থিতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে গতবারের আগের বারের তুলনায় গতবারের উৎপাদন ও লাভের বৃদ্ধির অনুপাতে গেলবারের তুলনায় এবারের বোনাস বাড়াতে হবে।

চার

ইউনিয়নের মিটিঙের প্রস্তাবের কথাটা যেদিন বাগানের বাবুদের মুখেমুখে, সেদিনই সকাল থেকে দর্জিকে ফ্যাক্টরিতে দেখা গেল। প্রথমে এসে বসল ফ্যাক্টরি অফিসে। ফ্যাক্টরিবাবু দর্জিকে দেখেই মাথা নিচু করে খাতাপত্রের এমন কাজ শুরু করে যাতে দর্জি কথা শুরু করার কোনো ফুরসত না পায়। দর্জি কোনো কথা না বলে বসে থাকে। ফ্যাক্টরিবাবু একবারও চোখ না তুলে যেভাবে কাজ করছেন তাতে মনে হয় যেন দু-হাত দূরে দর্জি এসে বসে আছে এই ব্যাপারটিই তিনি জানেন না। কিন্তু মজুররা এসে যখন কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করে তখন মুখ তুলেও কি করে ভান করা যায় দর্জিকে দেখেন নি। সুতরাং জিজ্ঞাসা করতেই হয়—"কি, সিগারেট খাবে নাকি?" দর্জি হাত বাড়ায়। ফ্যাক্টরিবাবু পটেক থেকে সিগারেটের

প্যাকেট, দেশলাই বের করে নিজের মুখে একটা গুঁজে আগে কথা বলার উপায় বন্ধ করে, তারপর দর্জিকে দেন। দর্জি সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টানতে থাকে। ফ্যাক্টরিবাবু আবার খাতাপত্রের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েন।

কিছুক্ষণ পর গুপ্ত এসে দরজায় দাঁড়ায়। দর্জিকে দেখে এগিয়ে এসে বলে, "কী বাবা, কী বুদ্ধি শানাচ্ছ বলো দেখি, একটু বুঝে-সুঝে নি, তোমার বেশি বোনাসের আশায় থেকে এবার বোনাস একেবারে মাথায় উঠবে না তো?" দর্জি কোনো জবাব দেয় না। গুপ্ত ফ্যাক্টরিবাবুর দিকে তাকায়। ফ্যাক্টরিবাবু চোখ তোলেন না পাছে দর্জির সঙ্গে একটা আড্ডায় জড়িয়ে পড়তে হয়। দর্জির নীরবতা আর ফ্যাক্টরিবাবুর ব্যস্ততা গুপ্তকে অবধারিত মনে করায় যে সে এসে পড়ায় এদের কথাবার্তা থেমে গেছে। চলে যাবার একটা ছুতো বের করতে গুপ্ত বলে বসে—"দাঁড়াও, কাজটা সেরে আসি।"

খাতাপত্রের ওপর হিসেব-নিকেশ করার ছুতোটা যখন আর রাখা যায় না তখন ফ্যাক্টরিবাবু খুব ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। দর্জি বসেই থাকে। উইদারিং হাউসের নতুন বানানো র‍্যাকগুলোর বাইরের দেয়ালটায় এখন রং লাগানো চলছে। দর্জি জানলা দিয়ে সেদিকেই তাকিয়ে থাক। ফ্যাক্টরি-সাহেবকে কিছুক্ষণের জন্য উইদারিং হাউসটার চারপাশে দেখা যায়। দর্জি যেভাবে সেদিকে তাকিয়ে পা নাচায় তাতে মনে হয় সে কিছুই দেখছে না অথবা সব কিছু এত ভালোভাবে দেখা যাবে বলেই সে এখানে এসে বসেছে। দরজায় অশ্বিনী আসতেই দর্জির যে-মুখটা এতক্ষণ গভীর অন্যমনস্কতায় ঢাকা ছিল, তা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—"কি খবর ইনস্পেক্টর?"

"খবর তো সব তোমার কাছে, একেবারে বেপাত্তা হয়ে আছ?"

"বসুন বসুন। কার পাত্তা মেলে ভাই। আপনি চার বাগান সামলাচ্ছেন, আমিও চার বাগান সামলাচ্ছি। আর বাবুদের তো

এখন নিশ্বাস ফেলারও সময় নেই।" অশ্বিনী বসে বলে, "ফ্যাক্টরি-বাবু কোথায়, দেখছি না—"। অশ্বিনীর মনে পড়ে যায় সে দর্জিকে আপনি সম্বোধন করে কিন্তু আজ হঠাৎ দেখা হওয়ার ঝোঁকে বাগানের বাবুরা সাধারণত দর্জিকে যে-'তুমি' সম্বোধন করে, অশ্বিনীও তা-ই করে ফেলেছে। দর্জি একটু হাসলো, এমন, যে মলিন মনে হতে পারে। "সকালে এখানে এলাম। ফ্যাক্টরিদা খাতাপত্রে মুখ গুঁজলেন, পাছে কেউ মনে করে যে আমার সঙ্গে কিছু বুদ্ধি করছেন। আমারও কেমন জিদ চেপে গেল। আমিও চুপচাপ বসে থাকলাম, একটাও কথা না বলে। শেষে আর না-পেরে ফ্যাক্টরিদাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।" কথা বলতে বোধ হয় দর্জির বিষণ্ণতাটা ঘুচে গিয়ে থাকবে, সে এবার অনেক বেশি প্রসারিত হাসে।

"আপনার খুব জেদ, না?"

"সে তো আমাদের জাতের দোষ ইনস্পেক্টর, আমাদের তো পাহাড়ে চড়তে হয়, পাহাড় ভেঙে নামতে হয়। তাই আমাদের মাঝামাঝি কোনো রাস্তা জানা নেই। যদি চড়াইয়ে উঠতে শুরু করি তো উঠতেই হয়, নামতে শুরু করি তো নামতেই হয়।

"আপনি তো হাফ্-বাঙালী।"

"সেটাই তো সর্বনাশ, দু-জাতেরই বদগুণগুলো পেয়েছি। বাদ দিন, আপনিও কি এখন খাতাপত্রের হিসেব কষতে বসবেন?"

"দেখি, ফ্যাক্টরিবাবু আসুন। আপনাদের খুব পোস্টার-টোস্টার পড়ছে দেখছি। কি ব্যাপার!"

"ও তো বোনাসের সময় প্রতিবারই হয়। আজ একটা মিছিলও হবে। সেজন্যই তো সকাল থেকে এসে বসে আছি। ও নিয়ে আর আপনার মাথা ঘামিয়ে কি হবে।"

"অন্তত হিংসে তো করতে পারবো"—অশ্বিনী হেসে উঠে দর্জিকেও হাসিয়ে ফেলে। কথাটাকে আর এমন দিকে গড়াতে দেয় না যাতে দর্জি বলে বসে যে অশ্বিনীকেও হিংসে করার কারণ আছে।

ফ্যাক্টরিবাবু অশ্বিনীকে দেখে দরজা থেকেই চেঁচিয়ে ওঠেন, "আরে ইন্‌স্পেক্টর এসে গেছেন! আমি তো আপনার জন্য লোক পাঠাচ্ছিলাম।" ফ্যাক্টরিবাবু এসে চেয়ারে বসেন। "নিন, হিসেবপত্রগুলো একবার দেখে দিন।" ঠিক বোঝা যায় না দর্জিকে এড়াবার জন্যই ফ্যাক্টরিবাবুর কাজ ফাঁদা কি-না।

"কই, আজ তো আপনাদের কোনো হিসেব দেখে দেবার কথা ছিল না, দুপুরে খেয়েদেয়ে সানিভ্যালি যাব, রাতে থাকতে হবে, আমি তো তাই আড্ডা মারতে এলাম।"

"এই তো, কাজ করতে করতে আড্ডা মারুন।"

"ফ্যাক্টরিদা কিন্তু কাজ করতে করতে কথা বলতেও পারেন না"—বলে দর্জি চেয়ার ছেড়ে উঠে বেরিয়ে যায়। ফ্যাক্টরিবাবুর এগিয়ে দেয়া খাতাপত্রের দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী বলে, "আমি তো আপনাদের অনেকবার বলেছি—আপনাদের প্রোগ্রাম আগে থেকে আমাকে দেবেন, নইলে আমার প্রোগ্রাম গোলমাল হয়ে যায়।"

"এত সব দিকে নজর রাখতে হয়।" ফ্যাক্টরিবাবুর কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টাকে মাঝপথে অশ্বিনী আচমকাই থামিয়ে দেয়, "তাহলে আমার প্রোগ্রাম আপনাদের পাঠিয়ে দেব, আপনারা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করবেন।"

"তাহলে তো সব ডেসপ্যাচ আটকে যাবে"—ফ্যাক্টরিবাবুর এই কথার উত্তরে অশ্বিনী খাতাপত্রের ওপর মাথা নুইয়ে ফেলে।

কথায়, দরকার হলে কথা না বলে, বিরক্তি প্রকাশের আত্মবিশ্বাস অর্জনটা কি এই চা-বাগানগুলিতে চাকরির সময়ের দীর্ঘতা দিয়ে বোঝা যাবে, না-কি খুব কম সময়ের ভেতরও দ্রুত পরিবর্তনের যে-প্রক্রিয়া অনেক সময় এসে যায় তা দিয়ে বুঝতে হবে। চাকরিক্ষেত্রে অশ্বিনীর অভিজ্ঞতার একটা প্রক্রিয়াও অবিশ্যি হতে পারে। সুইচ অন করে দিলেই তো আর চাকা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে শুরু করে না। অফ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও থামে না। চাকাকে নিজস্ব একটা

গতিবেগ যোগাড় করতে হয়। আবার, সেই নিজস্ব গতিবেগকে হারাতে হয়। নিজস্ব গতিবেগ যোগাড় ও হারানোর সময়টুকুতেই বাইরের বিদ্যুৎশক্তির অভিঘাতটা বোঝা যায়। চাকা যখন পূর্ণবেগে ঘুরতে থাকে, তখন সেটাকে চাকার নিজস্ব গতিবেগ মনে হয়। অশ্বিনী অভিঘাতের গতিবেগকে তার নিজস্ব গতিবেগ মনে করার পূর্ণতায়ই পৌঁছে যাচ্ছে বোধহয়।

অশ্বিনী খাতাগুলো টেনে নেয়, অনেকগুলো পাতা একসঙ্গে উল্টে একবারে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পৌঁছতে চেষ্টা করে। দু-একটা খাতায় নির্দিষ্ট পাতায় ফ্ল্যাগ দেয়া আছে। কার্ডে অশ্বিনী খুব ছোট ছোট অক্ষরে অঙ্কগুলো লিখতে থাকে। অশ্বিনী আর কোম্পানি আসলে একই হিসেব কষে, কত পাতায় কত চা। এই হিসেবের ওপর কোম্পানির মুনাফা নির্ভর করছে আর এই হিসেবের ওপর সরকারের ট্যাক্স নির্ভর করছে। কোম্পানির পক্ষে কত পাতিতে কত চা এই হিসেবটা প্রায় ততখানি দরকারী যতখানি দরকার কত চায়ের কত দাম এই হিসেবটা—সরকারের পক্ষে তা নয়। সেইজন্য সরকারের একটা খুব মোটা হিসেব থাকলেই চলে যে গড়ে কত পাতিতে কত চা হতে পারে।

এটা অবশ্য কোথাও বলা নেই যে হিসেবটা গড়ের। বাতাস আর মাটির জলীয় অংশের আর রোদের তাপাঙ্ক দশমিকের এমন পরিমাণে নির্দিষ্ট যে মনে হতে পারে সেটা গলে কোনো স্থানীয় বা পারিবেশিক ঘটনার বিশেষত্বও পার পাবে না। ফলে, আসলে সমস্ত স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে শেষ পর্যন্ত ঐ গড়ের হিসেবের ভেতর সেঁধিয়ে দেয়া হয়।

অতটা দক্ষতা অশ্বিনী এখনো আয়ত্ত করতে পারে নি। ফলে তাকে অঙ্কগুলো পড়তে হয়, যোগ-বিয়োগ করতে হয়, মিলিয়ে নিতে হয়। চাকরির সঙ্গে অশ্বিনীর সামঞ্জস্য স্পষ্টতই কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যেন। প্রথম যখন অশ্বিনী চাকরিতে যোগ দেয় তখন সে

জানতই না কোন্ হিসেবটা দিয়ে শুরু করে, কোন্ হিসেবটা দিয়ে শেষ করতে হবে। এখন সেই ধারাটা সে ধরে ফেলেছে। প্রায় কিছু না-ভেবেচিন্তে অশ্বিনী পাতি টেপার হিসেবটা দিয়ে শুরু করে আর শেষতম ডেসপ্যাচের অঙ্কটা বিয়োগ করে শেষতম ম্যানুফ্যাক-চারিংয়ের অঙ্কটা যোগ করে শেষতম স্টকে লাল পেন্সিলের টিক দিয়ে শেষ করে। এই অঙ্কগুলি নিয়েই তো অশ্বিনীর চাকরি। যদি এই চা-বাগানে উৎপাদনের মধ্যবিন্দুতে না-থেকে অশ্বিনীকে অঙ্কের কাজ করতে হত তাহলে হয়তো অশ্বিনী উৎপাদন-নিরপেক্ষতায় অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারত বা উৎপাদননির্ভরতা তার ভেতরে জন্মাবারই কোনো সুযোগ পেত না। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে তার অঙ্ক যে রোজকার পাতি টেপা আর ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সঙ্গে জড়িত। তাই অশ্বিনী যখন অঙ্ক মেলায় তখন, এখনো, সে চা পাতির গন্ধ পায়।

অশ্বিনীর চাকরি যত পুরনো হবে, এই গন্ধটা কি সে তত হারিয়ে ফেলবে?

যেমন এখন, অশ্বিনী আর চা বানাবার পদ্ধতিটা দেখতে পায় না। আগে পারতো—চাকরির প্রথম স্তরে। তখন অশ্বিনী পাতি-টেপার হিসেব দেখতে গিয়ে দেখতে পেত পাতলা সবুজ পাতি, কচি-কলাপাতার মতো সবুজ, কচুপাতার উল্টোদিকের মতো সবুজ, আবার ভারী কালচে মোটা খসখসে পাতি। অশ্বিনী জানত না, জানেও না এই পাতিগুলির কোনটাকেই বলে বাঁজি, কোনটাকে জনম। কিন্তু নাম না জেনেও পাতিগুলো অশ্বিনী দেখতে পেত। কারণ, কোন ঋতুতে পাতি টেপা হচ্ছে, কোন রকমের পাতি সেই ঋতুতে বেশি জন্মায়, সেই বিশেষ রকমের পাতিতে জলীয় অংশ কত থাকতে পারে, তাহলে সেই বিশেষ রকম পাতি বিশেষ ঋতুতে শুকোবার পর কত ওজন হারাবে, সেই ওজন হারানো পাতি থেকে কত চা তৈরি হতে পারে এটাই তার হিসেবের বিষয়।

চাকরির বর্তমান স্তরে অশ্বিনী আর পাতিগুলোকে দেখতে পায় না। পাতিগুলো অন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু গন্ধ এখনো পায়।

নিজের চাকরির এই নানারকমের স্তরের নানা জটিল অভিজ্ঞতা অশ্বিনীর ভেতর এমন তাড়া সৃষ্টি করে ফেলে যাতে খাতাপত্রে ডুবে যাবার আগে সে ফ্যাক্টরিবাবুকে এ-কথা শাসিয়ে দিতে ভোলে না যে তার প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্লেনভিউ বাগানের ডেসপ্যাচের প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে। আশ্বনী এই শাসানিটা যে সচেতনভাবে দেয় নি, সেটাই বুঝিয়ে দেয় চাকরিটা কতখানি তার ভেতরে ঢুকছে।

পাঁচ

দুপুরের ভোঁ বেজে উঠল। ফ্যাক্টরির ভেতর থাকলে ভোঁ-টা এমন দীর্ঘ লাগে। ভোঁ বেজে যেতে থাকলেও অশ্বিনী চোখ তোলে না। কিন্তু কানের ভেতর এমন ঝিঁঝিঁ করতে থাকে যে খাতার পাতার ওপর চোখ ফেলে রেখেও সে ভোঁ-টা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় চুপ করে থাকে। কিন্তু এক হাজার সাতশ' তেইশ কেজিটা তার মাথায় আটকেই থাকে।

ভোঁ-টা ধীরে ধীরে থেমে এলে অশ্বিনী আবার তার যোগ-বিয়োগ শুরু করে। ঠিক এক হাজার সাতশ' তেইশ থেকে।

বাইরে ততক্ষণে বিভিন্ন ব্লক থেকে ঝুড়ি ভর্তি পাতি নিয়ে মজুররা এসে জমা হয়েছে। হঠাৎ সমবেত গর্জন ওঠে—"জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ"। এক সঙ্গে সবাই চমকে ওঠে। অশ্বিনীর মনে পড়ে যায়' দর্জি তাকে অবশ্য বলেছিল আজ একটা মিছিল হতে পারে। খাতাটায় সই করে অশ্বিনী চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। ফ্যাক্টরিবাবু খাতাপত্রগুলো তাকের ওপর তুলে রেখে বেরিয়ে যান।

অশ্বিনী ফ্যাক্টরির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্যাক্টরির মজুররা তখনো সবাই বের হয় নি। ঠিক দরজার বাইরে কিছু শ্রমিক দাঁড়িয়ে আছে। বাকিরা অশ্বিনীর পেছনে ফ্যাক্টরির দরজার ভেতর

ভিড় করে ছিল। কিছু মজুর তখনো ভেতর থেকে আসছে। কিন্তু বাইরে মিছিলের ধ্বনি শুনে যে-দ্রুতগতিতে অশ্বিনীরা এসেছিল, ফ্যাক্টরির মজুররা তেমন গতিতে আসছে না, আসছে আস্তে আস্তে।

"ইন্‌স্পেক্টর, ফ্যাক্টরি ছেড়ে বেরবেন না", কানের কাছে ফ্যাক্টরি-বাবুর গলা শুনে অশ্বিনী তাকায়। ফ্যাক্টরিবাবু বলেন, "গোলমাল হতে পারে।" অশ্বিনীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ফ্যাক্টরিবাবু একটু সরে গিয়ে ফ্যাক্টরির চওড়া দরজাটা খোলা অবস্থায় যে-হুড়কো দিয়ে ঠেকানো থাকে, সেটা সবার চোখের আড়ালে খুলে দিয়ে অপর দিকের দরজাটার হুড়কো-ও খুলতে যান। ওজনের যন্ত্রপাতি ও খাতাপত্র নিয়ে লামা আর গুপ্তবাবু তাড়াতাড়ি আসেন। অশ্বিনীর পাশ কাটিয়ে গুপ্তবাবু ভেতরে ঢুকে যায়। লামা, অশ্বিনীর সামনে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

শ্লোগান শুরু হয়েছিল তখনো যারা আসে নি, তারা এসে পৌঁছেই শ্লোগান শুরু করছিল। খুব চড়া গলায় হাত মুঠো করে বাতাসে ছুঁড়ে, মুখ হাঁ করে সেই শ' শ' শ্রমিক একসঙ্গে চিৎকার করে তাদের দাবি জানাচ্ছিল—'মুনাফার ওপর বোনাস দিতে হবে' 'ইউনিয়নের ঝাণ্ডা খাড়া রাখতে হবে' 'দালালি চলবে না'। শ্লোগানের প্রথম ধ্বনি যে-দিচ্ছিল তাকে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু সারি সারি মজুরদের উৎক্ষিপ্ত মুঠো, উৎকণ্ঠ স্বর আর চোখমুখের তীব্রতা চোখে না পড়ে পারে না। বিশেষত মেয়েদের। কারণে অকারণে যে-মেয়েগুলো হেসে ওঠে, বাগানে পাতি টিপতে যাওয়ার সময়ও সাজতে ভোলে না, শ্লোগানের তালে তালে তাদের চুল এলোমেলো করে ফেলা, বিরাট হাঁ, ছোট ছোট মুঠো পাকানো হাত উৎক্ষেপণের তীব্রতা, পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে শরীরটাকে তীক্ষ্ণ তীব্র করে তোলা—সমস্ত অবস্থাটাকে অপরিচিত করে তুলছিল। এত অপরি-চিত যে বাগানের বাবুরা তাদের ঠিক জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছিল না। বোধহয় বাগানের নয় বলেই অশ্বিনী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যেতে

পেরেছিল। কিন্তু ফ্যাক্টরির মজুররা আলাদা দাঁড়িয়েই থাকে, শ্লোগান দেয় না।

লামা অশ্বিনীকে বললো, "ফ্যাক্টরির মজুরদের সঙ্গে কি কোনো গোলমাল হয়েছে।" অশ্বিনী বললো, "তেমন তো শুনি নি।" "তবে ফ্যাক্টরির সামনে কেন?" লামা এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার-ও বলে "ফ্যাক্টরির মজুররাও তো জয়েন করছে না!" লামা আবার মিছিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

এতক্ষণ দর্জি কোথাও ছিল না। খুব ধীরে সুস্থে সে অশ্বিনীরও পেছনে ফ্যাক্টরির মজুররা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে এসে দাঁড়াল। তারপর মিছিলের দিকে পেছন ফিরে ফ্যাক্টরি-মজুরদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। মিছিল, দরজার এপারে-ওপারে ফ্যাক্টরির মজুরদের ভিড় আর বাবুদের ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একমাত্র দর্জির দাঁড়ানোটাই একটু অদ্ভুত। সে-মিছিলের দিকে পেছন ফিরে ফ্যাক্টরি-মজুরদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। একভাবে দাঁড়িয়ে না-থেকে দর্জি মজুরদের সামনে একটু ঘোরাফেরাও করছিল। বাইরে তখন শ্লোগান পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনি হয়ে উত্তাল "জিন্দাবাদ" "জিন্দাবাদ"। ফ্যাক্টরির ভেতরে আওয়াজ বহুগুণ বেশি হয়ে প্রতিধ্বনিত। পেছনে সম্পূর্ণ ফাঁকা ফ্যাক্টরির ভেতর আওয়াজটা যেন দাপিয়ে বেড়ায়।

দর্জি ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর দরজার বাইরে ফ্যাক্টরির যে-মজুররা দাঁড়িয়ে ছিল, সেই মজুরদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যখনই শ্লোগানের মূলধ্বনি উঠছে, দর্জি তখনই একবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। ফ্যাক্টরির মজুররা শ্লোগান দিচ্ছিল না। দর্জিকে বারবার পেছন ফিরে তাকাতে দেখে পেছন থেকে দু-চারজন সট্‌কে পড়ে। সেটা টের পেয়েই বোধহয় দর্জি এবার ঘুরে দলটার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

দর্জি এসে দাঁড়াবার পর থেকেই শ্লোগানের জোর বেড়েছে। এটা

পরিষ্কার, ফ্যাক্টরি-মজুরদেরও শ্লোগানে দর্জি অংশ নেওয়াতে চায়। দর্জির সেই চেষ্টাটাকে আরো জোর দেয়ার জন্যই যেন মিছিলটা আরো ঘন হয়ে আসে; শ্লোগানগুলো দ্রুত ও উচ্চতর হতে থাকে। শ্লোগান যখন শুরু হয়েছিল তখন এলোমেলো মজুরদের জড়ো হওয়ার মতোই শ্লোগানটা ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছিল। মজুরদের জড়ো হওয়া শেষ হয়ে গেলে শ্লোগানটা একটা নির্দিষ্ট গতি পেয়ে যায়। সেই নির্দিষ্ট গতি পাওয়ার পর দর্জি এসেছে। তারপর থেকে ঐ সমবেত শ্লোগান যেন ধীরে ধীরে একটা সমবেত আঘাতের উদ্যোগ সৃষ্টি করে। দর্জি যখন ফ্যাক্টরি-মজুরদের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই উদ্যোগটা যেন তার শেষতম রেখায় এসে পৌঁছায়, যে-রেখা যে-কোনো মূহূর্তে ভেঙে যেতে পারে। ঠিক বোঝা গেল না সমবেত উদ্যোগের ফেটে পড়ার সেই সম্ভাবনার সামনে, না-কি পেছনে দর্জির উপস্থিতির নিয়ত খোঁচায় কখন একসময় ফ্যাক্টরি-মজুরদের বাইরের সারির প্রথম কয়েকজন শ্লোগানে সাড়া দিয়ে উঠে সমবেত উদ্যোগের ফেটে পড়ার মূহূর্তটাকে একটা খাতে বইয়ে দেয়। ঠিক এমন নাটকীয়ভাবে ঘটনাটি ঘটে নি যে শ্লোগানের সম্মোহনে প্রথমে একজন, তারপর দুজন, তারপর দশজন, তারপর সবাই ভেসে যায়। বা এমন একটা লাগসই ব্যাপারও ঘটে না যে সবাই একসঙ্গে তাদের অনিচ্ছা বা জড়তা বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সঙ্কোচ ত্যাগ করে সমবেত লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আসলে একই ইউনিয়নভুক্ত হয়েও ফ্যাক্টরির দরজার বাইরে-ভেতরে ছড়িয়ে মিছিল ও শ্লোগান থেকে ফ্যাক্টরি-মজুরেরা নিজেদের এমন আলাদা করে ফেলেছিল যাতে বোঝাই যাচ্ছিল তারা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তারপর তারা যে শ্লোগান দিয়ে ফেলে সেটা এমনই একটা ভঙ্গিতে ঘটে যে বোঝাই যায় না এই আলাদা হয়ে যাওয়া লোকগুলোকে সবাই মিলে আটকে রেখে দিতে পারল, না-কি দর্জি খুঁচিয়ে-টুচিয়ে ওদের গলা থেকে সমবেত স্বর বের করল।

কিন্তু, সে যা-ই হোক, সমবেত উদ্যোগটা তো তৈরি হয়েই গিয়ে-

ছিল। ফ্যাক্টরি-মজুরেরা সাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমবেত মজুররা ভাবল তাদের উদ্দেশ্যে তারা পৌঁছে গেছে। ফলে ফ্যাক্টরি-মজুরদের প্রথম সাড়ার পরই শ্লোগানটা যেন উৎসবের ধ্বনি হয়ে উঠল। গলার স্বর আরও এক গ্রাম তো চড়লই, শ্লোগানের উচ্চারণটাও বিস্তৃত হল। শ্লোগানটা নতুন করে জমে যেতে যেতে ফ্যাক্টরির ভেতরের শ্রমিকরাও পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসে। একটা খুব বড় বাধা অতিক্রম করে মজুররা তাদের বৃহত্তর শক্তির সঙ্গে এসে মিশে গেল —এমন নাটকীয় কিছু নয়। শ্লোগানের মূলধ্বনি যখন বাইরে, তখন ভেতর থেকে সাড়া দেয়াটা সম্ভব নয় বলেই ভেতরের মজুররা বেরিয়ে আসে।

ভেতরের মজুরদের বাইরে আসাটা দর্জি লক্ষ্য করে। বাইরে দাঁড়ানো ফ্যাক্টরি-মজুরদের পেছন থেকে দর্জি সামনে বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ শ্লোগান চলার পর দর্জি দু-হাত তোলে। সবাই থেমে যায়। দর্জি দু-হাত দিয়ে সবাইকে বসে পড়তে ইঙ্গিত করে। এতক্ষণ যারা শ্লোগানে মাতোয়ারা ছিল তারা দু-হাতে তালি বাজিয়ে বসে পড়ে। বাবুরা ফ্যাক্টরির ভেতর ঢুকে যায়। ফ্যাক্টরির অফিসের দিকে ফেরার আগে অশ্বিনী ঘুরে দেখে কোমরে হাত দিয়ে দর্জি বক্তৃতা শুরু করছে।

সব বাবুরাই ফ্যাক্টরি অফিসের ভেতরে। ব্যাপারটা কী হচ্ছে সে-বিষয়ে আগ্রহ সবারই। একটা ভয়ের ভাবও আছে। বোধহয় এ-সব আন্দোলন যে-কোনো সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেহারা নিতে পারে—এ রকম একটা আশঙ্কা সবার ভেতর কাজ করছে। যতক্ষণ ফ্যাক্টরির সামনে মিছিল হচ্ছিল, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, কিন্তু যখন মিছিল থেকে মিটিঙ শুরু হয়ে যায় তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা দেখায় যেন মিটিঙে যোগ দেয়া।

দর্জির গলা ভেসে আসছিল। খুব চড়া গলায় দর্জি চেঁচাচ্ছে। অশ্বিনী অন্যমনস্কভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে দর্জির কণ্ঠস্বর

শুনছিল। সে নেপালী ভাষা বোঝে না। আর প্রায় সবাই বোঝেন। তারা কথা না বলে দর্জির বক্তৃতা শুনে যান। মাঝে মাঝে হাততালি পড়ছে। মাঝে মাঝে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এই ঘরে যারা বসে আছে তাদের চোখে-মুখে একটা হাসিহাসি ভাব লেগে রয়েছে। অশ্বিনী বোঝে না সেটা কেন। দর্জি কোনো প্রীতিকর কথা বলছে? না-কি দাঙ্গাটা হল না বলে? না-কি ওখানে যে-দাবিদাওয়া তোলা হল তার সঙ্গে এদেরও স্বার্থের টান আছে?

দর্জির চিৎকার শুনে অথচ কিছু না-বুঝে অশ্বিনীর কিছুতেই দর্জির চেহারাটা মনে পড়ে না। গলার স্বরে মানুষকে চেনা যায়। গলার স্বরটা যখন এতটা অচেনা, মানুষটাও তখন অচেনা হয়ে যায়। অশ্বিনী দর্জির সেই অচেনা কণ্ঠস্বর কানে নিতে নিতে কেমন অর্থ-হীনতা বোধ করে। সে বসে থাকে। কিন্তু বোঝে না কেন বসে থাকে।

দর্জির গলাটা থেমে যায়। একসঙ্গে একবার টানা শ্লোগান ওঠে। হাততালি পড়ে। ঘরের ভেতর ফ্যাক্টরিবাবু বলেন, "যাও লামা, গুপ্ত, এখন বোধহয় ওজন হবে।"

ওজনের যন্ত্রপাতি আর খাতা নিয়ে গুপ্ত আর লামা বেরিয়ে যায়। আর যারা ছিল, তারাও দু-একজন চলে যায়। অশ্বিনী বসে থাকে। বাইরে অতগুলো মানুষের চলে যাওয়ার ধ্বনি কিছুক্ষণ ধরে শোনা যায়। ফ্যাক্টরিবাবু অশ্বিনীর জন্য ঘর ছেড়ে বেরতে পারেন না বোধহয়। এমন অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকাটা অশ্বিনীর ধাত নয়। অন্যমনস্কতার জন্য সে বসেও নেই। আসলে দর্জির অপরিচিত কণ্ঠস্বরে অজানা ভাষায় বক্তৃতা অশ্বিনীকে কেমন যেন বাইরের লোক করে দিয়েছে—এতটাই বাইরের লোক যে অশ্বিনীকে কখন উঠে বেরিয়ে যেতে হবে, সেটাই যেন সে বোঝে না। কিছু একটা কথা বলার জন্যই ফ্যাক্টরিবাবু বলে ওঠেন, "আমাদের এখানে

ও-সব লেগেই আছে। দেখলেন তো। কিন্তু এ-বছর বোধহয় মজুরদের ভেতরই ভাঙন এসেছে। ফ্যাক্টরির মজুররা বোধহয় আলাদা হয়ে যেতে চাইছে। বোধহয় গেছেও। তাই দর্জিও বোনাসের চাইতে ইউনিয়নের কথাই বেশি বললো। ইউনিয়নটা ভাঙতে পারলে দর্জির কোমর ভেঙে যাবে। আপনি বাড়ি যাবেন না?” এতক্ষণের হৈ-চৈ-এর পর ফ্যাক্টরিবাবুর কথাগুলি কেমন গোপন গভীর শোনায়। ফ্যাক্টরি থেকে বেরতে গিয়ে অশ্বিনী দেখে অত বড় ফ্যাক্টরির বিপরীত সীমা থেকে ইন্দ্রজিৎ একা একা আসছে। গোলমালের আশঙ্কায় বোধহয় দ্বিতীয় শিফ্‌টটা সঙ্গে সঙ্গে শুরু করা হয় নি। ফ্যাক্টরিবাবু বলছিলেন আবার সিটি বাজিয়ে দিতে হবে। পাতি ওজনের জায়গার ভিড়ের পাশ দিয়ে একা একা অশ্বিনী যখন বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়েছে তখন নতুন করে সিটি বেজে উঠল।

সেদিন বিকেলেই কোম্পানি ঘোষণা করল গতবারের চাইতে এবার মাথা-পিছু পাঁচ টাকা বেশি বোনাস দেয়া হবে। কিন্তু ফ্যাক্টরি-শ্রমিকদের বেলায় মাস-মাইনের ভিত্তিতে, বাবুদের যেমন সেই হিসেবে, বোনাস দেয়া হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাগানে জীবন-যাপনের পদ্ধতিটাই এ-রকম যে একটা খুব গুরুতর পরিবর্তনের ধাক্কাতেও বাইরের জীবনের ধরন-ধারণের কোনো বদল ঘটে না। মাঝেমাঝে বাইরের জীবনের সমস্ত চলিত গতি, ছন্দ, তাল ভেঙে ভেতরের পরিবর্তনের ধাক্কা ছড়িয়ে পড়ে—ভূমিকম্পে বা অগ্ন্যুৎপাতে যেমন স্থির সব ভিত্তি নড়ে যায়—কিন্তু সেটা ঘটে খুব কম আর যখন ঘটে তখন সবাই চোখ-কান বুজে কাটিয়ে দিতে চায় এই জপে যে ব্যাপারটা খুবই অস্থায়ী। ফলে এবারের বোনাসের ব্যাপারটা নানাদিক থেকে উল্লেখনীয় হলেও, কেউ যেন খেয়ালই করল না। অটাম-টির শেষ পালা চলছে। বিকেলের ভোঁ বাজার মুখোমুখি যেমন সবার একটা ব্যস্ততা থাকে হাতের কাজ শেষ করার আর অপেক্ষা থাকে কখন ভোঁ বাজে তার—এখন সারা সময় ধরেই সেটা চলছে। ফ্যাক্টরির কাজ অবিশ্যি পুরোদমে চলছে। দুই বাগানের পাতি নিয়ে কাজ। সময়ও বেশি হাতে নেই। পাতিও বেশি গাছে নেই। সুতরাং বাগানের সামগ্রিক চেহারাটায় একটা ছন্দ ভেঙে আর একটা ছন্দ শুরু হওয়ার সময়ের একটা অগোছালো ভাব এসেছে। পাতির পরিমাণ সবার অলক্ষ্যে একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। সবার অলক্ষ্যে, কিন্তু সবারই সেটা জানা আছে। কাউকে যদি শুধনো যায় পাতির পরিমাণ কি কমছে, এমন-কি ওজনের লোককেও, কেউ বলবে না কমছে। অথচ একটু একটু করে কমা যদি শুরু না হয় তাহলে কি রাতারাতি কমে যায়? ফ্যাক্টরির চব্বিশ ঘণ্টার কাজ ধীরে ধীরে কমে না এসে, কি একবারে ধপ করে বন্ধ হয়ে যায়? প্রথমে কখন একসময় দু-একজনের ওভার-

টাইমের কাজ কমে আসে। তারপর ধীরে ধীরে একটা সময় জুড়ে ওভার-টাইমটাই কমতে কমতে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে একটা সময় জুড়ে শিফটের কাজ কমে আসতে থাকে, আসতে আসতে রাত্রির কাজ ধীরে ধীরে থেমে যায়। তারপর একটা সময় জুড়ে ধীরে ধীরে অন্যান্য শিফটের কাজও কমে আসতে থাকে। কখন, একটা সময় জুড়ে, ধীরে ধীরে গাছের পাতি একেবারেই কমে আসতে থাকে। তারপর একটা সময় জুড়ে পাতিটেপার ব্লকের সংখ্যা কমে আসতে থাকে। তারপর একটা সময় জুড়ে ফাড়ুয়া আর কোদালি নিয়ে দু-একজন করে মজুর বেরতে থাকে। কখন যে কী ঘটে তাকে কেউ নির্দিষ্ট করতে পারে না। প্রায় ঋতু-পরিবর্তনের মতো অলক্ষ্য আর অবধারিত পরিবর্তন বাগানের জীবনে ঘটে যেতেই থাকে। শিশিরপাত কখন হিমকণিকা হয়ে যেতে শুরু করে, কুয়াশা কখন গুটিগুটি উঠে এসে, নেমে এসে, যেন স্লো মুভি ফিল্মে শিকারী জন্তু, প্রতিটি চা-বুশের শেকড় ঢাকা মাটির, কাণ্ডের, শাখার, পাতার ওপর নীরবে লাফিয়ে পড়ে, ছড়িয়ে, গুটিয়ে যেতে থাকে—ঋতু-পরিবর্তনের এই সব অলক্ষ্য আর অবধারিত ব্যাপারের সঙ্গে চা-পাতির আর ম্যানুফ্যাকচারিঙের যোগাযোগ যে তার পরিবর্তনও, অবধারিত হলেও, অলক্ষ্য থেকে যায়।

কিন্তু এমন অলক্ষ্য পরিবর্তনের গতিপথের সন্ধান অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব সব ব্যাপারের সম্মুখীন করে দিতে পারে। প্রথম কোথায় বোঝা যায় যে হাওয়ার দিক পাল্টানো শুরু হয়েছে। শুধু পাঁচ আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় পাতির স্থূলতা, রস, উপাদানের নিরিখ সেরে ফেলে গাছ থেকে তুলে রুমালে ভরতে বা মাটিতে ফেলতে বা না তুলে গাছেই রেখে দিতে হয় যাকে, যার মূর্তির মতো শরীরের পাঁচ পাঁচ দশটি আঙুলের এই সঞ্চালন দেখাতে মুভি-ক্যামেরাকেও স্লো করে দিতে হয়,—সেই কি একদিন কোনো মুহূর্তে বুঝে ফেলে পাতির ভেতরের রসের বদল ঘটছে। না-কি যেমন গাছ, তেমনি সে,

যেন গাছ-ই, বাতাস শরীরে নিতে নিতে রোমকূপে বুঝে ফেলে সব জল শূন্য করে মৌসুমি বাতাস ফিরে চলে গেছে—এখন বাতাস আসবে উত্তরত্নয়ারী। অথবা গভীর রাতে ফ্যাক্টরির গর্জনের ভেতর ছাঁকনি বা ড্রায়ারে চা ঢালতে ঢালতে সে নিজেকে একটু নিঃসঙ্গ বোধ করে ফেলে। না-কি বিভিন্ন গ্রুপের চা বাক্সে ভরার আগে পাহাড়ের মতো যে-সারি দেয়া থাকে তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটু ফাঁকা লেগে যায় তার। না-কি তার মনটা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গও ভেবে ফেলতে পারে। অবধারিত এই পরিবর্তন মানুষের আঙুল, নাক আর চোখ, স্পর্শগন্ধদৃশ্যের ইন্দ্রিয়গুলির কাছে নিয়ে যায়। যত অলক্ষ্যই হোক, এই তিন ইন্দ্রিয়ের মারফতই কোথাও তার প্রথম আভাস পাওয়া যায়।

আর হবেই বা না কেন। এই দশটা দুই ইঞ্চি, সোয়া-দুই ইঞ্চি আঙুলের ভেতর দিয়েই তো শ্রবণযোগ্য সমস্ত শব্দের জঙ্গল থেকে সুরের কাঠামো বেরিয়ে আসে কয়েকটা মাত্র তারে বা দৃশ্যের জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ছাওয়া ব্যাপকতা থেকে এই দুটো চোখই তো বয়ে নিয়ে আসে নিশ্চিত বাছাই। রহস্য সেখানে নয়।

রহস্য এখানে, যে, বঙ্গোপসাগর আর হিমালয়ের অবস্থানে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে সূর্যের অয়নমণ্ডলের আর বাতাসের গতি পরিবর্তনে সূচিত ঋতুগুলিকে বুঝতে যখন চা-গাছ-পাতি-র সঙ্গে জীবনব্যাপী বা বংশানুক্রমিক পরিচয়ে শীলিত মানবিক চামড়া চোখ-নাকের মতো উচ্চতম ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র প্রয়োজন, তখন, সে সবের ধার না ধেরে ওভার-টাইম নির্ভুল কমে আসে কি করে। কেউ কখনো শুনেছে ওভার-টাইমের দরকার না থাকলে এক মিনিটও ওভার-টাইম হয়েছে। অথচ ওভার-টাইম আর কাজের মাপই হোক, সে তো বাবুরাই করে। অনেক সময় সর্দাররাও করে। যে-ই করুক তার ভুল হবে না। ব্যবস্থাটাই এমন যে গাছ যেমন শুকনো পাতা ঝরিয়ে দেয়, চা-গাছের মতো চিরহরিৎ গাছের যেমন সারা বছর ধরে পাতা ঝরে যায় আর

গজিয়ে ওঠে, তেমনি কাজে না-লাগা বাড়তি মজুর ঝরে যায় আর কাজে লাগা বাড়তি শ্রম জমা হয়ে যায়।

এই রহস্যময় কারণেই বাবুদেরও এখন একটু-আধটু অবসর জুটছে ক্লাবে বা বাড়িতে বসার। মজুরদেরও বস্তিতে দু-একটা মুরগির লড়াইয়ের আয়োজন চলে। বোনাস ঘোষণাটা যেন আসলে ঋতু-পরিবর্তনেরই ঘোষণা—অটাম-টির শেষ ঘণ্টা বেজে গেল।

দুই

এবারের বোনাস ঘোষণার ধাক্কাটা সব স্তরেই খুব জোর লেগেছে। ফ্যাক্টরির সামনে মিছিল, বা তার আগে পোস্টারিং বা মজুরদের ইউনিয়নের প্রস্তাবে—এ-সব মিলে কোম্পানিকে কোনো ধাক্কা দেয়া সম্ভব হয়েছে কি-না তা এক কোম্পানি-ই জানে। কেউ মনে করেন ধাক্কাটা কোম্পানির খুব জোর লেগেছে নইলে মজুরদের মাথাপিছু পাঁচ টাকা বোনাস বাড়ত না। আবার কেউ বলে কোম্পানিই উল্টে বাবু আর মজুরদের চরম ধাক্কা দিয়েছে—নইলে অত কড়া ইউনিয়নে এমন ফাটল ধরত না। কোম্পানির যুক্তি ছিল। ফ্যাক্টরির মজুররা যখন মাস-মাইনে পায় তখন তাদের মাস-মাইনেতেই বোনাস হওয়া উচিত। মজুরদের একটা অংশের প্রতি কোম্পানি যখন এই সুবিচার করেছে তখন আর একটা অংশ কি তাতে আপত্তি করতে পারে, বিশেষত যখন মাথাপিছু বোনাস পাঁচ টাকা বেশি দেয়ার মতো অশ্রুতপূর্ব কাণ্ড ঘটিয়ে কোম্পানি নিজের সহৃদয়তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ রেখেছে। তাতে যদি ফ্যাক্টরি-শ্রমিকরা নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে বাবুদের স্বার্থের যোগ বেশি দেখে—কোম্পানি কি করবে।

ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে পাতিটেপা মজুরদের বা ফাড়ুয়া চালানো মজুরদের ব্যবহারগত পার্থক্য আছে। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে হয়, প্রকৃতির রোদজলের ওপর নির্ভর না করে

মানুষের তৈরি তাপ আর জলীয়তা ব্যবহার করতে হয়, নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় কখন ফায়ার হবে, কোন ছাঁকনিতে কতক্ষণ থাকবে—ইত্যাদির ফলে ফ্যাক্টরি-মজুরদের দক্ষতা খানিকটা বেশি আর সেটা প্রমাণযোগ্যও বটে। দক্ষতা পাতিটেপা মজুরেরও কম নয়, তাকেও তো পাতি পরীক্ষা করেই তুলতে হয়। কিন্তু সে-দক্ষতাটা ব্যবহৃত হয় একটিমাত্র পল্লবের ওপর। যদি তার ভুলও হয়, পরে নানা স্তরে সেটা শোধরানো যেতে পারে। তা-ছাড়াও ওজন হওয়া পর্যন্তই যার পাতি তার। তারপর তো সমস্তটাই এক হয়ে যায়। ফলে পাতিটেপার দক্ষতাটা প্রমাণসাপেক্ষ বা সে প্রমাণের ওপর খুব একটা কিছু আসে যায় না। ব্যক্তির দক্ষতার পরিমাণটাই সেখানে ধরা পড়ে। তদুপরি এক-একটা ফ্লাসে এক-একটা বাগিচায় পাতিটেপা হচ্ছে। গাছেরও যেন খানিকটা সহায়তা আছে। কিন্তু ফ্যাক্টরি-মজুরের দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রই হচ্ছে পাতি। তার দক্ষতার ওপর চায়ের গুণাগুণ নির্ভর করে, দাম নির্ভর করে। তত্ত্বের ব্যাপারটা একেবারেই জানা না থাকায় তাকে অনেকখানি মানসিক শক্তি খরচা করে তাপমাত্রা, জলীয়তাহ্রাস, চায়ের ফার্মেন্টেশন এগুলো আয়ত্ত করতে হয়। কাজের এই পার্থক্য মনের পার্থক্য ঘটায়—যদিও বাস তাদের একই বস্তিতে। মনের এই পার্থক্য আরো বেড়ে যায় মাইনের ব্যাপারে। বাবুদের মতো অফিসে গিয়ে সই করে মাসের পয়লা তারিখে ওরা মাইনে নেয়। আর পাতি-টেপা মজুরদের মাইনে নিতে হয় হাজরির দিন লাইনে দাঁড়িয়ে, হিসেব বুঝে। হাজরির দিন বাগানে বাজার বসে যায়। আর ফ্যাক্টরির মজুররা বাজার করে বন্দরে গিয়ে। কখনো কখনো দার্জিলিঙে গিয়েও।

কাজের ধরন-ধারণের জন্য ও মাইনেপত্তরের জন্য পোশাক-আশাকের পার্থক্য ঘটে। রোদে-জলে-শীতে পুড়তে-ভিজতে-কাঁপতে হয় না বলে ফ্যাক্টরির মজুররা ফুলপ্যান্ট ফুলশার্ট সোয়েটার জুতো পরে বাবু হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু এত সব কিছু সত্ত্বেও তারা মজুর। সেই বস্তিতে তাদের বাস বলে শুধু নয়—এই উৎপাদনের স্তর-বিন্যাসেই তারা মজুর, ফ্যাক্টরির মজুর বলে তাদের কোনো আলাদা পরিচয় নেই। কিন্তু কুশলতার জন্যই হোক আর উৎপাদনের ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত বলেই হোক বা উৎপাদনের মধ্য-বিন্দুতে থাকার সুযোগে এই সব ব্যাপারে তারা সায়েব বা বাবুদের সঙ্গে কিছুটা তাল রেখে কথা বলতে পারে বলেই হোক, তারা মজুরদের ভেতর প্রধান। ফ্যাক্টরির মজুররা বাগানের সমস্ত মজুরের স্বাভাবিক নেতা।

কিন্তু যে-রহস্যময় কারণে শিশিরের ঘনতার অনুপাতে বাবুদের যেন খানিকটা অবসর জুটে যায়, সেই রহস্যময় কারণেই মজুরদের ভেতর ফ্যাক্টরির মজুরদের অবস্থানটাকে মোচড়ানো যায়। উৎপাদনের স্তরবিন্যাস একটুও না বদলে, শুধু ফ্যাক্টরি-মজুরদের বৈশিষ্ট্যের ওপর যদি অতিরিক্ত জোর চালানো যায়, যেমন মুঠো পাকিয়ে ঘুষি মারার শক্তির সম্প্রসারিত প্রয়োগে হাতুড়ির আঘাতে আস্ত গোটা পাথর ভেঙে খান্-খান্, তেমনি মজুরদের ভেতর প্রধান না থেকে তারা আলাদা হয়ে যেতে পারে। তখন তারা বাবুদের ভেতর অপ্রধান জড় হয়ে পড়ে।

বোনাস ঘোষণার পর বোনাসের পরিমাণ নিয়ে কারো কিছু বলার থাকল না। কিন্তু বাগানের স্তর-বিন্যাসের এই পরিবর্তনটাই প্রধান বিষয় হয়ে উঠল। যেন-বা বোনাসের পরিমাণ বা বোনাস নির্ণয়ের পদ্ধতির বদল ঘটিয়ে উৎপাদনের স্তর-বিন্যাস পালটানো যায়! আর তা-ও আবার একটা বাগানে!

তিন

বোনাস ঘোষণার তিন দিন পরই একটা সভা ডাকা হল বাবুদের আর ফ্যাক্টরি-মজুরদের। সভাটা ডাকল গুপ্ত আর ফ্যাক্টরি-মজুরদের

পক্ষ থেকে গুরুং। সভাটা হবে বাবুদের ক্লাব ঘরে। বেলা পাঁচটার সময় ফ্যাক্টরিবাবু ছাড়া বাবুদের সবাই-ই এসে গেল। ফ্যাক্টরি-মজুরদের প্রায় তিন ভাগই এসে হাজির। সভাপতি হবেন বাগান-বাবু। গুপ্ত প্রথম বললো যে এ-বাগানে বাবুদের একটা ইউনিয়ন আছে, মজুরদের একটা ইউনিয়ন আছে। কিন্তু যেহেতু বাবুদের আর ফ্যাক্টরি-মজুরদের অনেকগুলো স্বার্থ এক সেইজন্য এদের দুই দলকে নিয়ে একটা আলাদা ইউনিয়ন হওয়া উচিত।

গুপ্ত কথাটা বলে দেয়ার পর সবাই চুপ করে থাকল। আসলে গুপ্ত কোনো নতুন কথা বলে নি। সবাই যেন জানে কেন এ মিটিঙ ডাকা হয়েছে, এ-মিটিঙে কোন্ প্রস্তাব পাস হবে। এমন-কি এই নতুন ইউনিয়নের সভাপতি হবেন বাগানবাবু আর যুগ্মসম্পাদক হবে গুপ্ত আর গুরুং, এটাও সবার জানা। সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বাগানবাবু বললেন, "তাহলে কি গুপ্তবাবু যে প্রস্তাব দিলেন সে প্রস্তাবটিতে সবার মত আছে—।" এ-জিজ্ঞাসার পরও কেউ কোনো জবাব দেয় না। আবার খানিকটা নীরবতার পর বাগানবাবু বলেন, "তাহলে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো।" কথাটা বাগানবাবু ঘোষণা করেন না। বলেন এমন স্বরে যেন তিনি নিজেই নিশ্চিত নন কথাটা সবাই গ্রহণ করল কি-না। "তাহলে, গুপ্ত, প্রস্তাবটা লিখে নাও।" গুপ্ত প্রস্তাব লিখতে থাকে। বাগানবাবু বলেন, "এখন আপনারা বলুন কী ভাবে ইউনিয়নটা হবে।"

ফ্যাক্টরি-মজুরদের সবার জায়গা ঘরের ভেতর হয় নি। অনেকে বারান্দায়, আর কেউ কেউ মাঠের ভেতর ছিল। বাবুরা সবাই ঘরের ভেতর পশ্চিমদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে, আর কেউ কেউ তাদের সামনে। গুপ্ত বসে বসে প্রস্তাব লিখে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাগানবাবু বলেন, "এবার বলুন, ইউনিয়নটা কী ভাবে তৈরি হবে?"

বারান্দা থেকে ফ্যাক্টরি-মজুরদের একজন মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে—"আমাদের যে-একটা ইউনিয়ন আছে, সেটার কি হবে?"

কলবাবু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "এই ইউনিয়নটা তো হবে শুধু ফ্যাক্টরি-মজুরদের আর বাবুদের। তাছাড়া আর সবাই তোমাদের ইউনিয়নে থাকবে।"

"তার মানে আমরা ইউনিয়ন ছাড়ব, এই তো"—বারান্দা থেকেই আর একজন জিজ্ঞাসা করে।

"গুরুং, বলো"—গুপ্ত বাগানবাবুর কানে কানে কিছু বলার পর বাগানবাবু ভাবেন। গুরুং বসে বসেই বলে, "আমার কিছু বলার নেই, সব গুপ্তবাবু বলে দিয়েছে।"

বারান্দার প্রশ্নকর্তাদের ভেতর একজন বলে, "কবে থেকে তুই গুপ্তবাবুর মুখটা ধার নিয়েছিস-রে, কত সুদে।"

গুরুং বলে—"তোর তা দিয়ে দরকার কি। আমরা ইউনিয়ন করছি, তোর ইচ্ছে হলে থাকবি, নাহলে দর্জির লেজ ধরগে যা।"

গুপ্ত তাড়াতাড়ি হাত তুলে বলে, "এর মধ্যে ও-সব কথা আনার কোনো মানে নেই। যে-ইউনিয়ন আছে, সে ইউনিয়ন আছে, সে ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই, আমরা আমাদের সুবিধের জন্য আর একটা ইউনিয়ন করছি, যার ইচ্ছে সে আসবে, যার ইচ্ছে না—সে আসবে না, এর মধ্যে তো ঝগড়াঝাটির কোনো ব্যাপার নেই।"

পেছনের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দর্জি বললো, "বাগানদা আমি কিছু বলতে চাই।" ঘরের ভেতরের কেউ খেয়াল করে নি, দর্জি কখন এসেছে। এখন হঠাৎ পেছনের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে সে যখন কিছু বলতে চায় সবাই চোখাচোখি করে। বাগানবাবু গুপ্তকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। এদিকে দর্জি পেছনের দরজায় দাঁড়িয়েই বলতে শুরু করে—"এ-মিটিঙের খবর আমি পাই নি। গুরুং ভাই আর গুপ্তদা মিলে এই মিটিঙ ডেকেছে। তো আমি ভেবেছি এটা অন্য কোনো মিটিঙ। কিন্তু এখন যখন শুনছি যে এখানে একটা ইউনিয়ন বানাবার মিটিঙ চলছে তো আমি কিছু বলতে চাই। এক

নম্বর কথা হচ্ছে ইউনিয়ন হতে পারে মজুরদের আর বাবুদের আলাদা আলাদা। মজুরদের কাজ আর বাবুদের কাজ আলাদা আলাদা। আবার সব মজুর আর সব বাবু এক হয়েও একটা ইউনিয়ন চলে। তো গুপ্তদা বললো, বাবুরা সব এক থাকবে আর মজুরদের ভিতর শুধু ফ্যাক্টরির মজুররা এই ইউনিয়নে আসবে। কথা হচ্ছে এটা কেন ?

গুরুং উঠে দাঁড়িয়ে বলে—"আমরা তো ঠিক করেইছি একটা ইউনিয়ন হবে। এখন এ-সব বক্তৃতা শুনে কি হবে।"

"আরে গুরুং ভাই, গুপ্তদা তোমাকে বলতে বললে তুমি কথা বলো না, শুধু ঘাড় কাত করো, আর আমি কথা বললেই তোমার কানে কাঁটা ফোটে ?" গুরুং আবার উঠতেই দর্জি গলা চড়িয়ে বলে, "দুই নম্বর কথা হল— ফ্যাক্টরি-মজুররা এই বাগানের ইউনিয়নের মেম্বার। আর বাবুদের তো একটা ইউনিয়ন আছে। দার্জিলিঙ জিলায় সাহেব কোম্পানির যত চা বাগান আছে সেই সব বাগানের বাবুরা মিলে আছে তাদের এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনে। তো এই নতুন ইউনিয়ন যে বানানো হচ্ছে তাতে আসতে হলে মজুরদের তো পুরনো ইউনিয়ন ছাড়তে হবে, বাবুরাও কি তাদের অ্যাসোসিয়েশন ছেড়ে দেবে ? সেটা বলেন—"

গুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "সে সব কথা এখানে আসে কি করে। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হয়েও আমরা এই বাগানের নতুন ইউনিয়ন তৈরি করব।"

"তাহলে মজুররাও এই বাগানের পুরনো ইউনিয়নের মেম্বার থেকে নতুন ইউনিয়নের মেম্বার হতে পারে ?"

"না পারে না। একটা বাগানে দুটো ইউনিয়নের মেম্বার হবে কি করে।"

"যেভাবে বাবুরা দুটো ইউনিয়নের মেম্বার হবে—"

"আমাদের অ্যাসোসিয়েশন সারা জিলার জন্য। আমরা তার মেম্বার থাকলেও একটা বাগানের এই ইউনিয়নের মেম্বার হব।"

"তাহলে এই নতুন ইউনিয়নটা তৈরিই হচ্ছে বাবুদের জন্য এক নিয়ম আর মজুরদের জন্য এক নিয়ম নিয়ে"—দর্জি একটু শব্দ করে হেসে উঠলে গুপ্ত বলে ওঠে, "তোমাকে এ-মিটিঙে ডাকা হয় নি, তুমি কেন কথা বলছ ?"

দর্জি হেসেই জবাব দেয়, "তাহলে তোমার ইউনিয়ন শুরুই হচ্ছে কাউকে কাউকে বাদ দিয়ে। আমি মেম্বার হতে চাইলেও আমাকে নেবে না। আর আমরা তো ইউনিয়ন করি সবাইকে মেম্বার করার জন্য"—মিটিঙটা হয়ে ওঠে যেন গুপ্ত আর দর্জির ভেতর কথা কাটা-কাটির মিটিঙ। বাগানবাবু বলেন, "শুধু দুজনে কথা বললে তো হবে না। সবার কথাই শুনতে হবে। তোমরা দুজন থামো। অন্যদের কথা বলতে দিতে হবে।" বাগানবাবু যখন এই কথাগুলি বলে চলেন, তখন গুপ্ত এগিয়ে গিয়ে গুরুং-এর কানে কানে কিছু বলে আসে। বাগানবাবুর কথা শেষ হতেই গুরুং উঠে বলে, "গুপ্তবাবুর প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে যে আলাদা একটা ইউনিয়ন হবে, এখন আমরা ঐ সব কথা শুনব না—"

"কেন হবে ?" দর্জি এবার বক্তৃতা শুরু করে "কেন হবে ? কয়েকটা দালাল পুরনো ইউনিয়নকে ভাঙতে চায় বলে ? আমি এই বাগানে চাকরি করি। আমার কাজ ইউনিয়নের দেখাশোনা করা। কোম্পানির সঙ্গে ইউনিয়নের সম্পর্ক গত কয়েক বছর ধরে এত ভালো বলেই আমরা মজুরদের জন্য কোম্পানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এত দাবি-দাওয়া মিটাতে পারি। অন্য বাগানে ঘেরাও হয়, হরতাল হয়। এ-বাগানে হয় না। কেন হয় না ? কোম্পানির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো বলে। আজ কোম্পানি ফ্যাক্টরির মজুরদের মাস-মাইনের হিসেবে বোনাস দেবে বলেছে। কোনো কোম্পানি যা করে নি এই কোম্পানি তাই করেছে। বোনাসের পরিমাণও বেড়েছে। কোম্পানি চায় এইভাবে মজুরদের সাহায্য করতে। যে ইউনিয়নের সঙ্গে কোম্পানির ভাব মহব্বতের

ফলে ফ্যাক্টরি-মজুরদের এই লাভ হয়েছে সেই ইউনিয়নটা ভাঙার জন্য কয়েকটা দালাল লেগেছে। এইসব দালালদের কোম্পানি সহ্য করবে না। তোমরা সবাই জানো মজুরদের সঙ্গে কোম্পানির এই ভালো সম্পর্ক বাবুরা ভালো চোখে দেখে না। তারা ভাবে কোম্পানি মজুরদেরই সব দেয়, বাবুদের দিকে তাকায় না। তাই বাবুরা অনেক দিন ধরে চায় এই ইউনিয়ন ভাঙতে। আজ ফ্যাক্টরি-মজুররা বাবু-দের মতন বোনাস পাবে বলে বাবুরা ফ্যাক্টরি-মজুরদের সঙ্গে মিলে নতুন ইউনিয়ন বানাতে চায়। বোনাস পাবে বলেই কি ফ্যাক্টরির মজুররা বাবু হয়ে গেল? বাবুরা কি মজুরদের দাবি নিয়ে কথা বলবে? কথা বলবে কাজের ঠিকা নিয়ে আর ওভার টাইম নিয়ে? কথা বলবে কার অসুখ হয়েছে তার চিকিৎসার জন্য? কথা বলবে কার বাচ্চা হবে তার অ্যালাউন্স-এর জন্য? কথা বলবে লকড়ির জন্য? হেঁ—এ। বাবুদের নিজেদের পেছনে কাপড় নেই, অন্যকে পাগড়ি পরাবে? আসলে আমাদের ইউনিয়নের সঙ্গে কোম্পানির মহব্বতকে হিংসে করে এই বাবুরা কয়েকজন ফ্যাক্টরি-মজুরকে চায় তাদের সামনে রেখে কোম্পানির সঙ্গে মহব্বত করবে বলে। আমি এই বাগানে চাকরি করি। ইউনিয়নের দেখাশোনা করা আমার কাজ। আমি কোম্পানিকে জানাব যে, যে-ইউনিয়ন নিয়ে কোম্পানির এত গর্ব, যে-ইউনিয়নের ছবি কোম্পানি পয়সা খরচা করে ছাপায়, যে-ইউনিয়নের ফ্যাক্টরির মজুরদের কোম্পানি মাসের হিসেবে বোনাস দেওয়া শুরু করেছে, সেই ইউনিয়নকে ভাঙার জন্য এই বাঙালী বাবুর দল লেগেছে, আর গুরুং-এর মতো একদল দালাল জুটেছে যারা বাঙালীবাবুদের হাত চাটছে। আমি জানি কোম্পানি কিছুতেই এই কাজ ক্ষমা করবে না, শাস্তি দেবে।” দর্জি দরজা ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বারান্দা আর মাঠে যারা ছিল তাদের অনেকেই দর্জির সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু ঘরের ভেতর যারা ছিল তারা কেউ বড় একটা নড়ে না।

দর্জির বক্তৃতা ও আনুষঙ্গিক উত্তেজনা একটু থামলে গুপ্ত লামাকে কিছু বলতে বলে। লামা বলে, "ইউনিয়নের সঙ্গে নেপালী-বাঙালীর কোনো ব্যাপার নেই, এ-সব ফালতু কথাই প্রমাণ করে যে দর্জির মতলব খারাপ।"

এরপর গুপ্ত বলে, "আমাদের প্রস্তাব পাস হয়েছে যে আমরা আলাদা ইউনিয়ন বানাব। এখন তার জন্য একটা কমিটি তৈরি হোক। কমিটিতে কে কে থাকবে আপনারা বলুন।"

গুপ্ত কাগজ কলম নেয়। গুরুং উঠে দাঁড়িয়ে দু-তিনটি নাম বলা শুরু করতেই দু-একজন বাবু ও মজুর উঠে দাঁড়ায়। দেখাদেখি আরো দু-একজন উঠে দাঁড়াতেই মিটিঙটার মেজাজ ভেঙে যায়। দর্জির অত উত্তেজিত বক্তৃতার পর মিটিঙটা কেমন যেন চুপসে গেছে। বাঙালীবাবুদের উল্লেখটা হয়তো দু-একজন বাবু ও মজুরকেও একটু ত্রস্ত করেছে। কিন্তু আসলে গোলমাল বাধিয়েছে দর্জির কথাগুলিই।

ফ্যাক্টরির মজুররা কোনো সময় ভাবতেই পারে নি যে তাদের বাবুদের মতন বোনাস দেয়া হতে পারে। ফলে ঘোষণাটা শুনে থতমত ভাবটা কাটার আগেই এই মিটিঙের খবর পায়। খবর যারা দিয়েছে তাদের খবর দেয়ার ভেতর এ-রকম একটা আভাস ছিল যে এই বোনাস মজুররা পাবে যদি দর্জির ইউনিয়ন ভেঙে বাবুদের সঙ্গে আলাদা ইউনিয়ন বানায় তাহলেই। আর তা যদি না করে তাহলে বোনাস আবার পাল্টানো হবে। এ-রকম আভাস ছিল বলেই এতো বেশি সংখ্যায় মজুররা এসেছিল। কিন্তু দর্জি ঠিক উল্টো কথা শুনিয়ে চলে গেল। পুরনো ইউনিয়ন ভাঙলেই নাকি কোম্পানি চটবে। এ-সব নাকি মজুরদের ঠকানোর জন্য বাবুদের চালাকি। দর্জির মুখ দিয়েই তো মজুররা এতকাল কোম্পানির কথা শুনে এসেছে। বাবু-দের মুখ দিয়ে নয়। দর্জিই তো সব দাবি-দাওয়া নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেছে! বাবুরা নয়। বরং বাবুরা মজুরদের হিংসেই করেছে। এখন দর্জিই যখন বলে বাবুদের এসব শয়তানি, মজুররা

চট করে অবিশ্বাস করতে চায় না। দর্জিকে যারা বিশ্বাস করে তারা তো দর্জির সঙ্গে চলেই যায়। কিন্তু অধিকাংশ মজুর কোনোদিকেই হেলতে চায় না। আসলে বুঝতে চায় কোন দিকে কোম্পানি হেলবে। তাই কমিটি তৈরির কথা শুরু হতেই যে যার মতো ঘর থেকে যেন বিড়ি খেতে বা গল্প করতে বেরিয়ে যায়। পরে যখন জানা গেল কমিটি হয়ে গেছে, মিটিঙও শেষ, তখনো অনেকে বাড়ি ফেরে না— মিটিঙ শেষ করে বাড়ি ফিরছে এটা বুঝতে দিতে চায় না বলে।

যারা মিটিঙে এসেছিল তাদের কেউ-ই বুঝে উঠতে পারে না ব্যাপারটা হল কি। দর্জির বক্তৃতার পরে যদি বেশ কিছুক্ষণ মিটিঙ চলত, যদি ইউনিয়ন তৈরির ব্যাপার নিয়ে আরো কিছু আলাপ-আলোচনা হত তাহলে উপস্থিত সবার মন থেকে দর্জির বক্তৃতার প্রভাব কেটে গিয়ে মিটিঙের আলোচনার প্রভাবটা থাকতে পারতো বা তাদের এমন মনে হতে পারতো যে মিটিঙটা চলছে। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল যেন দর্জিই মিটিঙটা ভেঙে দিল। মিটিঙের শুরুতে যেমন সহজভাবে সব বলা হচ্ছিল, করা হচ্ছিল তাতেই বোঝা যাচ্ছিল যে ভেতরে ভেতরে সব কিছু তৈরি হয়ে আছে, একটু একটু বেরচ্ছে। দর্জির বক্তৃতার পর কেমন যেন সব আবার ভেতরেই সেঁধিয়ে গেল। শুধু জানা গেল একটা কমিটি তৈরি হয়েছে।

চার

আগে সন্ধ্যাবেলায় যদি অশ্বিনী প্লেনভিউ বাগানে থাকত, তাহলে ক্লাবে এসে কিছুক্ষণ তিনতাস খেলত। এখন যে বাগানেই থাক, সন্ধ্যাবেলায় তার কয়েকহাত না-খেললে চলে না। সব বাগানেই বাবুদের ক্লাব আছে। সব বাগানের ক্লাবেই তিনতাস খেলা হয়। তাস খেলার একটা নিজস্ব নেশার সঙ্গে অশ্বিনীর একটা স্বতন্ত্র নেশাও এর পেছনে আছে। অন্যের হাতে কী তাস আছে সেটা নিছক ইচ্ছে শক্তির জোরে বুঝে ফেলার চেষ্টা করাটা অশ্বিনীর ধাতে ঢুকে

গেছে—এখন আর নিছক মজার ব্যাপার নেই। অন্যের হাতের তাসটা শুধু ইচ্ছে শক্তির জোরে বুঝে ফেলার চেষ্টা আসলে তো অন্যের ভাগ্যের লিখন জেনে ফেলার মতো একটা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। অশ্বিনী এখন তাস মারফত অন্যের ভাগ্য পড়ার খেলায় মাতে। বোধহয় জুয়ো খেলার উদ্দেশ্য কোনো সময়ই নিজের ভাগ্য ফেরানো নয়, অন্যের ভাগ্য জানা। নিজের ভাগ্য নয়, অন্যের ভাগ্য টাই জুয়োখেলার সবচেয়ে বড় বাজি।

বাগানের বাবুদের সমস্যাটা বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য উৎপাদনের সমস্ত বিষয় থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ অপসারিত করা। যে-উৎপাদন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাদের সম্পূর্ণ দখল করে থাকে তা থেকে মুক্তি, সম্পূর্ণ মুক্তি, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য না পেলে পরদিনের উৎপাদনে ঝাঁপ দেবার জন্য তারা তৈরি হতে পারে না। শুধু বাবুরা কেন, সাহেব ও মজুরদের বেলাতেও তাই। সাহেবরা যায় তিনমাইল দূরে তাদের ক্লাবে। মজুরদের বস্তিতে রকসি চলে, জুয়ো চলে, মুরগির লড়াই চলে। ফলে বাগানের সবার কাছে জুয়োর সবচেয়ে বড় বাজি নিজের ভাগ্যকে ভোলা।

ফলে জুয়ো খেলাটা নিয়মিত হলেও সে বিষয়ে অশ্বিনীর ও বাবুদের আগ্রহটা আলাদা। বাবুরা চায় যে-তাস তাদের হাতে এসে পড়েছে, সেই তাস নিয়ে লড়ে যেতে। অশ্বিনী চায় যে-তাস তার বিপক্ষের হাতে পড়েছে, সেটা টেনেটেনে বের করে হেরে যেতে। হারাজেতার একটা সোজা খেলায় স্বাভাবিক ভূমিকায় বাবুরা উৎ-পাদনে তাদের স্বাভাবিক ভূমিকা ভুলে যেতে চায়। হারাজেতার একটা বাঁকা খেলায় নেমে অশ্বিনী একটা গোপন অস্ত্র আয়ত্ত করতে চায়।

এই রকম একটা অন্য উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে অশ্বিনীর ধাতে এসে গেছে। বোধহয় উৎপাদনের মাত্র একটা সঙ্কীর্ণ অংশের ভার তাকে অষ্টপ্রহর বইতে হয় না বলে অথবা তার চাকরির পরোক্ষতা শখেও

বর্তেছে। অথবা, হয়তো তেমন কিছুই নয়, এক একজন এক একভাবে এক একটা ব্যাপারে অংশ নেয়—মানুষের সেই সনাতন বৈচিত্র্যই এর কারণ। সে যা-ই হোক, তথ্যের ব্যাপারটা অশ্বিনীর তেমন আসে না। যখন যে-তথ্য তার সামনে, তখন সেটি এত প্রধান হয়ে ওঠে যে অন্য আনুষঙ্গিক তথ্য যে পূর্বতন তথ্যের সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দিতে পারে—এ খেয়াল তার থাকে না। তথ্যের বিমূর্ত সমগ্রতা তার আয়ত্তে এখনো আসে নি, অশ্বিনী বুঝতে পারে। বুঝতে পারে বলেই আয়ত্ত করতে চায়। আয়ত্ত করতে চায় বলেই জুয়োটা অশ্বিনীর নেশা হয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লাব বন্ধ থাকতে পারে জেনেও অশ্বিনী ক্লাবে এসে দেখে লামা আর কলবাবু তাস সাফ্‌ল্ করছেন। অশ্বিনী এসে বসতেই তাস বিলি হয়ে যায়। অশ্বিনী ভেবেছিল আজকের মিটিঙ-টিটিঙ নিয়ে কিছু কথা হতে থাকবে—সে শুনবে। এখানে শোনাটাই তার প্রধান কাজ—যেহেতু বোনাস, ইউনিয়ন, কোম্পানি, বাবু, মজুর এ-সব কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শোনার একটা অভ্যেস আর তা থেকে নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌছে যাবার একটা প্রবণতা অশ্বিনীর ভেতরে দানা বাঁধছে।

লামা আর কলবাবু দুজন তাস তুলে নেয়। অশ্বিনী ব্লাইণ্ড খেলে। অশ্বিনী লামাকে নিজের লক্ষ্য করে। হয় লামাকে অশ্বিনীর ইচ্ছাশক্তির কাছে হারতে হবে, নইলে অশ্বিনী লামাকে হাতের তাস ফেলে দিতে বাধ্য করবে। অশ্বিনী তিনটি ডাক পর্যন্ত ব্লাইণ্ড খেলে যায়। তারপর তাস তোলে। দেখে বাজে তাস। তাস ফেলে দেয়। লামার হাতের তাস ভালো ছিল। সে জিতে যায়। পরের দানে অশ্বিনী প্রথমেই তাস তোলে। ডাক চলতে থাকে। মাঝারি তাস। অশ্বিনীর অনুমান হয় লামার হাতেও তার মতোই তাস পড়েছে। দানটা কলবাবুর হাতেই যাবে। কিন্তু লামাকে আগে তাস ফেলে দিতে হবে। অশ্বিনী চার বার ডাকে।

পঞ্চম বার লামা তাস ফেলে দেয়। ষষ্ঠ বার অশ্বিনী। পরের বার অশ্বিনীর হাত আবার খারাপ। অশ্বিনী নিশ্চিত হয় লামার হাত ভালো। কিন্তু লামাকে সে এবারও জিততে দেবে না। শুধু একটা গোলামের জোরে অশ্বিনী পয়সা ফেলে যায়। ছ-বারের পরও যখন কেউ তাস ফেলে না, অশ্বিনী মনে মনে ঠিক করে ফেলে সে আর এক পাক দেখে ফেলে দেবে। কিন্তু তার আগেই লামার হাতের একটা ভঙ্গি দেখে অশ্বিনী আর একপাক দেখতে চায়। লামা তাস ফেলে দেয়। লামার তাস ফেলাতেই অশ্বিনী খুশি হয়ে যায়—সে তাহলে লামার ভঙ্গিটা ঠিক বুঝতে পেরেছে। সে-ও তাস ফেলে দেয়। তার তাস দেখেই লামা চটে যায় "ইনস্পেক্টর, স্পোর্ট ইজ স্পোর্ট এইসব ধোঁকাবাজি করে ডাক দিলে খেলা আর খেলা থাকে না। আপনি প্রথম থেকেই দেখছি আমাকে টারগেট করেছেন। তাহলে আর খেলব কি।" কোনো কথা না বলে অশ্বিনী তাস বাটতে শুরু করে। অশ্বিনী এবার প্রথমেই তাস তুলে নেয়। খুব ভালো হাত পড়েছে। সাধারণভাবে এর চাইতে ভালো হাত আর কারো পড়ে না। অশ্বিনীকে সব আন্দাজ ছেড়ে এখন ডেকে যেতে হবে। তিন রাউণ্ড ডাকার পর প্রথমে কলবাবু হাত ফেলে দেন। লামা যেন জেদের বসেই আরো দু-রাউণ্ড ডেকে যায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে কলবাবু বলেন—"ইনস্পেক্টর বেশ সুখে আছেন, এ-বাগান ও-বাগান কাজ, তারপর নিজের খুশিতে বিশ্রাম। আমাদের হচ্ছে চাকরের জীবন, এই তাস খেলছি আর সবসময় ভাবছি এই বুঝি ডাক আসে।" ততক্ষণে তাস বাটা হয়ে গেছে। তুলতে তুলতে লামা বলে, "আরে চাকরি মানে চাকরি, সব চাকরি-ই চাকরি।" অশ্বিনী কোনো জবাব দেয় না। সে তাসের হিসেব কষতে থাকে। অশ্বিনীর একটা হিসেব আছে যে সাধারণত পাঁচ দান পরপর তাস ঘুরতে থাকে। যদি দু-সেট তাসে খেলা চলে তাহলে দশ দান পরপর। যদি খেলার পাশে কোনো ফালতু লোক বসে থাকে আর তাস নিয়ে

শুধুই সাফ্‌ল করতে থাকে তাহলে অবশ্য এ হিসেব মেলে না। অশ্বিনী এর মধ্যেই মনে মনে হিসেব কষে ফেলেছে যে এখন দু-দান কলবাবুর ভালো যাবে, তার পরের দু-দান লামার, তারপরের দান তার। পরীক্ষা করার জন্য সে ব্লাইণ্ড ডাকতে থাকে। প্রথম দানটা কলবাবু পাওয়ায় দ্বিতীয় বারও সে পরীক্ষার জন্য ব্লাইণ্ড ডাকতে থাকে। কিন্তু সে দানটা পেয়ে যায়া লামা। অশ্বিনীর মনোযোগটা এখন লামাকে ছেড়ে তাসের দানের হিসেবে যাওয়ায় লামা খানিকটা স্বাধীনভাবে খেলতে পারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে লামা বলে "কলদা, আজকের মিটিঙে কিন্তু ফ্যাক্টরিদা আসেন নি।"

তাসের দিকে তাকিয়ে কলবাবু বলেন, "এসেছিলেন, তখন মিটিঙ ভেঙে গেছে। তবে এলে আগেই ভাঙতো।"

লামা—"কেন।"

কলবাবু—"সভাপতি কাকে করতে বাগানবাবুকে না ফ্যাক্টরিবাবুকে ? যাকে করতে না তিনিই মিটিঙ ভেঙে দিতেন।"

অশ্বিনী—"আজকের মিটিঙে হলো কি ?"

এর উত্তরে লামা পয়সা ফেলে বললেন, "ঘোড়ার ডিম।" কলবাবু পয়সা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন "এখানে বাপের বেটা এক দর্জি আর সব মেয়েমানুষ, এমন বক্তৃতা দিল যে কোম্পানি ওর টিকিটিও ছুঁতে পারবে না কিন্তু ও সবার মাথা হাতে কাটবে। বেটাকে এই আর্গুমেণ্ট শেখাল কে ?"

অশ্বিনীর হিসেব অনুযায়ী এবারও লামারই পাওয়ার কথা, কারণ গেলবারে কলবাবুর হাত যখন লামার হাতে গেছে তখন লামার দিকেই টানবে বেশি। অশ্বিনীর হিসেবে শুরুর এই গলতিটুকু থেকেই যায় যে গেলবারের হাতটা যে কলবাবুর সেটা তার অনুমানমাত্র ছিল। হিসেবের নেশা কি অশ্বিনীকে এতটাই পেয়ে বসছে যে সে অনুমানের হিসেবকেও অঙ্কের মর্যাদা দিয়ে ফেলে।

লামাই হাতটা পায়। অশ্বিনী তাস বাটার আগেই বুঝে নিতে

চায় এতে লামার পক্ষে তাসের টান প্রমাণ হচ্ছে, না-কি, পাঁচ দান পর পর তাস ঘোরার নিয়মটা একটু তালফেরতা হয়ে খাটছে। ব্যাপারটা বুঝে নেয়ার অবকাশ পেতে সে জিজ্ঞাসা করে, "কি হল আজকের মিটিঙে ?" কথাটা বলার পর তার খেয়াল হয় অবিকল এই ভাষাতেই সে আগের বারও জিজ্ঞাসা করেছে। তাই সংশোধন করে বললো, "কি, বললো কী দর্জি ?"

"বললো কোম্পানি তাকে পাঠিয়েছে এই সব দালালি ভাঙতে, এইসব দালালি করলে বোনাস মিলবে না, এদিকে গুপ্ত বা গুরুং বলতে পারল না যে কোম্পানি তাদের বলেছে দর্জির ইউনিয়ন ভাঙতে"—কলবাবু।

কলবাবু আর লামা তাসে হাত দেয়া পর্যন্ত অশ্বিনী অনুমান করতে পারে না হাতটা কার দিকে যাবে। তাই সে আর একটু সময় নেবার জন্য বললো, "তো কোম্পানি কি বলে ?"

কলবাবু—"বলে না, বাজায়।

অশ্বিনী—"কি ?"

কলবাবু—"ডুগডুগি।"

প্রত্যেকেই পয়সা এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজকের মিটিঙে তো এ-বাগানের ভবিষ্যৎ ব্যাপার-স্যাপার নির্ধারিত হয়েছে। এখন গ্রহ কার দিকে, লামার কি তাতে কিছু করার আছে—এ-সব না জেনে লামার হাতের-তাস যেন বোঝা যায় না।

অশ্বিনী তাই তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তা, লামাদা কি বললেন ?"

কলবাবু—"বললেন বাঙালী-নেপালী মারামারি করো না, দর্জি বললো এই বেটা লামা বাঙালীকে আগে বানাও।"

অশ্বিনী হঠাৎ ঠিক বুঝে যায় লামা আর জিততে পারবে না। সে পয়সা এগিয়ে দিতে থাকে। কলবাবু তাস ফেলে দেন। অশ্বিনী ছাড়বে না। পয়সা দিয়ে যায়। দু-বারের পর লামা হাত ফেলে

দেয়। বাজে তাস। পরের বার-ও অশ্বিনী তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু একবারের পর লামা তাস ফেলে দিতেই অশ্বিনী বুঝে যায় হাতটা কলবাবু পাবেন। যেন অশ্বিনীর হাত কি হবে তা তার সম্পূর্ণ জানা হয়ে গেছে এই নিশ্চয়তায় অশ্বিনী এবার কলবাবুর হিসেব কষতে বসে। পরের হাতটা লামা পাওয়া সত্ত্বেও অশ্বিনী তার দিকে আর কোনো মনোযোগ দেয় না। যেন আর সব হাত লামা পেলেও অশ্বিনীর মানসাঙ্কে লামা যে এখন হারতে থাকবে—এই সিদ্ধান্তটা আর কিছুতেই বদলাবে না। বিশেষত যখন অশ্বিনীর হাতের খেলাটা আর একটু চললেই তার হিসেব প্রমাণিত হতো। মানসাঙ্কের হিসেব যে অশ্বিনীর কাছে সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে উঠছে!

কলবাবু বলেন, "বুঝলে লামা, আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা যদি এইভাবে থাকে তাহলে কালপরশু-ই একটা হেস্তনেস্ত হবে। আসলে কে কোম্পানির পেয়ারের সেটা নিয়ে তো কথা। তো কোম্পানি তার পেয়ার দেখিয়ে দেবে। আজকের মিটিঙটা, মানে এই নতুন ইউনিয়নটা কি কোম্পানি চায়?"

লামা—"তাইতো শুনলাম, সবই তো শোনা কথা, তবে দর্জির সঙ্গে তো কোম্পানির সম্পর্ক খুব স্ট্রেইণ্ড, তাই ভাবলাম হতেও পারে, গুপ্ত আর গুরুং নইলে মিটিঙ ডাকতেই বা যাবে কেন?"

কলবাবু—"কেন-র কি মাথামুণ্ডু আছে নাকি। হয়তো গুপ্ত আর গুরুং-এর নেতা হওয়ার শখ হয়েছে। দর্জি তো সেদিন বা আজ কোম্পানির বিপক্ষে একটুও বলে নি।"

যে-চাপ থেকে অব্যাহতি পেতে তিনতাস সেই চাপটা খেলুড়ে-দের মাথা থেকে খেলাতে সঞ্চারিত হয়ে একটা চাপা প্রতিযোগিতা আর উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কিন্তু মাথা থেকে সে-চাপ একটু সরে যেতেই লামা আর কলবাবু খুব হাল্‌কা বোধ করেন, ফাঁকা, যেন ভারহীন। তাই, নিজেদের মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে বাগান আর বোনাস আর ইউনিয়নের প্রসঙ্গে ফিরে গেছেন। সেই চাপ-টা

চলে যেতেই খেলার ভেতরের উত্তেজনাটা হ্রাস পেতে শুরু করে। অশ্বিনীর মনে উত্তেজনাটা টিকে থাকে এই হিসেবটা মিলে যাওয়ায় যে তিন দানের ভেতর একটি দানও লামা পায় নি। কিন্তু না পাওয়ার ব্যাপার নিয়ে লামাও আর ভাবিত নয়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে হাঁটুর নিচে পয়সা চেপে সবাই তাকায়। ইন্দ্রজিৎ। কলবাবু বলে ওঠেন—"কিরে।" "আপনি একটু চলুন।" তাস ফেলে দিয়ে কলবাবু এই শব্দটা আউড়ে যায় "আপনারা খেলুন"—দুজনে তাস খেলতে পারার অসুবিধেটাও তার খেয়ালে আসে না।

অশ্বিনী আর লামা-ও উঠে পড়ে।

পাঁচ

গেটের কাছে আসার আগেই অশ্বিনী দেখে তার ঘরের আলোটা একটু অন্যরকম যেন। গেটে এসে বোঝে বসার ঘরটাতে আলো জ্বলছে। দুটো ঘরের ভেতর দক্ষিণেরটা বসার। বারান্দায় উঠে বাঁ হাতে শোয়ার ঘরটা রেখে, পেরিয়ে, বসার ঘরে যেতে হয়। পর্দা থাকলে চট করে তুলে ঘরে যে-কেউ ঢুকে যেতে পারে বলে অশ্বিনী একটা কাঠের ফ্রেমে কাপড় লাগিয়ে পার্টিশন করে নিয়েছে। বসার ঘর আর শোয়ার ঘরের মাঝখানেও একটা পিসের পার্টিশনের উপর রং করা কাপড় সেলাই করে খাম্পানৃত্যের একটা দৃশ্য। বেণু দার্জিলিঙের একটা দোকান থেকে পছন্দ করে কিনে দিয়েছিল। দেড়শ টাকা দাম। বসার ঘরে একটা ছোট সেন্টার টেবিল, তিন পাশে তিনটি বসার জায়গা—কাঠের ফ্রেমে প্লাস্টিকের বেত দিয়ে বানানো। কোণায় একটা ছোট্ট টেবিলে লম্বা ফুলদানি। ফাঁকা। রোজ ফুল রাখা গোলাপের এখনো অভ্যেস হয় নি।

বারান্দায় উঠে অশ্বিনী বোঝে বারান্দার ওপর বাইরের ঘরের দরজাটা আবজানো, বন্ধ নয়। কেউ এসে অপেক্ষা করছে, কে আর

হতে পারে, এত রাত্রিতে, এক যদি অন্য কোনো বাগানের কোনো জরুরী খবর থাকে। দরজাটা খুলে অশ্বিনী দেখে, দর্জি। অশ্বিনীকে দেখে দর্জি মুখটা তোলে শুধু। অশ্বিনীকে দরজায় একটু দাঁড়াতে দেখেই দর্জি বলে, "কি, ভাবতে পারেন নি যে আমি এসে বসে আছি।" এ-টুকুতেই অশ্বিনী "আরে কী ব্যাপার ?" বলে এগোয়। এদের কথাবার্তা শুনে ভেতর থেকে গোলাপ আসে—"তোমার এত দেরি হলো ? উনি সেই কখন থেকে বসে আছেন !"

অশ্বিনী তু-পকেটে হাত দিয়ে তাস খেলায় জেতা রেজগিগুলো নাড়াতে নাড়াতে পার্টিশনের পেছনে দরজায় একবার গোলাপের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, "চা-টা দিয়েছ ?

দর্জি বলে, "সে-আর বলতে? আপনার অ্যাবসেন্স কম্পেনসেট করতে বৌদি সেই তখন থেকে দফায় দফায় খাইয়েই যাচ্ছেন—"

দর্জি গোলাপকে পার্টিশনের জন্য দেখতে পাচ্ছিল না। আড়াল থেকেই গোলাপ—"আহা-হা।"

"তা একটা খবর পাঠালেই হতো" বলে অশ্বিনী এসে পার্টিশনের গায়ে লাগানো জানলার দিকে মুখ করা তুজনার বসবার মতো আসনটিতে বসে। গোলাপ এসে পার্টিশনের মুখে দাঁড়ায়।

"আমি তো বললাম খবর পাঠাই, উনি কিছুতেই দিলেন না।" গোলাপের কথার জবাবে দর্জি একটু হাসে শুধু। তারপর যেন মনে পড়ে গেল এমনিভাবে যোগ করে, "তাহলে তো আর এত খেতে পারতাম না !"

"যান, বার বার ঐ বলে লজ্জা দেবেন না, যা-না খাইয়েছি ! তবে আপনি কথা দিয়েছেন ভুলবেন না কিন্তু।"

"আচ্ছা" দর্জি হেসে বলে, "সে হবে আর একদিন।"

"কি ?" অশ্বিনী তুজনের মুখের দিকে তাকায়।

"বৌদিকে একদিন গান শোনাতে হবে"—

গোলাপ সরে যাওয়ায় অশ্বিনী দেখে বারান্দার দিকের দরজাটা

আধখোলা। সে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তারপর চেয়ারে বসতে বসতে বলে, "কী ব্যাপ্যার?" পাশের ঘরের বড় আলোটা গোলাপ জ্বালানোয় এ-ঘরটায় আলো অতিরিক্ত হয়ে গেলে অশ্বিনী বলে—"এ-আলোটা নিবিয়ে দি? বড় চোখে লাগে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ"—

যে-কথা বলার জন্য দর্জি তার বাড়িতে এসে অপেক্ষা করে কিন্তু খবর পাঠায় না বা ক্লাবে যায় না, সে-কথা যে দরজা আধখোলা রেখে হওয়া সম্ভব নয়, সেটা না হয় অশ্বিনী আগে থাকতেই আন্দাজ করে উঠতে পারল। কিন্তু বসার ঘরে আলো দেখে, বাইরে থেকে তার যেমন মনে হয়েছিল তেমনি আর কারোও মনে হতে পারে যে এত রাত্রিতে অশ্বিনীর বাড়িতে কে এলো, তাই পাশের ঘরের বড় আলোটা জ্বলে ওঠার সুযোগে বসার ঘরটাকে আধো-অন্ধকার করে দেয়াটা অশ্বিনীর কোনো আন্দাজের ফল, না-কি আজকের মিটিঙ আর গত ক-দিনের ব্যাপারে দর্জিকে নিয়ে যা-সব হয়েছে তা থেকে সংক্রামিত একটা সহজ সাবধানতামাত্র?

প্রথমে দর্জি-ই কথা বললো, "আজকের মিটিঙের খবর সব শুনেছেন?"

"না, শুনলাম আর কোথায়? ক্লাবেও কেউ আসে নি। লামা, কলবাবু আর আমি মিলে খানিকটা তাস পেটালাম।"

ওরা কিছু বললো না?"

"হ্যাঁ। সে থেকেই তো একটু-আধটু শুনলাম। গুপ্ত আর গুরুং নাকি মিটিং ডেকেছিল, আপনাদের ইউনিয়ন নাকি ভাঙছে, আপনি কোম্পানির পক্ষে খুব বলেছেন, কেউ বুঝতে পারছে না কোম্পানির সাপোর্ট কোন ইউনিয়নের পেছনে,"— এই বাক্যটি বলে ফেলে অশ্বিনীর সন্দেহ হয় দর্জি কি তার কাছে বাগানের সব খবরাখবর নিতে এসেছে, সে কেন এই সব খবরাখবর দেবে, "এই সব আর কি", বলে অশ্বিনী কথাটা শেষ করে দেয়।

"তা লামাদা আর কলদা কী বলে এই নতুন ইউনিয়নের ব্যাপারে ?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অশ্বিনী মাথাটা চেয়ারের পেছনে হেলিয়ে দিয়ে বলে, "ঐ আর কি !"

অশ্বিনী বুঝতে পারে দর্জি তার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে চেয়ারে শিথিল হয়ে যায়। অশ্বিনী ঠিক করে ফেলে সে-ও আর সহজে তার এই ভঙ্গি বদলাবে না—যে-ভঙ্গিতে দর্জির দিকে সরাসরি চাইতে হচ্ছে না। অশ্বিনী এটাও বোঝে যে এখন অন্য কোনো প্রসঙ্গ তুলে কথা চালাবার দায়িত্বটা সে নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যতবারই সে-কথা বলতে যায়, দেখে বাগান, ইউনিয়ন, মিটিং ছাড়া কোনো কথা খুঁজে পায় না। একবার প্রায় ঠোঁটে এসে যায় যে কলবাবু দর্জির আর্গুমেন্টের খুব প্রশংসা করে বলছিলেন কে শেখাল এই বক্তৃতা, কিন্তু অশ্বিনী তাড়াতাড়ি সামলে নেয়।

বাঁ হাতটা তুলে অশ্বিনী নিজের চুলে আঙুল বোলাতে থাকে। অশ্বিনী বুঝতে পারে দর্জি চেয়ারের হাতলের ওপর কনুই রেখে মুঠোর ওপর চিবুকের ভর রাখায় তার শিথিলতা আবার একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। দর্জির যদি কিছু বলার থাকে সে বলতে পারে, কিন্তু সে যদি অশ্বিনীকে দিয়ে কিছু বলাতে চায় সে গুড়ে বালি। বাগান, বোনাস, ইউনিয়ন—এ-সবেব সঙ্গে অশ্বিনীর কোনো সম্বন্ধই নেই, সে সম্বন্ধ পাতাতেও চায় না। অশ্বিনীর ঠোঁটে কথা বলার ঝোঁকে একবার এসে গিয়েছিল—"আপনি তো আজকাল আর ক্লাবে যান না"—কিন্তু আবারও সে সামলে নেয়।

ছয়

বসার ভঙ্গি একটুও না বদলে দর্জি বলে, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনাকে কি ভাবে কথাটা বলবো। সোজাসুজি না বাঁকা ভাবে ?" কথাটা শুনেই অশ্বিনীর সোজা হয়ে বসার কথা। কিন্তু

সে-ও ভঙ্গি অপরিবর্তিত রেখে বললো, "সোজাসুজিই বলুন, বুঝতে সুবিধে হবে।"

দর্জি চিবুক থেকে হাতটা নামিয়ে কোলের ওপর ফেলে বলে, "না-বুঝিয়ে তো আর আপনাকে ছাড়ছি না, স্বার্থ যখন আমার। আর এই চা-বাগানে সাহেব থেকে লেবার পর্যন্ত সবার সঙ্গে কাজ করে এমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছে যে একটু প্যাঁচ না দিলে মনে হয় কাজটা হবেই না।"

"তো দিন একটা প্যাঁচ"—এই কথাটাকে অশ্বিনী তার ভঙ্গি বদলাবার কাজে লাগায়। এখন সে সোজা বসে। পায়ের ওপর পা ঝোলানো। বাঁ হাতটা চেয়ারের হেলানির মাথার ওপর ফেলে রাখা। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে যায়। অশ্বিনী গলা উঁচু করে বলে, "ও-ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে রাখো।"

"তাই ভালো, একটা প্যাঁচ দিয়ে শুরু করি তারপর সোজাসুজি বলবো"—অশ্বিনী বেশ বুঝতে পারে দর্জি তার কথা বলার বিষয় ও ভঙ্গি সব পেয়ে গেছে তাই তার ভঙ্গিটা আবার শিথিল হয়ে গেছে। হেসে হেসেই দর্জি শুরু করে, "আচ্ছা ইনস্পেক্টর, এই যে মনপুরানের পাতি প্লেনভিউয়ে এসে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, আপনি সেটা জানেন?

"হ্যাঁ, তা তো জানি-ই, সে তো এই অটাম-টি-টা। ম্যানুফ্যাক-চারিং-এর আর ডেসপ্যাচের হিসেব তো আমি প্লেনভিউয়ের ফ্যাক্টরিতেই দেখছি।"

"আর, গ্রিন লিফ এ্যাকাউন্ট? পাতির হিসেব?"

"সেটা মনপুরানেই আছে।"

"ব্যবস্থাটা কি কোম্পানি আপনাকে বলে কয়ে করেছে?"

"একদিন, বোধহয় প্রথম দিন, ফ্যাক্টরিবাবু দেখিয়েছিলেন রিসিভড ফ্রম মনপুরান টি এস্টেট এত গ্রিন লিফ, তার এ্যাকাউন্ট এই। মনপুরান থেকে পাতি রিসিভ করার কোনো রাইট তো প্লেন-

ভিউ ফ্যাক্টরির নেই। তাই আমি ওটা আলাদা করে দিতে বললাম।"

"আলাদা মানে?"

অশ্বিনীর হঠাৎ মনে হয় দর্জি তাকে জেরা করছে। সে বলে, "কেন, বলুন তো?" এর জবাবে দর্জির সহাস্য "বলুন-ই না" শোনা আর এগুলো সব দর্জির আসল কথা বলার ভূমিকা এটা মনে পড়া একই সঙ্গে ঘটে। সেই ফাঁকে দর্জি আরো যোগ করে, "আলাদা মানে, মনপুরানের গ্রিন লিফের হিসেব থাকছে প্লেনভিউ ফ্যাক্টরিতে মনপুরানের খাতায়—এই তো?"

"হ্যাঁ, তাই তো।"

"এ-সব ব্যবস্থা হওয়ার আগে কোম্পানি আপনার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিল বা আপনাকে জানিয়েছিল?"

"কি জানাবে?"

"যে এখন থেকে মনপুরানের পাতির দুটো এ্যাকাউন্ট দু-জায়গায় হবে?

"সে তো আমিই করতে বলেছি। আর দু জায়গায় কোথায় হচ্ছে। সব তো মনপুরানেরই খাতা।"

"তার মানে প্লেনভিউয়ে যে-পাতি আসছে, ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, ডেসপ্যাচ হচ্ছে সে-সব কোথাও লিখিত-পড়িত নেই, আপনার সই আর ক্লিয়ারেন্স অনুযায়ী সব মনপুরান থেকেই হচ্ছে।"

অশ্বিনীকে চুপ করে যেতে হয়। দর্জি বলে যেতে থাকে—"তার মানে এখন যদি কোম্পানিকে চেপে ধরা যায় যে তুমি বেআইনী-ভাবে মনপুরানের পাতি প্লেনভিউ-এ আনছ, আর এই চাপাচাপির ফলে যদি সমস্ত ব্যাপারটা ট্রাইব্যুনালে বা কনসিলিয়েশনে যায় তাহলে এক আপনার সই আর ক্লিয়ারেন্স দিয়ে কোম্পানি প্রমাণ করে দেবে সমস্ত ব্যাপারটাই ভুয়ো, মনপুরানের পাতি মনপুরানেই বানানো হচ্ছে। কোথাও প্রমাণ নেই পাতি প্লেনভিউয়ে আসছে।"

"কোম্পানি কি প্রমাণ করবে না-করবে তা নিয়ে তো আর আমার মাথাব্যথা নেই আর কন্‌সিলিয়েশন বা ট্রাইব্যুনাল নিয়েও আমার চিন্তা নেই। আমার গ্রিন লিফ এ্যাকাউণ্টের সঙ্গে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর হিসেব মিললেই হল"---অশ্বিনী টেবিলের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলে। যদিও দর্জি আর অশ্বিনী পরস্পর বিপরীত কথা বলছে কিন্তু শোনায় যেন একজন-ই উল্টেপাল্টে নিজের বক্তব্য দেখছে শুনছে। কথা বলার শুরুতে অশ্বিনীর ভেতর যে-অবিশ্বাস ছিল সেটা কখন উপে গেছে।

"ধরুন ইনস্পেক্টর, আমার এখন খুব দরকার কোম্পানিকে একটা দারুণ প্যাঁচে ফেলার, আপনি তো সব শুনেছেন, আমার যা ব্যাপার-স্যাপার, আমিও সব বিশদ করে বলছি, ধরুন, প্যাঁচে ফেলার জন্য আমি আপনার হেড অফিসে জানিয়ে দিলাম যে আপনার সঙ্গে ব্যবস্থা করে কোম্পানি এই রকম বেআইনী কাজ চালাচ্ছে, তখন আপনি তো সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বেন; কোম্পানির সঙ্গে আপনার বড় অফিসার যে-কোনো একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে আপনাকে বলি দেবে।"

"তা পারত যদি হিসেবে কোনো গোলমাল পাওয়া যেত। কিন্তু মনপুরানের তুটো এ্যাকাউণ্ট একেবারে ঠিক আছে, আজ সকালে মনপুরানের ডেসপ্যাচ ছিল।"

"ঠিক আছে? ধরুন আমি আপনার হেড অফিসে জানিয়ে দিলাম যে হিসেবের খাতায় সব ঠিক আছে—সেখানে কোনো গোল-মাল পাওয়া যাবে না। মনপুরানের পাতি নিয়ে যখন ট্রাক মন-পুরানের সীমানা ছাড়াবে বা প্লেনভিউয়ের সীমানায় ঢুকবে তখন যদি সারপ্রাইজ ইনস্পেকশন করা যায় তাহলে ধরা পড়বে কোনো প্রকার অনুমতি ছাড়াই ঐ পাতি বাইরে এসেছে।"

"তাতে আমার কি? আমি বলবো কোম্পানি আমাকে না-জানিয়ে চা-পাতি পাচার করছে—কোম্পানির ফাইন হোক

বা কোম্পানির নামে মামলা হোক"—অশ্বিনী এতক্ষণে হাসতে পারে।

"ধরুন, আমি এটাও বলে দিলাম যে প্লেনভিউয়ের উইদারিং হাউসে প্রতিদিনের পাতির হিসেব নিলে দেখা যাবে সেখানে প্লেন-ভিউয়ের টিপা পাতি থেকে অনেক বেশি পাতি আছে—মনপুরানের হিসেব নিলে যেটা মিলে যায়।"

"আমি একই কথা বলবো—কোম্পানি আমাকে না জানিয়ে করছে।"

"ধরুন, আপনার অফিসার একদিন এসে প্লেনভিউ গুদামের মোট চা ওজন করল, দেখল প্লেনভিউয়ের হিসেব অনুযায়ী যা থাকার কথা তার চাইতে অনেক বেশি আছে—মানে মনপুরানের পুরোটাই তো বাড়তি হবে, তখন।"

"কোম্পানির বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা নেয়ার নেওয়া হবে।"

"সেটা আপনিই নিন না কেন, আপনি তো ঐ তিনটির যে-কোনো একটা কাজ এখুনি করতে পারেন। মনপুরানের ট্রাক ঢোকবার মুখে ধরতে পারেন। এখানকার উইদারিং হাউসের বা গুদামের মোট চা ওজন করতে পারেন। কালকে এক চিঠি দিয়ে কোম্পানির গুদামে তালা লটকে দিতে পারেন। নইলে চা বাইরে আসা, প্লেনভিউ-এর গ্রিন লিফ আর গুদামজাত চা এই তিন হিসেবেই যদি আপনার সুপিরিয়র অফিসার গোলমাল পান, তবে সবই আপনার অজান্তে ঘটছে এটা অবিশ্বাস্য ঠেকবে।"

অশ্বিনী দর্জির দিকে তাকিয়ে থাকে। দর্জি খানিকটা পরে যোগ করে—"কিন্তু আপনিই যদি ইনিসিয়েটিভ নেন তাতে আপনার সার্ভিস রেকর্ড দারুণ ভালো হবে, আমারও মস্ত উপকার হবে।"

অশ্বিনী বোঝে এবার তাকে কথা বলতে হবে। সে যে এটা বুঝেছে এটুকু জানাবার জন্যই যেন বলে, "কিন্তু মনপুরানের পাতি

আনার সমস্ত ব্যবস্থাটাই তো খুব টেম্পরারি, মাত্র ওই অটাম-টির জন্য, তা-ও নাকি এক্সপেরিমেণ্টাল।”

এ কথার জবাব দর্জি তখুনি দেয় না। যেন দর্জি জানে, অশ্বিনীকে এখন তো বটেই, আজ রাতে, কাল সকালে, মনে মনে একটা হিসেব-নিকেশ করে নিতে হবে যে, বিভিন্ন বাগান থেকে দেড় দু-হাজার টাকা কখনো কখনো পেয়ে যাওয়ার কারণটুকুও জানতে না-চাওয়ার ও টের না-পাওয়ার অস্পষ্টতার সুবিধেটুকু আবার-যে আইনের ফাঁস হয়ে গলায় লাগতে পারে সেই আশঙ্কা আর আইনের ফাঁসটাকে নিজেই ব্যবহার করে কোম্পানির সঙ্গে নগদ দেনাপাওনার সম্পর্ক তৈরি করার স্পষ্টতার ভেতর তার লাভ কোন্‌টাতে বেশি। এটা তো আর অশ্বিনী দর্জিকে বলতে পারে না যে, তাকে নানা বাগানের বড়বাবু নানা সময় টাকা দেয়, কেন দেয় অশ্বিনী তা জানতে চায় না। এখন বা কখনো কখনো কারণটা অশ্বিনী জানতে পেলেও কি করে বলে যে কোনো একটা কাজ করতে দেবে না, যখন তার নিজেরই জানা নেই সেই কাজটুকুর জন্য সে ইতিমধ্যে টাকা খেয়ে বসে আছে কিনা। দর্জির কথার পরিষ্কার মানে হচ্ছে এখন থেকে সেই হিসেবটা রাখতে হবে। কোম্পানি নিশ্চয়ই তাকে বেশি টাকা দেয় না, নিশ্চয়ই কাজের তুলনায় কম টাকাই দেয় আর আইনটা যখন কোম্পানির হাতে থেকে যাচ্ছে, দরকার মতো কোম্পানি তাকে ফাঁসিয়েও দিতে পারে। অশ্বিনী দর্জিকে জিজ্ঞাসা করে বসে, “সে না-হয় হল, তার সঙ্গে আপনার ব্যাপারটার সম্পর্ক কি?”

সাত

দর্জি বেশ শিথিল হয়ে বসে আছে। কথা বলার জন্য সে ঘাড়টাকে সোজা করছে না। “সেটা দিয়েই শুরু করব ভেবেছিলাম কিন্তু প্যাঁচ ছাড়া তো চলতে পারি না। প্যাঁচ দেয়া হয়েছে। এবার আসল

কথাটা বলি। কোম্পানিকে আমি জব্দ করতে চাই, আপাতত আপনার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়।”

“কেন, কোম্পানির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তো খুব ভালো শুনে-ছিলাম।”

“ছিল, এখন নেই। অত ইতিহাস দিয়ে দরকার নেই, এই বাগানে কী করে চাকরি পেলাম তা তো আপনাকে বলেইছি। এখন কোম্পানি আমাকে সরাতে চায়। না হলে কোম্পানি লেবারদের ব্যাপারে আমার উপর সম্পূর্ণ ডিপেন্‌ডেন্ট হয়ে পড়বে, তখন আমি যা বলব তা-ই কোম্পানিকে মানতে হবে, কোনো বুদ্ধিমান কোম্পানি-ই তা চায় না। তাই কোম্পানি আমাকে কোনো রকমেই পার্মানেন্ট করে নি, একটা স্কেল দেয়া কি আর এই কোম্পানির পক্ষে একটা ব্যাপার? কিন্তু আমি বলেই, মানে লেবার ব্যাপারের সঙ্গে ডাই-রেক্টলি ইন্‌ভল্‌ভড্ বলেই আমাকে স্কেল দেবে না। এটা এদের নিয়ম, ইন্‌স্পেক্টর, যখন যা তখন তা, যখন যে, তখন সে। এদের সঙ্গে কারবার করার সময় মনে রাখবেন গতকালের সম্পর্ক দিয়ে এরা আজকের সম্পর্ক চালায় না। যদি আপনিও তাই করতে পারেন তবেই টিকতে পারবেন, নইলে গেলেন।” দর্জির কথাগুলো যেন কিছুটা স্বগতোক্তি।

চেয়ারে সোজা হয়ে দর্জি এবার অশ্বিনীকেই বলে, “কোম্পানি যে এবার একটা অস্বাভাবিক হারে বোনাস দিল, হঠাৎ, ওদের অন্যান্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু স্থানীয় কারণটা এই সুযোগে ওরা আমাদের ইউনিয়নটাকে ভেঙে নতুন একটা ইউনিয়ন তৈরি করবে। এ-সব ইউনিয়ন তো লড়াকু ইউনিয়ন না, আমার মতো মাইনে করা লোক লাগিয়ে মালিকের পোষা ইউ-নিয়ন। যখনই লেবাররা বুঝবে যে কোম্পানি দর্জির ইউনিয়নকে আর মানে না, গুপ্ত আর গুরুঙের ইউনিয়নকে মানে, অমনি সব ঐ ইউনিয়নে যাবে। আর আজ ওদের একটা মিটিঙ হয়ে কি কমিটি

নাকি হয়েছে। কাল সকালেই দেখবেন ম্যানেজার ওদের সঙ্গে বসে কতকগুলি দাবি মেনে নেবে। ব্যস। সবাই বুঝে যাবে ওদের ইউনিয়নটাই কোম্পানির পেয়ারের। হুড়হুড় করে মেম্বার হওয়া শুরু করবে। এই বুদ্ধি কষেই কোম্পানি মিছিলের দিন বিকেলেই বোনাস ঘোষণা করল। আমি আগেই কোম্পানির এই মতবল টের পেয়েছিলাম। ফ্যাক্টরি-মজুরদের কানে এই কথাটা ওঠানো হয়েছিল যদি তারা ইউনিয়ন ছাড়ে তাহলে মাস-মাইনেতে বোনাস দেয়া হবে। সেটা টের পেয়েই মিছিলের দিন আমি নিজে ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলাম, যাতে ফ্যাক্টরি-মজুররা মিছিল থেকে ভাগতে না পারে। সেদিন যখন আমার নিজের অত ঝোলাঝুলির পর তবে ফ্যাক্টরি-মজুরদের গলা দিয়ে ঐটুকু শ্লোগান বেরলো তখুনি আমি বুঝেছিলাম যে আর আটকানো যাবে না। কোম্পানিও আর একটুও দেরি না করে বোনাসটা ঘোষণা করে দিল। আজকের মিটিঙটা ডাকা হচ্ছে শুনেই আমি বুঝলাম পাল্টা ইউনিয়ন বানানো হচ্ছে। কাল সকালে সেই ইউনিয়নকে কোম্পানি রেকগনাইজ করলেই আমার ইউনিয়ন ছেড়ে সব ভাগবে। ব্যস। দর্জির খেল খতম্। এক, আপনি এখন কোম্পানিকে প্যাঁচটা দিলে বেরবার একটা রাস্তা পাওয়া যায়।”

“আপনি নাকি আজকের মিটিঙে বলেছেন কোম্পানি কখনো অন্য কোনো ইউনিয়নকে স্বীকার করবে না। সেই বক্তৃতার কথাতেই তো কলবাবু বললেন যে দর্জিকে আর্গুমেন্টটা শেখালো কে, ও দিব্বি বলে গেল ওর ইউনিয়নের ওপরই কোম্পানির আস্থা, কিন্তু গুপ্ত-গুরুং বলতে পারল না তাদেরকে কোম্পানি-ই বলেছে নতুন ইউনিয়ন বানাতে। লামা বা কলবাবুরও তো পরিষ্কার ধারণা নেই কী হচ্ছে সে-ব্যাপারে।”

“পরিষ্কার ধারণা কারোরই থাকে না ইনস্পেক্টর। আমি আজ সকালে মিঃ প্রধানের কাছে গিয়েছিলাম—এখানকার এম্-এল-এ। গত ইলেকশনে প্লেনভিউসহ আমার যে ক-টি বাগানে ইউনিয়ন আছে

তার সব ভোট তিনি পেয়েছিলেন। প্লেনভিউয়ের মতো হাজার-দেড়হাজার ভোটের বাগান যদি আমার, মানে, ওঁর হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে ওঁরই মুশকিল। উনি সব শুনে বললেন, আজকের মিটিঙে ঐ লাইনে আর্গুমেন্ট করতে, যাতে গুপ্ত-গুরুং মুখ খুলতে না পারে। কিন্তু আজকের বা কালকের মধ্যে যদি নতুন কোনো ইস্যুর সঙ্গে মিলিয়ে বলটাকে কোম্পানির কোর্টে ফেলা না যায় তাহলে ঐ পাল্টা ইউনিয়ন রেকগনিশন পেয়ে যাবে। সেই নতুন ইস্যু খুঁজতে খুঁজতেই আপনার, মানে, মনপুরানের কথা উঠলো। সব শুনে উনি বললেন এক যদি ইনস্পেক্টরকে রাজি করাতে পার তবে কোম্পানি জব্দ হবে। আর ইনস্পেক্টর যদি অল্‌রেডি কমিটেড হন, আপনি যদি রাজি না হন, তাহলে অবিশ্যি আমার আর কিছু করার নেই। ইনস্পেক্টর, আপনি কি কমিটেড?" দর্জি অশ্বিনীকে যখন কথাটা জিজ্ঞাসা করে বসে তখন দুজনের চোখ মিলে আছে। চোখটা না সরিয়ে অশ্বিনী ভেবে নেয় প্রশ্নটার মানে যদি এই হয় যে বিশেষত মনপুরানের পাতির ব্যাপারে সে কোনো টাকা নিয়েছে কি না, তাহলে তার উত্তর, না, সে কমিটেড্‌ নয়।

"না"—বলার পরও অশ্বিনী দর্জির চোখ থেকে চোখ সরায় না।

দর্জি পকেট থেকে দুটো কাগজ বের করে। "মিঃ প্রধান বললেন আপনি নতুন কাজে এসেছেন, হয়তো সব আইন-কানুন আপনার জানা নেই, তাই তাঁর ল-ইয়ারকে দিয়ে ড্র্যাফট করিয়ে টাইপ করিয়ে দিলেন।" ভাঁজ খুলে কাগজ দুটো দর্জি অশ্বিনীকে দেয়। হাতে নিয়ে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "কিন্তু কোম্পানি কি মিঃ প্রধানের মতো এমন একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লিডারের বিরুদ্ধে যাবে? তিনি বলে দিলেই তো সব মিটে যাবে।" "কোম্পানির আবার অন্য লিডার আছে, আপাতত। যে যার লাভ দেখে তো লিডার পাকড়াবে। আপনাকেও তাই করতে হবে, আমাকেও তাই করতে হবে।" কাগজটা পড়ার জন্য অশ্বিনী চেয়ারে হেলান দেয়।

তথ্য অধিগত করার ব্যাপারে অশ্বিনীর সীমাবদ্ধতা এখানে যে, সে একসঙ্গে ছুটো তথ্য গ্রহণ করতে পারে না। একটা তথ্য সম্পূর্ণ অধিগত করলেও তার আনুষঙ্গিক তথ্য ফাঁকে থেকে যায়। চিঠিটাতে সরকারি আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারার এত উল্লেখ আছে আর ইংরেজী বাক্যটা নানা শর্তে শর্তে এমন জটিল যে অশ্বিনী শুধু সেটা পড়েই যেতে পারে, কোনো মানে বুঝতে পারে না। শেষের দিকে তার যখন মনে পড়ে যায় এ-রকম নোটিশের মুসাবিদা তার ম্যান্নুয়ালে আছে, তখন সে নোটিশটা টেবিলের ওপর রেখে বলে, "আমি না হয়, নোটিশ দিলাম, তার সঙ্গে আপনাদের ইউনিয়নের সম্বন্ধ কি ?"

"কাল যদি আপনি এই নোটিশটা ইস্যু করে প্লেনভিউ ফ্যাক্টরি থেকে ডেসপ্যাচ আপাতত বন্ধ করে দেন, তাহলে আমি মনপুরানের ফ্যাক্টরি স্টাফকে আর বাগানের লেবারদের নিয়ে একটা মিছিল আনতে পারি। আসলে এবারে প্লেনভিউয়ের ফ্যাক্টরি-মজুরদের অতিরিক্ত বোনাস দেওয়ার আর একটা মতলব হচ্ছে মনপুরানের ফ্যাক্টরি-মজুরদের সঙ্গে যাতে এরা লড়ে যায়। কারণ কোম্পানির মতলব হচ্ছে মনপুরানের ফ্যাক্টরিটা তুলে দিয়ে, মনপুরানকে প্লেন-ভিউয়ের একটা ডিভিশন করে নেবে। গেলবার মনপুরানের ছু-ট্রাক পাতি এসেছিল। এবার পুরো অটাম-টি-টাই এলো, উইদারিং হাউসও বাড়লো। সামনেরবার থেকে অন্য সিজনের চা-ও আসবে। তার পরের সিজ‌্ন্ থেকে মনপুরান ডিভিশন হয়ে যাবে।"

"চার বছর ধরে ঝামেলা না পাকিয়ে এই বছর, একবারে, মন-পুরানকে ডিভিশন করার অসুবিধেটা কি ?"

"সেই অসুবিধেটাই তো বোঝাতে চাইছি। লেবার ট্রাবল। বাবুদের ট্রাবল। একটা আস্ত বাগান থাকলে তো সবারই সুবিধে। আর সেটা যদি একটা ডিভিশন হয় তাহলে তো কারোই আর কোনো প্রমোশনের চান্স থাকল না। মনপুরানে আমার ইউনিয়ন নেই। সেখানকার ইউনিয়নের লিডারদের সঙ্গে বোধহয় কোম্পানির

কিছু ঠিকঠাক হয়ে থাকবে। ওরা এ-ব্যাপার নিয়ে কিছু করবে না। সেই সুযোগে আমি ঢুকতে পারি। প্লেনভিউ বাগানের ফ্যাক্টরিতে মনপুরানের মাল বের করা আমি বন্ধ করে দিয়েছি, সেটা যদি আমি প্রমাণ করতে পারি, তাহলেই তো ওখানকার লেবাররা-বাবুরা আমাকে ধরবে, নাহলে ধরবে কেন। নইলে পুরনো ইউনিয়নের তাপ্পিতে ভুলবে। আর ইউনিয়নও সব ধোঁকা মারবে এই হচ্ছে, সেই হচ্ছে। আর মনপুরানের ব্যাপারটা সাহেবরা এত গোপনে গোপনে ম্যানেজ করে আসছে যে ওটা যদি একবার তোলা যায় তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। সাহেবরা চাইবে না, প্লেনভিউ বাগানের ইউনিয়ন আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মনপুরানে তুলে দিতে। কারণ মনপুরান আজ হোক কাল হোক ডিভিশন হবেই, আলাদা বাগান থাকবে না। আমিও মনপুরানের কেস সহ কোম্পানির সঙ্গে বসতে রাজি হব—এই শর্তে যে আমিও মনপুরানের ব্যাপার ছেড়ে দিতে রাজি থাকব—মনপুরানের বর্তমান ইউনিয়নেরই যেমন মনপুরানের ব্যাপারে কথা বলার অধিকার, তেমনি প্লেনভিউয়েও আমার ইউনিয়নকে কোম্পানির সঙ্গে কথা বলার একমাত্র অধিকার দিতে হবে।”

“কিন্তু মনপুরানের ব্যাপারে প্লেনভিউয়ের ওপর নোটিশ দিলে প্লেনভিউয়ের বাবুরা আমার ওপর চটবে না? হাজার হোক, এখানেই তো থাকি।”

“তাই বলে আপনি এমন কাজ করতে দেবেন যাতে আপনাকে যে-কেউ ফাঁসিয়ে দিতে পারে? আর এ-বাগানের কে চায়, এক ফ্যাক্টরিবাবু আর দু-একজন ছাড়া, যে মনপুরানের পাতি এখানে আসুক? এতে আর কারো কোনো লাভ নেই! মনপুরানের ব্যাপারটা একবাব জমাতে পারলে দেখবেন সবাই পক্ষ পাল্টাবে, গুপ্তও আমার দলে আসতে পারে, সেই সাহায্যটুকুই তো আপনার কাছে চাইছি।”

"ঠিক আছে, আমি কাল সকালে একটা নোটিশ দিয়ে রাখব—তারপর যা করার করুন'।"

"আমি মিঃ প্রধানকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি"—দর্জি উঠে দাঁড়ায়। দরজা খুলে বেরতে বেরতে দর্জি বলে, "মনপুরানের ব্যাপার নিয়ে যদি কোম্পানি আমাদের সঙ্গে বসে তাহলে মিঃ প্রধান আমাদের, মানে ইউনিয়নকে, রিপ্রেজেন্ট করবেন।" অশ্বিনী দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে পেছন ফেরে।

আট

অন্ধকারে পার্টিশনটা পেরতে গিয়ে অশ্বিনী দেখে পাশের ঘরের আলোর পটভূমিতে এ-ঘরের অন্ধকারে সব রং ঘুচে যাওয়া খাম্পা নর্তক যেন বিশাল হয়ে উঠেছে। এর আগে কোনোদিন বুঝি অশ্বিনী নর্তকের দিকে তাকিয়ে দেখে নি। এ-ঘরে এত পাওয়ারের আলোর নিচে খোকা উপুড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। তার পাশে বোধহয় কিছু পড়তে পড়তে বা লিখতে লিখতে গোলাপও ঘুমিয়ে পড়েছে। গোলাপের মুখটা হাঁ, চোখটা সম্পূর্ণ বন্ধ নয়, হাত দুটো দু-পাশে, ডানহাতটা খাট ছাড়িয়ে ঝুলে, ডান হাঁটুটা একটু ভাঁজ হয়ে পা দুটো ফাঁক, বাঁ পায়ের কাপড়টা একটু ওঠা। যেন, সঙ্গম করে চলে যাওয়ার সময় কেউ গোলাপকে খুন করে রেখে গেছে। অশ্বিনীর বিচ্ছিরি লাগে। তবু সে গোলাপকে না-ডেকে ওয়াড্রোব খুলে জামা প্যাণ্ট জুতো খুলতে খুলতে ভাবে, তিনটেতেই তো আর বলা যায় না সে জানে না, মনপুরানের পাতি বেরচ্ছে কেন—কোম্পানি না জানিয়ে আনছে, প্লেন-ভিউয়ে পাতি বেশি কেন—কোম্পানি না-জানিয়ে করছে, গুদামে বাড়তি চা কেন—কোম্পানি না জানিয়ে রাখছে—এটা কোনো বিশ্বাসযোগ্য জবাবই নয়, তার বড় অফিসে জানানোটা তো একটা টেলিগ্রাম বা টেলিফোনের ওয়াস্তা, কোম্পানি তো নিজে বাঁচবে, বড় অফিসারও ভালো খাবে, তারই হবে শাস্তি, এত সাধনা করে পাওয়া

চাকরিটাও যাবে, আসলে সেটাই তো দর্জি জানান দিয়ে গেল, মিঃ প্রধান যে মুসাবিদা পাঠিয়েছেন তাতে সই করা ছাড়া তার কিছু করার নেই। শোয়ার জামাটায় হাত গলাতে গলাতে অশ্বিনী থমকে যয়। একটা মাত্র উপায় আছে।

ওয়াড্রোবের দরজাটা আস্তে বন্ধ করে, জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে গোলাপের পাশে এসে দাঁড়িয়ে অশ্বিনী উপায়টা ভাবে—এখন যদি গিয়ে বড়বাবুকে সব জানিয়ে দেয়া যায়, তাহলে রাতা-রাতি খাতাপত্র মনপুরানে পাঠিয়ে দেবে হয়তো কিন্তু শুকোতে দেয়া পাতি আর বাক্সবন্দী চা রাতারাতি সরাতে পারবে কিনা কে জানে। এতে অবিশ্যি কোম্পানির কাছে যত টাকা সে চাইবে, তত টাকা পাবে।

গোলাপের হাঁ-করা মুখের ভেতরও আলো ঢুকেছে। ঠোঁটটা বন্ধ করে দিলে কি গোলাপ বেঁচে উঠবে, জেগে উঠবে? কিন্তু তাহলে এখন মিঃ প্রধান এম্. এল্. এ. দর্জি এদের বিরুদ্ধে কোম্পানির সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া হবে। কিন্তু কোম্পানি তো তাকে চিরজীবন দেখবে না। এরপর যখন আবার বদলি হবে।

গোলাপের হাঁয়ের ভেতর আঙুলটা ঢুকিয়ে দিলে কি গোলাপ মুখ বন্ধ করে ফেলবে। তার চাকরি তো সবে শুরু। এখন যদি সে এ-রকম একটা কেস ধরতে পারে তবে তার রেকর্ডও ভালো হবে। কোম্পানি যদি বলে, অশ্বিনী তো প্রথম থেকেই মনপুরানের পাতি আসছে জানে, অশ্বিনী অস্বীকার করবে। কোম্পানি যদি বলে, অশ্বিনী প্রথম থেকেই মনপুরানের খাতা প্লেনভিউয়ে সই করছে—অশ্বিনী অস্বীকার করবে। সে বলবে, গতকাল পর্যন্তও সে মন-পুরানের হিসেব মনপুরানে সই করেছে—রাত্রিতে তার সন্দেহ হয়েছে, সকালে সে নোটিশ দিয়েছে। ব্যাস। সব গ্রিন লিফ ওজন করো, গুদামের সব চা ওজন করো। আর বড়বাবুকে সে যদি এত রাত্রিতে গিয়ে ব্যাপারটা জানিয়ে আসে? দর্জি তাকে এত কথা বলে গেল

আর এই আশঙ্কাটা কি তার মনেও আসে নি যে, অশ্বিনী আজ রাতেই সব ফাঁস করে দিতে পারে? হয়তো, অশ্বিনীর বাড়ির সামনে কাউকে লুকিয়ে রেখেছে। সারারাত সে অশ্বিনীকে পাহারা দেবে। হয়তো, অশ্বিনীর বড় অফিসার মিঃ প্রধানের অতিথি হয়ে অপেক্ষা করছেন। অশ্বিনী বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড়বাবুকে খবর দিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে দার্জিলিঙে খবর চলে যাবে, তারপর রাত্রিতেই বাগান ঘেরা হবে, গুদাম সার্চ হবে, পাতি ওজন হবে। দর্জি যখন তাকে এসে এত পরিষ্কার করে সব জানিয়ে দিয়ে গেছে—তখন দর্জি সব দিক ভেবেচিন্তে প্রস্তুত হয়েই করেছে। টাইপ-ফাইপ করিয়ে একেবারে রেডি নোটিশটা যখন দর্জি ধরিয়ে দিয়ে গেল তখন নোটিশটা আজ রাত্রিতেই অশ্বিনী সই করে রাখুক। গোলাপকে দিয়ে রাখব। কাল সকালে ভোঁ বাজার আগেই যাতে নোটিশটা বড়-বাবুর বাড়িতে দাজু দিয়ে আসে। অশ্বিনী তখন ঘুম থেকে উঠবে না। বড়বাবু যখন জিজ্ঞাসা করবে বাবু কি করছেন, দাজু জবাব দেবে, ঘুমোচ্ছে। বাগান বন্ধের নোটিশ দিয়ে সে ঘুমোচ্ছে—এই অবস্থাটা কল্পনা করতে অশ্বিনীর খুব মজা লাগল। নোটিশটা রাত্রিতেই সই করে রাখতে, নোটিশটা ম্যানুয়ালের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে, বাইরের ঘরে যাবার আগে সে গোলাপকে ধাক্কা দেয়, "খাবার দাও।" গোলাপ ধড়মড়িয়ে ওঠে।

নয়

ম্যানুয়াল খুলে অশ্বিনী দেখে নোটিশের কোনো নির্দিষ্ট ফর্ম নেই, কিন্তু কয়েকটি নিদর্শ দেয়া আছে। নিদর্শগুলো পড়তে থাকে, এই ব্যাপারে কোনটা ঠিক হবে। প্রায় প্রতিটিতেই ইংরেজী বাক্যটা এমন অজস্র শর্তকণ্টকিত ও নানারকম আইনের ধারার উপধারার প্যারা-র উল্লেখে আকীর্ণ যে সেগুলো বাদ দিয়ে আবার দর্জির দিয়ে যাওয়া টাইপ করা নোটিশটা নিয়ে পড়ে। সেটাতে যে-সব ধারা-

উপধারার উল্লেখ আছে সেগুলো দু-একটা মিলিয়ে দেখতে গিয়ে অশ্বিনী আবার ফাঁপরে পড়ে। একবার সে ভাবে উকিলের মুসাবিদা যখন সই করে দিতে তার আপত্তি কি। কিন্তু না-দেখেশুনে সই করতে বেধে যায়। গোলাপ "খেতে এসো" ডাকার পরও অশ্বিনীকে মূল ধারাগুলি বুঝে নিয়ে অবশেষে সই করতে হয়। খাওয়ার টেবিলে বসার আগে অশ্বিনী গোলাপকে কাগজতুটো দিয়ে বলে, "কাল সকালেই এই চিঠিটা দাজু যেন বড়বাবুকে দিয়ে আসে। একটা চিঠি দেবে, আর একটা চিঠিতে সই করিয়ে আনবে।"

গোলাপ চিঠিটা নিয়ে বেডসাইড টেবিলের তাকে রেখে আসে।

"কী এত কথা বললে দুজন, এত রাত্রিতে, আমি তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।"

"সে ত দেখতেই পাচ্ছিলাম, যে-ঘুমের ছিরি, এত বলছি নাইটি পরা অভ্যেস করো।"

"আহা-হা, খোকন কি ভাববে?"

"খোকন তো বড় হচ্ছে, ওর জন্য পাশের ঘরে ব্যবস্থা করলেই হয়।"

"তুমি যা হচ্ছ-না দিন দিন।"

ছোট টেবিলটায় গোলাপ দুটো ডিসে ভাত বেড়ে নেয়, বাকি সব ছোট ছোট বাটিতে সাজানো। দুজন একই সঙ্গে খাওয়া শুরু করে।

অশ্বিনীর ঘরটার উত্তর দেয়াল জুড়ে পরপর—ওয়াড্রোব, বেড-সাইড, দুটো সিঙ্গল খাট মেলানো একটা গদি-পাতা সাত ফিট চওড়া খাট। ঘর নেই বলে খাওয়ার টেবিল পাততে পারে নি। একটা ছোট্ট সাড়ে তিন বাই আড়াই ফুটি টেবিলের ওপর মাইকা লাগিয়ে নিয়েছে—ওটাকেই খাওয়ার টেবিল হিসেবে ব্যবহার করে। বাসন-কোসন সবই চিনেমাটির। দরজার পাশে, বাইরের ঘরের দেয়ালের সঙ্গে লাগানো চার ফুটি কাচের আলমারিতে নানারকম টি-সেট আর

খাবার-দাবার পরিবেশনের সেট সাজানো। আলমারির ওপর দেয়ালে একটা খুব বড় বিকট তিব্বতি মুখোশ লাগানো—ওটাও বেণুর পছন্দ করে দেয়া।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে অশ্বিনী বিছানায় টানটান হয়ে সিগারেট টানতে থাকে। বেডসাইডের আলোটা জ্বেলে আর-একবার নোটিশটা দেখে আর এতক্ষণে চট করে সমস্ত নোটিশটার অর্থ তার কাছে আইনের সমস্ত কারিকুরি নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বোধহয় এতক্ষণ ধরে বারবার পড়ায় ভেতরে ভেতরে অর্থটা তার কাছে ধরা পড়ছিল। এখন স্পষ্ট হয়ে গেল। খুব ভালো মুসাবিদা। কাল সকালেই কোম্পানিকে উকিলের বাড়ি ছুটতে হবে। আবার কোনো উকিলের জবাব ম্যানেজারের সই নিয়ে অশ্বিনীর কাছে আসবে—অশ্বিনী যেমন কোনো উকিলের চিঠি সই করে পাঠাচ্ছে। এতটা ভাবনাচিন্তার কোনো দরকারই ছিল না—সমস্ত ভাবনাচিন্তা মিঃ প্রধান, তার উকিল আর দর্জি করে রেখেছে। অশ্বিনী যেন অনেকখানি নিশ্চিন্তবোধ করে। তার মারফত এত সব ব্যাপার হতে যাচ্ছে অথচ তাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে না এটা তার পক্ষে খানিকটা স্বস্তিকর-ই যেন। ভাঁজ করে নোটিশটা টেবিলে গোলাপ যেখানে রেখেছিল সেখানে রেখে দেয়। তারপর পাশ ফেরে।

ইতিমধ্যে গোলাপের কাজকর্মও শেষ। যত তাড়াতাড়ি গোলাপ-অশ্বিনী খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে শুয়ে পড়ছে তাতে মনে হয় যেন এই ধরনের জীবনযাপনেই তারা আজন্ম অভ্যস্ত। কোথায় কত দূরে জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ির একান্নবর্তী সংসার! স্মৃতিতেও তার থই মেলে না। অথচ সেই জীবনই তো বরাবরের। এ-জীবনের তো এখনো বছরও পেরয় নি। আসলে মানুষ আরামেই জন্ম-অভ্যস্ত।

শোয়ার আগে গোলাপ মুখে একটু ক্রিম ঘষে। তারপর সব আলো নিবিয়ে বালিশের তলা থেকে টর্চটা নিয়ে ওয়াড্রোবটা খুলে

গোলাপ অশ্বিনীর জামা-প্যাণ্টের পকেট হাতড়ে দেখে কোনো টাকা পয়সা আছে কি না।

সেই যেদিন বড়বাবু টাকা দিয়েছিলেন, সেদিন থেকে এটা গোলাপের প্রতি রাত্রির অভ্যাস। অশ্বিনীর পকেটে যেদিন খাম থাকে, সেদিন টর্চের আলোতে নোটগুলো দেখতে দেখতে গোলাপ খাটের তলে ঢুকিয়ে রাখা ট্রাঙ্কটা বের করে তার ভেতর নোটগুলো রেখে দেয়। এই টাকাগুলো সে ঐ ট্রাঙ্ক ছাড়া রাখে না। ঐ ট্রাঙ্ক নাকি তার লক্ষ্মী-বাক্স।

ওয়াড্রোব খোলার শব্দে অশ্বিনীর হঠাৎ মনে পড়ে যায় কিন্তু এই নোটিশ দিয়ে তার কি লাভ। দর্জির ইউনিয়ন, মিঃ প্রধানের ভোট, কোম্পানির বোনাস সবার সব সমস্যা না হয় মিটল, তার সমস্যা মিটবে কি। চোঁখ বুঁজে কাত হয়েও অশ্বিনী একটু মুচকে হাসে। তার সমস্যা না মিটলে তো ম্যানুফ্যাকচারিংও হবে না, গুদামও খুলবে না, ডেসপ্যাচও হবে না। আজ গোলাপ পকেটে কিছু পাবে না। কাল বা পরশু অনেক মোটা খাম পাবে। রাত্রিতে নোট না দেখলে বুঝি গোলাপের ঘুম আসে না। কাল বা পরশু গোলাপ খুব ঘুমোবে। আজ গোলাপের অনিদ্রা। আসুক, গোলাপ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলায় গোলাপ অশ্বিনীকে ডাকল, "বড়বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, বসে আছেন, তাড়াতাড়ি ওঠো।"

খাটের ভেতর দিকে পাশ ফিরে অশ্বিনী শুয়ে ছিল। সে মাথাটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বড়বাবু? আমার কাছে?" তারপরই তার সব কথা মনে পড়ল। অশ্বিনী বিছানায় উঠে বসলে গোলাপ ঘর ছেড়ে চলে যায়। এখান থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে বাইরের ঘরে বড়বাবু বসে। বড়বাবু সবদিক থেকেই অশ্বিনীর জ্যেষ্ঠ। এ-পর্যন্ত বড়বাবু তার বাড়িতে আসেন নি। সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া কারো বাড়িতেই যান না। স্বাভাবিক সময়ে অশ্বিনীর দৌড়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করা উচিত। অশ্বিনীর পক্ষে এখন সেটা সম্ভব নয়। মুখ-হাত ধুতে অন্তত কিছুটা সময় লাগবে।

গোলাপকে বড়বাবুর অভ্যর্থনার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে ভেতরে যেতে যেতে অশ্বিনীর এটাও মনে পড়ে যায় কাল রাত্রিতে এই অবস্থাটা কল্পনা করেছিল—সে ঘুমিয়ে অথচ বাগানের সব কাজকর্ম বন্ধ। বড়বাবু বাইরের ঘরে বসে অশ্বিনীর চটির শব্দ শুনতে পান নিশ্চয়ই। সেটা, অশ্বিনীর এই সদ্য ঘুম থেকে ওঠা অবস্থাতেও, খারাপ লাগে না।

গোলাপ চা তৈরি করে ক-টা বিস্কুট নিয়ে বাইরের দিকে রওনা দিয়েছে। "তুমি গিয়ে বস, আমি যাচ্ছি"—যত অপ্রয়োজনীয় শোনাক, এ-কথাটা বলে অশ্বিনী আবার বাথরুমের দিকে এগোয়।

বাইরের ঘরে যখন বড়বাবু বসে আর গোলাপ যখন তাকে সঙ্গ দিচ্ছে তখন ভেতরের এই ঘরে অশ্বিনীর চটি যেন আজ কলরব করে

চলে। বাথরুমে মুখ ধুতে ধুতে অশ্বিনী ঠিক করে ফেলেছে যে বড়বাবুর সব প্রশ্নের জবাবে সে জানিয়ে দেবে তার কিছু করার ছিল না, তার বড় অফিসার কাল রাত্রিতে দার্জিলিঙে এসে বসে আছে। যে টাকা-পয়সা খরচ করে ঘরটা সাজানো-গোছানো তার কিছু অংশ বড়বাবুর হাত দিয়েই তো আসা। আর বড়বাবুকে সেখানে অন্তত পনর মিনিট অপেক্ষা করার পর অশ্বিনীর এই সম্ভাষণ শুনতে হয়— "আপনি আবার এই সকালে এতটা আসতে গেলেন কেন, আমি তো যাচ্ছিলাম-ই।" গোলাপ উঠে যায়। গত রাতে যে-চেয়ারটাতে দর্জি বসেছিল, সেটাতে অশ্বিনী গিয়ে বসে। চেয়ারটায় যেন তাকে আঁটে না, তাই সে বাঁ-দিকে সরে দু-পা অনেকখানি ছড়িয়ে, একটার ওপর একটা চড়িয়ে দেয়। দুজনার বসার আসনটিতে এক কোণায় বড়বাবু বসে। অশ্বিনীকে একটু কোণাকুণি কথা বলতে হয়।

বড়বাবু কোনো কথা শুরু না করায় অশ্বিনী বার কয়েক চিবুক কপাল হাতিয়ে ভাবতে শুরু করে সে নিজে থেকেই বলে দেবে কিনা। কিন্তু তারই বা দরকার কি আগ্‌বাড়িয়ে কথা বলার— এই ভেবে অশ্বিনী নিজের ঘর নিজেই দেখতে থাকে আর তখন তার সন্দেহ হয় বড়বাবু এতক্ষণ এই সব জিনিসের দাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যোগ করে অশ্বিনীর জীবনযাত্রাকে তিনি কোথায় তুলেছেন তার একটা আন্দাজ নিয়েছেন। কিন্তু বড় অফিসার যদি দার্জিলিঙে এসে বসে থাকে তাহলে কোম্পানিকে আর নিজেকে বাঁচাবার জন্য অশ্বিনীর কী-ই-বা আর করণীয় ছিল।

আড়চোখে অশ্বিনী বড়বাবুর দিকে তাকায়। বডবাবু দরজার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। খাম্পা নর্তক যেন বড়বাবুর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে। রাস্তা দিয়ে দু-একজনের ওঠা-নামার ধ্বনি শোনা যায়। অশ্বিনী একবার হাই তোলে, ঘুমটা হয়তো আরো মিনিট পনের-বিশ হতো।

গোলাপ আসে। দু-কাপ চা রাখে। বড়বাবু বল্লেন, "আমি

তো আর চা খাব না বৌমা।" গোলাপ চা তুলে নিয়ে যায়। গোলাপের কি আর একবার অনুরোধ করা উচিত ছিল। "খান না, এক কাপ", অশ্বিনীই বলে।

পার্টিশনের পাশে গোলাপ না ঘুরে ঘাড় ফেরায়।

"না না, আমি এমনিতেই তো কম চা খাই।" গোলাপ চলে যায়।

"আপনাদের এটুকু কোয়ার্টারে কষ্টই হয়"—বড়বাবু পর্দার দিকে তাকিয়ে বলেন।

"না, না, অসুবিধে আর কি, আমাদের তো বাড়তি লোক নেই, দিব্বি চলে যায়।"

অশ্বিনীর সন্দেহ হতে শুরু করে সকালে গোলাপ চিঠিটা পাঠিয়েছিল তো? সে তো ঘুম থেকে উঠে তাকিয়ে দেখেও নি চিঠিটা আছে কি নেই, গোলাপকেও জিজ্ঞাসা করে নি। তবে কি বড়বাবু সামাজিকতা করতেই এসেছেন। সেটা কেমন বেখাপ্পা ঠেকলেও, যদি তা-ই হয়, তাহলে অশ্বিনীর আর একটু আপ্যায়ন করা নিশ্চয়ই উচিত ছিল। এটা মনে হওয়ামাত্র, অগ্রপশ্চাৎ না মিলিয়ে অশ্বিনী বলে বসে, "আপনাকে একটু ছানা করে দেবে?"

বলার পর তার মনে হয় যদি নোটিশের ব্যাপারেই বড়বাবু এসে থাকেন, তাহলেও ছানার কথাটা এমন কি খারাপ। বড়বাবু-র "না না" শুনে অশ্বিনীও বাইরের ঘরের পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বড়বাবু পকেটে হাত ঢোকায়, ধীরেসুস্থে, খানিকটা সময় নিয়ে। বড়বাবু যদি টাকা দিয়ে বসেন তাহলে অশ্বিনী কী করবে সেটাই সে ভেবে রাখে নি। টাকাটা সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় এ-ভাবে দেনাপাওনার সম্পর্কে অশ্বিনী ছেদ টানছে। এ-মানে অশ্বিনী বোঝাতে চায় না। যদিও কিসের দেনা, কার দেনা, কিসের পাওনা, কার পাওনা—এ-কোনো কিছুই তার জানা নেই। বড়বাবু পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটা বের করে দু-কুচি মিষ্টি সুপুরি মুখে দেন,

অশ্বিনীর দিকে এগিয়ে দেন। অশ্বিনী তেলোর ওপর দু-কুচি সুপুরি নেয়। "খোকনকে দেখছি না।"

"রোজ সকালে দাজুর সঙ্গে বাজারে যায়, আসবে এখুনি"— অশ্বিনীর কথা শেষ হওয়ার আগেই বড়বাবু বলে বসেন, "কাল রাত্রিতে কি আপনার এখানে দর্জি এসেছিল?"

"না তো। কেন?" অশ্বিনী ভাবে তার জবাবটা এমন হল যে বড়বাবু বুঝে গেলেন সমস্ত ব্যাপারটাই দর্জির মাথা থেকে এসেছে। বলা উচিত ছিল—হ্যাঁ, এসেছিল, তাতে আপনার কি? অশ্বিনী যোগ করে দেয়—"হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?"

"না। এমনি। হঠাৎ একেবারে সাতসকালে দাজুর হাত দিয়ে নোটিশ ধরিয়ে দিলেন? কালও তো কিছু বললেন না। বাগানের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে। এখন একদিনের প্রোডাকশনের যা দাম—একটা দিন লস্ হলে কোম্পানিকে আর মাথা তুলতে হবে না।"

বড় অফিসারের কথাটা এখুনি বলা উচিত কিনা বুঝতে না পেরে অশ্বিনী বলে—"তা আমি কি করবো বলুন, আমার কাজ তো করতে হবে।" অশ্বিনী একটু রূঢ় হতে চেষ্টা করেও ভাষা যোগাতে পারে না।

তার বদলে তাকে শুনতে হয়, "আপনি তো অনেকদিন ধরেই জানতেন। প্রথম থেকে বললেই একটা ব্যবস্থা হতো, এখন সিজনের একেবারে শেষে, তা-ও আবার ইউনিয়ন-টিউনিয়ন নিয়ে যা-সব ঝামেলা। তাই মনে হলো, হয়তো দর্জির বুদ্ধিই,—গোলে হরিবোল করে দেয়া সব।"

"আপনাদের বাগানের কোনো ব্যাপারস্যাপারে আমি নেই। ইউনিয়ন-টিউনিয়ন বুঝি না"—বড়বাবুর কথার পাল্টা অশ্বিনী বেশ কাটাকাটাই শুরু করে বটে—"কাল রাত্রিতে খবর পেলাম আমার অফিসার এসেছেন"—এটুকু যোগ করায় অশ্বিনীর কথাবার্তা কেমন গোলমাল হয়ে যায়—"আপনাদের বাঁচাবার জন্যই এ-নোটিশ

আমাকে দিতে হল"—বড়বাবুর কাছে কৈফিয়ত দিয়ে বসে অশ্বিনী-যে-বড়বাবুকে পনর মিনিট বসিয়ে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য তার সযত্ন নানা আয়াস।

বড়বাবু অশ্বিনীর দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার অফিসার এসেছেন, কে বললো।"

অশ্বিনী চুপ করে থাকে। কিন্তু এখনই যদি প্লেনভিউ বাগানটার মাল ওজন করা যায় তাহলে যে সবার বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা আর কোম্পানির বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের হয়ে যাবে, কয়েকজন গ্রেপ্তার হবে—সেজন্য তো বড়বাবুকে একটুও ব্যতিব্যস্ত দেখায় না। বড়বাবু এবার নিশ্চয়ই প্রস্তাব দেবেন যে নোটিশ আছে থাকুক, কিন্তু মনপুরানের মালটা মনপুরানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থাটা যেন অশ্বিনী করে। এ-প্রসঙ্গ কাল দর্জির সঙ্গে যে-ওঠেনি তাতে ভালোই হয়েছে। অশ্বিনী চায় না যে দর্জি বা আর কারো সঙ্গে সে সম্পূর্ণ এক হয়ে যায়। হয়তো দর্জি বড়বাবু সবাই-ই ভেবে রেখেছে যে ঝামেলা মিটে গেলে যেমন চলছিল আবার তেমনি চলবে। তেমন চলাবার জন্যই তো এত কাণ্ড। সে যা চলবে চলুক। অশ্বিনীকে এখুনি স্থির করে নিতে হবে যে মনপুরানের মাল সে বের করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে কিনা। বড় অফিসারের প্রসঙ্গটা বড়বাবু নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করেছেন। বিশ্বাসই করুন আর অবিশ্বাসই করুন, বাগান ভর্তি বে-আইনী মাল রেখে যে-কোনো মুহূর্তে সবাইকে গ্রেপ্তার করাবার সুযোগটুকু অশ্বিনীর হাতে রেখে, কোম্পানি কোনো ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পা বাড়াবে না। কোম্পানি অশ্বিনীর সঙ্গে আলাদা ব্যবস্থা করে মালটা আগে সরাতে চায়। তারপরে সবার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মাল সরাতে দেবে কিনা এটা অশ্বিনীকেই ভেবে ঠিক করতে হবে। নোটিশ যখন দিয়েছে তখন সমস্ত মাল ওজন করে নতুন রিপোর্ট দিতেই হবে। কোম্পানি চাইবে ওজন হোক, রিপোর্ট হোক—যে সব ঠিক আছে। তার

আগে অশ্বিনী চোখ বুজে থাকুক, মনপুরানের মাল মনপুরান চলে যাক। তাহলে এখুনি ট্রাকে করে মাল পাঠিয়ে দিতে হয়। অশ্বিনী এটুকু শুধু সাহায্য করবে যে মাল বেরিয়ে যাওয়ার পর সে ফ্যাক্টরিতে ঢুকবে। তার চাইতে ভালো ব্যবস্থা, অশ্বিনী নোটিশটা এখন ছিঁড়ে ফেলুক। মনপুরানের মাল মনপুরানে পৌঁছে যাওয়ার পর নোটিশ দিক। সাহেবরা আর বড়বাবু ছাড়া কেউ তো এখনো নোটিশের কথা জানে না। আর অশ্বিনী যদি নোটিশটা ফেরত নিয়ে নেয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। এতক্ষণে অশ্বিনীর মনে হয় তার উচিত ছিল কাল রাত্রিতে বড়বাবুকে জানিয়ে রাখা যে সে আজ সকালে নোটিশ দেবে।

কিন্তু বড়বাবু কোনো প্রস্তাব দেন না। কোনো কথাও বলেন না। যেন বড়বাবুর জানাই আছে কী কী কথাবার্তা হতে পারে, কী কী সিদ্ধান্ত হতে পারে। কাল রাত্রিতে বড়বাবুর জানা থাকলে, মনপুরানের মাল এ-বাগান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর নোটিশ পড়তো। বড়বাবু বসে যেন অশ্বিনীর সিদ্ধান্তটুকু জেনে চলে যাবেন অথবা নিজের সিদ্ধান্তটা জানিয়ে চলে যাবেন।

অশ্বিনী কথা বলতে থাকে, "আপনাদের ইউনিয়ন-টিউনিয়নের ব্যাপারে এখন আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু না হয়। কাল রাত্রিতে খবর পেলাম মিঃ প্রধান, এখানকার এম্.এল্.এ, তিনি নাকি ফোন করে আমাদের বড় অফিসারকে আনিয়েছেন। আপনাদের বোনাস, ইউনিয়ন এই সব ঝামেলা মিটে গেলে অফিসার নাকি আর বাগানে আসবেন না, আর না-মিটলে নাকি উনি এসে সব ওজন করাবেন, হিসেবপত্র দেখবেন। আমি তো কাল রাত্রিতেই আপনার ওখানে গিয়ে নোটিশ দিয়ে আসছিলাম,"—কিন্তু তাহলে তো মনপুরানের ইউনিয়ন দর্জির হাতে আসতো না—এতোক্ষণে সে কথাটা অশ্বিনীর খেয়াল হয়।

"মিঃ প্রধানকে আপনি চেনেন ?"

"হ্যাঁ। আমার সঙ্গে পরিচয় আছে। আমার বড় শ্যালিকার সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়।" একটু বিরতির অবকাশে অশ্বিনী আরো জুড়ে দেয়, "সেই সুবাদে খবরটা তো আগে পেয়েছি। নইলে আপনাদের রাজায়-রাজায় যুদ্ধে আমার চাকরিটা এতোক্ষণে চলে যেত।"

"কিন্তু উইদারিং হাউসের পাতিগুলো নষ্ট হবে, আজকের যে পাতি তোলা হবে সেটাও নষ্ট হবে, ফার্মেন্টেশনের চা নষ্ট হবে, প্রসেসিং-এর চা নষ্ট হবে।"

"আজকে বাগান বন্ধ রাখলেই হয়।"

"কোম্পানির একটা গুডউইল নেই? তার চাইতে পাতি তুলে খাদে ফেলে দেবো। কিন্তু কথাবার্তা চলতে থাক, ম্যানুফ্যাকচারিং-ও চলুক, ডেসপ্যাচটা বন্ধ রাখলেই তো হয়।"

"কাল রাত্রিতে যা খবর পেয়েছি সেই অনুযায়ী কাজ করেছি। আজ সকালে ব্যাপারটা খানিকটা না দেখে এগোই কি করে বলুন? যাতে আপনাদের কোনো কিছুর ক্ষতি না হয় সে আমি দেখব। সুযোগ পাওয়া মাত্র ডেসপ্যাচটুকু বন্ধ রেখে বাকিগুলো খুলে দেব।"

"ফ্যাক্টরিবাবু তো বলছিলেন বেলা দশটার মধ্যে ফার্মেন্টেশনের চা তুলতে না পারলে চা পচে যাবে।"

"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি তো, দেখছি।"

"তাহলে আপনি আসুন"—বড়বাবু উঠে দাঁড়ান, মনপুরানের পাতি সম্পর্কে একটিও কথা না বলে। চেয়ার ছেড়ে উঠে, দরজার দিকে পা বাড়াবার আগে, বড়বাবু বাঁ দিকের পকেট থেকে একটা লম্বা খাম বের করে সেণ্টার টেবিলটার ওপর রেখে বলেন, "বৌমাকে তুলে রাখতে বলুন, পাঁচ হাজার আছে।" এর জোরেই বড়বাবু এতো কম কথা বলেও সমস্ত কাজটা করিয়ে নেবার ব্যবস্থা ঠিক করে যেতে পারলেন। কিন্তু অশ্বিনী নিজেই জানে না ব্যাপারটা কোনদিকে গড়াবে, সে কী করবে, তাতে কার কাজ হবে আর কার কাজ হবে

না। দর্জি বা মিঃ প্রধানের কাজে লাগছে নাকি কোম্পানির, সেটা পরিষ্কার না হলে অশ্বিনী কোম্পানির কাছ থেকে আগাম টাকা নিতে পারে না, পরন্তু যখন জানেই না আজ সারাদিন তাকে কী কী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কাল রাত্রিতে দর্জি তো তার হাতে মুসাবিদাটা একেবারে টাইপ করে ধরিয়ে দিতে পেরেছে শুধু এই আঁচটুকু দিয়ে যে, অশ্বিনী যদি নোটিশ না দেয় তাহলে অশ্বিনীর বড় অফিসারকে দিয়ে অশ্বিনীসহ কোম্পানির ওপর নোটিশ ঝাড়ানো যায়। বড় অফিসার দার্জিলিঙে এসে বসে নেই—এটা তো আর এতো নিশ্চিত বলা যায় না, বিশেষত এই পুজোর আগের মনোরম দার্জিলিঙ! নইলে দর্জি নোটিশটা টাইপ করে আনে কোন আত্ম-বিশ্বাসে। মিঃ প্রধানের উকিল-বন্ধুর বেনামিতে সেই অফিসারেরই মুসাবিদা যে নয়—সেটাই কি এতো স্থিরভাবে বলা যায়। সুতরাং নোটিশের ব্যাপারে অশ্বিনা শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাতে যদি দর্জি মনপুরানের ইউনিয়ন হাতাতে পারে হাতাক গে। কিন্তু এখন সকালবেলায় পাঁচ হাজার টাকার প্যাকেট ঘরে রেখে দিয়ে দুপুরে বা বিকেলে কি তাকে নোটিশ প্রত্যাহারের জন্য বড়বাবুর টাইপ করা কাগজে সই করতে হবে, নোটের নম্বরগুলো ভিজিলান্স বা পুলিশে চলে যাওয়াটুকু আটকাতে। অশ্বিনী বলে ফেলতে পারে না যে টাকা আমি এখন নেব না, "টাকাটা আপনি এখন রাখুন বড়বাবু, পরে ও সব হবে" যেন পরে অশ্বিনী হিসেব করে তার বিল দেবে। বড়বাবু একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে অশ্বিনীকে দেখেন, সাতসকালে বড়বাবু ইনস্পেক্টরের বাড়িতে এসে ব্যবস্থা করেছেন—এ-কথা বাগানশুদ্ধ লোক ইতিমধ্যে জেনে যাবার পরও টাকাটা না-রাখায় অশ্বিনীর কোন লাভ? নাকি অশ্বিনী সম্পূর্ণতই অন্য গাছে নৌকো বেঁধে ফেলেছে। "পরে যা কথাকার্তা হবে সে হবে, এটা রেখে দিন না।" সাতসকালে অশ্বিনীর বাড়ি আসার দীনতাটুকু ছাড়া এতোক্ষণের ভেতর এই প্রথম বড়বাবুর কথায় একটু বিনয় প্রকাশ

পেল। নোটিশটা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে অশ্বিনী-ই দিয়েছে, বড়বাবু সত্যি প্রার্থী। পাছে মনপুরানের মজুর-কর্মচারীরা বুঝে ফেলে যে বাগানটা একটা ডিভিশন হয়ে যাচ্ছে, ফ্যাক্টরি উঠে যাচ্ছে, তাই সেন্ট্রাল এক্সাইজকে কোম্পানি চিঠিটা দিতে পারে নি, নইলে এ তো একটা চিঠির ওয়াস্তা যে এখন থেকে অমুক ফ্যাক্টরি আমি বন্ধ করে দিলাম—তাহলেই প্লেনভিউয়ের ফ্যাক্টরিতে বসে মনপুরানের হিসেবে সই মারতে ইনস্পেক্টর বাধ্য থাকবে। সমস্তটাই যখন এখন প্রকাশ্যে এসে গেছে তখন কোম্পানি হয় আগামীকাল চিঠি দেবে, নইলে মনপুরানের মাল মনপুরানে চলে যাবে। অশ্বিনীও ঘটনার শেষতম স্তর পর্যন্ত তার আপাতস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। জন্ম থেকে এতগুলো বছর যার কেটেছে বাপমরা সংসারে, কখন মায়ের নাকি-কান্না গোপনে বা জ্যাঠামশাইয়ের প্রকাশ্য উপদেশ শুরু হবে বা পরিবারের দায়দায়িত্ব তার ঘাড়ে এসে পড়বে—সেই হিসেব কষে আর তা থেকে নিজেকে ক্রমাগত বাঁচাতে বাড়ি থেকে বেরবার বা বাড়ি ফেরার সময় প্রায় মিনিটের হিসেব কষে স্থির করে, এমন-কি রাত্রির সম্পূর্ণ গোপনতাতেও স্ত্রীকে সামান্য সুযোগ না দেয়ার ফিকির বের করতে, সে এখন জ্যাঠামশাইয়ের বারোয়ারি সংসারের টিনের চালা ছেড়ে কোম্পানির কোয়ার্টারে ওয়াড্রোব আর খাম্পা নর্তক সাজিয়েছে বলেই তো আর সব হিসেব-নিকেশ ভুলে মেরে বসে থাকে নি। হিসেব অশ্বিনীর একবারই ভুল হয়েছিল—খোকনের জন্মের বেলায়। তারপর থেকে সে আর নিজের রক্তকেও বিশ্বাস করে না—পাঁচ হাজার টাকার প্যাকেট তো দূরস্থান। টাকাটা সে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিতে পারছে না বোঝামাত্র বড়বাবুর সঙ্গে তার এই আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের কথাবার্তায় অশ্বিনীর গলায় প্রথম একটু জোর প্রকাশ পেল, যে-জোর এতোক্ষণ নানাভাবে দিতে চেয়ে বারবার সে বকেই যাচ্ছিল "টাকাটা আপনি নিয়ে যান বড়বাবু, আমি এখন রাখব না।" দরজার কাছ থেকে ছ-সাত

পা হেঁটে সেণ্টার টেবিলের কাছে ফিরে প্যাকেটটা নিয়ে পকেটে রেখে, আবার ছ-সাত পা হেঁটে দরজার কাছে এসে বেরিয়ে যাবার সময় বড়বাবুকে বলে যেতে হয়, "তাহলে দেখবেন ভাই, একটা ব্যবস্থা করুন তাড়াতাড়ি।"

বড়বাবুর পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে অশ্বিনী ভেতরে যায়, তাকে এখুনি ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে।

দুই

খাবার টেবিলে বসেই অশ্বিনীকে দাড়ি কামাতে হয়। এখানকার বাথরুমে আলো এতো কম যে দাড়ি কামানো যায় না। তাই রোজ দাড়ি কাটার সরঞ্জাম নামানো আর তোলার হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। প্যান্টের ভেতর জামা গুঁজতে গুঁজতে পায়ে জুতো গলিয়ে অশ্বিনী খাবার টেবিলে খেতে আসে। গোলাপ টেবিলে খাবার সাজিয়ে দেয় কয়েকটি ডিসে। একটি বড় ডিসে লুচি, ছোট ডিসে তরকারি, আর একটি ডিসে কাঁচকলা আর ট্যাঁড়স সিদ্ধ, আর একটি ডিসে ছানা, একগ্লাস মিল্ক ফুড জাতীয় কিছু। এই সমস্ত খাবার গোলাপ সাজিয়ে দিতে দিতেই প্যাণ্ট আর জামার সবগুলো বোতাম আটকানো হয়ে যায়। অশ্বিনী সঙ্গে সঙ্গে দুহাতেই খাওয়া শুরু করে। গোলাপ একটা ছোট্ট তোয়ালে অশ্বিনীর কোলের ওপর ফেলে দেয়, তারপর মাটির ওপর বসে অশ্বিনীর জুতোর ফিতে বেঁধে দিতে শুরু করে। দাজুর সঙ্গে ফিরে খোকন দৌড়ে ঢুকে বাবাকে জড়িয়ে ধরে। "বাবা আঁ আঁ"—খোকন হাঁ করে। চামচ করে একটু ছানা তুলে অশ্বিনী খোকনের মুখে তুলে দিতে গেলে খোকন ঠোঁট বন্ধ করে ফেলে। আঙুল দিয়ে লুচিটা দেখিয়ে বলে, "বাবা আঁ আঁ।" "ছেলের মুখ আছে" গোলাপ ফিতে বেঁধে দিয়ে উঠে। অশ্বিনী খোকনের মুখে লুচি-তরকারি ঢুকিয়ে দেয়।

ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার জন্য অশ্বিনীর একটু হয়তো ব্যস্ততা থাকে

তাই বলে সে খানিকটা ঠাণ্ডা মিল্কফুডও হড়হড় করে খায় না। মিল্কফুডের শেষ চুমুকটা দিয়ে কোলের তোয়ালেটা দিয়ে মুখটা মুছে উঠতে উঠতে অশ্বিনী বলে, "আমার জন্য তোমরা দেরি করো না, অনেক গোলমেলে ব্যাপার আছে, একেবারে সন্ধ্যেতেও ফিরতে পারি।"

"তাহলে একবারে ভাত খেয়ে বেরলেই পারতে"—গোলাপ অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করে, "কি পরবে, কোট না কার্ডিগান?"

"কোটটাই দাও"—গোলাপের মেলে ধরা কোটটার দুই হাতার ভেতর হাত দুটো গলিয়ে কোটটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠিক করে, অশ্বিনী বেরিয়ে যায়।

চড়াইটুকু উঠে মাঠে পা দিতেই অশ্বিনী বুঝতে পারে অতবড় মাঠের চারপাশে সাহেবরা আর বাবুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে—কোনো গতি নেই, অন্যদিন যেমন থাকে। মনপুরানের জন্য যে উইদারিং র‍্যাকগুলো এ-বছরই বসানো হলো সেগুলোতে রঙ দেয়া হয় নি। উইদারিং হাউসের পুরনো রঙের সঙ্গে নতুন কাঠ আর জালের তার ঝকমক করছে। এই উইদারিং র‍্যাক বানাতে বাগানবাবু আর ফ্যাক্টরিবাবুর একটা ঝগড়ার যদি দরকার হয় তাহলে দর্জি আর কোম্পানির ঝগড়াতে ফ্যাক্টরিই বা বন্ধ হবে না কেন। মাঠের মাঝামাঝি এসে অশ্বিনী বোঝে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ ইঞ্জিনের শব্দ প্রায় উঠছেই না যেন। শুধু পাওয়ার হাউস চলছে। অথচ স্বাভাবিক ভাবেই ইঞ্জিনের শব্দ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হওয়ার কথা। সাহেবরা আর বাবুরা চারদিকে ছড়িয়ে, তাদের গতি নেই, তাদের সেই গতিহীনতা যেন ফ্যাক্টরির স্বাভাবিক শব্দ না থাকার ফলেই এতো স্পষ্ট। ফ্যাক্টরি-গেটের সামনে ম্যানেজার দুই পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, রাস্তার মাঝখানে আরো দুই সাহেব, পেছনে ফ্যাক্টরিবাবুসহ আরো দু-একজন বাবু। মাঠের কোণের দিকে বাগানবাবু ও তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টরা। তাদের এতক্ষণ ব্লকে থাকার কথা। কিন্তু পাতির

ভবিষ্যৎ কি তা না জেনে পাতি তোলাবার উৎসাহ থাকে? বড়বাবুর বাড়ির সামনে মোড়টাতে মাটির ওপর আর উইদারিং হাউসের সিঁড়ির ওপর কয়েকজন বাবু বসে। কোনো মজুর আশেপাশে কোথাও নেই। সাহেবদের গাড়িগুলোও নেই।

মাঠটা শেষ হতে হতেই অশ্বিনীকে ভেবে নিতে হয় সে ওখানে পৌঁছে কি করবে। নিয়ম অনুযায়ী এখুনি তাকে ওজন শুরু করতে হয় বা ফ্যাক্টরি আর উইদারিং হাউসের দরজার তালা সিল করে দিতে হয়। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবাই তো তার জন্যই অপেক্ষা করছে। কিন্তু দুটি করণীয়ের কোনোটি শুরু করেই অশ্বিনী ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ব্যবস্থার পথ রোধ করতে চায় না। কিন্তু সে তো আর ওখানে বলতে পারে না যে ঘটনার গতির জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে। উইদারিং হাউস থেকে এক ঝলক হাওয়ায় চা পাতির পাতলা গন্ধ ভেসে আসে।

অশ্বিনীকে দেখেই ম্যানেজার নিজেই এগিয়ে আসেন। ম্যানেজারের ভাঙা ভাঙা ইংরেজি—জাতিতে স্কচ। নেপালি, হিন্দি, বাঙলা তিনটিই ভাষা বলতে পারেন। "হোয়াট ইজ্ দ্য ম্যাটার ইনস্পেক্টর, ইটস কোয়ায়েট আন্এক্সপেক্টেড"—ম্যানেজার দাঁড়ান, অশ্বিনীকেও দাঁড়াতে হয়। ম্যানেজার মাঠের ভেতর দিকে পা চালান, "বাট ইউ ডিড্ নো এভ্রিথিং, আও, তোমকো সাথ হামারা বাত হ্যায়"—অশ্বিনী সাহেবের পাশেপাশে আস্তে-আস্তে হাঁটতে শুরু করে। "বড়বাবু সুড্ হ্যাভ ইনফরম্ড্ ইউ আরলিয়ার, বড়বাবু তোমকো কুছ নাহি বোলা? ই তো একঠো খত্‌কো বাত্ হ্যায়, ম্যাটার অভ্ এ লেটার, ইউ কুড ইজিলি হ্যাভ দ্যাট লাস্ট নাইট। উই ডিড নট গিভ ইউ দ্যাট ফর ট্যাকটিক্যাল রিজ্‌নস্। ইট মাইট ক্রিয়েট মিস আন্ডারস্ট্যাণ্ডিং অ্যামাং দি পিপ্‌ল দ্যাট উই আর গোয়িং টু ক্লোজ আওয়ার মনপুরান ফ্যাক্টরি, দ্যাট্স্ অ্যাবসালউট লাই।"

এ-সব ব্যাপারে তদ্বির-তদারক করে যাবতীয় খবরাখবর অশ্বিনীকে দেয়ার বা অশ্বিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব বড়-বাবুর আর সেজন্যই ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়েছে বলে ম্যানেজার বড়বাবুর ওপর চটেছে এটা বুঝে গিয়ে অশ্বিনী চারপাশে তাকিয়ে কোথাও বড়বাবুকে দেখতে পায় না। আজ সকালে বড়বাবুর সঙ্গে তার কথাবার্তার সমস্তটাই বড়বাবু যদি সাহেবকে জানিয়ে না থাকতেন তাহলে ম্যানেজার নিজের হাতে অশ্বিনীর সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব নিতেন না। "আই অ্যাম নট ইনটারেস্টেড অ্যাবাউট লস অভ ওয়ান ডেজ ক্রপস, হ্যাং ইট, বাট ইউ নো আই হ্যাভ নো ইরেগুলারিটি ইন মাই ফ্যাক্টরি, দিস ইজ জাস্ট এ ম্যাটার অভ এ লেটার ইন্‌টিমেটিং ইউ দ্যাট উই আর হ্যাভিং মনপুরান পাতি ইন প্লেনভিউ ফ্যাক্টরি। আই ডোণ্ট নো হাউ এ্যান অ্যাকশন লাইক দিস ক্লোজিং অভ দি ফ্যাক্টরি কুড বি প্রেসিপিটেডেড অন্‌ সাচ এ স্মল ম্যাটার। বড়বাবু স্যুড হ্যাড মেইন্‌টেইন্‌ড্‌ কনটাক্ট উইথ ইউ। ডিড ন্‌ট্‌ হি?"

সাহেব এখন জানতে চায় বড়বাবু অশ্বিনীকে টাকা পয়সা দিয়ে আসছে কিনা। সে-কথার স্পষ্ট জবাব না দিয়ে অশ্বিনী বলে তাকেও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়, কিন্তু সে এমন কিছু করতে চায় না যাতে কোম্পানির কোনো ক্ষতি হয়, কিন্তু তাকে খানিকটা দেখতে হবে অবস্থাটা কি।

অশ্বিনী ইংরেজি কথা বলতে অসুবিধে বোধ করে ফেলে। এর আগে দু-একবার দু-একজন সাহেবের সঙ্গে আসা-যাওয়ার পথে বা কাজের ফাঁকে হয়তো তার কথা হয়েছে কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে স্বয়ং ম্যানেজারের সঙ্গে তার বিশেষ আলোচনা এই প্রথম। অশ্বিনী তাই হিন্দি-ইংরেজি মিশিয়ে বলছিল। ম্যানেজার অশ্বিনীর কাছে একবারও বলে নি যে কোম্পানি কোনো বেআইনী কাজ করেছে। এটা শুধুই একটা আইনী ব্যাপার। অশ্বিনীকে একটা চিঠি দিলেই

সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার থাকত। ম্যানেজারের কথা শুনে অশ্বিনীর যখন মনে হয় যে ব্যাপারটা ততবড় বেআইনী নয় বোধহয়, যতবড় বেআইনী বলে কাল দর্জি আর আজ বড়বাবু স্পষ্ট করে ও হাবভাবে বুঝিয়েছেন, ঠিক তখনই ম্যানেজার বলে বসেন—"আই উড্ হ্যাভ লাইক্ড্ টু মিট ইয়োর হায়্যার অফিসার্স, দেন হি কুড মেড থিঙ্স ইজিয়ার ফর ইউ। আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দ্যাট ইট ইজ নট পজিবল্ অন্ ইয়োর পার্ট টু টেক ডিসিসন্স্ হোয়েন ইউ হ্যাভ সাম ইন-ফরমেশন অভ ইয়োর ওন। বাট আর ইউ গোয়িং টু ওয়ে দি হোল থিং?"

ম্যানেজার জেনে নিতে চান অশ্বিনী কতদূর যাবে। অশ্বিনী বলে দেয়, "নো"। তারপর যদি ওজন করা পর্যন্ত যেতেই হয়, পরে দেখা যাবে। "অলরাইট" বলে ঘুরবার আগে অশ্বিনীর ঘাড়ে একটা হাত রেখে ম্যানেজার বলে বসেন যে এখন থেকে যাবতীয় যোগাযোগ অশ্বিনী যেন তার ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের সঙ্গে করে। ম্যানেজার নাকি বুঝতে পারছেন বড়বাবু অশ্বিনীকে সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত রাখে নি। ম্যানেজারও এই মর্মে তার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারকে জানিয়ে দেবেন।

তিন

এই কথাগুলি বলতে বলতে ম্যানেজার অশ্বিনীসহ মাঠের ভেতর থেকে ফ্যাক্টরির সামনে ফিরে আসেন। অতবড় মাঠের নানা কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন সবাই তাকিয়ে আছে কী হয়। আসলে তো অশ্বিনীর কিছুই করার নেই। সে ফ্যাক্টরি সিল করে নি। সিল করবে না। সে গুদামের চা ওজন করে নি। চা ওজন করবে না। সে উইদারিং হাউসের তালা সিল করে নি। সিল করবে না। সে কাঁচা পাতা ওজন করে নি। করবে না। কাল রাত্রিতে দর্জির এনে দেয়া একটা টাইপ করা কাগজে সে সই করেছে—

পাছে সই না করলে তার বড় অফিসারকে দিয়ে সই করানো হয়। সে আবার একটা টাইপ করা কাগজে সই করে দেবে—যদি সে সই না করলে তার বড় অফিসারকে দিয়ে সই করানোর আশঙ্কা থাকে। কিন্তু তার উদ্যোগহীনতা বোধহয় অশ্বিনীর নিজের কাছেও খুব প্রকট সত্য নয় বলে রাস্তায় উঠে তাকে একটা কাজ ভাবতে হয়। ফ্যাক্টরি-বাবুকে ডেকে সে বলে, "তালা খুলুন।" দারোয়ানকে ডেকে তালা খুলতে বলা, দারোয়ানের তালা খোলা আর ঢুকতে গিয়ে অশ্বিনীর ঘুরে এসে ম্যানেজারকে বলা যে সে ফ্যাক্টরিবাবুসহ ফ্যাক্টরিতে বসে আছে, কোনো কিছু করার দরকার হলে সে খবর দেবে, এখন সবাই যেতে পারে—সমস্ত মাঠটার চার কোণায় বিদ্যুৎ চমকের কাজ করে। অশ্বিনী বুঝতে পারে সে সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রে। গেটের একপাশে দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে ম্যানেজার থেকে সমস্ত সাহেবরা দাঁড়িয়ে। বাবুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাকিয়ে। অতবড় দরজার ভেতর দিয়ে অতবড় ফ্যাক্টরিতে অশ্বিনী একা ঢোকে। সারাক্ষণ এই ফ্যাক্টরি মানুষজনে এতো গমগম্ করে যে আজ অশ্বিনীকে দরজা পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় দুপাশে নানারকম মেশিন আর ছোট ছোট চায়ের স্তূপের মাঝখান দিয়ে ঝক্‌মকে সিমেন্টের গলি চলে গেছে লম্বা, এতো লম্বা যে শেষে মনে হয় সরু হয়ে গেছে। অশ্বিনী ফ্যাক্টরি-অফিস পেরিয়ে বাঁ দিকে দেখে সারি সারি বাক্স সাজানো আছে। প্রায় সিলিং পর্যন্ত ছোঁয়া দুসারি বাক্সের মাঝখান দিয়ে সরু গলি। অশ্বিনী এরকম একটা সরু গলির সামনে এসে দাঁড়ায়। তিরিশ ফুট উঁচু আর পঞ্চাশ ফিট লম্বা এই রকম এক-একটা লাইনে কতগুলি বাক্স আছে, প্রতিটি বাক্সে কত চা আছে, এই সাতটা লাইনে সবগুলি বাক্সে কত চা আছে সবটাই অশ্বিনীর মুখস্থ। অশ্বিনী ইনভয়েসে সই করার আগে একবার এখানে চোখ বুলিয়ে যায়। আজ অশ্বিনী একটা সরু গলির ভেতর ঢুকে পড়ে। ঢোকা মাত্রই নিজেকে খুব বেঁটে মনে হয়ে যায়। মাথায় টিউব আলো

জ্বলছে। ছায়া পড়তে পারছে না। যেন দৌড়ের ট্র্যাক বানানো আছে এমনিভাবে অশ্বিনী সেই দুপাশে চায়ের বাক্সের পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে হাঁটতে থাকে। অন্য কোনোদিন ঢুকলেও হতো কিনা কে জানে, অশ্বিনীর জুতোর শব্দ হতে থাকে। কিন্তু শব্দটা বাইরে বেরতে পায় না। যেন অশ্বিনীর পেছনে তাড়া করে ফেরে।

গলিটার বিপরীত কোণা থেকে একটা বিড়াল ম্যাও ম্যাও করতে করতে আসতে শুরু করলে অশ্বিনী এতটাই ঘাবড়ে যায় যে মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে তাকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে হয়। ফ্যাক্টরি-অফিসে ঢোকার আগে সে দারোয়ানকে বলে ফ্যাক্টরিবাবুকে পাঠিয়ে দিতে।

ফ্যাক্টরিবাবু এসে বসেন না, দাঁড়িয়ে থাকেন। অশ্বিনী বসতে বলে। "আপনার দুটো বাগানের যোগগুলো করে রাখুন তো, এমনি একটা শাদা কাগজে আর কাল পর্যন্ত যা ডেসপ্যাচ হয়েছে বাদ দিয়ে রাখুন। তৈরি থাক সব। বাইরে সবাই কি আছে এখনো?"

"না। আপনি ফ্যাক্টরিতে ঢোকার পরই তো বড় সাহেব সবাইকে সরিয়ে দিলেন।" "আপনাদের ফ্যাক্টরি-ওয়ার্কারদের কাউকে দেখলাম না তো, কেউ আসেই নি নাকি।"

"না, এসেছিল। আমরা বলে দিলাম আজ সকালের শিফ্ট হবে না। ওরা আবার একটার সময় আসবে। এমনিতেই তো এবার বোনাস নিয়ে ফ্যাক্টরি-মজুরদের সঙ্গে অন্যদের গোলমাল বেঁধেছে, তার ওপর ফ্যাক্টরি বন্ধ দেখে ওরাও খুব ঘাবড়ে গেছে। একটার মধ্যে ফ্যাক্টরি খোলা যাবে না?"

"না-হলে ফার্মেন্টেশনের চা নষ্ট হয়ে যাবে, না?"

"সে তো বারোটার ভেতরই তুলে না ফেললে চাগুলো বাঁচানো যাবে না। তার ওপর কাঁচা পাতিগুলোও র‍্যাক থেকে আনতে হবে। বাগান থেকেও পাতি আসবে।"

অশ্বিনী ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কখন কী হবে। তার বিপদের আশঙ্কা কেটে গেছে বুঝলে সে হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারত। কিন্তু সেটাও তো তাকে অন্যের মুখ থেকেই শুনতে হয়। "চলুন আপনার ফাঁকা ফ্যাক্টরি দেখে আসি"—যেন আগেরবার বিড়ালটা তাকে এমন ভয় দেখিয়েছে যে সে আর একলা যেতে ভরসা করছে না। ফ্যাক্টরিবাবু উঠে দাঁড়ান। অশ্বিনী আগে আগে। ফ্যাক্টরিবাবু একটু পিছে পিছে। এবার অশ্বিনী সোজা হাঁটে। "কোন্ ঝাঁঝরিতে কতক্ষণ চা রাখবেন তার কি কোনো নিয়ম আছে?" "নিয়ম আর কি, ও অভিজ্ঞতায়, মানে দেখতে দেখতে ঠিক হয়ে যায়" ফ্যাক্টরিবাবু অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দেয়। "এর ওপরই তো চায়ের শর্টিং" "হ্যাঁ-আ—।" আবার ম্যাও ম্যাও ডাকতে ডাকতে বিড়ালটা এসে ফ্যাক্টরিবাবুর দুই পায়ের ফাঁকের ভেতর দাঁড়িয়ে লেজ মোচড়ায়। অশ্বিনী কিছুটা দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফ্যাক্টরি-অফিসের দিকে ফেরে। ফ্যাক্টরিবাবু পা দিয়ে বেড়ালটাকে নিয়ে খেলে যেতে থাকেন। অশ্বিনীর মনে পড়ে আগে একদিন ফ্যাক্টরির ভেতর দিয়ে ফ্যাক্টরিবাবু মুঠো মুঠো চা তুলে দেখে এক-এক জনকে এক-এক রকম নির্দেশ দিতে দিতে অশ্বিনীকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। অশ্বিনীর মনে হয়েছিল চায়ের নিশ্বাস না নিলে ফ্যাক্টরিবাবু মরে যাবেন। ফ্যাক্টরির শ্মশানপুরীতে ফ্যাক্টরিবাবুর দুঃখ-বেদনা দেখা যাবে ভেবেই কি অশ্বিনী অফিস থেকে বেরিয়েছিল যে এখন এই ভেবে ফেরে—ফ্যাক্টরিবাবুর চা বা ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ওপর দরদ-টরদ সব ফালতু কথা, আসলে ও-সব কিছু ওঁর ভেতরেই নেই, সব অশ্বিনীকে দেখানোর জন্য। অশ্বিনীর ভাবনা সত্ত্বেও এই দৃশ্যটা অপরিবর্তিতই থাকে, অন্তত কিছুক্ষণ, আসমুদ্রহিমালয়ের সাংবিধানিক মালিকানা যে-সরকারের তার প্রতিনিধি শ্রীঅশ্বিনী কুমার সরকার তার এক সইয়ের জোরে এত বড় ফ্যাক্টরির চাকা বন্ধ করে দিয়ে এখন ফ্যাক্টরির অফিসে পা-জোড়া আর এক চেয়ারে তুলে দিয়ে বসে আছে আর এই ফ্যাক্টরির

উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব যার হাতে সেই প্রৌঢ় শ্মশানপুরী-ফ্যাক্টরির ঝক্‌ঝকে মেঝেতে একটা বিড়ালকে দুই পায়ের ফাঁকে নিয়ে খেলে যাচ্ছেন। ফ্যাক্টরির দরজায় দারোয়ান।

চার

বেলা দশটা নাগাদ মনপুরান থেকে একটা মিছিল নিয়ে দর্জি ফ্যাক্টরির মাঠে ঢোকে। দর্জির আশেপাশে আরো দুচারজন বাবু ছিল। কিন্তু পুরো মিছিলটাই প্রায় মজুর আর কামিনদের। প্লেনভিউ ফ্যাক্টরির মাঠে ঢুকে মিছিলটা যেন ইতস্তত করে একটু। দর্জি মিছিলের সামনে সামনে এগিয়ে আসছিল। সে হঠাৎ পেছন ঘুরে মিছিলের মুখোমুখি তীব্রস্বরে চিৎকার করে ওঠে, "মনপুরান পাতি প্লেনভিউয়ের গুদাম থেকে বের হচ্ছে না হবে না।" এই একটি শ্লোগানেই মিছিলটা যেন প্রাণ পেয়ে যায়। তখন তারা প্লেন-ভিউয়ের ফ্যাক্টরি দখল করতে যাচ্ছে এমনি ভাবে মাঠ বরাবর ফ্যাক্টরির দিকে প্রায় ছুটতে থাকে।

এতটা পাহাড়ী পথ ওঠা-নামা করে আসার শ্রমে মিছিলের সেই শ-পাঁচ মানুষের সকলেরই মুখে চোখে একটা দীপ্তি। ঘামের একটা আচ্ছাদনের ওপর আলোর আভা পড়ে সেই রক্তিমাভ গাল দেখায় যেন রাগে ফেটে পড়া। সমস্ত পোশাকই আঁটো-সাঁটো। ফলে সেই মিছিল যখন ফ্যাক্টরির দিকে এগোয় তখন তাকে প্রায় অপরাজেয় মনে হতে থাকে।

পরন্তু এই মিছিলটি উঠে এসেছে পুরনো অভ্যেস-জড়তা ছেড়ে, নতুন একটা দায়িত্ব নিয়ে। মাত্র চারদিন আগে প্লেনভিউয়ের ইউ-নিয়নের মজুররা ফ্যাক্টরির সামনে দাঁড়িয়ে যে-শ্লোগান দিচ্ছিল তাতে ছিল নিজের ওপর নিজের রাগ। তাদেরই ভেতরের একদল আর তাদের ভেতর থাকবে না—এ-রকম একটা আশঙ্কার সামনে দাঁড়িয়ে, —বাঘের মতো একটা উদাহরণস্থানীয় প্রাণীও ঘুমোবার সময় মাছি

বা মশার বারবার ঘুরে ফিরে আসাতে শেষপর্যন্ত নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে যেমন তর্জন-গর্জন শুরু করে,—তেমনি,—মজুরদের সেদিনের শ্লোগান ছিল নিজেদের বিরুদ্ধে। তাই সেদিন তারা ফ্যাক্টরি-মজুরদের সামনে দাঁড়িয়ে রাগে ঘৃণায় ফেটে পড়তে চাইছিল। আর যে মূহূর্তে ফ্যাক্টরি-মজুরদের গলা থেকে, যত ক্ষীণই হোক না, একটা স্বর বেরলো তখন-ই রাগে গরগর চুলছেঁড়া হাতকামড়ানো সেই মিছিলই যেন উল্লসিত হয়ে ওঠে। জলের স্বভাব যেন মিছিলের, খাত খুঁজে খুঁজে, পেয়ে, বয়ে যাওয়া। আবার সেই মিছিল যখন ভেঙে যায়, ছড়িয়ে যায়, ঘরে ঘরে একা হয়ে যায়, তখন কেন্নোর স্বভাব যেন মজুরের, এমন গুটি পাকিয়ে যায় যে প্রায় সহস্রপদ হয়েও আর চলতে পারে না। তাই তিনদিন পর পুরনো ইউনিয়ন ভাঙার মিটিঙে হাজিরা দিয়ে গুটি পাকিয়ে থাকে।

কিন্তু মনপুরানের মিছিলটার সামনে একটা লক্ষ্য অতি বাস্তব। তাদের ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেলে, কোম্পানি যতই বলুক, তাদের এতগুলো হাত বন্ধ হয়ে যাবে। মজুর হিসেবে কোম্পানি তাকে পাতি টিপতে, ফাড়ুয়া চালাতে পাঠাতে পারে। কিন্তু ফ্যাক্টরির যে-মজুর বছরের পর বছর চেষ্টা করে করে শুধু হাত চালাবার বদলে নাক আর চোখ আর কান চালাতে শিখেছে—কোথায় একটা বিদঘুটে আওয়াজ উঠছে, পাকা আপেলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কিনা, ভেজা পাতির রং পুরনো তামার পয়সার মতো হয়ে উঠেছে কিনা—সে কি করে ফাড়ুয়া নিয়ে বা শুধু নিজের দশটা আঙুল নিয়ে ফিরে যাবে বাগানের ব্লকে ব্লকে। সুতরাং বাগানের পাতি বাগানে রাখতে হবে। আর তার জন্য প্লেনভিউ বাগানে মনপুরানের পাতি ঢোকা বন্ধ করে দিতে হবে। প্লেনভিউ বাগান থেকে মনপুরানের পাতি টেনে বের করতে হবে। প্লেনভিউ বাগান মনপুরানের মজুরদের কাছে খুব চেনা। সুতরাং সেখানে গিয়ে পাতিগুলো নিয়ে আসাটা খুব সম্ভব। এই মিছিলটা তৈরি হয়েছে সবার পক্ষে সমান একটা শত্রুর বিরুদ্ধে। সে

শত্রু সবার পক্ষেই এতদূর পর্যন্ত সমান যে মিছিলের সঙ্গে বাবুরাও চলে এসেছে, মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে দর্জির পাশে পাশে কেউ। বাকিরা, এমনকি বড়বাবুও পরে পিছে-পিছে। আর এই মিছিলটা রওনা হয়েছে পৌঁছনো সম্ভব এমন একটা লক্ষ্যের দিকে। মনপুরান থেকে প্লেনভিউ ক-মাইলই বা।

দর্জি ঠিক এই হিসেব কষেই এগিয়ে ছিল। যদি আঙুল দিয়ে মজুরদের সামনে লক্ষ্যটা দেখিয়ে দেয়া যায়—সে মজুরদের হাতে দূর-বীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই হোক অথবা লক্ষ্যস্থলটাকে অনেকখানি এগিয়ে এনেই হোক—আর যদি সবার পক্ষে সমান কোনো শত্রুকে সেই লক্ষ্যের কাছে যাবার পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া যায় তাহলে দৃষ্টিগোচর লক্ষ্যে পৌঁছবার তাড়নায় অস্থির সেই মিছিল মাঝখানের বাধাটিকে চূর্ণ করে দেয়ার জন্য ক্রমাগত বেগ সংগ্রহ করে ধেয়ে আসবে। ঘৃণা আর আবেগ—এই দুটোতেই মিছিল চলে।

এই হিসেবের ওপর নির্ভর করেই সাতসকালে দর্জি মনপুরান পৌঁছে যায়। মনপুরানে একটা পুরনো ইউনিয়ন আছে। সে ইউনিয়ন মনপুরানের পাতি যে প্লেনভিউয়ের ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো আন্দোলন করে নি কিন্তু বলেছে—কোম্পানির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে। আর তার সঙ্গে এ-কথাগুলোও ছিল যে শুধু অটাম্-টি-টাই যাচ্ছে, ফ্যাক্টরি তো আর বন্ধ হচ্ছে না। অটাম-টির যদি বেশি দাম পাওয়া যায় তাহলে বাগানের বাবু-মজুর সবই-ই বেশি বেশি বোনাস পাবে। দর্জি এ-সব সাত সতেরর মধ্যে না গিয়ে সকালে পৌঁছেই লাইনে লাইনে বাবু কোয়াটারে শুধু বলে বেড়িয়েছে যে এক্সাইজের অফিসার নোটিশ দিয়ে প্লেনভিউ ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিয়েছে, এখনই হচ্ছে সুযোগ, যদি মনপুরানের সবাই মিলে এখনই গিয়ে প্লেনভিউয়ে উঠতে পারে তাহলে মনপুরানের ফ্যাক্টরিটা বা মনপুরান বাগানটা বাঁচানো যাবে, নইলে এই বিপদ যদি কোম্পানি একবার কাটিয়ে উঠতে পারে তবে

মনপুরানের ফ্যাক্টরি কেউ বাঁচাতে পারবে না। এক্সাইজ থেকে ফ্যাক্টরি কেন বন্ধ করে দিয়েছে, বাবুদের কেউ কেউ সে-কথা জিজ্ঞাসা করলে অশ্বিনী বলেছে মনপুরানের পাতি যে প্লেনভিউয়ের ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছে এটা কোম্পানি আগে থাকতে এক্সাইজকে জানায় নি, কোম্পানির তাল ছিল গোপনে গোপনে সব কাজ সারার, কিন্তু সেণ্ট্রাল এক্সাইজের যে-অফিসার প্লেনভিউয়ে আছে সে খুব কড়া আর সৎ, ফলে ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয় নি। সবাই গেলেই দেখতে পাবে প্লেনভিউ বাগানের ফ্যাক্টরি আজ বন্ধ।

আর অশ্বিনীর কাছেই বাবুরা মজুররা প্রথম শুনলো যে মনপুরানের পাতির জন্য প্লেনভিউয়ের উইদারিং হাউস বাড়ানো হয়েছে। সেটাও সবাই গেলেই দেখে আসতে পারে সত্যি কি না। হ্যাঁ, সবাই মিলে গিয়ে দেখে আসা যায়—এই সিদ্ধান্তে সামান্য একটু খটকা লেগে থাকে সমস্ত ব্যাপারটাতে দর্জির স্বার্থ কি সাতসকালে ছুটে আসার—এই প্রশ্নটুকু। যারা মনপুরান ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় তারা ভাবে দর্জি ইউনিয়নটা হাতাতে চায়। দর্জি তাদের সে ধারণায় ঘা দেয় না কারণ দর্জির মতলব সম্পর্কে একটা আন্দাজ ওদের থাকা দরকার। যদি ওরা ভাবে দর্জি ইউনিয়ন হাতাতে চায় তাহলে ওরাই অগ্রণী ভূমিকা নেবে। আর অন্যদের সে বলে, সে নিজে যেখানে ইউনিয়ন করে তখন এতবড় একটা ব্যাপার জানা সত্ত্বেও মনপুরানের সবাইকে না-জানিয়ে থাকে কি করে। সকালের সমস্ত কাজ বন্ধ করে মনপুরান বাগানের বাবু আর মজুররা সাহেবদের সামনে দিয়ে যখন বেরিয়ে চলে যায়, মিছিল করে না—দল বেঁধে, যেন গল্প করতে করতে গ্রামের লোক দূরের মেলায়, তখনই দর্জির প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ যে মিছিল নিয়ে প্লেনভিউয়ে পৌঁছনোর আগেই প্লেনভিউয়ের ম্যানেজার খবর পেয়ে যাবে দর্জি এখান থেকে মিছিল নিয়ে বেরিয়েছে। মনপুরানের ইউনিয়নের হাতবদল, এখন এই অবস্থায়, ম্যানেজারের মাথায় বাজ

হানবে। ফলে দর্জি বাবুদের সঙ্গে বেশ গল্প করতে করতেই পথ চলে। শ্লোগানে আর ঝাণ্ডায় বাঁধা না থাকলে পাঁচশ মানুষের মিছিলও ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। অতগুলো মানুষও নানা দলে, নানা ভাগে ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যে-রাস্তার ছায়াচ্ছন্নতা সূর্যের উদয়-অস্তেও পরিবর্তিত হয় না, যে-রাস্তার কখনো দুপাশের কখনো এক পাশের পাহাড়ে গভীর গোপনতায় লালিত বা সুদূরে বিস্মৃত কাল্‌চে শ্যাওলা, যে-পথে একা চললে হৃৎপিণ্ডকে কোলাহলমুখর ঠাহর হয়, সে-পথে একটি সকালে পাঁচশটি মানুষ কতই বা ছড়াতে পারে!

প্লেনভিউয়ে ঢোকার আগের মোড়টাতে দর্জি প্রস্তাব দিয়েছিল যে সবাই মিলে মিছিল করে গেলে ভালো হয়। ততক্ষণে পথ হাঁটার পরিশ্রমে শরীর উষ্ণ, চোখেমুখে পিচ্ছিলতা, মেয়েদের সারামুখ জ্বলজ্বল, পায়ের পেশীতে কিছুটা হার্দ চাপ, উরুর পেশীতে নিয়ন্ত্রণাতীত দু-একটা শিরার কাঁপন, হৃৎপিণ্ড সামান্য একটু চঞ্চল, মেয়েদের নাসারন্ধ্র মাঝেমাঝে যেন ফুলে ফেঁপে ওঠে, গলার কাছে একটা নীল শিরার দব্‌দবানি দেখে বোঝা যাচ্ছে সেই নারীরা ত্রিশের দিকে চলে আসছে—তখন কি আর মিছিলের ডাক রোখা যায়?

দক্ষিণঢালু দিয়ে ওপরে ওঠেই উইদারিং হাউসের নতুন বাড়ানো অংশটা দেখামাত্র মিছিলটা যেন উত্তাল হয়ে ওঠে। মিছিলের সবচেয়ে আগে ছিল দর্জি। সে যদি মিছিলের তরঙ্গটাকে উইদারিং হাউসের ওপর নিয়ে গিয়ে ফেলত, উইদারিং হাউসটা মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ত। উইদারিং হাউসটা দেখার পর মিছিল যে উত্তুঙ্গতায় ওঠে, তা, যা-কিছু সামনে পড়ত, তার মাথায় আছড়ে পড়ে, ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে তছনছ করে ফেলত, যদি মিছিলটা বইয়ে দেবার মতো অতবড় একটা মাঠ সামনে না থাকত। কারণ জলের স্বভাব যেন মিছিলের—খাত পেলে বয়ে চলে যায়।

পাঁচ

ফ্যাক্টরির সামনে এসে মিছিলটা দাঁড়িয়ে পড়ে। পাঁচশ মানুষের অত বড় মিছিলও অত বড় মাঠে, অত উঁচু একটা ফ্যাক্টরি আর দোতলা উইদারিং হাউসের মাঝখানে কেমন ছোট হয়ে যায়। তাছাড়া মজুরদের পক্ষে ফ্যাক্টরির একজোড়া বন্ধ দরজার দৃশ্য খুব অশুভ যেন। এর সামনে তারা উদ্যোগ হারিয়ে ফেলে যদি না দরজাজোড়া ভেঙে ফেলা পর্যন্ত এগোতে পারে। দর্জি পেছন ফিরে বক্তৃতা শুরু করে। শ্লোগান থেমে যায় তবু কেউ শুনতে পায় না। সাময়িক একটা অগোছালো ভাবের মধ্যে ফ্যাক্টরির গেটের পাশে ফেলে রাখা ভাঙা বেঞ্চিটা কেউ তুলে নিয়ে আসে। তার এক-দিকের দুটো পা নেই। তিন চারজন মজুর সেই দিকটা উঁচু করে ধরে থাকে। তার ওপর উঠে দর্জি বক্তৃতা করে।

দর্জি গলার স্বরটা বেশি তোলে না। খুব ধীরে ধীরে বলে। একটু টেনে টেনে। কোম্পানি মজুরদের ঠকিয়ে, বাবুদের ঠকিয়ে এমন-কি সরকারকে ঠকিয়ে মনপুরানের পাতি প্লেনভিউয়ে নিয়ে এসেছে। তার প্রমাণ সরকার থেকে প্লেনভিউয়ের গেটে আজ তালা লাগিয়েছে। আমরা এসেছি। আমরা মনপুরান থেকে বাবুরা, মজুররা এসেছি। আমরা যদি ইচ্ছে করি উইদারিং হাউসের ঐ বেআইনী বাড়তি অংশটা ভেঙে দিতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে একজন চিৎকার করে ওঠে ভাঙো ওটা। দু-তিনজন সমর্থন করে। কয়েকজন চুপ করতে বলে। একটু সোরগোল পড়তেই দর্জি দুহাত তোলে। সবাই আবার বসে যায়। দর্জি গলাটা একটু বাড়িয়ে বলে ওঠে—আমরা ওটা ভেঙে দিতে পারি কিন্তু দেব না। কারণ এখানে যে পাতি শুকায় সেটা আমরা টিপি। ভেঙে দিলে আমাদের কাজ যাবে। কোম্পানি বাগান বন্ধ করে দিয়ে অন্য কোথাও অন্য কারখানা খুলবে। তাই আমরা

ভাঙব না। আমরা এই ফ্যাক্টরির গেট ভেঙে মনপুরানের চায়ের পেটিগুলো মাথায় করে আবার মনপুরান নিয়ে যেতে পারি। এখনই পারি। কিন্তু আমরা তা নেব না। আমরা এই এখানে বসছি। যতক্ষণ কোম্পানি এসে ঘোষণা না করে যে মনপুরান বাগান বন্ধ হবে না, মনপুরানের ফ্যাক্টরি বন্ধ হবে না, মনপুরান মনপুরানই থাকবে—ততক্ষণ আমরা এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না। আমাদের যা বলার আমরা বললাম, কোম্পানির যা বলার কোম্পানি বলুক।

দর্জি বেঞ্চটা থেকে লাফিয়ে নামার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে। বেঞ্চের পায়াছাড়া দিকটা যারা ধরে ছিল তাদের দু-একজন সেটা ছেড়ে দিয়ে হাততালি বাজায়। বাকিরা ওটা মাটিতে নামাবার আগেই মনপুরান ইউনিয়নের একজন লাফিয়ে সেই বেঞ্চের ওপর উঠেই বক্তৃতা শুরু করে দেয়। ফলে বেঞ্চটা আর নামানো হয় না কিন্তু সোজাও করা যায় না, ঢালু হয়ে থাকে। ইউনিয়নের নেতা খুব চড়া গলায় দর্জির বক্তব্যটাকে সমর্থন করে আর কোম্পানিকে গালিগালাজ করতে থাকে। মজুররা ততক্ষণে মাটির ওপরে বসে পড়ে একটু-আধটু গল্প-গুজব শুরু করে দিয়েছে। যে তিনজন বেঞ্চটার পায়াছাড়া দিক ধরে ছিল তারা খুব আস্তে আস্তে সেটা নামাতে থাকলে ইউনিয়নের নেতা একবার দেখে নিয়ে বক্তৃতা শেষ করতেই হাসি আর হাততালির মাঝখানে শোনা যায়, "এদ্দিন এ-সব বলোনি কেন?"

এরপর আরো একজন বক্তৃতা করতে ওঠে। বেঞ্চটার পায়াছাড়া দিকটা মাটির ওপর নামানো। পায়াঅলা দিকটায় সে হাতলটার দুপাশে দুপা রেখে বক্তৃতা করে যায়। এরপর থেকে যে-ই বক্তৃতা করে তাকেই নিজের ভারসাম্য রাখার জন্য বেঞ্চের পায়াঅলা দিকটায় উঠে খানিকটা করে সময় আর বুদ্ধি দিতে হয়। ফলে মিটিংটা জমে যায়।

ছয়

মিছিলটা যখন মাঠের ভেতর ঢুকে যায় তখনই মনপুরানের বাবুরা দাঁড়িয়ে পড়ে। দর্জির বক্তৃতাটা অতদূর থেকেই, কেউ-কেউ দু'এক-পা এগিয়েও শোনার চেষ্টা করে। তারপর ঐ রাস্তার এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে পড়ে। শেষে এমপ্লয়িজ ক্লাবের মাঠে তারা গোল হয়ে বসলে লামা এসে এমপ্লয়িজ ক্লাব খুলে দিয়ে তাদের বসতে বলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বড়বাবু আর ফ্যাক্টরিবাবু ছাড়া আর সবাইও ক্লাবে এসে হাজির হয়। দেখতে দেখতে ক্লাবে একটা আলোচনা শুরু হয়ে যায়। আলোচনাটা ঠিক আলোচনার জন্যই হয় না, খানিকটা যেন গল্প-গুজব করতে করতে আসল প্রসঙ্গটাই উঠে পড়ে।

বাগানবাবু বলেন, "কী খবর বড়বাবু, একেবারে মিছিল নিয়ে এসে আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন ?"

উত্তর দেয় মনপুরানের আরএক বাবু, "শুধু আমাদের পাতিই নেবেন সেটা কি চলে, আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়েও দেখেন কেমন লাগে ?"

"স্ত্রীকেও নিতে বলছেন ? তো এতদিন কি করছিলেন—"

মনপুরানের বড়বাবু বলেন, "আরে মশাই, বুঝতে পেরেছি নাকি। গতবার দুই-এক ট্রাক গেল, ভাবলাম এবারও সেরকমই। আর শুধু অটাম-টিটাই যদি হয় হোক্, দামটা তো বেশি পাওয়া যাবে, তা নয়, এতো ভাতে মারার ব্যবস্থা—"

"কোম্পানির ভাত তো বেশি দেখেন বড়বাবু, তাই এই দশা। আর আপনাদের তো সব সময় সাহেবের সঙ্গে চলা, যেন আমরাই শত্রু, এখন বোঝেন—"

"আমরা তো আজ সকালের আগে কিছু জানতেই পারি নি—আপনাদের দর্জি গিয়ে তো বললো যে এক্সাইজ থেকে ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিয়েছে—"

"ভাগ্যিস দর্জির সঙ্গে কোম্পানির এখন গোলমাল চলছে তাই আপনারা জানতে পেলেন, নইলে দর্জিই হয়তো ওর ইউনিয়নের লোকজন নিয়ে আপনাদের পেটাত—"

"তা মশাই যা হোক্, আমাদের তো আর কোনো অপকার করে নি—"

"আজ একেবারে সোনায় সোহাগা। একে ফ্যাক্টরি বন্ধ, তার ওপর আপনাদের মিছিল ? আরো কী যে আছে ?"

"প্লেনভিউয়ের ফ্যাক্টরি-স্টাফ তো নাকি খুব খুশি যে হ্যাঁ মনপুরান পারে না, আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি কী রকম ম্যানুফ্যাকচারিং হয়"—

"কোম্পানি খুশি হয়ে তো এবার প্লেনভিউ ফ্যাক্টরি-স্টাফের বোনাসের হারই বদলে দিয়েছে।"

"প্লেনভিউ তো ভাই চিরকালই কোম্পানির পোষ্যপুত্র"—

"আরে মশাই প্লেনভিউয়ের মতো মুনাফাও কোম্পানিকে কেউ দিতে পারে না, যে গরু দুধ দেয়, তার চাট্ও খেতে হয়। তো প্লেনভিউয়ে অবিশ্যি কোনোদিনই গোলমাল নেই, খুব পিসফুল, এবারই যেন তাও একটু গোলমাল ঠেকছে—"

"এখানে নাকি ফ্যাক্টরি-স্টাফের সঙ্গে অন্যদের খুব গোলমাল লেগেছে, এই মনপুরানের পাতি নিয়ে—"

"মনপুরানের পাতি নিয়ে লাগবে কেন। ফ্যাক্টরি-স্টাফ আর বাবুরা মিলে গতকাল একটা ইউনিয়ন তৈরি করেছে। সে তো সবারই রাইট আছে—"

"একই কোম্পানি যখন, মনপুরান আর প্লেনভিউ মিলে একটা ইউনিয়ন করলেই হয়—"

"কি সব বাবু আর লেবারদের নিয়ে ?"

"না, না, এই নতুন যেটা হয়েছে, বাবু আর ফ্যাক্টরি-স্টাফদের নিয়ে—"

"ভালো বলেছেন, মনপুরানের ফ্যাক্টরি-স্টাফের মুখের গ্রাস নিয়ে

প্লেনভিউ ফ্যাক্টরি-স্টাফ বোনাস পেটাচ্ছে আর তাদের সঙ্গে ইউনিয়ন হবে ?"

"ইউনিয়ন থাকলে তো আর এ-সব চলবে না। ইউনিয়ন বলে দেবে হয় এটা করা চলবে না—"

"ইউনিয়ন বলতেই বা যাবে কেন আর বললে শুনতেই বা যাবে কে। এই তো এত বড় ইউনিয়ন ছিল লেবারদের তারা কিছু বলেছে নাকি লেবারদের ? এত দিন ?"

"বরঞ্চ মনপুরানের ফ্যাক্টরি-স্টাফ আর প্লেনভিউয়ের ফ্যাক্টরির বাইরের মজুর আর বাবুরা মিলে একটা ইউনিয়ন হতে পারত। এদের ইন্টারেস্টে মিল আছে।"

"সে না-হয় আজ আছে। কাল যখন থাকবে না ?"

"ইউনিয়নও থাকবে না। আবার নতুন ইউনিয়ন হবে—"

"এই চলুক আর কি, এক ইউনিয়ন ভাঙা, আর এক ইউনিয়ন তৈরি করা আর মারামারি করা—"

এই সব মতামতের সবটাই যার যার স্বার্থে তৈরি—একেবারে সেই স্বার্থ, যে-স্বার্থে মানুষ ভাত খায় আর ঘুমোয়। আলাপ-আলোচনা আড্ডার মেজাজে চলতে চলতে একটা অন্য রকমের সমস্যা দেখা যায়। সাধারণভাবে এক বাগানের বাবুরা সবাই মিলে আর একটা বাগানে খুব বড় কোনো সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া আসে না। ফলে এ-রকম দল বেঁধে আসার সঙ্গে একটা সামাজিকতার সম্পর্ক আছে। কিন্তু এবার মনপুরানের বাবুরা মিছিল করে এসেছে, মজুরদের সঙ্গে। ফলে প্লেনভিউয়ের বাবুদের পক্ষে তাদের স্বতন্ত্রভাবে আদর-আপ্যায়ন করা বা দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যাপারে খানিকটা এমন অসুবিধা দেখা দিয়েছে যা তাদের পুরনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। ইতিমধ্যে অবশ্য মন-পুরানের যে-সব বাবুর সঙ্গে প্লেনভিউয়ের দু-একটি পরিবারের সামাজিক বা পারিবারিক সম্পর্ক আছে তারা সেসব বাড়িতে দেখা-

শোনা করে আসছে। মনপুরানের কলবাবুর মেয়ের সঙ্গে প্লেনভিউয়ের এক অ্যাসিস্ট্যান্টের বিয়ে হয়েছে। কলবাবু মেয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে এসেছেন।

শেষে বাগানবাবুই কথাটা পাড়ল। "বড়বাবু, আপনাদের দুপুরের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তাহলে করতে বলি"—

"না, না, তার দরকার নেই, আমরা তো ফিরে যাব"—

"ফিরে যান কি না যান, কখন যান, সারাদিন না খেয়ে থাকবেন? তা তো হয় না"—

"ওদিককার খবর কি? দর্জির সঙ্গে একটু কথা বললে হয় না?"

"ওরা তো ওদিকে ফ্যাক্টরির সামনে বসে আছে"—

খানিকটা কথাবার্তার পর ঠিক হয় যে ক্লাবঘরেই যাহোক রুটি তরকারির ব্যবস্থা করা হবে। তার আগে দর্জির সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে বাগানবাবু যায়।

সাত

বেলা একটা-দেড়টা নাগাদ একটা মিছিলের শ্লোগান শুনে ফ্যাক্টরির সামনে বসে থাকা মনপুরানের মজুররা উঠে ঘুরে দাঁড়ায়। বাবুরা তাড়াতাড়ি ক্লাবঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ক্লাবঘরের মাঠ থেকে শুরু করে ফ্যাক্টরিগেট পর্যন্ত সবাই হঠাৎ থমকে যায়। প্লেন-ভিউয়ের শ্রমিকরা যদি মনপুরানের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এসে থাকে তাহলে একটা গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা আছে। মিছিলের শব্দটা যত কাছে আসতে থাকে দর্জিকে দেখা যায় ফ্যাক্টরিগেটের সামনে থেকে হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণঢালুর দিকে আসতে। চারপাশে এক দর্জিরই চলন্ত রেখা আর মিছিলেরই একমাত্র ধ্বনি। প্রথমে মিছিলের ফেস্টুনটা দেখা যায়, তারপর মানুষজনের মাথা; তারপর তাদের সারা শরীর। একটা বিরাট সরীসৃপের মতো ফেস্টুন-ঝাণ্ডায় সজ্জিত সেই মিছিল বাগানের খাড়াই বেয়ে উঠে আসতে থাকে তো উঠে

আসতেই থাকে। দুটি তরুণী মাথায় ফুল গুঁজে ফেস্টুনটা ধরে ছিল। দর্জি সামনে দাঁড়িয়ে মিছিলটাকে ফ্যাক্টরিগেটের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করলে ফ্যাক্টরিগেটের সামনে মনপুরানের মজুররা উঠে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতে থাকে। "মনপুরানের পাত্তি প্লেনভিউয়ে আনা চলবে না," "মনপুরান বাগান তুলে দেয়া চলবে না।"

প্লেনভিউ বাগানের আশেপাশে মিঃ প্রধানের পার্টির যে-দুএকটি বাগান আছে তার মজুররা এসে প্লেনভিউয়ের বস্তির ভেতর ঢুকে দর্জির ইউনিয়নের যারা যারা এসেছে তাদের সঙ্গে নিয়ে মনপুরানের শ্রমিকদের সমর্থন জানাতে এসেছে। দর্জি সেই মিছিলটাকে নিয়ে এগিয়ে যায়, থামতে দেয় না। মনপুরানের মজুররা শ্লোগান দিতে দিতে সেই মিছিলের সঙ্গ ধরে। তারপর পুরো মিছিলটা বাগানটা ঘুরে আসতে উত্তরঢালুর দিকে চলে যায়। প্লেনভিউয়ের সর্বত্র শ্লোগানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনির এমন প্রবল ঝড় ওঠে যে মনে হয় চারদিকে ধস্ নামছে। মিছিলের লেজটাও যখন উত্তরঢালু দিয়ে সাহেবদের বাংলোর সামনে দিয়ে নেমে চলে যায় তখন চারদিক কেমন ফাঁকা হয়ে যায়—ফ্যাক্টরিগেটের সামনে দারোয়ান, মাঠের সামনে সেই এক দিকের পায়া-ভাঙা বিবর্ণ বেঞ্চি, এম্‌প্লয়িজ ক্লাবের মাঠে কয়েকজন মাত্র বাবু। এই শূন্যতার ভেতরও শ্লোগানের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এসে আঘাত করতে থাকে। যেন মনে হয় একটা জঙ্গম ধ্বনিস্রোত পাকে পাকে এই ফ্যাক্টরি এলাকাটাকে বাঁধছে। বাগানবাবুর পরামর্শমতো এই ফাঁকে বাবুদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলা হল, মজুররা ফিরে আসার আগেই যাতে বাবুরা খেয়ে নিতে পারে।

মিছিলটা অদৃশ্য হয়ে গেল বটে কিন্তু তার ধ্বনি সারাটা বাগানে তোলপাড় করে ফেরে। উত্তরের ঢালুর দিকে শ্লোগান খানিকটা অস্পষ্ট হতে না হতেই আবার পুব-উত্তর কোণা থেকে ধ্বনিটা একেবারে সোজাসুজি ফ্যাক্টরি-মাঠের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে যায়। পুব-ঢালুর গা বেয়ে বেয়ে, দু-পাহাড়ের মধ্যবর্তী খাত বেয়ে নদী যেমন,

তেমনি দিব্বি চলতে চলতে হঠাৎ আবার যেন উত্তর দিক থেকেই ধ্বনি ওঠা শুরু করে। আবার দক্ষিণপুব কোণ থেকে ধ্বনিটা দক্ষিণ দিকে বেড় না দিয়ে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে হঠাৎ পশ্চিমদক্ষিণ কোণ থেকে চড়াই বেয়ে উঠে আসতে থাকে, তারপর পাহাড়ের গা ধরে ধরে উত্তর দিকে এগোতে থাকে।

মিছিলটা পুব আর পশ্চিমঢালুর আনাচে-কানাচে কুলি বস্তির ভেতর দিয়ে প্রতিটি লাইনের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। প্লেন-ভিউয়েই যখন গোলমাল তখন প্লেনভিউয়ের মজুরদের ভেতর সাড়া জাগাবার জন্য মিছিল তো লাইনে লাইনে ঘুরবেই। যে-ফ্যাক্টরি-মজুররা প্লেনভিউয়ের ইউনিয়ন ভাঙছে তারা কেউ মিছিলে আসে নি —তাদের লাইন, ফ্যাক্টরি-মজুরদের লাইন দিয়ে মিছিলটা দবদবিয়ে যদি না ঘুরল আর মিছিলের ভয়ে যদি মজুররা পাহাড়ের গায়ে লুকিয়ে না থাকল তাহলে মিঃ প্রধানের সঙ্গে প্রোগ্রাম করে, এত বুদ্ধি খাটিয়ে দর্জি মিছিল করতে যাবে কেন। মিছিলের পায়ের তলায় যদি সব আগাছা দুমড়েই না গেল তবে আর দর্জি এতবড় মিছিলটা নিয়ে লাইনের লাইনে ঘোরার জন্য ম্যানেজারের বাংলোর সামনের পথটাই বা বেছে নেবে কেন।

এতবড় মিছিল সারা বাগান তোলপাড় করে ফিরছে এ-অভিজ্ঞতা এ-বাগানের কারো নেই। সুতরাং পাহাড়ের প্রতিধ্বনিময় ধ্বসে যাওয়া কিংবা রাত নিশুতিতে পাথরের চাঁই গড়ানো নিরন্তর গর্জন-মুখর জলস্রোতের বয়ে যাওয়ার হদিস যারা দিতে পারে, তারাও বুঝতে পারে না কয়েকশ মানুষের শ্লোগান কখন কোন্ ঝর্নার শুকনো খাঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে বা পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে নিচে খাতের ওপর মাথা ঝোলানো কোন চাঙড়ে ঘা খেয়ে খাতের ভেতর হা হা হারিয়ে যাচ্ছে বা কয়েকটি মাত্র গাছের গুঁড়িকে চার-পাঁচবার ঘোরা পাকদণ্ডীর পথে শ্লোগানের মুখ কখন পায়ে পায়ে দিক বদলাচ্ছে। তারপর অতবড় মিছিলের নানা জায়গায় আলাদা আলাদা

ভাবে শ্লোগান উঠছে। একদলের শ্লোগানের প্রতিধ্বনি আর এক দলের শ্লোগানের ধ্বনির সঙ্গে মিলে যায়। ফলে মিছিলটা যখন পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে ঘুরতে থাকে তখন ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে দিক-বিদিক চেনা-অচেনায় সেটা যেন কঠিন, জটিল, ব্যাপক, প্রাকৃতিক হয়ে ওঠে।

আট

ছটো নাগাদ দক্ষিণঢালু দিয়ে হর্ন বাজিয়ে একটা গাড়ি উঠল। এম্প্লয়িজ ক্লাবের মাঠে-বারান্দায় বাবুরা তখন বসে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের রুটি খাওয়া হয়ে গিয়েছে। জমাদার নোংরা কাগজগুলি ঝাড় দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়িটা মাঠের ভেতরই ঢুকল। আর গাড়ি খুলে নামলেন মিঃ প্রধান।

মিঃ প্রধানকে দেখে বাবুরা তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসেন। মিঃ প্রধানের পরনে নেপালের রাজা মহেন্দ্রের মতো পোশাক—চাপা মতো পাজামা, ফুলশার্ট, তার ওপরে একটা সোয়েটার, কোট, চোখে খুব সরু ফ্রেমে খুব হালকা রঙের চশমা, সেটা চশমা না সানগ্লাস বোঝা যায় না, মাথায় নেপালি টুপি। গাড়ি থেকে নেমে মিঃ প্রধান খুব আস্তে বাবুদের জিজ্ঞাসা করেন, "মিটিং তো এখানেই হবে?" বাবুরা একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। পেছন থেকে মনপুরানের বড়বাবু বলে ওঠেন, "হ্যাঁ এখানেই, মানে ঐ ফ্যাক্টরির সামনে," এমন সময় শ্লোগান শোনা যায়। মিঃ প্রধান বলেন, "মিছিল বেরিয়েছে?"

"হ্যাঁ বেরিয়েছে, আপনি বসুন না, আসুন"—বড়বাবু পথ দেখায়। মিঃ প্রধান বোধহয় একটু লাজুক স্বভাবের, অন্তত চোখের পাশের কুঞ্চিত রেখা আর সবসময় নোয়ানো চোখ আর সামান্য হাসি দেখে তাই মনে হয়। তিনি সবার সঙ্গে ক্লাবঘরের দিকে হাঁটা দেন। "আজকের মিটিঙে আপনারাও যে আসবেন তাতো দর্জি বলে নি।

আমি তো জানি শুধু মজতুরদের মিটিং।" এরপর আর বলা যায় না যে তারা মিটিঙের কথা জানে না। "কি বড়বাবু? কোম্পানি আপনাকেও মজতুরদের সঙ্গে এক করে দিল?" বলে মিঃ প্রধান বাইরে আনা বেঞ্চটার ওপর বসে পড়ে বড়বাবুকে বলেন, "বস্থন, বস্থন।"

বড়বাবু বসে পড়ে বলেন, "আমরা তো আজ সকালেই খবর পেলাম যে এখানকার ফ্যাক্টরি নাকি সরকার বন্ধ করার নোটিশ দিয়েছে।"

"না, না, বন্ধ করবে কেন, মনপুরানের পাত্তির হিসেব দেখায় নি। সেটা মিটে গেলেই খুলে দেবে। তবে ফ্যাক্টরিটা বন্ধ হওয়ায় আপনাদের খুব স্থবিধে হয়েছে তো আজ"—মিঃ প্রধান এত নরম স্বরে কথা বলেন যে পাশের লোকও শুনতে পায় না। পাশ থেকে দেখলে মনে হয় তার বয়স অনুপাতে শরীরে মেদ জমে নি। গলাটা বেশ সোজা চিবুকে এসে মিশেছে।

ইতিমধ্যে প্লেনভিউয়ের বাগানবাবু আর লামা কানাকানি করে নিয়েছে যে এখুনি এখানকার বড়বাবুকে খবর দিতে হবে। নইলে সেটা অভদ্রতা হয়ে যায়। মিঃ প্রধানের সঙ্গে আর একজন এসেছে —মিঃ ভট্টাচার্য। সেই ভট্চায, সান্যালের বাড়ি থেকে তুর্গাপূজার মিটিং সেরে আসার পথে পেছন থেকে ডেকে যে অশ্বিনীর সঙ্গে পরিচয় করেছিল। ভট্চায এতক্ষণ গাড়ির আশেপাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল, এখন বারান্দার কাছে এসে বলে, "তাহলে আমি একটু ঘুরে আসি।" ভট্চাযের কথাটা মিঃ প্রধান চোখ তুলে শোনেনও না, জবাবও দেন না। তার বদলে খুব মৃত্ব গলায় কী একটা মন্তব্য করেন যে কাছাকাছি যারা ছিল তারা হেসে উঠে বলে, "লামাভাই, কী বলছেন মিঃ প্রধান।" সিঁড়ির মাঝখানে লামা দাঁড়িয়ে পড়ে মিঃ প্রধানের দিকে তাকায়। বড়বাবু বলেন, "বলছেন প্লেনভিউয়ের বাবুরা আজ আমাদের চিনতেই পারছে না, লামাভাই

পালাচ্ছেন।" লামা হেসে বলে, "না, না আমি আসছি এখুনি।" মিঃ প্রধান একটু সরে বসে প্লেনভিউয়ের বাগানবাবুকে ডাকেন—"বাগানবাবু, বস্থন। এখন আপনাদের দুই বাগানের বাবুদের মতটা শুনে নি। কী ব্যাপার বলুন তো।" মিঃ প্রধান বাংলা বেশ বলেন। ভোটের সময় বাঙালিদের মিটিঙে বাংলাভাষাতেই বক্তৃতা করেন। কিন্তু তাঁর 'স'-ধ্বনিটাতে একটু শিষ লাগে, এ্যা বলতে পারেন না—এ বলেন, আর খুব ধীরে ধীরে কথাগুলি বলেন বলে মনে হতে পারে যে বাংলা তাঁর আয়ত্তে থাকলেও, তিনি খুব সাবলীল নন। কিন্তু শব্দের অভাবে বা উচ্চারণের অসুবিধার জন্য তাকে কখনো ঠেকে যেতে হয় না। বরং ধীরে বলার জন্য তাঁর বলার মধ্যে একটা গতি এসে যায় ও থেকে যায়। মিঃ প্রধান এখানকার এম. এল. এ, অনেক ক'বছর ধরে। ফলে তাঁর সঙ্গে অনেকের ব্যক্তিগত পরিচয় পর্যন্ত আছে।

বাগানবাবু ততক্ষণে বলতে শুরু করেছেন, "আমরা তো এর সাত-পাঁচ কিছুই জানি না। একদিন দেখলাম পাতি আসছে। তো আসুক। গেলবারও দু-একবার এসেছিল। আমি ভাবলাম সে-রকমই বুঝি। একদিন দেখি আমাদের পাতি শুকোবার জন্য ফ্যাক্টরিবাবু হেশিয়ান ঝুলিয়েছেন। তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় একটু আমার সঙ্গে ফ্যাক্টরিবাবুর। তখন তো দুই সাহেব এসে মাঝখানে পড়ে মিটিয়ে দিয়ে বলে, "আচ্ছা উইদারিং নিয়ে গোলমাল তো, আলাদা র‍্যাক বানানো হবে।" আস্তে করে মিঃ প্রধান বলেন—"আপনি আর ফ্যাক্টরিবাবু এবার কোয়াটার নিয়ে ঝগড়া করুন, দুজনের আর একটা করে কোয়াটার হবে।" যারা মিঃ প্রধানের পাশাপাশি ছিল তারা হেসে ওঠে। একটু দূরের যারা তারা "কি কি" জিজ্ঞাসা করে ওঠে। কিন্তু বাগানবাবু বলতে শুরু করে দেয়ায় আর কোনো জবাব দেয়া হয় না, "আমাদের কোনো আপত্তি নেই, যে-বাগানের পাতি সে-বাগানে থাকাই ভালো, আর আমাদের

যখন এতে দু পয়সার লাভ নেই, আমরা কেন চাইব বলেন যে মনপুরানের বাবুদের কোনো ক্ষতি হোক।"

"এখানে ফ্যাক্টরির কেউ আছেন? ফ্যাক্টরিবাবু? আপনাদের তো সমর্থন থাকবেই, ফ্যাক্টরিবাবুর সঙ্গে কথা বলা দরকার"—মিঃ প্রধান বলেন।

"ফ্যাক্টরিবাবু তো সেই সকাল থেকে এক্সাইজ ইনস্পেক্টরের সঙ্গে ফ্যাক্টরির ভেতরে।"

"আচ্ছা থাক্। বড়বাবুর সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাবে"—বড়বাবু বাড়ির কাছ থেকে কোণাকুণি আসছিলেন। বড়বাবুর মুখ-চোখ খুব গম্ভীর—সেটা তিনি সিঁড়িতে পা দিতেই বোঝা যাচ্ছিল। মিঃ প্রধান আগেই বড়বাবুকে নমস্কার করে দিলে বড়বাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। মনপুরানের বড়বাবু সরে বসে প্লেনভিউয়ের বড়বাবুকে জায়গা দিয়ে বলেন, "বসুন।" বড়বাবু বসতেই মিঃ প্রধান বড়বাবুর হাত ধরে বলেন, "পাশাপাশি দুই বড়বাবু—চল্‌বে না, আপনি এদিকে আসুন" বলে নিজেই মনপুরানের বড়বাবুর দিকে সরে গিয়ে প্লেনভিউয়ের বড়বাবুকে তাঁর ডানপাশে জায়গা করে দেন। চারপাশের সমবেত হাসিতে প্লেনভিউয়ের বড়বাবুর মুখের গাম্ভীর্য ফেটে যায়। মিঃ প্রধান উচ্চস্বরে হাসেন না। স্মিত মুখে তাকিয়ে থাকেন শুধু। তারপর বলেন, "আচ্ছা বাড়বাবু, আমরা যদি বলি মনপুরানের পাতি মনপুরানের ফ্যাক্টরিতেই ম্যানুফ্যাকচারিং করতে হবে, আপনারা আপত্তি করবেন না তো?" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বড়বাবু বলেন, "এ-ব্যাপারে আমার আর কি মত থাকতে পারে, বলুন। কোম্পানি যা করবে তাই হবে।"

"তা তো হল না। এই দেখুন ফ্যাক্টরিটা বন্ধ হয়ে থাকল। কোম্পানির মাথায় মাঝে মাঝে তেল দেয়া দরকার"—মিঃ প্রধান এত ভিড়ের ভেতরও যেন বড়বাবুর কানে কানে কথা বলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মিঃ প্রধান বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন,

"এখানকার বাবুদের বা ফ্যাক্টরি-মজ্‌দুরদের কি আপত্তি হবে?" বড়বাবু চুপ করে থাকেন। মিঃ প্রধানও আর কথা বাড়ান না। শ্লোগানের শব্দটা কাছাকাছি আসতে মিঃ প্রধান বলেন, এবারও গলার স্বর না তুলে, চোখটা একটু তুলে চারদিক ঘুরিয়ে, কিন্তু চোখ তুলে কথা বলার অভ্যেস নেই বলে তাঁর ভুরুটাই বেশি ওঠে আর কপালে রেখার লাইন পড়ে যায় "দেখুন, আমার তো কোনো অধিকার নেই আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে মালিকের সঙ্গে কথা বলার, আমি মজদুর ইউনিয়নের লোক, মজদুরদের হয়ে বলতে পারি, কিন্তু আপনারা যদি আমাকে বলেন তাহলে আমি মালিকের, মানে কোম্পানির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতে পারি।"

মনপুরানের বড়বাবু বলে ওঠেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমাদেরও তো এ-গোলমাল ভালো লাগছে না। এই সিজন্‌ টাইমে দু-দুটো বাগানের একদিনের প্রোডাকশন বন্ধ। কোম্পানিরটাও তো দেখতে হবে। আপনি আমাদের সবার হয়ে কথা বলুন।"

মিঃ প্রধান সবার দিকে চোখ তুলে তাকাবার চেষ্টায় ভুরু তুলে চারপাশে তাকান যেন তিনি যাচাই করে নিতে চান কারো আপত্তি আছে কি না। কিছুটা সময় চলে যাওয়ার পর তিনি বলেন, "তাহলে চলুন আমরা সবাই-ই আজকের মিটিংটাতে যাই, একটা ইউনেনিমাস প্রস্তাব নি—যাতে কারোই আপত্তি হবে না, তারপর দেখা যাক।"

নয়

তুমুল শ্লোগান দিতে দিতে উত্তরঢালু দিয়েই মিছিলটা ফিরে এসে ফ্যাক্টরির মাঠে ঢুকতেই মিঃ প্রধান মনপুরানের একজন ছোকরা অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওরা এখানেই আসুক, মিটিংটা এখানেই হোক না।" ছোকরা দৌড়ে খবর দেবার পর মিঃ প্রধান বড়বাবুর দিকে ঘুরে এমন করে বলেন—"কি বলেন?"

যে বড়বাবুর মাথা হেলিয়ে "হ্যাঁ হোক না" বলা ছাড়া উপায় থাকে না।

মিটিং এমপ্লয়িজ ক্লাবের মাঠে হবে শোনামাত্র মজুররা সব ছুটতে ছুটতে এদিকে আসতে থাকে। বারান্দার নিচে পৌঁছেই একটি মেয়ে দুই হাতে মুঠো তুলে শ্লোগান দেয়—"প্রধানভাই" "জিন্দাবাদ" "অমর রহে"। যারা ছুটে ছুটে আসছিল আর যারা এসে গেছে সবাই এই ধ্বনি দিতে দিতেই মাঠে ঢুকে পড়ে। দেখতে দেখতে ছোট মাঠটা উপছে লোকজন রাস্তার ওপর উঠে যায়, ফ্যাক্টরির মাঠে ছিটিয়ে পড়ে। ফ্যাক্টরির মাঠে হলে বোঝাই যেত না যে এত লোক এসেছে।

"নিন, তাহলে বড়বাবু, আপনি প্রেসিডেন্ট হয়ে যান"—প্লেনভিউয়ের বড়বাবুকে মিঃ প্রধান বলেন। বড়বাবু হাতজোড় করে "আমাকে ক্ষমা করুন" বলে বসলে মিঃ প্রধান পেছনে দাঁড়ানো বাবুদের দিকে হাতটা নেড়ে বলেন ,"নিন কেউ প্রস্তাব করে দিন যে মনপুরানের বড়বাবু সভাপতি হবেন।" মনপুরানের বড়বাবু "না, না আমি কেন, আমি কেন" বলতে বলতে একজন প্রস্তাব করে দিলে সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে। মনপুরানের বড়বাবু দাঁড়িয়ে চট করে ঘোষণা করে ফেলে যে মিঃ প্রধান বলবেন। মিঃ প্রধান "না না" করে বলেন "আগে আপনাদের একজন বলুন, তারপর মজুরদের একজন, শেষে আমি বলবো।" বাবুদের ভেতর কে বলবে তাই নিয়ে আবার একটা আলোচনা শুরু হতেই মিঃ প্রধান বলে দেন "বাগানবাবু বলুন না।" সভাপতিও নাম ঘোষণা করে দেন। সবাই মিলে বাগানবাবুকে ঠেলে এনে সিঁড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। মিটিং শুরু হয়ে যায়। মিঃ প্রধান সিগারেটের প্যাকেট বের করে দুই বড়বাবুর দিকে পর পর ধরেন। দুজনেই নমস্কার করলে, একটা সিগারেট ধরিয়ে মিঃ প্রধান পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে প্লেনভিউ ও মনপুরান চা বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীদের

এই জনসভায় গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবটি ইংরেজিতে লিখতে শুরু করেন।

মিঃ প্রধানকে দেখে, বিশেষত তাঁর লাজুক ভঙ্গিতে মনে হতে পারে যে তিনি বোধহয় খুব সতর্ক নন বা সব সময় সব কাজ তিনি গোছাতে পারেন না, যেন অন্য দশজন তাঁর কাজ গুছিয়ে দেওয়াতেই তিনি অভ্যস্ত। বিশেষত কোনো অবস্থাতেই তিনি তাঁর গলার স্বর তোলেন না। অনেক সময় পাশের লোকটিও শুনতে পায় না। ভিড়-টিড়ের মধ্যে প্রায় সব সময়ই তাঁর বলা কথা আর কেউ চেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে দেয়ায় এই ধারণা তৈরি হতে পারে যে নিজের কথা দশজনকে শোনানোর জন্যও তাঁকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়—এতই তিনি নির্ভরশীল। কিন্তু দশজনকে সব সময় নিজের চারপাশে রাখবার এটাই হয়তো তাঁর অন্যতম পদ্ধতি। এখানে যে মিটিং হবে সেই কর্মসূচিটা তৈরি করে পাশাপাশি যে-দু-একটা বাগানে তাঁর ইউনিয়ন আছে সেখানে খবর পাঠিয়ে মনপুরানের মজুর-কর্মচারীদের আনার পদ্ধতিটাও হয়তো তাঁরই বাতলানো। আর এখানে কর্মচারীদের পেয়ে যাবার পর ওখান থেকে আবার ফ্যাক্টরির মাঠে গিয়ে মিটিং করতে গেলে মজুরদের সঙ্গে একযোগে মিটিং-মিছিলের কোনো অভিজ্ঞতা যাদের নেই সেই বাবুরা পাছে পালাবার সুযোগ পেয়ে যায়—সেজন্য মিটিংয়ের জায়গাটাই বদলে ফেলে ক্লাবঘরটাকে ঘিরিয়ে দেবার ফন্দি এঁটে ফেলেন কি করে—যদি তিনি সবদিক নাই ভাববেন, নাই দেখবেন। ফ্যাক্টরির মাঠে মিটিং করলে দুই বড়বাবুকে দুই পাশে নিয়ে বসে থাকার সুযোগটাতো তাঁর নাও জুটতে পারত। সমস্ত ঘটনাটা যে-পাকিয়ে তুললো, সেই দর্জি সারা মিটিংয়ে একটিবার মুখও খোলে না। তার বক্তৃতা করাটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এতগুলো চা-বাগানের মজুর-কর্মচারীর ভোটটা তাঁর কাছে প্রায় ব্যাঙ্কে রাখা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো—সেখানে কি এমন কোনো পদ্ধতি বা

ব্যক্তির সঙ্গে মিঃ প্রধান একত্রিত হয়ে যেতে পারেন যা নিয়ে কারো কারো মনে সন্দেহ, প্রশ্ন এইসব দেখা দিতে পারে। মিঃ প্রধান এখানকার জনপ্রতিনিধি। তিনি শুধু সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীর সর্ব-সম্মত প্রস্তাব নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে কথা বলতে পারেন। যদি আজ এখানে প্লেনভিউ-মনপুরানের বাবুদের না পেতেন তবু হয়তো তাঁকে কোম্পানির সঙ্গে কথা বলতে হতো,—দু-দুটো বাগানের দৈনিক উৎপাদনের ক্ষতি তো আর ঘটানো যায় না। তাহলে হয়তো তিনি দু-বাগানের মজুর ও বাবুদের সঙ্গে আলাদাভাবে মিটিং করে সর্বসম্মত প্রস্তাব বানিয়ে কোম্পানির সঙ্গে বসে সব বলতেন। কিন্তু কোম্পানির সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনটা তিনি এতই বেশি বোধ করেন যে, নানাসূত্রে ম্যানেজার-অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠতা আছে সেই ভট্‌চাযকে সঙ্গে আনতে ভোলেন নি। মনপুরানের বড়বাবু সভাপতি হয়েই মিঃ প্রধানের নাম ঘোষণা করে দিতে পারেন, কিন্তু সর্বসম্মত প্রস্তাবটি লেখার আগে ভট্‌চাযের কাছ থেকে কোনো খবর পাওয়ার আগে তো আর বলতে উঠতে পারেন না—মিঃ প্রধান যখন বলতে উঠবেন তখন সবাই চাইবে কোনো ঘোষণা শুনতে।

মিঃ প্রধানের প্রস্তাব লেখা হল, একজন এসে মিঃ প্রধানের হাতে মিঃ ভট্টাচার্যের লেখা একটা স্লিপপত্র ধরিয়ে দিল। ততক্ষণে মনপুরান ও প্লেনভিউ-এর একজন করে বাবু ও একজন করে মজুরের বক্তৃতা করা হয়ে গেছে। মিঃ প্রধান ওঠার পর সবাই খুব ঘন হয়ে আসে। মাইক নেই, সবাই জানে মিঃ প্রধান জোরে কথা বলেন না। মিঃ প্রধান চোখ তুলতে পারেনই না বোধহয়, নইলে, তিনি যদি অন্যের দৃষ্টি এড়াতে চান তাহলে এক্ষেত্রে চোখটা তুললেই তার সুবিধে হতো বেশি। তাঁর নত চোখের সামনে মাঠভর্তি শ'শ' মজুরের চোখ। অথবা বক্তৃতা করার সময় তাঁর নত চোখের সামনে এত অজস্র চোখ দেখতে পান বলেই কি তিনি এমন স্বরে কথা বলতে

পারেন যাতে মনে হয় তাঁর শ'শ' শ্রোতার প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি ব্যক্তিগত আলাপ করছেন। আর তখন এই নেপালি জনতার অনেকের মাথার টুপি, গায়ের কোট, পরনের পা-জামার মতোই পোশাকে তাঁকে যেন জনতারই একটু অলঙ্কৃত প্রতিনিধি মনে হয়। এই পোশাক সত্ত্বেও তাঁকে, শুধুই বিশিষ্ট নয়, প্রায় অপরিচিত করে তুলতে পারে যে-চশমা সেটা তিনি চোখ থেকে খুলে হাতে রাখেন, ডান হাতে। চশমা হাতে ডান হাতটা একটু একটু নাড়িয়ে তিনি যখন বলেন, মনে হয় গাঁয়ের বুড়ো মাস্টার কথা বলছে। চশমাটা মাঝেমাঝে তিনি চোখে দেন যখন কোনো কাগজ তাঁকে পড়তে হয়। বাঁ হাতে তাঁর কিছু কাগজপত্র ধরাই থাকে। চশমাটা চোখে দিয়ে দু-একটা কাগজ দেখে, অবশেষে একটা থেকে পড়ে দিয়ে আবার চশমাটা খুলে আবার হাত নাড়ানোয় শিক্ষকতার এমন একটা প্রাচীন ভঙ্গি আসে যার অনুষঙ্গে হয়তো সততা জড়িত। চেঁচিয়ে কথা না বলা, খুব সাজিয়ে গুছিয়ে না বলা, এইসব আবার ঐ ভঙ্গির অনুষঙ্গটাকে জোরদার করে। ফলে মিঃ প্রধানের বক্তৃতা করার কথা যে-মিটিঙে সে-মিটিঙে শ্রোতার অভাব হয় না, বিশেষত গরিব নেপালি শ্রোতার। বক্তা যিনি একেবারেই নন, মানুষকে উত্তেজিত করার ক্ষমতা যাঁর নেই, তাঁর সবচেয়ে বড় মূলধন হয়তো এইখানে যে সকলের ওপরই তাঁর আপাতনির্ভরতা আর প্রায় কোনো সময়ই তাঁকে অবিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু মিঃ প্রধান তো সেই অর্থে নেপালি জনতার প্রতিনিধি নন, যে-অর্থে দর্জি। হয়তো তাঁর বয়স, তাঁর মর্যাদা ইত্যাদির জন্য কেউ আশাই করে না যে তিনি তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে জড়িত থাকবেন। অথবা হয়তো গরিব মানুষের সব আবেদন যে-দরবারে, সে-দরবারে তিনি তাদের লোক হয়ে থাকুন এটাই তারা চায়। এটা খুব মজার ব্যাপার যে দর্জি তার সমস্ত নৈকট্য সত্ত্বেও গরিব জনতার অদূরে বিদেশী আর মিঃ প্রধান তাঁর সমস্ত দূরত্ব সত্ত্বেও গরিব জনতার

কাছাকাছি। হয়তো নৈকট্য সত্ত্বেও দর্জির ভেতর সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্য এখনো দেখা যায় নি যা প্রায় কয়েকশ বছর ধরে ভূগোল-ইতিহাসের নানা প্রভাবে একটা জাতির স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন হিসেবে এসে যায়।

কিন্তু তার মানে কি এই যে এই গুণগুলি বা বৈশিষ্ট্য, মিঃ প্রধানের চরিত্রে যতটা আছে, তার চাইতে বেশি তিনি দেখান। বা, এই বৈশিষ্ট্য তাঁর ভঙ্গিতে যতটা, মনে ততটা নয়? নইলে যেটাতে তাঁকে কিছুটা বিদেশী মনে হয়ে যেতে পারে সেই পাতলা রঙের কাঁচের চশমাটা অন্য সময় পরে থাকলেও বক্তৃতা করার সময় তিনি খুলে নেন কেন। নইলে, সবার পরে বক্তৃতা দেবেন বলে তিনি ভট্চাযের খবরের জন্য অপেক্ষা করেন কেন। নইলে, ভট্চায যে কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করতেই এসেছে সেটা তিনি বলেন না কেন। নির্ভর-শীলতা আর বিশ্বাসযোগ্যতা—মিঃ প্রধানের অবয়বের এই দুই মূলধন শুধু কি তাঁর শরীরেই থেকে যায়।

দশ

মিঃ প্রধান বক্তৃতা করতে উঠলে হাততালি বাজে। তিনি খুব সংক্ষিপ্ত একটা বক্তৃতা দেন। "আজকের মিটিংটিই প্রমাণ করছে কোম্পানির কাজটি ঠিক হয় নি। কেন? না, আমরা এখানে নানা বাগানের মজদুর এসেছি, দুটো বাগানের বাবুরা এসেছেন। সারাদিন সবাই বসে আছি। কেন? না, মনপুরান বাগানের ফ্যাক্টরিটা বন্ধ করো না। কোম্পানি যা ভাবে, মালিকরা যা ভাবে—সেটা কোম্পানির ভালোর জন্য। কেন? না, কোম্পানির ভালো হলে, মালিকের ভালো। আবার আমরা মজদুররা যা ভাবি, বাবুরা যা ভাবেন, আমরা যারা কোম্পানির নোকরি করি তারা যা ভাবি সেটাও কোম্পানির ভালোর জন্য। কেন? না, কোম্পানির ভালো হলে আমারও ভালো। এখানে কোম্পানি ভাবছে মনপুরানের পাতি প্লেনভিউয়ের ফ্যাক্টরিতে

আনলে সকলের ভালো হবে। আমরা ভাবছি, হবে না। যেখানে বেশির ভাগ ভাবছে হবে না, সেখানে এখন এটা বন্ধ করা দরকার। মনপুরানের পাতি, মনপুরানের ফ্যাক্টরিতেই ম্যানুফ্যাকচারিং হওয়া দরকার। কিন্তু কোম্পানি বলছে অটাম-টি প্লেনভিউ-এর ফ্যাক্টরিতে ভালো হবে। বেশ তো, যদি হয়, হবে। কিন্তু তা নিয়ে তো সবার সঙ্গে আলাপ করা দরকার, কথা বলা দরকার। আমাদের মনের ভিতর একটা সন্দেহ ঢুকে গেছে। কোম্পানি কি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না নাকি? আজ সরকারের লোকও ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিয়েছে, কোম্পানি সরকারের সঙ্গেও আলাপ করে নি। সুতরাং আমাদের সর্বসম্মত প্রস্তাব যে মনপুরানের ফ্যাক্টরি তুলে দেয়া চলবে না। এটাতে কি সবার মত আছে?" সবাই মিলে হাততালি দিয়ে ওঠে। হাততালি থামলে মিঃ প্রধান চশমা পরে ইংরেজিতে লেখা প্রস্তাবটা পড়ে দেন। আর একবার হাততালি ওঠে। মিঃ প্রধান চশমাটা খুলে বলেন, "আমরা আমাদের এই প্রস্তাব নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে আজ রাত্রিতেই আলোচনায় বসব। কোম্পানিই আমাদের সঙ্গে বসতে চেয়েছে।" আবার হাততালি। "দুই বাগানের বাবুদের আর মজুরদের ইউনিয়নের দুজন করে প্রতিনিধি মিটিঙের শেষে হাজির থাকবেন। আমরা কোম্পানির সঙ্গে বসবো। আর একটা খবর আছে। সেটা অবিশ্যি আমাদের ব্যাপার নয়, সরকারের ব্যাপার। কোম্পানি স্বীকার করেছে যে সরকারকে না-জানিয়ে মনপুরানের পাতি প্লেনভিউয়ে আনাটা ঠিক হয় নি। এখন, মনপুরানের যে-পাতি আর চা এখানে আছে সেটা তো আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না, নিয়েই বা কি লাভ, কোম্পানির সঙ্গে আমাদের মিটিঙের পর যা ঠিক হবে সেটা কোম্পানি সরকারকে জানিয়ে দেবে। এখানকার ফ্যাক্টরি আজ এখুনি চালু হবে। আমরা আশা করি আগামীকাল থেকে মনপুরানের ফ্যাক্টরিও চালু হবে। এখন আপনারা যে-যার বাগানে ফিরে যান। কোম্পানির সঙ্গে আলোচনার ফল কি হয় তা আপনাদের জানানো

হবে।" হৈ হৈ করতে করতে সভা শেষ হয়। মজুররা এলোমেলো ভাবে মাঠ থেকে বের হওয়া শুরু করে। মিঃ প্রধান প্লেনভিউয়ের বড়বাবুকে বলেন, "বড়বাবু, ওদের বাবুদের একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন, নইলে ওরা যাবেন কি করে?"

মনপুরানের বড়বাবু বলেন, "না, সবাই আছি, বেশ হৈ হৈ করতে করতে চলে যাব, তাহলে আমরা কাল সকালে ফ্যাক্টরি চালাতে পারব তো?"

"নিশ্চয়ই পারবেন। এ তো বোঝাই যাচ্ছে। কোম্পানি আগের অ্যারেঞ্জমেন্টে ফিরে যেতে রাজি না হলে কি আর এক্সাইজ ছেড়ে দিয়েছে? তবে ভবিষ্যতে কি হয়, দেখতে হবে। আজ চেষ্টা করব একটু বাঁধতে। তবে আপনাদের তো আবার আনঅথারাইজ্‌ড্‌ স্ট্রাইকই হয়ে গেছে। কনসিলিয়েশনে আপনাদের কে কে থাকবেন? বড়বাবুকে তো থাকতেই হবে।"

বড়বাবু এসে বলেন, "আপনাদের গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে, একটা স্টেশন ওয়াগন আসছে।"

"তাহলে বড়বাবু, আমরা এখন কোথায় যাব, আপনার বাড়িতে?" মিঃ প্রধান জিজ্ঞাসা করেন। বড়বাবু বলেন, "আপনারা চলুন একটু অফিসে বসবেন, তারপর সাহেবকে খবর দিচ্ছি।"

এগার

আসলে আজ সকাল থেকেই বড়বাবু সমস্ত উদ্যোগ হারিয়ে বসে আছেন। তার কারণ অবিশ্যি বড়বাবু নিজেই। সাত-সকালে অশ্বিনীর বাড়ির লোকটি এসে বাড়বাবুর হাতে নোটিশটা দেয়ার পর, বড়বাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেটা পড়ে ফেললেও তাঁর পক্ষে ঐ অদ্ভুত ভাষার সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ধার সম্ভবই ছিল না। কিন্তু ফ্যাক্টরি আর উই-দারিং হাউস দুটো যে বন্ধ থাকতে পারে সেটা তিনি বোঝেন। হয়তো তাঁর পক্ষে উচিত ছিল রাধারমণবাবুর সঙ্গে গিয়ে চিঠিটা নিয়ে কথা

বলা। আসলে হয়তো বড়বাবু চিঠিটাতে বিরক্তই হন। বিরক্ত যদি হয়েই থাকেন তা যতটা না চিঠির জন্য তার চাইতে অনেক বেশি অশ্বিনীর সইয়ের জন্য। এমন চিঠি অশ্বিনী সরকারের সইয়ে আসে কেন, যে-অশ্বিনী সরকারের মাসিক আয়, বাড়বাবুর কাছ থেকে কিছু কিছু না পেলে, বড়বাবুর অফিসের ছোট কর্মচারীর সমানও হয় না। অসময়ে রাগটা হয়ে যাওয়ায় বড়বাবু চিঠিটা ফেলে রেখে খানিকটা সময় মিছিমিছি নষ্ট করে ফেলেন শুধু অশ্বিনীর ওপর তার গায়ের ঝাল মেটাবার জন্য। বড়বাবু যদি তখনই সাহেবদের কানে খবরটা পৌঁছে দিতেন তাহলে এই বেইজ্জতি অবস্থার মধ্যে বাগানকে পড়তে হতো না। বিলেতে বাগানের কোনো ডিরেক্টার মারা গেছেন—সেই বলে বাগান ছুটি দেওয়াও যেত। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বেরিয়ে বড়বাবু যখন চিঠিটা রাধারমণবাবুকে দেখান তখনই বোঝা যায় চিঠিটাতে অশ্বিনী সরকারের সইটা আসল ব্যাপার নয়, আসল ব্যাপার চিঠির ভেতরের কথাগুলো। তখনই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের কাছে রাধারমণ বাবুকে নিয়ে ছুটে যাওয়ার পর চিঠি পড়ে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন—কখন নোটিশটা পাওয়া গেছে। তারপর থেকে ওটার নাম আর চিঠি নয় নোটিশ। বড়বাবু ততক্ষণে বুঝে গেছেন যে তাঁর দেরি হয়ে গেছে। সুতরাং চোখকান বুঁজে বলে ফেলেন—তখুনি পেয়েই ছুটে এসেছেন।

তবু বড়বাবুর শেষ ভরসা ছিল যে যত বড় সই-করণেঅলাই অশ্বিনী হোক্ না কেন, ফ্যাক্টরির গেট অশ্বিনী বন্ধ করতে পারবে না। ভরসাটা ছিল বটে, ভেতরে ভেতরে হয়তো একটু ভয়ও ধরেছিল যখন সাহেব যে-কোনো টাকায় অশ্বিনীকে নোটিশটা তুলে নিতে বাধ্য করার জন্য বলেন। বড়বাবু তার বাড়িতে গিয়েছে শুনেও অশ্বিনী যখন ছুটে বাইরে না এসে তাকে বসিয়ে রাখে, ভয়টা তখন বেশ দলা পাকালেও পাঁচ হাজারের খামটা অশ্বিনী এভাবে ফিরিয়ে দেবে—এটাই বড়বাবু বোধহয় কল্পনা করেন নি। প্রথমে মনে হয়ে থাকতে

পারে বড়বাবু যে আবার ভাগ বসিয়েছে সেটাই অশ্বিনী ধরে ফেলেছে কিন্তু অশ্বিনীকে পুরো টাকাটা দিলেও কিছু হতো না।

বড়বাবুর সমস্ত উদ্যোগে শেষ মার খেয়েছে এরপর ম্যানেজারের মুখের সামনে পড়ে। ম্যানেজার যদি রাগে ফেটে পড়ে বড়বাবুকে জুতো দিয়ে দুচার ঘা মারতেন তাহলে সেটা প্রায় একশ বছরের পুরনো এই শিল্পে ম্যানেজার আর বড়বাবুর সম্পর্কের অজস্র কাহিনীর সূত্রে তৈরি ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলে যেতে পারত। ম্যানেজার থম থমে মুখে বড়বাবুকে বসতে বলেন-- আর তারপর বড়বাবুর পাশ দিয়ে তাকিয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলে যান, একটুও রাগ না দেখিয়ে—বড়-বাবুর উচিত ছিল ইণ্ডিয়ান স্টাফদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কোম্পানিকে ওয়াকিফহাল রাখা, বড়বাবুই সে কাজটা বরাবর করে আসছেন বলে কোম্পানিও ঐ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কিন্তু এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে কি করে যে, যে-অফিসারের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ, বড়বাবু নিজে যার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সে এতবড় একটা ব্যাপারের কোনো আঁচ কোম্পানিকে দিল না? ম্যানেজারের এখন সন্দেহ হচ্ছে ইণ্ডিয়ান স্টাফ রিলেশনের সমস্তটাই এ-রকম ফাঁকা কি না। ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত ছিল এর পর থেকে বড়বাবু নিজে যেন কোনো ইণ্ডিয়ান স্টাফ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত না নেন, সবসময় যেন তাকে বা কোনো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারকে সব জানিয়ে রাখেন।

এর শাদা মানে বড়বাবু বিভিন্ন অফিসারকে ঘুষ দেয়ার জন্য যে-টাকা কোম্পানির কাছ থেকে নেয় সে-টাকা সেই অফিসাররা পায় কিনা এই নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে সুতরাং এই সব কাজ কোম্পানি আর বড়বাবুকে দিয়ে করাবে না।

এরপর বাড়ি গিয়ে বসে থাকা ছাড়া বড়বাবুর আর কী করণীয় ছিল? বড়বাবু তাকে কোনো টাকা দিয়েছেন কিনা, দিয়ে থাকলে কোন দফায় কত কত দিয়েছেন, এই সব হিসেব যদি ম্যানেজার

অশ্বিনীর কাছ থেকে নেন আর অশ্বিনী যদি বলে বসে সে কোনোদিনই কোনো টাকা নেয়নি বা এমন-কি সত্যি হিসেবটাও যদি দিয়ে বসে তাহলে বড়বাবুর বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের অভিযোগ এসে যায়—এমন একটা আশঙ্কা তো থেকেই যায়, ঘুষের টাকার তহবিলের হিসেব এ-ভাবে হওয়া যতই কেন না অবাস্তব হোক। কিন্তু বাস্তব তো সারাদিন ধরে এটাই যে বাগানের এতবড় ব্যাপারে পরামর্শের জন্য বড়বাবুর কাছে কেউ আসে নি আর কোম্পানির কাছে ঘটনাটা ঘটার একমাত্র কারণ বড়বাবু তার কর্তব্য করেন নি, কোম্পানিকে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রাখেন নি, ইণ্ডিয়ান স্টাফদের সঙ্গে কাজের সূত্রে বোঝাবুঝি তৈরি করতে পারেন নি। আজকের অবস্থাটার রিপোর্টে নিশ্চিত থাকবে বড়বাবুর ব্যর্থতা এই দুর্ঘটনার অভ্যন্তরীণ কারণ। অন্য কর্মচারীদের বেলায় যা-হোক বড়বাবুদের সঙ্গে যদি একবার ম্যানেজারদের বোঝাবুঝি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কোম্পানি সে-বড়বাবুকে বাগানে আর রাখে না। এই নীতিটা জানা থাকায় বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ থেকে শুরু করে বদলি, আর একজনকে দিয়ে বড়বাবুর সমস্ত কাজ করিয়ে বড়বাবুকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা—এ সবই বড়বাবুর ভবিষ্যতের কল্পনার বিষয় হতে পারে। বড়বাবুর উদ্যোগ গত কয়েকটিমাত্র ঘণ্টায় এমন নষ্ট হয়ে যায় যে মিঃ প্রধান যখন মনপুরানের বাবুদের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থার অনুরোধ করেন তখন কোনো সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করে গাড়ি ঠিক করার সাহসও তাঁর থাকে না। যেমন আজ দুপুরে মনপুরানের বাবুদের সঙ্গে সামাজিকতার দায়িত্ব বড়বাবু বাগানের তরফ থেকে নিতে পারেন নি।

বারো

অশ্বিনীকে সময় মতো কেমন নৈর্ব্যক্তিক হয়ে যেতে হয়, যেন-বা সত্যিসত্যি লবণের পুতুল সাগরে পড়ার মতো নৈর্ব্যক্তিক।

নইলে যার সই করা নোটিশ নিয়ে সারাদিন ধরে এত কাণ্ডকারখানা, সে গেটে এক দারোয়ান দাঁড় করিয়ে রেখে ফ্যাক্টরির ভেতর সেই-যে ঢুকে যায় আর বেরয় না, আর কেউ তার খোঁজও নেয় না। অশ্বিনী যে ফ্যাক্টরি থেকে বেরয় না তার একমাত্র কারণ বেরলেই তাকে ফ্যাক্টরি সিল করতে হবে। ফ্যাক্টরি সিল করতে হলে আবার ম্যানুয়াল এনে দেখে নিতে হবে কি কি করতে হবে। যাই পদ্ধতি হোক্ না কেন সিল যদি অশ্বিনী একবার করে দেয় তাহলে সে আর খুলতে পারবে না। অথচ অশ্বিনী যতক্ষণ ভেতরে থাকবে ততক্ষণ এটাই বোঝাবে যে সে সব যাচাই করে দেখছে, আর ফ্যাক্টরিবাবু তাকে দেখাচ্ছে। সে সব দেখার পর সেন্ট্রাল এক্সাইজ তার নির্দেশ দেবে।

অশ্বিনীর ক্ষেত্রে, নির্দেশ অশ্বিনী দেবে না, নির্দেশটা আপনা থেকে তৈরি হয়ে যাবে বা জন্ম নেবে, ব্যবস্থাটাই এমন। গতরাতে ব্যবস্থাটাই এমন জায়গায় এসে অশ্বিনীকে ফেলে দিয়েছিল যে টাইপ করা নোটিশে অশ্বিনীর সইটা কোনো ব্যাপারই নয়, অশ্বিনী না করে তো চোদ্দপুরুষ করবে, কপি করার সময় তো সবজায়গাতেই লেখা হবে স্বাক্ষর অবোধ্য। সেন্ট্রাল এক্সাইজের আইন আর তাদের উৎপাদনক্রমের ভেতর যোগাযোগের ফলে আবার একটা টাইপ করা কাগজ বেরোবে যাতে অশ্বিনী স্বাক্ষর করবে, সেই স্বাক্ষর যা সবসময়ই অবোধ্য।

ফ্যাক্টরিবাবুকে দুই বাগানের হিসেব আলাদা আলাদা করে লিখতে বলে অশ্বিনী কিছুক্ষণ বসে থাকে। ফ্যাক্টরিবাবু খুবই ঢিমে তালে এক-একটা খাতা থেকে অঙ্কগুলো দেখে দেখে শাদা কাগজটাতে লিখছে। অশ্বিনী আর ফ্যাক্টরিবাবু দুজনই জানে কাজটা অর্থহীন,—দু-বাগানের হিসেব দু-বাগানের খাতাতেই লেখা আছে। কিন্তু ফ্যাক্টরিবাবুকে তো অশ্বিনীর একটা কিছু কাজ দেয়া দরকার। সে এমন ভাব করে যেন সমস্ত হিসেবটা তার একটা

কাগজে পাশাপাশি কলমে দরকার—যাতে সে চোখের সামনে রেখে সমস্ত হিসেবটা বুঁঝতে পারে।

কিছুক্ষণ ফ্যাক্টরি-অফিসে বসে থাকার পর আবার উঠে যাওয়ার জন্য অশ্বিনীকে একটা শাদা পাতা ভাঁজ করে, আর একটা পেন্সিল পকেটে নিতে হয়। ফ্যাক্টরির ভেতরে গিয়ে দেখে বিড়ালটা ম্যাও ম্যাও করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অশ্বিনীর ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ আগে ফ্যাক্টরিবাবু যেমন বিড়ালটাকে পায়ে পায়ে নিয়ে খেলছিলেন তেমনি খেলে। সে বিড়ালটার দিকে এগিয়ে যায়। বিড়ালটা দাঁড়িয়ে পড়ে ডাকা থামিয়ে দেয়। তারপর যেন খানিকটা সন্দিগ্ধভাবে আস্তে ডাকে। অশ্বিনী তার পা-টা আলতোভাবে বিড়ালটার কোমল পিঠের উপর রাখতেই বিড়ালটা মুখটা একটু ঘুরিয়ে আহ্লাদের স্বরে আরো সরু করে ডাকত থাকে। অশ্বিনী ও-রকম এক পা তুলে দাঁড়িয়েই থাকে—সে কায়দাটা জানে না যাতে বিড়ালটাকে নিয়ে বলের মতো খেলা যায় অথবা বিড়ালটাও অশ্বিনীর পায়ে পায়ে সেই খেলা খেলাতে সম্পুর্ণ আস্থা পায় না। একটা কাগজে বল বানিয়ে বিড়ালটার সঙ্গে শিকার-শিকার খেলা যেতে পারে ভেবে অশ্বিনী তার পা নামিয়ে নিয়ে চারপাশে কাগজ-টাগজ খোঁজার জন্য তাকায়। আবার সেই নিঃসঙ্গ চায়ের স্তূপগুলি, যার পাশে অশ্বিনী সব সময় মানুষ দেখতে অভ্যস্ত—অশ্বিনীর চোখে পড়ে। অশ্বিনী চায়ের প্যাকিং যেখানে হয় সেই জায়গায় গিয়ে আবার একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ে। পেছনে পেছনে বিড়ালটা কিছুটা দূরত্ব রেখে ম্যাও ম্যাও করতে করতে তাকে অনুসরণ করে। গলির মাঝামাঝি যাওয়ার পর অশ্বিনীর আবার সেই ভয় ধরে। যদি বেড়ালটা তার উপর পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অশ্বিনী তার হাঁটার গতি বাড়ায়। বেড়ালটাও। গলির শেষে গিয়ে অশ্বিনী দেখে একটা প্যাকিং বাক্সের উপর কিছু রাঙতা আর প্যাকিং কাগজ রাখা আছে। অশ্বিনী একতা রাঙতা তুলে দেয়। সেটা দুমড়ে মুচড়ে একটা বলের মতো বানিয়ে অশ্বিনী

গলিটার ভেতর বেশ খানিকটা জোরে ছুঁড়ে দেয়। বেড়ালটা ঘাড় ঘুরিয়ে সেই রাঙতার বলটার পড়া দেখে। তারপর ডাক থামায়। গুটিগুটি পায়ে সেই বলটার দিকে এগিয়ে যায়। বলটার কাছাকাছি গিয়ে নাক নামায়। তারপর একটা থাবা তুলে বলটার ওপর মারে, বলটা পেছিয়ে যায়। বেড়ালটা বলটার ওপর দিয়ে লাফিয়ে বিপরীত দিকে গিয়ে আর একটা থাবা মারে। বলটা বেড়ালটার পেটের দিকে চলে যেতেই সামনের পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে কোমরটাকে ঢেউয়ের মতো তুলে বেড়ালটা ওদিকে চলে এসেই লেজ দিয়ে বলটাকে একটা ঝাপট মারে। অশ্বিনী দেখে আর আরেক তা রাঙতা দিয়ে আরেকটা বল বানাতে শুরু করতেই বাইরে থেকে শ্লোগানের প্রবল ধ্বনি শোনা যায়। রাঙতাটা হাতে নিয়েই অশ্বিনী কান খাড়া করে শ্লোগানের শব্দগুলো বোঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু দেয়ালে লেগে শব্দগুলো ভেঙে যায়। অশ্বিনী সরে গিয়ে দেয়ালে কান পেতেও কিছু বুঝতে পারে না। বোঝার জন্য দেয়ালটার মাথা থেকে তলা পর্যন্ত তাকিয়ে বাতাসের জন্য দেয়ালের ওপরে দু ইঞ্চি মতো তারের যে ঢাকনি দেয়া আছে সেটার কাছে উঠে উঁকি দিয়ে দেখতে, কোণায় রাখা টেবিল মইটা অশ্বিনী টেনে নিয়ে আসে। একবার গলিটার দিকে তাকায়—যদি ফ্যাক্টরিবাবু দেখে ফেলে। ঐ মাথা থেকে দেখা যাবে না আর যদি ফ্যাক্টরিবাবুর পায়ের শব্দ শোনে, নেমে আসবে।

কিন্তু ওপরে উঠেও অশ্বিনী দেখতে পায় না। ফ্যাক্টরিটা দোচালা। তাতে তার মাথাটা চালে ঠেকে চোখটা ঐ তারের ওপরে উঠে যায়। মইয়ের একটা তাক নিচে নামলে মাথাটা বেশি নেমে আসে। ফলে অশ্বিনীকে উপরের তাকে উঠে ছাতে ডান হাতের ভর দিয়ে মাথাটাকে একপাশে সরিয়ে দেখতে হয়। তাও মিছিলটার গোড়া দেখতে পায় না। ফ্যাক্টরি-অফিসের চালের বাড়তি অংশটাতে সেটা ঢাকা পড়েছে। অফিসে বসলেই তো সব দেখা যাবে ভাবার

পরেই মনে হয় গেট তো বন্ধ। অশ্বিনী দেখে সবাই ধীরে ধীরে বসে পড়ছে। অশ্বিনীর চোখের সামনে একজন প্যাণ্ট পরা লোককে অশ্বিনীর চেনা মনে হল কিন্তু একই সমতলে দাঁড়িয়ে যে-চেনা, তাকে এতটা উঁচু থেকে একটা ছোট ফাঁক দিয়ে দেখে ঠিক কোথায় দেখেছে মনে করতে পারে না। একটা বক্তৃতার ধ্বনি শোনা যায়। যে-বক্তৃতা দিচ্ছে তাকে দেখা যায় না। অশ্বিনী আরো খানিকক্ষণ দেখে নেমে আসার সময় খেয়াল করে বল বানাবার জন্য যে রাঙতার পাতটা সে হাতে নিয়েছিল সেটা হাতেই আছে। সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে আর একটা বল বানাতে বানাতে অশ্বিনী আর একটা গলি পেরতে থাকে।

পেরিয়ে এসে অশ্বিনী একবার বেড়ালটিকে দেখার জন্য প্রথম গলিটার মুখে দাঁড়ায়। দেখে অত দীর্ঘ গলিতে, বিরাট উঁচু চা-বাক্সের নিচে বেড়ালটা বলটাকে চার পা দিয়ে লোফালুফি করতে করতে নিজেও একটা বল হয়ে যাচ্ছে—আর বল, ছায়া, বেড়াল একই জায়গায় গোল হয়ে ঘুরছে।

তের

নতুন তৈরি বলটাকে একটা মেসিনের আড়ালে লুকিয়ে রেখে, বোধহয় বেড়ালটা আর ফ্যাক্টরিবাবুর হাত থেকে বাঁচাতে—অশ্বিনী ফ্যাক্টরি-অফিসের ভেতর ঢুকে বলে, "কি আপনার হিসেব হলো?" তারপর পকেট থেকে পেন্সিল আর কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে কোটটা খুলে ফেলে চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে দেয়।

"এই হচ্ছে।"

"আচ্ছা মনপুরানের অ্যাভারেজ পাতির কোনো হিসেব আছে?

"সে তো এখানে নেই, এখানে আমাদের বাগানেরটা আছে। ওদের বাগানেরটা ওদের বাগানে থাকতে পারে, নিশ্চয়ই আছে।"

"দু বাগানকে এক করে দিয়েই তো মুশকিলটা বাঁধানো হয়েছে।

আচ্ছা, এবারের পাতি কি অ্যাভারেজ, না অ্যাভারেজের চাইতে কম বা বেশি ?”

“আমাদের বাগানে অ্যাভারেজই বলতে পারেন, অটাম-টিটা একটু বেশি হচ্ছে এবার—তা অ্যাভারেজে ধরলেই হবে।”

“তাহলে আপনার এই হিসেবটা হয়ে গেলে আর একটা হিসেব দেবেন গেল পাঁচ বছরের অ্যাভারেজ ক্রপস্ আর এ-বছরেরটা। মনপুরান আর প্লেনভিউয়ের জয়েণ্ট ক্রপস থেকে প্লেনভিউয়ের অ্যাভারেজটা বাদ দেবেন। মিলিয়ে দেখব সেটা মনপুরানের অ্যাভারেজের সঙ্গে মেলে কিনা। যদি মেলে তাহলে বাঁচোয়া। বলা যাবে যে দুই বাগানের পাতি এক ফ্যাক্টরিতে আসছে। কোম্পানির একটা টেকনিক্যাল ভুল হয়েছে এক্সাইজকে না জানানো। কিন্তু যদি না মেলে তাহলে বুঝতেই হবে মনপুরান ছাড়াও অন্য কোথাও থেকে পাতি আসছে। তাহলে তো সিরিয়াস ব্যাপার”—কাগজ-পেন্সিল নিয়ে অশ্বিনী আবার বেরিয়ে যায়।

লুকনো জায়গা থেকে বলটা বের করে অশ্বিনী গলিটার ভেতর ঢোকে। বেড়ালটার কাছাকাছি গিয়ে বলটা এমনভাবে ছোঁড়ে যাতে বেড়ালের গায়ে লেগে ওদিকে চলে যায়। বেড়ালটা চমকে এমন একটা লাফে সরে আসে যে বাক্সের গায়ে লেগে উল্টে পড়ে। তারপর নতুন বলটার দিকে তাকিয়ে দেখে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায়। কাছে দাঁড়িয়ে গর গর করে, তারপর গন্ধ শোঁকে। গন্ধ শুঁকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। অশ্বিনী তখন পুরনো বলটা হাতে তুলে নিয়ে ওর খেলা দেখে। এবার আর বেড়ালটা থাবা দিয়ে খেলে না। সামনের দুই পায়ের মাঝখানে বলটা চেপে ধরে মাথাটা নিচু করে বলটাতে বোধহয় দাঁত বসাতে যায় আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উল্টে যায়। উল্টে যাবার পর আবার বিপরীত দিক থেকে একই কায়দায় বলটাকে সামনের দুই থাবার ভেতর নিয়ে মুখটাকে নামিয়ে বলটাকে তলার দিক থেকে কামড়াতে চায়। আবার উল্টে যায়। থাবা

দিয়ে বল খেলা শেখার শেষে বেড়ালটা দাঁত দিয়ে বল খেলা শিখছে—দৃশ্যটা অশ্বিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন দেখে। তার বুক-পকেটে পেন্সিল আর শাদা কাগজ।

বাইরে আবার শ্লোগান শুনে অশ্বিনী তাড়াতাড়ি মইটাতে গিয়ে চড়ে। এবার সে পরিষ্কার দেখতে পায় তাদের ঢালু বেয়ে মিছিলটা উঠে আসছে, দর্জি কোণাকুণি মাঠ পেরচ্ছে, মিছিলের মাথার উপর দিয়ে এমপ্লয়িজ ক্লাবের বারান্দায় বাবুদের দেখা যাচ্ছে, দর্জি মিছিলটাকে নিয়ে মাঠের ভেতর ঢুকছে, মিছিলটা থামল না, ফ্যাক্টরিটাকে ঘুরে উত্তরঢালুর দিকে চলে যাচ্ছে। ছ-ইঞ্চির তারের ফাঁক দিয়ে অশ্বিনী শুধু ওদের মাথার ওপরটাকে দেখতে পাচ্ছে—কালো একটা স্রোত, মাঝেমাঝে নানা রঙের ফুল।

অশ্বিনী মই থেকে নামে। গলির মুখে এসে দেখে বিপরীত দিকে ফ্যাক্টরিবাবু দাঁড়িয়ে আছে। অশ্বিনী পেন্সিলটা নিয়ে প্যাকিং বাক্সগুলোর গায়ে টিক দেয়া শুরু করে। সে মইয়ের ওপর বলেই কি ফ্যাক্টরিবাবু আর আসেন নি, কিন্তু মইয়ের ওপর তো সে অন্য কারণেও উঠতে পারে। কারণটা দেখাবার জন্যই মইটা টেনে এনে অশ্বিনী উঠে একেবারের ওপরের তাকের বাক্সগুলো দেখে কাগজের ওপর কি নোট করতে থাকে।

মই থেকে নেমে, মইটা সরিয়ে অশ্বিনী দেখে হাতে তার রাঙতার বলটা রয়ে গেছে। সে বেড়ালের গলিটার মুখে গিয়ে দেখে বল, বলের ছায়া, আর নিজের শরীরের ছায়া নিয়ে সেই দীর্ঘ গলিপথে বিড়ালটা একটুখানি জায়গার ভেতর হুটোপুটি খেয়েই যাচ্ছে। আস্তে করে বলটা ফেলে দিয়ে সে পাশের গলি দিয়ে ফ্যাক্টরিবাবুর দিকে এগোতে থাকে। ফ্যাক্টরিবাবু অশ্বিনীকে আসতে দেখে একটু সরে যায়।

অশ্বিনী পৌঁছতেই ফ্যাক্টরিবাবু জিজ্ঞাসা করে, "আপনি, যেগুলি লিখতে বলেছেন হয়ে গেছে ; আর কিছু লাগবে ?"

"না, চলুন দেখি"—

যেতে যেতে পেছন থেকে ফ্যাক্টরিবাবু বলেন, "আপনি বলেছিলেন ফার্মেন্টেশনের পাতিটা তুলতে দেবেন, তা ও-পাতিটা তো নষ্ট হয়েই গেল"—

অশ্বিনী ঘুরে দাঁড়ায়—"কিন্তু আপনি বলেছিলেন, বারোটা"—

"হ্যাঁ, এখন তো দেড়টা বাজে, আর বারোটাতেও দেরি হয়ে যেত—এখন আর বোধহয় পাতিগুলো রাখা যাবে না।" অশ্বিনীর যেন একটা কাজ জোটে। তাড়াতাড়ি বলে, "চলুন তো, দেখি"—ফ্যাক্টরিবাবু আর অশ্বিনী ফার্মেন্টেশন ঘরের দিকে চলে। ফ্যাক্টরি-গেট দিয়ে ঢুকেই বাঁ-হাতি অফিস। তারপর প্রসারিত দীর্ঘ করিডরের ডাইনে-বাঁয়ে বেরিয়ে গেছে,—বয়লার চেম্বার, প্যাককরা চা-রাখার জায়গা, চা-প্যাক করার জায়গা, ড্রায়ার মেশিন, তিনসারি রোলার, শিফ্টার, আর এ-সবের শেষে ফার্মেন্টেশন চেম্বার, ফ্যাক্টরির ভেতরেই বটে কিন্তু আলাদা বিরাট শেড, একটা ছোট্ট ঘেরা করিডর দিয়ে গিয়ে দরজাটার সামনে দাঁড়াতে হয়।

ঘরটা আধো অন্ধকার। ঢোকামাত্র গা শিরশিরায়, এত ঠাণ্ডা। পায়ের তলে জল প্যাঁচ প্যাঁচ। প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। চোখটা সয়ে এলে বোঝা যায় লম্বা আধো অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরটার বিরাট মেঝে জুড়ে রোলার মেশিনে ভাঙা, থেঁতলানো, পেষা, নিংড়নো পাতি বিছনো আর সেই বিছনো পাতির ট্যানিন্, ক্যাফিন, প্রোটিনের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনকে মিশিয়ে চা-পাতির প্রাকৃতিক রসায়ন বদলে চা-পাতির রং, লিকারের রং বানানো হচ্ছে। সেই রসায়ন তৈরির জন্য ফার্মেন্টশনের সময় ঘরের তাপ বাড়তে দেয়া যায় না।

এমন মেঝেতে চা-পাতি ছড়ানো যাবে না, যে-মেঝে গরম হয়ে ওঠে। রোদ যেন না ঢোকে। গরম বাতাস যেন না ঢোকে। ঘরের গরম বাতাস যেন বেরিয়ে যায়। তার জন্য এক্সহস্ট ফ্যান দেয়ালে লাগানো। শীকরকণা ছিটিয়ে দিতে মিস্ট স্প্রেয়ার।

এই ফার্মেণ্টেশন ঘরের মেঝেতে কাল শেষ রাতে ছড়ানো চা-পাতি গুলো পড়ে আছে। চোখ যতক্ষণ সয়ে যায় নি অশ্বিনীর নাকে শুধু গন্ধ লাগছিল। খুব মিষ্টি গন্ধ। গন্ধটা ঠিক চেনা যায় না। কিন্তু এই গন্ধের সঙ্গে অশ্বিনীর মনে মাছির অনুষঙ্গ আসে। চোখ সয়ে এলে দেখে চা পাতি সারা মেঝেতে ছড়ানো। ফ্যাক্টরিবাবু একটু হাতে তুলে নিয়ে দেখে। অশ্বিনী দেখে কাঁচা চামড়া জলে ভেজালে যেমন রং হয় তেমনি রং। অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "কী? নষ্ট হয়ে গেছে, না আছে?"

"নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই আমাদের এখানে তিন ঘণ্টার বেশি ফার্মেণ্টেশন দরকার হয় না। অটাম-টি আমরা কোনো কোনো সময় চার সাড়ে চার ঘণ্টা পর্যন্ত দি। ছঘণ্টাতেও বাঁচানো যায়—এখনকার আবহাওয়ায়। কিন্তু এ তো প্রায় সাত ঘটা হতে চললো।" ফ্যাক্টরিবাবু ঘরটার বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করেন মুখটা পাতি-গুলোর ওপর ঝুলিয়ে—ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে যেমন চাষী যায়। অশ্বিনীর আবার মনে হয় লোকটার বোধহয় চায়ের ব্যাপারে সত্যি সত্যি দরদ আছে।

অশ্বিনী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাতিগুলোর দিকে চেয়ে আছে। সে বোঝে না পাতিগুলো নষ্ট হয়েছে কি না। কাঁচা চামড়া ভেজানো রং সারাটা মেঝেয়। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে থাকতে অশ্বিনীর কাছে ধরা পড়ে পাতাগুলো যেন পুরো রঙ পায় নি। রসটা শুকিয়ে গেছে বা গেঁজে গেছে—কিছু একটা হবে যাতে পাতিগুলোকে ভেজা অথচ পচার মতো লাগছে—ব্যবহৃত চা-পাতি ফেলে দিলে খানিকটা পর যেমন লাগে। একবার অশ্বিনী যখন পাতিগুলির পচনক্রিয়ার

লক্ষণটা দেখতে পায় তখন চোখ তুলে সারাটি মেঝেতেই তাই দেখে। সে-ও ফ্যাক্টরিবাবুর মতো হাঁটতে শুরু করে। হঠাৎ অশ্বিনীর মনে পড়ে যায় ঘরময় যে ভারি মিষ্টি গন্ধটা নছড়ে না আর যে-গন্ধে তার বারবার মাছির কথা মনে আসছে সেটা পাকা কাঁঠাল ভাঙার পরের গন্ধ। আগে আগে ফ্যাক্টরিবাবু, পিছে পিছে অশ্বিনী, আস্তে আস্তে পা ফেলার কারণ এটা হতে পারে যে তাদের হাতে সময় আছে। কিন্তু যেভাবে তারা পা ফেলছিল তাতে সহজেই মনে হতে পারে যে তারা একটা শবদেহের চারপাশে ঘুরছে। যে-পাতিগুলো কাল সকালে বা পরশু বিকেলে তোলা হয়েছে, উইদারিং র‍্যাকে যে-পাতি গুলোকে শুকানো হয়েছে, যে-পাতিগুলোর আজ এতক্ষণে ড্রায়ারে যাওয়ার কথা, যে-পাতিগুলোর কাল সকালে প্যাক হয়ে ছু একদিনের মধ্যে বাজারে চলে যাওয়ার কথা—সেই পাতিগুলো এখন ওই ফার্মেণ্টেশনের ঘরে পচছে। কালচে এঁকেবেঁকে যাওয়া শুকনো খটখটে পাতার বদলে পড়ে আছে সোজা হয়ে যাওয়া পাতা—মরে গেলে মানুষের সমস্ত ভঙ্গি যেমন শক্ত জড় হয়ে যায়। এই পাতিগুলো তো নষ্ট হয়েছে, যদি এখনো এদের সরিয়ে ফেলা যেত তাহলে হয়তো বীজাণুর জন্ম আটকানো যেত। এরপর আবার সমস্ত ঘরটাকে বীজাণুমুক্ত করতে হবে। অশ্বিনীর একটা সইয়ের জোরে এই পাতি-গুলোর মৃত্যু ঘটে যায় অথচ অশ্বিনী তার জন্য বেদনা দায়িত্ব বোধ করে না। এখন, যখন সে প্রায় শোকনম্র শ্রদ্ধা প্রকাশের ভঙ্গিতে ঘরটাকে প্রদক্ষিণ করছে, তখন, তার ভেতর কোনো অনুতাপও যেমন নেই তেমনি নেই এই চা-পাতির উৎপাদনের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে উপজাত কোনো বেদনা বোধ—যা হয়তো-বা ফ্যাক্টরিবাবুর ভেতর আছে। একটা জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গেল অব্যবহারে—এর যে সর্বজনীন দুঃখ সেটাই বোধহয় অশ্বিনীকে স্পর্শ করে থাকবে। চায়ের পাতার এই ব্যাধিগ্রস্ত চেহারা দেখতে দেখতে অশ্বিনী ভাবে না কিছুই। সে একবার জিজ্ঞাসা করে, "আপনাদের উইদারিং র‍্যাকের

পাতিগুলোও তো গেল বোধহয়।" ফ্যাক্টরিবাবু জবাব দেন—"সেগুলোর ব্যবস্থা করা যাবে, কিন্তু এগুলো তো জন্মের মতোই গেল।"

সমস্ত ঘরটা ঘুরে এসে অশ্বিনী আবার পুরনো জায়গায় দাঁড়ায়। তারপর ফ্যাক্টরিবাবুকে বলে "চলুন"। ঘর থেকে বেরতে বেরতে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "আপনাদের ফ্যাক্টরি আবার খোলার আগে নিশ্চয়ই এটা পরিষ্কার করে নেবেন।"

"হ্যাঁ তা করতেই হবে। এতগুলো চা-পাতি নষ্ট হয়েছে—এটা মজুরদের ওপর খুব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।" ফ্যাক্টরি শেডে তখন আঁধার জমতে শুরু করেছে।

পনর

অফিসে এসে আলো জ্বেলে বসার কিছুক্ষণ পরই ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এসে ঢোকেন। ফ্যাক্টরিবাবু দাঁড়িয়ে ওঠেন। অশ্বিনী বসে থাকে। ফ্যাক্টরিবাবুর ছাড়া-চেয়ারটায় বসতে বসতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কথা শুরু করেন, "ইজ ইয়োর অ্যাকাউন্ট কমপ্লিট ?"

"ইয়েস"

"আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ নট গন্ ফর অ্যাকচুয়াল ওয়েইঙ"—

"নো আই সেইড্ দ্যাট আই ওন্ট রিকোয়্যার দ্যাট"—

"অলরাইট, নাউ মিঃ প্রধান এম-এল-এ ইজ হোল্ডিং এ মিটিং। আফটার দ্যাট উই উড বি মিটিং ফর কনসিলিয়েশন। নাউ ইউ ক্যান ইজ থিঙস। উই আর গিভিং ইউ দিস লেটার রিগ্রেটিং আওয়ার মিসটেক"—

অশ্বিনী চিঠিটা নিয়ে দেখে। লেখা আছে, কোম্পানির তরফ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে যে মনপুরানের পাতি প্লেনভিউয়ে আনার ব্যাপারটা আগেই এক্সাইজকে জানানো হয় নি। যাহোক

এ-রকম ভুল আর হবে না। কোম্পানি জানাচ্ছে যে, মনপুরানের পাতি, প্লেনভিউয়ের ফ্যাক্টরিতেও আসতে পারে, মনপুরানের ফ্যাক্টরিতেও ম্যানুফ্যাকচারিং হতে পারে। যদি প্লেনভিউয়েই ম্যানুফ্যাকচারিং হয় তাহলে অনুরোধ করা হচ্ছে এক্সাইজ যেন মনপুরানের থেকে গ্রিন লিফের ডেসপ্যাচ ও প্লেনভিউয়ে রিসিপ্টের ব্যাপার তাঁদের হিসেবে রাখেন।

সমস্ত চিঠিটা পড়ে অশ্বিনী ফ্যাক্টরিবাবুর তৈরি লিস্ট দুটো সহ চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "এই দুটো ঐ চিঠির সঙ্গে এনক্লোজ করে দেবেন। আর আপনাদের অফিসে এক্সাইজ ম্যানুয়াল আছে তো?"

সাহেব বলেন, "লাইকলি"—

অশ্বিনী বলে, "না থাকলে আমার বাড়ি থেকে আনিয়ে নিতে পারেন। ওখানে নোটিশ উইড্রয়ালের যে-স্পেসিমেন আছে সেটা একটা টাইপ করে দেবেন। সঙ্গে 'আফটার ফিজিক্যাল ভেরিফিকে-শন অফ দি লিস্ট এনক্লোজ' যোগ করে দেবেন।" সাহেব বেরিয়ে যান।

আধঘণ্টাটেক পরে কাগজগুলো যখন একজন মজুর মারফৎ আসে, অশ্বিনী বাগানের চিঠিটা ফ্যাক্টরিবাবুকে দেখিয়ে বলে, "কার সই?"

"সুপার-ইন-টেনডেণ্টের"—

নোটিশ উইড্রয়ালের চিঠিটা নিয়ে সই করতে করতে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "সুপার-ইন-টেনডেণ্টও এসেছেন নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

কোম্পানির পক্ষ থেকে যে-চিঠি দেয়া হচ্ছে সেটার কপিতে রিসিভ করে সই দিয়ে, অশ্বিনী নিজের চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "নিন ফ্যাক্টরি খুলুন আর এই কপিটাতে রিসিভ করিয়ে কাল আমাকে দিয়ে দেবেন।"

অশ্বিনী এসে দরজায় দাঁড়ায়, দারোয়ান গেট খুলে দেয়। বাঁহাতে কোটটা পিঠের উপর ঝুলিয়ে অশ্বিনী সম্পূর্ণ একাএকা মাঠটা কোণা-

কুণি পার হতে শুরু করে। চারপাশে রাস্তায় আলো জ্বলছে। বড়বাবুর বারান্দায় আলো নেই, ঘরে আলো। মাঝখানের মাঠটা অন্ধকার—যে-মাঠটায় আজ সারাদিন হাজার হাজার মানুষের পা হেঁটে বেড়িয়েছে এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও। মাঠ পেরিয়ে অশ্বিনী সকালে প্রায় নিঃসঙ্গ ফ্যাক্টরিতে ঢুকেছিল। এখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ মাঠটা সে পেরচ্ছে। তাও অন্ধকারে।

অশ্বিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না নোটিশটা আগে তুলে নেয়ার। কোম্পানির চিঠিটা আসার পর সে দেরি করে নি। কোম্পানি চিঠি দিতে দেরি করছে কেন বা এই প্রায় সন্ধ্যার আগে চিঠিটা এলো না কেন তার নানা কারণ থাকতে পারে। হয়তো কোম্পানির সুপারিন-টেনডেণ্ট সব সাহেবদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিল। হয়তো সাহেবদের ভেতর মতভেদ ছিল। হয়তো সাহেবরা বুঝতেই পারে নি এ-রকম একটা সহজ পদ্ধতিতে এমন জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে। হয়তো কোম্পানি জানতো মিঃ প্রধান এসে মিটিং সেরে কন্‌সিলিয়েশনে না বসলে অশ্বিনীর পক্ষে সই করা সম্ভব হতো না, কারণ সরকারী লোক হিসেবে অশ্বিনী এমন কোনো নির্দেশ দিতে পারে না যেটা তার ওপরঅলা নাকচ করে দিতে পারে আর কে জানে মিঃ প্রধানের সঙ্গে অশ্বিনীর বড় অফিসার এসেছে কি না। সুতরাং জনসভায় মিঃ প্রধান ফ্যাক্টরি খোলার কথা নিজে ঘোষণা করে দেয়ায় অশ্বিনীর পক্ষে সই করে দিতে কোনো অসুবিধে থাকে না। হয়তো আজ সকাল থেকে এটাই প্রোগ্রাম হয়ে আছে। কার প্রোগ্রাম, কিসের প্রোগ্রাম, কে করেছে—তা অবশ্য কেউই জানেনা। কাল গভীর রাত্রিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে একটা টাইপ করা কাগজে অশ্বিনীর সই পড়েছে,—আজ আর একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে আবার একগাদা তৈরি কাগজ অশ্বিনীর সামনে যতক্ষণ না এসেছে ততক্ষণ অশ্বিনী সই করতে পারে নি। সারাদিন অপেক্ষার পর যখনই সেই কাগজ এসেছে সই করে দিয়ে অশ্বিনী বেরিয়ে এলো।

উইদারিং হাউসের নতুন বাড়িটার তলা দিয়ে যখন যাচ্ছে পেছনে "ইনস্পেক্টর" শুনে অশ্বিনী দাঁড়ায়। "ইয়োর এনভেলাপ" ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার একটা ভারি লম্বা লেফাফা এগিয়ে দেন। অশ্বিনী চলতে চলতেই "থ্যাঙ্ক ইউ" বলে লেফাফাটাকে প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে দেয়, কোণাটুকু বেরিয়েই থাকে।

রাস্তায় পৌঁছে ঢালু বেয়ে নামতে গিয়ে আবার "ইনস্পেক্টর" শুনে পেছন ফিরে দাঁড়াতে হয়। পেছন ফেরামাত্র দূরে ম্যানেজারের অফিসের ঝকঝকে আলো চোখে পড়ে, কন্‌সিলিয়েশন বসেছে, তারপর চোখে পড়ে সামনে দাঁড়ানো ভট্‌চাযকে।

"কি ? চিনতে পারলেন ?"

"বাঃ! মিঃ ভট্‌চায, আপনাকে চিনতে পারব না ? কখন এসেছেন"—অশ্বিনী একগাল হাসে।

"মিঃ প্রধানের সঙ্গে। উনি মিটিঙে বসেছেন, আমি আপনার জন্যই এখানে অপেক্ষা করছি।"

"কেন বলুন তো ?"

"আমি দু-জনার প্রতিনিধি হয়ে দুটো অনুরোধ করব, আপনাকে রাখতে হবে।"

"আরে বলুন-ই না।"

ওরা একসঙ্গে ঢালু বেয়ে অশ্বিনীর কোয়াটারের দিকে নামতে থাকে।

"নাম্বার ওয়ান, মিঃ প্রধান আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেবেন তার ভাষা খুঁজে পান নি। তাই অনুরোধ করেছেন নেকসট টাইম আপনি যখনই দার্জিলিঙে যাবেন ডোণ্ট, ডোণ্ট, ডোণ্ট ফরগেট টু পে হিম এ ভিজিট। ইট ইজ এ স্ট্যাণ্ডিং ইনভিটিশন ফ্রম হিম্ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফ্রম মিসেস্ প্রধান।"

"বেশ তো, এ-নিয়ে এত বলবার কি আছে, চলে যাব। আর দ্বিতীয় অনুরোধ ?"

"সেটা আমার বন্ধু উড্রু-র কাছ থেকে।"

"উড্রু কে?"

"আপনাদের এই বাগানের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, ফ্যাক্টরি। ও এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিল, এখানেই। এই একটু আগে গেল ফ্যাক্টরি খোলার ব্যাপারে"—শুনে অশ্বিনী ওপর থেকেই একবার প্যাণ্টের পকেটে হাত দেয়। তাহলে হয়তো তাকে বেরতে দেখেই উড্রু, নাকি কে, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, ভট্‌চাযের কাছ থেকে গিয়ে ঐখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

"উড্রু আমাকে বলেছে, ও নিজেও নিশ্চয়ই বলবে, ইয়োরোপিয়ান ক্লাবে আপনাকে যেতে হবে। ইফ পসিব্‌ল্ রেগুলারলি। ইফ্ নট, অফ্‌ন।"

"আরেফ্ বাবা সে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। সে দেখা যাবে।"

"আর একটা শেষ অনুরোধ। ফ্রম মাই হাম্ব্‌ল্ সেল্‌ফ্।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বলুন না।"

"প্লিজ কনসিডার মি এ্যাজ ওয়ান অভ্ ইয়োর বেস্ট ফ্রেণ্ড্‌স্। যখন দরকার হবে অধমকে একটু মনে করবেন।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়"—গেট খুলে অশ্বিনী বলে, "আসুন।"

ভট্‌চায দাঁড়িয়ে পড়ে। "না, এখন যাবো না। আপনি সারাদিনের পরিশ্রমে ডেড টায়ার্ড। এখন গিয়ে গরম জলে স্নান করুন। তারপর, কি, অভ্যেস টভ্যেস আছে?"

ভট্‌চায মধ্যমা, তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে গ্লাস ধরার মুদ্রা দেখায়। অশ্বিনী মাথা নাড়ায়। "অল রাইট" বলে ভট্‌চায হাত বাড়িয়ে দেয়। ধরে অশ্বিনীর হাত ঝাঁকায়। "নাইট" বলে ভট্‌চায আবার চড়াই ভেঙে অফিসের দিকে যেতে থাকে।

সরু প্যাণ্ট পরে বলেই কি না কে জানে, ভটচার্যের কোমরের ওপরের অংশটা তলার চাইতে ভারি মনে হয়। দুপা হাঁটলেই হাঁফায়। কথা বলে খুব নাটুকে কায়দায়, প্রায় সব শব্দের ওপর

জোর দিয়ে। দুর্গাপূজার মিটিং থেকে ফেরার সময় প্রথম আলাপের দিন টগরদি বলেছিলেন দার্জিলিঙে বা পাহাড়ে ওর অসাধ্য কোনো কাজ নেই।

ষোল

ঘরে ঢোকামাত্র খোকা এসে জড়িয়ে ধরলো। গোলাপ একটা বিরাট মিষ্টির প্যাকেট অশ্বিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, "তাহলে তুমি এলে, কোথায় ছিলে তুমি? যতবার এদের পাঠাই, ঘুরে এসে বলে সবাই আছে তুমি নেই—"

অশ্বিনী হাতের প্যাকেটটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "এটা কি?"

"দর্জি দিয়ে গেল, এইমাত্র, আবার বলে গেল গানটা আর একদিন এসে শুনিয়ে যাবে।"

অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে দার্জিলিঙের গ্লেনারির প্যাকেট। তাহলে নিশ্চয়ই মিঃ প্রধানের সঙ্গে এসেছে। সে তো মিঃ প্রধানের জন্য কিছুই করে নি। এমন-কি এখনো সে জানে না মিঃ প্রধানের অভীপ্সিত কি ছিল। দর্জির জন্যও সে কিছু করে নি। কিন্তু তার কাজের ফলে হয়তো দর্জির উপকার হয়েছে।

কিন্তু উপকারটাই বা কি হয়েছে। সমস্যার সমাধান তো হচ্ছে ম্যানেজারের অফিসে, সেখানে কনসিলিয়েশনের সভা বসেছে। কোম্পানি তাকে যে-চিঠি দিয়েছে, সেটাও নিশ্চয়ই কোনো উকিলের মুসাবিদা, তাতে তো কোম্পানি পরিষ্কার বলে দিয়েছে মনপুরানের পাত্তি আসবে কি আসবে না সেটা ঠিক করা কোম্পানির স্বাধীনতা। যদি আসে অশ্বিনীকে বাড়তি খাটনি খেটে এক জায়গায় ডেসপ্যাচের, আরেক জায়গায় রিসিপ্টের হিসেব রাখতে হবে। তা অশ্বিনী খাটবেও না। ব্যবস্থা এখন যেটা চলছে, সেটাই চলতে থাকবে। অশ্বিনী প্লেনভিউ-এ বসেই মনপুরানের পাত্তি সই করবে। কোম্পানির সব পয়েন্টেই জিত। তাই ঐ সাহেব তাকে এই ভারি এনভেলাপ ধরিয়ে

দিয়েছে। তাহলে দর্জি মিষ্টি দিয়ে যায় কেন? নাকি যে-কোনো সিদ্ধান্তকেই সব পক্ষ তাদের জয় মনে করতো। তাই কি মিঃ প্রধান বিজয়োৎসবের মিষ্টি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন? যেন, যে-ভাবেই মিটুক তাতেই জিত। আসলে বোধহয় কারোরই কোনো হারার পয়েন্ট ছিল না, নেইও, এক মনপুরানের ফ্যাক্টরি-স্টাফদের ছাড়া। কিন্তু মনপুরানের ফ্যাক্টরি-স্টাফদের কথা আপাতত কারো মাথাতেই নেই, অশ্বিনীরও নয়।

সহসা, অশ্বিনীর সমস্ত ভাবনা ছাড়িয়ে ছাপিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে বাঁশি বেজে ওঠে। খোকা অশ্বিনীর হাঁটু ছেড়ে দুই হাত তুলে সারা ঘরময় নেচে বেড়ায়—"বাঁশি বেজেছে, বাঁশি বেজেছে, এবার ফ্যাক্টরি চলবে।"

গোলাপ হেসে বলে ওঠে, "ওঃ সারাদিন বাজে নি। এমন খালি খালি বিচ্ছিরি লাগছিল। যাক্, ফ্যাক্টরি খুললো?"

অশ্বিনী কোটটা গোলাপের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, প্যাকেট থেকে একটা মিষ্টি বের করে, খোকনের মুখের ভেতর গুঁজে দিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে। সেই হাসির ওপর ফ্যাক্টরির বাঁশি তীক্ষ্ণ তীব্র এসে পড়তে থাকে। ধারাবাহিক।

সতের

কনসিলিয়েশনের মিটিঙের ব্যবস্থা ম্যানেজারের ঘরে। ম্যানেজারের টেবিলটাকে পেছনে রেখে ঘরের চারপাশের দেয়ালে চেয়ারের সারি আর ঘরের মাঝখানে দুই সারি চেয়ার। ম্যানেজারের টেবিলের সঙ্গে পেছন-লাগানো চেয়ারগুলোর দুটিতে প্লেনভিউয়ের ম্যানেজার আর মিঃ প্রধান। দুজনের দু-পাশে দুই বাগানের সাহেবরা। পশ্চিম দিকের দেয়ালের এক সীমায় সুপারিনটেনডেণ্ট হাচিন সাহেব। পুব-পশ্চিমের দেয়ালের সারিতেও দুটো একটা চেয়ারে সাহেবরা। সাহেবরা সবাই পর পর, মাঝখানে কোনো চেয়ারে কোনো ফাঁক

নেই। সাহেবদের পরে একটা করে চেয়ার বাদ দিয়ে দুই দিকের দেয়ালে দুই বাগানের বড়বাবু বসে, সাহেবদের সঙ্গে বাবুদের সীমান্ত বানায়। উত্তরের দরজার দু-পাশে আর পুব-পশ্চিমের দেয়ালের দুই-তৃতীয়াংশে আর মাঝখানের দুই সারিতে বাবুরা আর মজুররা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তার ইউনিয়নের দুজনকে নিয়ে দর্জি ঢুকেই বাঁয়ে বসেছে। প্লেনভিউয়ের বাগানবাবু, কলবাবু পুবদিকের সারির শেষ দিকে। মনপুরানের কলবাবু ও মনপুরানের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি দুজন দরজার ডানপাশে। ঘরের মাঝামাঝি সারির চেয়ারে মিঃ প্রধান ও কলসাহেবের মুখোমুখি দুটো চেয়ারে গুপ্ত আর গুরুং। চেয়ারগুলো এমনি সাজানো যে কলসাহেব আর মিঃ প্রধানই সভার লক্ষ্যবিন্দু হয়ে পড়েন, যেন তাঁরা যেখানে, সেটাই মঞ্চ।

সাহেবরা সবাই বসে আছেন। বাবু আর মজুরদের ভেতর অনেকে দরজায় দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ বাইরে। মিটিং শুরু হলে এসে বসবে। বাবু আর মজুরদের দিকের অনেকগুলি চেয়ার খালি।

মিঃ প্রধান ঘাড় নিচু করে সিগারেট খাচ্ছিলেন। কিন্তু সবার দিকে চাইবার জন্য চোখটা টেনে রাখায় তাঁর কপালে অনেক ভাঁজ পড়ে। মিঃ প্রধানের বাঁ পাশের ছোকরা সাহেব একটু ঝুঁকে কলসাহেবকে কিছু বললে, কলসাহেব চেয়ারের দুই হাতল মুঠোয় চেপে সোজা হয়ে বসে সমস্ত ঘরটার ওপর চোখ ঘোরান। সবাই চুপ করে যায়। কলসাহেব বলেন, "তাহলে মিটিং শুরু করা যাক্। আমাদের সুপারিনটেনডেণ্ট মিঃ হাচিন সভাপতিত্ব করবেন।" মিঃ প্রধান নোয়ানো ঘাড় হাচিনসাহেবের দিকে ফেরান। পশ্চিমদিকের দেয়ালের চেয়ারের সারির শুরুতে হাচিনসাহেব যেমন বসেছিলেন, তেমনি বসে থাকেন। মিঃ প্রধানের বাঁয়ের সেই ছোকরা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারটি দাঁড়িয়ে একটা কাগজ সামনে মেলে ধরে ইংরেজিতে কিছু পড়তে শুরু করলে দর্জি কিছু বলে। সাহেব থেমে যান। ডান পায়ের ওপর বাঁ পা রেখে হাচিনসাহেব চেয়ারে কাত

হয়ে ছিলেন। একবার ঘাড় তুলে দেখলেন। দর্জি বলে, "স্যার, মিটিংটা কাদের নিয়ে হচ্ছে।"

কলসাহেব চেয়ারের হাতল মুঠোয় চেপে সোজা হলে দর্জি বসে পড়ে। কলসাহেব হুড়হুড় করে বলে যান, "তুই বাগানের বাবুদের ও মজুরদের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সভার প্রস্তাব মিঃ প্রধান আজ বিকেলে দিলে আমি সানন্দে রাজি হয়েছি"—কথাটা শেষ করেই ছোকরা সাহেবকে বাঁ হাতের আঙুল নাড়িয়ে ইঙ্গিত করেন পড়ে যেতে।

কিন্তু ছোকরা সাহেব পড়া শুরু করতে পারার আগেই তার বসার ভঙ্গিতে দাঁড়াবার উদ্যোগ এনে দর্জি বলে, "তাহলে তো স্যার, তুই বাগানের স্বীকৃত ইউনিয়নগুলিরই এখানে আসার কথা। বাইরের লোক কেন থাকবেন?" কথাটা শেষ করে সে সোজা বসেই থাকে উত্তরের অপেক্ষায়। ফলে, দর্জি থেমে গেলেও, ছোকরা সাহেব চোখের সামনে কাগজটা মেলে ধরেও পড়া শুরু করতে পারে না। পড়ার মাঝখানে যদি তাঁকে থেমে যেতে হয়! হাচিন সাহেব কোণার চেয়ারে মুখ তোলেন না। কলসাহেব একবার ছোকরা সাহেবের দিকে তাকিয়ে কোম্পানির গ্রুপ লেবার অফিসারের দিকে আঙুল নাড়ান। কলসাহেবের ডানদিকে দুটো চেয়ার বাদ দিয়ে তিনি বসেছিলেন। দাঁড়িয়ে উঠে একটা কাগজ থেকে তিনি পড়ে শোনান, "গতকাল এই বাগানের বাবুরা আর ফ্যাক্টরি মজুররা মিলে একটা ইউনিয়ন তৈরি করেছে, সেই ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে মিঃ গুরুং ও মিঃ গুপ্ত উপস্থিত আছেন।"

বসে থেকেই দর্জি জিজ্ঞাসা করে, "স্যার, মাত্র কাল যে ইউনিয়ন তৈরি হয়েছে, তার মেম্বারশিপ কবে হলো, মেম্বারশিপ কত, রেজি-স্ট্রেশন হয়েছে কিনা সে সবের পাত্তা কোথায় পাওয়া যাবে। আর আজকেই কোম্পানির সঙ্গে আর আর-আর-সব রেজিস্টার্ড ইউ-নিয়নের সঙ্গে গতকালের এই ইউনিয়ন মিটিঙে বসেছে? এটা কেমন

ব্যাপার ?”—কথাটা বলতে বলতে দর্জির সারা শরীরে যে-টানটান ভাব আসে, তার টানে সে দাঁড়িয়েই পড়ে যেন, কিন্তু যতটা টান তার শরীরে, ততটা তার গলার স্বরে নেই। গ্রুপ লেবার অফিসার দাঁড়িয়েই ছিলেন, জবাব দেন, “আজকের এই মিটিঙে আসার জন্য কোম্পানি কাউকেই চিঠি দেয় নি এবং যেহেতু বর্তমান সভার আলোচ্য বিষয় কোনোপ্রকার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের আওতার ভেতর পড়ে বলে কোম্পানি মনে করে না, সেইহেতু, প্রকৃত অর্থে এটা কোনো কনসিলিয়েশন সভা-ও নয়। তবু, আমরা মিঃ প্রধানের শুভপ্রয়াস-কে সাহায্য করতে চাইছি বলেই এই সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা কোম্পানির পক্ষ থেকে সবার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।”—খুব শান্তভাবে কথা কটি বলে তিনি বসে পড়েন, তাঁর জন্য এ-টুকুই নির্দিষ্ট ছিল।

সাহেবের পড়ার মাঝখানে দর্জি উঠে দাঁড়ায়। দর্জি যে-দাঁড়িয়েছে সেটা দেখেও সাহেব কাগজ থেকে মুখ তোলেন না বা আর কোনো সাহেব দর্জির দিক ফিরেও তাকান না। বাবুরা সাহেবের দিক থেকে চোখ সরিয়ে দর্জির দিকে তাকায়। দর্জি বসে পড়ে। সাহেব পড়ে যেতে থাকেন। পড়া শেষ করে সাহেব চোখের সামনে থেকে কাগজটা নামান আর সঙ্গে সঙ্গে মিঃ প্রধানের দিকে একটু বেঁকে চেয়ারে বসে পড়তে নেন। ফলে, তাঁর পড়া শেষ হওয়ার পর দর্জি আবার দাঁড়ালেও, তিনি যেন দর্জিকে দেখতেই পান না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দর্জি দেখে হাচিনসাহেব ডান হাতের পাঞ্জায় মুখটা রেখে এলিয়ে আছেন। কলসাহেব অত বড় শরীরটা নিয়ে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে। আর বাবুরা সবাই দর্জির দিকে তাকিয়ে। দর্জি গলায় একটু কাশির মতো শব্দ করে। তাও কোনো সাহেব তাকান না। তখন দর্জি বলে, “স্যা-র”। সঙ্গে সঙ্গে সেই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার একটা কাগজ থেকে পড়তে শুরু করে প্রথমে হাচিনসাহেব, পরে বাবু আর মজুরদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, “তাহলে প্রথমে ঠিক করে

নেয়া দরকার, এ-মিটিঙে আলোচনা কী হবে।" দর্জি কিছু বলে। ছোকরা সাহেব তাঁর পড়া থামান না। দর্জি আরো একবার গলা ঝাড়ে; ছোকরা সাহেব পড়েই যান। খুব উঁচু গলায় কিছু বলে, ছোকরা সাহেবের পড়া থামিয়ে দিয়ে, কোম্পানির সঙ্গে তার গোলমালটাকে মীমাংসার অতীত অবস্থায় নিয়ে যাবার লোভ দমন করে দর্জি তার হাঁ বন্ধ করে, তারপর বসে। বাবুরা দর্জির দিক থেকে সাহেবের দিকে মুখ ঘোরায়।

দর্জির সঙ্গে ছোকরা সাহেব ও লেবার অফিসারের এই কথা-বার্তায় সভার মূল তিনজন লোক, মিঃ প্রধান, কল, ও হাচিন প্রায় নীরব। দশাসই কলসাহেব চেয়ারের মাথার ওপরে দেড়হাত উঁচুতে, চিবুক হাতের উপর রেখে, মুখে অসংখ্য রেখা তৈরি করে বসে থাকেন। মিঃ প্রধান কোনোদিকেই তাকান না,—তাঁর হাবভাব দেখলে মনে হয় তিনি দর্জির প্রশ্ন আর সাহেবদের জবাব কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না। হাচিন বেঁটে খাটো, শক্ত সমর্থ, বসেছেনও কোণায়—একেবারে চেয়ারের ভেতর সেঁধিয়ে।

মিঃ প্রধান হয়তো কিছু বলে থাকবেন কারণ সেই ছোকরা সাহেবটি তাঁর কাগজ দেখে পড়তে পড়তে মিঃ প্রধানের দিকে হু'-এক বার তাকান। তিনি পড়ে যান, "এই মিটিঙে মনপুরান চা-বাগানের বাবু ও মজুরদের আজকের বে-আইনি হরতাল ও প্লেনভিউ বাগানে দলবদ্ধভাবে এসে এখানকার দৈনন্দিন কাজকর্ম নষ্ট করা জনিত পরি-স্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য মিঃ প্রধানের শুভ চেষ্টাকে সাহায্য করতে মনপুরান ও প্লেনভিউ বাগানের ম্যানেজারিয়্যাল স্টাফ, বাবু ও মজুরদের প্রতিনিধিদের এই সভা ডাকা হয়েছে।"

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবুরা আর মজুরেরা চমকে ওঠে। ছোকরা সাহেব ইংরেজিতে পড়েছিল, সবাই সব কথার মানেও বোঝে নি। কিন্তু একই উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে কতকগুলি শব্দের অর্থ সকলেরই জানা হয়ে যায়। তাই সবাই-ই বুঝে যায়,

মনপুরানের শ্রমিক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বে-আইনি হরতালের অভিযোগ আনা হয়েছে। সবার দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে সাহেব বসে পড়ে। ইংরেজি কথাটার পুরো অর্থ যারা বুঝতে পারে তাদের কাছে বাকিরা গিয়ে মানেটা পুরোপুরি জেনে নিতে চায়। ফলে বাবু আর মজুরদের ভেতর অনেকেই উঠে দাঁড়িয়ে থাকে, জায়গা বদলায়। মনে হয় সভাটা ভাঙতে বসেছে।

যখন শুরু হয় তখন সভাটাতে মাত্র দুটি ভাগ ছিল—একদিকে সাহেবরা, কোম্পানি,—আর একদিকে বাবু আর মজুররা দুই বাগানের। এই সভায় গুপ্ত আর গুরুং থাকতে পারে কি না দর্জি এই প্রশ্ন তোলায় সভায় প্রথম চিড় ধরে। কোম্পানি পরোক্ষে গুপ্ত আর গুরুঙের পক্ষ নেয়ায় সভার ভাগাভাগিটা বদলে হয়েছিল —একদিকে কোম্পানি আর গুপ্ত-গুরুঙের মতো কিছু কর্মচারী আর একদিকে বাবুরা আর মজুররা। আর এখন কোম্পানি শুধু মন-পুরানের বাবু আর মজুরদের আজকে প্লেনভিউ-এ আসাটাকে বে-আইনি হরতাল বলে ঘোষণা করায় প্লেনভিউ আর মনপুরান বাগানের বাবু-মজুররা একেবারে আলাদা আলাদা হয়ে যায়। আজ সকাল থেকে এই দুই বাগানের বাবু আর মজুরদের ভেতর যে মিল-মিশ দেখা গিয়েছিল সেটা আর কার্যকর থাকে না, কারণ এখন তাদের স্বার্থ আলাদা হয়ে পড়ে। মনপুরানের বাবু আর মজুররা উঠে উঠে নিজেদের ভেতর কথাবার্তা বলতে শুরু করে।

মনপুরানের এক মজুর এসে দর্জিকে বাইরে ডাকে। একটু উঁচু গলায় দর্জি বলে, "আপনাদের ইউনিয়নের সঙ্গে আগে কথা বলুন।" কথাটা সবার কানেই যায়। আজকের মিটিঙে গুপ্ত আর গুরুংকে হাজির রেখে আর দর্জিকে কোনো কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে কোম্পানি এটা দেখাতে চায় যে দর্জির সঙ্গে কোম্পানির আর আগের সম্পর্ক নেই। সুতরাং এখন মনপুরানের ব্যাপার নিয়ে দর্জি কথা বলতেই পারে। কিন্তু দর্জি প্রথমত মনপুরানের বর্তমান ইউ-

নিয়নের সঙ্গে কোনো ঝগড়া করতে চায় না, সে এমন একটা অবস্থা পাকাতে চায় যাতে মনপুরানের ইউনিয়ন তার সাহায্য চায়। আর দ্বিতীয়ত দর্জি তখন যেমন চিৎকারের জন্য হাঁ করেও হাঁ বন্ধ করেছিল, তেমনি এখন মনপুরানের মজুরদের যাচা ডাক ফিরিয়ে দিয়ে কোম্পানিকে জানিয়ে দিতে চায়—তাকে যদি প্লেনভিউ নিয়ে থাকতে দেয়া হয়, তাহলে সে মনপুরানে নাক গলাবে না।

মিঃ প্রধান ঘাড়টা একটু তুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে কলসাহেব আর সেই ছোকরা সাহেবকে বলেন, "মনপুরানের সবাইয়ের আজকের এখানে আসাটা যদি বে-আইনি হয়, তাহলে তোমাদেরও মনপুরানের পাতি প্লেনভিউয়ে পাঠানোটা বে-আইনি।"

সেই ছোকরা সাহেবটি খুব ধীরে ধীরে বলেন, "কিন্তু পাতি এখানে আনা বা না-আনা তো ট্রেড ইউনিয়নের আওতায় পড়ে না, —সে তো সরকার আর কোম্পানি ঠিক করবে।"

মনপুরানের কলবাবু একটা কোণ থেকে খুব জোরে বলে ওঠেন, "স্যার, আমরা শুনলাম আমাদের পাতির জন্য প্লেনভিউয়ের গুদাম সিল হয়েছে। একে তো আমাদের বাগানের ফ্যাক্টরি বন্ধ। শেষে বাগানও বন্ধ হয়ে না যায় সেই ভয়ে আমরা সবাই যে-যেমন ছিলাম ছুটে এসেছি। একে কি হরতাল বলে, স্যার। বাগানের কথা ভেবেই তো আমরা ছুটে এসেছি, স্যার।"

সেই ছোকরা সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে আবার কাগজ থেকে পড়ে যান, "বাগানের ভাবনা কোম্পানি ভাববে। কর্মচারীরা যদি কোনো খবর না দিয়ে কাজে অনুপস্থিত হয়, দলবেঁধে কাজের জায়গা ছেড়ে চলে যায়, কোম্পানির উপযুক্ত অফিসারদের অনুমতি ব্যতীত বাগান ছেড়ে আসে, তাহলে, এ-সবই কোম্পানির চাকরির শর্তের বহির্ভূত কাজ গণ্য হতে পারে ও সেই অপরাধে যেকোনো কর্মচারীর চাকরি চলে যেতে পারে বা তার ইনক্রিমেন্ট আটকানো হতে পারে বা তার চাকরির দীর্ঘতায় ছেদ টানা যেতে পারে।"

ঘরের ভেতরটা থমথম করতে থাকে। সেই সুযোগে মনপুরানের ইউনিয়নের সেক্রেটারি বলে উঠে, "কিন্তু অবস্থাটা তো বুঝবেন স্যার। আজ সকালে আমরা খবর পাই যে প্লেনভিউ বাগানের ফ্যাক্টরি আমাদের পাতির জন্য সিল হয়েছে। আমরা তো ভয় পাচ্ছিলাম যে মনপুরানের ফ্যাক্টরিটা কোম্পানি তুলে দিচ্ছে। এই ঘটনার পর সন্দেহ হলো আমাদের বাগানটাই উঠে না যায়। আপনারা তো জানেন স্যার, এ-ব্যাপারে আপনাদের ওপর ভরসাই রাখা হচ্ছে, আমরা ইউনিয়নের তরফ থেকে আপনাদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে কোনো কথা বলি নি। কিন্তু আপনারাও আমাদের সঙ্গে কোনো কথা তো বলেন নি স্যার। এই অবস্থায় আজকের ব্যাপারটাকে হরতাল বলে ধরলে কি করে চলে স্যার?"

ঘরের সবাই ছোকরা সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকে। সাহেব খুব নিচু স্বরে বলেন, "আজকে বে-আইনি হরতাল হয়েছে এটা একটা দিক। আর, কোম্পানি সেটা কিভাবে নেবে, সেটা আরেকটা দিক।" কথা বলার জন্য মিঃ প্রধান সিগারেটটা সরান, "এখন তো আলোচ্যসূচী ঠিক হচ্ছে। এখনই তো ঠিক হয়ে যাচ্ছে না এটা হরতাল। প্রথম আলোচ্য মনপুরানের ফ্যাক্টরি তোলার আশঙ্কা। আর এতে অংশ নেবে দুই বাগানের ম্যানেজারিয়াল, সুপারভাইজারি ও লেবার স্টাফের প্রতিনিধিরা।" সাহেব খচখচ করে লেখেন। তারপর লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কল বা হাচিন বা আর কেউ একবার তাকিয়েও দেখেন না। মিটিঙের সবাই সেই ছোকরা সাহেবের দিকে তাকিয়ে। কাগজটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছোকরা সাহেবের হাসি দেখে বোঝা যায় তিনি কিছু বলছেন। মিঃ প্রধান শুধু মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দেন, "আজকের বে-আইনি হরতাল" করতে রাজি নন। মিঃ প্রধান সিগারেটসহ হাতটা চেয়ারের হাতলের ওপর ঝুলিয়ে বলেন, "ঐ বিষয়টা আলোচনার সময় আপনাদের মত দেবেন যে এটা বেআইনি হরতাল। এঁরা মত দেবেন

যে এটা হরতাল নয়, বে-আইনিও নয়। কিন্তু আলোচ্যসূচীতে তা লেখা থাকবে কেন।" ছোকরা সাহেব আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে "অ্যালেজড" শব্দটাকে মনপুরানের ফ্যাক্টরি তুলে দেয়া হচ্ছে কথাটার আগে বসাতে চাইলে—মিঃ প্রধান ঘাড় নেড়ে সায় দেন। সাহেব কথাটা লিখে ফেলে মুখ তুলে ঠোঁট ফাঁক করতেই দর্জি উঠে বলে, "কিন্তু স্যার, ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোম্পানির সভায় বাইরের লোক থাকবে কেন।"

"এখানে তেমন কেউ নেই, যারাই আছে তারা বাবুদের আর মজুরদের প্রতিনিধিত্ব করছে বলে দাবি করে," গ্রুপ লেবার অফিসার দাঁড়িয়ে উঠে বলেন।

ছোকরা অফিসারটি খুব মৃদুস্বরে বলেন, "এটা কোনো আনুষ্ঠানিক কনসিলিয়েশন সভা নয়। তা যদি হতো তাহলে মনপুরান সংক্রান্ত আলোচনায় কোম্পানি প্লেনভিউ বাগানের কোনো ইউনিয়নের সঙ্গেই বসত না।" যখন বলেন, গ্রুপ লেবার অফিসার পুরো মিটিংটাকেই বলেন, কিন্তু ছোকরা সাহেবের সব কথাই যেন মিঃ প্রধানের সঙ্গে।

দর্জি বলে, "মনপুরানের ব্যাপারে তো প্লেনভিউয়ের ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কোনো কথা বলতে চায় না। শুধু বন্ধুভাবে পরামর্শ দিতে পারে। কথা বলার অধিকার একমাত্র মনপুরানের স্বীকৃত ইউ-নিয়নের। তেমনি প্লেনভিউয়ের কোনো প্রসঙ্গ যদি আসে তাতে কথা বলারও একমাত্র অধিকার আমাদের ইউনিয়নের।"

গ্রুপ লেবার অফিসার দর্জির কথা থামতেই বলে ওঠেন, "তাহলে আজকের সভার পদ্ধতি হিসেবে লেখা হোক্ যে মনপুরান ও প্লেন-ভিউয়ের বাবুদের ও ওয়ার্কারদের ইউনিয়ন কেবল তাদের নিজ নিজ বাগান নিয়ে কথা বলবে, পরস্পর সম্পর্কে বলবে না।"

দর্জি চুপ করে থেকে বোঝায় যে সে রাজি আছে।

আজ সকাল থেকে মনপুরান আর প্লেনভিউ বাগান এককাট্টা হয়েছে—এই যে ধারণাটা শ্রমিক-কর্মচারীদের ভেতর চারিয়ে

গিয়েছিল, দর্জি আর গ্রুপ লেবার অফিসারের দুটো কথাতে তা বাতিল হয়ে যায় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিচ্ছিন্নতাটা কেউ বোধ করে না। কিন্তু দর্জি যখন বলে, "তাহলে, বাইরের লোক যারা আছে তাদের চলে যেতে বলা হোক," তখন মুহূর্তের ভেতর সবাই-ই বুঝে ফেলে, শুধু গুপ্ত আর গুরুং কেন, এ-মিটিঙে প্লেন-ভিউয়ের কারোরই থাকার কোনো দরকার নেই। মিটিঙের শুরু থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত নানা কথাবার্তার ভেতর দিয়ে সকাল থেকে তৈরি হওয়া ঐক্য এখন ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো। যে-ঘটনার ফলে আজকের এই সভা, সেই ঘটনাটাকেই নাকচ করে দিয়ে, সমস্ত অবস্থাটাকে আজকের সকালের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে, অবশেষে সভা শুরু হতে পারে। মিঃ প্রধান বলেন, "তাহলে কোম্পানি তার অবস্থা বলুক।"

আঠার

দর্জি আর কোনো কথা বলে না। দর্জি যদি মনপুরানের প্রতি-নিধিত্ব করত, আজকের সকাল থেকে সব ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হচ্ছিল দর্জি-ই মনপুরানের নেতা, তাহলে কোম্পানি গুপ্ত আর গুরুংকেও প্লেনভিউয়ের প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিত। দর্জি মন-পুরানের প্রতিনিধিত্বের অধিকার ছেড়ে দেয়ায় কোম্পানি গুপ্ত আর গুরুংকে স্বীকৃতিটুকু দেয় না। এই সমস্ত আলোচনায় মিঃ প্রধান কোনো অংশ নেন নি। কোম্পানির সমর্থনের জোরে ভবিষ্যতে যদি গুপ্ত আর গুরুঙের ইউনিয়নটাই প্রধান বা একমাত্র ইউনিয়ন হয়ে ওঠে তাহলে তখন তাদের ওপর ভরসা করতে হবে মিঃ প্রধানকে।

ম্যানেজারের টেবিলের পেছনে কাঠের চৌকো ফ্রেমে খুব বড় করে একটা ম্যাপ টাঙানো ছিল। সেই ছোকরা অফিসার সেই ম্যাপের কাছে গিয়ে একটা লাঠি দিয়ে দেখায় প্লেনভিউ-এর সঙ্গে মনপুরানের একটা জায়গায় সংযোগ আছে।

এই মিটিঙে যারা আছে তাদের প্রত্যেকেরই জানা প্লেনভিউ আর মনপুরানের, মাঝখানে রংটং চা-বাগান। দেয়ালের ম্যাপ প্রতিদিনের সেই জানাটাকে মিথ্যা করে দেয়। সেই যোগসূত্রটা খাদ না জঙ্গল সে-সব কোনো ব্যাখ্যায় না গিয়ে ছোকরা সাহেব বলে, "চল্লিশ বছর আগে এই দুটি বাগান আসলে একটিই বাগান ছিল : পরে মনপুরানকে আলাদা করে দেয়া হয়। এখন যদি কোম্পানি মনে করে তাহলে নিশ্চয়ই দুই বাগানকে আবার এক করে দেবে। যদিও আপাতত তেমন কোনো উদ্দেশ্য কোম্পানির নেই, তবু কোম্পানি কখনোই এটা স্বীকার করবে না যে, এইসব সাংগঠনিক ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়নগুলির কথা বলার কোনো অধিকার আছে।"

মনপুরানের কলবাবু বলে ওঠেন, "কিন্তু স্যার, মনপুরানের ফ্যাক্টরি উঠে গেলে, ফ্যাক্টরি-স্টাফের কি হবে স্যার।"

"সেটা কোম্পানির ব্যাপার। এমন কোনো ব্যবস্থা নিশ্চয়ই কোম্পানি নেবে না যাতে সমস্ত ফ্যাক্টরি-কর্মচারীদের চাকরি যায়।"

"কিন্তু স্যার প্রমোশনের ব্যাপার কি হবে স্যার ?"

"প্রমোশন কোনো ক্লেইম নয়। কোম্পানি বলছে, কোম্পানির নিয়ম ও চাকরির শর্তাবলীর ভেতর থাকলে কোম্পানি কখনোই স্থায়ী কর্মচারীকে ছাঁটাই করতে পারে না। কিন্তু সেই কর্মচারীকে কোম্পানির আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা মানতে হবে।"

মিঃ প্রধান বলেন, "তাহলে এটা লেখা হোক। কোম্পানি সংগঠন ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার চূড়ান্ত অধিকারী। মনপুরানের শ্রমিক ইউনিয়ন আশা করে কোম্পানি তাদের সঙ্গে সময় সময় আলাপ আলোচনা করবেন। যে-রকম পুনর্বিন্যাস আর সংগঠনই হোক না কেন কোম্পানি তার কোনো স্থায়ী কর্মচারী বা শ্রমিককে ছাঁটাই করবে না।" মিঃ প্রধানের কথাগুলি লিখে, ছোকরা অফিসারটি বলেন, "এই জায়গাটিকে এভাবে লিখতে চাই, 'হোয়াটেভার মে বি দি টাইপ অভ রিঅর্গানিজেশন অ্যাণ্ড রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট'

—এইটি থাক তারপর যোগ হোক্ "দি ম্যানেজমেন্ট রিটারেটস্ ছাট অ্যাজ পার এক্সিসটিং রুল, সার্ভিসেস অভ এ পার্মানেন্ট ইন্কাম্বেন্ট ক্যানট বি টার্মিনেটেড ইফ হি অর শি ডাস নট কমিট সাচ্ অফেন্সেস্ অ্যাজ মে রিকোয়্যার দি এমপ্লয়মেন্ট অভ সাব সেকশন সাচ এণ্ড সাচ অভ সেকশন সাচ এণ্ড সাচ অভ দি সার্ভিস রুল্স্, ফার্স্ট চ্যাপটার, জেনারেল অ্যাণ্ড ছাট দি পার্মামেন্ট এম্প্লয়িজ অভ দি কোম্পানি এন্জয় নো রাইট অভ অবজেকশন টু সাচ চেঞ্জেস অভ দি সিচুয়েশন অভ হিজ সার্ভিস অ্যাজ মে বি রিকোয়ার্ড অ্যাজ পার কোম্পানি রুল্স্।" মিঃ প্রধান তাঁর সম্মতি জানান। তারপর কাগজটা নিজের হাতে নিয়ে তার বাংলা ও নেপালি অনুবাদ করে আস্তে আস্তে শোনান। শোনাবার পর তিনি এই মন্তব্যটুকু শুধু জুড়ে দেন "এ তো আইনের কথাই আবার বলা হলো, এতে আর আপত্তির কি আছে। এখন এই সিজ্নের চায়ের কথায় আসুন।"

ছোকরা অফিসারটি বলেন, "সেটা তো এ-মিটিঙের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না।"

মিঃ প্রধান বলেন, "আপনারা তো মনপুরানের ফ্যাক্টরি তুলে দিতে চান না। তাহলে ওখানকার পাতিটা এখানে আনছেন কেন?"

"কারণ এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং ভালো হয়, চায়ের দাম বেশি পাওয়া যায়।"

"তাহলে এটুকু যোগ করে দিন না যে মনপুরানের ফ্যাক্টরিতে যাতে অটাম-টির ভালো উৎপাদন হয় তার জন্য কোম্পানি চিন্তা ও চেষ্টা করবে ও শ্রমিক-কর্মচারীরা কোনো ওয়াইল্ডক্যাট স্ট্রাইকে যাবে না।"

ছোকরা অফিসার বলেন, "রাজি। আর একটা শর্ত যোগ করতে হবে, এক বাগানের কর্মচারী অন্য বাগানে গিয়ে কোনো উত্তেজনা ছড়াতে পারবে না।"

মিঃ প্রধান বলেন, "রাখুন। কিন্তু এটা তো আপনারা ঠেকাতে পারবেন না।"

এই প্রস্তাবগুলি কালকের ভেতর টাইপ হয়ে ইউনিয়নগুলির কাছে, মিঃ প্রধানের কাছে ও কোম্পানির কাছে দুকপি করে যাবে, সই করে এক কপি নিজেদের কাছে রেখে আর এক কপি সুপারিনটেনডেন্ট অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে। এটা স্থির হওয়ার পর দর্জির কথা অনুযায়ী লেখা হয়, যে-ইউনিয়নগুলি আগের দিন পর্যন্ত স্বীকৃত—শুধু তাদের কাছেই পাঠানো হবে। সভা ভেঙে যায়। বাইরে মিঃ প্রধানের ও সাহেবদের গাড়ি সারি দিয়ে দাঁড় করানো ছিল। সভা ভাঙার মিনিট দুয়েকের ভেতর নানাদিকে নানারকম আলোর তীব্র ঝলক আর শব্দ তুলে তুলে গাড়িগুলো বাঁয়ে ডাইনে বেঁকে বেঁকে যেন চারপাশের অন্ধকার পাহাড়ের আনাচে-কানাচে সেঁধিয়ে যায়।

মিঃ প্রধানের এমনই পারদর্শিতা যে সবপক্ষকে তিনি সমান পাইয়ে দেন। কোম্পানি চেয়েছিল দর্জির হাত থেকে মনপুরান ইউনিয়নকে বাঁচাতে আর পাতি আনা না-আনার ব্যাপারে স্বাধীনতা। কোম্পানির সেটা জুটেছে। এতটাই জুটেছে যে কোনো এক জায়গায়ও কোম্পানি স্বীকার করে নি যে পাতি আনা হবে কি না-হবে, এ-ব্যাপারে আর কারো কিছু বলার আছে। কিন্তু স্বীকার না করলেও কোম্পানি অটাম-টি-টার অন্তত একটা অংশ মনপুরানে ম্যানুফ্যাকচারিং করবে। আর একটা অংশ প্লেনভিউয়ে পাঠাতে পারে।

আবার দর্জি চেয়েছিল প্লেনভিউয়ের শ্রমিকদের ওপর তার ক্ষমতাকে যেন স্বীকৃতি দেওয়া হয়—গুপ্ত আর গুরুং-কে না মেনে কোম্পানি দর্জিকে জিতিয়ে দেয়।

আবার মনপুরান চেয়েছিল তাদের ফ্যাক্টরি যেন না ওঠে। আপাতত উঠছে না।

কিন্তু দেশবিদেশে ছড়ানো এই কোম্পানির এই দেশের নানা জায়গায় ছড়ানো চা-বাগান বা এই রকম সব প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক বিন্যাসের পরিবর্তন কি দর্জির সঙ্গে সাহেবদের সম্পর্কের টান বা ঢিল বা মনপুরানের বাবুদের আর ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাজনিত উদ্বেগের দ্বারা অথবা মিঃ প্রধানের কোনো ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের প্রয়োগে সাব্যস্ত হতে পারে? সেই সাংগঠনিক বিন্যাস তো পুঁজি, বাজার, দর, আর লাভের পারস্পরিকসম্পর্ক-সূত্রে নদী বা অরণ্যের মতো প্রাকৃতিক হয়ে উঠেছে—কোনো বর্ষায় নদীর কোথাও চর পড়ে, কোথাও কায়েমচর ভাসে, কোথাও ঝড়ে গাছ পড়ে যায়, কোথাও নতুন অরণ্য মাথা তোলে। তাতে একজন বা কয়েকজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্ক কতো অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক। অথচ, সারাক্ষণ ব্যক্তি সেই ব্যবস্থার যেন কর্তা-ই প্রতীয়মান হয়ে যায়। প্রতীয়মান হয়ে যায়। তারপর কখন একসময় ব্যক্তির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি চিহ্নহীন ঘটলেও ব্যবস্থা বাধাহীন রয়ে যায়।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাড়ি থেকে অশ্বিনীর চিঠি কম হলেও আসে। জ্যাঠামশাই আর মা মাসে অন্তত একটা করে লেখেন। মায়ের চিঠি লেখাটা অনিয়মিত, কাউকে দিয়ে লেখাতে হয়। জ্যাঠামশাই মাসের টাকা পাওয়ার খবর দিয়ে চিঠিটা লেখেন। অশ্বিনী কাউকেই কোনো চিঠি লেখে না—মনিঅর্ডার ফর্মের কুপনে যে-কটি লাইন আঁটে তার চাইতেও কম লাইন জ্যাঠামশাইকে লেখে। আর মাঝেমাঝে গোলাপকে জিজ্ঞাসা করে মাকে চিঠি লিখেছে কিনা।

চিঠি না-লেখার প্রথম কারণ চিঠি লেখার অভ্যেসই অশ্বিনীর কম। তদুপরি চিরকাল জ্যাঠামশাই বলে এসেছেন, সে শুনে এসেছে। আজ যদি সে-ও বলা শুরু করে—সেটা কেমন অবাস্তব ঠেকে। মনি-অর্ডারের কুপনের জায়গাটুকুতেও অশ্বিনী হয়তো লিখত না যদি না তার মনে হতো যে কুপনে কিছু না-লেখা মনিঅর্ডারটি জ্যাঠামশাইয়ের কাছে অপমানজনক ঠেকতে পারে। কিন্তু বাড়িতে থাকতে যে-টাকা মা মারফৎ বা জ্যাঠাইমা মারফৎ পাঠাত এখন সেই টাকা নিজে পাঠাবার লজ্জাটুকু ঢাকতেই যেন কুপনে অশ্বিনী নেহাত আনুষ্ঠানিক একটা ভঙ্গিতে লেখে, "শ্রীচরণকমলেষু জ্যাঠামশাই, আমরা এখানে একপ্রকার আছি, আশা করি আপনারা কুশলে আছেন। জ্যাঠাইমা ও মা-সহ আপনি আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। সেবকাধম অশ্বিনী।" অশ্বিনী যদি তার পাঠানো সবগুলো মনিঅর্ডার কুপন একসঙ্গে দেখত তাহলেও সে এই বাঁধা-গতের বাইরে একটি শব্দও লিখতে পারত না। ছোটবেলা থেকে অশ্বিনী মা জ্যাঠাইমার চিঠি লিখতে লিখতে আর জ্যাঠামশাইয়ের

লেখা চিঠি পড়তে পড়তে জেনে গেছে নিজেরা 'একপ্রকার' থাকে, অপরেরা 'কুশলে' থাকে, প্রণাম 'ভক্তিপূর্ণ' হয় আর বৈষ্ণব পরিবারের শেষ চিহ্নটুকু এই 'সেবকাধম'।

ঠিক এর বিপরীত কারণে মা-কে চিঠি লেখা হয় না। বাবা মারা যাওয়ার পর জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে তাকে নিয়ে মায়ের বেঁচে থাকাটা সব বাঁধা-গতের বাইরে এমন ব্যক্তিগত ব্যাপার যেটাকে চিঠিতে রক্ষা করার ক্ষমতা অশ্বিনীর নেই। বরং গোলাপ এখানকার নানা খবর দিয়ে, বর্ষার আর শীতের কথা জানিয়ে মাকে চিঠি লিখতে পারে। গোলাপ খামে ভরে মাকে মাঝেমাঝে টাকাও পাঠায়।

মা আর-কাউকে দিয়ে চিঠি লেখান। সে-চিঠিও অনেকটাই বাঁধা-গতের। অশ্বিনী যখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ত, মা বলতেন কাকে চিঠি লিখতে হবে। অশ্বিনী ঠিক লিখে দিত। দু-একটা শুধু ব্যক্তিগত কথা থাকে। মায়ের বাতের ব্যথাটা কি-রকম, জ্যাঠাইমার শরীর খারাপ বেড়েছে কি না।

জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি ইন্‌ল্যাণ্ডে আসে। এমনিতেই জ্যাঠা-মশাইয়ের হাতের লেখা ছোট ছোট। তার ওপর চার পাতায় সব খবর আঁটবার জন্য এমন করে লেখেন যে শেষের দিকে চিঠি পড়ে ওঠাটাই মুশকিল হয়। তাও আবার চার পাতাতেই শেষ হয় না। শুরুর জায়গায় উল্টো করে, দুই পাতার মাঝখানের শাদা অংশ ভরে কোথায় যে জ্যাঠামশাই "ইতি আঃ তোমাদের জ্যাঠামশাই" লেখেন সেটা প্রায়ই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাসে এই একটাই চিঠি জ্যাঠামশাই লেখেন কিন্তু তাতে শহরের, পাড়ার ও বাড়ির প্রায় সমস্ত খবরই থাকে। জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি এলে না পড়ে অশ্বিনী পকেটে ভরে অফিস থেকে বাড়ি ফেরে, খাওয়ার টেবিলে গোলাপ পড়ে আর সেদিন চিঠি শুনতে শুনতে হাসতে হাসতে খাওয়া থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপর আর সে-চিঠির কথা গোলাপেরও

মনে থাকে না, অশ্বিনীরও না। জ্যাঠামশাইয়ের চিঠিতে হঠাৎ করে বাড়ির জীবনযাত্রার চেহারাটা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে—তার খারাপ দিকগুলো বাদ দিয়ে। সে-জীবনযাত্রা থেকে অশ্বিনী এত দূরে সরে এসেছে যে জ্যাঠামশাই ভাবতেও পারেন না কী-রকম ঘরে কী-রকম টেবিলে তাঁর চিঠি পড়া হয়।

তবু জ্যাঠামশাইয়ের চিঠির ভাষা থেকেই বোঝা যায় জ্যাঠা-মশাইয়ের দিক থেকে অশ্বিনীর সঙ্গে সম্পর্কটা পালটে যাচ্ছে। জ্যাঠা-মশাইয়ের মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে নেই। বাবা মারা যাওয়ার পর মা আর অশ্বিনী জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে তো অতিরিক্ত চাপ হিসেবেই এসেছিল ও যতদিন অশ্বিনী চাকরি না পেয়েছে সেই হিসেবেই ছিল। এটা কোনো চাপা ব্যাপার ছিল না। জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমা দুজনেই খুব পরিষ্কার ভাষায় এটা বোঝাতেন। কিন্তু মায়ের বা অশ্বিনীর কিছু করার ছিল না। অশ্বিনী প্রথম চাকরি পাওয়ার পর জ্যাঠামশাই বা জ্যাঠাইমা ভাবতেন অশ্বিনী তার সমস্ত টাকা সংসারে দিচ্ছে না অথচ দেয়া উচিত, অশ্বিনীরই উচিত সংসারের সম্পূর্ণ ভার নেয়া। বোধহয় সেই উদ্দেশ্যেই জ্যাঠামশাই অশ্বিনীর বিয়েও ঠিক করেন। দেনাপাওনার ব্যাপারে কী কথা হয় তা অশ্বিনীর মা-ও জানেন না, অশ্বিনী তো জানেই না। ছেলের বাড়ির খরচা বাবদ অশ্বিনীকে ধার করে টাকা জোগাড় করতে হয়েছিল। পরে অবশ্য অশ্বিনী জানতে পেরেছিল যে নগদ দুই হাজার টাকা গোলাপের বাবা জ্যাঠামশাইকে দিয়েছেন, সেজন্যই গয়নাগাটি জিনিসপত্র তিনি বেশি দিতে পারেন নি। অর্থাৎ একটা ঘরে থাকতে দেয়া, ইস্‌কুলের মাইনে দেয়া, বিয়ে দেয়া—এই যে-সবের গড়কে মানুষ-করা বলে তার দৌলতে সুযোগ আসা মাত্র অশ্বিনীকে জ্যাঠামশাই নিজের পুঁজি হিসেবেই দেখেছেন। বোধহয় সেই কারণেই অশ্বিনীর এই নতুন চাকরিটা পাওয়ার সময় জ্যাঠামশাইয়ের ভেতর একটা আশঙ্কা দেখা দিয়ে থাকবে এখন অশ্বিনী নিজের

বৌ-ছেলে-মাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে। কিন্তু সেই আশঙ্কাটা যে ঠিক নয় তাই প্রমাণ করতেই যেন অশ্বিনী মা-কে তার চাকরির জায়গায় নিয়ে আসে না,—পাহাড়, ঠাণ্ডা ও বর্ষার ছুতোগুলোকে কাজে লাগায়। তখন আবার বোধহয় জ্যাঠামশাইয়ের এই আশঙ্কা দেখা দিয়ে থাকবে যে মাকে অশ্বিনী তাঁর ঘাড়ে ফেলে রাখছে। সে-আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণ করতে অশ্বিনী প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে একশটি করে টাকা জ্যাঠামশাইয়ের নামে পাঠায়। অশ্বিনী খরচ করেছে বলে জানে যে তার বিধবা মায়ের দুইবেলার খাওয়া খরচ বড়জোর তিরিশ টাকা। আর বাড়ির গরুর দুধের দামটা যোগ করলেও তা পঞ্চাশ টাকার ওপর যেতেই পারে না। এই টাকা পাঠাতে শুরু করার পরই জ্যাঠামশাইয়ের দিক থেকে অশ্বিনীর সঙ্গে সম্পর্কটা পাল্টাতে থাকে। কিন্তু সেটা এত অস্পষ্ট যে জ্যাঠামশাইও বোধহয় টের পান না।

কিন্তু অশ্বিনীকে টের পেতেই হয়। একেবারে ছেলেবেলা থেকে জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমার চাউনি, কথা বলার ভঙ্গি, এমন-কি হাঁটা দেখেও যে তাকে আর তার মাকে বুঝে নিতে হয়েছে ব্যাপার কি। কখন জ্যাঠামশাইয়ের সামনে-পড়া চলবে না আর কখন জ্যাঠামশাইয়ের ফাইফরমায়েশ খাটার জন্য হাতের কাছে থাকতে হবে তা অশ্বিনী প্রায় বাতাস শুঁকে বলে দিতে পারত। সেই থেকেই হয়তো মানুষের বাইরের আচার-আচরণ লক্ষ্য করা থেকেও ভেতরের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বাসনা-কামনা বুঝে ফেলার দিকেই অশ্বিনীর টান বেশি। অশ্বিনী যত দিন বাড়িতে ছিল জ্যাঠামশাই চেয়েছেন অশ্বিনী যেন তার ছেলের মতো সংসারের বা জ্যাঠামশায়ের সমস্ত দায়দায়িত্ব নেয়। স্নেহ-ভালোবাসা মায়া-মমতার বন্ধন ও ছেলের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে এই চাওয়াটা আসে নি। শুধু মেয়েদের বাবা-মা হওয়ার ফলে জ্যাঠামশাই-জ্যাঠাইমাকে মেয়ে বাড়ির লোকজনদের মেয়ে-জামাইদের তুষ্ট রাখতে ব্যস্ত থাকতে

হয়েছে। একটা ছেলে থাকলে নিজেরা তুষ্ট থাকার জন্য তার ওপর নির্ভর করা যায়। জ্যাঠামশাই অশ্বিনীকে সেই জায়গাটায় চেয়েছেন। জ্যাঠামশাইয়ের শত সন্দেহ অবিশ্বাস সত্ত্বেও ঐ জায়গাটিতে যেতে অশ্বিনী কখনো রাজি হয় নি। আগের চাকরির সময়ে নিজের হাতখরচ পঞ্চাশটাকা, মায়ের জন্য পঁচিশটাকা আর ব্যাঙ্কে একশ টাকা রেখে দেড়শ টাকা অশ্বিনী জ্যাঠামশাইকে দিত। বিয়ের পরও এই টাকাটা সে বাড়ায় নি। কারণ সে জানত, বাড়ানো মানেই বাড়ানোর ক্ষমতা স্বীকার করে নেয়া। আর সেটা স্বীকার করা মানে বাড়িয়ে যেতেই হবে। তার চাইতে বরঞ্চ জ্যাঠাইমার খোঁটা "বউ আসার আগেও যা খরচা, বউ আসার পরও তাই" সহ্য করা অনেক ভালো।

দুই

এই নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে প্রতিমাসের নিয়মিত একশটাকা ছাড়াও জ্যাঠামশাই যখন যা আভাস দিয়েছেন অশ্বিনী পাঠিয়েছে। একবার জ্যাঠামশাই লিখেছিলেন, বাড়িতে যে গোরুটা আছে তার দুধ কমে আসছে, আর মাস খানেকের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে, দুধ না থাকলে বৌমার (অশ্বিনীর মা-র) খুবই কষ্ট হবে। একটা দুধেল গোরু কেনার জন্য পাওয়া যাছে, দামও মাত্র শ দুই টাকা। খুব ভালো গোরু। অশ্বিনী গোরু কেনার জন্য একশ টাকা পাঠিয়েছিল। কিছুদিন আগে জ্যাঠামশাই লিখেছিলেন এখন কিছু টাকা হাতে পেলে বৌমার (অশ্বিনীর মা-র) ঘরের একটা-দুটো টিন পাল্‌টে দিতেন—অশ্বিনী পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছিল। আবার মাত্র দিন দশ-বারো আগে, যখন পূজোয় বাড়িতে যাবে না এটা ঠিক করেই ফেলে, জামাকাপড় কেনার জন্য অশ্বিনী একশ টাকা পাঠিয়েছে।

কিন্তু অশ্বিনীর মায়ের অম্বুবাচীর সময় গোলাপ পঞ্চাশটা টাকা

পাঠাতে চেয়েছিল—অশ্বিনী কিছুতেই পঁচিশ টাকার বেশি পাঠাতে দেয় নি। জ্যাঠামশাইকে গোরু কেনা, টিন বদলানো আর কাপড় কেনার জন্য টাকা পাঠানো যায়। কিন্তু মায়ের অম্বুবাচীর জন্য পঞ্চাশটাকা নেহাতই বড়লোকি। বড়লোকি যদি দেখাতে হয় অশ্বিনী এখানে, দার্জিলিঙে, দেখাবে—বাড়িতে নয়।

টাকা-পয়সা খরচার ব্যাপারে অশ্বিনী কোনো কার্পণ্য করে না কিন্তু সে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে চায় না। বাড়িতে যে-জ্যাঠামশাই ছিলেন দাবিদার, চিঠিতে সেই জ্যাঠামশাই প্রার্থী হয়ে যাচ্ছেন—এটা অশ্বিনী বোঝে। জ্যাঠামশাইয়ের ওপর অশ্বিনীর আর কোনো নির্ভরতা নেই বলেই তাঁর আর্জি সম্পর্কে সে উদার হতে পারে, বিশেষত যখন এক পয়সাও না-দেবার অধিকার তার সবসময়ই থেকে যাচ্ছে। এক পয়সাও না দিয়ে যদি অশ্বিনীসহ অশ্বিনীর মা জ্যাঠামশাইয়ের সংসারে কাটিয়ে দিতে পারেন, তাহলে অশ্বিনী ছাড়াও তিনি কাটিয়ে দিতে পারবেন, যদি অশ্বিনী এখন টাকা পাঠানো বন্ধ করে, তবু। কিন্তু মা তো টাকা চান না। তাঁকে টাকা দেয়াও হয় না—গোলাপ খামে কী পাঠায় না-পাঠায়! তাঁকে মিছি-মিছি অম্বুবাচীর জন্য টাকা পাঠিয়ে একটা নতুন অবস্থায় ফেলা কেন। তাও আবার পঞ্চাশ টাকা।

জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি অশ্বিনী না-খুলে নিয়ে আসে, তারপর খাওয়ার টেবিলে শোনে। কিন্তু পরে একসময় চিঠিটা জ্যাঠামশাইয়ের সই করা মনিঅর্ডার রসিদগুলোর সঙ্গে গুছিয়ে রেখে দিতে ভোলে না। ফলে অশ্বিনীর কাছে জ্যাঠামশাইয়ের টাকা চাওয়া আর এখান থেকে টাকা পাঠানোর একটা ইতিহাস থেকে যায়। সারাটা শৈশব, বাল্য, যৌবন, একটা গোটা চাকরি, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে কাটিয়েও অশ্বিনী জ্যাঠামশাইয়ের ছেলের কাজ হাতে তুলে নিয়েছে এমন কোনো নজির রাখে নি। অথচ এই নতুন চাকরিতে যোগ দিয়ে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা যখন প্রায় ছিন্নই হয়ে গেল তখন

মনিঅর্ডার রসিদে আর জ্যাঠামশাইয়ের চিঠিতে দলিল হয়ে থাকছে যে জ্যাঠামশাইয়ের মেয়েরা নয়, জামাইরা নয়—অশ্বিনীই জ্যাঠামশাইয়ের শেষ বয়সের সব দায়িত্ব পালন করেছে। এই দায়িত্ব পালনের সাক্ষ্যসাবুদসহ অশ্বিনী কোন্ আদালতে হাজির হতে পারবে। পুত্রস্নেহ বা পিতৃভক্তি যে-আদালতে বিচার হয় সে-আদালতে কি কখনো অশ্বিনী যেতে চায়। বা জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি-ঘর সামান্য জোতজমি এইসব সম্পত্তির মালিকানা নির্ণয়ের যখন প্রয়োজন পড়বে তখন কি পুত্রস্নেহ বা পিতৃভক্তির সাক্ষ্যসাবুদ আত্মিক আদালতের এক্তিয়ার থেকে নেমে আসবে সিভিলকোর্টের এজলাসে। একই বাপের স্নেহধন্য একাধিক ভাই বা বোন যেখানে সম্পত্তির ওপর দখল চাইতে দাঁড়ায় সেখানে কি গোরু বা টিন বা কাপড় কেনার টাকা দেয়ার সাক্ষ্যসাবুদ গৃহীত হবে?

তিন

বারোটা বাজার আগেই অশ্বিনী অফিস থেকে ফিরে আসে। গোলাপকে একটা চিঠি দিতে দিতে বলে, "কী তোমার রান্নাবান্না কমপ্লিট?"

চিঠি নিয়েই গোলাপ বলে, "জ্যাঠামশার মনে হচ্ছে"—

একটু হেসে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে—"খোলো নি বলে"

গোলাপ চিঠি খুলে পড়তে শুরু করে দেয়। অশ্বিনী ওয়াড্রো-বের কাছে গিয়ে জামাপ্যান্ট খোলে। "কি, জবাব দিলে না?"

"উঁ?"

"তোমার রান্নাবান্না কমপ্লিট?"

"মায়ের আবার বুকের ব্যথাটা বেড়েছে"—

অশ্বিনী পাজামাটা পরে এগিয়ে আসে, "তোমার রান্নাবান্না কমপ্লিট?"

গোলাপ খাবার টেবিলের দিকে সরে চেয়ারটায় বসে পড়ে,

তারপর চিঠিটা পড়তে পড়তে আপনমনেই একটু হাসে। অশ্বিনী মেঝের ওপর বসে পড়লে গোলাপ চট করে চিঠি থেকে চোখে সরায় "কি ব্যাপার ? ওখানে বসে পড়লে যে ?"

"তোমার চিঠি পড়া শেষ হোক, অনেকক্ষণ লাগবে তো ?"

"তোমার মতো আমি চিঠি পকেটে নিয়ে থাকতে পারি না। কী করে থাকো ?"

"তাহলে তো আর অফিসের কোনো কাজ হবে না, তোমার রান্নাবান্না কমপ্লিট ?"

চেয়ারের হেলানির মাথায় বাঁ বাহু রেখে গোলাপ ছুই হাতে ইনল্যাণ্ডটা ধরে ছিল। সেই অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করে, "কেন ?"

"একটু দার্জিলিঙে যেতাম।"

"আমরা যাব না ?" গোলাপ ছুই হাতেই চিঠিটাকে থুতনির কাছে চেপে ধরে।

"না। আজ আমি যাব। ছুচারদিন পর একেবারে পূজোর মতো বেরুবো। পূজোটুজো সেরে ফিরব—"

"আমরা পূজোর বাজার করব না ?"

"এত বাজার করছ তাও পূজোর বাজার হচ্ছে না ? কোরো"—

"তুমি দিব্বি একাএকা যাবে, না ?"

"তা হলে তুমিও চলো, বাগানের গাড়িতে। আরো সবাই যাবেন। পেছনে বোসো। এইটুকু রাস্তায় বারকয়েক বমি কোরো। তারপর ওদের ওখানে গিয়ে শুয়ে থেকো। আবার কাল সকালে ফিরে এসো। আবার ছুদিন পর বাক্স-পেঁটরাসহ যেও।"

"আর বলতে হবে না, আমি যাচ্ছি না, কিন্তু রাত্রিতে তুমি না থাকলে এত টাকা ঘরে নিয়ে আমার ভীষণ ভয় করে—"

"ভয় করবার কি আছে। বাগানের ভেতর। পাশাপাশি কোয়ার্টার। দাজুকে শুতে বোলো। তাই বলে তো আর ও-টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারি না"—

"কেন ? আমার নামে ?"

"বলেছি তো হয় না। যখন জিজ্ঞাসা করবে এই চাকরিতে আসার পর তোমার বউয়ের এত টাকা এলো কোত্থেকে তখন শ্বশুরবাড়ির কোন্ জমিদারি দেখাব বলো ?" একটু পরে অশ্বিনী যোগ করে—"একটা কাজ করো না কেন, বললাম তো কতবার, গয়না বানিয়ে রাখতে তো পারো, সেটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে"—

"গয়না কী আর এ-সব পাহাড়ি জায়গায় কেনা যায় নাকি ? আর মজুরির টাকাটা তো বেফয়দা যাবে। দরকার পড়লে ঐ টাকাটা তো আর পাবে না"—

"বা বা তোমার হিসেব জ্ঞান আছে বটে। গয়না কিনবে না পাছে মজুরির দাম দিতে হয়।"

"তা তো বলি নি। বলেছি টাকার বদলে গয়না করে রাখা যায় না।" চিঠিটা টেবিলের ওপর নুনের পাত্রে চাপা দিয়ে গোলাপ উঠে পড়ে—"যাও স্নানে যাও"—

"খোকন কোথায় গেল ?"

"দেখি, পাঠিয়ে দিচ্ছি"—

"বাবা বাবা" বলে বাইরে থেকেই ডাকতে ডাকতে খোকন এসে ঢোকে। তারপর পেছন থেকে অশ্বিনীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "তুমি আমাকে ডেকেছ ?"

"হ্যাঁ—চলো স্নান করি"—

"কেন। আজ বেড়ু করতে যাব ?"

"না বাবা চলো ; আমি তো আজ দার্জিলিং যাব"—

"আমরা যাব না ?"

"তোমরা তো দুদিন পর যাবে। পূজো দেখবে। ড্যাং ড্যাং ড্যাং বাজনা বাজবে। কত লোক আসবে, আরতি হবে"—

"তুমি তাহলে আসার সময় বেবিকে নিয়ে আসবে"—

"লুসুকে আনব না?"

গোলাপ দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে বলে যায়—"দাঁড়াও এখুনি জল গরম করে দিচ্ছি"—

"না লুসুকে আনবে না"—

"কেন। লুসু আবার কি করল"—

"না। ও বলে ও স্কুলে পড়ে। আমি পড়ি না। ও আমার দিদি না।"

"তুমি তো বেবির দাদা"—

"হ্যাঁ আমি বেবির দাদা। বেবিকে যাই বলি বেবি তাই করে। আচ্ছা বাবা আমি স্কুলে পড়ব না?" খোকন স্কুলের 'স'-র ওপর অতিরিক্ত জোর দিচ্ছিল।

"তুই ওভাবে স্কুল বলছিস কেন"—

"লুসু বলে আমি নাকি বলতে পারি না"—

"না, তুমি তো সুন্দর বলো। তুমি আগে কি বলতে?"

"ইসকুল"—

"সেটাইতো ভালো ছিল"—

"না, আমি স্কুলই বলবো। পারি না বাবা?"

"খুব ভালো পার"—

গোলাপ ভেতর থেকে বলে ওঠে, "জল গরম হয়ে গেছে।"

"চলো খোকন"—

"না বাবা, একটু দাঁড়াও"—খোকন তাড়াতাড়ি জামাপ্যান্ট খুলতে গিয়ে পারে না। অশ্বিনীর সামনে এসে দাঁড়ায় "খুলে দাও।" খুলে দিতেই খোকন লাফিয়ে অশ্বিনীর পিঠে ওঠে, গলা জড়িয়ে ধরে। অশ্বিনী খোকনকে নিয়ে বাথরুমে ঢোকে। গোলাপ জল-টল সব ঠিক করেই রেখেছিল। অশ্বিনী খোকনকে পিঠে নিয়ে হুড় হুড় করে জল ঢালে। খোকন অশ্বিনীর গলা আরো জাপ্টে ধরে। "এবার সামনে এসো, সাবান মাখা হবে"—খোকন গলা ছেড়ে সামনে

এসে দাঁড়ায়। দুই হাতের আঙুলগুলো বুকের কাছে ধরে খোকন একটু একটু কাঁপে—"বাবা, জলটা আর একটু গরম করে দি"—

"না খোকন, খবরদার হিটারে হাত দেবে না ; ভীষণ শক মারবে কিন্তু"—

কয়েকদিন আগে একটা ইমার্সন হিটার কেনা হয়েছে। সেটা দিয়ে গোলাপকে জল গরম করতে দেখে খোকনও জল গরম করতে চায়, সেই প্রথম দিন থেকেই। অশ্বিনী গোলাপকে বলে দিয়েছে সেটা সবসময় খোকনের নাগালের বাইরে রাখতে।

"বাবা, দাজু তো স্নান করে না"—

"দাজু তো বড়"—

"তুমিও তো বড়"—

"তুই কি তাহলে দাজু হবি ?"

"তুমি দাজুকে স্নান করতে বলো না কেন ?"

"দাজু রাত্রিতে বাড়িতে গিয়ে স্নান করে বোধহয়"—

"না, আমাকে দাজু বলেছে, ও কোনোদিন স্নান করে না"—

খোকনকে জামাকাপড় পরিয়ে স্নানঘর থেকে বের করে দিয়ে অশ্বিনী বলে, "যাও মাকে বলো চুল আঁচড়ে দিতে—"

"আমি নিজে পারি"—

"আচ্ছা বেশ, নিজে করো"।

অশ্বিনী জামা-পাজামা পরে বেরিয়ে আসতে আসতে বলে, "তুমি স্নানে যাও", গোলাপ জবাব দেয়—"আমার অনেক কাজ বাকি, তোমরা খেতে বসে যাও।"

"ঠিক আছে, আমার তো দেরি আছে এখনো, তুমি স্নান সেরে নাও না।"

"ধ্যুৎ, এভাবে আমার সবকাজ নষ্ট হয়। তোমরা খেয়ে নাও না, আমি পরে খাবো।"

"আচ্ছা, তুমি কাজটাজ সারো, দেখি কত কাজ"—

"ধ্যুৎ, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরলেই সব কাজের গোলমাল"—গোলাপ স্নানের আয়োজন শুরু করে।

খাবার টেবিলে ভাত মুখে দিয়ে অশ্বিনী বলে, "কই চিঠিটা পড়লে না?" খাবার টেবিলে সব কিছুই আলাদা আলাদা পাত্রে আছে। যার দরকার সে নিজে নেবে। বেশির ভাগ সময় অবিশ্যি গোলাপ নিজেই দেয়। খোকন চেয়ারে বসলে টেবিল হাতে পায় না বলে, আর একটা পুরনো টেবিলের ওপর বসে খোকন খায়।

গোলাপ নিজে একটু ভাত মুখে দিয়ে, চিঠিটা খোলে।

চার

"তোমার পাঠানো একশত টাকা পাইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম তোমরা ৺পূজার সময় আসিবে, ৺পূজার কয়েকটা দিন বাড়ি ভর্তি হইবে। কিন্তু ৺পূজাতে তোমাদের এত অল্প দিনের ছুটি তাহা জানিতাম না। চাকরিতে ঢুকিয়াই ছুটি নেয়া ভাল নয়। ছুটি না নিয়া ভালোই করিয়াছ। আমি শচীন বাগচী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি এখানে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে অনেকদিন সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তিনিও বলিলেন প্রথম প্রথম ছুটি না নেয়াই ভালো"

"কে লিখেছে মা, দাদু?"

"হ্যাঁ", অশ্বিনী জবাব দেয়—"তোকে আর একটু ডাল দেব?"

"না, মাছ দাও, না না, ঝোল দেবে না, দাদুর কাছে যাব না, শুধু বকে" খোকা ভাত মুখে দেয়। গোলাপ ভাত মুখে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললো, "তোকে কবে বকেছেন রে, যত বাজে কথা"—

খোকন সে-কথার জবাব না দিয়ে বলে, "বাবা, ঐ কপিটা দাও তো"—

গোলাপ আবার পড়ে—"তোমার টাকা দিয়া যাহা হয় কিনিব—দেখো, কখনো খুশিমনে লিখবেন না, যেন তিনজনের জন্য ওর

বেশি জামাকাপড় কোনোদিন কিনেছেন—তবে আজকাল কাপড় চোপড়ের দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছে। তোমার পাঠানো পঞ্চাশটাকা দিয়া বৌমার ঘরের চাল ঠিক করিব বলিয়া টিন খোঁজ করিতেছি। কিন্তু এখন আর পুরান দশফুটি টিন পাওয়া যায় না। ও-ঘরের অন্য টিনের সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে। ঠিক মাপের টিন পাওয়া না-গেলে জোড়া লাগাইতে হইবে। জোড়া লাগাইলে চাল পোক্ত হইবে না। আমাদের পাড়ার অবিনাশ সাপ্লাই অফিসে কাজ করে। তাহাকে বলিয়াছিলাম। সে বলিয়াছে একটি দোকানের ঠিকানা দিবে ও তাহাদের বলিয়া দিবে। আমাকে পরশ্বদিন সেখানে গিয়া দুইটি টিন আনিতে হইবে। কিন্তু অবিনাশ বলিয়াছে প্রতিটির দাম পঁয়ত্রিশটাকা হিসাবে মোট সত্তরটাকা লাগিবে—তুমি কি আরো কুড়ি টাকা পাঠাবে নাকি ?”

“বাঃ আমি পাঠাতে যাব কেন, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি, জ্যাঠা-মশাই কুড়িটা টাকা খরচ করবেন না ?”

“দাদুর বাড়ি খারাপ। দাদুর বাড়িতে আমি যাব না”—বলে খোকন দুই হাতে কাঁচের গ্লাস তুলে তুলে জল খেতে শুরু করে। গোলাপ হেসে বলে, “দেখতো কী রকম পাকা পাকা কথা বলে, লোকে ভাববে আমরা শিখিয়ে দিয়েছি—”

“খোকন, আর একটু ভাত নিয়ে আর একটা মাছ দিয়ে খা”—গোলাপ বলে।

“না আমি খাব না। মাছ ঝাল।”

“তোমার রান্নার ঝাল আর কমাতে পারলে না। ঐ যে জ্যাঠাইমার স্বাদ অনুযায়ী রাঁধতে শিখেছ—”

“এখন একটুও ঝাল দিই না। এটা আবার ঝাল নাকি।”

অশ্বিনী গোলাপের পাতে দুটো ভাজা তুলে দেয়। “ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।”

একটা ভাজা মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে গোলাপ পড়তে থাকে।

"নতুন গোরুটির পিছনে আরো কিছু টাকা খরচ হইয়া গেল। গোরুটির কোনো অসুখ ছিল হয়তো। নতুন বিয়ানো অথচ দুধ প্রায় দিতই না। ইহার আগের মালিক আমাকে নানা কথা বলিয়া বুঝাইয়া গোরুটি গছাইয়াছিল। তোমার একশত টাকা না পাইলে অবশ্যই আমি গোরু কিনিতে যাইতাম না।—যাক তাও লিখেছেন" গোলাপ দুমুঠো ভাত মুখে পুরে তাড়াতাড়ি চিবুতে শুরু করে—"কিন্তু কিনিবার পরই বুঝিলাম আমাকে ঠকাইয়াছে। চিরজীবন মানুষকে বিশ্বাস করিয়াই ঠকিলাম। আমি কাহাকেও এক পয়সাও ঠকাই নাই অথচ আমাকে সবাই চিরকাল ঠকাইয়াছে। যাহা হোক্ আমাদের পাড়ার ভূপেনবাবুর ছেলে সুকুমার ডিস্ট্রিক্ট এ্যাগ্রোইনডাসট্রিজ কর্পোরেশনে নতুন চাকরি পাইয়াছে। তাহাকে রাজবাড়ি গ্যারাজে ট্র্যাক্টরের কাজকর্ম শিখিতে যাইতে হয়। রাজবাড়ির পাশেই ব্লক অফিস। তাহাকে কয়েকদিন বলিবার পর সে ব্লক অফিস হইতে একটি ঔষধ আনিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কি বলিতে কি বলিয়াছে কে জানে। চারদিন ঔষধ খাওয়াইয়াও কোনো উপকার হইল না দেখিয়া আমি ঔষধ বন্ধ করিয়া দেই, পরে স্থানীয় পশুচিকিৎসালয়ে লইয়া যাইব স্থির করি। এ বিষয়ে প্রিয়নাথ ঘোষের সহিত আলাপ করায় সে বলিল পশুচিকিৎসালয়ের ডাক্তারকে বাড়িতে ডাকিয়া কিছু না দিলে নাকি ভালো ঔষধ পাওয়া যায় না। সত্যমিথ্যা জানি না। তবে প্রিয়নাথ ঘোষ তো জল বেচিয়াই তিনতলা বাড়ি তুলিয়া ভাড়া খাটাইতেছে। অবশেষে ডাক্তারকে কল দেয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করি। দুইশত টাকার গরুকে তো আর বিনা চিকিৎসায় মারিতে পারি না। কিন্তু ডাক্তারটির প্রশংসা করিতেই হইবে। একদিন দেখিতে আসিয়াছিল। সেইদিন একটি ও তাহার সাতদিন পর আর একটি ইনজেকশন দিয়া গিয়াছে। প্রথম ইনজেকশনের পরই গোরুর দুধ নিয়মিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ইনজেকশনের পর নিয়মিত ও ঘন হইয়াছে! এখন নতুন গোরুটির প্রতিদিন দুই সের সোয়া দুই সের

দুধ হইতেছে। পুরান গোরুটিও এখনো দুধ দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে নাই। নিয়মিত আধ সের মতো দুধ দিতেছে। তবে তাহাকে আর দুইবেলা দুই না। দুই গোরু মিলিয়া প্রায় সের তিন দুধ হইতেছে। তোমার জ্যাঠাইমা সেদিন সর বাটিয়া একটু ঘি-ও তৈরি করিয়াছিলেন—নিজেই খেয়েছেন সেটা, মাকে তো আর দেন নি"—

"সে কি তুমি চিঠি পড়তে পড়তেই ঝগড়া করবে নাকি"—

গোলাপ আবার দুমুঠো ভাত মুখে ঢোকায়। খোকন ক্ষীরের বাটিটা টেনে নেয়। "খোকন, হাত ধুয়ে খা, নইলে বিচ্ছিরি লাগবে।" অশ্বিনী খোকনের কাছের বাটিতে জল ঢেলে দেয়। খোকন তার ভেতর হাত চুবোতে গিয়ে টেবিলে জল ফেলে। গোলাপ বলে ওঠে—

"কী যে তুমি করো না, এখন টেবিলটা নোংরা করছে"—

"আরে এ-টেবিল নোংরা হয় না"—

"ওখানে সরবাটা ঘি খাচ্ছেন আর এখানে খোকনের জন্য একটু ভালো দুধ জোটে না"—

"কেন, এখনকার দুধটা তো বেশ ভালো। খুব সুন্দর ক্ষীর হয়েছে"—

গোলাপ আবার চিঠিটা শুরু করতে গেলে অশ্বিনী বলে, "কি? আরো আছে নাকি?"

"এটুকুতেই শেষ হবে?"

"তাহলে ক্রমশ করে দাও"—

"যদিও গোরুটির পিছনে ডাক্তার ও ইনজেকশন বাবদ আরো অতিরিক্ত খরচ সতের টাকা যোগ করলে দামটা আর সস্তা পড়ে নাই, তবু আজকাল দুধেল গোরু কেহ বেচিতে চাহে না। ডাক্তার-বদ্যি করিবার মতো ক্ষমতা লোকটির ছিল না বলিয়াই বেচিয়াছে। আমরা এখানে তিন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। বর্তমানে দুধই আমাদের প্রধান খাদ্য। তোমার মায়ের বুকের ব্যথাটা কয়দিন ধরিয়া আবার

বাড়িয়াছে। এখানো ডাক্তার দেখাইতে রাজি হন নাই। আর এ-সব ক্রনিক অসুখে ডাক্তাররা কিছু করতেও পারে না। আমার মনে হয় কয়দিন সাবধানে থাকিলেই ঠিক হইয়া যাইবে। তোমার জ্যাঠাইমাকে বলিয়াছি যাহাতে বৌমাকে সকালেও এক কাপ করিয়া দুধ দেন,—এরপর এ-কোণা ও-কোণায় কী লিখেছেন খুঁজে পাচ্ছি না"—

"এতেই হবে। এখন খাও।"

"বাবা, আমাকে নামিয়ে দাও"—

পাঁচ

খোকনের মুখের দিকে তাকিয়ে দুজনাই হেসে ওঠে—সারা মুখে ক্ষীরমাখা। অশ্বিনী ওকে পেছন দিয়ে ধরে টেবিল থেকে নামিয়ে দেয়। তারপর আবার চেয়ারে বসতেই গোলাপ বলে, "তুমি নাও ওকে মুখ ধুইয়ে দাও, সব ভিজিয়ে একসা করবে"—

"করুক না একটু"—একটু চুপ করে থেকে অশ্বিনী বলে, "কি আমাদের পাড়ার ভূপেনবাবুর ছেলে সুকুমার রাজবাডিতে কোন্ অফিসে কাজ করে, তার পাশে ব্লক অফিস, সেখান থেকে গোরুর জন্য ওষুধ—পারেনও বটে জ্যাঠামশাই।"

"তা পারবেন না কেন, লোককে দিয়ে কাজ করানো ছাড়া তো কোনো কাজ নেই, মায়ের জন্যই দুঃখ হয়। ওঁদের ওখানে তো মুখ ফুটে কিছু বলবেনও না, গোরুর জন্য ডাক্তার, ইনজেকশন, আর মায়ের জন্য এককাপ দুধ। তাও দেন কিনা কে জানে, আর দিতে গিয়ে কথা যা শোনান তাও আমার জানা আছে।"

"তুমি তাহলে জ্যাঠাইমাকে কিছুতেই ছাড়বে না।"

"ছাড়াছাড়ির তো কিছু নেই। বিয়ের পর লোকে শাশুড়ীকে ভয় পায়। আর আমাকে জ্যাঠশাশুড়ীর ভয়েই সবসময় তটস্থ থাকতে হতো। আমার তো প্রথম দিকে সন্দেহ হতো তুমি চাকরি-

বাকরি করো কিনা। নিজের ছেলের বৌয়ের ওপরও মানুষ অত শাশুড়ীগিরি ফলাতে পারে না। মা আর আমি তুজনা মিলেই ঐ একজনকে খুশি করতে পারতাম না।"

"ব্যস, ব্যস, বিষম খাবে"—গোলাপের খাওয়া হয়ে গেছে দেখে অশ্বিনী ওঠে। গোলাপও উঠে দেখে খোকন ওয়াড্রোব খুলে তাক থেকে প্যাণ্ট আর জামা বের করেছে।

"খোকন, কি হচ্ছে"—

"ওগুলো ভিজে গেছে, ঠাণ্ডা লাগছে। আমি এখন নিণ্টুদের বাড়িতে যাব।"

"না, তুপুর বেলায় যেতে হবে না, চুপচাপ শুয়ে থাকো। খবরদার বলছি। দা—জু, টেবিল পরিষ্কার করে নিয়ে যাও।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অশ্বিনী বলে, "তাহলে তখন আর তুমি মায়ের ওপর রাগতে কেন।" মুখহাত ধোয়ার জন্য গোলাপ তখন চৌকাঠ পেরিয়েছে—"রাগব না তো কি, তোমার ওপর সবচে বেশি রাগতাম"—বলে চলে যায়।

"বাবা, আমি নিণ্টুদের বাড়ি যাব না?"

"নিশ্চয়ই যাবে"—

"মা যেতে দিচ্ছে না"—

"আচ্ছা প্যাণ্ট-জামা পরো তো, নইলে আবার ঠাণ্ডা লাগবে।" অশ্বিনী মেঝের ওপর বসে ছেলের প্যাণ্টের বোতাম আটকায়।

মা যে ঐ সারাদিন চুপ করে থাকতেন, কিছুতেই ঠোঁট খুলতেন না, ওতেই আমার রাগ হতো। মা, এটা করে দেব, না, মা ওটা করে দেব, না। আর দিনরাত জ্যাঠাইমার দাসীবৃত্তি করা। কেন? উনি কি জ্যাঠাইমার খান না পরেন। ওকি তুমি ওকে প্যাণ্ট পরিয়ে দিচ্ছ? খোকন, তোমার যাওয়া হবে না, যাও, এখন শুয়ে পড়"—

খোকন মুখ কাঁচুমাচু করে অশ্বিনীর মাথা জড়িয়ে ধরে—"বাবা, আমি যাব।"

অশ্বিনী খোকনের মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে কিছু বলামাত্র খোকন লাফিয়ে গিয়ে খাটের ওপর উঠেই চোখ বোঁজে।

"তার চাইতে বরং জ্যাঠাইমা ভালো। যা মুখে এলো বলে গেলেন"—

"এই বলছো মা ভালো, এই বলছো জ্যাঠাইমা ভালো"—

"না, বড়দিদা ভালো না," খোকন চোখ বুঁজেই বলে।

"দেখলে, একটা শিশুও বোঝে। কোনোদিন হাতে করে ওকে একটা মিষ্টি দিয়েছেন? অথচ ওঁর বড় মেয়ের বড় ছেলে, ধেড়ে ছেলে, তার জন্য ক্ষীর শুকিয়ে রাখতেন। তুমি ভেবেছ আমি সারা জীবনে এ-সব ভুলব? ওঃ, কোনোদিন যে ওখান থেকে ছাড়া পাবো ভাবি নি।"

"আচ্ছা, এখন, আপাতত চুপ কর তো, এখানে তো আর জ্যাঠাইমা নেই যে শুনতে পাবেন। তা, তুমি এত কথা শিখলে কি করে, ওখানে তো সাত চড়ে রা কাড়তে না, দেখ তো কটা বাজে "—

"তোমার জ্যাঠাইমার হাতে পড়লে আমরা তো কোন্ ছার, গাছও কথা বলবে। একটা বাজতে দশ, তুমি যাবে কখন?"

"গাড়ি এখানে আসবে, দুটো নাগাদ, ওদের কথা তো, আমি বলেছি যাওয়ার সময় তুলে নিতে, কে গিয়ে অফিসে বসে থাকবে", অশ্বিনী পাশ ফিরে চোখ বোঁজে।

"বাবা" ডাক আর একটা ধাক্কায় চমকে জেগে ওঠে অশ্বিনী। চোখ খুলে দেখে গোলাপ নেই, খোকন এসে গলা জড়িয়ে ধরেছে— "বাবা, আমি যাব না?"

"কোথায় যাবে", বলে অশ্বিনী আবার চোখ বোঁজে।

"নিন্টুদের বাড়ি"—

"এখন ঘুমোও, পরে বিকেলে যেও"—

"তুমি যে তখন বললে এখুনি যেতে দেবে, আমি তো শুয়েছি"—

"মা-কে জিজ্ঞাসা করো"—

খোকন মেঝেতে নামলে অশ্বিনী বলে, "ঘড়িটা দিয়ে যা তো খোকন" খোকন ওয়াড্রোব খুলে, ড্রয়ার খুলে ঘড়ি দিয়ে যায় অশ্বিনীকে। অশ্বিনী দেখে—"একটা পঁচিশ", মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট ঘুমিয়েছে অথচ এত ভারি লাগছে।

"বাবা, মা যেতে বলেছে"—

"তাহলে যাও, মা কোথায়?" চোখ বুঁজেই অশ্বিনী বলে।

গোলাপের গলাতেই "কেন, এই তো" শোনার পর অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "কি করছো —"।

গোলাপ পায়ে পায়ে খাটের কাছে আসে। তারপর অশ্বিনীর পাশে বসে। "তোমরা বাপব্যাটা ঘুমিয়ে পড়লে, আমি আর কি করি, বসে বসে সেলাই করি—"

"তুমি ঘুমোলে না?"

"তুমি তো যাবে। তখন ঘুম থেকে উঠলেই মাথা ধরবে। তাছাড়া খাওয়ার পরই ঘুমোলে আমার কী রকম অম্বল হচ্ছে আজকাল—"

"কোনো কাজ নেই, কম্ম নেই, অম্বলের আর দোষ কি"—

গোলাপ ডানহাতে সেলাইটা ধরে বাঁ হাতটা অশ্বিনীর বুকের ওপর রেখে বলে, "তুমি গেলে বিচ্ছিরি লাগে। রাতে থাকার কি আছে। চলে আসতে পারো না?"

"আসব কি-সে? তোমার টাকা আরো জমলে না-হয় গাড়ি কেনা যাবে"—অশ্বিনী গোলাপকে কাছে টেনে নেয়।

"দরজা খোলা আছে" বলে উঠে দরজা দুটো বন্ধ করে অশ্বিনীকে জড়িয়ে ধরে শুতে-শুতে বলে, "তুমি তো এখুনি চলে যাবে" তারপর চোখ বুঁজতে বুঁজতে বলে, "জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি পড়ে সব পুরনো কথা মনে হচ্ছিল। জীবনের আসল সময়টা এমন নষ্ট হয়েছে, না? শরীরটাও যেন বুড়িয়ে গেছে!"

গোলাপের বুকের ওপর মুখটা রাখতে রাখতে অশ্বিনী বলে, "বুড়িতেই যদি এই হয় আর ছুঁড়িতে কাজ নেই।"—

"তুমিই বলো শুধু—"

"তা-ছাড়া আবার কে বলবে ?"

"না, কেমন, সব কিছুই ইচ্ছে হয়, পারি না, একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি"—

"এই যদি একটুতে ক্লান্ত হওয়া হয় তাহলে তো আমি নেই" —

"দিদির বয়স আমার থেকে কত বেশি অথচ দিদিকে কেমন ছোট মনে হয়"—

"তোমাকে কি বড় মনে হয় ?"

"তুকি বলবে কি, আমার নিজেকেই মনে হয়"—

"ওঁরা চিরকাল বড় শহরে থেকেছেন, তাই ও-রকম; তোমারই বা বয়েস কি, একবছর যেতে না যেতেই তুমিও ও-রকম হয়ে যাবে, দেখবে"—

"প্রথম প্রথম অবশ্যি যে-রকম লাগত, এখন তা লাগে না।" গোলাপ চুপ করে যায়। তারপর আরো চাপা স্বরে বলে, "তুমি খুশি হও তো ?"

"কিসে"—

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোলাপ বলে, আরো চাপা স্বরে, চোখ বুঁজে, ঘাড়টা ঘুরিয়ে, অশ্বিনীর মাথাটাকে চেপে ধরে— "এই সবে, আমাকে নিয়ে ?"

"তোমার কি মনে হয় ?"

"তোমার যা-ইচ্ছা করো না! আমি কিছু বলব না। পরে আমার ইচ্ছে হবে।" যেন অশ্বিনীর ইচ্ছেটাকে কোনো বাধা না দেবার জন্যই গোলাপ খানিকটা উদ্যোগ নেয়।

"তুমি কিন্তু জন্ম থেকে ঐ-বাড়িতে থেকেও বুড়ো হও নি"—

"পালিয়ে পালিয়ে থেকেছি তো !"

"তোমার যে-রকম ইচ্ছে করে, কোরো। আমার ভালো লাগে। ব্যথা লাগুক না, তবু ভালো লাগে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোলাপ আবার বলে, "খোকনের আলাদা শোয়ার ব্যবস্থা করা উচিত, না?" অশ্বিনী জবাব দেয় না। গোলাপ বলে, "তুমি যে নাইটি পরার কথা বলেছিলে, নিয়ে এসো তো, পরবো," আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোলাপ আবার বলে, "তোমার যা ইচ্ছে করো। যা ইচ্ছে বলো, আমি তাই করব। আমার ব্যথা লাগে না—"

জ্যাঠামশায়ের পরিবারে তুজনকেই সমস্ত ইচ্ছা এত চেপে চেপে রাখতে হয়েছে যে ভিনদেশে নিজেদের সম্পূর্ণ আলাদা সংসার হয়ে ওঠার পর টাকা-পয়সার অভাব না থাকায়, নিজেদের খুশিমতো সংসারটা করতে পারায় খুশিমতো খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হওয়ায় গোলাপের নিজের শরীর নিয়ে খুশি হওয়ার নতুন ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নাকি। বিয়ের এত কটি বৎসর পর, এক সন্তানের মা হয়ে যাওয়ার পর নতুন কোন্ অভিজ্ঞতা এই পাহাড়ের গর্তে গোলাপের জন্য অপেক্ষা করে আছে যাতে নিজের শরীরটার ফুরিয়ে না-যাওয়াটা নিজের কাছে অন্তত সত্য হয়ে ওঠে। বেতো রুগিরা যেমন নিজের শরীরে নিজেই ব্যথা দেয়, গোলাপ কি তেমনি অশ্বিনীর শরীর দিয়ে নিজের শরীরটাকে খোঁচাবে—শরীরটা যে এখনো আছে এটা শরীর দিয়ে বোঝবার এতই তাড়া তার?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কড়া নাড়তেই বেণু এসে দরজা খুলে দেয়—"বাঃ, এসে গেছেন, বৌদি আপনার জন্য তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে"—

"ও-সব বাজে কথা ছাড়ুন, তাড়তাড়ি তৈরি হয়ে নিন, আসার সময় দেখে এলাম বাংলা সিনেমা এসেছে"—অশ্বিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে।

টগর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে. "ওঃ উনি থাকেন জঙ্গলে, এসে খবর দিচ্ছেন বাংলা সিনেমা এসেছে, এসব আমাদের দেখা হয়ে গেছে"—

বেণু—"কি, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, না ভেতরে আসবেন?" অশ্বিনী পেছনে হাত দিয়ে দরজাটা আবজে দিতে দিতে বলে, "তিনটে তো বেজে গেছে, এখনো গেলে ছবিটা দেখা যাবে"—

টগর—"তুমি কি আজই আবার ছুটবে, নাকি আজ রাতটা থাকবে?"

অশ্বিনী—"যদি সিনেমায় যান তাহলে থাকব, নাহলে আমি একাই সিনেমায় যাব, তারপর সিনেমা থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে যাব"—

বেণু—"ও বৌদি, তোমার জামাই তো রীতিমতো সেয়ানা হয়ে উঠেছে, কেমন হিসেব বোঝে?"

টগর—"আজ তো থাকছই, কাল সিনেমা দেখা যাবে"—

বেণু—"ও সব ফাঁকিবাজি চলছে না। আপনি এসে বললেই আমাদের দেখা সিনেমা আবার আমরা দেখতে যাব, না?"

"একবার দেখলে কি আর দুইবার দেখা যায় না?"

"যায়, সেটা আপনাকে খাতির করে। সেটাই আগে ঠিক হোক, আপনাকে খাতির করা হবে কি না"—বেণু।

"দেখুন, আপনারা কথা বলে সময় নষ্ট করছেন আর এদিকে সিনেমার টাইম চলে যাচ্ছে"—

বেণু—"এ তো মজা মন্দ নয়। জামাই আমাদের বাড়িতে এসে আমাদেরই ওপর চোখ রাঙাবে।

"সত্যি কি সিনেমাটা দেখা হয়ে গেছে?"

টগর জবাব দেয়, "হ্যাঁ পরশুদিন"—

"কেন দেখলেন, আপনারা তো জানতেন আমি দু-একদিনের ভেতরই আসব।"

"হ্যাঁ, সেই আশায় আশায় থেকে সিনেমাটাই চলে যাক!"—বেণু।

"তো, একবার গেলে কি আর দুবার যাওয়া যায় না?"—অশ্বিনী মিনতি করে।

"এখন কি করে যাওয়া হবে। লুসু এখনই স্কুল থেকে আসবে। বেবি ঘুমোচ্ছে, দাদার না হয় ফিরতে ফিরতে সোয়া পাঁচটা। তাহলে ইভনিং-এ যেতে হয়" —বেণু। "ইভিনিং-এ আবার ভাবছিলাম, মিঃ প্রধানের ওখানে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল"—অশ্বিনী। বেণু চট করে বলে, "এক কাজ করুন না। আপনার দেখা নিয়ে তো কথা। আমাদের তো দেখা হয়েই গেছে। আপনি বৌদিকে নিয়ে এখুনি চলে যান।

"ধুৎ, তা কি হয়, আপনি যাবেন না—"অশ্বিনী।

"তাহলে জামাজুতো খুলে এখানেই শুয়ে থাকুন। সিনেমা দেখা আর আপনার কপালে নেই।" বেণু ঘর ছেড়ে চলে যায়।

টগর বলে, মিঃ প্রধানের সঙ্গে কি তোমার আগেই অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট করা আছে।"

"প্রায় তাই"—

"উনি তোমাকে চিনলেন কি করে ?"

"আমাদের বাগানে একটা গোলমাল হয়েছিল, তখন উনি গিয়েছিলেন"—

"আজ সন্ধ্যায় মিঃ প্রধানের কাছে চলো, কাল সন্ধ্যায় সিনেমায় যেয়ো"—

"আমাকে যে কাল বিকেলেই ফিরতে হবে"—

"দেখছ না বৌদি, ওঁর সব প্রোগ্রাম ঠিক থাকবে, আর আমাদের সব প্রোগ্রাম ওর জন্য বদলাতে হবে"—বেণু আবার এ-ঘরে এসে ঢোকে। অশ্বিনী যেন খানিকটা চিন্তা করেই বলে, "আচ্ছা তাহলে সন্ধ্যার শোতে সিনেমায় চলুন, কাল না হয় থেকে যাওয়া যাবে। আর, করব কি ?"

"এই তো ভালো মানুষের মতো কথা বেরচ্ছে"—বেণু ঘর ছেড়ে চলে যায়। অশ্বিনীকে পাজামা ইত্যাদি এনে দেয়।

অশ্বিনীর একজোড়া স্যাণ্ডেল, পাজামা, দু-তিনটি কম্বল, বিছানার চাদর, একটা প্যাণ্ট আর একটা শার্ট এখানে জমে গেছে। একবার অশ্বিনী পাজামা ফেলে চলে যায়, আর একবার স্যাণ্ডেল, কম্বল কিনে এনেও তার বাগানে নেয়া হয় না। তার থাকার উপকরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ে আসতে অশ্বিনীর এতই সাবধনতা। বেণু জিজ্ঞাসা করে, "চা খাবেন ?"

"এখন আর চা খেয়ে কি হবে, গোবিন্দদা ফিরুন।"

"তাহলে বৌদি, আমি লুস্থকে নিয়ে আসি, ওর তো ফেরার সময় হলো।—"

"চলুন, আমিও যাচ্ছি, বাড়িতে বসে থেকে আর কি করব"—অশ্বিনী পাজামাটা চৌকির ওপর রেখে দেয়। বেণু একটা চাদর জড়িয়ে এসে বলে, "চলুন"—

দুই

বেণু আর অশ্বিনী পৌঁছতেই ছুটির ঘণ্টা পড়ে যায়। অশ্বিনী একটু পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। লুস্নু পেছন থেকে এসে অশ্বিনীর কোমর ধরে একেবারে ঝুলে পড়ে—"মেসো কখন এসেছ?"

অশ্বিনী ঘুরে লুস্নুকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, "বাঃ বাঃ লুস্নু-সোনা, এই তো আমি বাগান থেকে নেমেই তোমার স্কুলে চলে এসেছি।" ওরা হাঁটতে শুরু করে দেয়। বেণু পেছন থেকে বলে, "নাম্, লোকে বলবে কি, বুড়ি মেয়ে কোলে উঠেছে?"

লুস্নু এঁকেবেঁকে কোল থেকে নামতে শুরু করলে অশ্বিনী তাকে নামিয়ে দেয়।

"খোকন এসেছে?"

"না তো। খোকন আসবে, পূজোর ভেতর আসবে, এসে থাকবে।"

ওদের সোজা নেমে যাওয়ার কথা, কিন্তু অশ্বিনী বাঁ দিকে ঘুরে যেতেই বেণু বলে, "ওদিকে কোথায় চললেন?"

"আপনি বাড়ি চলে যান, আমি আর লুস্নু একটু বেড়িয়ে ফিরব"—

লুস্নু বেণুকে জড়িয়ে ধরে বলে, "শোনো, শোনো পিউমনি, মাথাটা নামাও, কানে কানে" বেণু মাথা নিচু করলে লুস্নু তার মাথা ধরে আরো নামাতে থাকে "আঃ তোর জন্য কি রাস্তায় বসব নাকি?" বেণুকে প্রায় বসতেই হয়। অশ্বিনী একটু সরে দাঁড়িয়ে হাসে। বেণু ফিরে সোজা হতে হতে বলে, "ওব্ বাবা মেসোকে একেবারে সব চিনিয়ে দিয়ে বসে আছ, তাই তো মেসোকে দেখেই কোলে"—

কেক-প্যাসস্ট্রি নানারকম মিষ্টিতে গ্রেনারির প্যাকেটটা বেশ বড়ই হয়। টগর বলে উঠে—"সে কি তুমি এত খরচা করতে গেলে কেন, বেণু তুইই বা দিলি কেন?"

"আবার আমাকে টানছ কেন? জামাইদের খরচা করতে দিতে নেই, এ তো জন্মে শুনি নি।"

"বক্তৃতা তো দিচ্ছেন তখন থেকে, একটাও তো মুখে দেন নি"। তারপর টগরের দিকে ফিরে—"আমরা সিনেমায় যাব, বাচ্চারা তো আর যাবে না।"

"আর দাদার জন্য?"

"দাদার আর দাদার মেয়েদের জন্য একই ব্যবস্থা।"

"গোবিন্দবাবুও অফিস থেকে ফেরেন, টগর আর বেণুও বেরবার জন্য তৈরি হয়। গোবিন্দবাবু ঘরে ঢুকেই বলে, "কি রে বেণু, তোদের আসামী হাজির মনে হচ্ছে!"

"হ্যাঁ, দেখো না, আসামাত্র গ্রেনারিতে নিয়ে গেছি, এখন আবার সিনেমায় যাচ্ছি"—

"সাধে কি আর অশ্বিনী সহজে দার্জিলিঙে আসে না, গোলাপকে নিয়ে আসো নি?"

"না, ওরা তুদিনপর তো পূজোর সময় আসবেই, তাই আর এখন আনলাম না"—

"পূজোর কটা দিন তো তোমরা সব এখানেই থাকছ? নাকি তার ভেতর আবার বাগানে ছুটবে?"

"ভাবছি তো আপনার এখানেই আসব, কিন্তু আমরা এতজন···"

কথাটাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে গোবিন্দবাবু বলেন, "দেখ অশ্বিনী, কিছু কিছু কথা আছে যা ভাবলেও বলতে নেই আর কিছু কিছু কথা আছে যা না ভাবলেও বলতে হয়। তুমি যে-কথাটা বলতে যাচ্ছিলে সেটা যদি পরের দলের হয় তাহলে বলার দরকার নেই। আর যদি প্রথম দলের হয় তাহলে বলা উচিত নয়।"

"জামাইয়ের টেরি-ফেরি বাগানো হয়েছে?"—বেণু এসে জিজ্ঞাসা করে। বেণু তৈরি হয়ে গেছে। টগর এসে বলে, "অশ্বিনী তুমি তৈরি হলে না?"

"তৈরি তো হয়েই আছি, আবার কি"—অশ্বিনী।

"সিনেমা হল থেকে মিঃ প্রধানের সঙ্গে দেখা করে কি বলে আসবে যে কাল আসবে ?"—টগর।

"কি রে বেণু, তুইও কি তোর বৌদির দলে নাম লেখালি ?"—গোবিন্দবাবু।

"না না আমি ও-সব প্রধান-অপ্রধানের ভেতর নেই। সিনেমা-হল থেকে বাড়ি চলে আসব"—

"না, না। কাল সোজা চলে গেলেই হবে"—

বলে অশ্বিনী পাশের ঘরে গিয়ে চুলটা আঁচড়ে বাইরের ঘরে গিয়ে কোটটা পরতে পরতে বলে, "চলুন সব"—

টগর বেণুর চাইতে একটু যেন মোটা। বেণু টগরের চাইতে একটু যেন লম্বা। কিন্তু এলোমতো বাঁধা খোপার তলা দিয়ে চাদর দেয়ার জন্যই হোক্ অথবা শাড়ির শাদা রঙের ওপর ঘিয়ে রঙের চাদরের জন্যই হোক বেণুকে পেছন থেকে কেমন বিমর্ষ বোধ হয়। অথবা বেণুর সিঁথিটা খুব স্পষ্ট ও দীর্ঘ বলেই কিনা কে জানে। অথবা টগরের একটু চাপা রঙের শাড়ির সঙ্গে ঘাড়টা বাইরে রেখে জড়ানো চাদরের পাশে বেণুকে দেখা যাচ্ছে বলেই হয়তো। বৈধব্য আর দুঃখ অশ্বিনীর মনে বরাবরই একাকার। বেণুর হালচাল চেহারায় সেই তথাকথিত দুঃখ মেলে না। কখনো কখনো তার গলার স্বরে, যখন সে চোখের বাইরে, খানিকটা উঁচু গ্রামে সেই দুঃখ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, কান্নাচাপা গলায় কাউকে যেন উঁচু স্বরে কথা বলতে হচ্ছে। বেণু এই বয়সে বিধবা হয়েছে—এই ঘটনাটাই অশ্বিনীর মনে বেণুকে দুঃখের বৃত্তে ঘিরে রেখেছিল। আর অশ্বিনীর সামনে বেণু যেন ইচ্ছে করে সেই দুঃখের বৃত্তটাই খানখান করে ভেঙে দেয়। কিন্তু পেছন থেকে, বিশেষত পথে, বেণুকে এখনো অশ্বিনীর সেই দুঃখের বৃত্তে আটকা মনে হয়। পেছন থেকে বেণুকে এখনো দুঃখী মনে হয় বলেই হোক আর বেণুকে তার মনের ভেতরে দুঃখের সঙ্গে এক করে রাখতে চায়

বলেই হোক, অশ্বিনী ভেবে নেয় বেণুর মনের ভেতরে অনেক দুঃখ বলেই বাইরে যেন দুঃখহীনতা।

তিন

সিনেমাহলের দরজায় অশ্বিনী ওদের দুজনকে এগিয়ে যেতে দিয়ে টিকিট দেখিয়ে ভেতরে ঢোকে। সিটটা দেখে নেয়ার পর ঢুকবার সময় বেণু তৃতীয় সিটটায় আগে বসে পড়ে আর প্রথম সিটটায় অশ্বিনীকেই বসতে হয়, তা কি অশ্বিনী একটু পেছিয়ে পড়েছিল বলে, না কি সিটটা বেছে নেয়ার প্রথম ভার বেণুর ওপর পড়েছিল বলে। বেণুর পাশে একজন ভদ্রলোক এসে বসার পর অশ্বিনী বেণুকে নিজের কোণার সিটটা দিয়ে তৃতীয় আসনটাতে গিয়ে বসে।

বিরতির সময় টগর উঠে হলের নানা জায়গায় বাঙালিদের নানা-জনের সঙ্গে কথা বলে বলে ঘোরে। অশ্বিনী একটা পটেটো চিপসের প্যাকেট এনে বেণুর হাতে দেয়। বেণু একটু হেসে নেয়। বেণুর মুখে হাসি ছাড়া কোনো কথা চট করে জোগায় না। অশ্বিনী পকেট থেকে আর একটা প্যাকেট বের করে ধরে। বেণু বলে, "যার জিনিস তাকেই দেবেন।" পরে, সিনেমা শুরু হওয়ার পরও অশ্বিনী চিপসের প্যাকেটের কোনো আওয়াজ বেণুর কাছ থেকে পায় না। বেণু বাইরের কোনো জিনিস খেতে চায় না—অশ্বিনী বুঝে ফেলে।

বৈধব্য আর অপরিচয় মিলে বেণু-সম্পর্কে অশ্বিনীর মনে কতক-গুলি ধারণা তৈরি হয়েই ছিল। নানা অভিজ্ঞতায় আর দেখা-শোনায় সেই ধারণাগুলি ভাঙছে। অশ্বিনীর মনে বেণুর সম্পর্কটা তৈরি হচ্ছে নানা ধারণা ভেঙে ভেঙে। সেই ভাঙা ধারণার ছড়ানো টুকরোগুলি মিলে তাদের সম্পর্কের নানারকম নক্‌শা তৈরি করতে পারে—যদি নতুন ধারণা তৈরি না হয়।

প্রায় কর্মহীন অবস্থায় অশ্বিনীকে সেদিন রাতটা তো বটেই, তার পরের সারাটা দিনই কাটাতে হয়। লুসু স্কুলে যাওয়ার জন্য আর

গোবিন্দবাবু অফিসে যাওয়ার জন্য সকাল আটটা থেকেই তৈরি হতে থাকে। অশ্বিনী ঠিক এই ধরনের ব্যস্ততার সঙ্গে পরিচিত নয়। তার এই চাকরিতে সময়ের কোনো ঠিকঠিকানাই নেই। এর আগের চাকরিতে বাড়ির লোকজনকে, নিশ্চয়ই তার অফিসের ভাত দেবার জন্য খানিকটা ব্যস্ত হতেই হতো, কিন্তু অশ্বিনী অফিস যাওয়ার প্রস্তুতির সময়টিকে এত সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছিল যে সেই ব্যস্ততাটুকু সে লক্ষ্য করতে পারে নি। নিজে একটা কাজের লোক হয়েও অশ্বিনী যে বসে বসে এই ব্যস্ততা দেখে আর তারপর লুস্থুকে পৌঁছে দেয়ার জন্য বেণুকে সঙ্গ দেয়, তারপর শুয়ে বসে বার কয়েক চা খেয়ে ফেলে—সেটাই যেন তাকে অভিজ্ঞতার, পারিবারিক অভিজ্ঞতার, একটা নতুন জগতে নিয়ে যেতে পারে। সেই নতুন জগতে লুস্থু-বেবিকে ঘেরা বেণুর নিজস্বতা, নিয়ম-কানুন বা ধ্যানধারণা যতটা সক্রিয়, ঠিক ততটাই সক্রিয় গোবিন্দবাবুর সারাদিনের চাকরি-নিয়ন্ত্রিত রুটিন।

চিঠিতে জ্যাঠামশাই বদলে যাচ্ছেন। গোলাপ বদলে যাচ্ছে। চাকরির জায়গাতে নানারকমের অভিজ্ঞতাও অশ্বিনীকে ঘা মারছে। এত পরিবর্তনের বা নতুনতর অভিজ্ঞতার আঘাতে আঘাতে কি অশ্বিনীর চরিত্রের ভিতটাই বদলে যেতে পারে। পাছে সংসারে ঢুকিয়ে দেয় এই ভয়ে যে স্বামী ও পিতা হওয়ার পরও সংসারের কেন্দ্র থেকে বাইরে থেকেছে, এতগুলো অভিজ্ঞতার কেন্দ্র হয়ে ওঠা কি তার পক্ষে স্বাভাবিক?

চার

প্রায় সন্ধ্যায় তৈরি হয়ে অশ্বিনী জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল। ভেতর থেকে বেরিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে টগর বলে—"চলো।" টগর বেরিয়ে গেলে বেণু দরজা বন্ধ করতে ঘরে ঢোকে। চৌকাঠ পেরিয়ে অশ্বিনী বলে, "টা টা"—

বেণু মুখটা একটু বাড়িয়ে বলে, "আর টা টা করতে হবে না,

টো-টো করুন গে" পেছনে দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো, আর টগর অশ্বিনী সিঁড়ি দিয়ে নামে। টগরের পরনে খুব ঘন সবুজ সিল্ক, বাঁ-কাঁধ থেকে আঁচল গড়িয়ে কনুইয়ে, ডান কাঁধ কর্ডিগানে ঢাকা। কর্ডিগানটা পাতলা, ছোট—মাত্র কোমর পর্যন্ত, কলার নেই। টগরের ঘাড়ে পাউডারের স্নিগ্ধ প্রলেপের ওপর উড়ো চুল। জুলপির কাছ থেকে কিছু উড়ো চুল পেছনে আসছে—টগর বাঁ হাত দিয়ে সেই চুলগুলোকে কানের পেছনে ঠেলে দেয়। টগর যখন বেরয় তখন সত্যি বোঝার উপায় নেই তার দু-দুটি মেয়ে।

টগর দু-ধাপ আগে আগে নামছিল। অশ্বিনী দু-ধাপ পেছনে-পেছনে। মিঃ প্রধান অশ্বিনীকে মিঃ ভট্টাচার্য মারফত একটা সামাজিক নেমন্তন্ন করেছেন। টগর এখানে দার্জিলিঙের সমাজের সবার সঙ্গে অশ্বিনীকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং টগর ছাড়া তো আর মিঃ প্রধানের কাছে যাওয়া যায় না, মিঃ ভট্টাচার্যকে ছাড়াও নয়। টগর আর অশ্বিনী প্রথম মিঃ ভট্টাচার্যের কাছে যাবে। তারপর সেখান থেকে মিঃ প্রধান।

সিঁড়ির শেষ ধাপটা ঘুরতেই দেখা যায় এক ভদ্রমহিলা উঠে আসছেন। তাকে দেখেই টগর ছুটে নিচে নেমে যায়—"লক্ষ্মীদি, আপনি?"

"আমি তো সিন্‌হার ওখানে। আজ আবার ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান একজিবিশনের মিটিং"—

"ও তাই বুঝি, ঈস, আপনি আমাদের দরজার সামনে দিয়ে রোজ যান আর আমার ওখানে একদিন যেতে পারেন না?"—টগর লক্ষ্মীদির ব্যাগশুদ্ধ হাতটা ধরে।

"এই তো যেতাম, তা তুমি তো বেরচ্ছ!"—লক্ষ্মীদি অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। অশ্বিনীকেও হাসতে হয়।

"ঈস, তাই বুঝি, অচ্ছা চলুন, আমি ফিরছি"—

লক্ষ্মীদি আরো খানিকটা হেসে বলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আজ

থাক, আর একদিন, তোমার ওখানেই আসব।” টগরের গালে আলতো করে দুটো আঙুল ছুঁইয়ে লক্ষ্মীদি ওপরের সিঁড়িতে পা দিয়ে অশ্বিনীকে যখন বলেন “যাও, ঘুরে এসো দুজনে, যাব একদিন তোমাদের ওখানে”—তখন টগর আর অশ্বিনী সত্যি সত্যি একেবারে যেন ছেলেমানুষ হয়ে যায়।

বাইরের রাস্তায় পড়েই টগর যেন স্বগতোক্তি করে—“বেশি বেশি”, অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে—“কে?”

“দাঁড়াও একটু শর্টকাটে যাই”—বলে টগর ডানদিকে দু-বাড়ির ফাঁকে ঢুকে পড়ে। ফাঁকটা নিতান্তই অপরিসর—দুজন পাশাপাশি হাঁটা যায় না, অশ্বিনীই পেছনে পেছনে হাঁটে। কিন্তু আধো-অন্ধকার অপরিসর এই গলিটার শেষে ঝকমকে নীল আকাশ দেখা যায়, যেন এই গলিটা গিয়ে শেষ হয়েছে একেবারে সমুদ্রে। টগর বলে, “লক্ষ্মী দি, চিনতে পারলে না?”

“আমি কি করে চিনব—”

“সেই দুর্গাপূজার মিটিঙে ওঁর বাড়িতে গেলে না?”

“ও, সেই মহিলা, সেদিন যেন একটু কম বয়েসি মনে হয়েছিল!”

“উনি বহুরূপী। কখনো কমবয়েসি, কখনো বেশি বয়েসি। এক লক্ষ্মীদির জোরে মিঃ সান্যাল করে-কম্মে খাচ্ছেন। আর এই কয়েকজনমাত্র দার্জিলিঙের তাবৎ সোশ্যাল অর্গানিজেশন হাত করে রেখেছে। এই যে শুনলে না, কি একজিবিশন হবে, আমরা যেন কেউ কিস্সু না। মিটিংটার খবর পর্যন্ত দেয় না। ঐ লক্ষ্মীদি, মিসেস সিন্হা, মিস্ থাপা, কিরণদি আর মিসেস মজুমদার—এমন করে রেখেছে না!”

“কী করে রেখেছে?” গলিটার শেষে একটা লম্বা সিঁড়ি দিয়ে ওরা নামতে শুরু করে।

“সব কিছু। যেন দার্জিলিঙটা ওদের প্রাইভেট সম্পত্তি। আর আমাদের গবমেণ্টও তেমনি। শুনেছি স্বাধীনতার আগেও নাকি

লাটসাহেবের দরবারের লোক ছিলেন এঁরাই, এক কিরণদি আর মিসেস মজুমদার বাদে, ওঁরা তো সেদিন এসেছেন, দার্জিলিঙে। আর স্বাধীনতার পরও এঁরাই। দেখবে তুমি একদিন ভীষণ গোলমাল লাগবে!"

"গোলমাল টোলমাল আবার কি নিয়ে—"

"গোলমাল হবে না কেন। আমরা না-হয় চুপ করে যেতে পারি, সবাই তো আর তা নয়। দুর্গাপূজা কমিটি থেকে শুরু করে সব একেবারে ঐ কয়েকজনের হাতে যদি থাকে, সবাই সহ্য করবে কেন। নতুন-নতুন কত অফিস এসেছে, তার অফিসাররা আছেন, কলেজের প্রফেসররা আছেন। আর এদের ভাব দেখলে মনে হয় দেশটা স্বাধীনই হয় নি। ঐ শুনলে না, কী একজিবিশন হবে— আমি জানিই না।"

"ভদ্রমহিলা তো আপনার সঙ্গে বেশ মিষ্টি করেই কথা বললেন—"

"আরে এমনি কথা শুনলে মনে হবে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। আসলে মহাটঁ্যাটন।"

জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে টগর থামে। খানিকটা যেন হাঁফিয়ে গেছে। "ভট্‌চাযের বাড়ি যা নিচে। সেখান থেকে আবার মিঃ প্রধানের বাড়িতে উঠতে পেটের ভাত হজম হয়ে যাবে।"

এই ওঠানামাই শুধু নয়, এক-একটা বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছনোর জন্য নানারকম ভাবে ঘোরা-ফেরা, উঁচু থেকে নিজের গন্তব্য দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও,—সেই গন্তব্যে পৌঁছতে নানারকম ওঠানামা চক্রাকারে ঘোরা—এগুলোর সঙ্গে অশ্বিনী এখনো ধাতস্থ হয় নি। মনের ভেতর নানা ইচ্ছা, স্বপ্ন-বাসনা চিন্তা-ভাবনা নিয়ে যে-ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে হাঁটতে চলতে-ফিরতে হয় সেটার নানা তল মনের ভেতরকার ব্যবস্থাগুলো বিপর্যস্ত করে ফেলে।

পাঁচ

মিঃ ভট্‌চাযের দরজায় বেল টিপতে আধবুড়ো একজন কাঞ্ছা এসে দরজা খুলে দেয়। টগর তাকে নেপালি ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করে ভট্‌চায আছে কি না। সে ভট্‌চাযকে ডাকতে যায় আর অশ্বিনীকে নিয়ে টগর গিয়ে বসে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে কাঞ্ছা আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে যায়।

ভট্‌চাযের ঘরটা ছোট। পুরনো ধাঁচের একটা বড় সোফা আর দুটো কৌচ ঘরের মাঝখানে—একটা ডিমের মতো টেবিলকে ঘিরে। বড় সোফাটার বাঁ দিকে একটা ছোট টেবিলের ওপর পাঁজা করা কাগজপত্র। যে-দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া যায় তার সঙ্গে সমকোণে ঘরটা রাস্তার দিকেই খানিকটা বেড়ে গেছে। বড় সোফাটার পেছনের ঐ বাড়তি জায়গাটুকু দিয়ে এগিয়ে গেলে বাইরে যাবার দরজার বিপরীত দিকে দোতলায় যাবার সিঁড়ি। ফলে বাইরে সিঁড়ির ওপর দাঁড়ালে নিজেকে উল্টনো ইংরেজি এল্‌ অক্ষরের কোণটায় দেখতে হয়। ঘরের পুব-পশ্চিম দুদিকের সব জানলাই কাঁচের। তাতে ভারি পর্দা ঝুলছে। পর্দাগুলো দামি ও প্রায় নূতনই।

সিঁড়ির বাঁকটা ঘুরেই ভট্‌চায দাঁড়িয়ে পড়ে। দু-হাত তুলে "কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য, আওয়ার নিউফাউণ্ড ল্যাণ্ড"—এই পর্যন্ত বলে ভট্‌চায যে-ভাবে তার পাজামার ওপর ড্রেসিং গাউনটা ঘিরে নেমে আসে, আর একটা সুইচ টিপে ঘরটাকে উজ্জ্বলতর করে তোলে আর শেষে কৌচটার ওপর বসে পড়ে টগরের দিকে তাকিয়ে বলে "উইথ আওয়ার ওন্ গোল্‌ডেন এন্‌জেল্"—তাতে অশ্বিনীর মনে হয় সে যেন কোনো নাটকের স্টেজে। অশ্বিনীর এটুকু দেখতে ভুল হয় না যে-কৌচটিতে ভট্‌চায বসেছে সেটা একটু বাঁ দিকে কোণ করা—অর্থাৎ ভট্‌চায ওটাতেই নিয়মিত বসে।

অশ্বিনী বলে, "এলাম আপনাদের নিমন্ত্রণ রাখতে।"

ভট্‌চায বলে ওঠে, "সো গুড্‌ অভ ইউ, খুব ভালো করেছেন, কবে এসেছেন—"

"কাল।"

ভট্‌চায একটু অবাক হয়ে বলে, "দেন ইউ আর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স লেট!" টগর বলে, "কী ব্যাপার, আমার তো জানাই ছিল না আপনাদের সঙ্গে অশ্বিনীর এত চেনাজানা হয়ে গেছে।"

"চেনাজানা? ওঃ হোয়াড্‌ ডু ইউ সে টগরদি। হি সেভ্‌ড্‌ দি হোল লট অভ বাগার্স, বাই সিঙ্গ্‌ল স্ট্রোক অভ হিজ জিনিয়াস। আর এখানে কি আর দেখছেন। চলুন না মিঃ প্রধানের ওখানে, ইনস্পেক্টরকে মাথায় নিয়ে সবাই নাচবে। যাবেন তো?"

"আমার আর আপত্তি কি। যেখানে নিয়ে যাবেন, যাব", অশ্বিনী বলে। বাগানের বাইরে 'ইন্‌স্পেক্টর' ডাকটা এখনো তার কানে লাগে। মিঃ ভট্‌চায চেঁচিয়ে ওঠেন—"কাঞ্ছা।" কাঞ্ছা যে-সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটা না দেখেও বুঝতে পেরে ভট্‌চায নেপালি ভাষাতেই কিছু আদেশ করে।

"আমার এই ডেন খুঁজে বের করলেন কি করে?" ভট্‌চায দুজনার মুখের দিকেই একবার করে তাকায়।

"ঠিকানাটা তো জানাই ছিল, খুঁজতে হয় নাকি আবার?" টগর বলে।

"তা অবিশ্যি ঠিক। ইউ হ্যাভ গট অ্যান এনভিয়েব্‌ল গাইড"—ভট্‌চায অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে চোখ মটকায়। কাঞ্ছা এসে একটা চুরুট, একপ্যাকেট সিগারেট আর একটা শালাই দিয়ে যায়। ভট্‌চায সিগারেট প্যাকেটটা খুলে অশ্বিনীর দিকে বাড়িয়ে ধরে। অশ্বিনী একটা তুলে নিলে, চুরুটটা মুখে দিয়ে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আগে অশ্বিনীরটা ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরাতে যায়। ধরে না। ফলে বাকিটা ইতিমধ্যেই ভর্তি অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে আবার

কাঠি জ্বালায় ভট্‌চায। একটু একটু ধোঁয়া ছেড়ে, জোরে জোরে টেনে চুরুটটা ধরাতে ধরাতে ভট্‌চায বলে, "বুঝলেন টগরদি, আপনাকে আমরা একটা পার্টি দেব, ফর ইনট্রডিউসিং সাচ এ ফ্রেণ্ড টু আস।"

টগর যে-ছবির কাগজটা দেখছিল সেটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলে, "হ্যাঁ, আমাদের বেলায় তো শুকনো ধন্যবাদ আর আসল বেলায় তো ঐ মিসেস সিন্‌হা আর লক্ষ্মীদি। তখন তো আমরা খবরও পাই না।"

মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে ভট্‌চায বলে, "এনি ট্রাব্‌ল ?" ভুরু নাচিয়ে সে অশ্বিনীকেও প্রশ্ন করে।

টগর বলে, "এই তো আপনার এখানে আসার সময় সিঁড়ির গোড়ায় লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা। আমাকে শুনিয়ে গেলেন ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান একজিবিশনের মিটিং আছে। সেখানে যাবার জন্য মিসেস্‌ সিন্‌হার কাছে যাচ্ছেন। অথচ আমরা মিটিং-এর খবরটাও জানি না।"

"ওঃ ইয়োর পার্টি অ্যাফেয়ার অ্যাণ্ড ফিমেল অ্যাফেয়ার—আমি কিছু বুঝিই না।

"ঐ তো, যখনই কিছু বলি তখনই আপনারা বলেন আপনারা জানেন না, পাছে কিছু করতে হয়। তবে কে জানে বলতে পারেন ?"

"আরে, টগরদি তো বেশ রেগে আছেন। তাহলে তো কিছু করতেই হয়, কী ব্যাপার বলুন তো !"

"না—ব্যাপার তো আপনারা কিছু জানেন না ! দার্জিলিঙের সব ব্যাপার তো মিসেস সিন্‌হা, লক্ষ্মীদি, মিস থাপা, কিরণদি আর মিসেস মজুমদার—এই পঞ্চসতীর একচেটিয়া"—

হো হো করে হেসে উঠে ভট্‌চায বলে, "পঞ্চসতী কি না জানি না, আমি ব্যাচিলর মানুষ, আমাকে আর ও-সবের ভেতর টানবেন না। তবে মনোপলির ব্যাপার যদি বলেন তাহলে আমি আপনার সঙ্গে সেণ্ট পারসেণ্ট একমত" আর একবার সংক্ষিপ্ত হেসে ভট্‌চায

অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করে, "তারপর ইনস্পেক্টর আপনার প্যারাডাই-জের খবর কি ?"

অশ্বিনী একটা সচিত্র পত্রিকা নিয়ে এলোমেলো পাতা উল্টাচ্ছিল। সেদিক থেকে চোখ না-সরিয়েই বলে, "ঐ মুখেই বলে প্যারাডাইজ। চলুন না গিয়ে থাকুন ওখানে দুদিন, একেবারে পাগল হয়ে যাবেন"—

"ওখানে থাকতে যাব কেন। আপনিই বা থাকতে যাবেন কেন। সারাদিন কাজকম্ম করবেন, তারপর এই তো ডিসট্যান্স—গাড়ি করে চলে আসবেন"—

"গাড়িটাই যে নেই, এই যা মুশকিল"—

"আজ মুশকিল, কাল আসান হতে পারে"—কাঞ্চা চায়ের জিনিসপত্র এনে টেবিলে রাখে, "নিন টগরদি, এই হতভাগ্য ব্যাচিলরের বাড়িতে একটু হস্টেস হন।" টগর চায়ের জিনিস-পত্রের দিকে হাত বাড়ালে ভট্‌চায আবার অশ্বিনীকে বলে, "অবিশ্যি আপনি যদি বলেন তাহলে রোজ সন্ধ্যাবেলায় আপনাকে প্লেনভিউ থেকে দার্জিলিঙে নিয়ে আসার জন্য আমি আমার ভাঙা গাড়ি নিয়ে ছুটতে রাজি আছি। অন্তত সঙ্গসুখটা তো মিলবে। হা-হা-হা—"

অশ্বিনী পত্রিকাটি নামিয়ে রাখে। টগর চায়ের পাতিটা চামচ দিয়ে নেড়ে ভট্‌চাযকে জিজ্ঞাসা করে, "কড়া না পাতলা ?"

"আই লাইক ইট এ বিট বিটার কিন্তু আপনার হাতে সবই চলবে"—

চিনি দেবার আগে টগর আবার জিজ্ঞাসা করে নেয়—ক'চামচ। দুধ একটুখানি দিয়ে দেখিয়ে নেয়—হবে কি না।

চায়ে অশ্বিনী চুমুক দিয়ে বলে, "তবে, আপনাদের দার্জিলিঙে বসে দার্জিলিঙের চা খাওয়ায় কোনো আরাম নেই। ভিজতে ভিজতে চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়"—

"এটা যা বলেছেন মিঃ সরকার। সত্যি তাই। নানারকম কায়দাকিসিম করে হয়তো কিছুক্ষণ গরম রাখা যায় কিন্তু ঐ যে গরম চা তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া, ওটি হবার কোনো উপায় নেই।" চা শেষ করে ভট্চায একটা সিগারেট অশ্বিনীর দিকে আবার বাড়িয়ে দেয়। নিজে চুরুটটা নিয়ে টানতে টানতে বলে, "তাহলে আপনারা প্লিজ দুমিনিট অপেক্ষা করুন অশ্বিনীবাবু, টগরদি, আমি একটু চেঞ্জ করে আসছি।"

টগর ও অশ্বিনী—"ঠিক আছে, ঠিক আছে" বলার পর ভট্চায সিগারেটের প্যাকেট, দিয়াশালাই ইত্যাদি নিয়ে তার সেই ছোট সিঁড়িটা প্রায় ভরে দোতলার দিকে বেঁকে গেল।

অশ্বিনী টগরের দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসে। জবাবে টগরও। এ-হাসিটা যে কেন হেসে ফেলে অশ্বিনী তা নিজেই জানে না। টগরের হাসিটা দেখে সে বোঝে টগরের হাসিটা তার বাড়িতে এতো স্ফূর্ত হতো না। চুলের বা বেশের পারিপাট্যে অথবা আচার-আচরণের সামাজিকতায় অথবা পরিবারে প্রচলিত নয় এমন ভঙ্গিতে বাড়ি থেকে বেরনোমাত্রই টগর আলাদা হয়ে যায়।

যেমন বেণু বেরনো মাত্রই তার গার্হস্থ্য দুঃখ তার সারা অবয়বে নেমে আসে—বাড়ির ভেতরে যে-দুঃখের হদিস বেণুর চলনে-বলনে পাওয়া যায় না। অথবা টগরের শরীরে ঋজুতা আর পৃথুলতার গার্হস্থ্য সৌন্দর্যের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রুক্ষ চুল, একটি শাণিত ঘাড়, সামান্য উন্মোচিত বাহু, অতি সূক্ষ্ম দুটি চোখ যেন অনিকেত সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। অশ্বিনী ছাড়া আর কেউ তো টগরের দুই চেহারার তুলনা করে টগরকে আবিষ্কারের সুযোগ পায় না।

কোট-প্যান্ট পরে, ওপরে একটা কম্ফোর্টার জড়িয়ে ভট্চায নেমে আসে।

"চলুন, যাওয়া যাক"—

ছয়

মিঃ প্রধানের বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে যাবার উপায় নেই। মিঃ প্রধানের বাড়ির ঠিক সরাসরি নিচে ভট্‌চায গাড়িটা দাঁড় করায়। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে খুঁজতে ভট্‌চায একটু সময় নেয়। তার-পর "চলুন" বলে ওদের পথ দেখায়। ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই মিঃ প্রধান অশ্বিনীকে দেখেই হৈ হৈ করে ওঠেন—"আরে আসুন, আসুন, আপনি আসবেন আগে জানান নি কেন, আমি প্রায়ই মিঃ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করি। আসুন টগরদি।" মিঃ প্রধান কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। টগরকে বলেন, "আপনারা ভেতরে যান না," কিন্তু ভট্‌চাযকে দেখতে না পেয়ে নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আসুন।" ভট্চায আগেই ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। সে একটা ছোকরা চাকরকে নিয়ে বেরিয়ে এলে মিঃ প্রধান জিজ্ঞাসা করেন—"কি ব্যাপার?" "না, ঐ গাড়ির একটা পাহারার ব্যবস্থা করে আসি।"

"ও তো বুড়িকে বলে এলেই হতো"—

"বুড়িকে দেখলাম না।"

"ঠিক আছে, আপিন আসুন, ও-ব্যবস্থা করে আসবে"—মিঃ প্রধান সবাইকে নিয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়ান। মিঃ প্রধান পর্দা তুলে ধরেন। প্রথমে ভট্চায ঢুকে পাশ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর টগর। সবশেষে অশ্বিনী। অশ্বিনীর পিঠে হাত দিয়ে মিঃ প্রধান মিসেস প্রধানের দিকে এগিয়ে যান। তারপর তাঁর মৃদুগলায় কী ভূমিকা করলেন সেটা অশ্বিনী বুঝতে পারে না। মিঃ প্রধান আবার বাইরের ঘরের দিকে চলে যান। মিসেস প্রধান একহাতে টগরের আর একহাতে অশ্বিনীর হাত ধরে তাঁদের সোফাতে নিয়ে গিয়ে বসান। মিঃ ভট্চাযকে ডেকে বলেন, "আসুন, মিঃ ভট্‌চায"—

অশ্বিনী সেদিন বাগানে মিঃ প্রধানকে দেখে নি। সেই দুর্গাপূজার

মিটিং ছাড়া তার সঙ্গে মিঃ প্রধানের কোথাও দেখা হয় নি। সে বুঝতে পারে না-ভট্চাযের সঙ্গে সে ঢুকেছে বলেই তাকে মিঃ প্রধান চিনতে পারলেন, নাকি সেই দুর্গাপূজার মিটিংয়েই তিনি চিনে রেখেছেন। অশ্বিনী আরো বুঝতে পারে না তাকে যতটা সংবর্ধনা করলেন ততটা সবার ক্ষেত্রে করা মিঃ প্রধানের মতো ব্যস্ত লোকের পক্ষে আদৌ সম্ভব কিনা।

ঘরটা লম্বা মতো। বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকেই যে-টেবিল সেটা ঘিরে কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিল। তাদে চেহারা দেখা যাচ্ছে না, শুধু রঙিন পা-গুলি নানাভাবে নানাদিকে ছড়ানো। মিসেস প্রধান এদের যে-সোফার কাছে নিয়ে গেলেন সেখানে আরো একজন মহিলা বসে ছিলেন। তাঁকে দেখে নমস্কার করে ভট্চায জিজ্ঞাসা করে, "ডাঃ সাহা কোথায় ?"

"উনি একটু হাসপাতালে গেছেন, ওখান থেকে এখানে আসবেন"—

"এঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে তো ?"

ঝক্ঝকে দাঁতে মহিলা হেসে উঠলেন।

ভট্চায পরিচয় করিয়ে দিতে বলে, "ইনি টগরদি। আর ইনি টগরদির ভগ্নীপতি। এখানকার ইয়োরোপিয়ান গার্ডেনসে এক্সাইজের চার্জ নিয়ে রিসেন্টলি এসেছেন, মিঃ এ. কে. সরকার"—

"ও তাই বুঝি ?" ভদ্রমহিলা নমস্কার করেন। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। মিসেস প্রধান আবার বললেন, "আপনারা বসুন।" মহিলার পাশের সোফাতে প্রথমে অশ্বিনী, পাশে টগর, তার পাশে ভট্চায বসে।

ভদ্রমহিলার মুখখানার ভেতর চশমার মোটা অথচ ছোট ফ্রেমটা এত বেশি প্রাধান্য পেয়েছে যে তার মুখের গড়নটা কিছুতেই বোঝা যায় না। তিনি কথা বলার জন্য ঘাড় ঘোরালে অশ্বিনীও তার দিকে

সম্পূর্ণ না তাকিয়েও ঘাড়টা ঘোরায়। যখন বোঝে কথাটা টগরকে বলা তখন অশ্বিনী টগরের দিকে তাকায় ও হাসে।

"আপনারা কি দার্জিলিঙেরই বাসিন্দে?"

"চাকরির সূত্রে। এখন প্রায় বাসিন্দেই—"

ভট্‌চায বলে, "চাকরির সূত্রে দার্জিলিং আসা এক জিনিস আর থেকে যাওয়া আর এক জিনিস।" মিসেস প্রধান একটা চেয়ার নিয়ে এসে ওঁদের কাছে বসে আলাপে যোগ দেন—"সেটা ঠিকই। আগে তো দার্জিলিঙের দুদল লোক ছিল, এক বাসিন্দে, আর-এক সিজনার। এখন তো নতুন অনেক অফিস-টফিস হয়েছে। চাকরি করতে অনেকেই আসেন। বাসিন্দে আর কজন হন।" মিসেস প্রধান অশ্বিনীর দিকে ফিরে বলেন, "আপনার কেমন লাগছে।"

"আমি তো নতুন এসেছি, সব এখনো দেখে উঠতেই পারি নি। আমার তো ভালোই লাগছে।"

ভট্‌চায এগিয়ে এসে বলে, "আমি বলে দিচ্ছি, দেখবেন, মিঃ সরকার উড প্রুভ হিমসেল্‌ফ্‌ টু বি এ পারফেক্ট দার্জিলিং ম্যান।"

"আপনি কি হাত গুনতে জানেন নাকি?" টগর জিজ্ঞাসা করে।

"সে তো ওখানে হচ্ছে"—ভদ্রমহিলা টেবিল-ঘেরা ভিড়টাকে দেখান।

"ওখানে কি? সুনীলবাবু নাকি? সুনীলবাবু"—ভট্‌চায টেবিলের দিকে মুখ করে ডাকতেই ভিড়টা একটু ফাঁক হয়ে যায়। সেই ফাঁক দিয়ে ভদ্রলোক বলেন, "বসুন অমরবাবু"—

"এই যে স্যার, এখানে অনেক ক্লায়েন্ট বসে আছে"—ভট্‌চাযের কথা শুনে সুনীলবাবু উঠে পড়তেই টেবিল ঘিরে যারা ছিল তারা হৈ হৈ করে উঠল—আমারটা হলো না, আমারটা হলো না।" টেবিলভরা ফুল যেন চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, অশ্বিনী রঙীন পোশাকে ঝলমল ছেলেমেয়েদের দেখে।

"হবে, হবে," বলতে বলতে সুনীলবাবু এদের দিকে এগিয়ে

আসেন, ছেলেমেয়েদের দলটা ভেতরের দিকে চলে যায়, "ক্লায়েন্ট একটু কমলে তো বাঁচতাম মশাই, এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে চাকরি ছাড়তে হবে দেখছি"—সুনীলবাবু সামনের চেয়ারটায় গিয়ে বসেন। তারপর মহিলার দিকে তাকিয়ে বলেন, "কী কমেছে?" মহিলা প্রথমে খানিকটা থতমত খেয়ে যান, তারপর বলে উঠেন—"কমেছে মানে একেবারে সেরে গেছে, আমি একেবারে ভুলেই গেছি।"

"ভুলে যান তাও ভালো, দয়া করে গল্প করবেন না। তাহলে আর আমাকে থাকতে হবে না—"

ভট্‌চায মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কী ব্যাপার?"

মহিলা সোজা হয়ে বসে বলা শুরু করেন, "আর বলবেন না, আমার রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাথা ধরতো আর সেই স্নান পর্যন্ত থাকত। এত ওষুধ উনি দিয়েছেন, কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে একদিন সুনীলবাবুকে বললাম। উনি একটা ওষুধ বাতলে দিলেন, সাতদিনের ভেতর আমার প্রায় দশবছরের মাথাধরা একেবারে সেরে গেল।"

টগর জিজ্ঞাসা করে বসে—"কি, কি ওষুধ।"

মহিলা সুনীলবাবুকে দেখিয়ে বলেন, "ওঁর বারণ আছে, বলা যাবে না"—

সুনীলবাবু বলেন, "আমার কাছে যাঁরা আসেন তাঁদের আমি একেবারে সোজাসুজি বলে দি, আপনাদের সব গোপন কথা যেমন আপনারা আমাকে বলেন, আমার কথাও আপনাদের গোপন রাখতে হবে। কেন জানেন? ধরুন, মাথা ধরার কথাই। কারো পেটের জন্য মাথা ধরতে পারে, কারো শ্লেষ্মার জন্য, কারো পিত্তের জন্য। আমি একজনের অসুখ বুঝে তাকে একটা ওষুধ বাতলালাম। সে যদি তারপর মাথা ধরা দেখলেই ঐ ওষুধ দেয়া শুরু করে তাহলে তো অসুখও সারবে না, ওষুধেরও বদনাম রটবে"—

ভট্‌চায বলে, "আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি সুনীলবাবু, ইনি মিঃ এ. কে. সরকার সেন্‌ট্রাল গবমেণ্টের এক্সাইজের চার্জ নিয়ে এসেছেন, এখানকার ইয়োরোপিয়ান গার্ডেনসে, আর ইনি টগরদি"—

"টগরদিকে চিনি—"

"আর ইনি সুনীলবাবু। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু আসলে ক্লাস ওয়ান পামিস্ট এ্যাণ্ড অ্যাস্ট্রলজার"

"ও-সব বাজে কথা। আসলে আমি এ্যান অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাজ গৃহীতান্ত্রিক। আপনার ঐ পামিস্ট আর অ্যাস্ট্রলজার ইত্যাদি সব ফালতু, ওগুলো তো কোনো ব্যাপার নয়। তন্ত্রটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার।" টগর, ঐ ভদ্রমহিলা, ভট্‌চায সবাই-ই হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে এগিয়ে বসেছে। অশ্বিনী সোফার কোণায় যেমন হেলান দিয়ে ছিল তেমনি থেকে সুনীলবাবুর কথা শুনছে মনে হলেও আসলে সে ভাবছিল তাকে পরিচিত করে দিতে ভট্‌চায প্রথমবার বলেছিল, ইয়োরোপিয়ান গার্ডেনসে এক্সাইজের চার্জ, আর দ্বিতীয়বার সেনট্রাল গবমেণ্ট শব্দটা জোড়ার ফলে পরিচয়টা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। ভট্‌চাযের কাছে শোনা এই পরিচয়টুকু থেকে অশ্বিনী নিজেরই পরিচয় নেয় যেন। এখানে এসে অশ্বিনীকে একবারও ভট্‌চায 'ইনস্‌পেক্টর' বলে নি। তার বাড়িতে শেষের দিকে 'মিঃ সরকার' বলেছে। আসলে, নানা নামে তাকে ডেকে, নানা ভাষায় তার পরিচিতি দিয়ে ভট্‌চায কি যাচিয়ে দেখতে চায় কোনটা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হবে।

একটি লোক এসে প্রথমে ছোট টেবিল, তার ওপর চায়ের জিনিস-পত্র রেখে যায়। একটা বড় ডিসে নানারকম বিস্‌কুট কাজুবাদাম। মিসেস প্রধান চা ঢালার আয়োজন করেন। শুধু অশ্বিনী আর টগরকে জিজ্ঞাসা করেন—চিনি ক' চামচ লাগবে।

ভট্‌চায সুনীলবাবুকে বলে, "আপনি আপনার সব অভিজ্ঞতা লিখে ফেলুন না। সবাই তাহলে জানতে পাবে"—

"সবাইকে কি করে না-জানানো যায়, সেই বুদ্ধিটা দিন। এই এক হাত দেখা আর কোষ্ঠী দেখার জ্বালায় তো দার্জিলিং ছাড়তে হবে। আজকাল আবার অসুখ-বিসুখের ওষুধ চাইতেও লোক আসতে শুরু করেছে। এবার পালাতে হবে।"

অশ্বিনীকে চা দিতে দিতে মিসেস প্রধান বল্লেন, "এখন থেকে আপনার নেমন্তন্ন থেকে গেল। যখনই দার্জিলিঙে আসবেন, তখনই আমাদের এখানে আসবেন—"

টগরকে চা দিয়ে বললেন—"আপনি নিয়ে আসবেন।"

অশ্বিনী দেখে নেয় এই ঘরটার এক দিকে, দক্ষিণ দেয়ালে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, আপাতত তার সামনে একটি চেয়ার। উত্তর দেয়ালে একটা ছোট টেবিলে টাই-কোট পরা মিঃ প্রধানের তৈলচিত্রের মতো বিরাট ছবি। তার সামনে ফুলদানিতে বড় বড় ফুল আর পোড়া ধূপকাঠি। অপরিচিত কেউ ভাবতে পারে মিঃ প্রধান আর জীবিত নেই। মিঃ প্রধান যদি সেক্রেটারিয়েট টেবিল-টার চেয়ারে এসে বসেন তাহলে তিনি সরাসরি নিজের ছবির মুখোমুখি হবেন। ঘরের মাঝখানে ঝাড়লণ্ঠনের আকারের ইলেকট্রিক বাল্ব, লম্বা দেয়াল দুটিতে সামনাসামনি চারফুটি দুটো টিউব বাতি। সারাটা মেঝেতে খানিকটা বিবর্ণ একটা সতরঞ্চির মতো পাতা। অশ্বিনীরা যেদিকের দেয়ালে বসে তার দরজার মাথায় একটা বিরাট তিব্বতী মুখোশ।

সুনীলবাবু কথা বলছিলেন, অশ্বিনী চেষ্টা করেও সে-কথাতে মন দিতে পারে না। তার দৃষ্টি বারবার আটকে যায়,—পাশের ভদ্রমহিলা সোফাতে বাহুটা ছড়িয়ে রেখে বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমা ধবধবে শাদা সিঁথিতে ঘষেই চলেছেন। তাঁর হাতের শিরা-গুলির ফুলে ওঠায় অশ্বিনী টের পায় তিনি বেশ জোর দিয়েই ঘষছেন। সুনীলবাবুকে হাত দেখাতে-দেখাতে ছেলেমেয়েদের যে-দলটা ভেতরে চলে গিয়েছিল তারই একজন বোধহয়, এ-ঘর দিয়ে

যাতায়াত করছিল। ঢোলা লম্বা জামার ওপর দিয়েও তার স্তন-জোড়া ফুটে ওঠে। মিসেস প্রধান কখনো ঘোমটা ফেলছেন না। এত সব দেখে ফেলার ভেতরও সুনীলবাবুর কথা একমন হয়ে শোনার অন্তরঙ্গ ভঙ্গিটি অশ্বিনীতে লেগেই থাকে। যেন এ-ঘরে প্রথম ঢোকার সময় সকলের চোখের বাইরে থেকে অশ্বিনী ঠিক করে নিয়েছে কোন্ ভঙ্গিটি নেয়া ঠিক হবে—কেতা আর চরিত্র দুদিক থেকেই ঠিক। অশ্বিনী হয়তো জানেও না কেতা আর চরিত্র দুদিক থেকেই ভঙ্গি আর তার মন সম্পূর্ণ দু-রকম ভাবে চলতে পারে বা চলাটাই তার পক্ষে স্বভাব। নইলে এতগুলো মানুষ চারপাশে ছড়ানো থাকলেও পরিবেশটার দিকেই অশ্বিনীর মন বারবার যায় কেন।

সুনীলবাবু বলছিলেন, "আমাদের মতো স্মৃতিহীন জাত দুনিয়াতে একটাও নেই। এই গাছ-গাছড়ার ব্যাপারটাই ধরুন না। আমরা ঠাট্টা-তামাসা করি। আর রাশিয়া এসে ভারত সরকারের কাছে দরবার করছে যাতে এখানে গাছ-গাছড়ার ব্যাপার নিয়ে রিসার্চ করতে পারে। ভারত সরকারও অনুমতি দেবে। তখন দেখবেন। আসল কথাটা কি জানেন। তন্ত্র বলেছে যে এই শরীরটা তো ম্যাটার। যেমন পাথর, বীজ, গাছ, তেমনি ম্যাটার। ম্যাটারের সঙ্গে ম্যাটারের কোরিলেশন হচ্ছে প্রকৃতির বা পৃথিবীর একমাত্র নিয়ম। তাহলে মানুষের এই শরীরের সঙ্গে এই পৃথিবীর অন্য ম্যাটারের কোরিলেশন নিশ্চয়ই আছে। ধরুন আমার শরীরে যদি জলের ভাগ বেশি থাকে তাহলে আমি যদি কিছু অতিরিক্ত তাপ আমার শরীরে সঞ্চার করতে পারি আমার জলাধিক্য বা রসাধিক্য বশত যে শারীরিক অসুবিধেগুলি হচ্ছে তা সেরে যেতে বাধ্য। শরীরটাকে শরীর হিসেবে দেখা এটাই হচ্ছে তন্ত্রের মূল কথা। এটা তো মেটেরিয়ালিজমেরও মূল কথা। তাহলে তন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক বিচারে অস্বীকার করার যুক্তি আছে কিছু?"

সাত

মিঃ প্রধান ঘরে ঢোকেন। অশ্বিনী তাকাতেই মৃদু হেসে সুনীল বাবুর পাশে গিয়ে বসেন। তারপর অশ্বিনীকে দেখিয়ে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করেন—

"অশ্বিনীবাবুর হাত দেখেছেন—"

"না, না হাত দেখব না বলেই তো এত বক্তৃতা করছি।"

"আসুন, আসুন অশ্বিনীবাবু।"

অশ্বিনী উঠতে উঠতে বুঝে যায় আসলে ঐ টেবিল থেকে উঠে আসার পরই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল সুনীলবাবুকে হাত দেখানো। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারটি নেহাতই অন্যমনস্কতা বশত সে ঘটায় নি বলেই এতক্ষণ সুনীলবাবুকে সেই সমস্ত কথা বলতে হয়েছে যাতে অশ্বিনী কিছুতেই মন দিতে পারছিল না। অশ্বিনী খুব ত্রস্তভাবে বিপরীত দিকের সোফাটায় সুনীলবাবুর পাশে গিয়ে বসে। টগরকেও মিঃ প্রধান ডাকেন—"এদিকে আসুন টগরদি।" টগর এসে পাশের সোফাটায় বসে। সুনীলবাবু অশ্বিনীর হাতটা ধরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর মিঃ প্রধানের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ইনি তো নিজেকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করেন না—"

"সেণ্ট পারসেণ্ট কারেক্ট"—মিঃ প্রধান বলেন খুব মিষ্টি হাসির সঙ্গে। মিঃ প্রধানের সঙ্গে অশ্বিনীর এই প্রায় প্রথম আলাপ, এর আগে সেই পূজোর মিটিঙে চোখের দেখা। কিন্তু মিঃ প্রধানের যেন অশ্বিনীর সবটুকুই চেনা।

"আপনার সময় এখন ক্রমাগত ভালো যাবে, যাতে হাত দেবেন, সেটাই ধূলোমুঠো-সোনা।" কথাটা শুনে ভট্‌চায সোফা থেকে উঠে আসে। "যা-যা জীবনে করার ইচ্ছে, এখুনি তাতে হাত দিন, সাফল্য অনিবার্য। একে তো কেউ রুখতে পারবে না"—সুনীলবাবু মিঃ প্রধানের দিকে তাকিয়ে বলেন। মিঃ প্রধান যেন কথাগুলি বিচার

করতেই একটা সিগারেট ধরান। "ভেরি ক্যালকুলেটিভ, গভীর জলের মাছ, কেউ ধরতে ছুঁতে পারবে না।" সুনীলবাবু আবার চুপ করে যান। "কখনো বিচলিত হন না। ওর হাতে একটা জট চিহ্ন আছে, এই যে বুধের স্থানের নিচে, এ এক থাকে মহাযোগীদের আর মহাখুনীদের—যারা জীবনমৃত্যুকে প্রায় সমদৃষ্টিতে দেখে।"

সুনীলবাবু অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার কোষ্ঠী আছে ?"

"না"

"রাশিচক্র ?"

"না—"

"জন্মতারিখ মনে আছে ? সময় ? একেবারে ঠিক টাইম ?"

"তারিখটা জানি। সময় একেবারে ঠিক জানি না। তবে মা জানেন নিশ্চয়ই—"

"মা কোথায় থাকেন, এখানে ?"

"না, বাড়িতে—"

"যদি সঠিক সময় একেবারে ঠিক টাইম ও তারিখটা পান, একদিন আমার সঙ্গে দেখা করবেন। এখন বলুন আর কী কী জিজ্ঞাস্য আছে—"

মিঃ প্রধান টগরের দিকে তাকিয়ে বলেন, "টগরদি জিজ্ঞাসা করুন আর কি কি জানতে চান, অশ্বিনীবাবুর।"

টগর কি করে বলে অশ্বিনীর সব কিছু তার জানা নেই, মাত্র কয়েক মাসের পরিচয়ে সে কী করে জানবে তার ভগ্নীপতির জীবনে প্রধান প্রশ্ন কী কী হয়ে আছে।

ভট্‌চায এতক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে জিজ্ঞাসা করে বসে, "মিঃ সরকারের খুব অসুবিধে হয় দার্জিলিঙে আসা-যাওয়ার। একটা গাড়ি হলে খুব সুবিধে হয়। গাড়ি কিনতে পারবেন কবে, দেখুন তো সুনীলবাবু।"

"ইচ্ছে করলে আজই"—উত্তরটা শোনামাত্র অশ্বিনী হাতটা টেনে নিতে চাইল, সুনীলবাবু কি গোলাপের সেই কালো ট্রাঙ্কটার ভেতরটাও দেখতে পাচ্ছেন, যে-ভেতরটা অশ্বিনী এখনো দেখে নি।

"তাহলে বলুন ব্যবসাপাতিও করবেন, শুধু চাকরিতে তো আর গাড়ি হয় না, কী বলেন টগরদি"—মিঃ প্রধান টগরের দিকে ফিরে কথা বল্লেন।

"বলেছি তো জীবনে যা যা করার ইচ্ছে তাতে এখুনি হাত দিতে, এর চাইতে ভালো সময় ওর হাতে আর হয় না।" অশ্বিনী নিজে কোনো প্রশ্ন খুঁজে পায় না। এখানে উপস্থিত তার একমাত্র আত্মীয় টগরও না। অথচ অশ্বিনীকে নিয়ে মিঃ প্রধান আর ভট্‌চায প্রশ্ন করে যাচ্ছেন আর সুনীলবাবু জবাবও দিয়ে যাচ্ছেন। সুনীলবাবু যখনই বলেছেন সে ইচ্ছে করলে এখুনি গাড়ি কিনতে পারে তখন থেকেই হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চাওয়ার ইচ্ছেটা তার এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে সুনীলবাবু হাতটা একটু আলগা করতেই অশ্বিনী অতি ধীরে হাতটা টেনে নেয়, মুখের হাসির রেখা অবিকৃত রেখে।

বিপরীত দিকের সোফায় বসে থাকা ভদ্রমহিলা এতক্ষণে বলে ওঠেন, "মিঃ সরকারের ভাগ্য ভালো। সুনীলবাবুকে হাত দেখাবার জন্য সেই শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার থেকে লোক এসে ফিরে যায় আর মিঃ সরকার প্রথম পরিচয়ের দিনই হাত দেখিয়ে ফেললেন।"

ভট্‌চায ততক্ষণে নিজের পুরনো জায়গায় গিয়ে বসেছে, "সে তো সব ক্ষেত্রেই। মিঃ প্রধানের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে চিঠি লিখতে হয় আর উনি প্রথম দিনই একেবারে ভেতরের বৈঠকখানায়"—

"না, না, তা কেন, আমি তো ওঁকে নেমন্তন্ন করে এনেছি। হি ইজ আওয়ার গেস্ট, যখনই দার্জিলিঙে আসবেন, আমাদের এখানে চলে আসবেন"—

"আপনার আগে মিসেস প্রধানই সে নেমন্তন্ন করে দিয়েছেন"—টগর এতক্ষণে একটা কথা বলার সুযোগ পায়।

"তাহলে তো একেবারে হোম মিনিস্ট্রির অর্ডার।" বলে মিঃ প্রধান তাঁর রঙিন চশমার ভেতর চোখটাকে একটু তুলতে চান।

ভট্চায বলে ওঠে, "টগরদি কিন্তু আজ খুব রেগে গিয়েছেন।"

মিঃ প্রধান টগরদির দিকে তাকিয়েই বলেন, "কেন, কি ব্যাপার।"

"না, না, কিছু না"—বলে টগর হেলান দেয়।

ভট্চায বলে, "টগরদি আজ বলেছেন, কিন্তু কথাটা আমি আগেও শুনেছি। এই যে গবমেণ্টের সব একজিবিশন বা কমিটি-টমিটি হয় তাতে দার্জিলিঙের সেই পঞ্চসতী ছাড়া আর কেউ কোনো জায়গা পাওয়া তো দূরের কথা, খবরও পান না।"

"পঞ্চসতী মানে?" মিঃ প্রধান চোখটাকে এদিক-ওদিক নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করেন।

"মিসেস সিন্হা, লক্ষ্মীদি, মিস থাপা, কিরণদি আর মিসেস মজুমদার"—ভট্চায বলে। প্রায় সবাই-ই মৃদুস্বরে হেসে ওঠে। সামনের সোফার ভদ্রমহিলা বলেন, "খুব কারেকট। ঠিক বলেছেন উনি। যেখানে যাবেন এঁদের মুখ। অন্তত ভ্যারাইটির খাতিরে কিছু নতুন মুখ আনার চেষ্টা করুন"—মহিলা হেসে প্রায় এলিয়ে পড়ে বাঁ হাতটা মুখের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে নিজের হাসি নিজেই চাপা দেন।

মিঃ প্রধান বলেন, "কথাটা অবিশ্যি আমি অনেকদিন থেকেই শুনছি। এ-সব বিষয়ে সব সময় ইণ্টারভেন্ করা ডেলিকেট। কিন্তু দিনদিন ব্যাপারটা এমন হচ্ছে যে এভাবে তো চলে না। এখন লোকজনের কনসাসনেস অনেক বেড়ে গেছে। নতুন লোকজন আসছেন। তাঁদেরও তো জায়গা করে দিতে হবে। তবে আমার পক্ষে আরো ডেলিকেট মিসেস সিন্হা কন্সার্নড্ বলে।"

আট

একটি কমবয়েসি মেয়ে এসে মিঃ প্রধানকে বলে, "বাবা, আমরা এ-ঘরে নাচলে, তোমাদের অসুবিধে হবে?"

ভট্‌চায সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, "নট অ্যাট অল, উই উড বি র‍্যাদার প্লিজড্।"

মেয়েটি ছুটে বেরিয়ে যায়। প্লেয়ার ও রেকর্ডসহ এক গোছা ছেলেমেয়ে ঘরে ঢোকে। আর অশ্বিনী দেখতে পায় যেন নানা রঙের ফুল হঠাৎ নানা ভঙ্গিতে নানা গুচ্ছে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্লেয়ারে বাজনা বেজে ওঠে আর সমস্ত শরীরগুলো যেন এক সঙ্গে কথা বলে ওঠে। যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই নাচতে শুরু করে। আর নাচতে নাচতেই ঘুরতে থাকে। মাথার শ্যাম্পু করা চুলগুলো দুলছে, নাচিয়েদের শরীর দুলছে আর রঙে রঙে সবটার এমন চেহারা যেন মনে হয় ফুলবনে বাতাসের দোলা। রেকর্ডের বাজনাটা স্তিমিত হয়ে গান শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে এদের নাচের ছন্দও বদলে যায়। হিল্লোলিত গতির বদলে একটা চকিত উল্লাস এসে যায়। অশ্বিনী টেরও পায় না কখন সে পা দিয়ে তাল ঠুকতে আরম্ভ করেছে। গানটার ছন্দও যেন অশ্বিনী ধরতে পারে। খানিকটা দ্রুত ছন্দে গেয়ে ওঠার পর একটা তীব্র চিৎকারে ফেটে পড়ছে। দ্বিতীয় বার থেকে ঐ তীব্র চিৎকারটার মুখে এসে সমস্ত নাচিয়েরা একই সঙ্গে মুখব্যাদান করে চিৎকার করে ওঠে আর তার পরই তাদের নাচের গতি বেড়ে যায়। ভট্‌চাযের দেখাদেখি অশ্বিনীও নাচিয়েদের কাছে গিয়ে হাততালি দিয়ে গানের তাল রাখতে শুরু করে। পেছনে সস্মিতমুখে মিঃ ও মিসেস প্রধান, সুনীলবাবু, টগর আর সেই ভদ্রমহিলাও এসে দাঁড়ান। গানের তাল রাখতে হাততালির সঙ্গে ভট্‌চাযের কোমরেও খানিকটা দোলা আসে।

সেই মেয়েটি অশ্বিনীর সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে নাচতে থাকে। অন্য অনেকের যেমন তার পরণে তেমন কোনো আঁটো-সাঁটো পোশাক ছিল না। কিন্তু ঢোলা রঙিন জামা ভেদ করেও তার স্তন দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে ছিল। বাজনার তালেতালে, গানের তালেতালে সেই রঙিন ঢোলা জামায় এমন প্রবল আলোড়ন যে মনে হয় সমস্ত শরীরটা নানা রঙের ঢেউ—তার ওপরে তার মুখটুকু শুধু ভাসছে, ডুবছে, ভাসছে আর সেই ডুবে যাওয়া আর ভেসে ওঠাটা মাথার চুলের চিহ্ন ধরে শুধু বোঝা যাচ্ছে। মেয়েটি অশ্বিনীর আরো কাছে আসে। তার স্তন দুটোর ওপরে জামার অংশটা এমন ফুলে ওঠে, আলোড়িত হয় যেন মুহূর্তের ভেতর সেই রঙটা ফেটে যাবে আর ভেতর থেকে তার দুটো স্তন বেরিয়ে আসবে। অশ্বিনী হাততালি দেয়, পায়ে তাল তোলে, তার শরীরও দুলে ওঠে, মেয়েটির শরীর আরো কাছে আসে। অশ্বিনীর পেশীতে পেশীতে একটা আলোড়ন জাগে। মেয়েটির চুল অশ্বিনীর কপালে মুখে গলায় লাগে। ঠিক সেই মুহূর্তে রেকর্ডে যেমনি ঐ সমের চিৎকারটা আসে অশ্বিনী আর মেয়েটি একসঙ্গে প্রবলতম স্বরে চিৎকার করে ওঠে, অশ্বিনীর মুখে চোখে মেয়েটির চিৎকারের গরম হাওয়া লাগে, অশ্বিনী মেয়েটির উৎক্ষিপ্ত জিভ, গোলাপি তালু, ছায়াচ্ছন্ন কণ্ঠনালী দেখতে পায়। সমবেত হাসি আর হাততালিতে অশ্বিনীর খেয়াল হয় বাজনা থেমে গেছে, নাচও শেষ। খানিকটা চকিত হয়েই যেন অশ্বিনী সেই মেয়েটিকে খুঁজতে গিয়ে সম্বিত ফিরে পায়।

টগর একগাল হেসে বলে, "তুমি আবার ট্যুইস্ট শিখলে কোথায়?"

হাঁফাতে হাঁফাতে অশ্বিনী বলে, "আমি তো জানি না।"

ভট্‌চায এসে বলে, "নাচলেন আর বললেই হলো জানি না।"

মিসেস প্রধান বললেন, "এই যে, মেয়েদের যেদিনই নাচের পার্টি থাকবে আপনাকে আসতে বলছে।"

মিঃ প্রধান বললেন, "কই, তোমরা তাহলে নেমন্তন্ন করে দাও।"

একটি মেয়ে নাচের শ্রমে চকচকে মুখ নিয়ে এসে বলে, "আপনি আসবেন কিন্তু।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়"—বলে অশ্বিনী যেন সামলাতে থাকে পাছে সে বলে বসে সে আবার নাচলো কখন। অশ্বিনীর আর বসতে ইচ্ছে করছিল না। সারা সন্ধ্যায় এই প্রথম তার খুব হৈ হৈ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ঘরের ভেতর কেমন গুমোট লাগছিল। সে মিঃ প্রধান, মিসেস প্রধান, ভট্চায, সুনীলবাবু আর ঐ ভদ্রমহিলার দিকে খুব অনির্দিষ্টভাবে তাকিয়ে বলে, "তাহলে চলি, অনেক রাত হয়েছে।" অশ্বিনী বেরবার উদ্যোগ করে। তার সঙ্গে ঝল্‌মলে মুখ নিয়ে টগর। পেছন থেকে ভট্চায বলে, "আরে দাঁড়ান মিঃ সরকার, একসঙ্গেই বেরচ্ছি।" মিঃ প্রধান অশ্বিনীর পাশে-পাশে বাইরের ঘরে এসে পা দিতেই ফোন বেজে ওঠে। মিঃ প্রধান ফোনে কথাবার্তা বলা শুরু করলে অশ্বিনী দাঁড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ অশ্বিনীর মনে প্রশ্ন জাগে ভট্চাযের বাড়িতে কি টেলিফোন আছে। অশ্বিনী একটু পেছন ফিরে ভট্চাযকে জিজ্ঞাসা করে, "মিঃ ভট্চায আপনার টেলিফোন নম্বরটা কত।"

"ডাবল থ্রি টু।"

কিন্তু এটা তো জিজ্ঞাসা করা যায় না যে অশ্বিনী আর টগরকে নিয়ে এখানে আসার আগে ভট্চায মিঃ প্রধানকে ফোনে জানিয়েছিল কি না। নইলে মিঃ প্রধান সুনীলবাবুকে এনে রাখেন কি করে, যাতে অশ্বিনীর হাতটা দেখানো যায়? সুনীলবাবু অশ্বিনীর হাত দেখার জন্য অত তন্ত্রের বক্তৃতা দিচ্ছিলেন! আসলে তো অশ্বিনী তার কোনো কথা খেয়ালই করে নি। মিঃ প্রধান এসে অশ্বিনীর হাত দেখানো শুরু করলে কখন একসময় যেন অশ্বিনীর মনে হতে শুরু হয়েছিল যে তার হাতটা সুনীলবাবুকে দিয়ে দেখানোর জন্য আগে থাকতে সব ব্যবস্থা করে রাখা। কখনোই তেমন

কোনো ব্যবস্থা সম্ভব নয় যদি ভট্চাযের ফোন না থাকে। ভট্চাযের ফোন থাকায় সন্দেহটা চেপে বসে। অশ্বিনীর হাত সুনীলবাবুকে ধরিয়ে দিয়ে মিঃ প্রধান আর ভট্চায মিলে প্রশ্ন করে কেন, অশ্বিনীর গাড়ি হবে কি না, অশ্বিনী ব্যবসা করবে কি না আর বারবার সুনীলবাবু বলে যান কেন অশ্বিনীর ধূলিমুঠোসোনা। যে-মুহূর্তে অশ্বিনীর সন্দেহ হয়েছিল যে তার হাত দেখানোটা আয়োজিত ব্যাপার, আর তাতে মিঃ প্রধান আর ভট্চাযের আগ্রহ-ই যেন বেশি, সেই মুহূর্তে অশ্বিনী যেন আটকা পড়ে যাচ্ছে মনে করছিল। মনপুরানের পাতি আনার ব্যাপারে দর্জির সঙ্গে রাত্রির আলাপ থেকে শুরু করে আজ সন্ধ্যায় মিঃ প্রধান তাকে যে-ভাবে সংবর্ধনা করলেন, সেই পর্যন্ত তার মনে পড়ে যায় আর সে প্রাণপণে সমস্ত ঘটনার ভেতর একটা কার্যকারণসূত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। মিঃ প্রধান, ভট্চায আর দর্জির ভেতর যে-যোগাযোগ—অশ্বিনী তাতেই আরো একটা উপাদান হয়ে যাচ্ছে নাকি, এই সন্দেহটা অশ্বিনীকে পেয়ে বসতেই নাচ শুরু হয়েছিল।

মানসিক কার্যকারণের সূত্র খোঁজবার জন্য যে-অশ্বিনীর এত ব্যস্ততা, তাকে না-জানিয়ে তার ভাগ্য যাচাই হয়ে গেল কি না এ নিয়ে যে-অশ্বিনীর এত ব্যগ্রতা, সে নেহাত এই শারীরিক ব্যাপারটাও টের পায় না যে বাজনা, গান আর ছন্দিত দেহভঙ্গির সংক্রমণে, তার পেশীতে যে-আন্দোলন আসে, তার ফলে, নিজে টের না পেয়েও, নেচে ফেলার মতো একটা শারীরিক ক্রিয়া পর্যন্ত সে ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

ডাঃ সাহা হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলেন তিনি আসতে পারছেন না। সুতরাং গাড়িতে করে সুনীলবাবু আর ভদ্রমহিলাকে পৌঁছে দিয়ে ভট্চায জিজ্ঞেস করে, "কি এখুনি বাড়ি ফিরবেন নাকি"—

অশ্বিনী বলে, "খুব হাঁটতে ইচ্ছে করছে, আমরা এখানেই নেমে যাই"—

ভটচায—"যদি অপরাধ না নেন একটা কথা জিজ্ঞেস করি"—

অশ্বিনী—"বলুন না"—

"আপনি কি ড্রিঙ্ক করেন"—

"বলেছি তো, না"—

"তাহলে চলুন, একটুখানি খাবেন, নেচেছেন তো, দেখবেন ফ্রেশ লাগবে"—

অশ্বিনীর মনে হয়, হাঁটতে নয়, সে একটু মদ খেতেই চাইছিল। সে টগরকে জিজ্ঞাসা করে, "খাবো?"

"খাও না। একটু আধটু খাওয়া ভালোই। তুমি এত নাচ শিখলে কোত্থেকে—"গাড়িতে অশ্বিনীর কাঁধে টগর হাত রাখে।

"গোবিন্দদা বাড়িতে আছেন"—অশ্বিনী একটু সঙ্কোচ করে।

"উনি ততক্ষণ ঘুমিয়ে পড়বেন", টগরের এই কথা শুনে রাস্তার কোণায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে, নেমে ভট্‌চায বলে, "আসুন।" প্রথমে টগর, তারপর অশ্বিনী নামে।

নয়

বারটাতে মৃদু আলো। খুব চাপা সুরে বাজনা বাজছে। একটা জানলার পাশের টেবিলে ওরা বসে। বাইরে দার্জিলিঙের পশ্চিম-বাহু দেখা যায়। আলোর মালা যেন কেউ একদিক ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে। আলোগুলি ধীরে ধীরে নিচে নেমে গেছে। দূর দূর পাহাড়ের মাথাতেও দু-চারটি আলো দেখা যায়। হঠাৎ তাকালে মনে হতে পারে চারপাশে বুঝি আকাশের তারা।

বেয়ারা এসে অর্ডার নিয়ে যায়। ভট্‌চায বলে, "ওয়েদারটা খুব ভালো।" বেয়ারা দুটো পেগ আর একটা গ্লাস দিয়ে যায়।

ভট্‌চায গ্লাসটা টগরের দিকে এগিয়ে দেয়। দু-করতলের মাঝখানে গেলাসটা নিয়ে টগর বসে থাকে।

অশ্বিনী নেচে ফেলতে পারায় অশ্বিনী আর টগরের ভেতরের সম্পর্কটা যেন একটা নতুন জটিল পাক খেয়ে যায়। শুধুমাত্র মিঃ প্রধানের মতো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির বাড়ির আতিথেয়তা নয়, সব মিলিয়ে টগরের সঙ্গে সমাজের একটি অংশের যে শারীরিক ব্যবধান ছিল, অশ্বিনী যেন সেইটিই তার শরীর দিয়ে ঘুচিয়ে দিয়েছে। মিসেস সিনহা বা লক্ষ্মীদির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে টগর যেন সমমর্যাদার ভিত্তি পেয়ে যায়। সেই স্বল্পআলোকিত, চাপা সঙ্গীতে গুঞ্জিত বারে টগর দুই চোখ মেলে অশ্বিনীকে আর তার ভঙ্গিগুলো দেখে। বাইরে আলোকমালার দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী কত অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তার মদের গেলাস তুলে নিয়ে খুব ছোট্ট ছোট্ট চুমুক দিচ্ছে। যেন অশ্বিনীর কত দিনেরই অভ্যেস!

ভট্‌চায জিজ্ঞাসা করে—"যে-ভদ্রমহিলাকে নামিয়ে দিয়ে এলাম তাঁকে চেনেন?" "মিসেস সাহা, মানে?"

টগর বলে, "ডাঃ সাহার···" কিন্তু বাক্যটা শেষ করতে পারে না।

ভট্‌চায বিস্তৃত হেসে বলে, "ডাঃ সাহার তো বোঝা গেল। কিন্তু কি?" "মানে?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভট্‌চায যোগ করে, "ভাগ্নী, আইনে বাধা আছে, তাই বিয়ে করতে পারে না, এমনি আছেন দুজন—"

শোনামাত্র টগর চাপা স্বরে প্রায় চিৎকারই করে ওঠে—"এম্ মা, এই নাকি, আগে বললেন না কেন, ভালো করে দেখতাম।"

"এতক্ষণ দেখলেন, তাও ভালো করে দেখা হলো না, আর কি দেখতেন"—অশ্বিনী।

"ও, তাই ভদ্রমহিলার সিঁথিতে সিঁদুর নেই, অথচ সবাই এসে ডাঃ সাহার কথা জিজ্ঞেস করছেন?" টগর।

টগরই আবার কথা বলে ওঠে, "আমি অবশ্যি শুনেছিলাম যে

হাসপাতালে ও-রকম একজন আছেন। কিন্তু ইনিই যে সেই। ঈস, আগে জানলে—। আচ্ছা আবার তো দেখা হবেই।”

“সবচেয়ে মুশকিল হয় ওঁকে ডাকতে। আপনাদের দিদি-টিদি বলে ডাকা যায়। ওঁকে তো আর তা যায় না। আবার এদিকে মিসেস সাহাও বলতে পারি না। এই এক হাঙ্গামা। মামা-ভাগ্নী দুজনাই এখন স্থনীলবাবুর মহাভক্ত।”

“স্থনীলবাবুটি কে?” অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে বসে।

স্থনীলবাবু খুব ভালো লোক। নিজের নেশাতেই মশগুল হয়ে আছেন। এদিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর ওদিকে তান্ত্রিক”—একটু শব্দ করে হাসে ভট্চায।

“আসলে কি জানেন, ইনস্পেক্টর, সেই মহাভারতের গল্প আছে না, রাজা হওয়ার আগে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়েছিল, রামায়ণেও তো আছে রামচন্দ্রের বনবাস। রাজা হওয়ার আগে কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে থাকতেই হয়। সে-সময়ের কথা পরে কেউ জিজ্ঞাসা করে না, জিজ্ঞাসা করতে নেই। আমাদের দার্জিলিঙের গণ্যমান্যদের সবারই এ-রকম এক-একটা অজ্ঞাতবাসের কাল আছে। তখন সবাই নিজের নিজের পুঁজি জোগাড় করে। আসলে নিজের স্বার্থের জন্য যা লাগে তাই করবেন, একেবারে নির্লজ্জের মতো। লোকে তাই মেনে নেবে”—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভট্‌চাযের মুখে শোনা দার্জিলিঙের কয়েকজনের অজ্ঞাতবাসের বৃত্তান্ত ঃ

মিঃ প্রধানের বাবা থাকতেন কালিম্পঙের কাছে একটা প্রায় গাঁয়েই। সামান্য কিছু ক্ষেতি ছিল, ওখানকার ইস্কুলের হেড্‌মাস্টারি ছিল আর গ্রামের ছোট ডাকঘরের আংশিক সময়ের পোস্টমাস্টারি ছিল। আরো দু-একটা এরকম কিছু থাকতে পারে—কিন্তু এমন কিছু নয় যা দিয়ে পুঁজি সংগ্রহ হয়। মিঃ প্রধান কোনো পৈতৃক সম্পত্তি পান নি। যা করেছেন নিজের হাতেই করেছেন। সেদিকে থেকে মিঃ প্রধান সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ। মিঃ প্রধান ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছেন এটা জানা যায়। তার বেশি কিছু পড়েছেন কিনা কেউ জানে না। কালিম্পঙের ছেলে হিসেবে কালিম্পঙেই মিঃ প্রধানের কর্মজীবনের শুরু। একসময় কালিম্পঙের বাজারে মিঃ প্রধান একটা দোকানও দিয়েছিলেন—নিজেই বসতেন সে দোকানে। স্টেশনারি জিনিসপত্রের সঙ্গে তিব্বতি উলও বিক্রির ব্যবস্থা ছিল দোকানটাতে। দোকানটার বিক্রি-বাটরাও মন্দ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে এমন হলো যে মিঃ প্রধান আর দোকানে বসতেন না। তিনি একজন কর্মচারী রাখলেন। পরে সেই কর্মচারীটিকেই দোকানটি দিয়ে দেন মিঃ প্রধান। যাহোক মিঃ প্রধান ঐ তিব্বতি ব্যবসার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে প্রায় সময়ই গ্যাংটকে থাকতে হতো। মিঃ প্রধান তখন যত মাল সংগ্রহ করতেন তার সব নিজের দোকান থেকে বিক্রি করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য অনেকে, বিশেষত শিলিগুড়ির অনেক ব্যবসায়ী মি

প্রধানের কাছ থেকে মালপত্র কিনতেন। যেটা একেবারেই জানা যায় না যে তিব্বত থেকে কী এমন মাল আসত, যার প্রায় ম্যানেজিং এজেন্সি নিয়ে মিঃ প্রধান গ্যাংটকে বসে গিয়েছিলেন। সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী তিব্বত থেকে শীতকালে উল, কম্বল ইত্যাদি নিয়ে ওরা নামত, এখান থেকে নুন, সাবান ইত্যাদি নিয়ে ওরা ফিরত। সেই নুন আর কম্বলের ব্যবসার জন্য তো আর মিঃ প্রধানের দরকার ছিল না। তবে এ-কথাও ঠিক কালিম্পঙে অনেক বড় ব্যবসাদারদের গদি ছিল। ফলে মিঃ প্রধানকে নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এই সব ব্যবসাদারদের হয় বুদ্ধিতে নয় পরিশ্রমে হারিয়ে দিয়ে, তবে ব্যবসা করতে হয়েছে। একটা সময় পর্যন্ত মিঃ প্রধানকে রাত-দিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। তিন-তিনবার তিনি পায়ে হেঁটে তিব্বতের ভিতর পর্যন্ত যান। কেন যান সেইটি কেউ জানে না। মিঃ প্রধানকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি এক একসময় এক-একভাবে উত্তরটা এড়িয়ে যান। একটা কথা অবিশ্যি এরকম চালু আছে—এই রকম একবার তিব্বত থেকে ফেরার পর তাঁকে সরকার গ্রেপ্তার করেছিল। গ্রেপ্তার করেই ছেড়ে দিয়েছিল কিনা অথবা মাসখানেক বা দু-তিনমাস বা ছমাস জেলে ছিলেন—এটাও জানা যায় না। গ্রেপ্তারের ব্যাপারটা অবিশ্যি মিঃ প্রধান দু-একসময় বলেন। কিন্তু সেটা এমন প্রসঙ্গে বলেন যাতে মনে হয় কোনো রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। মিঃ প্রধানের গ্রেপ্তারের সময়টা এমন অনির্দিষ্ট যে বোঝা যায় না তখন ইংরেজ শাসন চলছে, নাকি দেশ স্বাধীন হয়েছে। সাহেব এস-ডি-ও বা জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট জজের নাম হয়তো করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এমন কিছু সাহেব ছিলেন, যাদের নাম মিঃ প্রধান করেন তারা সাহেব না হয়ে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানও হতে পারেন।

যাহোক, কালক্রমে, মানে কার্শিয়াঙে দোকান করার বছর দশেকের ভেতরই মিঃ প্রধান শিলিগুড়িতে উত্তর বাঙলার সবচেয়ে

বড় গ্যারাজ খোলেন। এই গ্যারাজটা তাঁর দোকানের মতো ছোট আকারে খোলা হয় না। একবারে বিরাট বড় জমি কিনে আলাদা আলাদা দালান বানিয়ে, নতুন যন্ত্রপাতি এনে, মিঃ প্রধান প্রায় তখনকার হিসেবেই লাখ দুই-আড়াই টাকা বিনিয়োগ করে বসলেন। তখন আসাম, নেফা থেকে শুরু করে সারা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর অংশের স্থলপথে যোগাযোগ সবে শুরু হয়েছে মাত্র, ন্যাশনাল হাইওয়েগুলো হচ্ছে মাত্র, এই অবস্থায় এই সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল শিলিগুড়িতে এমন একটা আধুনিক গ্যারাজের প্রয়োজন যে কত বেশি ছিল তা বোঝা গেল যখন গ্যারাজ চালু হওয়ার আগেই দূর পাল্লার ট্রাকগুলো এসে লাইন দিতে লাগল আর বছর চারেকের ভেতর মোটরগাড়ির জিনিসপত্রের প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী একটি ভারত বিখ্যাত, আর একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এই শিলি-গুড়িতেই তাদের গ্যারাজ খুললো। কিন্তু এতদিনে মিঃ প্রধানের গ্যারাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

এই গ্যারাজ মিঃ প্রধানকে এত মুনাফা দিতে থাকে যে মাত্র বছর খানেকের ভেতর তিনি দার্জিলিঙে একটা বাড়ি কিনে একটা হোটেল শুরু করেন, আর একটা বাড়ি কিনে কালিম্পং থেকে পরিবারসহ উঠে আসেন। লেবঙের ঘোড়দৌড়ে মিঃ প্রধানের ঘোড়া দৌড়য়।—এগুলোর সব হিসেব পাওয়া যায়। মিঃ প্রধানের গ্যারাজের মুনাফা থেকে এ-সবই সম্ভব। হিসেব পাওয়া যায় না গ্যারাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে দুই-আড়াই লাখ টাকা খাটানো হয়েছিল সেই পুঁজিটার বা সেই পুঁজির সমতুল্য গুড্‌উইলের।

কালিম্পং থেকে দার্জিলিঙে চলে আসার পরই জিলায় সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে মিঃ প্রধান বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ আসন পেয়েছেন। কোনোরকম ছোটখাটো গোলমাল আর ঘরোয়া ঝগড়ার ভেতর মিঃ প্রধান যান না। যেকোনো নেপালি ছেলের পড়াশোনা বা চাকরির জন্য তিনি সমস্ত কিছু করতে প্রস্তুত। সেজন্য নেপালিরা

মিঃ প্রধানের ভেতর এমন একজনকে পেয়েছে যাঁকে বৃহত্তর সমাজে প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে তাঁদের ভালো লাগে। কিন্তু বাঙালিদের ব্যাপারে মিঃ প্রধানের প্রায় স্নায়বিক দুর্বলতা। তাঁর গ্যারাজে নেপালি 'এপ্রেন্টিস বা বাঙালি এঞ্জিনিয়ার ছাড়া তিনি চাকরি দেন না। দার্জিলিঙের বাঙালি সমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ। সামাজিক, সরকারি বা আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে মিঃ প্রধান নেপালি আর বাঙালিদের সমমর্যাদা দেন। কখনো কখনো দেখা গেছে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু ভঙ্গিতে তিনি যে-কোনোরকম সঙ্কীর্ণতার বিরোধিতা করছেন।

নেপালিরা মিঃ প্রধানের ভেতর পেয়েছেন বৃহত্তর জনসমাজে তাঁদের একজন যোগ্য প্রতিনিধি, তিনি নিজের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হবেন না। আবার মিঃ প্রধানের ভেতর বাঙালিরা পেয়েছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি যে-কোনোরকম সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে থাকবেন। ফলে গত দুই দুইটি ভোটে মিঃ প্রধান এখানকার এম্-এল্-এ।

বাঙালিপ্রধান শিলিগুড়িতে ছোটখাটো নেপালি-বাঙালি দাঙ্গাতে নেপালি মালিকের ট্যাকসি পুড়ে যায় বা নেপালি কোনো বড় রেস্তোরাঁ—মিঃ প্রধানের অতবড় গ্যারাজের দেয়ালে একটা ঢিলও পড়েনি কোনোদিন, নেপালি ও বাঙালি কর্মীরা মিলিত ভাবে পাহারা দিয়ে যায়—মিঃ প্রধানের উদার নীতিতে লোকজনের আস্থার অন্তত এই একটা নগদ প্রমাণ তো হাতেনাতে মেলে,—মিঃ প্রধানের গ্যারেজটাই তাঁর উদারনীতিকে ধরে রাখে, নাকি তাঁর উদারনীতিই গ্যারাজটাকে ধরে রাখে, সে তর্ক যদিও অমীমাংসিতই থাকে।

দুই

স্বাধীনতা-আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তা তেমনভাবে দার্জিলিঙ জিলাতে হয়নি বললেই চলে। এক ইংরেজ আমলের একেবারে শেষের দিকে কমিউনিস্টরা যখন চাবাগানের মজুর-আন্দোলন শুরু

করে তখন যেন সারা ভারতবর্ষের আন্দোলনের ঢেউ দার্জিলিঙে এসে লাগে। তার আগে যেটুকু হয়েছে হয়তো দার্জিলিং জিলার ইতিহাসে তার গুরুত্ব আছে, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সামগ্রিকতায় তার স্থান খুব একটা নেই।

তবু দার্জিলিং জিলাতে যাঁরা স্বাধীনতা-আন্দোলনের কর্মী বলেই পরিচিত—মিঃ সিং তাঁদের ভেতর প্রথম ও প্রধান। দার্জিলিং ও শিলিগুড়িতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নেপালি বাঙালিদের ভেতর খোঁজ করলে আজও এমন লোকের দেখা পাওয়া যাবে যাঁরা মনে করতে পারবেন যে স্বাধীনতার আগে কংগ্রেসি নেতা বলতে তাঁরা এক মিঃ সিংকেই বুঝতেন। দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রকাশ্যে খদ্দর পরে গান্ধিটুপি মাথায় দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন তখন এক মিঃ সিং-ই।

মিঃ সিং রাজনীতি করতেন বলেই তাঁর ঘরদোরের খবর কেউ একটা বড় রাখতেন না। তখন মিঃ সিং থাকতেন শিলিগুড়িতে মহাবীরস্থানে আর দার্জিলিঙে বাজারে। পুরনো লোকেরা জানতেন দার্জিলিঙের বাজারের ওপরই মিঃ সিং-এর পৈতৃক বাড়ি ছিল, বাড়ি না-বলে বাড়িগুলি বলাই ভালো। বেশ খানিকটা জমির ওপর কোথাও কাঠ, কোথাও পাথর দিয়ে বানানো নানা রকম কোঠার একটানা বস্তি। এই বস্তির ভাড়া অনেকদিন পর্যন্ত মিঃ সিং-এর একমাত্র উপার্জন ছিল।

কংগ্রেস সংগঠন মিঃ সিং কতদূর কী করতে পেরেছিলেন তা অবিশ্যি বলা যায় না কিন্তু ১৯৪২ সালে তিনি প্রায় জনা পঁচিশ সত্যাগ্রহী নিয়ে শিলিগুড়ি থানার সামনে জাতীয় পাতাকা উত্তোলন করেন। পুলিশ এসে লাঠি চালায়। সেই লাঠি তাঁর মাথায় পড়ে। তারপর তিনি গ্রেপ্তার হন। এ তো অনেকেরই নিজের চোখে দেখা।

১৯৪৪-৪৫ সালে মিঃ সিং ছাড়া পান। তখন দার্জিলিঙের চা-বাগানগুলিতে কমিউনিস্টরা ঢুকেছে। চৈত্রমাসের শুকনো বনভূমিতে

একটুখানি আগুনের শিখা বা অনেক সময় কাঠে কাঠে ঘর্ষণ থেকেই যেমন দাবাগ্নি সৃষ্টি হয় দার্জিলিং জিলার তাবৎ চা-বাগানের নেপালি শ্রমিকদের ভেতর নতুন শ্রমিক-আন্দোলন সে-রকম দাবদাহন সৃষ্টি করেছে। যে-জিলায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বলতে কিছু ছিল না, সেই জিলায় এক-একটা বাগান দেখতে দেখতে রাতারাতি লালঝাণ্ডা তুলে দিচ্ছিল। একসময় মনে হচ্ছিল সারাটা দার্জিলিং জিলাই বুঝি লাল হয়ে যাবে।

এই সময় জেল থেকে মিঃ সিং ছাড়া পান। ছাড়া পেয়েই তিনি চা-বাগানে শ্রমিক সংগঠনে লেগে পড়েন যার এক ও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব হ্রাস করে কংগ্রেসের প্রভাব বাড়ানো।

জেলে যাওয়া পর্যন্ত মিঃ সিং-এর জীবনের কোনো কিছুই মানুষের অজানা নেই। জেল থেকে বেরনোর পর, শ্রমিক-আন্দোলন শুরু করা থেকে আর কোনো কিছুই স্পষ্ট জানা যায় না। তার কারণ অবশ্যই এটা হতে পারে যে শিলিগুড়ি বা দার্জিলিঙে চোখের সামনে সবসময় ঘোরা ফেরা করছে যে-মানুষ তাকে যেমন মনে রাখা যায়, পাহাড়ের আনাচে কানাচে অসংখ্য কুলি বস্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে-মানুষ তার হদিস কি আর তেমন রাখা যায়। মিঃ সিং বলেন তখন কংগ্রেসের নির্দেশেই তিনি শ্রমিক-আন্দোলন করতে এগিয়ে ছিলেন! সেটা নিশ্চয়ই সত্য হতে পারে। বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর উপর কমিউনিস্টদের প্রভাব দমনের মতো আদর্শগত কাজ নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশেই শুরু হতে পারে। আবার কারো কারো মতে মিঃ সিংকে সাহেবরাই তাদের বাগানগুলিতে নিয়ে গিয়ে ইউনিয়নের কাজে লাগান যাতে কমিউনিস্টদের ঠেকানো যায়। মালিকরাই লাগান আর কংগ্রেসই লাগাক, উদ্দেশ্য তো একই, কমিউনিস্টদের ঠেকানো। সুতরাং এটাও খানিকটা বোঝা যায়।

কিন্তু কমিউনিস্টদের ঠেকাতে গিয়ে মিঃ সিং তখন কংগ্রেসকেও ঠেকিয়ে বসে আছেন। কমিউনিস্টদের তখন শ্লোগান মজতুর ঐক্য। তার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে কখন একসময় মিঃ সিং-এর হাতে একটিই মাত্র অস্ত্র থেকে যায় নেপালি ঐক্য। শুধু দার্জিলিং জিলার এক চা-বাগানের সঙ্গে আর এক চা-বাগানের মজুতুরদের ঐক্য নয়—এই পাহাড়ের শ্রমিকদের সঙ্গে যদি সমতলের ডুয়ার্সের মদেশিয়া শ্রমিকদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে কমিউনিস্টদের ঠেকাবার ক্ষমতা কারো ছিল না। স্থতরাং শ্রমিক-আন্দোলনের খাতিরেই মিঃ সিংকে সমতলের বিরুদ্ধে পাহাড়ের ঐক্য বিদেশীর বিরুদ্ধে নেপালির ঐক্য,—এই শ্লোগান তুলতে হয়। যেসব বাগান তখন পর্যন্ত সরাসরি কমিউনিস্টদের পাল্লায় পড়ে নি, সেই সব বাগানে এই শ্লোগান বেশ ধরে গেল। মিঃ সিং অন্তত দাঁড়াবার একটা জায়গা পেলেন।

কমিউনিস্টদের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করে এই দাঁড়াবার জায়গাটি পেতে মিঃ সিংকে তিন-চার বছর খুব মেহনত করতে হয়েছে। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি-ই বেআইনি ঘোষিত হওয়ায় আর তার প্রায় সব নেতা জেলে আটকা পড়ায় মিঃ সিং-এর যেন সোনায় সোহাগা। তখন সারা জিলায় তিনিই একমাত্র অকমিউনিস্ট শ্রমিক-নেতা। স্থতরাং তিনি নতুন নতুন বাগানে ইউনিয়ন শুরু করলেন।

ঠিক এই সময় মিঃ সিং-এর পৈতৃক বাড়িটা ভেঙে পাকা একটা বাড়ি তৈরি শুরু হয়। মিঃ সিং-এর কোনো পৈতৃক টাকাপয়সা ছিল না। তার নিজেরও কোনো আয় ছিল না। তবু দার্জিলিঙের মতো জায়গায় তিনি যে অতবড় একটা দালান তৈরি শুরু করলেন তার পুঁজিটা নিশ্চয়ই তিনি কোথাও থেকে সংগ্রহ করেছেন। কোথা থেকে করেছেন সেটাই কেউ জানে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জিলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে নিশ্চয়ই তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি

বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু শুধু প্রতিপত্তিতে তো আর এতবড় দালান হয় না। বাড়িটা তৈরি করতেও অন্তত বছর তিনেক সময় লেগেছে।

কমিউনিস্টরা যখন জেলে তখন মিঃ সিং পূর্ণোদ্যমে তাঁর ইউনিয়নের প্রভাব বাড়াচ্ছেন আর সারা জিলায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। মদেশিয়াদের বিরুদ্ধে নেপালিদের ঐক্য বিদেশীদের বিরুদ্ধে পাহাড়-বাসীদের ঐক্য—এই শ্লোগানগুলি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠে ওদিকে ডুয়ার্সের আর এদিকে তরাইয়ের নানাজায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগার মতো অবস্থা তৈরি করেছিল। দেশ তখন স্বাধীন। সরকারের পক্ষ থেকে ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলাদাভাবে মিঃ সিং-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হয়। কিন্তু মিঃ সিং-এর পক্ষে তখন :এই শ্লোগান ছাড়াও সম্ভব নয়। তাঁর বাড়ি তখন আধখানা। কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতৃত্ব প্রথম নির্বাচনে মিঃ সিংকে মনোনয়ন দিলেন না। দ্বিতীয় নির্বাচনের আগে তো মিঃ প্রধানই এসে গেছেন। কিন্তু চা-বাগানের শ্রমিকদের ওপর মিঃ সিং-এর প্রতিপত্তি থাকায় তিনি জিলার সভাপতি থেকেই গেলেন। মিঃ সিং-এর তিনতলা বাড়িতে এখন বারোটা ফ্লাট। বাড়ির মালিক, জিলা কংগ্রেসের সভাপতি আর শ্রমিক নেতা—এই তাঁর পরিচয়।

তাঁর বাড়িটাও তৈরি হয়ে গেল, কমিউনিস্টরাও ছাড়া পেল, প্রথম নির্বাচনটাও হয়ে গেল। সেই একটা সময় এসেছিল যখন মিঃ সিংকে ভেবে ঠিক করতে হয়েছে তিনি কংগ্রেস ছাড়বেন নাকি কংগ্রেসেই থাকবেন। নেপালি-ঐক্য, ও সমতলের বিরুদ্ধে পাহাড়ের ঐক্যের যে-আওয়াজ মিঃ সিং তুলেছিলেন সেই আওয়াজের ওপর দাঁড়িয়ে তার চাইতে আরো গরম আওয়াজ উঠল নেপালিদের জন্য আলাদা রাজ্য চাই। স্বাভাবিকভাবেই মিঃ সিং-এর এ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। কিন্তু কংগ্রেসের ভেতরে থেকে তো এ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া যায় না। কারণ যারা

নেপালিদের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবি তুলছে তাদের প্রধান শত্রু কংগ্রেস। মিঃ সিং-এর পক্ষে কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দলে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না, তা সেই নতুন দলের প্রতি তাঁর যত সহানুভূতি থাকুক না কেন। কমিউনিস্টদের শ্রমিক-ঐক্যের আওয়াজের বিরুদ্ধে নেপালি-ঐক্যের আওয়াজ দিয়ে যে-বাগানগুলিতে একদিন মিঃ সিং ইউনিয়ন তৈরি করেছিলেন, এই নতুন দল নেপালি-ঐক্যের বিরুদ্ধে নেপালি রাজ্যের শ্লোগান দিয়ে সেই বাগানগুলিতেই ইউনিয়ন বানাতে লেগে গেল। তাতে অবিশ্যি মিঃ সিং-এর কিছু আসে যায় না। তখন তিনি কংগ্রেসের সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একজন সহসভাপতি। ইউনিয়নের জন্য দৌড়াদৌড়ি করার তাঁর কি দরকার। তাঁর ইউনিয়ন করে দেয়ার তখন কত লোক।

মিঃ প্রধান আর মিঃ সিং-এর মধ্যে প্রকাশ্য একটা বিরোধই আছে। প্রথম ভোটের সময় বিধানসভায় কংগ্রেসের মনোনয়নের চাইতে মিঃ সিং তাঁর ইউনিয়নগুলি নিয়ে থেকে বাড়িটা শেষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারের ভোটে তিনি কেন মনোনয়ন পেলেন না। সারা জিলায় এক তাঁরই মাথায় তো পুলিশের লাঠির দাগ আছে। শিলিগুড়িতে কারখানা করে মুখেমুখে বাঙালি-নেপালি ভাবমোহব্বতের কথা বলে বলেই কি মিঃ প্রধান কোনোদিন মিঃ সিংকে, চা-বাগানের মজুরদের এত ভোটের ওপর মিঃ সিং-এর দখলদারি সত্ত্বেও, মনোনয়নটাই পেতে দেবে না?

তিন

মিঃ সান্যালের বাড়িতেই দুর্গাপূজার মিটিংটা হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীদির সঙ্গেই টগর আর অশ্বিনীর সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হয়েছিল। টগরের ভাষায় লক্ষ্মীদি পঞ্চসতীর প্রধান সতী।

মিঃ সান্যাল প্রায় বছর তিরিশ আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের

চাকরিতে ঢোকেন। এখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন ছুঁই-ছুঁই। ডেপুটি রেঞ্জারের চাকরিতে ঢুকে অতি অল্প সময়ের ভেতর মিঃ সান্যাল রেঞ্জার হয়ে যান। তখনকার দিনের বি-এস-সি পাশ, কাজকর্মও খুব ভালো জানতেন। রেঞ্জার হিসেবে বছর পাঁচেক খুব সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর হঠাৎ একটা ঘটনায় মিঃ সান্যাল সাসপেণ্ডেড হয়ে যান। কেন তিনি সাসপেণ্ডেড হয়ে ছিলেন তা নিয়ে নানারকম কাহিনী আছে। দেড় বছর সাসপেনশনের পর কী হয়েছিল তা নিয়েও তিনটি মত আছে। কেউ বলেন মিঃ সান্যালের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় কিন্তু তিনি চাকরিতে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন—আত্মসম্মানের জন্য। তিনি যে নির্দোষ সেটুকু প্রমাণিত হওয়ার অপেক্ষাতেই নাকি মিঃ সান্যাল দেড় বছরের সাস-পেনশন স্বীকার করে নিয়েছিলেন—এতই নাকি তাঁর আত্মমর্যদা-বোধ। কেউ বলেন বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন, সেই কারণে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কেউ বলেন সরকারের সঙ্গে তাঁর এই রকম একটা বোঝাবুঝি হয় যে সরকার তার বিরুদ্ধে তদন্ত করবে না, তিনিও পদত্যাগ করবেন।

যে কারণেই হোক পদত্যাগ করে তিনি দার্জিলিঙে এসে বসেন।

কেন তিনি সাসপেণ্ডেড হয়েছিলেন সে সম্পর্কে প্রচলিত নানা কাহিনী-উপকাহিনীর সত্যমিথ্যা বিচার না করে ঘটনাটা বর্ণনা করা যায়। তখন মিঃ প্রধান রেঞ্জার হিসেবে সিকিমের নিচে একটা রেঞ্জে আছেন। রেঞ্জটার কয়েকটা ব্লক এমন একটা জায়গায় যেখানে দুটি পাহাড়ি নদী সমতলে এসে মিশেছে। ফলে বর্ষাকালে ব্লকগুলোকে বাঁচাবার জন্য খুব খাটতে হয়। মিঃ সান্যাল যখন রেঞ্জার ছিলেন তখন একবার প্রচণ্ড বর্ষায় বাঁধ ভেঙে প্রায় তিন-চারটি ব্লক সম্পূর্ণ ভেসে যায়। মিঃ সান্যালের নামে অভিযোগ ওঠে তিনি কয়েকজন কনট্রাকটরের কাছে সমস্ত গাছ বেচে দিয়ে-ছিলেন, বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-ছদিন প্রায় রাতদিন গাছ

কেটে পার করা চলে, তারপর বাঁধ কেটে ব্লকের ভেতর নদী ঢুকিয়ে দেয়া হয়।

এই অভিযোগ যেমন সত্য হতে পারে তেমনি এটাও সত্যি হতে পারে যে মাত্র কয়েক বছরের চাকরিতে ডেপুটি রেঞ্জার থেকে রেঞ্জারের পদে উন্নীত হওয়ায় মিঃ সান্যালের বিরুদ্ধে একটা দল তৈরি হয় ও ডেপুটি ফরেস্টার পদে তাঁর অবধারিত উন্নতি ঠেকাবার জন্যই এই ষড়যন্ত্র করা হয়।

এমনই অভিযোগ যার কোনো নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। কোনো কনট্রাক্টর যদি বলেও যে সে ঐ ব্লকগুলির কিছু গাছ কিনেছিল তাহলেও কিছু প্রমাণ হবে না—সাক্ষ্য কোথায়। পাশাপাশি বস্তির লোকরা যদি বলে তারা রাতদিন গাছ কাটতে দেখেছে তাহলেও কিছু হবে না। বর্ষার শুরুতে কনট্রাক্টররা তো গাছ কাটতেই পারে। আর গ্রামের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয় কোন ব্লকে গাছ কাটা হচ্ছে। একমাত্র উপায় জলের তলায় গিয়ে দেখা গাছের শেকড় শুদ্ধ জলের স্রোতে ওপড়ানো, নাকি করাত দিয়ে কাটা। সেটা দেখা তো আর সম্ভব নয়। সুতরাং অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তার বিচারও সম্ভব নয়।

চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর নাকি তখনকার কিছু প্রাইভেট ফরেস্ট আর কাঠের ফ্যাক্টরি থেকে মিঃ সান্যালের কাছে চাকরির প্রস্তাব আসে। কিন্তু মিঃ সান্যাল নাকি ঘোষণা করেন আর কারো দাসত্ব করবেন না। দার্জিলিঙে একটা বাড়ি কিনে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী একমাত্র বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে উঠে আসেন, মনে হয়েছিল, যেন অবসর-জীবন কাটাতে।

মিঃ সান্যালের স্ত্রী লক্ষ্মীদি দেখতে দেখতে দার্জিলিঙের বাঙালি সমাজে একটা বিশিষ্ট জায়গা পেয়ে যান। লক্ষ্মীদির সবচেয়ে বড় গুণ যে-কোনো পরিবেশে, যে-কোনো অবস্থায় লোকের সঙ্গে তিনি মিশতে পারেন। সব হিসেব-নিকেশ মিলিয়ে দেখা যাবে মাস

ছয়েক লক্ষ্মীদি শুধু বাঙালি সমাজের ভেতর আটকা ছিলেন। তারপর তাঁকে সারা দার্জিলিঙই চিনে যায়। সেই আজ থেকে বিশ বছর আগে লক্ষ্মীদি যখন প্রায় এসেছিলেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ্মীদি ছাড়া দার্জিলিঙের এমন কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান সম্ভবই নয় যেখানে সমস্ত জাতের মানুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয়। বাঙলা-দেশের শেষ গভর্নর লর্ড ব্যারোজও নাকি বটানিক্‌সে ফ্লাওয়ার শো উদ্বোধন করে কাঁচিটা লক্ষ্মীদির দিকে বাড়িয়ে বলেছিলেন, "ক্যাচ ইট লক্‌স্‌মি দি।" তখন লক্ষ্মীদির বয়স তিরিশও হয় নি, মাত্র এক ছেলের মা, দেখলে মনে হতো আঠার বছর বয়স। আজকের প্রায় পঁয়তাল্লিশ পেরনো লক্ষ্মীদিকে দেখলে মনে হয় এখনো চল্লিশ হয় নি। ইংরেজ আমলের শেষের বছর দুই আর তারপর তো বটেই—দার্জিলিঙের সরকারি আধা-সরকারি সামাজিক জীবনে লক্ষ্মীদি ছিলেন ও আছেন অপরিহার্য। রাজভবন থেকে লেবঙের মাঠ—সর্বত্রই লক্ষ্মীদি।

এই সময় আসাম ও উত্তরবাঙলার সঙ্গে দেশের বাকি অংশের রেল যোগাযোগের জন্য আসামলিঙ্ক লাইন খোলার কাজ শুরু হয়। রেলের বড় কর্তারা যাঁরাই নানাধরনের কাজে শিলিগুড়ি পর্যন্ত আসতেন তাঁরাই দার্জিলিংটা ঘুরে যেতেন।

সেই সময় মিঃ সান্যাল রেলওয়ের ক্লাস ওয়ান কনট্রাকটরের তালিকাভুক্ত হয়ে যান। গঙ্গা থেকে আসাম পর্যন্ত যত নতুন রেল লাইন পাতা হয়েছে, যত বড় বড় নতুন ব্রিজ তৈরি হয়েছে, যত বড় বড় জংশন স্টেশন তৈরি হয়েছে, তার অন্তত শতকরা পঞ্চাশভাগ স্যানকন্‌সের। মিঃ সান্যালের ফার্মের দুটো অফিস—একটা শিলি-গুড়িতে, আর একটা পাণ্ডুতে। এই অফিসগুলোতে এঞ্জিনিয়ার ড্রাফট্‌সম্যান, সার্ভেয়ার, এস্টিমেটররা আছেন। কাগজপত্রের হেড অফিস দার্জিলিঙে। স্যান্‌কন্‌সের চিফ এঞ্জিনিয়ার আর চিফ আর্কিটেক্টের বেসিক মাইনেই মাসিক দুই হাজার টাকা।

স্ক্যান্‌কন্‌সের মালিক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি কি রেঞ্জারের চাকরি থেকে পদত্যাগ করে মেলে। মিঃ সান্যালের জীবনের এই প্রশ্নটির জবাব মেলে না। জবাব অবিশ্যি কেউ কেউ দেয় যে মিঃ সান্যাল চাকরি ছাড়ার পরই নাকি লক্ষ্মীদির কর্মজীবন শুরু, সুতরাং স্ক্যান্‌কন্‌সের আসল পুঁজি স্বয়ং লক্ষ্মীদি। কিন্তু লক্ষ্মীদিকে না হয় দেখা যায়, লক্ষ্মীদির পুঁজিকে তো আর দেখা যায় না। কে বের করবে পাহাড়ি নদীর উন্মাদ স্রোতের নিচে গাছের শেকড় ওপড়ানো, না গোড়া করাতকাটা?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোলাপ আর খোকনকে পঞ্চমীর দিনই পাঠিয়ে দিয়েছিল, গোলাপের কেনাকাটা বাকি ছিল। সপ্তমীর দিন সকালে অশ্বিনী এসে পৌঁছনোমাত্র গোলাপ সমস্ত জিনিসপত্র এনে বাইরের ঘরে অশ্বিনীকে দেখানো শুরু করলে অশ্বিনী বলে ওঠে, "আরে করেছ কি, তুমি কি দার্জিলিঙের বাজার শুদ্ধুই কিনে ফেলেছ নাকি"

টগর বলে, "প্রায় তাই। এ-তুদিন তো বেণু আর গোলাপ এক মুহূর্তের জন্য বাড়িতে বসে নি। শুধু হুটপাট করে বেরিয়েছে। আমাকেও নিতে চেয়েছিল। আমি ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে আর ওদিকে এগোই নি"—

বেণু ভেতর থেকে গলা উঁচিয়ে বলে, "গোলাপদির বাজার করে দিয়ে দার্জিলিঙের বাজারে আমার নাম হয়ে গেছে না, এখন দোকানিরা খাতির করবে"—

গোবিন্দবাবু এসে বাইরের ঘরে বসেন, "তুমি যে খাস বাঙাল এটা বোঝাই যাচ্ছে, আরে দার্জিলিঙে তো মানুষ সব সময়ই কিনছে, এখানে পূজোর সময় কেউ কি আর আলাদাভাবে বাজার করে। দার্জিলিঙে তো বারোমাসই বাজার"—

অশ্বিনী কিছু না বলে হাসে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, "দাদা আমাকে বলছেন কেন, আপনার নিকটাত্মীয়াকে বলুন, এসব কিছুর জন্য আমাকে তো গত মাসখানেক প্রায় না-খাইয়ে রেখেছে আর এখন সরকারের অ্যাডভান্সের টাকা সারা বছর ধরে শোধ করো"—

গোলাপ বলে ওঠে, "আহা হা, কী এমন বেশি কিনেছি, কোনটা না কিনলে হতো বলুন জামাইবাবু। জ্যাঠশ্বশুর জ্যাঠশাশুড়ী—এঁদের ধুতি, শাড়ি তো কিনি নি, টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। খোকনের

প্যাণ্ট, শার্ট। বেণুদি বললো একেবারে গরম কাপড়ের করে নিতে, আমিও তাই করে নিলাম।"

গোবিন্দবাবু—"এই একটা তুমি খুব বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছ—শীতের বাজার আর পূজোর বাজার একসঙ্গে"—

টগর—"তুই বেণুকে নিয়ে বেরলি কেন গোলাপ। তোর জামাইবাবুকে নিয়ে বেরলে দেখতি কতো সস্তায় জিনিস পেতি"—

গোবিন্দবাবু—"তা তুমি বলতে পার। তোমাদের দেখেই আমার ভয় করছে। তবে ধুতি শাড়ি এখান থেকে না কিনে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে ভালো করেছ। এখানকার দুখানার দামে প্লেইন্‌সে তিনটে হবে"—

অশ্বিনী দুটো ফ্রক তুলে ধরে। টগর বলে ওঠে, "এইগুলো একেবারে পুরো বাজে খরচ হয়েছে। লুম্নু-বেবির জন্য গরম কাপড়ের ফ্রক। ওদের কি আর জিনিসের কিছু কমতি আছে?"

বেণু একটা কিছুতে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢোকে। "জিজ্ঞেস করো তোমার বোনকে, কতবার নিষেধ করলাম। শেষে বললাম ফ্রক কিনো না, শুধু কাপড় কেন, বানিয়ে নেয়া যাবে, রাজিও হলো, শেষে আবার কাপড় ফেরত দিয়ে ফ্রক নিয়ে বললো, না ওরা পরতে পারবে না! তোমারই তো বোন!"

গোবিন্দবাবু বলেন, "সে-বিষয়ে গোলাপ কোনো সন্দেহ রাখে নি"—

বেণু বাঁ হাতে তার হাত মোছার ন্যাকড়াটা রেখে ডান হাতে একটা বেডকভার তুলে ধরে বলে, "এটি খুব ভালো হয় নি?"

"হ্যাঁ", বলে অশ্বিনী হাত বাড়িয়ে ধরে।

"আমার পছন্দ"—বেণু যেন সগর্বে বলে।

"সবই তো তোমার পছন্দ বাবা, আমি অত জিনিসের ভেতর বুঝতেই পারি না কিছু", গোলাপ বেণুর দিকে মুখ উঁচু করে বলে, তার পর সরে গিয়ে জায়গা দিয়ে বলে, "বসো না" "দাদা, গোলাপদি যে

তোমাকে লুম্নু-বেবি-খোকনের সমান করে দিল। তোমার জন্য প্যান্টের কাপড়।” বেণু হেসে ওঠে। গোবিন্দবাবু হাসিতে যোগ দিয়ে বলেন, “তা দ্বিতীয় শৈশব”। পূজোর বাজার বলতে যা বোঝায় ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। লুম্নু-বেবি-খোকনের জন্য গরম জামা কাপড়, গোবিন্দবাবুর জন্য একটা প্যান্টের কাপড় আর একটা বেডকভার। অশ্বিনী চিন্তা করে এ-বাড়িতে পূজোর বাজার কি হলো, সেটা জিজ্ঞাসা করবে কি না। ঠিক সে-সময়ই টগর বলে ওঠে, “আমার পূজোর বাজারে কোনো হাঙ্গামা নেই। তিন মামার জন্য তিন ধুতি-পাঞ্জাবি” গোবিন্দবাবু “তোমার মামারা তো আমাকে অনেকদিন পূজোর জিনিস দেয়া বন্ধ করেছেন” টগর হেসে ফেলে বলে, “একটা চিঠি লেখো”—

অশ্বিনীর ঠিক বিপরীত দিকের চেয়ারে টগর বসেছে। টগর বাড়িতে কি কখনো সোজা হয়ে বসে বেশ আগ্রহের সঙ্গে কথা-বার্তায় কাজেকর্মে অংশ নেয়? অথচ বাইরে তো টগর কোনোসময় এই অনায়াস ভঙ্গি নেয় না। সেখানে যেন কিছু ঘটনার সম্ভাবনায় টগর সবসময়ই উন্মুখ।

টগর উঠে বসে—“গোলাপ, একটা কাজ করবি?” সবাই-ই টগরের দিকে তাকায়। টগর বলে, “চল্ আমাদের দু-বোনের নামে বাবাকে একটা ধুতি-পাঞ্জাবি পাঠাই।” গোলাপের কোলের ওপর বেডকভারটা পড়ে ছিল, সেটা দুই হাতে মুঠো করে বলে ওঠে—“বেশ হবে, চলো যাই, এখুনি পাঠিয়ে দিয়ে আসি”—

টগর ওঠার উদ্যোগ করে বলে, “চল্”—

গোবিন্দবাবু বলেন, “মামারা আবার রাগ করবেন না তো!”

টগর কোনো কথা না বলে উঠে পড়ে। গোলাপ অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, “খুব ভালো হবে, না?”

“তাহলে তোমার মায়ের জন্যও একটা শাড়ি পাঠিও”—অশ্বিনীর মুখে কথাটা শুনে টগর দরজার কাছ থেকে ঘাড় ঘোরায়।

গোলাপ "আচ্ছা" বলে ঘরের দিকে যেতেই বেণুও তাকে অনুসরণ করে বলে, "গোলাপদি, শাড়িটা পাল্টে যাও, ক্রাস্‌ড হয়ে গেছে"—

বাইরের দরজায় ছোট ছোট হাতের ধাক্কা পড়তে থাকে। অশ্বিনী গিয়ে খুলে দেয়ামাত্র ঢুকতে ঢুকতে লুস্থু চিৎকার করে "পিউমনি আমি খোকনের সঙ্গে কোথাও যাব না। পলিআন্টিরা বেরচ্ছিল তাদের সঙ্গে যাচ্ছিল," লুস্থু ভেতরে চলে যায়। সেখান থেকে গোলাপ চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে, "খোকন, কোথায় যাচ্ছিলে।" বেণুও চড়া গলায় বলে, "আচ্ছা লুস্থু, ওতো আর যায় নি।"

"আহা-হা যায় নি, যাচ্ছিল তো"—

খোকন বাইরের ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললো, "যেতে বললো যে"—লুস্থু বাইরের ঘর আর ভেতরের ঘরের দরজার পর্দা ধরে বলে "আহাহা যেতে বললো যে আমি তোকে কানে কানে বলে দিলাম না যে বল্, 'নো থ্যাঙ্ক ইউ অ্যান্টি' কিছুতেই বললো না। আরো বললো আমি যাবো"—

গোবিন্দবাবু বলেন, "আচ্ছা, হয়েছে লুস্থু, ও তো এখনো থ্যাঙ্ক ইউ শেখে নি, শিখলে বলবে"—

"আমি বাবা খোকনকে নিয়ে কোথাও যেতে পারব না, মা তোমরা কোথায় যাচ্ছ?" এক নিশ্বাসে বলে লুস্থু ভেতরের দিকে চলে যায়।

"বৌদি, ওদের সঙ্গে নিয়ে যাও না, পূজোর দিন বাড়িতে কি বসে থাকবে?"

"ওদের নিয়ে দোকানপাটে যাওয়া—!" টগর।

"না, না, কিছু করবে না, লুস্থু আছে তো!"—বেণু।

খোকন আর বেবি টেবিলের ওপর রাখা জামাকাপড় হাতাতে থাকে। বেবি জামাকাপড়গুলো নাকে চেপে ধরে বলে, "কী সুন্দর গন্ধ!"

দুই

গোলাপ আর টগর তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে। এমন হুটহাট বেরনোতে গোলাপ মোটেই অভ্যস্ত নয়। তার পোশাকটা তাই এখনো বেরনোর সময় একটু বেশি ভারি হয়। টগর হাল্কা সবুজ রঙের আর গোলাপ খয়েরি রঙের চেক দেয়া শাড়ি পরেছে। লুস্থু গোলাপের হাত ধরে। খোকন গিয়ে টগরের হাত ধরে। বেবি দাঁড়িয়ে থাকে। দরজার সামনে এসে টগর বেবিকে ডাকে, "আয়" "আমি পূজো দেখতে যাবো" "আমরা তো পূজো দেখতেই যাচ্ছি।" বেবি ছুটে গিয়ে টগরের আর একটা হাত ধরে। টগর দরজার দিকে এগিয়ে হঠাৎ থেমে বলে, "অশ্বিনীই বা বসে থেকে কি করবে? তুমিও চলো না। আসবার সময় না হয় পূজোমণ্ডপটা ঘুরেই আসব"—

"যাও অশ্বিনী, ঘুরেই এসো"—গোবিন্দবাবুও অশ্বিনীকে বলেন।

"আপনিই বা থাকবেন কেন, চলুন না, একদিনও আমাদের সঙ্গে বেরন না", গোলাপ গোবিন্দবাবুকে বলে।

গোবিন্দবাবু বলেন, "বিকেলে বেরবো। এখন তোমরা ঘুরে এসো"—

টগর হেসে ফেলে "এখন রাস্তায় বেরলে ওঁর পা আপনা থেকেই অফিসে চলে যাবে! কী করে যে বছরের এই তিনচারটি ছুটির দিন কাটে!" ওরা বেরতে গেলে অশ্বিনী বলে ওঠে—"তাহলে একজনই বা বাদ থাকেন কেন, সবাই মিলে গেলেই হয়।" একজনটা কে সেটা বুঝে নিতে যে-টুকু সময় লাগে তারপরই গোলাপ বলে ওঠে "হ্যাঁ, হ্যাঁ বেণুদি চলো" গোলাপ ভেতরে চলে যায়। বেণু বলে ওঠে—"রান্নাবান্না করতে হবে না! তারপর আমি তো অঞ্জলি দিতে যাব, তোমরা এখন ঘুরে এসো, বিকেলে আবার বেরনো যাবে।"

"আমরাও তো পূজোর ওখানে যাব। আর রান্নাবান্না ফিরে এসে করলেই হবে"—টগর বলে।

"তাহলে তোমরা বেরোও আমি তোমাদের ধরে নিচ্ছি"—

বেবি বলে, "আমি পিউমনির সঙ্গে যাব।"

রাস্তায় নেমে অশ্বিনীর কাছে গোলাপের খয়েরি শাড়িটাকে ততো ভারি মনে হয় না। বোধহয় গোলাপ শাড়ি পরার ধরন কিছুটা পালটেছে অথবা গোলাপের কাঁধের ওখানে কিছু পরিবর্তন হয়েছে, সেটা জামার কাটে না চুল বাঁধায়—অশ্বিনী খানিকটা গোলমালে পড়ে। মাত্র দুদিন আগে দার্জিলিঙে এসে গোলাপ কোথায় একটু পাল্‌টেছে যে অশ্বিনীর চোখে পাল্টানোটা ধরা পড়ছে কিন্তু তার কারণটা ধরা পড়ছে না। অথবা এই অসময়ে রাস্তায় সবাই মিলে বেড়াতে বেরিয়ে গোলাপকে দেখার অনভ্যাসের জন্যই এ-রকমটি মনে হচ্ছে। টগরকে খুব পরিচিত ঠেকে। যেন গল্প করতে-করতে অলসভাবে উঠে এসেছে। কপালের ওপর চুল-গুলোও তেমনিভাবেই আঁচড়ানো। কিন্তু তাই বলে সারা শরীরে কোথাও একটু শিথিলতা নেই। অশ্বিনী দেখে গোলাপের সারা শরীরে আগে যে জড়তা ছিল সেটা অনেকখানিই যেন নেই। হঠাৎ হঠাৎ চোখ পড়লে তো গোলাপকে প্রায় অপরিচিত ঠেকে যায়। নিজের স্ত্রীর পরিবর্তনের একটা সূত্র না পেলে শান্তি মেলে না বলেই যেন অশ্বিনী ভেবে নেয়—স্বাধীনতা, স্বাধীনতা পেলেই সব কিছুর স্ফূর্তি ঘটে। "ঘটেছে। এমন-কি আমারও।" অশ্বিনীরও, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা পেলেই সবাই নিজের মতো করে বেড়ে ওঠে। বেড়েছে। এমন-কি গোলাপও।

এত টাকা হাতে পেয়ে, খরচের এমন স্বাধীনতা পেয়ে গোলাপের মাথাটা ঘুরে যাওয়ার বদলে কেমন ভীষণ হিসেবি হয়ে ওঠে—এমন কি নিজের জন্য হুটহাট করে শাড়ি-কাপড় কেনার বদলে বেণু-টগরের পছন্দের ওপর ছেড়ে দিয়ে এখন-একটা তখন-

একটা শাড়ি কিনে রাখার হিসেবিয়ানাটুকুও সে দেখায়। অথচ পাছে পূজোর বাজারে কেনাকাটার হুল্লোড় লাগিয়ে দেয়া হয় সেই ভয়ে কেনাকাটা বন্ধ রাখার অস্বাভাবিক প্রবণতাটাই অশ্বিনীর হিসেবি স্বভাবে ছিল বেশি। গোবিন্দবাবুর জন্য একটা প্যাণ্টের কাপড় আর তিন বাচ্চার জন্য জামাকাপড় কেনার বুদ্ধিটুকু গোলাপেরই। বেণু আর টগরের জন্য শাড়ি না-কিনে গোলাপ অন্তত নিজের হিসেবিআনাটুকু বেশ প্রমাণ করে রেখেছে—অশ্বিনী হয়তো সেই ভুলটাই করে বসত। একটাই শুধু অসুবিধা। টাকাগুলোর কোনো হিসেব রাখা যাচ্ছে না। গোলাপ প্রতিদিন প্যাণ্টের পকেটে হাত দেয়। প্রথম কয়েকবার মনে ছিল তারপর থেকে অশ্বিনীরও গোলমাল হয়ে যায় কে কখন টাকা দিয়েছে। কত টাকা দিয়েছে।

তিন

বেণু পেছন থেকে গোলাপের নাম ধরে ডাকে, অশ্বিনী দাঁড়ায়। টগর বলে, "আমরা দোকানে ঢুকছি।" তিন বাচ্চাই টগর-গোলাপের সঙ্গে দোকানে ঢুকে যায়। বেণুর দিকে ফিরে রাস্তার মাঝখানে অশ্বিনী দাঁড়িয়ে থাকে। বেণু একটা পিঙ্ক শাড়ি পরেছে, গায়ের চাদরটাতেও নকশা। বেণুর হাত ধরে বেবি পেছনে পেছনে প্রায় ছুটছে। কাছাকাছি এলে অশ্বিনী দেখে এখন হঠাৎ বেরনো সকালে বেণুই সবচেয়ে বেশি সেজেছে। আর তাকে দেখাচ্ছে যেন এখনো কলেজ ছাড়ে নি। "কি ব্যাপার। এত সেজেছেন কেন"—

"বছরে তিনটি দিন পূজো, সাজব না কেন"—

"সে তো বিকেলে"—

"বিকেলে আবার কি। পূজো তো সকালে"—বেণু দাঁড়িয়ে পড়ে একটু হাঁপায়। তারপর জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে হেসে

বলে, "খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে এসেছি তো। ওরা কোথায় ?" অশ্বিনী আঙ্গুল দেখায়। বেণুর হাত ছাড়িয়ে বেবি দোকানের দিকে ছুটে যায়।

"আপনারা মণ্ডপে যাবেন না ?"

"আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানে যাব !"

"বাঃ বাঃ, তাহলে আমি চলে যাব। মণ্ডপে যাবেন বলেই তো আমি এলাম"।

"তাই তো ! স্নান করেও এসেছেন !"

"পূজোর দিন স্নান করলে ভালো লাগে না ?"

"হ্যাঁ" বলে, অশ্বিনী যেন এতক্ষণে, গোলাপের পূজোর বাজার দেখানো আর টগর-গোলাপের পূজোর বাজার করতে আসার বাইরে আসল পূজোটাকে দেখতে পায়। সকাল বেলায় দার্জিলিঙের রাস্তায় চারদিকে খুব ধীরে বহ্‌তা জনস্রোতের মাঝখানে বেণু স্নান সেরে একটু রঙিন শাড়ি আর একটু নকশাকাটা চাদর গায়ে দিয়ে অঞ্জলি দিতে যাবার জন্য হাঁফাচ্ছে। কিন্তু অশ্বিনী বলে ফেলে, "দার্জিলিঙে তো সবাই সবসময় বেড়াচ্ছে—তাই এখানে পূজোটা আর বোঝা যায় না"—

"এত ভিড় থাকলে কোথাও কিছু বোঝা যায় না। এই সিজন্ টাইমে দার্জিলিং আমার ছুচোখের বিষ। এই শীতকাল আসছে, দেখবেন দার্জিলিং কী সুন্দর !"

"আপনার সবই অদ্ভুত, শীতকালে সবাই দার্জিলিং ছেড়ে পালায় আর আপনি বলছেন সুন্দর !"

"সেজন্যই তো ভালো লাগে। ভিড় আমার একেবারে ভালো লাগে না"—

"আপনাকে দেখে তো তা মনে হয় না। মনে হয় আপনি হৈ হৈ করতে খুব ভালোবাসেন"—

"ভালোবাসি-ই তো। হৈ হৈ করব না তো কি চুপচাপ বসে

থাকব ? বললাম তো ভিড় আমার ভালো লাগে না, তার মানে কি হৈ হৈ করতে ভালো লাগে না ?"

দোকান থেকে লুস্থু ছুটে এসে বেণুর হাত ধরে। "আপনাকে বোঝা মুশকিল"—

"আমাকে আর বুঝতে হবে না,—ঐ যে গোলাপদি ডাকছেন", গোলাপ ডাকছিল। বেণু আর অশ্বিনী দোকানে গেলে গোলাপ শাড়িটা আর টগর ধুতিটা দেখায়। অশ্বিনী মাথা হেলিয়ে বলে, "ছুটোই তো ভালো"—

বেণু শাড়িটা দেখে বলে, "তাঁতের নাও না!"

গোলাপ বলে, "তাঁতেরই ভালো হবে, না ? দিদি, তাঁতেরই ভালো হবে ?"

টগর বলে, "তাঁতেরই নে না।" সঙ্গে সঙ্গে দোকানি বলে, "মাদরাজ না হেণ্ডলুম না গুজরাট কি দেখাব বলুন।" দেখান না একটা করে, তারপর বুঝবো"—গোলাপই জবাব দেয়।

দোকানি একটার পর একটা তাঁতের শাড়ি ফেলতে থাকে। গোলাপ বলে, "বেণুদি, তুমি পছন্দ করে দাও।" লুস্থু আর বেবি সামনের বাঁধানো চত্বরটায় এক্কা-দোক্কা খেলা শুরু করেছে।

"এই জামা নোংরা হবে" বলে তাদের ধমকে বেণু গোলাপকে বলে, "মাকে তুমি যেটা পাঠাবে, মায়ের সেটাই পছন্দ হবে"—

একটা শাড়ি মেলে ধরে গোলাপ জিজ্ঞাসা করে, "এটা বেশ সুন্দর, না ?"

বেণু একবার দেখে বলে, "পাড়ে আবার এই লাইনটা লাগিয়েছে কেন, কী রকম মেড়ো মেড়ো রং, বৌদি দেখো" "দিদি, আর মাড়োয়ারিদের কোনো রং নাই। আমাদের দেশের বাঁধনির মতো রঙচঙা শাড়ি তো কলকাতার সব কলেজের মেয়েরা পরছে।" বেণু জিভ কাটে। টগর দেখে বলে, "হুঁ—উ। এ-রকম পাড় পরার অভ্যেস থাকলে আর খারাপ কি ? পরেন ?" গোলাপ বুঝতে না

পেরে জিজ্ঞাসা করে বসে, "কে ?" থতমত ভাবটা সামলাতে টগর ভুরু কোঁচকায় তারপর খুব স্বাভাবিক স্বরে "মা-আ" বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলে ফেলেই শাড়িটা ছেড়ে দিয়ে হেসে ফেলে, হাত দিয়ে যেন মুখের ওপরের চুল সরায়, "এমন বিচ্ছিরি না !"

ব্যাপারটা বুঝে ফেলার পর বেণু আর অশ্বিনী একসঙ্গেই হেসে ওঠে। তারপর গোলাপ। গোলাপের হাসিটা ততো খোলে না। যাঁর শাড়ি কেনা হচ্ছে তিনি তো একমাত্র গোলাপেরই মা। টগরের নন। টগর তো তাঁকে দেখেই নি।

বেণু পাঁজার ভেতরের একটা শাড়ি আঙুল দিয়ে দেখায়—"এটা দেখ তো।" দোকানি সেটা তুলে ধরতেই বেণু বলে, "বৌদি, দেখ তো"—

টগর দেখে বলে, "বাঃ"—

বেণু বলে, "এইটি নিয়ে নাও"—

টগর আর গোলাপ বসে বসে শাড়ি ধুতি দেখছিল। অশ্বিনী আর বেণু দাঁড়িয়ে ছিল। বেণু শাড়ি ধুতি পছন্দ করায় তেমন অগ্রহ নেয় না। পছন্দ করার খুব একটা ব্যাপার নেই বলে, আর এখন স্নান করে অঞ্জলি দিতে যাবার আগে দোকানে কাপড় চোপড় ঘাঁটা-ঘাঁটি, দরদস্তুরের ভেতর যেতেও মন চাইছে না। শাড়ি পছন্দের সময় বেণু আর টগরই কথা বললো। গোলাপ এখনো বোঝে না, যে-নকশার বেশির ভাগটাই পছন্দের তার ভেতর কোন্ একটা অপছন্দের রঙের লাইন আছে। তবে শিখে যেতে গোলাপের বেশি দিন লাগবে না। গোলাপের পরনের ভারি রঙের শাড়ি তো ইতি-মধ্যেই কোনো একটা কারণে তার শরীরে মানিয়ে যেতে শুরু করেছে —পরার ধরন কি জামার কাট কি চুলের খাঁজের কোনো একটি কারিকুরিতে।

টগর শাড়ি আর ধুতিটা দোকানির দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, "খুব ভালো করে সেলাই করে প্যাকেট করে গালা লাগিয়ে দিন।"

দোকানি খুব চেঁচিয়ে টেনে একটা হাঁক দিতেই কোত্থেকে একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে আসে। বসে বসেই শাড়ি আর ধুতিটাকে ভাঁজ করে ফেলে দোকানি বাচ্চাটার হাতে দিয়ে দেয়।

দাম দেয়ার সময় গোলাপ আর টগরের গোলমাল লেগে যায়। তুজনই শাড়ি আর ধুতি তুটোর দামই দিতে চায়। একান্নটাকা চল্লিশপয়সা শোধ করার জন্য টগর পঞ্চান্নটাকা আর গোলাপ ষাট-টাকা ফেলে দিয়ে দোকানিকে নিজের নিজের টাকা নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। দোকানি মাথায় হাত দিয়ে বলে, "হায় ভগবান, ঠিক আছে তুটো টাকাই থাক্। আপনারা আরো শাড়ি আর ধুতি নিয়ে নেন।"

টগর "এই গোলাপ, আমি বড় আমার কথা থাকবে"—

গোলাপ "এখানে বড় নেই, তুজনে মিলে পাঠাব তো তুমি টাকা দেবে কেন"—

টগর বলে, "আমি ধুতিটার দাম দিচ্ছি, তুই শাড়িটার দে"—

গোলাপ "কেন, বাবাকে অমি দেব না?" বললে মানে দাঁড়ায় যে গোলাপের গর্ভধারিণী আর সম্পর্কে টগরেরও মা যিনি, তাঁর জন্য টগর একটা শাড়ি পাঠাতে চায় না। কিন্তু গোলাপের মতো স্পষ্ট করে তো আর টগর বলতে পারে না, কেন, মাকে আমি দেব না? ফলে সে চুপ করে যায়।

দোকানি বলে, "দিদি, আপনারা হিসেব বুঝেন না। একান্নটাকা চল্লিশপয়সা হয়েছে তো। আপনি দেন পঁচিশ সত্তর, আপনি দেন পঁচিশ সত্তর, ব্যস"—এ-হিসেবটাতে টগর আর গোলাপ তুজনই হেসে ওঠে।

চার

দোকান থেকে উঠেই গোলাপ বলে, "খোকন কোথায়?" সবাই-ই আশেপাশে তাকায়। এক্কাদোক্কা খেলার গুটি ফেলে জামা তুলে

প্যান্টের পেছনে মুছতে মুছতে লুস্থ বলে, "আমি কিন্তু ঐদিকে যেতে দেখেছি"—বলে চৌমাথার দিকটা দেখায়। "দেখেছিস তো বলিস নি কেন," বলে টগর দোকানের বারান্দা থেকে নামতেই অশ্বিনী তাড়াতাড়ি চৌমাথার দিকে হাঁটতে শুরু করে। চৌমাথায় এসেও খোকনকে না পেয়ে অশ্বিনী এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। ওরাও চৌমাথায় এসে গেলে অশ্বিনী "আপনারা এখানে একটু দাঁড়ান, আমি তরকারি বাজারটা দেখে আসি" বলে পথটা পেরয়। "তুমি দাঁড়িয়ে আছ, আর ছেলেটাকে দেখলে না"—গোলাপের সামনে রাস্তাটা যেন জনশূন্য হয়ে যায়—তার গলায় এত অভিমান। হঠাৎ বেবি বলে ওঠে, "ঐ তো খোকন।" তারা যে-দোকানটাতে কাপড় কিনছিল তার সামনেই সিঁড়ির পাশে একটা বুড়ো কী খেলা দেখাচ্ছে। খোকন চেয়ারে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। টগর আর লুস্থ একই সঙ্গে "অশ্বিনী" "খোকন" বলে চেঁচিয়ে ওঠে। মাথা ঘুরিয়ে টগরের হাসিমুখ আর হাত নাড়ায় অশ্বিনী যেন কোনো প্রাচীন মামলায় ফাটক খেটে বেরিয়ে আসে মাথা নিচু করে। তার জন্য একটা গাড়িকে হঠাৎ ব্রেক কষতে হয়।

দোকানির প্যাকেট সেলাইও হয়ে গিয়েছিল। বেণু বলে, "এখন কি আবার পোস্ট অফিস যাবে নাকি ? তাহলে তোমরা এসো, আমি যাই।" টগর—"তোরা এই রাস্তা দিয়ে উঠে যা, অশ্বিনী আর আমি বরং পোস্টাফিসের সামনে দিয়ে যাই," "ঠিকানা তো লেখা হল না" অশ্বিনী মনে করিয়ে দেয়। "ও হরি, তাহলে কি হবে"—টগর। "ঐ দোকানটাতে যান, ওর কাছে লিখবার পেন্সিল আছে নিশ্চয়ই"—

"ঠিকানা তুমি জানো"—

"মনে নেই তো"—

"আমিও তো জানি না—এই গোলাপ" গোলাপ বেণু তখন বাচ্চাদের নিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়েছে—অশ্বিনী গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, পাড়াটার নাম কি, নতুন সেনপাড়া ?" "হ্যাঁ।" বেণু

একবার বলে নেয়—"এ-রাম, জামাই, শ্বশুর বাড়ির ঠিকানা জানে না।

প্যাকেটের দুদিকেই ঠিকানা লেখার পর অশ্বিনী From লিখতে লিখতে জিজ্ঞাসা করে, "ফ্রম কি লিখব।" উত্তর না পেয়ে চোখ তুলে বলে, "গোবিন্দদার নাম?" "চিনতেই পারবে না। তোমার নাম দিয়ে দাও।"

অশ্বিনী বলে, "এতদিন পর আপনি আর ও মিলে একসঙ্গে আপনাদের বাবাকে পুজোয় একটা কাপড় পাঠাবেন, তার মধ্যে আমার নাম দিলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা কী হয়ে যায় না!"

একটু চুপ করে থেকে টগর বলে, "তা কী লিখবে, তোমাকে আর গোলাপকেই তো ওরা চিনবে, চেনে।"

"আরে, আপনাকেও চিনবে।"

"ধ্যুৎ, কেমন লজ্জা করছে!"

"ঠিক আছে আমি লিখে দিচ্ছি।" অশ্বিনী লেখা শুরু করে। টগর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। মাঝে মাঝে দু-আঙুলে জল নিয়ে লিখবার জায়গাটা একটু একটু ভিজিয়ে দিচ্ছিল। দোকানিটাই এ-রকম ভিজিয়ে ভিজিয়ে লেখার কায়দা শিখিয়ে দিয়েছে। অশ্বিনী লিখে দিল—ফ্রম টগর-গোলাপ। কেয়ার অভ, গোবিন্দবাবুর নাম-ঠিকানা।

অশ্বিনী উঠতে উঠতে বলে, "আপনি যে কী না, আপনার নামটাই আপনার বাবা ভুলে গেছেন নাকি! তাহলে গোলাপের নাম গোলাপ রাখতেন?"

"তা অবিশ্যি ঠিক। কিন্তু কেমন লজ্জা করল।" একটু চুপ থেকে টগর খুব নিচু গলায় বলে, "আমার সঙ্গে তো সত্যি কোনো সম্বন্ধ নেই। মানে চেনাপরিচয় নেই, কিছু যদি ভাবেন।" শব্দ না পেয়ে টগর হেসে ফেলে তারপর প্যাকেটটা উল্টো-পাল্টা করতে করতে হাঁটে।

সম্পর্ক তো টগর গড়ে তুলতে পারে, তার নজির বেণু, তার নজির অশ্বিনী। সম্পর্ক তো সে করায়ত্ত করতে পারে। বেণুর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে,—বাইরে থেকে যতই মনে হোক সবটাই টগরের পক্ষে সুবিধেজনকই হয়েছে, বেণু আসার আগে, দু-মেয়ে তখন আরো ছোট, টগর একাই তো দু-হাতে সবদিক সামলেছে, —টগরকে তো দৈনন্দিন সংসার আর ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা থেকে খানিকটা সরে এসে বেণুকে জায়গা করে দিতে হয়েছে। অধিকারের সীমানায় অংশীদার জোটাতে কে-ই-বা চায়, আর অংশীদারকে সইতেই বা পারে কজন। এক বাপের দুই মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও যে-বোনের সঙ্গে এতদিনের পরিচয় ছিল না তাকে প্রথম থেকে আপন করে নিতে তো টগরের দেরি হয় নি। তেমনি দেরি হয়তো হবে না এখন নতুন করে বাবার সঙ্গে যদি পরিচয় হয় বা নিজের সৎমার সঙ্গে। গোলাপের ছেলে খোকনের সঙ্গে টগরের ব্যবহারেও তো কোনো কমতি নেই কিছু, আবার অতিরিক্ত দেখানেপনাও নেই। তবে টগর একটা প্যাকেটের ওপর নিজের নাম লিখতে এত ভাবে কেন, যেন, এত কিছু প্রশ্ন উঠবে জানলে সে কখনোই বলত না, দু-বোন মিলে ওখানে কাপড় পাঠাবার কথা।

আসলে হয়তো কোনো পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য নিজে কোনো উদ্যোগ নিতে টগর পারে না। যে-কোনো তৈরি সম্পর্কের ধারা সে অক্ষুণ্ণ রেখে যেতে পারে। অশ্বিনীর ক্ষেত্রে হয়তো পারিবারিক-ভাবে তৈরি সম্পর্কের নির্দিষ্ট ছাঁচটাই কিছু কিছু বাতিল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কটাকে সে লালন করতে পারে বলেই না একদিন সন্ধ্যায় অশ্বিনীর অমন আচমকা নেচে ফেলায় সে অমন খুশি হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে যায়। আর, অশ্বিনীর কথা সবার থেকেই আলদা। মাথাটা হেলিয়ে অশ্বিনীকে পেছন থেকে দেখে, একটা কিল মেরে টগর বলে, "কে বলবে মাস কয়েক আগে এই কাঠ বাঙাল এসেছিল, মনে আছে, তোমার দাদার সোয়েটার পরিয়ে তোমাকে

মিটিঙে নিয়ে গিয়েছিলাম ?" হাসি সামলাতে প্যাকেটটাই টগর মুখে চাপা দেয়। "মনে আবার থাকবে না, সে তো মাস ছুই-এর ব্যাপার, প্রথম স্যুট বানিয়ে দিলেন" "এখন তোমার তো প্রায় চারটি কমপ্লিট, না ?" "কমপ্লিট চারটি, আর এমনি প্যান্ট আছে, আলগা" "ছুমাসে তুমি কিন্তু একেবারে বদলে গেছ, চেনাই যায় না। এত সুন্দর ফিগার, যা পরবে তাই মানাবে। এখন সস্তায় কাপড় পাবে—একটা ওভার কোট আর মোটা প্যান্ট বানিয়ে নাও, শীতের সময় লাগবে" কার্ডিগানের ওপর দিয়ে আঁচলটা পিঠ ঘিরে টেনে দেয়ায় বাড়ি থেকে বেরনোর পর টগরের, যে একটা শিথিল ভাব ছিল সেটা হঠাৎ বদলে যায়। যেন ঐ প্যাকেটটা নিয়ে তাড়াতাড়ি লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে যাওয়ার উদ্দেশ্য আছে।

পাঁচ

পূজোর জায়গাট রাস্তা থেকে একটু নিচুতে, খানিকটা সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। নিচু থেকে উঠে এলে আগেই দূর থেকে চেখে পড়ে। অশ্বিনী আর টগর দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিল সারাটা মাঠে মানুষ-জনের ভিড়। তারা সিঁড়ির মাথায় আসতেই তলা থেকে মিঃ প্রধান আর মিঃ ভৌমিক একসঙ্গে সংবর্ধনা করেন। মিঃ প্রধান হেসে, মিঃ ভৌমিক বলেন, "আসুন আসুন, এত দেরি হলো যে।" "দেরি আর কোথায়, এই তো এলাম"—নামতে নামতে টগর বলে। মিঃ ভৌমিক বলেন, "মিঃ প্রধান নিশ্চয়ই অশ্বিনীবাবুকে লজ্জা দিয়েছেন।" মিঃ প্রধানের পরনে ধুতিপাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিটা গরম কাপড়ের। গায়ে শাল। পায়ে পাম্পসু। মিঃ ভৌমিকের পরনেও অবিকল তাই, পাঞ্জাবির রংটা বাদ দিয়ে। "মিঃ প্রধানকে তো ধুতিতেই ভালো দেখায়"—টগর বলে।

"ভালো দেখায় না, বলুন মানুষের মতো দেখায়। প্যান্ট-কোট মানেই হচ্ছে আপনাকে কাজ করতে হবে আর কাজ মানেই

অকাজ। আমি তো সেজন্য কোর্টের বাইরে ধুতিপাঞ্জাবি ছাড়া পরতেই পারি না।"—ভৌমিক।

মাঠের ভেতর মাত্র দুটো হেলান দেয়া বেঞ্চ আর কয়েকটি ইতস্তত ছড়ানো চেয়ার, মণ্ডপে তখন অঞ্জলি চলছে। মিঃ প্রধান বলেন, "টগরদি, অঞ্জলি দেবেন না?"

"আমি তো স্নান করে আসি নি"—

"ও একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে নেবেন"—

মিঃ ভৌমিক অশ্বিনীকে বলেন, "আপনিও দিয়ে আসুন"—

"আপনারা দেবেন না?"

"আমরা তো সকাল থেকেই এখানে আছি, প্রথমেই দিয়ে নিয়েছি।"

অশ্বিনী জুতো খোলার জন্য একটা চেয়ারে বসে।

অঞ্জলি দেয়ার জন্য মিঃ প্রধানই পেছন দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গঙ্গাজল জোরে ছিটিয়ে দেন যাতে টগর আর অশ্বিনীর গায়ে পড়ে, তারপর সকলের মাথার ওপর দিয়ে ফুল-বেলপাতা ওদের হাতে দেন। অঞ্জলি দিতে দিতে অশ্বিনী দেখে ঠিক তার সামনের সারিতেই বেণু আর গোলাপ। তাদের সামনে লুসু, বেবি আর খোকন হাঁটু গেড়ে অঞ্জলি দিচ্ছে।

অঞ্জলি দেয়া হয়ে গেলে টগর গোলাপ বেণু অশ্বিনী মণ্ডপের ওখানেই দাঁড়ায়। টগর বলে, "মিঃ প্রধান, পরিচয় করিয়ে দি, এ হচ্ছে গোলাপ, আমার ছোট বোন"—

"মানে অশ্বিনীবাবুর স্ত্রী"—

"আগে তো আমার বোন তারপর তো স্ত্রী"—

"আপনাদের কী আর কোনো পরিচয় আছে নাকি। শুধু কার স্ত্রী এটাই একমাত্র পরিচয়। আচ্ছা নমস্কার। একদিন আসবেন আমাদের ওখানে টগরদির সঙ্গে, অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে।" গোলাপ নমস্কার করার পরই ঘোমটা তুলে দেয়।

"আর এ হচ্ছে আমার ননদ বেণু"—

আগে বেণুকে নমস্কার করে মিঃ প্রধান বলেন, "ওঃ একেবারে নিজের বোন, কর্তার বোন সবাইকেই নিয়ে বেরিয়েছেন।"

এ-ব্যাপারটা আসলে এই প্রথম ধরা পড়ল—সবাই হেসে ওঠে। মিঃ ভৌমিক এগিয়ে আসেন—"এত হাসির কি হলো"—

মিঃ প্রধান বলেন, "না, আমি বলছিলাম, টগরদি একেবারে নিজের বোন আর কর্তার বোন দুজনকেই নিয়ে বেরিয়েছেন"—

টগর আর একবার বেণু আর গোলাপের সঙ্গে মিঃ ভৌমিকের পরিচয় করিয়ে দেয়। মিঃ ভৌমিক বেণুকে দেখিয়ে বলেন, "আপনাকে তো দু-একবার দেখেছি মনে হচ্ছে, আপনি এখানেই থাকেন ?"

"হ্যাঁ, ও তো এখানেই থাকে, গেলবছর পূজোতেও দেখেছেন"—

"মিঃ ভৌমিকের সুন্দর চেহারা খুব মনে থাকে"—মিঃ প্রধান এমন মৃদুস্বরে কথাটা বলে দেন যে সবাই উঁচু গলায় হেসে ওঠে, সবচেয়ে বেশি বেণু।

নিজের বোনের তো একজন সুপাত্র জুটিয়েছেন, কর্তার বোনটির জন্য একটি জোটান"— মিঃ ভৌমিকের মুখ দিয়ে কথাটা বেরনো মাত্র বেণু ঘাড় ঘোরায়, মণ্ডপের সামনে ছোট্ট মাঠটুকু পেরিয়ে পশ্চিমের বিরাট খাদটার ওপারের ধূসর বর্ণের বিরাট পাহাড়টার আগে তার দৃষ্টিটা রাখার মতো কিছু আর জোটে না। অঞ্জলি হয়ে যাবার পর প্রতিমার সামনেও এখন সেই খাদের পরপারের ধূসর পাহাড় ছাড়া কিছু নেই। অশ্বিনী বলে বসে, "পূজোয় প্রসাদট্রসাদ পাওয়া যাবে না ?"

মিঃ প্রধান বলেন, "টগরদি যান না, ঐ ঘর থেকে একটু প্রসাদ এনে ছেলেমেয়েদের হাতে দিন।"

"আমি তো স্নান করি নি, বেণু তুই যা না"—

বেণু শূন্য মন্দিরে ঢুকে যায়। মিঃ ভৌমিক বলেন, "মিউনিসি-

প্যালিটিতে কয়েকটা লোহার রেলিং আছে। ওভারসিয়ারকে তো বলেছি এই কিনারা দিয়ে লাগিয়ে দিতে"—

"আমি ভাবছিলাম পি-ডবলু-ডিতে খোঁজ করব। তো ওদের তো কাউকে পাওয়াও যাবে না। হ্যাঁ রেলিং দিয়ে দেয়া দরকার। সন্ধ্যাবেলায় কাচ্চাবাচ্চারা ছুটোছুটি করে"—

"মিসেস প্রধান আসেন নি?"—টগর জিজ্ঞাসা করে।

"যতক্ষণ পূজো হয়েছে, সেই প্রথম থেকে বসে ছিলেন, পূজো শেষ হয়েছে, অঞ্জলি দিয়ে চলে গেছেন। আবার কাল সকালে আসবেন। মিসেস প্রধানকে দেখলে বোঝা যায় আসলে পূজোটা কি?"—মিঃ ভৌমিক বলেন। মিঃ প্রধান হাতটা উল্টে বলেন, "দিনরাত তো এই নিয়েই আছেন। আর সুনীলবাবুর সঙ্গে সবসময় পরামর্শ"—

"সুনীলবাবু আসেন নি?" অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ, এসে পূজোর সময় সারাক্ষণ বসে ছিলেন। সুনীলবাবুর জন্যই তো পূজোর নাম ছড়িয়েছে। নইলে আজকাল বারোয়ারি পূজোর যে-হাল," বিনয়বাবু বলেন।

রাস্তা থেকে একটা হৈ হৈ শোনা যেতেই সবাই তাকিয়ে দেখে একদল ছেলেমেয়ে রাস্তা দিয়ে প্রায় নাচতে নাচতেই আসছে। বিনয়বাবু দূর থেকেই তাদের হাত নাড়ালেন। "কমিটি মেম্বার যাঁরা আসেন নি এখনো, তাঁদের বাড়িতে প্রসাদ পাঠিয়েছিলাম"—বিনয়বাবু বলেন।

ঐ দলটাও সিঁড়ি দিয়ে নামে, বেণুও মণ্ডপ থেকে ডাকে, "তোমরা প্রসাদ নিয়ে যাও"—

ছয়

রামধনুর সবগুলো রঙে ঝলমলে অতবড় মুখের একটা প্রতিমার পায়ের পাতারও নিচে মৃদু গোলাপি শাড়িতে স্নানসারা বেণুর মুখ-

খানির মাত্র একটি রঙ থেকে অশ্বিনী চোখ সরিয়ে নেয় যেন বাতাসে ভেসে আসা একরাশ ফুলের বনে। দুর্গাপূজার মিটিঙে যে-মেয়েটি স্ন্যাক্‌স্‌ দিচ্ছিল অশ্বিনী তাকে চিনতে পারে। সেদিন মিঃ প্রধানের বাড়িতে যে-মেয়েটির সামনে সে নেচেছিল, তাকে অশ্বিনী খুঁজে পায় না। ধুতিপাঞ্জাবি পরা যুবকটিকে অশ্বিনী চেনে--নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

দলটি ছুটে এসে কলকল করতে করতে মিঃ প্রধান আর বিনয়-বাবুকে ঘিরে ধরে, ফলে টগর আর অশ্বিনীও ঘেরা পড়ে যায়। গোলাপ বাচ্চাদের নিয়ে প্রসাদ আনতে গেছে। সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তারপর সবাই একসঙ্গেই হেসে ওঠে। হঠাৎ একজন জোরে সরু গলায় বলে, "ম্যান্‌আর্স, ম্যান্‌আর্স।" সবাই আচমকা চুপ করে যেতে সামনের যে মেয়েটির চুল মাথার ওপর সোজা খানিকটা উঠে দুদিকে ঝুলে গেছে সে টানা সুরে বলতে থাকে—"সিন্‌হা আন্টি ইজ কামিং উইথ সিন্‌হা আঙ্কল, দে আর অলরেডি হাফ ওয়ে। সরলাদির পিঠের ব্যথা বেড়েছে, এত, নড়তে পারছেন না, সি ফিয়ার্স সি মে নিড হসপিটালাইজেশন, ভিজে গেভ হার এ গুড মাসাজ,"—সবাই মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসে, মেয়েটি একটুও না থেমে বলে যায় "মিঃ এণ্ড মিসেস থাপাস, এক্স-ক্লুসিভ অভ ইচ আদার"—বিনয়বাবু হো হো করে হেসে ওঠেন, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত হাসির যেন বাঁধ ভেঙে যায়। মিঃ প্রধানের কপালের ও মুখের যে-রেখাগুলি তাঁর নিচু হয়ে তাকাবার অভ্যাসে সবসময় গভীর চিন্তার ফল মনে হয়, যতটা বেশি সম্ভব ততটাই হেসে ফেলায়, সেগুলো আর এলোমেলো মনে হয় না, খানিকটা পরিপাটি ঠেকে। টগর আর অশ্বিনী ব্যাপারটা বুঝতেই পারে না। "মিঃ থাপা একজন। মিসেস থাপা আরেকজন। এক্সক্লুসিভ, অভ ইচ আদার্"—মিঃ প্রধানের ব্যাখ্যা শুনে তারাও হেসে ওঠে। অশ্বিনী তবু বুঝতে পারে না। টগর কি পারে? যে-মেয়েটি বলছিল সে

হাসি চাপার প্রাণপণ চেষ্টা করে শেষে "ভ-ভ-ভ-উ-চ্" করে হেসে ফেলে। তারপরই গম্ভীর হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আবার বলতে শুরু করে, "ডক্টর বোস এ্যাণ্ড ডক্টর সেন ওয়ার নট অ্যাভেইল্এব্ল্, দেয়ার বেটার হাভস্ অ্যাসিঅর্ড দেয়ার ফুল প্রেজেন্স ইন দ্য ইভ্নিং, মিঃ ছেত্রি ইজ কামিং, মিসেস লক্ষ্মীদি আন্টি ইজ সরি দ্যাট সি ইজ লেট অর দ্যাট দি পূজা ইজ সো আর্লি অর দ্যাট দ্যার হ্যাজবিন্ হার্লিবার্লি অ্যান্ড কল্ড্ সমীরেন্দ্র এ ডার্লি"—

আবার একটা হাসির ফোয়ারা ছোটে। এবার অশ্বিনী আর টগর বুঝে শুনেই হাসিতে যোগ দেয়। দলটা, যেন প্রাণখুলে হাসার জন্যই, একটু আলগা হয়ে যায়, আর হাসিটা শব্দের তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রঙেরঙ ঢেউ তোলে। সেই হাসির বৃত্তের বাইরে বেণু আর গোলাপ বাচ্চাদের নিয়ে এসে দাঁড়ায়। অশ্বিনীর মনে পড়ে যায় ভদ্রলোকের নাম সমীরেন্দ্র। এবারের পূজোর সেক্রেটারি নাকি কি। সিঁড়ির ওপর থেকে মিঃ সিন্হা বলে ওঠেন, "এ-যে হাসির বন্যা শুরু হয়েছে, কি ব্যাপার!"

হাসতে হাসতে বিনয়বাবু বলেন, "ওঃ মিঃ সিন্হা, আর পাঁচমিনিট আগে এলে যা শুনতেন না! আপনাদের কাছ থেকে ঘুরে এসে কুম্-কুম্ রিপোর্ট করছিল। থাপা এক্সক্লুসিভ" বলে বিনয়বাবু আবার একচোট হাসেন। ছেলেমেয়েদের ভিড় থেকে একজন চেঁচিয়ে ওঠে "বাটা এক্সক্লুসিভ।" আবার একটা হাসি শুরু হয়। বিনয়বাবু বলেন, "তোমার শেষটুকু আর একবার বলো কুমকুম"—

এই ভিড়টা থেকে বেরিয়ে অশ্বিনী বেণু আর গোলাপের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। লুম্বু দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ডাকে "খো-ক-ন।" খোকন সে-ডাক না শুনে কোমরে হাত দিয়ে ছেলেমেয়েদের ভিড়টার পাশে দাঁড়িয়ে দেখে। গোলাপ বলে, "চলো।" "হ্যাঁ চলো।" টগরও এগিয়ে আসে। মিঃ প্রধান জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা সন্ধ্যাবেলায় আসবেন কিন্তু"—

টগর বলে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, এখন চলি"—

মিসেস সিন্‌হা বলেন, "আমরা এলাম, তোমরাও চললে! বসো না, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" টগর বাচ্চাদের দেখিয়ে বলে, "ওরা থাকতে চাইছে না, অনেকক্ষণ বেরিয়েছি।" মিসেস সিনহা মাথা হেলিয়ে বলেন, "আ-চ্ছা, একদিন ওদের নিয়ে আমার এখানে এসো।" টগর বলে "আচ্ছা।" সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে টগর চাপাস্বরে বলে, "থাকেন তো মাথার ওপরে, আর দেখা হয় বছরে দু-একদিন—"

"কেন, ভাড়া নিতে আসেন না?" অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে।

"সে তো ব্যাঙ্ক থেকে পায়"—

"তাড়াতাড়ি চলো, রান্নাবান্না সব পড়ে আছে" বেণু তাড়া দেয়। বেণুর দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী ভাবে, এরপর বেণু কি আর এ-টুকু রঙিন শাড়িও পরবে?

সাত

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় বেণু একটা গভীর সবুজ রঙের শাড়ি, কমলা রঙের পাড়, পরে। অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "কি ব্যাপার, একেবারে খুকি সেজে গেলেন যে!"

"মাঝেমাঝে না-সাজলে আপনারা আবার যদি বুড়ি বানিয়ে দেন। তাছাড়া দাদার সঙ্গে বছরে একদিন বেরচ্ছি—"

গোবিন্দবাবু গরম পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে তৈরি হন। জুতোর সঙ্গে তিনি মোজা পরতে চাইছিলেন, কিন্তু বেণু কিছুতেই দেয় নি। অশ্বিনীর ধুতিপাঞ্জাবি আনা হয় নি, সুতরাং তাকে একটা হাল্কা রঙের কোট-প্যান্টই পরতে হয়। বাচ্চাদের জামা-কাপড় পরিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা সিঁড়ি দিয়ে একবার নিচে নামছে, একবার উঠছে, একবার ভেতরে যাচ্ছে। তৈরি হয়ে অশ্বিনী আর গোবিন্দবাবু বসবার ঘরে বসে ছিলেন। বেণু এসে দাঁড়িয়ে ছিল। গোবিন্দবাবু বলেন, "কীরে বেণু, ওদের দুজনের হলো?"

"বসো না, হচ্ছে, তোমার মতো তো ওদের বছরে একদিন বের হওয়া নয়"—

"তাহলে তো আমারই দেরি হওয়ার কথা"—

বেণু একটু হেসে বলে, "তুমি কোমরে দড়ি বেঁধে নেবে নাকি, অভ্যেস নেই, আবার ধুতি নিয়ে মুশকিলে না পড়"—

গোবিন্দবাবু হাসেন। ভেতরের ঘর থেকে টগর আর গোলাপ বেরিয়ে আসে। "বাঃ বাঃ তোমাদের তো চেনাই যাচ্ছে না"—

"নাও চলো এখন, আর চিনতে হবে না"—

উঠতে উঠতে গোবিন্দবাবু বলেন, "গোলাপ দেখো, আমাকে তোমার ভগ্নীপতির মতো লাগছে তো ঠিক!" গোলাপ তার কুঁচিটা দরজায় দাঁড়িয়ে একবার ঠিক করে বলে, "এতেই চলবে, এখন চলুন"—

গোলাপ একটা ছাপা সিল্ক পরেছে। টগর-ও সিল্ক পরেছে ডিপ কমলা রঙের জমিনে ডিপ সবুজ পাড়। বেণুর শাড়ির পাড় আর জমিনটারই একেবারে উল্টো। ফলে টগরের গায়ের রঙ আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, ঘাড়ের চুলগুলো উড়ছে, মাথার খোঁপাটা একটু উঁচুতে গোল করে বাঁধা। গোলাপের মাথাতেও খোঁপা, চ্যাপটা। সিল্কের পিচ্ছলতায় গোলাপকেও নতুন লাগছে। কিন্তু টগরের অভ্যস্ত ভঙ্গিমা তাকে যে-সাবলীলতা দিয়েছে—গোলাপকে তা দেয় নি। অশ্বিনীর নজরে পড়ে যায় টগরের মতো করেই গোলাপও আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। বেছানো আঁচল টগরের শরীরে লেগে আছে। আঁচলটাকে ঠিক রাখার জন্য গোলাপকে হাতটা বেঁকিয়ে রাখতে হয়। পেছন থেকে অবিশ্যি গোলাপ আর টগরের অত সাধের খোঁপা দুটো ম্লান করে দেয় বেণুর এলোখোঁপা, তার ওপরে ফুলের কুঁড়ির মতো একটা কাঁটা। সাধারণত বেণু শাদা শাড়ি ছাড়া পরে না। আজ উৎসবের দিনে সে একটা সামান্য রঙিন শাড়ি পরে সকালে বিপদে পড়েছিল—বিনয়বাবু তাকে কুমারী ভেবে

নিয়েছেন। কুমারী ভেবে নিলে বেণুর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে সে-ও টগর আর গোলাপের মতো সাজে নি কেন। নাকি বেণুর নিজস্ব একটা মাপ আছে। যে-যাই ভাবুক সেই মাপটাকে সে বদলাতে রাজি নয়। খাওয়ার টেবিলে মাছটুকু না খাওয়া আর সাজগোজের জন্য সচেতন প্রয়াস না পাওয়ার ভেতরই কি বেণুর বৈধব্যটুকু টিঁকে আছে। নাকি বেণু সকালের ঐ ঘটনার পরও, রঙিন শাড়ি পরেও, গোলাপ-টগরের পাশে নিজের নিষ্প্রভতাটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চায়।

"দাদার সঙ্গে রাস্তায় বেরলে মনে হয় আমরাও দার্জিলিঙে সিজ্‌নার্, না বৌদি?"

"বেশি বলিস না। তাহলে আবার মাঝরাস্তা থেকেই ঘুরে বসবে শরীর ভালো নেই বলে"----

"ঐ-কথাটি কখনো বলি না গো। শরীর আমার সবসময় ঠিক। আমি বাইরে বেরবো না, আমার ইচ্ছে, স্বাধীনতা"—

"গুড্ গুড্, আমরা আজ সব দাদার দলে, বৌদির বিরুদ্ধে, জামাই কি বলে?" বেণু বলে।

"ও আবার কি বলবে। আমবা তো একই অপ্রেস্‌ড্ ক্লাসের লোক"—গোবিন্দবাবু টিপ্পনী কাটেন।

লুস্থু প্রথম থেকেই বেণুর হাত ধরে হাঁটছিল। বেবি আর খোকন একবার গোলাপের, একবার টগরের হাত ধরে হাঁটতে গিয়েছে। কিন্তু গোলাপ আর টগর আজ এত সেজেগুজে বেরিয়েছে যে ওদের পক্ষে আর কারো দিকে নজর দেয়া মুশকিল। বেবি খোকনের হাতে ধরা ওদের হাত বারবারই কাঁধে বা বুকে বা ঘাড়ে উঠে যায় দেখে অশ্বিনী ওদের দুজনকে দুহাতে ধরে।

দূর থেকে লাল নীল বাতির জ্বলানেবা আর টিউব বাতির সার দেখে লুস্থু বলে ওঠে, "মা, কী সুন্দর সাজিয়েছে দেখো"—

গোলাপ—"খোকন, সবসময় হাত ধরে থাকবে, সকালে তো কাণ্ডই করেছিলে, ওর হাতটা কিন্তু ছেড়ো না।" টগর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেয় বেবি কোথায়।

পূজোর জায়গায় ঢোকার সিঁড়ির ওপরে রাস্তা থেকেই ভিড়। অনেকে রেলিঙ ধরে বসে আছে। অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। দেখা যায় সামনে পাহাড়ের বাঁকে দু-এক জোড়া আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে।

"গোবিন্দদা, না?"

"হ্যাঁ, আরে মাল্‌হোত্রা! কখন এসেছ"—

"দিস ইজ ফর দি ফার্স্ট টাইম আই এ্যাম মিটিং ইউ আউটসাইড দি ব্যাঙ্ক ইন মাই লাস্ট সিকস মান্‌থ্‌স্‌ স্টে ইন ডারজিলিং" মালহোত্রা হাত বাড়ায়। তার হাতটা চেপে ধরে গোবিন্দবাবু ফিরে বলেন, "অশ্বিনী তোমরা যাও না!" ওরা এগোনো শুরু করলে বেণু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বলে, "দাদাকে কেউ ডাকলে কেমন অবাক লাগে, না!" টগরও একবার পেছন ফিরে দেখে। কোঁচা ছেড়ে দেয়া গোবিন্দবাবু ডানহাতে মালহোত্রার হাত চেপে ধরে বাঁ হাত নাড়িয়ে কিছু বলছেন আর হাসছেন। গেঞ্জি গায়ে যে-হাসিটা বাড়িতে কেমন বুড়োটে দেখায় সেটাই কি এখন রাস্তায় একজন কৃতী পুরুষের আত্মবিশ্বাসী হাসি হয়ে যায়। টগর মুখ ঘুরিয়ে বলে ওঠে, "অশ্বিনীটা খুব গুমরোমুখো কিন্তু। লোকে এত কথা বলে ওকে দেখলেই, ও মুখও খোলে না, হাসেও না"—

চারপাশে তখন লোকের ভিড়। তার ভেতরই খুব আস্তে করে বেণু বলে দেয়—"মুখ খুললেই পাছে সব বুদ্ধি বেবিয়ে যায়!"

গোলাপ "বা বা যে ভিড়, আমার তো ভয়ই করছে!" টগর চাপা স্বরে বলে, "চুপ কর, বাঙালের মতো করিস না।" হাতে টান পড়ায় ফিরে অশ্বিনী দেখে খোকন এক ভদ্রলোকের পেছনে পড়ে গেছে। তাকে বের করে ওরা সিঁড়িতে পা দেয়।

আট

সিঁড়ির গোড়ায় একটু দূরে ভট্‌চায দাঁড়িয়ে ছিল। টগরকে দেখেই এগিয়ে এসে বলে, "টগরদি, আই অ্যাম হিয়ার টু রিসিভ ইউ।" সিঁড়ি থেকে নামার জন্যই বোধহয় টগরের শরীরে একটু দোলা লাগে। "সকালে দেখি নি কেন?"

"আমার সকাল হতে হতে তো মা দুর্গার দুপুর হয়ে যায়। সেজন্য আমি আগেই মা দুর্গার কাছে অ্যাপলজি চেয়ে রেখেছি, আ-ঃ মিঃ সরকার"—ভট্‌চায অশ্বিনীকে জড়িয়ে ধরে—একহাতে বেবি, আর একহাতে খোকন থাকায় অশ্বিনী কিছু করে উঠতে পারে না। বেবি হঠাৎ ঝটকায় অশ্বিনীর মুঠো ছাড়িয়ে নিতেই অশ্বিনী তাকে ধরতে গিয়ে দেখে বেবি দুহাতে বেণুর কব্জি চেপে আছে। টগর তখন পাশের এক ভদ্রলোকর সঙ্গে কথা বলছে—"এবার আর ছুটিতে বাড়ি যাওয়া হয় নি?"

"না। গেলাম না। ভাবলাম, এবার দার্জিলিঙের পূজোটাই দেখি"—

বেণু গোলাপকে বলে, "চলো আমরা ও-দিকে যাই"—

দেখতে দেখতে ওদের পুরো দলটাই ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তার ওপর গোবিন্দবাবু একদলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সিঁড়ির গোড়ায় দুদিকে দুদলে অশ্বিনী আর টগর। বেণু আর গোলাপ ভেতরে।

মণ্ডপের সামনে কিছু বাচ্চা, কিছু বুড়োবুড়ি আর দু-একজন ছাড়া, মাঠটার বাকি অংশ আর ওপরের রাস্তার অনেকটা জুড়ে নানা ছোটখাটো দলে সবাই ছড়িয়ে আছে। দলটা কোনোসময়ই স্থির থাকছে না। একজন চলে যাচ্ছে, আরেকজন আসছে। মণ্ডপের একেবারে সামনে প্রতিমাটিকে দেখলে পূজোর কথা মনে পড়ে। তাছাড়া যে-কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যে-রকম, এখানেও সে-রকমই। পূজোটা উপলক্ষমাত্র হয়ে যায়।

পাশাপাশি আর কেউ পরিচয় করিয়ে দেবার নেই বলেই বোধহয় লক্ষ্মীদি টগরকে ডাকেন—"টগর, এসো পরিচয় করিয়ে দি, আমাদের চিফ এঞ্জিনিয়ারের পুত্রবধূ। ছেলেও ওদিকে আছে। বিয়ের পর দার্জিলিঙে এসেছিল। আমি পূজো দেখার জন্য আটকে রেখেছি।"

টগর ঠোঁটদুটো সরু করে একটা আধা শিষ বাজিয়ে বলে, "ঈ-স্ কী মিষ্টি বউ লক্ষ্মীদি! বর কেমন"—

"ওর মতোই সুন্দর। দেখি আছে কোথাও, তোমাকে দেখিয়ে দেব"--

"খুব ভালো করেছ ভাই। দেখো আমাদের দার্জিলিঙের পূজো। এ-রকম প্লেইনসে কোথাও হয় না"—

"আর যাই দেখান, দয়া করে নিরঞ্জনটা দেখাবেন না!" এক ভদ্রলোক এসে বলেন। যেন খানিকটা অভিমানের সুরেই টগর বলে, "আহা হা আমাদের পাহাড়ি নদীতে জল থাকে না, সেটা তো আর আমাদের দোষ নয়" তারপর লক্ষ্মীদিকে বলে "মিঃ সান্যাল আসেন নি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসেছেন, আছেন কোথাও"—

যে-ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি বলেন, "এবার পূজোয় কোনো কালচারাল প্রোগ্রাম হবে না?" লক্ষ্মীদি বলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নবমীর রাত্রিতে একটা ভেরাইটি প্রোগ্রাম হবে"—

পেছন থেকে একজন ডাকে—"ল-ক্ষ্মী-দি।" লক্ষ্মীদি ঘুরে বলে ওঠেন—"আরে অলোকা। আজ সকালেই আমি তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, অলোকা তো কখনো পূজোতে বাইরে থাকে না"—

ভট্চায এসে পেছন থেকে টগরকে বলে, "টগরদি, একে চিনে রাখুন, বিশ্বাস, যা দারুণ গিটার বাজায় না! যদি পারেন একদিন শুনবেন!"

"একদিন কেন, নবমীর রাত্রিতে তো এখানে ভেরাইটি প্রোগ্রাম আছে, সেদিনই শুনব"—এইমাত্র জানতে পারা খবরটি টগর শুনিয়ে দেয়।

বিশ্বাস বলে ওঠে, "আচ্ছ, আচ্ছা হবে"—

"এই মিঃ সরকার, কোথায় যাচ্ছেন"—

"এই, ছেলেকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে আসি"—

টগর পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, "অশ্বিনী, ওরা কোথায় ?"

"ভেতরে কোথাও আছে, দেখছি"—অশ্বিনী একটা হাত তুলে বলে। সেদিকে তাকিয়ে ভট্‌চায বলে, "থ্যাঙ্কস টু ইউ উই হ্যাভ গট্‌ এ ভেরি রিয়াল ফ্রেণ্ড ইন হিম, ভাগ্যিস আপনি ওকে ইনট্রডিউস করিয়ে দিয়েছিলেন"—

যাক্‌ তাও বললেন, আমি তো ভাবলাম ওকে পেয়ে আমাকে বোধহয় ভুলেই গেলেন"—

"আপনাকে ভুলে গেলে কি আর ওকে পাওয়া যাবে ?"

টগর একটু কৃত্রিম চোখ পাকিয়ে তাকায়।

সকলের মাথার ওপর দিয়ে কে একটা চেয়ার নিয়ে এসে এক কোণায় পেতে দেয়। মিঃ সিংহ বসছেন দেখে টগর এগিয়ে যায়— "আপনার পায়ের ব্যথাটা বেড়েছে নাকি ?"

"না, বাড়ে নি, দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধে হয়, হাঁটতে কোনো অসুবিধে হয় না। গোবিন্দবাবুকে দেখলাম"—

"হ্যাঁ, উনিও এসেছেন !"

"ঐ তো উনি। ভালো আছেন তো গোবিন্দবাবু !"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ভালো ?"

"এই চলছে একরকম"—

"এই যে আসুন," বলে গোবিন্দবাবু এক ভদ্রলোকের হাত ধরে টানেন "মিঃ মৈত্র, আমাদের নতুন অ্যাকাউন্টান্ট"—টগর নমস্কার করে।

মিঃ মৈত্র প্রতিনমস্কার করে বলেন, "গোবিন্দবাবুকে তো বলে বলে হয়রান হয়েছি। আজ বললাম আপনার মিসেস কোথায়, তাঁকেই বলবো। একদিন আমাদের বাড়িতে আসতেই হবে"—

"আমি যে-কোনোদিনই যেতে পারি, কিন্তু আপনার কলিগ কি যাবেন"—

"আপনিই আসুন একদিন, তাহলে উনিও যাবেন!"

পেছন থেকে একজন এসে গোবিন্দবাবুর হাত চেপে ধরে বলেন, "গোবিন্দ দা।"

গোবিন্দবাবু পেছন ফিরে ভদ্রলোককে দেখে হো হো করে হেসে উঠলেন—"আরে রঞ্জন, কতদিন পর দেখা, অ্যাঁ।"

গোবিন্দবাবুর হাসিটা এত জোর হয়েছিল যে সবাই একবার তাকায়। টগর তাড়াতাড়ি নিজের মুখেই রুমাল চাপা দেয়। বাইরে এসে যে-লোক এত জোরে হাসতে পারে, সে দিনরাত ঘরের ভেতর বসে থাকে কী করে—এটা ভাবতেই "টগর" ডাক শুনে পেছন ফিরে টগর যেন হাঁ হয়ে যায়, তারপর ভদ্রমহিলার দুই কাঁধ আলতোভাবে ধরে হাঁ করে আস্তে আস্তে বলে, "ম-নো-র-মা, তুমি কবে এলে!"

"এসেছি তো। দেখো!" বলতেই ভেতরে কাঁসর আর ঢাক বেজে ওঠে আর চারপাশে রব উঠে যায়—"আরতি, আরতি।"

নয়

মণ্ডপের দিকে যাবার একটা তোড় আসে। ফলে নানা ভাগ হয়ে যাঁরা গল্প করছিলেন তাঁদের দল-উপদল ভেঙে যায়। মণ্ডপের দিকে যাবার যারা তারা এর পাশ দিয়ে ওর পেছন দিয়ে প্রায় ছোটা শুরু করলে যাঁরা মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন না, দাঁড়িয়েই ছিলেন, তাঁরা এদিক-ওদিক সরে যান। ফলে দেখতে দেখতে সিঁড়ি থেকে মণ্ডপ পর্যন্ত একটা পথ তৈরি হয়ে যায়। এতক্ষণে রাস্তা

থেকে মণ্ডপ পর্যন্ত দৃশ্যটা যেন একটা অর্থ পায়—যাঁরা মন্দিরে যাবার তাঁরা যেতে পারেন, যাঁরা যাবার নন তাঁরা দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। গোবিন্দবাবু মিঃ সিংহকে বলেন, "আপনি আরতি দেখবেন না!"

"আর ঐ ভিড়ের ভেতর যাব না"—

"কাউকে বললে চেয়ারটা মণ্ডপের কাছে দিয়ে দিত, বলবো?" বলে গোবিন্দবাবু মুখটাও তুলে ফেলেন।

"না, না, এত ভিড়, সকলের অসুবিধা হবে। তার চাইতে এখানেই ভালো, সবার সঙ্গেই দেখা হবে, আপনি যাবেন না?"

"এই তো আছি" বলে গোবিন্দবাবু মন্দিরের দিকে দু-পা এগিয়ে যান। আপাতত তার কোনো সঙ্গী নেই। আসলে এ-জায়গাটা তো মন্দিরের পেছন দিক। সেজন্য আলোটাও অপেক্ষাকৃত কম। দু-চার পা এগিয়ে যেতেই গোবিন্দবাবু একজনকে ধরেন—"কি নিয়োগী, তোমাদের নতুন ব্র্যাঞ্চ এক্সটেনশনের কী হলো হে"—

"আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিল, সে তো আপনি সব জানেনেই,বছর চার আগে"—

"আরে সে সাতপুরনো কথা বাদ দাও, তোমাদের না হেড অফিস থেকে কে মুরুব্বি এসে দেখে গেল!"

"হ্যাঁ, তারপর সে তো তিনটি জায়গা ফিক্স করে মার্কেট সার্ভে কবার জন্য বলেছে, সেটাই চলছে এখন"—ভদ্রলোক থেমে যান। ফলে, হয়তো গোবিন্দবাবু ভাবেন, অন্য ব্যাঙ্কের লোক এর চাইতে বেশি বলতে চায় না বা হয়তো ভদ্রলোক ভাবেন, গোবিন্দবাবু ভাবতে পারেন প্রায় সমস্তরের অফিসার হয়েও গোবিন্দবাবুকে সে চেপে বলছে,—আসলে গোবিন্দবাবু এমনি কথার কথা হিসেবেই তো জিজ্ঞেস করেছেন। হয়তো একটা কথার কথা এ-ভাবে ব্যবসার কথা হয়ে ওঠাকে দুজনই ঢাকতে চায়। তাই নিয়োগী আরো গম্ভীর হয়ে বলে বসে—"আমাদের ব্যাঙ্কের তো জানেন দাদা, শুধু

তো বিজ্‌নেসের দিকে তাকিয়ে ব্র্যাঞ্চ বা এক্সটেনশন প্ল্যানিং হয় না, নানারকম পলিটিক্যাল রিজন্‌স্‌ও থাকে। মনে হলো এ-সব জায়গায় ইনটিরিয়রের দিকে দু-একটা ব্র্যাঞ্চ খুলতে পারে কিন্তু সেটা নট্‌ ফর এনি বিজ্‌নেস রিজন্‌"—

গোবিন্দবাবু একটু হেসে বলেন, "আমি কিন্তু ভাই খুব ওয়াইড এক্সটেনশন প্ল্যানিং-এর কথা খুব জোরের সঙ্গে বলেছি। তুমি বলছ স্টেট ব্যাঙ্ক তো শুধু বিজ্‌নেস রিজন্‌স-এ গাইডেড হয় না। ঠিকই। আমাদের মালিকদের ভেতরও শুনেছি এই নিয়ে ঠাট্টা তামাসা হচ্ছে যে স্টেট ব্যাঙ্ক নাকি উড্‌ প্রুভ ইটসেল্‌ফ্‌ টু বি অ্যানাদার ননসেন্স অভ এ গবমেণ্ট আণ্ডারটেকিং। আই টোট্যালি ডিস্‌এগ্রি। এখন তাই মনে হচ্ছে বটে। আর এখন খুব ইনটিরিয়রে ব্র্যাঞ্চ খুললে তা প্রফিটেবলও হচ্ছে না। কিন্তু দেখো, এরপর এগ্রিকালচারাল সেক্টর থেকেই ব্যাঙ্ক ডিপোজিটের একটা, সে অন্তত, থার্টি পারসেণ্ট পর্যন্ত আসবে। সেটা হার্নেস করার মতো ক্যাপাসিটি আমাদের থাকবে না, মানে প্রাইভেট ব্যাঙ্কদের। তখন দেখবে এখন যে ওয়াইড এক্সটেনশনের প্ল্যান তোমাদের ব্যাঙ্ক করেছে গ্যাট উইল পে ডিভিডেণ্ড।"

"পার্সপেক্‌টিভে অবিশ্যি রুর‍্যাল ডিপোজিটটাই আছে"—মিঃ নিয়োগী যেন একটু খুশিই হোন্‌ যে গোবিন্দবাবু বিষয়টাকে তত্ত্বের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। পায়ের পাতার ওপর যেন একটু উঁচু হয়ে, মুখটা ভাসাতে ভাসাতে, টগর অত ভিড়ের ভেতর খুব তাড়াতাড়ি ভেসে যাচ্ছিল, সে মুখ ঘুরিয়ে বলে যায়, "তুমি এখানেই আছ তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা দেখ না, আমি আছি"—

গোবিন্দবাবু ভিড়ের ওপর দিয়ে চোখটা ফেলে রাখার যত অলস ভঙ্গিই করুন না কেন, তিনি টগরের লম্বা ঘাড়ের দোলা আর স্বচ্ছন্দ গতিটা দেখে ফেলেন। স্ত্রী ফিগার রেখেছেন বা স্ত্রীর ফিগার থেকে গেছে কিনা বা স্বামী বুড়োদের দলেই চলে গেছেন কিনা এমন

সব দরকারি তথ্য তো এমন সমাবেশে না এলে স্বামী-স্ত্রীরা জানতে পারেন না। গোবিন্দবাবু আর টগর কি পরস্পরকে আবার এক বছরের মতো জেনে নিচ্ছেন। আবার সামনের বছরের পূজোতে এসে তারা দেখবে দুজনার কে কত বদলালো।

দশ

অশ্বিনী গোলাপকে খুঁজতে গিয়ে ভেতরে আটকা পড়ে। তারপর আরতির জন্য লোকের ভিড় এত বাড়ে যে অশ্বিনী বেরতে পারে না। অশ্বিনী, গোলাপ আর বেণু একেবারে পেছনে পড়ে গিয়েছিল। তারপরই রেলিং দেয়া। রেলিং-এর আগে আবার ড্রাম শোয়ানো। বেবি আর খোকনকে অশ্বিনী এক-একবার কাঁধে তুলে তুলে দেখায়। লুসুও কিছুই দেখতে পায় না। বেণু একবার উঁচু করে ধরে, কিন্তু সে-ও লজ্জা পায়, বেণুও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। অশ্বিনী গোলাপের হাতে খোকনকে আর বেণুর হাতে বেবিকে ধরিয়ে দিয়ে লুসুকে বলে, "এদিকে এসো।" লুসু লজ্জায় বেণুর কোলে মুখ গোঁজে। "এখানে এসেও বেণুদির কোল ছাড়ছে না"—গোলাপ। অশ্বিনী লুসুকে টেনে নেয়—"আচ্ছা, আচ্ছা বড়দিদি, অত লজ্জা পায় না, দেখো না তোমার পিউমনি মাসিমনিকে শুদ্ধু দেখিয়ে দেব"—অশ্বিনী লুসুকে বেশ উঁচু করে ধরে। প্রথমে লজ্জায় লুসু একটু এঁকেবেঁকে যায় কিন্তু তারপর সোজা হয়েই থাকে—বাইরের সব আলো-রঙের, মানুষের মুখের সারির, নানা দৃশ্যে বুঝি তার লজ্জা ভেসে যায়। লুসু বলে, "পিউমনি, ঐ যে বাবা"—

গোলাপ—"তোর মাকে দেখতে পাচ্ছিস ?"

বেণু—"ওর মাকে আর এখন পাওয়া যাবে না, ফেরার সময় খুঁজে নিলেই হবে"—

বেণু অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করে, "সকালেই বেশ ভালো ছিল, না ? ফাঁকা, কেমন আমাদের পূজো আমাদের পূজো মনে হচ্ছিল"—

"এখনই বা খারাপ কি। এত লোকজন, সবার সঙ্গে সবার দেখাশোনা, আমার তো বেশ মজাই লাগছে"—অশ্বিনী।

"আহা-হা, এইটুকু জায়গাতে এত ভিড়, প্রতিমার মুখটাই দেখা যাচ্ছে না, আরতি দেখা যাচ্ছে না"—গোলাপ বলে।

"আসলে তোমরা তো সব বেঁটে তাই কিছুই দেখতে পাচ্ছ না!" অশ্বিনী লুস্থুকে নামিয়ে দেয়। মাটিতে নেমেই লুস্থু বলে, "মেসো, এবার পিউমনিকে দেখাও"—

কেউ কোনো জবাব দিল না দেখে লুস্থু আবার বলে, "মেসো, পিউমনিকে দেখাও না।" যেন সেই মুহূর্তে লুস্থুর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সেটাই। "মেসো, দেখাবে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখাব, দেখাব"—

ঢাকে কাঠির খুব চাপা আওয়াজ পড়ে গুর্ র্ র্ র্ র্। অশ্বিনী বলে, "আরতি শুরু হলো।" লুস্থু বেবি আর খোকন তিনজনই একসঙ্গে বলে ওঠে, "আরতি দেখব আরতি দেখব।" বেণু আরতির বাজনা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠে একবার পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে গলা বাড়ায়, তারপর হঠাৎ পেছনে তাকায়, হঠাৎ-ই কপাল থেকে চুল সরায়, তারপর পেছন ফিরে অশ্বিনীকে বলে বসে— "আরতি দেওয়ার জন্য এই লোকটিকে টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছে জানেন", কথাটার মাঝখানে বেণু এমন আচমকা নিশ্বাস ফেলে দেয় ও নিয়ে নেয় যেন হাঁফ ধরেছে, "সেজন্যই তো এত ভিড়।" গোলাপ খোকনকে, বেণু বেবিকে, আর অশ্বিনী লুস্থুকে তুলে ধরে। ঢাকের গুর্ র্ র্ র্ বাজনাটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। এখন খুব ঢিমে তালে বাজনা চলছে। লুস্থু বলে, "ঈস পিউমনি, ধুনুচি নিয়ে দাঁড়াচ্ছে আবার বসছে আবার দাঁড়াচ্ছে"—

বেবি বলে, "না দাঁড়াচ্ছে না, বসে আছে"—

লুস্থু—"হ্যাঁ ও বেশি জানে, দেখছিস না দাঁড়াচ্ছে আবার এই এই বসলো"—

খোকন—"মা, কে দাঁড়াচ্ছে"—

গোলাপ—"আমি তো আর দেখতে পাচ্ছি না, তুমি দেখ কে দাঁড়াচ্ছে"—

খোকন—"মা, আগুন নিয়ে উঠেছে"—

গোলাপ—"হ্যাঁ ভালো করে দেখ"—

লুম্বু—"জানো পিউমনি তুই হাতে চারটে ধুনুচি।"

কোলে বেবি আর খোকনের ভার নিয়েও গোলাপ আর বেণু প্রতিমার উজ্জ্বল বিশাল চওড়া পানপাতার মতো মুখটা যে-ধোঁয়ায় আড়াল হয়ে যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ওটুকু ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এদিকে ঢাকের বাজনা ধীরেই চলছে বটে তবে মাঝেমাঝে কাঠি জোরে পড়ছে। ঢাকটা যখন খুব খাদে গুর গুর-র-র-র-র করে বাজছে তখন বোঝা যায় সবাই যেন নিশ্বাস বন্ধ করে আছে—এত চুপচাপ বুকের ভেতরটাও গুর গুর গুর র-র-র করতে থাকে। আর তারপরই খুব উঁচুতে দু-তিনবার শব্দ উঠছে। যে আরতি দিচ্ছে সে নিশ্চয়ই এই তালেতালে তার সারাটা শরীর কাঁপাচ্ছে আর পা ফেলছে। পেছন দিক থেকে সেই আরতির ভঙ্গিটাই তো চোখে ভাসে, লোকটির চেহারা তো তুচ্ছ হয়ে যায়। ঢাকের বাজনা খুব চাপায় খুব দ্রুত হতে থাকলে বেবিকে হঠাৎ নামিয়ে দিয়ে বেণু বলে ওঠে—"আরে, আরতিটা দেখাই হবে না নাকি?" পেছনে বেণু যেন জায়গা খোঁজে, কোথা থেকে আরতিটা দেখা যায়! বেবিকে নামিয়ে দিয়ে বেণুর চকিতে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আর ঘাড় ঘোরানোর ত্বরিত ভঙ্গিতে আর সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে চাদরটা একটু গড়িয়ে নামায় চাদরটা কাঁধে ঠেলে দেয়ার অন্যমনস্ক অভ্যাসে বেণু যেন অশ্বিনীর চোখে এমন কম-বয়সে চলে যায়, যখন চলা-বলায় অনেক ভঙ্গি থাকে। বেণুকে একটু দেখে নিয়ে অশ্বিনী বলে, "শুনুন, আপনারা দুজন এই ড্রামটার ওপর দাঁড়ান, আমার কাঁধ ধরুন, দিব্বি দেখতে পাবেন।" বেবি আর খোকন বলে ওঠে—"আমরা দেখব,

আমরা দেখব” লুসুকে নামিয়ে দিতে দিতে অশ্বিনী বলে, “লুসু, তুমি একটু দাঁড়াও, পিউমনি আর মাসিকে একটু দেখাই, তুমি তো বড় আবার তোমাকে পরে দেখাচ্ছি।”

অশ্বিনী হাত দিয়ে নাড়িয়ে পরখ করে ড্রামটা শক্তভাবে বাঁধা আছে কিনা। সিমেন্টের থামের সঙ্গে লম্বালম্বি তিনটি শিক গেঁথে দেয়া বেড়া তো আগেই ছিল। তার গায়ে হেলানো বড় বড় লোহার গ্রিল বেঁধে দেয়া। তার সামনে লোহার ড্রাম। অশ্বিনী গোলাপকে বলে, “নাও ওঠো” তারপর গোলাপের একহাত ধরে। গোলাপ এক পা ড্রামের ওপর দিয়ে আর একটা হাত লোহার গ্রিলের দিকে বাড়িয়ে দিলে অশ্বিনী বলে ওঠে—“না, না, না, আমার কাঁধ ধরো, এ-দিকে ঝুঁকে থাকো।”

“ধ্যুৎ, পারব না” বলে গোলাপ একটা পা নামিয়ে নিলে বেণু বলে ওঠে—“আমি তো পারি, তুমি পারো কি না দেখো গে।” ডান হাত দিয়ে অশ্বিনীর বাঁ কনুইটা চেপে ধরে, অশ্বিনীও বেণুর কনুইটা চেপে ধরে। প্রায় এক ঝোঁকে ড্রামের ওপর উঠে একটু টলে যেতেই বেণু অশ্বিনীর কনুই থেকে হাত ছাড়িয়ে তার কাঁধটায় আঙুলের ভর দেয়। বেণুর দেখাদেখি গোলাপও আর একটা পা তোলে, বেণু তাকে ধরে বলে, “দাঁড়াও দাঁড়াও”—অশ্বিনীর কাঁধে হাতের ভর রেখে খানিকটা নিচু হয়ে, গোলাপও দাঁড়িয়ে যায়।

অশ্বিনীর এক পা বেবি, আর এক পা খোকন চেপে ধরে—“আমরা দেখব, আমরা দেখব।”

অশ্বিনী বলে, “লুসু, একটা কাজ করতে পারবে? ওদের দুজনকে আমার কোলে তুলে দাও তারপর তুমি ঠেলেঠুলে সামনে চলে যাও।”

“এত ভিড়, কেউ যেতে দেবে না।”

“সবাই যেতে দেবে, তুমি একটু এগোও, যেখানে দেখবে দেখা যাচ্ছে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়বে কিন্তু আর কোথাও নড়বে না।”

বেণু ওপর থেকে বলে, "যা না লুম্বু, সামনে চলে যা, খুব ভালো দেখতে পাবি।"

লুম্বু খোকনকে তুলে অশ্বিনীর ডান কোলে দেয়, বেবিকে তুলে বাঁ কোলে, তারপর নিজে এগিয়ে যায়।

বেণু হঠাৎ চাপা স্বরে হেসে ওঠে—"গোলাপদি, জামাইয়ের অবস্থা দেখ, মাথার ওপর আমরা দুইজন, কাঁধের ওপর ওরা দু-জন," গোলাপও হেসে ফেলে।

এগার

ততক্ষণে ঢাকের বাজনা দ্রুততর, এত জোরে, মনে হয় বুকের ভেতর থেকে শব্দটা উঠছে। চারটি ধুনুচি নিয়ে আরতি দিয়ে চলেছেন। এখনো গতিটা বাড়ে নি, চারটি ধুনুচি নিয়ে প্রধানত আবর্তন চলছে, কিন্তু গতি ধীরে ধীরে বাড়ছে—ধুনুচি নিয়ে আবর্তনের গতিই বাড়ছে। হঠাৎ ঢাকের আওয়াজের একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নর্তক থেমে গিয়ে চারটি ধুনুচিসহ নিজের সারা শরীর কাঁপাতে থাকেন, কাঁপাতে কাঁপাতে ধীরে ধীরে এঁকে বেঁকে নিচু হয়ে যেতে থাকেন, যেন ভেঙে পড়ছেন। ঢাকের বাজনা ছন্দ ছেড়ে দিয়ে একটানা গুর-র্-র্-র্-র্-র্-র বাজতে থাকে, আর সেই একটানা বাজনাও ধীরে ধীরে আরো নেমে একটা নিম্নতম খাদে পড়ে গিয়ে বাজতেই থাকে, গভীর রাতে ঘুমের ভেতর শুনতে পাওয়া কোনো দূর ঝর্ণার জলধ্বনির মতো। চারপাশে যেন নিশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায়। সকলের চোখের আড়ালে প্রতিমার পায়ের কাছে ভেঙে পড়া আরতিকারের কিছু একটা যেন ঘটছে—সেটা সবাই প্রতিমার বিশাল মুখখানার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চায়। এতগুলো মানুষ আর প্রতিমার মাঝখানে যে মানুষটি এতক্ষণ ছিল সে আর না থাকায় প্রতিমার মুখটি যেন নতুন ব্যঞ্জনা পাচ্ছে। অশ্বিনীর কাঁধের ওপর বেণুর আঙুলগুলি বাঁকা হয়ে বসে

আবার সেই গুর্ র্ র্ র্ ধ্বনিটা একটু একটু উচ্চতর গ্রামে উঠতে থাকে। সেই উচ্চতর গ্রামের সঙ্গতি রেখে ধোঁয়ার রাশি প্রতিমার মুখকে আচ্ছাদন করতে থাকে। উচ্চতম একটা স্বরে এসে সেই গুর গুর ধ্বনিটা বাজতেই থাকে। আর সেই বাজনার রেখা ধরে ধরেই একজায়গায় পাশাপাশি দুটো ধুনুচি উঠে আসতে থাকে, আসতেই থাকে। সেই দুটো ধুনুচি সম্পূর্ণ উঠে আসার আগেই বাঁ পাশে আর ডানপাশে আরো দুটো ধুনুচির মাথা দেখা যায়। বাজনাটা আরো আরো প্রবল হলে, আরতিকারের হাঁটু মাটি ছাড়ে, তখন তার দুহাতে দুটো করে মোট চারটে ধুনুচি দেখা যায়। ঠোঁট-দাঁত দিয়ে চেপা দুটো আর দু-হাতে দুটো করে চারটে মোট ছটি ধুনুচি নিয়ে আরতিকার যখন সম্পূর্ণ উঠে দাঁড়ায় তখন দশহাতে দশ অস্ত্র নেয়া যে-প্রতিমাটির হাঁটুর সমানও তাকে দেখাচ্ছে না সেই প্রতিমাটি প্রায় সম্পূর্ণই ধোঁয়ার আড়ালে চলে যায়। আর ছয় ধুনুচির মালায় নর্তক নিজেই যেন প্রতিমা হয়ে ওঠে।

"ঈস, আপনি দেখতে পাচ্ছেন ?" ফিসফিস করে বেণু শুধোয়। গোলাপ হাতের ভর বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, "দেখতে পাচ্ছ তো ?" অশ্বিনী শুধু 'হুঁ' বলে। আরতিকারের ঘাড়টা প্রায় সমকোণে পেছন দিকে বাঁকানো—ঠোঁটের ধুনুচি দুটো রাখার জন্য। সে এদিক-ওদিক তাকাতে বা হাতে-ধরা তার চার-চারটে ধুনুচি দেখতেও পারছে না। সেই অবস্থায়, নিজের দুই হাত দুই দিকে সম্পূর্ণ প্রসারিত করে দিয়ে আরতিকার বাঁদিকে ফেরে—তার পায়ে ঢাকের বাজনার তালে তালে বোল ওঠে আর ধুনুচিগুলো থেকে ধোঁয়াও সেই তালে তালে বেরিয়ে যেন নকশা তৈরি করে। ঢাকের বাজনা দ্রুত হয়, আরতি-কারের নাচও দ্রুত হয়। তারপর একসময় ঢাকের বাজনা হঠাৎ থিতিয়ে যায়। আরতিকার দাঁড়িয়ে পড়ে কাঁপতে থাকে। দুটি ছেলে এসে তাঁর দুই কাঁধের ওপর মোটা তারের বড় গোল চাকতির মতো দুটো লাগিয়ে দিয়ে যায়। তারপর দুদিকে দুটো করে ধুনুচি

সেই চাকতির ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। তারপর আর একটা মাটির মালসা মতো এনে কপালের ওপর বসিয়ে দেয়। আরতিকার মোট এগারোটা ধুনুচি নিয়ে মিনিট খানেক বোধ হয় সামলে নেয়। তারপর ঢাকের বাজনাটা আবার সেই গুর গুর ধ্বনিতে ফিরে যায়। এবার একবারেই উচ্চ গ্রামে। আর সারা শরীরে ধুনুচি নিয়ে আরতিকার ধীরে ধীরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরতে শুরু করেন। একটা খুব চাপা রব ওঠে "সরে যাও সরে যাও।" একটু ধাক্কার ঢেউ পেছন পর্যন্ত বয়ে এলো। লাগলো। অশ্বিনী একটু পেছনে হেলতেই গোলাপ আর বেণু দুজনই অশ্বিনীর কাঁধ চেপে ধরে। বেণু বলে, লুস্তুটা আবার এগিয়ে গেল।"

"কিছু হবে না, কত তো বাচ্চা আছে"—অশ্বিনী।

ততক্ষণে আরতিকারের ঘূর্ণনে বেগ আসছে একটু একটু করে। দেখতে দেখতে ধুনুচির ধোঁয়া আরতিকার আর প্রতিমাকে ঘিরে একটা বলয়ের সৃষ্টি করে। পরিষ্কার ধোঁয়ার বলয়ের ভেতর আরতিকার আর প্রতিমা। আর সেই ধোঁয়ার বলয়টাও যেন তীব্র বেগে ঘুরছে, ধীরে ধীরে ঢাকের শব্দ এমন জায়গায় ওঠে মনে হয় চার পাশের সবগুলো পাহাড় যেন একসঙ্গে ভেঙে পড়ছে। আরতিকারকে আর দেখা যাচ্ছে না। এগারোটা ধুনুচি আর ধোঁয়ার একটা মূর্তি যেন প্রতিমার সামনে চক্রাকারে ঘুরেই চলেছে। লোকটির ঘাড়টা সমকোণে বাঁকানো, হাতদুটো শরীর থেকে সমকোণে ছড়ানো, বোধ হয় শরীরের ভার সামলাতে পা দুটো দুপাশে ছড়ানো, শরীরের উর্ধাংশটা কোমর থেকে ক্রমেই সমকোণে পেছন দিকে বেঁকে যাচ্ছে। ঐ-রকম একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত ভঙ্গিতে লোকটি যখন ঘুরতে থাকে, সে ঘূর্ণনের বেগ যখন ক্রমাগত বাড়তে থাকে, প্রায় একটা চক্র হয়ে ওঠে, তখন আবার, সেই ঘূর্ণনের মধ্যেই সে আবার সেই খিলান-ভঙ্গি থেকে শরীরটাকে সোজা করে তোলে, আবার নামায়। যেন মানুষের শরীরটা একটা জীবন্ত ঢেউ হয়ে প্রতিমার পায়ের তলায়

এসে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে। ঢাকের বাজনাটা ক্রমাগত দ্রুত আর উঁচু হতে থাকে। লোকটার ঘূর্ণনও বাড়তে থাকে, ঘন হতে থাকে পেছন দিকে বাঁকানো তার শরীরের ওঠা আর পড়া। তারপর সমস্ত অবস্থাটা প্রায় একটা অবিশ্বাস্য স্তরে চলে যায়। মণ্ডপময় ধোঁয়া আর প্রতিটি মানুষের কানে আর সারা শরীরে ঢাকের বুক ফাটানো উন্মাদ বাজনা, একটা কিছু হয়ে যাবে—যে-কোনো মুহূর্তে। তখন, সেই মুহূর্তটিতে, সারাটি শরীরে এগারোটা ধুনুচির মালা সাজিয়ে যে-মানুষটি গত আধঘণ্টা ধরে নিজের শারীরিক সত্তাটাকে সম্পূর্ণ অবান্তর করে তুলেছে, যাকে মানুষ মনে করার কোনো কারণই প্রায় নেই, যখন বলি দেয়ার পাঁঠার শরীরটা যেমন জান্তব আবেগে দাপায় তেমনি করে কোনো জান্তব আবেগে ঐ আরতিকারের শরীরটা দাপাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে, ঢাকের একটা চরম আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই আরতিকার এগারোটি ধুনুচি চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলে দু-হাত দু-পা ছড়িয়ে মাটির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে যায়—নিজেকে একটা তরতাজা মানুষ প্রমাণ করার তাগিদেই, মানুষ ছাড়া আর কিছু নয় প্রমাণ করার নেহাত কোন্ মানবিক তাগিদেই যেন।

আরতি শেষ হয়ে যায়।

বারো

পেছন থেকে গোলাপ আর বেণু নামলে অশ্বিনী বেবি আর খোকনকে তাদের কাছে দিয়ে বলে, "আপনারা দাঁড়ান, আমি লুস্তুকে নিয়ে আসি।"

সবাই তখন মাঠ থেকে বেরুচ্ছে। আরতিকারকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন অষ্টমীর দিন হলে ভালো হতো, সপ্তমীর দিন সবাই আসে না তো। কারো কারো মতে সবাই-ই এসেছেন। কারো কারো মতে যেদিন আরতি সেদিনই পুজো জমে, অন্যদিন কিছু না।

লুসু ভিড় ঠেলে এদিকেই আসছিল, অশ্বিনী তাকে খপ করে ধরে ফেলে। বেণু-গোলাপ আর অশ্বিনীও বাচ্চাদের নিয়ে বেরবার দিকে একটু একটু এগোয়। একটু এগোতেই গোবিন্দবাবু আর টগর, একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে। দেখেই লুসু গিয়ে জড়িয়ে ধরে—"মা, দেখেছ, কি সুন্দর না?"

অশ্বিনী গোবিন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করে, "গোবিন্দদা দেখেছেন?"

"হ্যাঁ দেখেছি, বেশ করে কিন্তু। এই আরতিটা আসার পর থেকে এই পুজোর আট্র্যাকশনটাও বেড়ে গেছে, আজই যে আরতি, তা তো জানতাম না, তোমরা তো বলো নি কিছু।"

"আমি তো জানতাম না, টগরদি—"

"জানতাম, বলতে ভুলে গিয়েছি"—অশ্বিনীর সন্দেহ হয় টগর ঠিক কথা বলছে না। বেণু বলে, "দাদা, তোমরা তো আর একটা আরতি দেখই নি?"

"কি রে—"

"গোলাপদি আর আমি জামাইয়ের দুই ঘাড়ে—"

"যাঃ! সত্যি! কোথায়?" টগর হেসে ওঠে।

"হ্যাঁ মা সত্যি, মেসো-ই তো সবাইকে দেখালো, নইলে আমরা দেখতেই পেতাম না, আমি অবিশ্যি সামনে চলে গিয়েছিলাম।"

"থাম তো" বেণু বলে, "শোন না, গোলাপদি আর আমি জামাই-যের দুই ঘাড়ে আর খোকন আর বেবি দুই কোলে—যা কাণ্ড না!"

"অশ্বিনী, সত্যি ওরা তোমার ঘাড় মট্‌কেছে!" গোবিন্দবাবু বলেন।

দুদিক থেকেই ভিড়ের চাপ আসছিল, ওরা পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলছিল।

গোলাপ বলে "না, না, পেছনে একটা ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে-ছিলাম, ওঁর কাঁধটা আমরা ধরেছিলাম।"

রাস্তায় পড়তেই হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগে। এতক্ষণে

ভিড়ের চাপে বোঝা যায় নি, ঠাণ্ডা পড়েছে। পেছন থেকে ভট্চায এসে যায় "আরে আমি এদের খুঁজে বেড়াচ্ছি আর এরা চলে যাচ্ছে। মিঃ সরকার, মিঃ প্রধানের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন ?"

"না-তো, কেন ?"

"উনি আপনার খোঁজ করছিলেন, আমি অবিশ্যি বলেছি বাড়ির লোকজন নিয়ে এসেছেন। আমি আপনাকে খুঁজে পেলাম না। ঠিক আছে, কাল আসছেন তো—।"

"না, কাল তো আমাকে একটু বাগানে যেতেই হবে। যেখানে থাকি সেখানে একটু যাব না ? কাল বাবুদের থিয়েটারও আছে, বারবার বলে দিয়েছেন।"

"কাল কখন যাবেন ?"

"এই বিকেলের দিকে।"

"পরশু তো দেখা হচ্ছে তাহলে !"

"হ্যাঁ, পরশু নিশ্চয় !"

"পরশু তো এখানেও ভেরাইটি প্রোগ্রাম—বাইরে থেকে আর্টিস্ট আসবে—" শোনা খবরের ওপর টগর রঙ চড়িয়ে দেয়।

"অলরাইট, তাহলে চলি।"—ভট্চায।

"আচ্ছা, আচ্ছা।"

"এভরিবডি, নাইট, নাইট।"—ভট্চায দুহাত নাড়াতে নাড়াতে দু-পা পেছু হাঁটে।

"নাইট।"

ভট্চায চলে গেলে গোবিন্দবাবু বলেন, "বাবা, অশ্বিনীর তো খুব খাতির হয়েছে দার্জিলিঙে।"

টগর—"অশ্বিনীর খাতির আর দেখলে কোথায়। মিঃ প্রধানের ওখানে গেলে বুঝতে।"

গোলাপ বলে, "ওর আবার খাতির কিসের। দিদিকে সবাই চেনে, দিদির খাতিরেই সবাই ওকে চেনে।"

যেন তারিফ দেয় এমন ভঙ্গিতে অশ্বিনী স্মিতমুখে গোলাপের দিকে তাকায়। গোলাপ এমন অবহেলা ভরে কথা বলতে শুরু করল কবে?

"ঐ আনন্দেই থাকো। আসলে অশ্বিনী আসার আগে তোমার দিদিকে কেউ চিনতই না।"—গোবিন্দবাবু।"

"আ-হা-হা-হা"—গোলাপ।

অশ্বিনীর হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়—"আচ্ছা টগরদি, সেই মিঃ পেটালিকর নাকি প্যাটেলকর, ওঁকে তো দেখছি না! ওঁর স্ত্রীর চেহারাটা কী রকম দুর্গা প্রতিমার মতো!"

কেমন একটা হেচঁকির মতো আওয়াজ তুলে টগর বলে ওঠে, "ওঃ পেটালিকার! পেটালিকারের কারখানা থেকে খবর এসেছিল তাই চলে গেছে।" অশ্বিনীর এটাও বিশ্বাস হয় না। টগর আজ এত মিথ্যে কথা বলছে কেন।

"তুমি কাল কখন বাগানে যাবে?"—গোলাপ।

"সন্ধ্যা নাগাদ"—

"রাত্রিতে ফিরবে তো?"

"তুমি থাকবে এখানে, না ফিরলে ও ওখানে থাকবে কোথায়, খাবে কি?"—গোবিন্দবাবু।

"না, অত রাত্রিতে ফিরবে কি করে?"

"দেখি, যদি একটা গাড়ি পাই তাহলে তো মিটেই গেল, নইলে বাগানের গাড়িতেই ফিরব। বলা আছে।"

উৎসবের একটা সংক্রমণ আছে। সেই সংক্রমণে সিল্কের শাড়ি না-পরলেও বেণুর বৈধব্যের খোলস ভেঙে যায়, সে প্রায় নাচতে-নাচতে অশ্বিনীর ঘাড়ে হাতের ভর রেখে আরতি দেখে। কমলা রঙের শাড়িতে ছবির মতো সেজে এ-কথায় সে-কথায় অনর্গল মিথ্যে বলে-বলে টগর বিছানায় যাওয়ার আগে বাইরের ঘরে অশ্বিনীকে একা

পেয়ে প্রায় ফিস ফিস করে বলে বসে, "ভট্‌চায ডাকছিল কেন, আজও গেলাস চালাবার কথা ছিল নাকি?" অশ্বিনী "ধ্যেৎ" বললেও টগরকে ত্বরিতে অশ্বিনীর দুই গাল টিপে ধরে "তুমি আসল বদ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না, না?" বলতে হয়, তার আঁচলটা খানিক খসে গেলেও। আজ রাতে আরো কিছুক্ষণ পরে, অনেকদিন পর দেখা টগরের ঘাড়ে আর কোমরে গোবিন্দবাবু হাত দেবেন জেনেই কি টগরকে এই মিথ্যেটুকু অভিনয় করতে হয়, গোবিন্দবাবুর সঙ্গে শোয়াটাতেও একটু মিথ্যা মেশাতে। অশ্বিনীর দুই ঘাড়ে নিজের সাঁড়াশির মতো আঙুল বিঁধিয়েই গোলাপ ক্ষান্তি দেয় না, তারপরই দাঁত লাগায়—অশ্বিনীর শরীরটাকে শরীর দিয়ে মেরে মেরে বুঝে নেয়ার এত কি জ্বালা গোলাপের। এত বড় রাত্রি আর এত গোটা একটা শরীর নিয়ে বেণুরই যেন কিছু করার থাকে না।

উৎসবে মানুষ মানুষের কাছে আসে। উৎসবে মানুষ থেকে মানুষ দূরে যায়।

উৎসবে নিজের থেকে মানুষ দূরে যায়।

তের

গোটা চারেকের সময় নিচে হর্ন আর তারপরেই কড়া নাড়ার শব্দ। অশ্বিনী দরজা খুলে দেখে ভট্‌চায। "ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একটু বাগানের পূজো দেখে আসি, আপনারও সুবিধে হবে, তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন।" টগর ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভট্‌চায টগরকেও বলে, "চলুন না টগরদি, বাগানের পূজো দেখে আসি"—

"চলুন, আমার আর আপত্তি কি। কি অশ্বিনী, তোমার গিন্নিও যাবে নাকি?"

"জিজ্ঞেস করুন। কাল তো কিছু বলে নি"—অশ্বিনীর কথা শুনে টগর ভেতরে যায়।

"আমার দায় পড়েছে বাগানে যাওয়ার। আমরা এখানেই ঘুরব। দিদি যাচ্ছে যাক। দিদিকে একটু আমাদের কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দিও"—বলতে বলতে গোলাপ এ-ঘরে ঢুকে ভট্‌চাযকে দেখেই ফিরে যায়। অশ্বিনী হেসে বলে, "বসুন, আমি তৈরি হয়ে আসছি"—

একা একা বসে ভট্‌চায ঘরের চারপাশটা একবার দেখে। হাত বাড়িয়ে কী একটা নিতে গিয়েও হাতটা গুটিয়ে নেয়। বাঁ হাতের পাঞ্জার ভেতর ডানহাত ভরে। আবার খোলে। কোটের পকেট থেকে সিগারেট দিয়াশালাই বের করে। কী মনে করে আবার ঢুকিয়ে রাখে। বেণু এসে এককাপ চা দিয়ে বলে যায়, "ওঁরা এখুনি আসছেন।" চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভট্‌চায শুনতে পায় ভেতরের ঘরে চাপাস্বরে কথা হচ্ছে এবং চাপাস্বরে হাসি। ভট্‌চাযও ঠোঁটে হাসি নিয়ে চায়ের কাপে ঠোঁট দেয়।

ভট্‌চাযের চা শেষ হওয়ার আগেই অশ্বিনী এসে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে থাকে, বসে না। চায়ের কাপটা নামিয়ে ভট্‌চায বলে ওঠে, "আপনার ফিগারটা এত ভালো যে দর্জিরা পেলে আপনাকে বিনিপয়সায় স্যুট বানিয়ে দেবে, শুধু এ্যাড্‌ভারটাইজমেন্টের জন্য।" অশ্বিনী মৃদু হাসে। কিন্তু সেই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথমে টগর, তারপর গোলাপ আর বেণু ঢোকে। টগরের দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী একটু হাসে আর ভট্‌চায প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠে বলে, "চলুন।" ঘরের পর্দার দুদিকে গোলাপ আর বেণু অগোছালো মুখ বের করে থাকে আর টগর কাঁধের ওপর আলগা চাদর ছড়াতে ছড়াতে দরজার দিক এগিয়ে যায়।

"মা, আমি বাবার সঙ্গে যাব"—খোকন বলে।

"ধ্যুৎ, বাগানে গিয়ে কি করবি?"

"বাগানে দাজু আছে—"

"আচ্ছা, এখন আর দাজুর কাছে যেতে হবে না।" গোলাপ খোকনকে কোলে লেপ্‌টে রাখে। ওরা নেমে যায়।

সামনের সিটেই তিনজন বসে। ভট্‌চায তো চালাচ্ছেই। টগর বলে, "যাক, ভট্‌চাযের গাড়িটার দৌলতে একটু ঘোরা যাচ্ছে"—

"ভট্‌চাযের গাড়ির দৌলতে বলবেন না, বলুন মিঃ সরকারের দৌলতে। ওঁকে বাগানে যেতেই হতো, আমার গাড়ি না হলে অন্য গাড়ি জুটতো। আমি ওর সঙ্গ ধরলাম" —শহর পেরতেই ভট্‌চায একটা গোল্ডফ্লেকের টিন আর একটা দিয়াশালাই, নিজের পাশ থেকে তুলে অশ্বিনীকে দেয়। অশ্বিনী একটা সিগারেট তুলে মুখে দেয়। টগর বলে বসে, "দাও, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি" টগর দিয়াশালাই জ্বালায় আর নিবে যায়। শেষে ভট্‌চায গাড়িটা একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে একটা সিগারেট মুখে দেয়। টগর কাঠি জ্বালায় কিন্তু দিয়াশালাইয়ের বাক্সটা কোথায় রাখবে বুঝতে পারে না। টগরের কাছ থেকে ভট্‌চায দিয়াশালাইটা নিলে টগর দুই হাতের আজলায় আগুনটা বাঁচিয়ে অশ্বিনীর সিগারেটটা ধরিয়ে দেয়। ভট্‌চায সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আবার গাড়ি চালায়।

প্লেনভিউ বাগানে অশ্বিনীর কোয়ার্টারে ওদের নামিয়ে দিয়ে ভট্‌চায বলে, "আপনারা তো এখানে একটু বসবেন-ই, ততক্ষণে আমি একটু উড্রু-র সঙ্গে দেখা করে আসি"—

আগে অশ্বিনী কোয়ার্টারের দরজা খোলে। টগর ভেতরে ঢুকে প্রথমে অশ্বিনীদের শোয়ার ঘরের ভেতরে দাঁড়ায়। "বাঃ, সুন্দর কোয়ার্টার তো! তবে তোমাদের দুজনের পক্ষেই ভালো। মেম্বারের সংখ্যা একটু বেশি হলে মুশকিল। ডাইনিং স্পেস নেই, না?"

"সেজন্যই তো টেবিল কিনতে পারলাম না, মনে নেই আপনার? তবে আমাদের তো দুজনার খাওয়া, আসলে তো প্রায়ই দুজনকে আলাদা আলাদাই খেতে হয়, তো এই টেবিলেই চলে যায়। টগর বাইরের ঘরের পার্টিশনটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—"এইটিই বেণু পছন্দ করে দিয়েছিল, না! ভারি সুন্দর জিনিসগুলো কিন্তু দাম

এত !” বাইরের ঘরের ভেতরে ঢুকে চেয়ারে বসে পড়ে টগর বলে, “সব বাগানের কোয়ার্টারই এ-রকম। তবে ওদের সাহেবদের বাংলোগুলো খুব ভালো। তোমাকে ও-রকম বাংলো দেবে না কেন ? তুমি তো সরকারি লোক”—টগর চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার বড় ঘরের দিকে যায়। “সরকারি লোক হই আর যা-ই হই আসলে মাইনে তো আর সাহেবদের সমান পাই না। পে-স্কেল দিয়ে সবকিছু ঠিক হবে। তবে আমার এর চাইতে একটা ভালো কোয়ার্টার বরাদ্দ হয়েছিল,বড়বাবু দেয় নি”—

অশ্বিনী দাঁড়িয়েছিল। টগরের গতির সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরে যায়। তারপর টগরের পেছন পেছন আবার বড় ঘরের ভেতরে চলে যায়। টগর বিছানার ওপর বসে ছিল, এবার এলিয়ে পড়ে—“তুমি জিদ করলে না কেন”—

টগরের প্রশ্নের যেন কোনো উদ্দেশ্য নেই এমন নিরুত্তাপ। অথচ ভেতরের অন্য কোনো অনির্দিষ্ট উত্তেজনায় প্রশ্নগুলো কাঁপে। যেন, টগর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর চায় না, অন্য কিছু জানতে চায়।

“আমিও ওদের কাছ থেকে সময় বিশেষে নানারকম সাহায্য নেই। সেইজন্য আর গোলমালের ভেতর গেলাম না”—অশ্বিনী বিছানার পাশে বসে। যেন, সেটাই তার বসার জায়গা।

“গুড বয়। অশ্বিনী ইজ এ গুড বয়। হঠাৎ অশ্বিনীকে টগরের দিকে তাকাতে হয়, পরিপূর্ণভাবে তাকাতে হয় টগরের শরীরের দিকে। “তুমি এমন ভাব করে থাকো অশ্বিনী যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না, কিন্তু তোমার মতো লোকরা সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হয়”—টগর অশ্বিনীর সেই পরিপূর্ণ দৃষ্টিটা নিজের চোখ দিয়ে গ্রহণ করে বলে।

“আমার কি ডেঞ্জারাস দেখেছেন!” অশ্বিনী টগরের শরীর থেকে তার পরিপূর্ণ দৃষ্টিটা সরিয়ে নিতে পারে না। আর অশ্বিনী হঠাৎ বোঝে টগর আর সে একা একা ঘরে বসে কথা বলে না,

নাকি সে-ভাষা ভালো জানে না। যেন এখানে তার কিছু করণীয় আছে—অশ্বিনী বোধ করে। গুদাম বন্ধের দিন যেমন তাকে গুদামের ভেতর তার কী করণীয় সেটা জানবার জন্য সারাদিন বিড়ালের সঙ্গে খেলতে হয়েছিল, এখনো যেন তেমনি কিছু করা দরকার। অশ্বিনী ঠিক বোঝে না সেটা কি। আর বোঝে না বলেই টগরের দুটো বাহুর ওপর দুটো হাত রেখে দেয়। এ-ভঙ্গির একটা অর্থ আছে। এ-ভঙ্গির পরম্পরা আছে। সেই অর্থটা বুঝে নিতে কিছু সময় যায়। সেই পরম্পরার জন্য যেন কোথাও কোনো অপেক্ষা থেকে যায়। সেই অর্থের টানেই বা সেই পরম্পরাতেই একসময় টগর দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "তুলে দাও তো আমাকে।" অশ্বিনী খুব আস্তে করে দুই বাহু ধরে টগরকে খাটের ওপর বসিয়ে দিতে থাকে, ধীরে ধীরে, যেন টগরের মারাত্মক কোনো অসুখ। কিন্তু টগরের শরীরের ভার তাকে পেছনে টানে, টগর একটুও উদ্যোগ নেয় না উঠে বসতে। ফলে অশ্বিনীকে খুব শক্ত করে টগরের বাহু চেপে ধরতে হয়, খাটের গায়ে হাঁটুর ভর দিয়ে জোর নিতে হয়। তারপর টগর যখন প্রায় উঠে বসেছে, তখন টগর টলে পড়ে যাচ্ছে দেখে অশ্বিনী টগরের ডান বাহুটা ছেড়ে দিয়ে তার পিঠটা বেড় দিয়ে ধরে, ফলে অশ্বিনীর মাথা প্রায় টগরের থুতনির নিচে গলার কাছে চলে যায়। টগরের শরীরের ভেতরের গন্ধ অশ্বিনীর নাকে এসে লাগতেই টগরের মাথাটা টলে অশ্বিনীর ঘাড়ের উপর প্রায় পড়ে। আর তার বাঁহাতটা দিয়ে টগরের কোমরের কাছটা বেড় দিয়ে ধরে টগরকে অশ্বিনী সোজা করে দিতেই টগর লাফিয়ে বিছানা থেকে নামে—"কই তোমার পুজোর ওখানে যাবে না?"

"হ্যাঁ, চলুন।" কথাটা শেষ করতে অশ্বিনী হাঁফায়।

অশ্বিনী চাবি হাতে দাঁড়ায়। তার যেন কিছু করণীয় ছিল—সে ভুলে যাচ্ছে সেটা কী। অথবা সেটা যে কী তা এখনো নির্দিষ্ট হয় নি।

পূজোর ওখানে তখন আলো জ্বলেছে। ছেলেমেয়ের দল ভিড় করে আছে। বয়স্করা এসে যাচ্ছেন। টগরকে বাইরে রেখে অশ্বিনী স্টেজের ভেতর ঢোকে, সবে মেক্ আপ নেওয়া শুরু হয়েছে। অশ্বিনী-কে দেখেই সবাই রে রে করে উঠল, "আরে ইনস্পেক্টর এসে গেছে।" বাগানবাবু মুখ ভর্তি শাদা রঙ নিয়ে বলে। "আসবে না মানে, আজ না-এলে ওকে আর বাগানে ঢুকতে দিতাম!" লামা বলে।

"আরে এসে তো গেছি, আর এখন গালাগাল করছেন কেন। একলা আসি নি, দার্জিলিং থেকে লোক ধরে নিয়ে এসেছি আপনাদের থিয়েটার দেখাতে।"

"কে, কাকে নিয়ে এসেছেন!" বাগানবাবু জিজ্ঞাসা করেন।

"আরে ইনস্পেক্টর, এসে গেছেন, থ্যাংকস থ্যাংকস" ফ্যাক্টরিবাবু একটা শাড়ি হাতে ঢোকেন, "এই যে বাগানবাবু, দেখুন এই শাড়িতে হবে কি না।"

"অমর ভট্‌চায বলে এক ভদ্রলোক আর আমার বড় শ্যালিকা।"

"বাঃ বাঃ, আপনি সত্যি মশাই ভদ্রলোক, আজ রাত্রিতেই ফিরবেন নাকি?"

"হ্যাঁ, সেজন্যই তো গাড়ি নিয়ে এলাম।"

বাইরে গাড়ির শব্দ শুনে অশ্বিনী বেরিয়ে যায়, গিয়ে দেখে টগর নেই, ভট্‌চায এসে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে, স্টার্ট বন্ধ করে নি। ভট্‌চায ডাকে, "ইনস্পেক্টর, শুনুন।" টগরের জন্য একটু এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে অশ্বিনী গাড়ির কাছে যায়।

"উড্রু বলছিল আপনাদের নিয়ে ওর বাংলোতে যেতে।"

"না, না, আমি এলাম এঁদের ফ্যাংশানে, তা হয় না।"

"এঁদের ফ্যাংশান শুরু হতে তো দেরি আছে।"

"না দেরি নেই, না, না, আর আমি এই বাগানে থাকি, না, না, সে হয় না। দেখি, টগরদি আবার কোথায় গেলেন।"

"এই অশ্বিনীবাবু, শুনুন না, তাহলে কি ওকে বলব, এখানকার ফাংশনের পরে যাব"—ভট্চায গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে নেমে আসে।

"না, না, আমি আজ যেতে পারব না"—

"আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি রাগ করছেন কেন, ইট ওয়াজ জাস্ট এন ইনভিটিশন।"

অশ্বিনীকে দেখে বড়বাবু বারান্দা থেকে ডাকেন, "এই যে ইন-স্পেক্টর, এখানে"—

অশ্বিনী বড়বাবুর বাড়িতে এলে বড়বাবু বলেন, "আমাদের দুর্ণাম করার আর কোনো বুদ্ধি কি আপনার জানা ছিল না?"

"কেন?"—

"কেন? একজন ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, তাকে কিছু না-বলে মাঠে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন।"

"আমি দাঁড় করিয়ে রাখব কেন, উনিই তো থাকলেন! দাঁড়ান, আমার সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক আছেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।"

যে লোক নিজের গাড়িতে করে অশ্বিনীকে নিয়ে আসে, তার সামান্য একটা প্রস্তাবে অশ্বিনী এমন চমকে এমন অভদ্রতা করে বসে যেন মিঃ ভট্চাযেরই তার কাছে বাধিত হওয়া উচিত। অশ্বিনী তো খনিকটা ধমকে পর্যন্ত উঠতে পারে আর ভট্চাযকে মাঠে দাঁড়িয়ে একা একা সিগারেট খেতে হয়।

পনর

ফাংশান যতক্ষণ শুরু না হয়, ওরা বড়বাবুর বাড়িতেই অপেক্ষা করে। বড়বাবুর ঘর থেকে ওরা দেখতে পায় সব বাড়ি থেকে সারি দিয়ে সবাই চলেছেন। ভট্চায এর মধ্যে বার দুই বাইরে গিয়েছে।

টগর হেসে বলেছে, "ভটচায একজায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতেই পারে না।"

ওদের জন্য স্টেজের সামনে একদিকে তিনটি চেয়ার রাখা ছিল। হলের মাঝখানে, প্রথম সারিতে দুটো সোফা রাখা হয়েছে। ম্যানেজার আর তার মেম ওখানে এসে বসবে। সাড়ে ছটা নাগাদ ভেতর থেকে ঘণ্টা বাজানো হলো। বাইরে যারা ছিল তারা হুড়মুড় করে ভেতরে এসে বসে। খানিকক্ষণ পরই ম্যানেজারের গাড়ি এসে দাঁড়ায়। হলের ভেতর থেকেই দেখা যাচ্ছিল বাচ্চা মেয়েরা দুই সারিতে দাঁড়িয়েছে। তারা সাহেব-মেমের গায়ে ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। সাহেব তাও দু-একটি বাচ্চার মাথায় আঙুলের দু-একটা টোকা দিল—মেমসাহেব কোনোদিকে না তাকিয়ে গট গট করে ভেতরে ঢুকে যায়। সাহেব-মেম ভেতরে ঢুকতেই হলের ভেতর যারা ছিল তারা সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। টগর, অশ্বিনী আর ভট্‌চাযকেও দাঁড়াতে হয়। সাহেব-মেম সোফায় বসার পর সবাই বসে, সাহেব দুপাশে তাকিয়ে কোণায় অশ্বিনীকে দেখে ভুরু তুলে নাচায়। ভট্‌চায গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে আসে। সাহেব ভট্‌চাযের জুলফি টেনে একটু আদর করে দেয়।

আবার ভেতর থেকে একটা ঘণ্টা পড়ে। বড়বাবু এসে ম্যানেজারের কাছে জোড়হাতে দাঁড়ায়। ম্যানেজার আর মেম-সাহেব উঠে কোণায় নতুন বানানো সিঁড়ি দিয়ে স্টেজে ওঠেন। উঠে স্টেজের মাঝখানে দাঁড়ান। বড়বাবু একটা ট্রে হাতে এসে দাঁড়ান। তার ওপর থেকে একটা কাঁচি নিয়ে মেমসাহেব ফিতে কেটে দিলেই পর্দাটা দুদিক থেকে সরে যায় আর ভিতরে মেরুন রঙের একটা পর্দার ওপরে সোনালি অক্ষরে জ্বলজ্বল করে ওঠে ইংরেজিতে লেখা : ম্যানেজার-পত্নী অনুগ্রহ করে এই নাট্যানুষ্ঠানের উদ্বোধন করাতে এই বাগানের ভারতীয় কর্মচারীরা গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করছে। সাহেব আর মেমসাহেব সেটা পড়ে একগাল হাসা মাত্র চারদিকে হাততালি। মেমসাহেবকে নিয়ে সাহেব যে-মুহূর্তে নামবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে—উইঙ্‌স্ থেকে কলবাবু গিয়ে এক নমস্কার করেন। এই অভিনব ব্যাপারটি যে কলবাবুর কীর্তি আর সেটা যে সাহেব বুঝেছেন তা বোঝা যায় যখন তিনি কলবাবুর পিঠে একটা ছোট্ট চড় মারেন। অশ্বিনী নিশ্চিত হয়ে যায় কাণ্ডটা ইন্দ্রজিৎ বানিয়েছে।

সাহেব আর বসেন না। সাহেবের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে হুইস্‌ল্ পড়ে। নাটক শুরু হয়ে যায়। ঐতিহাসিক নাটক। প্রথমেই বাগানবাবু এক মহিলার বেশে ছুটে এসে স্টেজের ওপর আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। স্টেজের ওপর শুয়ে শুয়ে বাগান-বাবু কী করছেন দেখার জন্য বাচ্চারা বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতেই একটা গোলমাল শুরু হয়ে যায়। কিছু শোনা যায় না। উইংস থেকে ফ্যাক্টরিবাবু বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে এক ধমক দেন, "কোনো চ্যাংরা-প্যাংরা কথা বললে ঘর থেকে বের করে দেব।" অশ্বিনী ভাবতেই পারে নি ফ্যাক্টরিবাবু এত জোরে চিৎকার করতে পারেন। হল চুপ হয়ে গেলে বাগানবাবু কাঁদতে কাঁদতেই কোমর থেকে ওপরের অংশটা তোলেন।

প্রথম দৃশ্য শেষ হতেই টগর বলে, "এই চলো, এ কতক্ষণ দেখবে?"

অশ্বিনী বলে, "চলুন, ভট্‌চাযকে বলুন"—

ওরা তিনজন কোমর নুইয়ে, পিঠ নিচু করে বেরিয়ে আসে। বড়বাবু মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তো না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না, রাত্রির খাওয়ার ব্যবস্থা নাকি করে রাখা হয়েছে। কিছু কাঁচা প্রসাদ নিয়ে বহু কষ্টে ছাড়া পাওয়া গেল। গাড়িতে এদের তিনজনকে তুলে দিয়ে বড়বাবু জিজ্ঞেস করে, "ইনস্পেক্টর বাগানে ফিরছেন কবে?" মুখ বাড়িয়ে উত্তরটা দেয় ভট্‌চায, "কেন

তার আগেই যা করার করবেন নাকি, বড়বাবু!" "সে আর আমরা করব কি, আমাদের মালিকরা থাকতে, কি বলেন ইনস্পেক্টর।" এ-বিষয়ে ইনস্পেক্টরের কিছু বলার নেই বলেই যেন সে তার পাশে দাঁড়ানো বড়বাবুকে পুরনো প্রশ্নের জবাব দিয়ে বসে, "এই ফিরব, এরই মধ্যে, তবে কোনো দরকার-টরকার হলে খবর দেবেন"—

ভট্‌চায গাড়িতে স্টার্ট দিলে বড়বাবুর কথাগুলো শোনা যায় না, তাঁর নমস্কারের সঙ্গে এইটুকু শোনা যায়— "খবর নেবেন। খুব খুশি হয়েছি। আচ্ছা"—। ভট্‌চায স্টিয়ারিং ছেড়ে নমস্কার জানায়। টগর বাঁ হাতে অশ্বিনীর মাথার ওপরের শিকটা ধরে ছিল, গাড়ির চাকাটা ঘোরা শুরু করলে সে শিকটা ছেড়ে মাঝখানের আসন থেকে একটু ঝুঁকে হেসে নমস্কার জানায়। অশ্বিনী শুধু হাসে আর গাড়িটা চলা শুরু করলে মুখ বাড়িয়ে বলে, "তাহলে আসি বড়বাবু"—

গাড়িটা সদর রাস্তায় বাঁক নিতেই ভট্‌চায বলে, "কী হতো, আপনার বাগানবাবুর অ্যাকটিঙ দেখার আগে একটু উড্রুর কাছ থেকে ঘুরে এলে বা পরেও যাওয়া যেত।"

টগর মাথার ওপরের শিকটা আর ধরে নি। সে অশ্বিনীর পেছন দিয়ে হাত ছড়িয়ে ওপাশের সিটের মাথাটা ধরে। জিজ্ঞেস করে, "কে, কার ওখানে"—

"আরে, এই বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিঃ উড্রু। সেদিন নিজে অশ্বিনীবাবুকে কত করে বলেছে ক্লাবে যেতে। আমি আপনাদের নামিয়ে দিয়ে ওর বাংলোয় গিয়েছিলাম। আপনাদের সঙ্গে এসেছি শুনে বললো আপনাদের নিয়ে আসতে। আমি এসে অশ্বিনীবাবুকে বললাম তো একেবারে রেগে আগুন। বললাম বাবুদের ফাংশনের শেষে যাব। তাতেও রাজি না"—

"কেন, অশ্বিনী গেলে না কেন?" টগর জিজ্ঞাসা করে।

"তার বদলে বাগানবাবুর হিরোইনের পার্ট দেখলেন, কোথায় লাগে উরসুলা?" —ভট্‌চায।

"উরস্থলা কে ?"

"হলিউডের লেটেস্ট ক্রেজ"—

একটু হাসির ভেতর ভট্‌চাযই আবার প্রশ্ন করে, "আজকের হোল ফাংশানে কার পারফরমেন্স বেস্ট। মানে বেস্ট অ্যাক্টর কে ?"

"সাহেব," টগর বলে।

"উঁহু। বাগানবাবু।" ভট্‌চায বলে।

"আপনি তো অ্যাক্টর বলেছেন, অ্যাকট্রেস বলেন নি"—টগর বলে।

"তা অবিশ্যি ঠিক"—

"বেস্ট অ্যাক্টর—কলবাবু"—অশ্বিনী।

"কলবাবু কে ?" টগর প্রশ্ন করে, ভট্‌চায একটু তাকায়।

"মেমসাহেব ফিতে কাটার পর পর্দায় লেখা ফুটলো তো ?" "হ্যাঁ।" "তারপর সাহেব আর মেমসাহেব নেমে আসছে, ঠিক সেই সময় একজন হঠাৎ উইংস থেকে বেরিয়ে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল," ভট্‌চায বা টগর কারো মনে পড়ে না দেখে অশ্বিনী আরো যোগ করে "সাহেব তার পিঠে দুটো চড় মারল"—সঙ্গে সঙ্গে টগর আর ভট্‌চায হো হো হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ে। ভট্‌চায গাড়ির স্পিডটাই কমিয়ে দেয়, "ওঃ ওয়াণ্ডারফুল" ভট্‌চায বলে। ওদের হাসি একটু কমলে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "ওর মানে বুঝলেন ?"

হাসতে হাসতে টগর একটু এগিয়ে এসেছিল। সে সোজা হয়ে বসে বলে, "ও বাবা, এর আবার মানেও আছে নাকি ?"

ভট্‌চায বলে, "ডিপ অ্যাণ্ড গ্রেট সিমবলিক মিনিং নিশ্চয়ই। কি ? অশ্বিনীবাবু, শুনি, মানেটা একটু শোনান"—

অশ্বিনী বাইরের দিকেই তাকিয়েছিল। সেভাবে তাকিয়ে থেকেই বলে যায়—"মনে হচ্ছে, ঐ পর্দার ওপর লেখাটা কলবাবুর মাথা থেকে বেরিয়েছে, কলবাবুই অসম্ভব পরিশ্রম করে ওটা

বানিয়েছেন, সাহেব যেন এটা বোঝেন। নইলে বড়বাবু আবার অন্যরকম বুঝিয়ে দিতে পারে তো?" আবার খানিকটা হাসির পরে ভট্চায জিজ্ঞাসা করে, "তা সাহেব কি বুঝলেন?"

"সাহেব বুঝলেন যে কলবাবুই কলটা বানিয়েছেন"—অশ্বিনী অলসভাবে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে যায়। তার বলার ভঙ্গি যেন টগর আর ভট্চাযের গল্প শোনার আগ্রহটা আরো বাড়িয়ে দেয়।

"সাহেব যে বুঝলেন, এটা বোঝা গেল কি করে?" ভট্চায জিজ্ঞাসা করে। অশ্বিনী সামান্য একটুক্ষণ চুপ করে থাকতেই টগর সোজা হয়ে বসে দুহাতে তালি বাজিয়ে বলে, "নইলে সাহেব কি আর আদর করে পিঠ চাপড়ে দিতেন!"

গাড়ির বাইরে থেকে অশ্বিনী হাসিমুখ ভেতরে ফেরায়। আবার একচোট হাসির পর অশ্বিনী বলে, "এরও একটা মানে আছে"—

"কিসের?" —টগর।

"এই যে কলবাবু এসে নমস্কার করলেন, সাহেব পিঠ চাপড়ালেন"—

"বাব্বা, এত সব গভীর মানের ধাক্কায় তো নাজেহাল হয়ে গেলাম, বলুন, বলুন, এর আবার মানে কি।" ভট্চায বলে।

"এর মানে ঐ কাণ্ডটা কলবাবুর বানানো নয়"—

"কার বানানো"—

"ইন্দ্রজিৎ বলে একজন নেপালি অ্যাপ্রেনটিসের, কলবাবুর আণ্ডারে, পাছে বড়বাবু বলে দেয় ওটা ইন্দ্রজিতের তাই কলবাবু এসে আগেভাগে জানান দিলেন যে কীর্তিটা তাঁরই"—

"আর ইন্দ্রজিতের কথাটা সাহেব জানতেই পারবে না?" টগর।

যেন তিনজনের কেউ-ই মনে করে উঠতে পারে না কথাটা হাসির ছিল কি না। ভট্চায সিগারেটের টিনটা ধরে একটু বাড়াতেই টগর নিয়ে নেয়। পাহাড়ি রাস্তায় স্টিয়ারিং হাতে হয়তো

ভট্‌চায অশ্বিনী পর্যন্ত হাত বাড়াতে পারে না। হয়তো ভট্‌চায ভাবে টগরই অশ্বিনীকে টিনটা দেবে। টগর টিনটা থেকে সিগারেট বের করলে ভট্‌চায সেটা হাত বাড়িয়ে নেয়। অশ্বিনী হাত বাড়ালে টগর সোজা হয়ে বসে, অশ্বিনীর দিকে ঘুরে, তার ঠোঁটে গুঁজে দেয় আর এটুকু অবকাশে গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলে সিগারেটটা জ্বালিয়ে কাঠিটা ফেলে দিয়ে, আসলে দিয়াশালাই শুদ্ধু বাঁ হাতটা স্টিয়ারিঙে রেখে গাড়িটা ভট্‌চায একদম থামিয়ে দেয়। টগর ভট্‌চাযের আঙুলে বাড়ানো দিয়াশালাইটা নিয়ে, কাঠি জ্বালতেই অশ্বিনী শিখাটা বাঁচাতে নিজের দুই হাতের ভিতর জ্বলন্ত কাঠি শুদ্ধু টগরের হাতটা ধরে ফেলে মুখের কাছে তুলে আনে আর গাড়িটা তখনই দুলে উঠে চলা শুরু করে।

"যাক্, অশ্বিনীবাবু এ-জন্যই উড্রুর কাছে যেতে চান নি, ওখানে বসে বসে এত মানে বুঝতে পেরেছেন!" ভট্‌চায বলে।

"আচ্ছা, তুমি উড্রুর কাছে গেলে না কেন। আড্ডা মারা যেত"— টগরের এই কথার কোনো জবাব অশ্বিনী দেয় না। "অশ্বিনী যেন কি। ও যে কী ভাবে না! লোকে এত মিশতে চায় ওর সঙ্গে, ওর স্বভাবটাই অদ্ভুত! না, মিঃ ভট্‌চায?" "সে আপনি বলতে পারেন, তবে ইন-স্পেক্টর খুব ইনটারেসটিং" হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে ভট্‌চায বলে, "ঘুরে আসবেন নাকি একবার ইয়োরোপিয়ান ক্লাবে, যদি উড্রুর দেখা মেলে" টগর কি করে বলে সে ভট্‌চাযের চাইতে বেশিদিন অশ্বিনীকে চেনে না। "হ্যাঁ, হ্যাঁ চলুন না একটু ঘুরে আসা তো হবে" টগর বলে। ভট্‌চায গাড়ি বাঁয়ে ঘোরায়। এতক্ষণ একপাশে খাদ একপাশে পাহাড় ছিল। এখন রাস্তাটা দুপাশের ঘন জঙ্গলের ভেতর খাড়া উঠে গেছে। গাড়ির আলোটা ধাক্কা খাচ্ছে বিরাট বিরাট গাছের কাণ্ডে আর ঝরে যাচ্ছে পাইন পাতার ফাঁক দিয়ে দিয়ে। গাড়ির ভেতরে এরা সবাই চুপ। গাড়িটা ফার্স্ট গিয়ারে কোঁকাতে কোঁকাতে চড়াই-এ উঠছে, তার শব্দ প্রচণ্ড। গাড়িটা কাঁপছেও একটু। এমন

মনে হতে পারে যে গাড়ি শুদ্ধ এরা হারিয়ে যাচ্ছে। টগর অশ্বিনীর ঘাড়ের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে পাশের শিকটা ধরে ছিল। সে-শিকটা ছেড়ে দিয়ে অশ্বিনীর বাঁ বাহুটা ধরে। অশ্বিনী মাথার ওপরের শিকটা ধরে ছিল। তাই যেন টগরের হাতটা গড়িয়ে অশ্বিনীর গলায় আসে। টগরের হাতটা কনুই থেকে অশ্বিনীর গলা বেয়ে ঝুলতে থাকে, নিরবলম্ব লতার মতো। অশ্বিনী তার অলস ডান হাতটি দিয়ে টগরের হাতের ছোট পাঞ্জাটাকে নিজের মুঠোয় না নিয়ে করে কি,—তাতে যদি টগরের থুতনিটা অশ্বিনীর ঘাড়ে এসে ঠেকে যায়, আর টগরের দুটি একটি উড়ো চুল অশ্বিনীর কানের পাশে গালের পাশে নড়তে থাকে, তবু।

ষোল

গাড়িটা একবার ডাইনে বেঁকতেই আলোয় সাজানো একটা জাহাজের সামনে যেন পড়ে যায়। দোতলার ছাদ থেকে ফেলা ফ্লাড লাইট গাড়িটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, হেড্‌লাইটের আলোটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। "ওব্ বাবা, কোনো মক্কেলই নেই, মাত্র তিনটি গাড়ি দেখছি।" ভট্‌চায গাড়ি থামায়।

গাড়ি থেকে নেমে অশ্বিনী এগিয়ে যায়। গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে টগর তার শাড়ির কুঁচি আর চুলটা একটু ঠিক করে নেয়। এতক্ষণে বাড়ির গড়নটা বোঝা যায়। দোতলা লম্বা বাড়ি। ওপরটা প্রায় সম্পূর্ণই কাঁচের। ভেতরে ভারি পর্দা। ছাদের ওপর থেকে ফ্লাড লাইট ফেলে ড্রাইভ-ওয়েটা আলোকিত রাখা হয়েছে। খুব লম্বা ড্রাইভওয়ে। দুপাশে অনেকখানি বাঁধানো জায়গা—গাড়ি রাখার। তার পরে দুপাশে মাঠ। "ভারি সুন্দর জায়গা তো" —টগর ডান কানের ওপর হাত বুলিয়ে বলে। "এ-আর কী সুন্দর দেখলেন! দিনের বেলায় একদিন এসে দেখবেন কী কাণ্ড। আসলে কি, জানেন টগরদি, দে নো হাউ টু লিভ এ

লাইফ"। দারোয়ান সেলাম দেয়। ভট্চায বলে, "চলুন, বিলিয়ার্ড রুমে আছে নিশ্চয়ই।" ভট্চায একপাশে, একটু আগে। অশ্বিনী আর টগর পাশাপাশি। ভট্চায প্রায় গাইডের মতো বক্তৃতা শুরু করে, বাঁ-হাতে সিগারেটের টিন আর তার ওপর দিয়াশালাই চেপে ধরে—"সারাদিন মোষের মতো খাটল, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল, স্নান করল, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল, ক্লাব, ব্যস, তখন আর কোনো কাজের কথা নয়। মদ খেল, খেললো, নাচলো, গাইল—ব্যস। দে এনজয় লাইফ। নইলে বলুন মিঃ সরকার, দে ক্যান অ্যাফর্ড নট্ টু কেয়ার অ্যাবাউট লিভিং হিয়ার ইন দি জাঙ্গল। দে ক্যান মেক এ লাইফ আউট অভ ইট। দেশ থেকে এত দূরে আছে, অথচ দে নেভার মাইণ্ড। আসুন বাঁ দিকে।" ঘুরতেই সামনে একটা দরজা, খোলা, ঘাড় হেলিয়ে চাইতে হয় এত উঁচু আর দুই হাত ছড়িয়েও বেড় পাওয়া যায় না এমন চওড়া, কপাটের চৌখুপিগুলো ভরে মোটা কাঠের চাকতি আটকানো, মনে হয় যেন লোহার মতো শক্ত। তার পেছনে বিলিয়ার্ড রুম এত লম্বা যে বিপরীত দিকের দেয়ালটাকে ঘরের অংশই মনে হয় না। তারা যেদিক দিয়ে ঢুকছে তার সমকোণে এই হল। তিনটি বিলিয়ার্ড টেবিল। ঢাকনা দেয়া আলো টেবিল-গুলোর ওপর ঝুলছে। দুটো টেবিলের ওপর ঢাকনা। একেবারে শেষ টেবিলটায় খেলা চলছে। দেয়ালে স্টিক রাখার জায়গা। আর এক দেয়ালে একটু তাকের মতো। যে-টেবিলে দুজন খেলছিল, তাদের পেছনের তাকে দুটো ছোট গেলাশে একটু একটু মদ। ভট্চায মাঝের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনে খেলার টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্টিক নিয়ে একজন লক্ষ্য করছে। ভট্চায দুঠোঁট দাঁতের ভেতর ঢুকিয়ে ভুরু কুঁচকে অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতে থাকে যেন। খেলোয়াড় প্রায় স্টিকের সঙ্গে সমান হয়ে শরীরের ঊর্ধাংশ রেখেছে। স্টিকটাকে নিজের প্রসারিত বাঁ হাতের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে রেখে সে পড়ে আছে তো আছেই।

ভট্‌চায দুটো ঠোঁট ভেতরে ঢুকিয়ে ভুরু কুঁচকে টেবিলটার দিকে একবার আর পরমুহূর্তে অশ্বিনী টগরের দিকে তাকাচ্ছে। যেন এই স্ট্রোকটার ওপর খেলার অনেক কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু খেলোয়াড় কিছুতেই মারে না। টগর-অশ্বিনীর মতো আনাড়িদের মনে হয়ে যেতে পারে যে ও-রকম শুয়ে থাকাটাই বোধহয় খেলা। এদিকে ভট্‌চায খেলাটায় কী হয় কী হয় এই উত্তেজনা প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথমেই এমন ভঙ্গি নিয়ে বসে আছে যে মারটা দেয়া না হলে তা আর বদলানোও যাচ্ছে না। অবশেষে প্রায় কোনো রকম আভাস না দিয়ে কখন যে মারটি হয়ে যায়—তা প্রায় বোঝাই যায় না। নরম, ছড়ানো অথচ অত্যন্ত স্পষ্ট আলোর তলায় সবুজ মখমলের মতো টেবিলে দুচারটি বল শুধু মৃদু ভাবে পরস্পরের পাশ ঘেঁষে স্থান পরিবর্তন করে। খেলোয়াড়টির এতক্ষণ হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা আর ভট্‌চাযের উত্তেজনার বৈপরীত্যে সেই সবুজ টেবিলে কয়েকটি বলের মৃদু গড়ানো আর স্থির হয়ে যাওয়ার যেন একটা আধিভৌতিক তাৎপর্য আছে। বলগুলির যেন নিজস্ব প্রাণ আছে। ভট্‌চায একগাল হেসে অশ্বিনী আর টগরের দিকে তাকায়।

খেলোয়াড় আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে, দেখে, তাকের ওপর থেকে গেলাশটা তুলে নিতে গিয়ে ভট্‌চাযের দিকে ভুরু নাচিয়ে বলে, “ওয়েল, ভট্‌চায!”

“ইয়েস” বলে ভট্‌চায, অশ্বিনী আর টগরকে বলে “চলুন।” বিপরীত দিকের ছোট দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে ওরা বাঁদিকে বেঁকে। দুপাশে——দরজা-দেয়াল-দরজা-দেয়াল-করিডর-দেয়াল-দরজা-দেয়াল পেরিয়ে ওরা যেখানে এসে থামে, বাঁ দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, সেখান দিয়েই তারা ঢুকেছিল। ডানদিকে বড় দরজাটা দেখিয়ে ভট্‌চায বলে, “কী, অশ্বিনীবাবু, হয়ে যাবে নাকি, একটুখানি”—

অশ্বিনী—“না, বাড়িতে ওরা আছে”—

ভট্চায—"কারা আর আছে। টগরদি তো পারমিশন দিয়েই দিয়েছেন!"

অশ্বিনী—"সবাই আছে, পূজোর দিন, না"—

ভট্চায—"আরে, মহাষ্টমীর দিন বলেই তো বলছি, মায়ের নামে দু-এক চুমুকমাত্র হয়ে যাক্ না, এ তো শাস্ত্রে লেখা আছে!"

"না, না, মুখে গন্ধ-টন্ধ হবে, শেষে—"

"অ, এইজন্য? একটা ছোট জিন খাবেন, তারপর এতটা রাস্তা যাবেন, দার্জিলিঙে গিয়েও আবার হয় তো ঘুরবেন। দেখবেন মুখে শুধু মিষ্টি একটা লজেন্সের গন্ধ লেগে থাকবে। আর যদি চান এক প্যাকেট লজেন্স না হয় নিয়ে যাবেন—দুএকটা লজেন্স মুখে দিয়ে"—

টগর বলে, "চলো, ভট্চায যখন বলছেন, একটুখানি খাও"—

সতর

বারের দরজার দিকে যেতে যেতে ভট্চায অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, "আরে মশাই, বৌকেই যদি এত ভয়, ডোণ্ট লেট ইয়োর ওয়াইফ টেস্ট ইয়োর মাউথ দিস নাইট, কী বলেন টগরদি! হো-হো-হো।" দরজাটা বেয়ারা খুলে দেয়। একটা লম্বা কাউণ্টারের এক কোণায় একটি মেয়ে বসে। সে ভট্চাযকে দেখে এক গাল হেসে দেয়। বেয়ারা তাদের মাত্র একটা টেবিল, চারটি চেয়ার আর খুব চাপা আলোর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে দেয়। ঘরটা গভীর অথচ উজ্জ্বলতর আলোতে ভরে যায়। বেয়ারাকে হুকুম দিয়ে ওরা বসলে ঘরটার নিচু সিলিং, ঝকঝকে আকাশী রং আর মাইজটন টেবিলে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে টগর বলে, "এ-রকমই সব ঘর নাকি?"

"এ-রকমও আছে, দুটো টেবিলও আছে, পঞ্চাশটা টেবিলও আছে, আবার যার ইচ্ছে সে ঘরে না বসে, এখানে বসেও খেতে

পারে” ভট্‌চায উঠে ঘরের যে-দিকটাতে পর্দা আর কাঁচের দেয়াল সেদিকটায় একটা দরজা খুলে দেয়, বাইরে ছোট একটা বারান্দা যেন! “দেখে যান না, দেখে যান”—ভট্‌চায ভেতর থেকে দরজাটা একহাতে খোলা রেখে, যেন সে বেয়ারা, টগরকে আর অশ্বিনীকে বাইরে গিয়ে সেই ছোট্ট, নিভৃত, গোপন বারন্দাটা দেখে নিতে দেয়।

“সব একেবারে রাজকীয় ব্যাপার না?” টেবিলে ফিরে এসে বসার পর টগর বলে।

“আচ্ছা যদি কাউকে ধরুন কলকাতা, বা ধরুন লণ্ডন থেকেই একটা ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে, এখানে নিয়ে এসে ফেলা হলো, তার-পর তার ঘুম ভাঙলে, জানলা দিয়ে দেখলে কি সে বুঝতে পারবে যে তাকে কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে? নাকি ভাববে যে সে লণ্ডনেই আছে”—ভট্চায় যেন একটা ধাঁধা ধরে।

অশ্বিনী বলে ফেলে, “আমার মতো লোককে আনলে ভাববে স্বপ্ন দেখছি। আবার লণ্ডনে যে এ-জায়গারই লোক তার কাছে কিছুই নতুন ঠেকবে না।”

“আপনাকে তো উড্র্‌ সাধাসাধি করছে এ-ক্লাবের মেম্বার হতে।”

“তাই নাকি? অশ্বিনী?” টগর তার বিস্মিত চোখ অশ্বিনীর মুখ থেকে ভট্‌চাযের মুখ থেকে অশ্বিনীর মুখে সরিয়ে সরিয়ে নেয়। সেই দৃষ্টির কোনো জবাব না দিয়ে অশ্বিনী বলে, “আমি যা মাইনে পাই, তাতে এ-ক্লাবের মেম্বার হওয়া চলে না।”

“বুঝলেন, ইনস্পেক্টর, এরা যাকে নিজেদের দলে টানতে চায় তার যাতে চলে সে-ব্যবস্থাও এরাই করে দেয়। আমি তো এ-ক্লাবের মেম্বার। কোনোদিন আমার কাছ থেকে একটা পয়সা নেয় না। বছরের চাঁদা দেয়ার সময় ঠিক একটা ব্যবসা-ট্যাপসা পাইয়ে দেয়।”

“আমি তো আর ব্যবসা করি না।”

“করেন কি করবেন না, সেটাই বা কে জানে। তা তো কথা

না। এখানকার চাঁদার জন্য আপনার মাইনের ওপর নির্ভর করতে হবে না।”

বেয়ারা এসে গ্লাসগুলো দিয়ে চলে যাওয়ার সময় ভট্চাযের কথা-মতো বড় আলোটা নিভিয়ে দিতেই ঘরটা প্রায় অন্ধকারে ডুবে যায়।

“টগরদি দেখবেন, আবার গ্লাস বদল না হয়ে যায়, শেষে আপনি খেয়ে বসলেন জিন আর আমরা খেলাম অরেঞ্জ স্কোয়াশ”—ভট্চায হেসে ওঠে। অশ্বিনী ঠিক করতে পারে না অত চুপচাপের ভেতর ভট্চাযের হাসির শব্দটাই খারাপ শোনাল নাকি অত কম আলোতে হাসির জন্য ভট্চাযের মুখের রেখাগুলোকেই খারাপ লাগল।

“বাবা, আমার দরকার নেই তাহলে খাওয়ার। শেষে একটা কেলেংকারী হবে”, টগর টেবিল থেকে সরে বসে বলে।

“আরে না না, তাই কি হয় নাকি? আমি আপনাকে ভয় দেখালাম, আর আপনি ভয় পেয়ে গেলেন?” ভট্চায বলে।

“ঠিক তো?” টগর জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ”—ভট্চায টগরের দিকে গেলাসটা ঠেলে দেয়।

“এত বড় যে কাণ্ড বানিয়েছে একটা, কুল্লে তো দুজনকে দেখলাম কাঠি দিয়ে ঠোকাঠুকি করছে। আপনার উড্র না ফুড্র, সে কোথায়।” —টগর গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে।

“উড্র তো এখানে আসে নি দেখছি। কেউই অবিশ্যি রোজ আসে না। দেখি বসে আছি তো, এর ভেতর যদি এসে যায়।”

“কেউ আসে না তো এত বড় একটা কাণ্ড বানাবার দরকার কি ছিল”—টগর।

“না। শনিবার রাত্রিতে প্রত্যেকে, একবার আসবেই। সেদিন হচ্ছে ক্লাব-ডে। বুধবারও প্রায় প্রত্যেকেই আসে—মেয়েরা সাধারণত রবিবারেই আসেন। আর অনেকে আছে, যারা গল্ফ খেলে তারা রোজ দুটো বাজতে না-বাজতে আসবেই। এদের তো বিরাট গলফ্ লিঙ্ক আছে।”

"তাদের বুঝি চাকরি নেই ?"—টগর।

"খুব আছে। তারা সেই ভাবে ঠিক করে নেয় আর কি। খেলার তো একটা নেশা আছে। তবে টেনিসটাই বেশি খেলে, সে-জন্য ইনডোর হার্ড কোর্ট আছে বোধহয় তিনটি না চারটি। কেউ কেউ রোজ সন্ধ্যাবেলায় আসবে। ঘণ্টা দেড়েক খেলে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবে। যেন এটাও একটা চাকরি। মানে খেলারও তো একটা নেশা আছে।"

"মানে, এ-সব ব্যবস্থা করা আছে। যার যখন ইচ্ছে এসে, যতক্ষণ খুশি, যা খুশি করো"—টগর।

"হ্যাঁ, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। আর এদের সার্ভিস কনডিশনেই আছে ক্লাবে আসতে হবেই।"

"সে তো খুব ভাল নিয়ম, আড্ডা মারতে হবেই, খেলতে হবেই।"

"আসল কথা কি জানেন টগরদি, সাতসমুদ্দুর পার থেকে তো এসেছে। এরা কাজের ব্যাপারটা বোঝে। ঐ আমাদের মতো গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে চলছে তো চলছেই, সব সময়ই ঝিমুচ্ছে আবার কোনো-সময় নাক ডাকিয়ে যে ঘুমোবে সেটুকু আত্মবিশ্বাস পর্যন্ত নেই।"

"ঘুমনোটা বুঝি খুব, কী বললেন, আত্মবিশ্বাসের ব্যাপার!"—টগর।

"না। মানে, এদের, সাহেবদের সার্ভিস কনডিশন দেখলেই বুঝবেন কোম্পানিগুলো কী রকম অ্যালার্ট যাতে এদের এফিসিয়েন্সি একটুও সাফার না করে। সারাদিন প্রাণপণে খাটো, তারপর ক্লাবে এসে যা খুশি সে-রকম ফুর্তি করো। মানে মনটাকে নানাদিকে ছড়িয়ে দেয়া। একরকম চাকরি করতে করতে যাতে নেতিয়ে না পড়ে। কোম্পানি তো খরচ আর কম করে না। এই সব তো কোম্পানির খরচ। চাঁদা পর্যন্ত কোম্পানি দিয়ে দেয়। আর কত লোক এমপ্লয়েড শুধু এই ক্লাবটার জন্য ভাবুন তো! সেই অতবড় গল্‌ফ্ লিঙ্ক, তার ঘাস ছাঁটাই, তার যন্ত্রপাতি, এই বেয়ারা, মালি,

ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তার পর আবার রেস্তোরাঁ আছে, ওপরে। মানে এই পেল্লায় কাণ্ড কোম্পানি বানিয়ে দিয়েছে যাতে তুমি একটু দয়া করে এসে প্রাণে যত চায় খেলতে পার, ফুর্তি করতে পার।"

"অশ্বিনী, তোমার নেশা হয়েছে? আমার কেমন নেশা-নেশা লাগছে।"

ভট্‌চায খুক করে হাসে, "সে-কি? অরেঞ্জ স্কোয়াশেই নেশা?

"তবে এ-নেশা লাগছে কেন? বেশ হাল্‌কা লাগছে"—

"এই সব আলো, এই ঘর এ-সবের নেশা হবে হয় তো"—ভট্‌চায।

"সাহেবদেরও এই রকম নেশা হয়?"

"সে তো হয়-ই। তাছাড়া এই যে আসল নেশা আছে। সাহেবদের নেশা তাই আরো সরেস। মনের সুখে নেশাও করে বটে।"

"যাতে শরীরে যত কুলোয় খাটতে পার!" —টগর।

"সাহেবদের গতরের কাজ তো বেশি না, মাথার কাজ বেশি।"

"ও, মাথার কাজ বেশি? তাহলে প্রাণে যত চায় খেলতে পার, ফুর্তি করতে পার, যাতে মাথা যত পারে খাটাতে পার"—টগর।

"হ্যাঁ, মাথা যত পারে, খাটাতে পার।"

"মাথা শুধু একদিকে খাটালে মাথা ঘোরে, মাথা ধরে, মাথা আর কাজ করে না"—টগর।

"হ্যাঁ, মাথা সব সময় সাফ করতে হয়। কত কাজ তো! সেই চায়ের বীজ তৈরি করা, নতুন গাছ বানানো, পুরনো গাছ বাঁচানো, পাতি, পাতি শুকাই থেকে প্যাকিং তো আছেই, তার ওপর বৃষ্টির কম-বেশি আছে, লেবার ট্রাবল, বাবুদের নানা গোলমাল—কত কাজ তো! মাথা সব সময় সাফ রাখতে হয়!"

"মাথা সাফ না-রাখলে তো মাথা খাটানো যায় না, সেজন্য খেল, মদ খাও, যত বেশি পার, তাহলে সাফ থাকবে"—টগর।

হ্যাঁ, আর ভাবনাচিন্তা তো কম না! এই "সিলন-টি ভাল দাম পেল।"

"সিলন-টি মানে ?"— টগর।

"সিলন, মানে সিংহলের চা।"

"সিংহল, মানে, ঐ ম্যাপের নিচে যে ?"

"হ্যাঁ, ম্যাপের নিচে যে···, তারপর সাউথ আফ্রিকার চা বেশি দাম পেল কিনা ?"

"সাউথ আফ্রিকা, মানে ?"—টগর।

"ঐ সিংহল যেমন ম্যাপের নিচে, সাউথ আফ্রিকাও তেমনি ম্যাপের নিচে।"

"ও, তাহলে, ম্যাপের নিচে চায়ের দাম বাড়লে এদের, সাহেবদের, পাহাড়ের উপরে খুব চিন্তা হয় ?"

"হ্যাঁ, খুব চিন্তা হয়!"

"সেজন্য খেলতে হয় ?"—টগর।

"হ্যাঁ, খুব খেলতে হয়!"

"কি খেলতে হয় ? কি কিঁ খেলতে হয় ?"—টগর।

"ঐ, টেনিস, বিলিয়ার্ড, গল্‌ফ্‌, যা ইচ্ছে খেল।"

"যা-ইচ্ছে খেলা যে, ঐ খেলাটার নাম কি, ঐ যে একজন একটা লাঠি নিয়ে সবুজ টেবিলটার ওপর ঘুমিয়ে পড়ল।"

"ঘুমিয়ে পড়ে নি, খুব হিসেব কষে, একেবারে ডিগ্রি মেপে তো মারতে হয়, যাতে একটা বল, আর-একটা বলের কোণা ছুঁয়ে, আর একটা বলকে ঠোকর মেরে, —মানে এই সব ডিগ্রি অনুযায়ী মারতে হয়—বিলিয়ার্ড।"

"তাতে মর্ হয় কখন, বিলিয়ার্ডে ?"—টগর।

"মর তো হয় না, পয়েন্ট আর কি ?"

"ও ? মর্ হয় না ? পয়েন্ট। তাহলে টেনিস ?"—টগর।

"টেনিসেও পয়েন্ট আছে! আবার সেট আছে।"

"টেনিসে মর্ হয় কখন ?"—টগর।

"টেনিসে মর্ হয় না তো, হেরে যায়।"

"ও একেবারে হেরে যায়?" টগর।

"হ্যাঁ, একেবারে হেরে যায়।"

"ওহ্, আমার কী-রকম নেশা লেগে গেল। এই ঘরেরই নেশা, এই আলোর? আর একটা কী খেলা যেন!"

"গল্ফ্"

হ্যাঁ, গল্ফ্। গল্ফে মর্ হয়?"

"লাঠি মতো, মানে স্টিক আছে, গল্ফ্ স্টিক দিয়ে বল মারতে হয়, মাঠের ভেতর খুব জোরে, লম্বা স্টিক"—ভট্চায দুহাত আঙুলে আঙুলে পেঁচিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর তুলে মারার ভঙ্গি দেখায়।

টগর-ও দুহাতের আঙুলে আঙুলে পেঁচিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর তুলে মারার ভঙ্গি করে বলে, "এ-রকম ভাবে, খুব জোরে, মারতে হয়?"

"হ্যাঁ, মারতে হয়, মাঠে গর্ত থাকে, সেখানে গিয়ে বল পড়ে।"

"তাতে কি হয়?"—টগর

"পয়েণ্ট হয়।"

"পয়েণ্ট হয়। তারপর মর্ হবে কখন?"—টগর।

"গল্ফে তো মর্ নেই।"

"ও গল্ফেও মর্ নেই। শুধু পয়েণ্ট আছে?"

"হ্যাঁ, শুধু পয়েণ্ট আছে।"

"মাথা খাটানোর জন্য এই সব খেলা খেলতে হবে?"— টগর।

"হ্যাঁ, তাহলে তো মাথাটা সাফ থাকবে।"

"আপনি এই সব খেলা খেলেন?"—টগর।

"না। আমি খেলি না।"

"ও। আপনি খেলেন না। কিন্তু সব খেলার নিয়ম জানেন" —টগর।

"হ্যাঁ, নিয়ম তো জানতেই হবে।"

"অশ্বিনীর তো মাথা খাটাবার কাজ, না?"—টগর।

"হ্যাঁ, ওর তো সব হিসেবের ব্যাপার। সব সময় মাথার কাজ।"

"তাহলে অশ্বিনীকে এ-সব খেলতে হবে, যাতে মাথা ভালোভাবে খাটানো যায়!"—টগর।

"খেলা তো উচিতই।"

"অশ্বিনীর চাকরির শর্তে লেখা নেই—খেলতেই হবে?"—টগর।

"না, সরকারের তো লাভের ব্যাপার না, আইনের ব্যাপার।"

"আইনের ব্যাপার হলে খেলতে হয় না?"—টগর।

"খেলতে তো হয়ই, আইন-ও তো মাথার ব্যাপার।"

"ও, খেলতে হয়, কিন্তু লেখা থাকে না?"—টগর।

"হ্যাঁ, খেলতে হয়, কিন্তু লেখা থাকে না, লেখা না থাকলেও খেলতে তো আর বাধা নেই।"

"বরং একদিক দিয়ে আরো সুবিধেই"—টগর।

"তা অবিশ্যি বলতে পারেন, একদিক দিয়ে···।"

"শর্তে লেখা থাকলে তো খেলাটাও চাকরি হয়ে যায়। আর লেখা না থাকলে খেলাটা চাকরি হয় না"—টগর।

"হ্যাঁ, তা তো হয়ই না।"

"তাহলে সাহেব-মেমরা যখন চাকরি করবে খেলবে, মানে চাকরির খেলা খেলবে, অশ্বিনী তখন চাকরি না করেও খেলবে?"—টগর।

"হ্যাঁ, ওর তো আর খেলাটা চাকরি নয়!"

"অথচ ওর মাথা খাটাবার কাজ!"—টগর।

"হ্যাঁ, খুব মাথা খাটাবার কাজ।"

"তাহলে খেলা অবশ্যই দরকার"—টগর।

"ভীষণ দরকার।"

"যদি শরীরের কাজ হতো তাহলে দরকার হতো না!"—টগর।

"না, না, শরীর তো একটা যন্ত্রের মতো। লাগিয়ে দিলেই চলে।"

"মাথা তো আর তা নয়, লাগিয়ে দিলেও চলে না!"—টগর।

"তাতো চলেই না।"

"সেজন্য, অশ্বিনীকে মাথা খাটানোর জন্য এইসব খেলতে হবে?" —টগর।

"হ্যাঁ, এত সব আছে, যা খুশি একটা খেললেই হলো!"

"যা খুশি খেলব?"—টগর

"যা খুশি খেলুন।"

"যা খুশি?"—টগর

"যা-খু-শি।"

"যা-আ, খু-উ, শি-ই?"—টগর

"যা-আ খু-উ শি-ই।"

"অশ্বিনী, তোমাকে যা-আ-খু-উ-শি খেলতে হবে।"

"কিন্তু এ কোনো খেলাতেই তো মর্ নেই"—এতক্ষণে এই একটি কথা বলে অশ্বিনী একটা ছোট্ট চুমুক দেয়।

"তাই তো, ভট্চায। এ-কোনো খেলাতেই তো মর্ নেই" —টগর।

"তাহলে, যে খেলায় মর্ আছে, সেই খেলাই খেলুন"—ভট্চায।

"কোন্ কোন্ খেলায় মর্ আছে অশ্বিনী?"—টগর

"হাডুডু, কানামাছি—আপাতত তো এই মনে পড়ছে"—অশ্বিনী।

"তাহলে হাডুডু, কানামাছিই খেলবেন, তার জন্য মেম্বার হতে তো আর আপত্তি নেই"—ভট্চায।

অশ্বিনী ভট্চাযকে বলে, "আপনি একটু সরে বসুন তো। এদের আলো যে কোথা থেকে আসে তাও বোঝা যায় না, আপনার চোখের পাতার ছায়াটা একেবারে ঠোঁটের ওপর ঝুলে পড়েছে।" ভট্চায একটু সরে বসে।

"কি অশ্বিনী, মেম্বার হবে না?"—টগর।

"যা-খুশি খেলতে?"—অশ্বিনী।

"তা, খেলুন না, যা খুশি, খেলুন না, কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ।" বলে ভট্‌চায উঠে দাঁড়ায়।

আঠার

ঘরের আলোটা এত ম্লান যে সে-আলোয় মেঝেতে ছায়া দেখায় যেন কেউ জল দিয়ে মেঝেটা ধুয়ে দিচ্ছে। "নিন, টগরদি উঠুন, দাঁড়ান, না, হ্যাঁ" টগর উঠে দাঁড়ায়। ভট্‌চায গিয়ে অশ্বিনীকে বলে, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, ইনস্পেক্টর" অশ্বিনীও দাঁড়ায়।

"চোখ বাঁধতে হবে নাকি আবার!" ভট্‌চায জিজ্ঞাসা করে।

"আমি চোখ বন্ধ করেই আছি, তাই থাকব, বাঁধার দরকার কি?"—অশ্বিনী।

"তাহলে নিন স্টার্ট করুন। ওয়ান, টু, থ্রি।"

অশ্বিনী চোখ বন্ধ করে দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দেয়, তারপর ঘষে ঘষে হাঁটতে শুরু করে। ভট্‌চায বলে, "বলুন, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ।"

"ও আমার হয়ে আপনি বলতে থাকুন"—অশ্বিনী চোখ বন্ধ করে পা ঘষতে-ঘষতে যেদিকে কাঁচের দেয়াল সেদিকেই যায়।

"কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ। কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ। টগরদি সাবধান। দেখছেন না হাত দুটো কেমন দুপাশে পাখনার মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে"—কথা কটি বলে ভট্‌চায ঘরের অন্য কোণায় চলে যায়।

"একোয়ারিয়ামের মাছের মতো অশ্বিনী ঘুরছে, না?" বলেই টগর চুপিসাড়ে অশ্বিনীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। আঁচলটা কোমরে গুঁজে ফেলে। কিন্তু চট করে পেছন ফিরতেই টগর তাড়াতাড়ি বসে পড়ে, অশ্বিনী আর ধরতে পারে না। ভট্‌চায বলে ওঠে, "অত কাছে যাবেন না টগরদি, গন্ধ পাবে, গন্ধ পেলে ছুঁয়ে ফেলবে। কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ, কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি

তাকে ছো, কানামাছি ভোঁ ভোঁ।" অশ্বিনী তুহাত নাড়াতে নাড়াতে পা ঘষতে ঘষতে ঘরের কাঁচের দেয়ালের দিকটায় চলে যায়। কাঁচের দেয়ালে তার সারাটা শরীর ঠেকে গেলে সে তুহাত তুদিকে ছড়িয়ে তুহাতের চেটো কাঁচের দেয়ালটায় লাগিয়ে পায়ে পায়ে এদিকে আসতে শুরু করে। ভট্‌চায কাঁচের দেয়ালের দরজাটা খুলে ধরে টগরকে বাইরে বারান্দায় যেতে ইশারা করে, টগর টুক্ করে বাইরে চলে যায়। ভট্‌চায দরজাটা খুলেই রাখে। "কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছো, কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ কানামাছি ভোঁ ভোঁ।" অশ্বিনীর হাতটা এসে দরজার ফাঁকটাতে পড়ে, সেই ফাঁকটার ভেতর কিছুটা হাওয়া আঁচড়াতে আঁচড়াতে আবার পা ঘষে ঘষে অশ্বিনী একেবারে দরজার মুখটা ভরে দাঁড়িয়ে যায়, বাইরের বারান্দার দিকে মুখ করে। মেঝের ওপর বসে দরজাটা হাত দিয়ে খোলা রেখে ভট্‌চায বলতে থাকে—"কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ, কানামাছি ভোঁ ভোঁ।" তুহাত দিয়ে বাতাস হাতড়াতে হাতড়াতে অশ্বিনী বাইরে ছোট বারান্দার দিকে চলে যায়, যেন ওখানে টগরের গন্ধ সে পেয়েছে, "কানামাছি ভোঁ ভোঁ, আপনারা খেলুন, আমি দেখি উদ্রু এসেছে কিনা"— ভট্‌চায চলে যায়।

সেদিন রাত সাড়ে নটা নাগাদ টগর আর অশ্বিনী তাদের সিঁড়িতে পা দিলে অশ্বিনীর মনে হয় তাকে একটা ভূমিকা খুব নিশ্চিতভাবে নিতে হচ্ছে—দর্জি, মিঃ প্রধান, ভট্‌চায, উদ্রু, আজ বাগানের কোয়ার্টারে, গাড়িতে, ক্লাবে।…। কিন্তু সে ঠিক বুঝতে পারছে না ভূমিকাটা কী।

ভট্‌চাযের গাড়ি ছেড়ে, স্টেশনের মোড়টা থেকে তারা হেঁটেই আসছে। রাস্তার লোকজন যাচ্ছে আসছে। টগর একবার বলেছিল পূজোর ওখানে যাবে নাকি একবার! কিন্তু অশ্বিনী চায় নি, "ভাল্

লাগছে না। তার চাইতে এদিক দিয়ে, হেঁটে চলুন ফিরি।" রাস্তায় টগরই লজেন্স কেনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। অশ্বিনী লজেন্সের গন্ধ শুঁকছে দেখে দোকানি একটা অন্যপ্যাকেট দিয়ে সেটি নিতে বলেছিল। প্যাকেটটা ছিড়তেই মিষ্টির একেবারে গা গোলানো গন্ধ। অশ্বিনী নিজে একটা মুখে নিয়ে, টগরকে একটা দিয়েছিল।

বাড়ির সিঁড়ির প্রথম বাঁকে অশ্বিনী হঠাৎ টগরকে বলে, "দেখুন তো, মুখে গন্ধ আছে নাকি?" মুখের গন্ধ শোঁকাবার জন্য ঐ বাঁকে টগরের দুই গাল নিজের দুই হাতে একেবারে মুখের কাছে এনে ধরতে হয় অশ্বিনীকে। "নেই," শোঁকার পরও মুখখানা তার হাতের ভেতর ধরে রাখতে হয় এখানে, এই সিঁড়ির বাঁকে।

উনিশ

পরদিন একেবারে সাতসকালে কড়া নাড়া শুনে অশ্বিনী বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দেখে ভট্চায আর একটি অপরিচিত লোক। ভট্চায বলে, "এই দেখুন, রাঙতি থেকে এসেছে, চা নাকি চুরি গেছে।" লোকটি একটি চিঠি অশ্বিনীকে দেয়। অশ্বিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চিঠিটা খোলে। রাঙতির ম্যানেজার লিখেছে, কাল রাত দুটোর সময় বাগানের দারোয়ান তাকে খবর দেয় যে একজন লোক চায়ের বস্তা নিয়ে পালাচ্ছিল দেখে সে তাড়া করে, লোকগুলো বস্তা ফেলে পালায়, এই খবর সেন্ট্রাল এক্সাইজের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে। "দাঁড়ান" বলে অশ্বিনী ঘরের ভেতরে গিয়ে গোলাপকে ধাক্কা দেয়। গোলাপ ধড়মড় করে উঠে পড়লে অশ্বিনী বলে "ভেতরে যাও, লোক এসেছে," "কি ব্যাপার?" "না, এমনি।" গোলাপ খোকনকে তুলে নিয়ে গেলে অশ্বিনী বিছানাটা পাকিয়ে ভেতরে রেখে এসে ভট্চায আর লোকটিকে বাইরে থেকে ভেতরে ডাকে "আসুন—।"

"না, এখন আর বসব না"—বলেও ভট্চায ভেতরে আসে, "আপনি কি এখনই যাবেন?"

"হ্যাঁ যেতে তো হবেই।"

"আমি সঙ্গে গাড়ি নিয়ে এসেছি"—লোকটি বলে।

"ঠিক আছে, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি, আপনি একটু বসুন।"

"তাহলে আমি চলি"—ভট্চাযের এই কথা শুনে অশ্বিনীর মনে হয় লোকটির সঙ্গে ভট্চায এলো কি করে। সে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি এলেন, মানে, আপনি জানলেন কি করে।"

ভট্চায বলে, "সে আরেক কাণ্ড, এই লোকটি চিঠি নিয়ে প্লেন-ভিউয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে বলেছে আপনি দার্জিলিঙে আছেন; ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে। ও আবার রাঙতিতে ফিরে গেছে, ওখানকার ম্যানেজার তখন দার্জিলিঙে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে, যাতে আপনাকে খুঁজে দিতে পারি।"

"কেন, আমি তো রাঙতিতে আমার ঠিকানা দিয়ে এসেছি।"

"সেটা বোধহয় খুঁজে টুজে পায় নি। আপনি তো পূজোগণ্ডার দিনে ভালো প্যাঁচে পড়লেন। আমি চলি তাহলে"—ভট্চায যাবার উদ্যোগ করে। লোকটিকে বলে, "চলুন, আপনি আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুন, উনি ততক্ষণে তৈরি হচ্ছেন।" লোকটিও ওঠে, দরজায় ভট্চায দাঁড়ায়। লোকটিকে বলে, "আপনি নিচে যান, আমি যাচ্ছি।" লোকটি চলে গেলে ভট্চায অশ্বিনীকে বলে "ইন-স্পেক্টর একটা রিকোয়েস্ট করছি, দিজ্ পিপ্ল, মানে রাঙতির ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার—দে হ্যাপ্ন্ টু বি কানেকটেড্ উইথ্ আস্। প্লিজ সি টু ইট দ্যাট দে আর নট্ লেড্ টু এনি ডিফিকালটি, মানে চুরির ব্যাপার তো। ওদের আর কি-ই-বা করার আছে, এ তো আকছার হচ্ছে।"

"আচ্ছা, আগে গিয়ে দেখি কী ব্যাপার, এখান থেকে তো কিছু বুঝতেই পারছি না।"

"অল্‌রাইট, গুড্ উইসেজ"—ভট্চায বেরিয়ে যায়।

ততক্ষণে বাড়ির ভেতরে সবাই উঠে গেছে। গোবিন্দবাবু বলেন, "কি হল অশ্বিনী, এত সকালে কি ব্যাপার ?"

"রাঙতির গুদামে কাল একটা চুরি হয়েছে, ম্যানেজার গাড়ি পাঠিয়েছে, যেতে হবে। দেখি কি ব্যাপার ?"

"ভালো ল্যাঠা মহানবমীর দিন, গিয়ে চোরের হদিশ করো গে।"

"দেখ তো কাণ্ড, চুরি হয়েছে তো তোমাকে যেতে হবে কেন ?" গোলাপ বলে। লুসু আর বেবির পাশে খোকন একেবারে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। অশ্বিনী একটা চাদর নিয়ে খোকনকে ঢেকে দেয়।

"কখন ফিরবে, অশ্বিনী"—টগর জিজ্ঞাসা করে।

"গেলামই না এখনো, দেখি আগে গিয়ে"—অশ্বিনী বাথরুমের দিকে যায়। বেণু স্টোভে কেটলি চাপিয়ে দিয়েছিল, বলে, "একটু দাঁড়ান না, গরম জল হয়ে গেল।"

"না, না, আমি স্নান করব না।"

বাথরুম থেকে অশ্বিনী বেরিয়ে আসতে-আসতে বেণু টোস্ট তৈরি করে ফেলেছে। অশ্বিনীকে বলে, "একেবারে জামাকাপড় পরে আসুন।"

জামা-প্যাণ্ট পরে বোতাম লাগাতে-লাগাতে অশ্বিনী এসে টেবিলে বসতেই বেণু চারটি টোস্ট এগিয়ে দেয়। "ধ্যুৎ, সকালে এতগুলো খাওয়া যায় না-কি।"

"খেয়ে যান, সারাদিন কী জুটবে, কে জানে একবারে স্নানটান করে ভাত খেয়ে গেলেই হতো !"

"না, না, খবর পেয়ে দেরি করা ঠিক না"—গোবিন্দবাবু এসে দরজায় দাঁড়ান।

গোলাপ বলে, "বেণুদি, চা টা করে দেব ?"

"হ্যাঁ, করো না, জল হয়ে গেছে।"

কেটলিতে পাতি দিতে দিতে গোলাপ বলে, "চুরি হয়েছে তো, তোমাকে খবর দিল কেন, তুমি কি থানার দারোগা নাকি।"

"থানার দারোগা না, চায়ের দারোগা"—গোবিন্দবাবু বলেন।

লুস্ত্র আর খোকন ঘুম থেকে উঠে এসে বেণুর আর গোলাপের কাপড়ে মুখ গোঁজে। লুস্ত্র জিজ্ঞাসা করে, "পিউমনি, মেসো এখুনি যাচ্ছে কেন।"

"কাজে যাবেন, তাই।"

খোকন—"মা, বাবা কোথায় যাচ্ছে।"

গোলাপ—"কাজে যাচ্ছেন।"

চায়ে চুমুক দিয়ে অশ্বিনী বলে, "ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আর এক কাপ চা দেখি।" ইতিমধ্যে খোকন এসে অশ্বিনী-র হাঁটু ধরে। "বাবা, পূজো তো, তুমি কাজে যাচ্ছ কেন।"

"তুমি দিদি আর বোনের সঙ্গে খেলা কর, আমি ঘুরে আসছি।"

"আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

"তুমি তো পূজো দেখতে যাবে, বাবা।"

বাইরের ঘরে বসে জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে অশ্বিনী বলে, "কোটটা কোথায়?" টগর কোটটা এনে ধরে, অশ্বিনী হাত গলিয়ে দরজাটা খুলে মুখ ঘুরিয়ে "আসি" বলে বেরিয়ে যায়।

কুড়ি

রাঙতি বাগানে ঢুকে বড়বাবুর বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে হর্ন দিতে বড়বাবু বেরিয়ে এসে বলেন, "অফিসে নিয়ে যাও।" অফিসের সামনে অশ্বিনীকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বড়বাবু এসে বলেন, "আর বলেন কেন, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, আজ পূজোর দিন সবাই আনন্দ করবে, আর আমরা ঘুরছি চোরের পেছনে"—

অফিসে বসে অশ্বিনী বলে, "কি হয়েছে বলুন তো?"

"দাঁড়ান আগে সাহেবকে খবর দি"—বড়বাবু বেরিয়ে যান। অশ্বিনী বোঝে বড়বাবু কোনো কথাবার্তা বলবেন না। চুরি হওয়া

সত্ত্বেও যে কেউ অফিসে নেই তার কারণ কি পূজো নাকি চুরিটা তেমন কিছু বড় নয়,—সেটা অনুমানের চেষ্টা করে অশ্বিনী। জানলা দিয়ে অশ্বিনী দেখতে পায়, বিপরীত দিকে, বোধ হয় অনিলবাবুরই কোয়ার্টার থেকে, বাচ্চারা বেরিয়ে পূজো মণ্ডপের দিকে যাচ্ছে।

বড়বাবু ফিরে আসেন, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানেজারের গাড়িও আসে। বড়বাবু বলে, "চলুন, সাহেবের ঘরে গিয়ে বসা যাক"—

ম্যানেজার তার চেয়ারে বসে, সামনে ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, অশ্বিনী আর একটা চেয়ারে। বড়বাবু দাঁড়িয়ে থাকেন। সাহেব "মর্নিং" বললে অশ্বিনী প্রত্যুত্তর দেয়। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন অশ্বিনী সব্ জানে কি না। সকালের চিঠিটি বাদ দিয়ে অশ্বিনী কিছুই জানেনা শুনে সাহেব ফ্যাক্টরি-সাহেবকে বলতে বলেন। ফ্যাক্টরি-সাহেব বলতে থাকেন যে কাল রাত সোয়া দুটো নাগাদ তিনি খবর পান দারোয়ান কয়েকটি লোককে বস্তা নিয়ে যেতে দেখে তাড়া করলে তারা বস্তা ফেলে পালায়।

অশ্বিনী—তোমাকে কে খবর দেয়।

ফ্যাক্টরি-সাহেব—ম্যানেজার আমাকে টেলিফোন করে—

অশ্বিনী—দারোয়ান কাকে খবর দেয়—

ফ্যাক্টরি-সাহেব—আমি সেটা জানিনা, বোধহয় ম্যানেজারকে।

অশ্বিনী ম্যানেজারের দিকে তাকায়। ম্যানেজার বলেন, "আমি রাত দুটোয় ফ্যাক্টরিবাবুর টেলিফোনে প্রথম খবর পাই"—

"ফ্যাক্টরিবাবু কার কাছে খবর পান"—

"সেটা আমি জানি না"—

"তাহলে ফ্যাক্টরিবাবুর কাছ থেকে প্রথম শুনে নি"—

ম্যানেজার বড়বাবুকে বলেন ফ্যাক্টরিবাবুকে ডেকে আনতে। বড়বাবু বেরিয়ে গেলে অশ্বিনীকে ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার সঙ্গে ভট্চাযের দেখা হয়েছিল ?"

হ্যাঁ। ভট্চাযই তো তোমাদের ড্রাইভারকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলো।"

"হ্যাঁ, সে জন্যই আমি ড্রাইভারকে বলে দিয়েছিলাম আগে ভট্চাযের সঙ্গে দেখা করতে"—

অশ্বিনী খানিকটা অর্ধচেতনভাবেই বোঝবার চেষ্টা করে ভট্চাযের প্রশ্নটা আসছে কেন। অশ্বিনী যেন জানে সমস্ত ঘটনা নিজস্ব গতিতে এগোবে, আর তাতে তার যেটুকু করার সেটুকু তাকে দিয়ে করিয়ে নেবে। পাছে, তার করণীয় কাজটি সময়মতো সে করতে না পারে সেই ভয়ে তাকে যা একটু সতর্ক থাকতে হয়। কাল যেমন ইয়োরোপিয়ান ক্লাবের বারের ভেতরের ছোট্ট বারান্দায় যা করণীয় ছিল তা যথাস্থানে করা হয়নি বলে তার খানিকটা শুধতে হয়েছিল বাড়িতে ওঠার সিঁড়ির বাঁকে। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে আসার জন্য অশ্বিনীর ও সাহেবদেরও মুখেচোখে যে-গাম্ভীর্য লেগে ছিল অশ্বিনী নিজে সেটা ভাঙার কোনো উদ্যোগ নেয় না। থাক্ না, দেখা যাক কী হয়।

ফ্যাক্টরিবাবু এসে দাঁড়ালে অশ্বিনী বলে, "একটা আলাদা ঘরে কথা বলতে পারলে সুবিধে হতো," ম্যানেজার খানিকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাকে সামনের ঘরটা দেখিয়ে দেয়। অশ্বিনী উঠতে উঠতে বড়বাবুকে বলে, "কিছু শাদা কাগজ দেবেন"—

একুশ

নির্দিষ্ট ঘরটির চেয়ারে বসে, ফ্যাক্টরিবাবুকে বসতে বলে, কাগজ-কলম নিয়ে ফ্যাক্টরিবাবুর দিকে তাকানো মাত্র অশ্বিনী বোঝে বন্ধু-স্থানীয় ফ্যাক্টরিবাবুর সঙ্গে তার পুরনো সম্পর্কের কণামাত্রও এখানে অবশিষ্ট নেই। কেমন করে যে সমস্ত সম্পর্ক এখন ফ্যাক্টরি অ্যাসিস্টান্ট আর সেন্ট্রাল এক্সাইজ ইনস্পেক্টর—এই সম্পর্কটায় এসে স্থিরচিত্রের মতো অনড় অচল অপরিবর্তনীয় হয়ে যায়। ফ্যাক্টরিবাবু

অশ্বিনীর দিকে তাকান না। কাগজ কলমের দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "আপনি প্রথম খবর পেলেন কার কাছ থেকে ?"

"রাত পৌনে দুটোর সময় দারোয়ান আমাকে জানায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে—

"তাহলে সেই দারোয়ানকে আগে দরকার"—অশ্বিনী ফ্যাক্টরি-বাবুকে থামিয়ে দেয়। পরে কিছু ভেবে বলে, "আচ্ছা, আপনার স্টেটমেণ্টটা আপনি দিন তো, দারোয়ানেরটা পরে নেব, আচ্ছা দাঁড়ান, আমি দারোয়ানকে ডাকতে বলি"—অশ্বিনী উঠে দরজার কাছ থেকে ফিরে বলে, "নাম কি ?" "আমাকে বড় বাহাদুর খবর দেয়।"

ফিরে এসে অশ্বিনী বসলে ফ্যাক্টরিবাবু বলা শুরু করেন। তার বিবৃতিটা দাঁড়ায় রাত পৌনে দুটোয় বড় বাহাদুর দারোয়ান এসে তাঁকে জানালে ফ্যাক্টরিবাবু সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে যান। ফ্যাক্টরির চারপাশে দু-জন দারোয়ানকে নিয়ে ঘুরে দেখেন।

"ফ্যাক্টরি খুলে দেখেন না ?"

"রাতে কাজ হলে চাবি আমার কাছে থাকে, না হলে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের কাছে"—

"এখন চাবি কার কাছে আছে"—

"জানি না কার কাছে, আমার কাছে নেই, ম্যানেজার বা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের কাছেই থাকার কথা।"

"আপনার কাছে চাবি শেষ কবে ছিল"—

"পঞ্চমীরও আগে। তারিখটা বলতে পারছি না"—

"তারপর আপনি কি করলেন"—

"আমি কিছু দেখতে না-পেয়ে—"

"কিছু দেখতে না-পেয়ে মানে ? ফ্যাক্টরির কোথাও কোনো কাটা ভাঙা কিছু দেখেন নি ?"

"তখন, রাত্রিতে একবার ঘুরেছি, দেখি নি।"

"পরে সকালে ?"

"আর আমি ফ্যাক্টরিতে যাই নি—"

"তারপর ?"

"তারপর আমি বড়বাবুকে গিয়ে ডেকে তুলে বললাম। ওখান থেকে ম্যানেজারকে ফোন করা হলো।"

"ফোন কে করলেন, আপনি না বড়বাবু ?"

একটু থেমে ফ্যাক্টরিবাবু বললেন, "আমি করলাম, বড়বাবু পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন"—

"কটার সময় ফোন করেন ?"

"ঘড়ি দেখি নি। পৌনে তুটোয় খবর পাই, পনের মিনিট তো নিশ্চয়ই ফ্যাক্টরির চারপাশে ঘুরতে লেগেছে, তাহলে ধরুন তুটো। তবে অপারেটর ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই একটু সময় লেগেছে। সুতরাং তুটো পাঁচ-দশও হতে পারে।" ফ্যাক্টরিবাবু থামেন। অশ্বিনী কোনো প্রশ্ন করে না দেখে আবার বলতে থাকেন, "মিনিট পাঁচ-সাতের ভেতরই বড়সাহেব, ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এস্ট্যাবলিশমেণ্ট এসে পড়েন। তখন থেকে সাহেবরা আমি আর বড়বাবু এই অফিসে আর ফ্যাক্টরির সামনেই ঘোরাঘুরি করছি। আপনাকে খবর পাঠানো হয়। ভোর হলে আমরা সবাই-ই হাতমুখ ধুতে বাড়ি গেছি। তারপর আপনি এলেন।" ফ্যাক্টরিবাবু থেমে গিয়েছেন দেখে অশ্বিনী বলে, "সাহেবরা এলে গুদাম খোলা হয়, না ?"

"আমি জানি না"—

"আপনি তো বললেন সবাই একসঙ্গে ছিলেন ভোর পর্যন্ত।" ফ্যাক্টরিবাবু তাও কোনো কথা বলেন না দেখে অশ্বিনী বলে, "গুদামে প্রথম কে ঢোকে ?"

"আমি জানি না। আমি গুদামে ঢুকি নি।"

"গুদামে কেউ ঢুকেছিল কি না বা এই চুরির খবর জানার পর

কেউ, মানে ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার বা বাবুরা কেউ গুদামে ঢুকে সব দেখে-টেখেছিলেন কিনা আপনি জানেন না ?"

"না।"

যে-কাগজে প্রশ্নোত্তরগুলো লিখছিল, অশ্বিনী সেই কাগজগুলো একবার আঙুলের আগায় ঘষে, তারপর ফ্যাক্টরিবাবুর পাশ দিয়ে তাকায়, যেন কথাগুলো শেষ হলো কিনা সে-বিষয়ে সে নিশ্চিত হতে পারছে না। তারপর প্রথম পাতাটার ওপর বুলিয়ে চোখটা তুলে খুব অলসভাবে তার প্রশ্ন আর ফ্যাক্টরিবাবুর উত্তরগুলো পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে অশ্বিনী মাঝেমাঝে থামে।

"ঠিক আছে ?"

"হ্যা। তবে বাংলায় লিখলে আমাদের বোঝার সুবিধে হয়।"

"ঠিক আছে। দাঁড়ান, এই দুটো জায়গাতে একটু ইনিসিয়াল করে দেন, কাটাকুটি হয়েছে।" ফ্যাক্টরিবাবু সই করে দেন। তারপর কাটাকুটির জায়গাগুলোতে তলায় অশ্বিনী সই করে। ফ্যাক্টরিবাবুও তলায় সই করেন। ফ্যাক্টরিবাবু বলেন, "তাহলে যেতে পারি ?"

"হ্যা, হ্যা। দেখবেন তো দারোয়ানটা এসেছে কি না।" অশ্বিনী আর একটা সাদা কাগজ টেনে নেয়।

বাইশ

বুড়ো দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে প্রথমেই জানা যায় তার কোনো ডিউটি ছিল না, সে হচ্ছে হেড্ দারোয়ান, তাকে একজন এসে খবর দেয় যে তিন নম্বর লাইনের রাস্তায় চা পাচার হচ্ছে। সে সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরিবাবুকে খবর দিয়েছে, তারপর সাহেব আর বাবুদের সঙ্গে ফ্যাক্টরির সামনে সকাল পর্যন্ত বসে থেকেছে। অশ্বিনী যখন জিজ্ঞাসা করে যেখানে চায়ের বস্তাটা পড়ে আছে সেখানে গিয়েছে কি না তখন সে বলে হাঁা, সাহেব আর বাবুদের সঙ্গে গিয়েছে। "কখন ?"

"বড়বাবুর বাড়ি থেকে বড়সাহেবকে ফোন করল। তারপরই সাহেবরা আসলেন। তারপর গুদামটা দেখে তিন নম্বর লাইনের রাস্তায় সবাই মিলে যাওয়া হলো।"

"ফ্যাক্টরিবাবুও গিয়েছিলেন?"

"যারা ছিলাম সবাই-ই তো গেলাম, রাতে তো আর গুণে গুণে দেখি নাই কে কে আছে।"

"গুদামে কেউ ঢুকেছিল?"

"জানি না, আমি ঢুকি নাই।"

"গুদামের চারপাশে যখন ঘুরেছ তখন কোনো ভাঙাচোরা টুটা-ফুটা দেখেছিলে?"

"রাত্রিতে তো বোঝা যায় নাই, সকালে তো আর যাই নাই।"

হেড্ দারোয়ানকে যে খবর দিয়েছে সে বললো তার ডিউটি তিননম্বর লাইনের রাস্তায় ছিল না। তিন নম্বর লাইনের রাস্তা থেকে চৌকিদারের ডাক শুনে সে গিয়ে দেখে চায়ের বস্তা পড়ে আছে, আরো দুই জন চৌকিদার সেখানে এসেছে। সে তারপর এসে হেড্ দারোয়ানের কাছে খবর দেয়। সে-ও গুদামের চারপাশে ঘুরে দেখে। সে-ও সবার সঙ্গে তিন নম্বরের রাস্তায় আবার আসে। সে গুদামে ঢোকে নি, কাউকে ঢুকতে দেখে নি।

বাকি দুই দারোয়ানের সঙ্গে অশ্বিনীর কথা বলা মুশকিল, তারা নেপালি ছাড়া জানে না। বড়বাবু দোভাষির কাজ করলেন। কিন্তু কিছুতেই যেটা বেরলো না সেটা হচ্ছে চোরদের বস্তাটা নিয়ে পালাতে কে প্রথম দেখেছে। প্রত্যেক দারোয়ান বললো তারা চিৎকার শুনে গিয়েছে। সেটা খুবই সম্ভব, এক-একজনের এক-একটা চৌহদ্দিতে পাহারা থাকে। বাগানের সেই চৌহদ্দিটা সে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। বাগানের ম্যাপ এনে দেখা গেল তিন নম্বর লাইনের রাস্তাটা এ-রকম প্রায় তিনটি চৌহদ্দির সীমারেখা। বস্তা পড়ে থাকতে দেখেছে বলে সবাই ম্যাপটাতে একই জায়গা দেখায়।

দু-সারি কুলি বস্তির মাঝখানে তিন নম্বর লাইনের রাস্তাটা ছাড়া অন্য এমন নানা দিক দিয়েও যাওয়া যায় যা কোনো না কোনো চৌকিদারের চৌহদ্দির একেবারে ভিতরে পড়ে। তাতে অবিশ্যি এটা প্রমাণ হয় না যে সেই চৌহদ্দির চৌকিদারকে দেখতেই হবে। চৌকিদার তো আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। ম্যাপে দেখা যাচ্ছে বাগানের ঐ সীমানাটা অনেকখানি জুড়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মতো হয়ে গেছে, তারপর সেই ফার্স্ট ব্র্যাকেট থেকে ইংরেজি S অক্ষরের মতো সীমানাটা এঁকে বেঁকে গেছে। ঐ S অক্ষরের প্রথম যে বাঁকটা তার সামনে খানিকটা সমতল। সেই সমতলের পরেই বাগানের বর্ডার। চোরদের নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য ছিল এখান দিয়ে মাল পাচার করা। বাগানের বর্ডারের শেষে খাড়া নিচে রাস্তা। ঐ S অক্ষরের প্রথম বাঁকটার মাঝখানে তিন নম্বর লাইন। মালগুলো পড়েছিল মাঠের মাঝখানে। যে জায়গাটায় চায়ের বস্তাগুলো পড়ে থাকতে সবাই দেখেছে, বাগানের ঐ জায়গাটিকেই সব দিক থেকেই দেখা যায়। ইংরেজি S অক্ষরটার মতো বাঁক যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মতো অংশটা থেকে শুরু হয়েছে তার মাঝখান থেকে শুরু করে S-এর তলার বাঁকটার মাঝখানটা পর্যন্ত সমস্ত অংশের যে-কোনো একটা জায়গা থেকে চোরদের মাল নিয়ে পালাবার রাস্তাটা চোখে পড়ে। তার জন্যই সব চৌকিদারই বলছে সে চিৎকার শুনেছে। জায়গাটা যদি এমন হতো যে মাত্র একটা নির্দিষ্ট ব্লকের চৌকিদারের চোখেই পড়তে পারে তাহলে তাকে ধরা যেত। চোরদের পালাবার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা ছিল S-এর মাথার ওপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মতো যে অংশটা লেগেছে তার মাঝখান দিয়ে। আর ম্যাপেও দেখা যাচ্ছে গুদামের পেছন থেকে চা-বাগিচার ভেতর দিয়ে ঐ জায়গায় যাওয়াও সম্ভব।

চোররা কোন্ রাস্তা দিয়ে পালালে ভালো হতো, কেন পালালো না, এমন জায়গা দিয়ে কেন পালালো যেটা পাশাপাশি কটি ব্লকের

চৌকিদারের চোখে পড়তে পারে—সেটা অশ্বিনীর অনুসন্ধানের বিষয় নয়। অশ্বিনী আন্দাজ করতে চাইছে গুদাম থেকে চা পাচারের কোনো ব্যাপার হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ায় চুরির কথা বলা হচ্ছে কি না। চুরি কি চুরি না, সেটা থানা দেখুক গে। অশ্বিনীকে দেখতে হবে গুদাম থেকে ট্যাক্স্ না দিয়ে কোম্পানি চা পাচার করছে কি না।

এই প্রশ্নটা যখন অশ্বিনীর মাথায় ঢুকেছে তখনই সাহেবদের জিজ্ঞাসাবাদের পালা আসে। বড়বাবু এসে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি ও-ঘরে যাবেন ?" অশ্বিনী সাহেবদের সঙ্গে কথা বলতে ম্যানে-জারের ঘরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়ও। কিন্তু হঠাৎ বলে বসে, "ফ্যাক্টরি-সাহেবকে একটু আসতে বলুন।" তারপর বসে পড়ে।

তেইশ

ফ্যাক্টরি-সাহেব এসে বসার পর অশ্বিনী বোঝে সে যে ও-ঘরে গিয়ে সাহেবদের সঙ্গে কথা না বলে ডেকে পাঠাতে পেরেছে তার কারণ আজকের বা কালকের শেষ রাতের ঘটনা তাকে আজ এই ঘরে বসিয়ে দিয়েছে। এই ঘরে বসেই তাকে কথা বলতে হবে। খানিক-ক্ষণ ফ্যাক্টরি-সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদের পর এটাও সে বুঝতে পারে আলাদা ঘরে বসে কথা বলাটা সাহেবের পক্ষেও বোধহয় ভালোই হয়েছে। সাহেব বলেন, সোয়া ছটা নাগাদ ম্যানেজারের টেলিফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের বাংলোতে চলে যান, তারপর থেকে ম্যানেজারের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, আজ সকালে বাড়িতে মুখহাত ধোয়ার সময়টুকু ছাড়া। তিনি ম্যানেজারের ও অন্যান্যদের সঙ্গে চুরিটা যেখানে ধরা পড়েছে সেখানে গিয়েছেন। কোন্ চৌকিদার কোথায় পাহারা দেয় এ-সব তাঁর জানা নেই। এ-সব ঠিক করে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-এসট্যাবলিশমেণ্ট। এ-সব আসলে বড়-বাবুই অন্য কোনো বাবুকে দিয়ে করান। গুদামের ব্যাপারে সাহেব

খুব পরিষ্কার বলেন তিনি গুদামে ঢোকেন নি কারণ তাঁর মনে হয়েছে পুলিশ বা এক্সাইজ আসার আগে কারো গুদামে ঢোকা উচিত নয়। তিনি কাউকে গুদামে ঢুকতে দেখেন নি। তবে তিনি আসার আগে বা যখন গুদামের সামনে ছিলেন না তখন কেউ ঢুকেছে কিনা বলতে পাবেন না। ঠিক এই জায়গাতে গুদামের চাবির প্রসঙ্গটি অশ্বিনী তোলে। অন্যান্য প্রশ্নের যেমন সরাসরি উত্তর সাহেব দিচ্ছিলেন এই প্রসঙ্গটাতে তেমন সরাসরি জবাব দিতে পারেন না। "ইনস্পেক্টর হিসেবে তুমি নিশ্চয়ই জানো যে একটা উৎপাদন-কেন্দ্রে চাবির আইনানুগ অবস্থা যাই হোক, বাস্তবে যে কাজ করে তার ওপর কিছুটা দায়িত্ব বর্তায়।"

অশ্বিনী—"সরকারের লোক হিসেবে চাবির আইনানুগ অবস্থাটা শুধু আমার জানা দরকার।"

সাহেব—"সে তো তুমি ভালোই জানো, বাগানের সব কাজ ম্যানেজারের নামে হয়। আমরা ম্যানেজারের দেওয়া ক্ষমতাগুলি ভোগ করি। আজ আমি ফ্যাক্টরিতে আছি, কালই ম্যানেজার আমাকে হুকুম দিয়ে বাগানে বদলি করে দিতে পারে।"

অশ্বিনী—"ফ্যাক্টরিতে তো রাত্রির কাজ বন্ধ। রাত্রিতে এখন চাবি কার কাছে থাকে।"

সাহেব—"একটা চাবি ম্যানেজারের কাছে থাকার কথা। আর একটি চাবি ফ্যাক্টরিবাবুর কাছে থাকতে পারে, অন্তত তাই থাকে।"

অশ্বিনী—"তোমাদের ফ্যাক্টরি রাত্রিতে বন্ধ থাকলে, সকালে কে খোলে?"

"ফ্যাক্টরির দারোয়ান।"

"ফ্যাক্টরির দারোয়ানের কাছে তো আর চাবি থাকে না। সে চাবিটা কার কাছ থেকে নেয়?"

"সেটা অবস্থার ওপর নির্ভর করে। ম্যানেজারের কাছ থেকেও

নিতে পারে, ফ্যাক্টরিবাবুর কাছ থেকেও নিতে পারে, আমার কাছ থেকেও নিতে পারে।"

"তোমার কাছে কাল রাত্রিতে ফ্যাক্টরির চাবি ছিল কি?"

"হ্যাঁ ছিল। এখনো আছে। গুদামের একটাই চাবি আমার কাছে আছে।"

"তোমাদের গুদামের চাবি কটা?"

"আমি জানি না"—

অশ্বিনীর প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল গুদামের দায়িত্ব যে-অফিসারের ওপর আছে, গুদামের মালের রক্ষণাবেক্ষণ তারই দায়িত্ব—কিন্তু বলে না। কারণ ও-সব জেনেশুনেই নিশ্চয় সাহেব চাবির ব্যাপারটা একটু গোলমেলে রাখছে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারকে অশ্বিনী বলে, "আমার আর কিছু জিজ্ঞাসার নেই," সাহেব "ধন্যবাদ" বলে লাফিয়ে দাঁড়াল, গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল।

ম্যানেজার ঘরে ঢুকতেই অশ্বিনী দাঁড়িয়ে ওঠে। এ বাগানে ম্যানেজার তার নিজের ঘরে, নিজের চেয়ারে বসতেই অভ্যস্ত। তাকে আর একটা ঘরে, আর একটা চেয়ারে বসে, আর একজনের প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে—এই অবস্থাই ঘটনাটাকে খানিকটা যেন জটিল করে তোলে। দারোয়ানরা যখন বলে নি কে প্রথম দেখেছে তখন ম্যানেজার আর সে-বিষয়ে কি বলবেন। গুদামে ঢোকার ব্যাপারে ম্যানেজার বলেন তিনি তো ঢোকেনই নি, সবাইকে ঢুকতে নিষেধও করে দিয়েছিলেন। কাল রাত্রিতে একবার মাত্র ফ্যাক্টরির চারপাশে ঘুরেছেন, কোথাও কোনো ভাঙা বা কাটার চিহ্ন দেখেন নি। চাবির ব্যাপারেও ম্যানেজার পরিষ্কার জবাব দেয় গুদামের চাবির দায়িত্ব গুদামের অফিসারের। তিনি যদি কাউকে চাবি দিয়ে থাকেন, দায়িত্বও তাঁরই। আর অশ্বিনীকে বলতেই হয়—"অফিসাররা তোমার দেয়া ক্ষমতায় কাজ করে, সুতরাং দায়িত্ব তো তোমারও।"

ম্যানেজার একটু গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়—"দায়িত্ব সবই তো আমার, যেহেতু আমি এ-বাগানের ম্যানেজার। কিন্তু আমার দেয়া ক্ষমতায় যদি কারো চাবি রাখার কথা হয় তাহলে চাবির দায়িত্বটাও তারই।" অশ্বিনী ম্যানেজারকে সরাসরি বলে বসে, "তোমাদের চুরির ব্যাপার আমার দেখার বিষয় নয়, সে পুলিশ দেখবে। আমার দেখার কথা গুদামের মাল ট্যাক্‌স্ না দিয়ে বেরুচ্ছে কিনা, যদি বেরয় তার দায়িত্ব কোম্পানির। তোমাদের কোম্পানির নিয়ম অনুসারে গুদামের চাবি দারোয়ানের কাছেই থাকুক আর ম্যানেজারের কাছেই থাকুক সেটাও আমার দেখার কথা নয়। সবার সঙ্গে কথা বলে আমার সিদ্ধান্ত হয়ে যাচ্ছে যে গুদামের চাবি কার কাছে থাকে সে-বিষয়ে এ-বাগানের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, থাকলেও সে নিয়ম মানা হয় এমন নিশ্চিত বলা যায় না, চাবি কটি বা কার কার কাছে ছিল বা রোজ গুদাম খোলে কে—এই তিনটি প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায় নি। সুতরাং এই ঘটনার রাত্রিতে গুদাম আইনানুগ অবস্থায় ছিল না—এমন একটি আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার মতো সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি। এর সঙ্গে যদি ফ্যাক্টরিতে ভাঙাচোরার কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহলে প্রমাণ হবে যে ফ্যাক্টরির দরজা খুলেই চা বেরিয়েছে। তার দায়িত্ব সম্পূর্ণতই কোম্পানির।" কথাগুলো অশ্বিনী খুব ধীরে ধীরে বলে, ব্যাখ্যা করার মতো করে নয়, অবস্থাটা যা দাঁড়িয়েছে তার একটা নিরপেক্ষ বর্ণনা দেয়ার মতো করে, এই নিরপেক্ষতাটা অশ্বিনীর বিশেষ ধরন নয়। অশ্বিনী শুধু ঘটনার গতির দিকে চোখ রেখে কথাটা বলতে চায়—ঘটনাটা তাকে কোথায় এনে ফেলেছে। তাকে এনে ফেলা মানেই এক্ষেত্রে কোম্পানিকে, বাগানকে এনে ফেলা। কোম্পানি যদি এখন আবার ঘটনাটাকে না বদলায় তাহলে অশ্বিনী অবিকল এই কথাগুলি লিখে ফেলবে। অশ্বিনী যতক্ষণ কথা বলছিল সাহেব "হুঁ হুঁ" করে শুনছিলেন, মাঝে-মাঝে "ইয়েস" "ইয়েস" বলছিলেন আর বাঁ হাতটা নাড়ছিলেন।

অশ্বিনী কথাগুলি বলা শেষ করার পর সাহেব চুপ করে যান। এই চুপ করে থাকার সময়টুকুতে অশ্বিনীর কাছে ধরা পড়ে কখন একসময়- ম্যানেজার যে এই বাগানের ম্যানেজার হয়েও অন্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছেন আর-একটা চেয়ারে বসে—অবস্থার সেই জটিলতা- টুকু কেটে গিয়ে এমন সরাসরি অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে সরকারের সঙ্গে কোম্পানির কথা হচ্ছে। অশ্বিনী কথাগুলোকে বুঝে নেয়ার জন্য ম্যানেজার নিজের বাঁহাতের তালুতে ডানহাতের তর্জনীটাকে ঠুকে ঠুকে মেঝের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন—"ইউ সে ইনস্পেক্টর, দ্যাট ইন অ্যাবসেন্স অভ্ এনি প্রুফ", সাহেব থামেন, জিজ্ঞাসা করেন —"প্রুফ অর অ্যাডমিশন?" অশ্বিনী বলে, "প্রুফ্ অ্যাণ্ড অ্যাডমিশন" সাহেব আবার শুরু করেন, "ইন অ্যাবসেন্স অভ্ এনি প্রুফ অ্যাণ্ড অ্যাডমিশন অভ এক্জিসটেন্স অভ এনি সাচ রুল অ্যাজ উইথ হুম্ দি কী অর কীস্ অভ দি ফ্যাক্টরি আর কেপ্ট অ্যাণ্ড অ্যাজ ইট ক্যাণ্ট্ বি ডিটারমিণ্ড্ হাউ মেনি কীস্ আর দেয়ার অ্যাণ্ড হু কিপ্স্ দেম দি কনক্লুসন দ্যাট অন দি নাইট অফ অকারেন্স দি ফ্যাক্টরি ওয়াজ নট প্রোটেকটেড বাই কমপ্লায়ান্স উইথ দি প্রভিশন্স্ অ্যাজ রিকোয়ার্ড আণ্ডার ল কাণ্ট বি ওভাররুল্ড্।" সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। যেন কথাগুলোর অর্থ বোঝেন। মাথাটা একটু নিচু। তারপর বলেন, "ইনস্পেক্টর, সেটা তো আমার কোম্পানির সমস্ত গুডউইলে কলঙ্ক দেবে। আমি তো তা করতে পারি না। ম্যানেজার হিসাবে আমি বলছি গুদামের চাবি একটাই, মানে একসেট চাবি আমার কাছে থাকে, আমার সামনে গুদাম খোলা হয়, গুদামের সমস্ত আইন মানা হয়।"

"কিন্তু তোমার ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার তো বলে গেল গুদামের চাবি সে রাত্রিতে তার কাছেও একটা ছিল, যদিও সে জানে না গুদামের ক-সেট চাবি আছে ও কার কার কাছে থাকে।

"তুমি তাকে এই বিবরণটি বাদ দিতে বলতে পার।"

"আমি কি করে বলব, সে সই করে গেছে"—অশ্বিনী কাগজটা দেখায়। ম্যানেজার আবার চুপ করে যান। তারপর বলেন, "কিন্তু সেটা তো আমাদের ভেতরের ব্যাপার। দায়িত্ব আমার, আমি তার কাছে রাখতে পারি। আমি তো বলছি চাবি একটা সেট-ই।"

এবার অশ্বিনী চুপ করে থাকে। অশ্বিনী বুঝতে চায় একটা চুরির ব্যাপারে যাতে জড়িয়ে পড়তে না হয় তার জন্য সবাই নিজেকে দায়িত্বমুক্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা পাচ্ছে কি না। দারোয়ানরা তো নিশ্চয়ই তাই, বাবুরাও। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার-ও। কিন্তু যদি এটা সামান্য একটা চুরির ব্যাপারই হতো তা হলে সবাই এত সাজিয়ে গুছিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করত না—একটু-আধটু এলোমেলো করত। তাহলে সবাই ভেতরে ভেতরে জানে যে গুদাম থেকে মাল পাচার হয়, তাই এত সতর্কভাবে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছে? তাই যদি হবে তাহলে ম্যানেজার এত ঠাণ্ডা মাথায় নিজের ঘাড়ে সব দোষ নেয় কি করে? তাহলে ম্যানেজারের আড়ালে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার থেকে শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা ছিল? অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "কিন্তু স্যার, আসল ব্যাপারটা কি? তোমাদের চাবি কার কাছে থাকে?" "ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার এবং ফ্যাক্টরিবাবু—এদের উপরই গুদামের দায়িত্ব, সব সময়, কিন্তু এ-প্রসঙ্গ বাদ দাও। এই বাগানের ম্যানেজার হিসেবে বলছি দায়িত্ব আমার।" স্টেটমেণ্টটা একবার দেখে নিয়ে সই করার জন্য অশ্বিনী কাগজটা এগিয়ে দেয়, তারপর "আমি গুদামে ঢুকব, পুলিশ ইনস্পেক্টর আছেন তো!"

"পুলিশকে তো খবর দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনো পুলিশ আসে নি।"

অশ্বিনী একটু আশ্চর্য হয়ে যায়—"সে কি কথা। এত বড় একটা চুরি হলো, এখনো পুলিশ আসে নি? এটা কি রকম?"

"এখনই আমি আবার খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি কি তাহলে ফ্যাক্টরিতে এখন যাবে না ?"

"পুলিশ এসে সব ক্লিয়ারেন্স না-দিলে আমি ঢুকব কি করে ?" ম্যানেজার বড়বাবুকে ডাকতে ডাকতে চলে যান।

চব্বিশ

পুলিশ কখন আসে সেই অপেক্ষায় সেই ঘরের ভেতর অশ্বিনী একা-একা বসে থাকে। প্লেনভিউয়ে সেদিন একটা বেড়াল ছিল, আজ তাও নেই। ছুটির দিন, অফিসে কেউ আসে নি। দূর মণ্ডপ থেকে মাঝেমধ্যে ঢাকের কাঁসির আওয়াজ পাওয়া যায়। এ-ঘরটার সমস্ত দরজা জানলাও খোলে নি। অশ্বিনীকে এই আধো অন্ধকার ঘরটিতে সম্পূর্ণ একা একা বসে থাকতে হয়, বসে থেকে যেতে হয়, যতক্ষণ না বাইরে, তার চোখের বাইরে, শোনার বাইরে নানা ঘটনা বা নানা ব্যক্তির নানা যোগাযোগ তার একটা ভূমিকা তৈরি হয়ে যেতে থাকে। এ-যেন মাতৃগর্ভে বসে বসে অপেক্ষা করা ডাক্তার নার্সরা সব এসেছে কিনা, যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক আছে কিনা, জল গরম করা হয়েছে কি না,—তারপর জন্ম নেয়া।

বেলা দুটো নাগাদ অফিসের বাইরে একগাদা জুতোর শব্দে অশ্বিনী সচকিত হয়। তাহলে পুলিশ এসেছে।

কিন্তু একা পুলিশ ইনস্পেক্টর ঘরে ঢুকে বলে, "নিন মশাই আমার কাজ শেষ, এখন আপনার কাজ শেষ করুন।" যে-চেয়ারটাতে বসে সবাই অশ্বিনীর নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছে সেই চেয়ারটাতেই ইনস্পেক্টর বসে। এক প্যাকেট সিগারেট বের করে অশ্বিনীকে একটা দিয়ে আর নিজে একটা ধরিয়ে বলে, "মনে হয় এমনি চুরি, বাগানের কেউ মানে, অফিসার বাবু এরা কেউ, জড়িত নেই বলেই মনে হয়। মানে আপনার কেস যা বোধ হয়, গুদামের পেছন দিকের এক কোণার একটা টিন একেবারে খুলে ফেলেছে।"

"তবে যে সবাই বললেন কেউ গুদামের কোনও কাটা-ফাটা বা ভাঙা দেখেন নি"—অশ্বিনী যেন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকেও জেরা শুরু করে দেয়।

"ঠিকই বলেছেন। একেবারে একটা জায়গায় জোড়ায় মানে ঝালাইয়ের জোড়া মিলিয়ে কেটেছে। তিন ফুট বাই তিনফুট। কেটে টিনটা এমনভাবে সেট করে রেখেছে যে বাইরে থেকে বোঝবার কোনো উপায়ই নেই।"

"কিন্তু বাইরে থেকে কী ভাবে আটকে রেখেছে?"

"সিমেন্টের নিচের খাঁজটা তো ছিলই। আর ওপরেরটা কাটার লাইনে লাইনে মিশিয়ে দিয়েছে। কাটার লাইন ধরে খুব সূক্ষ্মভাবে পিচও লাগানো আছে, পিচই মনে হলো মানে সামথিং গাম। আঠা কিছু যেন। আমার মনে হচ্ছে ওপরের দুই কোণায় গুদামের বেড়ার টিনটা কোণা করে রাখা ছিল বোধ হয়। যখন আটকাতো তখন ঐ কোণাটা আটকে দিত।"

"মানে আপনি বলছেন, চুরিটা নিয়মিত হতো।"

"আমার তো তাই মনে হচ্ছে। অন্তত সারকাম্‌স্টান্সেস তো সে-দিকেই লিড করছে। খুব অর্গানাইজ্‌ড্‌ গ্যাঙ মশাই। গাড়ি ফাড়ি নিয়ে আসত কি না তাই বা কে জানে। তবে যে-স্কেলের কাজ তাতে গাড়ি আনাও বিচিত্র নয়। সে-সব তো ইনভেসটিগেশনের ব্যাপার, এখানে ও-রকম তিনটি গ্যাঙ্‌ আছে।"

"আচ্ছা, টিনের কাটা দাগটা বাইরে থেকে না ভেতর থেকে, মানে কোন দিক দিয়ে কাটা হয়েছে।"

"বাইরে থেকে, না, না মশাই, ও-সব কিছু না। লেবারদের ভেতর কেউ কেউ জড়িত থাকতে পারে, পারে কেন নিশ্চয় আছে, তবে চা-পাচারের কোনো ব্যাপার নয়।"

"কাটার দাগটা কি ফ্রেস না বেশ কিছুদিনের পুরনো, মানে আপনি বলছেন কি না যে এটা একটা নিয়মিত ব্যাপার চলছিল বলে আপনার মনে হচ্ছে, কাল ধরা পড়ে গেছে,"

"কাটার দাগটা দেখতে পেলে বোঝা যেত, কিন্তু সেখানে তো পিচ লাগানো।"

"পিচ লাগানো কেন বলুন তো।"

"সেটাই ভাবছি, দুটো কারণ হতে পারে। এক, কালো রঙের সঙ্গে কাটার দাগটা মিশিয়ে দেয়া। দুই, ঐ পিচ জাতীয় জিনিসটা যদি আঠার মতো কিছু হয় তাহলে ঐ কাটা জায়গাটাকে ঠিক মতো লাগিয়ে রাখা, যাতে দরকারের সময় খোলা যায়। কিন্তু সেটা তো কেমিক্যাল টেস্ট না-হলে বোঝা যাবে না। আমি স্যাম্পেল নিয়ে টেস্টের জন্য পাঠাচ্ছি। টেস্টের রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে পার-পাসটা কি ছিল। তবে যেভাবে এই স্ট্রংলি বিল্ট গুদাম কেটেছে তাতে বুঝতে হয় যে হাইলি স্কিল্ড্ গ্যাঙ। এ-রকম দুটি তিনটি গ্যাঙ এই অঞ্চলে অপারেট করে।

"আচ্ছা, ওরা যে-যায়গাটা কেটেছে, অর্থাৎ যেখান দিয়ে ওরা গুদামে ঢুকবে সেটাতো চেস্টের গাদা দিয়ে আটকেও যেতে পারে। তখন ওরা ঢুকবে কি করে। তাহলে তো ওদের এইটি এনসিওর করতে হয় যে ভেতরে যাতে ঐ ঢোকার জায়গাটার সামনে কোনো র‍্যাক না পড়ে—"

"সেটা খুব ইন্টারেসটিং। নাম্বার ওয়ান মজার ব্যাপার হচ্ছে এইটি যে ঠিক ঐ জায়গাটিতে সাধারণত কোনো চেস্টের র‍্যাক পড়ে না। কেন পড়ে না, অন্য বছর পড়ত কি না—ও-সব খোঁজ করে দেখলাম আপনাদের মাপটাপের যা ব্যাপার তাতে ঐটুকু জায়গা বাদ পড়ে যায়। নাম্বার টু, অথচ জায়গাটা ঐ খালি চেস্ট-টেস্ট, প্লাই ইত্যাদি দিয়ে সবসময়ই ঢাকা থাকে।"

"তাহলে তো তারা জানে প্যাক্ড্ চায়ের র‍্যাক কতটা আসবে বা আসে বা ঐ জায়গাটি দিয়ে ঢোকা সহজ হবে বা সম্ভব। তাহলে ভেতরের কারো জড়িত থাকা ইম্পসিব্ল্ নয়।"

"ইম্পসিব্ল্ তো কিছুই নয় মশাই। দু-একজন লেবারের জড়িত

থাকার সম্ভাবনাটাই বেশি। কিন্তু কাটার জায়গার লোকেশন দিয়ে সেটা ধরা যাবে না। কারণ দেয়াল থেকে চায়ের বাক্সগুলি কমপক্ষে দেড় ফুট দূরত্বে থাকে। ঐ দেড় ফুট দিয়ে একজন স্বচ্ছন্দে ঢুকে যেতে পারে, সেজন্য লোকেশনটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়। আর এরা তো সিল্‌ড্‌ চেস্ট চুরি করে না। লুজ টি বস্তায় বস্তায় নিয়ে যায় অথবা চেস্ট ফুটো করে বস্তায় চা ভরে নেয়। তবে খুব স্কিলড্‌ গ্যাঙ্‌ আর খুব ওয়াইড কানেকশন সব। এখান থেকে ট্রাক বোঝাই চা চুরি করে নিয়ে শিলিগুড়িতে বিক্রি হয়ে যাবে---কয়েকঘণ্টার ভেতর, রাস্তায় ধরলে ফল্‌স্‌ ইন্‌ভয়েস পর্যন্ত থাকে। এ-রকম তিনটি গ্যাঙ্‌ এই এরিয়ায় অপারেট করে।"

"গুদামের চাবিটাবির ব্যাপার নিয়ে কিছু পেলেন না কি—"

"আর মশাই, এ-সব ইয়োরোপিয়ান কনসার্নে কি আর ও-সব গোলমাল থাকে? ম্যানেজারের কাছে চাবি থাকে, ম্যানেজার খোলে, বন্ধ করে, ব্যস। আপনি তো সব স্টেটমেণ্ট নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, সকাল থেকে তো তাই করলাম।"

"আচ্ছা, তাহলে আমি চলি, আপনি আপনার কাজ করুন গে। কত চা গুদামে থাকল আর কত চা গেল হিসেব করুন গে"—দুই ইনস্পেক্টর একই সঙ্গে ঘর থেকে বেরোয়, বড়বাবু ওদের পেছন পেছন চলেন। গাড়িতে ওঠার সময় পুলিশের ইনস্পেক্টর বলেন, "তবে হাইলি স্কিল্‌ড্‌ গ্যাঙ্‌ মশাই, ওরা রাতারাতি আবার ঝালাই পযন্ত করে দিতে পারে, এমন স্কিল্‌ড্‌ আর ওয়েল ইকুইপ্‌ড্‌। এ-এলাকায় তিনটি এ-রকম গ্যাঙ্‌ অপারেট করে।"

দারোগার গাড়ি চলে যায়, অশ্বিনী ফ্যাক্টরির দিকে পা বাড়ায়।

পঁচিশ

আসলে দারোগার কাছে অশ্বিনী জেনে নিল যে যখন ওই ঘর থেকে বাইরে বেরোবে তখন অবস্থাটা কি আছে। একই সরকারের দুই

দারোগা। একজন পুলিশের, আর একজন আবগারির। আবগারির দারোগা এসে অপেক্ষা করে ছিল পুলিশের দারোগা অবস্থাটাকে কোথায় এনে তার হাতে দিয়ে যায়, সেজন্য। এখন পুলিশের দারোগা জানিয়ে দিয়ে গেল (১) 'হাইলি স্কিল্‌ড্' 'ওয়েল ইকুইপ্‌ড' 'ওয়েল কানেকটেড' এ-রকম তিনটি দল এই এলাকায় অপারেট করে (২) এই চুরিটা নিয়মিত হচ্ছিল, ফলে অনেক মাল-ই গুদাম থেকে বেরিয়েছে, (৩) খুব বড় একটা চুরির ব্যাপার, এর ভেতরে এক্সাইজের কোনো ভূমিকা নেই—শুধু কত মাল গেছে তার হিসেব বের করা ছাড়া। তাহলে ভট্‌চাযদের সঙ্গে "ওয়েল কানেকটেড" এ-বাগানের ম্যানেজার-অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের কোনো অসুবিধায় পড়তে হলো না।

অশ্বিনীকে কাজ করতে হলো অনেক। গুদামের সমস্ত খোলা চা নতুন করে ওজন করতে হলো। প্রতিটি চেস্ট দেখতে হলো, চা ঠিক আছে কিনা। প্রতিটি চেস্ট নতুন করে সিল করতে হলো। গাড়ি গিয়ে দার্জিলিং থেকে ওয়েল্‌ডার নিয়ে এলো। অশ্বিনী দাঁড়িয়ে থেকে সেই সম্পূর্ণ জায়গাটির ঝালাই দেখল।—মোট তিন হাজার কেজি চা কম পড়ল। অশ্বিনী স্টক রেজিস্টারে লিখল অত তারিখে চুরির খবর পেয়ে সমস্ত মাল ওজন করে দেখা গেল মোট তিনহাজার কেজি চা কম। চুরির বিষয়টা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তের জন্য আছে। সেই তদন্তের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই তিনহাজার কেজি চায়ের হদিস পাওয়া যাবে না। সুতরাং আজ মোট এত হাজার এত শ, এত কেজি চায়ের মজুত পরীক্ষা ও ওজন করে দেখা গেল। গুদামের যে-জায়গাটি কাটা হয়েছিল সেটা তার সামনেই ঝালাই করা হয়েছে।

কিন্তু অশ্বিনীর কাছে বাগানের দারোয়ান থেকে শুরু করে ম্যানেজার পর্যন্ত যে-সব কথা বলেছে তার নথিগুলোতে যে সই করা প্রমাণ থেকে যায় চোর কেউ দেখে নি, চাবি কার কাছে থাকে কেউ

জানে না, কে গুদাম খোলে কেউ জানে না আর তৎসত্ত্বেও ম্যানেজার বলে দায়িত্ব সব তারই। ঐ রকম লোহার পাত দিয়ে তৈরি দেয়াল একেবারে তিনবাই তিন সরল রেখায় কাটা হয়, যেন অনেক রয়েসয়ে, আবার কাটা দাগের ওপর পিচ জাতীয় কিছু ঘসে রাখা হয়, যাতে কাটাটা কতদিনের পুরনো বোঝা যায় না। কিন্তু সেটা আবার রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে! আর অশ্বিনীকে তো একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে, সব কাগজ পাঠাতে হবে না। তার লাইনটাও যেন ঠিক হয়েই যায়—'যাই হোক, চাবি কার কাছে থাকে বা গুদাম খোলা-বন্ধ কার দায়িত্বে এ-সব প্রশ্নে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টায় অফিসারদের কেউ কেউ ও কোনো কোনো বাবু কিছু অস্পষ্টতা দ্বারা সন্দেহের পরিবেশ সৃষ্টি করলেও ম্যানেজার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়।'

অশ্বিনীর মাথার চুল, কোট-প্যান্ট চায়ের মরচে রঙের ধূলোয় একেবারে বদলে যায়। ফিরতে, সেই অবস্থায়, সন্ধ্যা ছটায় অশ্বিনী যখন গাড়িতে চাপার জন্য গুদামের অফিস থেকে বেরতে যায়, ম্যানেজার একগাদা কাগজ টেবিল থেকে তুলে অশ্বিনীকে বাড়িয়ে দেয় "ইনস্পেক্টর, ইয়োর পেপার্স।" অশ্বিনী কাগজগুলো হাত বাড়িয়ে নেয়। ফ্যাক্টরির দরজায় ম্যানেজারকে একা ফেলে রেখে চলে যাওয়ার সময় ম্যানেজার যে বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল ফাঁক করে বিদায় জানায় তার মানে কি পাঁচ হাজার? ম্যানেজারের এগিয়ে দেয়া কাগজের ভেতর ভারি লম্বা খামটা সে হাতের তালুতে চেপে রাখে। কোনোদিনই তো অশ্বিনী নোটগুলো প্রথমে দেখতে পায় না, গোলাপ দেখে। গুনতেও পারে না, গোলাপ গোনে। আজ তো গোলাপের সেই কালো ট্রাঙ্ক নেই। গোলাপ তাহলে রাখবে কোথায়? স্যুটকেসে? শোয়া পর্যন্ত এই খামটা কোথায় থাকবে? টেবিলের ওপর?

ছাব্বিশ

বাড়িতে ঢুকতেই সবাই একেবারে হৈ হৈ করে উঠল। টগর বলে, "একী চেহারা হয়েছে!"

গোলাপ বলে, "তোমার জন্য আমাদের নবমী পূজোটা মাঠে মারা গেল"

টগর—"মিঃ ভট্চায সেই কখন থেকে বসে আছেন, বলছেন লোকটাকে ঘুম থেকে তুলে পাঠালাম, বাগানেই যাবেন যাবেন করেছিলেন।"

গোবিন্দবাবু বোধহয় এতক্ষণ ভট্চাযের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি চেয়ার থেকে উঠে বললেন, "এখন আর কথা বাড়িয়ো না, যাও তাড়াতাড়ি ওর স্নান খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। গোলাপ, যাও গরম জল করে দাও, তাড়াতাড়ি, অশ্বিনী যাও এখন স্নান করে নাও।" গোবিন্দবাবু ভেতরে চলে যান। পেছনে পেছনে গোলাপ। অশ্বিনী টগরকে জিজ্ঞাসা করে, "বাচ্চারা সব কোথায়?"

"ওদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখে শেষে বেণু নিয়ে গেল ঘুরিয়ে আনতে! খুব দেখালে বাবা! ভট্চায এখুনি গাড়ি নিয়ে ছুটতেন!" টগরও ভেতরে ঢুকে যায়।

তাহলেও যে অশ্বিনী ভট্চাযের সামনের চেয়ারে বসে না, তা কি ঐ কাগজপত্র নিয়ে সে ভট্চাযের সামনে বসতে চায় না বলে, পাছে ভট্চায লম্বা খামটা দেখে ফেলে, নাকি সে এখন চায় ভট্চায চলে যাক।

সুতরাং ভট্চাযই উঠে দাঁড়ায়। "তাহলে সব ভালোয়ভালোয় মিটেছে?" এ-প্রশ্নের কোনো মানে বুঝতে পারে না অশ্বিনী, কার ভালো, কিসের ভালো।

"হ্যাঁ, এই মিটলো" "আপনার জন্য চিন্তাই হচ্ছিল, এত দেরি হল যে!"

"পুলিশ আসতে দেরি করল।"

"কাউকে ধরেছে টরেছে নাকি, অ্যারেস্ট করেছে কাউকে"—এ প্রশ্নটার মানে বুঝতে চায় অশ্বিনী। মানে কি এই, বাগানের কাউকে ধরেছে কি না, কোনো অফিসারকে বা বাবুকে? "না, ধরে নি।" সমস্ত কাগজপত্র ফাইল অশ্বিনী দুই হাতে কোলের কাছে চেপে রেখেছে, তার হঠাৎ ভয় হয় লম্বা লেফাফাটা এখুনি তার হাত থেকে পড়ে যাবে। অশ্বিনী যখন ভট্‌চাযকে বেরতে দেয়ার জন্য দরজার একপাশে দাঁড়ায় তখন দরজার দিকে পা বাড়ানো ছাড়া ভট্‌চাযের আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু ওখানে, অশ্বিনীর অত কাছে দাঁড়িয়ে, অশ্বিনীকে আপাদমস্তক দেখে ভট্‌চায দাঁড়িয়ে পড়ে—

"আপনার সারা গায়ে যে চায়ের ধূলোয় একেবারে ভরে গেছে!"

"হ্যাঁ, তাই দেখছি"—

"সব বোধহয় আবার ওজন করতে হলো, মানে গোডাউনের, নাকি ফ্যাক্টরির?"

"হ্যাঁ, তা তো করতে হলোই"—

"আপনাদের তো আবার সব আইন-কানুন বাঁধা একেবারে, না?"

"হ্যাঁ, সে তো সব আছেই"—

"তার থেকে তো আর সরবার উপায় নেই, সব করতে হবে, না?"

এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে এতগুলো কথা বলা যায় না। তার ওপর ভট্‌চায যেন তার থাবাটা দিয়ে কাগজপত্রের প্যাকেটটা নিয়ে, লম্বা খামটা তুলে বলে ফেলতে পারে—"ওটা কি অ্যাঁ।" অশ্বিনী ঘরের ভেতর দিকে সরে যায়, এক পা।

ভট্‌চাযও চৌকাঠের ওপর পা রাখে, কিন্তু বেরয় না—"তো কি দেখলেন সব করে, চা কম ধরা পড়ে গেল গুদামে?"

"হ্যাঁ, তাতো পড়লই"—

"কত চা কম পড়ল ?" ভট্চায চৌকাঠের বাইরে যাবার জন্য পা-টা তুলেও বলে বসে।

"তিন হাজার কেজি"—

"বা বা। তিনহাজার কেজি মাল শর্ট অথচ কেউ অ্যারেস্ট হলো না ?"

অশ্বিনী অন্যদিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় আবৃত্তি করে দেয়—"না। কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো প্রাথমিক প্রমাণ নেই, পুলিশ বলেছে তিনটি হাইলি সিকল্ড্ ওয়েল-ইকুইপড দল এই এরিয়ায় অপারেট করছে।" 'ওয়েলকানেকটেড' কথাটা বলতে পারে না।

"ও, এ কেস অভ সিম্প্ল বার্গলারি !" ভট্চায নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে যায়, তারপর উঁচুগলায় ডেকে বলে, "টগরদি যাই !". টগর বেরিয়ে আসে—"আচ্ছা !"

"যান, ইনস্পেক্টর স্নান-টান করে নিন। আর টগরদি যদি পারেন একটু" বলে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল-তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে গলায় মদ ঢালার মুদ্রা দেখায়। "ওর মতো ওষুধ নেই।" ভট্চায হোহো করে হেসে সরে যায়, মাথা নিচু করে অশ্বিনী ভেতরে আসে, একগাল নিঃশব্দ হাসি নিয়ে টগর দরজা বন্ধ করার জন্য দুই পাল্লায় হাত দেয়।

লম্বা খাম সমেত এই কাগজপত্রগুলো গোলাপের হেপাজতে না-দিয়ে অশ্বিনী যে জামাকাপড় ছাড়তে পারে না। আর এ-বাড়িতে গোলাপকে আলাদা করে ডেকে গোপনে কোনো কথা বলা যায় না। এখন খামটাকে তো আর আলাদা করা যায় না। কাগজপত্র সমেত রাখতে হবে। কাল কাগজপত্র বের করে ফেলতে হবে। গোলাপের স্যুটকেসে ওরা কেউ হাত দেয় কি। অশ্বিনীকে টগরের পিছু পিছু ভেতরে গিয়ে রান্নাঘরে গোলাপকে ফাইলটা দিয়ে বলতে হয়—"এগুলো স্যুটকেসে রেখে দাও তো, দরকারি কাগজপত্র কিন্তু!" অশ্বিনীর দিকে একবারও না তাকিয়ে গোলাপ অব্যর্থভাবে

তার বুড়ো আঙুল দিয়ে লম্বা খামটাকে চেপে ধরে বেরিয়ে যায়। গোলাপ কি গন্ধে বুঝতে পারে? অশ্বিনীর মনে হয় সে ফাইলটা টেবিলের ওপর রাখলেও গোলাপ বুঝতে পারত ও সময় মতো সরিয়ে রাখত। "জল গরম হয়েছে?" টগর বলে, "হ্যাঁ, তুমি জামাকাপড় ছেড়ে এসো।" জামাকাপড় ছাড়বার জন্য বাইরের ঘরে ফিরে যায় অশ্বিনী। গোলাপ স্যুটকেসে চাবি লাগিয়ে উঠতেই দরজার কড়া দ্রুত নড়ে ওঠে। অশ্বিনী গিয়ে দুহাতে দরজা খুলে দেয়। লুম্বু-বেবি-খোকন তার হাতের তলা দিয়ে গলে যায়। পেছন থেকে খোকন তার পা জড়িয়ে ধরে। বেণুকে আসতে দিতে সরে যেতে গিয়ে অশ্বিনী দেখে বেণুর মুখের হাসিটা একেবারে মুছে গেল, চোখের পাতাটা নেবে আসে, দু-পায়ের ওপর বেণু একটু টলে যেতেই "আরে" বলে অশ্বিনী গিয়ে লাফিয়ে বেণুকে ধরে ফেলে, গোলাপকে ডাকে– "এই দেখতো, দেখতো!" গোলাপ ছুটে এসে বেণুকে ধরে। টগর আর গোবিন্দবাবু ঘরে আসতে আসতে ওরা বেণুকে কার্পেটের ওপর শুইয়ে দিয়েছে। অশ্বিনী দরজাটা বন্ধ করে দেয়। গোবিন্দবাবু তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে "জলের ছিটে দাও" বলে এগিয়ে দেন। বেণু তখনই মুখটা এ-পাশ ও-পাশ করে চোখটা টানটান করছে। দু-চারবার জলের ছিটে পড়তে বেণু দুহাত দিয়ে চোখ ঢাকে। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে বসে হাঁটুর ওপর দুহাতে মুখ ঢাকা দেয়। তারপর মুখে তুলে ম্লান হেসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে অশ্বিনীকে আপাদমস্তক দেখে। —চায়ের আর লোহার ধুলোর রং যে অবিকল এক। চায়ের ধুলোয় ঢাকা অশ্বিনীকে হঠাৎ দেখে প্রায় তিন বছর আগে মৃত স্বামীর লোহার ধুলোয় ঢাকা নিয়মিত সান্ধ্য চেহারার বিভ্রমে বেণু অজ্ঞানটা না-হয়েই পারে নি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরই অশ্বিনী-গোলাপ বাগানে ফিরে এসেছে। দিন পাঁচ পরেই অশ্বিনী ডাকে এক গাদা কার্ড পেল। খুলেই বোঝে ভট্‌চায পাঠিয়েছে। একটা ফ্লাওয়ার শো-র কার্ড। একটা ডগ্ শো-র। আর একটা লেবং রেসের—গভর্নরস্ কাপের খেলা। ডগ্ শো আর রেসের দিন গভর্নর উপস্থিত থাকবেন। আর ফ্লাওয়ার শো-র দিন গভর্নরের স্ত্রী। পরপর তিন দিন। তিনটি কার্ডের ভেতর দুটিতে মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস্-এর মিসেস্ কেটে অশ্বিনী সরকার লেখা। নিশ্চয়ই টগরদিকে আলাদা কার্ড দিয়েছে। রেসের কার্ডের পেছনে টগর আর অশ্বিনীর নাম আলাদা আলাদা করে লেখা। তিনটি কার্ডেই সিট নম্বর পর্যন্ত দেয়া আছে।

ভট্‌চায অবিশ্যি আগেই বলেছিল যে কার্ড জোগাড় করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এসব কার্ড নিয়ে নাকি ভীষণ গোলমাল হয়। আগে মাত্র গুটি কয়েক লোক ছিল—জায়গা কুলিয়ে যেত। আর এখন সবাই-ই যেতে চায়, ফলে গোলমাল, নিন্দে, কুৎসা—ইত্যাদি বাড়তেই থাকে।

অশ্বিনী তো জানতই না এ-সব আছে। টগরই একদিন কথায় কথায় ভট্‌চাযকে বলে। আর ভট্‌চায যখন বলে চেষ্টা করব, তখনই অশ্বিনী জানত কার্ড জোগাড় হবেই, তার জন্য, যত কিছুই করতে হোক্ না। ভট্‌চায অবিশ্যি এটুকু বলে রেখেছিল যে গভর্নর এবার মাত্র দিন পাঁচ-ছয়ের জন্য আসছেন—সুতরাং যে-কটাই হোক পরপর হয়ে যাবে।

অশ্বিনী গোলাপকে একবার বলে, "দেখ, তুমি যাবে কি না, তাহলে মিস্টার কেটে মিসেস করে দি—"

"আর কাটাকুটি করতে হবে না, তুমি গিয়ে ফুল, কুকুর, ঘোড়া—সব দেখে এসো গে। দার্জিলিঙে হুজুগও আছে বাবা!"

ফ্লাওয়ার শো-র দিন সকালেই অশ্বিনী দার্জিলিঙে চলে যায়। সেই অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর থেকে বেণু যেন লজ্জা পায়। আর অশ্বিনীরও কেমন যেন সবসময় মনে হয় বেণু অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। তাই বেণু আর অশ্বিনী একা থাকলে কেমন একটা অস্বস্তি হয়। বিকেলে বেরোবার জন্য, তৈরি হয়ে টগর বলে, "বাগান থেকে যে আমার সঙ্গে যাবে বলে এলে, তুমি না হয় কার্ড পেয়েছ"—

"বাবা, আপনাকে কার্ড দেবে না, আর আমাকে দেবে, তাহলে কি আর আমি ওখানে কার্ড দেখিয়েও ঢুকতে পারব?"

"কেন তুমি তো বেশ সাবালক হয়ে গেছ, আর তোমাকে নিয়ে আমি ঘুরতে পারব না।" টগরের কথা শুনে অশ্বিনী জোরে হাসে, বেণুও হাসে, তবে শব্দ হয় না। "আপনি যাবেন না? আপনি তো বোধহয় ফুলটুল ভালোবাসতেন!" অশ্বিনী বেণুকে বলে। "আজ তো শুরু, থাকবে তো কদিন, যাবোখন—"

টগর একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে বেণুকে বলে, "জানিস বেণু, বাইরে গিয়ে এমন ভাব করবে না যে কিছুই জানে না, আমি যা বলব তাই করবে, সবাই ওর সঙ্গে এসে কথা বলবে ও কারো সঙ্গে কথাটিও যেন বলতে পারে না, শুধু মিট্‌মিট্ করে হাসবে" তারপর অশ্বিনীর দিকে ফিরে মুঠো পাকিয়ে বলে, "মিটমিটে শয়তান কোথাকার!"

রাস্তায় নেমেই টগর বলে, "তোমার দিব্বি আরাম। উনি দয়া করে বাগান থেকে এসে ফ্লাওয়ার শো, আর ডগ শো আর রেসে যাবেন বলে, আমরা কার্ড জোগাড় করার জন্য দুনিয়া ঘুরে বেড়াব। জানো কী হয়েছে?"

"কি করে বুঝব? আপনাদের এখানে তো কিছু-না-কিছু হচ্ছেই সবসময়।"

"আরে সে-রকম না। সে রিন্টিদি নাকি কে, সেই ও-সবের

অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, সে বলেছিল, স্টেট গবমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারিদের যেখানে কার্ড দেয়া যায় না, সেখানে একজন সেণ্ট্রাল এক্সাইজ ইন্‌স্পেক্টরকে কেন দেয়া হবে। আর সত্যি তো তাই। শেষে মিঃ প্রধান নিজে দুটো কার্ড রিকুইজিশন করে তোমাকে একটা, আমাকে একটা পাঠিয়েছেন।"

"এত কিছু করার কি দরকার ছিল?"

"দরকার নেই মানে, যেখানে সবাই জানে যে তুমি মিঃ প্রধানের লোক সেখানে তোমার প্রসঙ্গে ও-কথা বলার অর্থ মিঃ প্রধানকেই অপমান করা। এই রিন্টি নিশ্চয়ই মিঃ সিনহার দলে। মিঃ সিন্‌হা প্রাণপ্রণে চেষ্টা করছে সামনের বছর নমিনেশন পেতে। কিন্তু পারবে না, মিঃ প্রধানের খুঁটির জোর অনেক বেশি।"

"আপনাদের এই সব কাজকম্ম করার জন্য কি কোনো পার্মানেণ্ট কমিটি-টমিটি আছে?"

"তোমার মাথা। কুকুরের ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না, কেনেল ক্লাব আছে একটা, মেম্বার হব বলে একটা পাপি একবার জোগাড় করেছিলাম এক সাহেবের কাছ থেকে, কিন্তু আমার বাবা ভালো লাগে না, বিছানায় লোম, নোংরা, এঃ।"

"ও, কুকুর না থাকলে বুঝি, কী ক্লাব বললেন, তার মেম্বার হওয়া যায় না?"

"তা, যাবে না কেন, কেনেল ক্লাবের সঙ্গে কুকুরের কী আছে, তবে ও-সব না জানলে তো আর কমিটি মেম্বার-টেম্বার, মানে, কিছুই না জানলে, তাও ঠিক না, ঐ আর কি।"

দুই

ফ্লাওয়ার শো-র ব্যবস্থা রাজভবনের বাগানটিতে। সারি সারি চেয়ার পাতা আছে। সিট নম্বর দেয়া। দুদিকে খুব সুন্দর দুটো লনকে ঘিরে ছোট্ট ছোট্ট, মরসুমি ফুল। লনের ওদিকে নানারকম

গাছ-গাছালি লতা-পাতায় জায়গাটা একটু বুনো হতে হতে পাহাড়ে বনে মিশে গেছে। ইংরেজি T অক্ষরের মাথাটার মতো রাস্তাটার উত্তরে বেশ ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ঝোপঝাড়।

"ট-গ-র-দি-ই" বলে যে-মহিলা এসে টগরের হাতের আঙুলগুলো নিয়ে নিজের হাতে ধরলেন তিনি অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে একগাল হাসলেন। তারপর সেই হাসির ভঙ্গিকেই তিনি সোজা এমনভাবে চিবুক দিয়ে গলার দিকে নামিয়ে দিলেন যাতে হনু থেকে চিবুক পর্যন্ত লম্বা হয়ে গেল আর ঠোঁটটা গোল। "জানো টগরদি, ব্রিগেডিয়ার ইভান্‌স্‌ নাকি কাল ডগ্‌ শো-এ আসছেন না?"

"সে-কি? কখন জানলে—"

"আমি তো ভাই আজ সকালেই জানতে পেরেছি, তারপর এখান থেকে নাকি শেঠি ট্রাঙ্ককল করেছেন। কী হবে কা-ল টগরদি?"

"দেখ তো কী কাণ্ড! দেখি শেঠিকে জিজ্ঞাসা করি।" টগর এগিয়ে যায়। ভদ্রমহিলা একটি যুবককে বলে, "টগরদিকে জায়গাটা দেখিয়ে দাও না ভাই" ছেলেটি আসতে টগর গম্ভীর হয়ে বললো, "আমি জানি। ঠিক আছে"—

অশ্বিনী শুধোলো—"ঐ ভদ্রলোক কে?"

"কে, কার কথা বলছ"—টগর চারপাশে তাকায়।

"না, না, উনি যার কথা বললেন, ব্রিগেডিয়ার"—

"কী জানি কে?"

"আপনি চেনেন না?"

"আমি চিনতে যাব কোন্‌ দুঃখে"—

"আপনি যে বললেন জিজ্ঞাসা করবেন কাকে"—

"জিজ্ঞাসা তো করবই। নইলে রিন্টি ভাববে ঐ একা সব খবর জানে, আমরা যেন কিছু জানিই না।"

"ঐ মহিলাই রিন্টি দি?"

টগর এবার মুখ ঘুরিয়ে বলে, "হ্যাঁ, তোমাকে বলাই হয় নি, দেখ

তো। ঐ তো রিন্টি। বয়সের তো গাছ-পাথর নেই। অথচ আমাকে দিদি ডাকা চাই”—

চেয়ারের নম্বর খুঁজে পেয়ে চাপা রাগে টগর ফেটে পড়ে, “দেখেছ রিন্টির কাণ্ড! এমন জায়গায় সিট দিয়েছে যাতে কিছুই দেখা যায় না, আমাদেরও কেউ দেখতে না-পায়!”

সামনে একটা বিরাট বড় দরজা, দুর্গে-টুর্গে যেমন থাকে। লোহার না কাঠের অশ্বিনী বুঝতে পারে না। কিন্তু অশ্বিনীর জায়গাটাই এমন পড়েছে, নাকি, খুব একটা চেনাজানা কাউকে পাচ্ছে না অথবা সমস্ত অবস্থাটা খুব চাপা সম্ভ্রমের বলে—অশ্বিনীর চোখটা ঐ দরজাতেই আটকে থাকে—যে-দরজার চেহারা দেখে বোঝা যায় না কাঠের না লোহার, যার বন্ধ হওয়ার ধরন দেখে অশ্বিনীর মনে হচ্ছে ওটা আর সচারচর খুলবে না আর যদি খোলে তাহলে যারা একবার ভেতর ঢুকবে তারা আর বেরবে না।

কখন একসময় সবাই চুপ করে গেল। এই চেয়ারের সারি যেখান থেকে শুরু হয়েছে তার সামনে খোলা আঙিনামতো জায়গায় একটু ছোটাছুটি পড়ল, এ-কাঁধ ও-কাঁধের ফাঁক দিয়ে অশ্বিনী দেখে দুধ-আলতা রঙের এক বুড়িমতো মহিলা লালপেড়ে সাদা শাড়ি আর একটা গরম চাদর গায়ে দিয়ে সিংহাসনের মতো চেয়ারটাতে বসে আছেন। যেন খানিকটা অস্বস্তিতেই।

কিন্তু তিনি মাইকের সামনে তাঁর বক্তৃতাটি ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে খানিকটা পরিশ্রম করে, প্রথমে বাংলায়, পরে নেপালিতে, পড়া শুরু করতে লাল পাড় সাদা শাড়ির সব অনুষঙ্গ ঘুচে গিয়ে মৃদু প্রতিধ্বনিত থেকে যায় অভ্যস্ত অভ্যস্ত অভ্যস্ত ভূমিকা। বাংলায় আর নেপালিতে প্রতিটি অক্ষর উচ্চারণের আয়াস ও তিনি যেভাবে বক্তৃতাটি শেষ করে ধীরে ধীরে ডানদিকে চলা শুরু করলেন তার কোনো একটি সামান্যতম জায়গাতেও তাঁর ভূমিকায় কোনো অনিশ্চয়তা ছিল না।

আসলে প্রদর্শনীটি আর এক হলে আর গ্লাস হাউসে। এখানে

বক্তৃতার পর গভর্নরের স্ত্রী সেই প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে চললেন। যারা চেয়ারে বসেছিল, খুব ধীরে ধীরে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। দাঁড়াবার পর অশ্বিনী বোঝে লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। খুব ধীরে ধীরে এগোতে হচ্ছে বলে জুতোর ঘষার একটা শব্দ আর একটা খুব চাপা গুঞ্জন উঠছে।

তিন

বেশ অনেকটা সময় হাঁটি হাঁটি পায়ে এগোনোর পর অশ্বিনী বোঝে টগর তার হাতটা চেপে ধরে টানছে। ঘাড় ঘোরাতেই টগর আস্তে আস্তে টেনে তাকে একপাশে নিয়ে যায়। তারা একটা পাশে পড়ে যায়। টগর অশ্বিনীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে—যেন তারা এই সবার সঙ্গে যাবে না বা সবার পেছনে যাবে বলে অপেক্ষা করছে।

শেষ লাইনটা তাদের পেরিয়ে গেলে টগর অশ্বিনীর হাতে একটা মৃদু চাপ দিয়ে তাকে ধরে বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে শুরু করে—খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে। এতক্ষণে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "কি ব্যাপার ?" "চলো না, তাড়াতাড়ি" চাপা স্বরে টগর বলে। টগর রাস্তা ধরে হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরে যায়। সেই বিরাট বাড়িটা তাদের বাঁদিকে পড়ে। অশ্বিনী-র মনে হয়ে যায় টগর ফুলটুল কিছু দেখবে না, টগর কি কোথাও লুকোতে চায়। অশ্বিনী খুব অচেতনভাবে বোধ করে ফেলে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা তাকে করতে হতে পারে, আর-একটু সময়ের ভেতর।

কিন্তু তার জন্য অশ্বিনী সামান্য প্রস্তুত হওয়ারও সময় পায় না। টগর তার হাত ধরেই দৌড়তে শুরু করে। তাদের দৌড়নোর শব্দের প্রতিধ্বনি ওঠে।

শোয়া বসা হাঁটায় টগরের যে-শরীরটা অশ্বিনীর চেনাজানা হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ-দৌড়নোর, তাও আবার অশ্বিনীর হাত ধরে

প্রতিধ্বনিময় দৌড়নোর ভূমিকায়, সেটা এমন আকস্মিক অপরিচিত হয়ে যায়।

ইংরেজি T অক্ষরের মতো রাস্তাটার দণ্ড ধরে টগর তাকে আঙুলে আঙুলে বেঁধে ছুটতে ছুটতে বাঁক ঘুরতে অশ্বিনী দেখে সামনের দেয়াল সরে গিয়ে তাদের পথ নির্জন খুলে রেখেছে যেন সেই দুর্গের গভীর ভেতরবাগে আর দেয়ালজোড়া সেই স্তম্ভতুল্য অবকাশ দিয়ে মাথার অত উপরে আর শরীরের দুপাশের অত তফাতে দুর্গতোরণের চৌকাঠের ফ্রেমে মুহূর্তে বালিকা হয়ে টগর সেই দুর্গের অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরে অবধারিত ঢুকে যাচ্ছে, তার উড়াল শরীরের পাখনার মতো হাতে অশ্বিনী লগ্ন হয়ে আছে, হালকা, আলগা, দ্রুত নিশ্বাসের তালে অশ্বিনী একবার বলে ওঠে, "সে কি, কোথায় যাচ্ছেন!" কিন্তু হাত যখন টগরের হাতে, টগর যখন আগে আগে ছুটছে আর তাদের দুজনের হাতের বন্ধনীতে যখন শূন্যতা শৃঙ্খলাবদ্ধ—তখন এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না—টগর আর অশ্বিনীর দ্বৈতদৌড়ের জন্য এতখানি অবকাশ যেখানে খুলে রাখা।

কিন্তু টগরের দৌড় সেই দুর্গের মতো বাড়িটার ভেতরে ঢুকেও থামে না। কার্পেট-ঢাকা দীর্ঘ, দীর্ঘ অলিন্দের লীনতায় যেন আরো এক দরজা স্তম্ভতুল্য অবকাশ নিরেট জনহীন, টগর সেদিকেই ছুটছে। কার্পেটের ওপর দিয়ে তাদেরই গূঢ় দৌড়নোর প্রতিধ্বনি চকিতদুর্গের ভেতর থেকে, ভেতর ভেতর থেকে অসংখ্য চাপা পায়ের অব্যর্থ ও অভ্যস্ত পশ্চাদ্ধাবনেরই বেগে ডাইনে বাঁয়ে করিডর, ভাঙলে শায়িত শবে পৌঁছনো যায় এমন প্রসারিত সিঁড়ি আর বন্ধ দরওয়াজা অর্গলিত দুয়ার রুদ্ধ দ্বার দ্বার দ্বার দিয়ে অনিবার্য ছুটে আসে—তুরঙ্গ, বল্লম, বর্শার তীক্ষ্ণতার অনুষঙ্গে চারদিক থেকে তাদেরই ঘিরে ফেলতে থাকে।

অশ্বিনী ভেবেছিল ঐ দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাদের ছুটতেই

হবে। কিন্তু দরজার কাছে গিয়েই টগর দাঁড়িয়ে পড়ে। আর হাঁফায়। সেখানে দাঁড়িয়ে অশ্বিনী খুব কাছেই, বাইরে লোকজনের পায়ের শব্দ আর গুঞ্জন শুনতে পায়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে হাঁফাতে গিয়ে টগর অশ্বিনীর হাতটা ছাড়তে ভুলে যায়।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে টগর আর অশ্বিনী এক যুগ্ম শ্রমের শ্বাসমোচন করে। একটু স্থির হয়ে তার মুখটা অশ্বিনীর দিকে তুলে ধরে টগর বলে, "দেখো তো, আমার ঘাম বেরলো নাকি, এত সহজেই ঘেমে যাই। এই বয়সে এতটা দৌড়নো! দেখো বুক কেমন করছে"—অশ্বিনীর হাতটা তুলে নিয়ে টগর নিজের তখনো ওথলানো দুই বুকের মাঝখানে চেপে ধরে রাখে। তখনো অশ্বিনীর দিকে টগরের মুখটা ভাসানো আর তখনই তার চোখদুটো আর একবার বুজে আসে।

টগর সচকিত হয়ে তার ব্যাগ থেকে একগাদা ন্যাকড়ার মতো কাগজ বের করে অশ্বিনীকে মুঠো করে দেয়। আমার মুখের ওপর একটু একটু পাফ করে দাও তো। দেখো। মেক আপ যেন কিছু উঠে না আসে। শুধু ঘামঘাম ভাবটা শুষে নেবে।

টগর একটু সরে দরজার আলোর দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। পেছনে একটা বিরাট লম্বা করিডর নিয়ে অশ্বিনী টগরের উত্তোলিত মুখের চিবুকে তর্জনীটা রেখে টিস্যু পেপার দিয়ে তার মুখের অদৃশ্য ঘাম শুষে নিতে থাকে।

দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে অশ্বিনী দেখে গভর্নরের স্ত্রীর ঠিক পেছনেই তারা দুজন। সামনে একটা দরজা রাশিরাশি ফুলের মালা দিয়ে আটকানো—সিনেমার ফুলশয্যার খাটের মতো। গভর্নরের স্ত্রী দুহাতের আঙুলগুলো মিলিয়ে সেই ফুলের মালারাশিতে একটা মৃদু টান দিতেই অশ্বিনীকে টগর একটু ঠেলে এগিয়ে দেয় আর মালাগুলো খুলে যাওয়ামাত্র ফ্ল্যাশগান জ্বলে উঠতে থাকে, যেন শেষ হবে না, শেষ পর্যন্ত অশ্বিনী হাসতেও পারে, যেন বিদ্যুতের চমক

ছড়াতে ছড়াতে অশ্বিনী আর টগর গভর্নরের স্ত্রীর প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে ফুলবনে ঢুকে যায়। কিন্তু ফ্ল্যাশবাল্বে অশ্বিনীর চোখ এত ঝলসে যায় যে সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফুল দেখতে পায় না।

প্রথম ঘরটার শেষে একটা ছোট্ট করিডর পেরিয়ে দ্বিতীয় ঘর। এই ফাঁকটাতে আসতে "মিঃ কুমরা, হোয়্যার ইজ মিঃ কুমরা" বলে রোগা টাকমাথা এক ভদ্রলোক অশ্বিনীর পাশ থেকে ঘুরে ভিড়ের এদিক-ওদিক তাকান। ঠিক সেই সময়ই অশ্বিনী বোঝে তার গায়ে গা-লাগা পেছনের ভদ্রলোক অশ্বিনীকে একটু যেন ঠেলছেন। কিন্তু ভদ্রলোক যাতে এগিয়ে আসতে না পারেন সেজন্য অশ্বিনী আরো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। পেছনের ভদ্রলোক অবশ্য আর ঠেলেন না। অশ্বিনীর পাশে দাঁড়ানো যে-ভদ্রলোক মিঃ কুম্‌রাকে খোঁজ করছিলেন তিনি পেছন ফিরে একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে অশ্বিনীকে যেন খানিকটা ঠেলেই অশ্বিনীর ঠিক পেছনের ভদ্রলোককে হাত ধরে "হোয়াই আর ইউ কিপিং বিহাইণ্ড, ইউ আর আওয়ার মোস্ট অনার্ড গেস্ট" বলে বলে একজন খুব বেঁটে খাটো ভদ্রলোককে সামনে প্রায় টেনে নিয়ে আসেন। এই কথাটি বলার জন্য সমস্ত শোভাযাত্রাটাই থম্‌কে দাঁড়ায়। কিন্তু অশ্বিনী বোঝে মিঃ কুমরাকে সামনে যেখানে দাঁড় করানো হচ্ছে সেখানে তিনি দাঁড়ালে অশ্বিনীকে দু-পা পেছনে সরতেই হবে। দুই হাতের ভর অশ্বিনীর কোমরে রেখে পেছন থেকে টগর একটা খুব গোপন ঠেলা দেয়—যেন অশ্বিনী পেছনে না সরে। অশ্বিনী পাথরের মতো শক্ত মুখে পাথরের মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যেন তাকে কেউ ঐ বিশেষ জায়গাটিতে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। ডাইনে বাঁয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে অশ্বিনীকে মুখভাব অনড় রেখে যেতে হয় যেন সে বুঝতেই পারছে না আশেপাশের প্রায় সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে, কেন সে মিঃ কুমারকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে না। অশ্বিনী মনে মনে প্রস্তুত হয়ে থাকে যদি কেউ শেষ পর্যন্ত

মুখে মুখে তাকে বলেই ফেলে জায়গাটা ছাড়তে তাহলে সে যাতে হঠাৎ শশব্যস্ত· হয়ে উঠে মিঃ কুমারকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারে। মাত্র কয়েকমুহূর্তের জন্য একটু ইতস্ততভাব মিছিলের মাথার দুতিনটি লাইনকে একটু বিব্রত করে যেন। যিনি মিঃ কুমরাকে ডাকাডাকি করছিলেন তিনি মাত্র কয়েকসেকেণ্ডের জন্য অশ্বিনীকে বাক্যহীন দেখে রাখেন। সেটা বুঝতে পেরেও অশ্বিনী তাঁর দিকে তাকায় না। গভর্নরের স্ত্রী একগাল হাসি নিয়ে অশ্বিনীর দিকে মুখ তুলে কিছু বলেন। অশ্বিনী বুঝতেই পারে না তিনি কি বললেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু নিচু হয়ে গভর্নরের স্ত্রী-র মুখের কাছে মাথা নামিয়ে হাতটা সামনে এগিয়ে দিয়ে "ইয়েস, ইয়েস" বলে। গভর্নরের স্ত্রী এগিয়ে যাবার উদ্যোগ নিতেই মিছিলটা সচল হয়। সুতরাং যে-ভদ্রলোক মিঃ কুমরাকে অশ্বিনীর পেছন থেকে বের করলেন, অশ্বিনীর পাশের জায়গাটায় মিঃ কুমরাকে দাঁড় করিয়ে তিনি নিজেই অগত্যা পেছনের সারিতে চলে যান। এখন অশ্বিনী গভর্নরের স্ত্রীর একেবারে ডানপাশে, আর অশ্বিনীর ডানপাশে তার প্রায় কনুইয়ের কাছে তার পেছন থেকে বের হওয়া মিঃ কুমরা—অশ্বিনী তাঁর চাইতে এক ফুটেরও বেশি লম্বা একমাত্র এই শারীরিক কারণেই অশ্বিনী যাকে এতক্ষণ পেছনে রেখে এসেছিল। হাঁটতে হাঁটতে অশ্বিনী ভাবে গভর্নরের স্ত্রীর দাঁতগুলো এত সাদা, ওগুলো কি বাঁধানো? মাঝেমাঝে অশ্বিনীর কোমরে দুটো হাত—সেটা কি টগরের না আর কারো?

দ্বিতীয় ঘরের দরজাটাও তোরণের মতো সাজানো, ফুলের মালায়, ঝালরে। আবার ফ্ল্যাশ লাইট। আবার বিদ্যুতের চমক ছড়াতে ছড়াতে মিঃ কুম্‌রা আর গভর্নরের স্ত্রীর মাঝখানে অশ্বিনী হেঁটে যায়। ছবি তোলা শেষ হলে কোমরের কাছে গোপন চাপে অশ্বিনী বুঝতে পারে টগর তাকে কোনো ইঙ্গিত করছে। টগরের ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে অশ্বিনী একটু নিচু হয়ে গভর্নরের স্ত্রীর মুখের কাছে মাথা

নামায়। গভর্নরের স্ত্রী কিছু বলেন যার ভেতর "নাইস" শব্দটি ছিল। অশ্বিনী খুব মৃদু "ইয়েস" বলে হাতটা সামনে এগিয়ে দিতে "ওঃ ই-য়ে-স" বলে গভর্নরের স্ত্রী হঠাৎ তড়বড়িয়ে এগিয়ে যান। অশ্বিনী তাঁর সঙ্গে এগিয়ে যেতে গিয়েই বোঝে পেছন থেকে টগর খুব গোপন টানছে। আর সেই টানের ফলে অশ্বিনীকে যেটুকু থামতে হয় তার ভেতরই তার জায়গাটা ভর্তি হয়ে যায়। সেই ভিড় আর চাপা কোলাহলের মধ্যে টগর ফিসফিস স্বরে অশ্বিনীকে বলে "বেরোও"। অশ্বিনী বেরনোর জন্য এক-পা দু-পা করে পেছিয়ে আসতে শুরু করে, সারাটা মিছিল খুব দ্রুত অশ্বিনীকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। অশ্বিনীকে একটু দাঁড়াতে হয়। সেই চলমান মিছিলের ভেতর দাঁড়িয়ে অশ্বিনী দেখতে পায় খানিকটা আগে মিছিলের ভেতর আর একটি লোক দাঁড়িয়ে, পেছন ফিরে, অপলক দেখছে অশ্বিনীকে। সে-ও মিছিলটাকে বয়ে যেতে দিচ্ছে। অশ্বিনী লম্বা—তাই তার মাথাটা মিছিলের ওপর ভেসে, আর ঐ লোকটার মাথা মিছিলের ভেতর ডুবে। মিঃ কুমরা। যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদের ভিড়ের ভেতর পথ করে নিয়ে অশ্বিনীকে আপাদমস্তক দেখে যান। অশ্বিনীকে দেখবার জন্য তাঁকে মাথাটা উঁচু করতে হয়, আর উঁচু একবার করে ফেলার পর নামান নি, যতক্ষণ না টগর এসে অশ্বিনীর হাত ধরে ভিড়ের ভেতর পথ করে নেয়।

বাইরে এসে অশ্বিনী বলে, "বেরিয়ে এলেন যে!"

"আর থেকে কি হবে? আর ঐ তো শেষের ঘরটায় অর্কিড, ওখানে আর কিছু নেই। চলো দেখি কে কে এলো"—

টগরের সঙ্গে যেতে যেতে অশ্বিনী বলে, "আবার কি ঐ বাড়ির ভেতর ঢুকবেন নাকি?"

টগর হেসে বলে, "আরে না না। তোমার মতো বাঙাল নিয়ে তো মহা মুশকিল। এত ভয় পাও কেন। কেমন শর্টকাট করে লাস্ট রো থেকে ফার্স্ট রোতে নিয়ে এলাম, বলো।"

"আপনি চিনলেন কি করে, ঐ বাড়ির ভেতর দিয়ে রাস্তা!"

অশ্বিনী একবার পেছন ফিরে তাকায়। তাকে কি এখনো মিঃ কুমরা দেখছেন?

"সবাই-ই সব কিছু চেনে, বুঝলে, দায়ে পড়লে—। হঠাৎ দেখতে পেলাম রিন্টি সবার সঙ্গে না এসে ঐ দরজা দিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে গেল, তখনই বুঝলাম। দাঁড়াও। ঐ যে ভট্চায আসছে।" অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে ভট্চায উল্টোদিক থেকে আসছে—ও কি ফুলের ঘরেই ঢোকে নি। ভট্চায এসে বলে, "চলুন, একটু আড্ডা মারা যাক"—

"এখুনি যাবেন? কে কে এলো, একটু দেখে যাবেন না?"

"আবার কী দেখবেন, মিঃ প্রধান আছেন"—

"দেখলাম না তো"—অশ্বিনী।

"এখন ওদের দেখা যায় না। ভেতরে কোথাও আছেন। ভি-আই-পি ব্যাপার। হয়েই তো গেল। চলুন এখন আড্ডা মারি গে"—

অশ্বিনী আর একবার পেছন ফিরে তাকায়। তারপর ওদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে।

একটু অন্যমনস্ক হয়েই হয়তো হাঁটছিল অশ্বিনী। চারপাশে নানারকম কোলাহল। সে কোনোদিকেই কান দিচ্ছিল না। নেহাৎই হঠাৎ যেন বোঝে কলকল করে টগর কিছু বলে যাচ্ছে। কী বলছে, সেটা বোঝার আগেই ভট্চায চমকে দাঁড়িয়ে যায় আর অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করে, "সে কি মশাই, কি বললো?"

অশ্বিনী বুঝতে পারে না, কার কি বলার কথা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। সে জবাব দেয়, "না, আমাকে তো কিছু বলে নি।"

"ই—স্ অশ্বিনী, তুমি কী ন্যাকামি করতে পার। আমি নিজে চোখে দেখলাম, একেবারে তোমাকে কি বললো, তুমি কি জবাব-ও দিলে যেন"—টগর দুহাত নেড়ে একবার ভট্চাযের মুখের দিকে আরেকবার অশ্বিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো। অশ্বিনী ভুরু

কুঁচকে একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "কী যা-তা বলছেন। ওঁরা তো সেই মিঃ কুমরা না কাকে খুঁজছিলেন, আমাকে আসলে বলতে চাইছিলেন সরে দাঁড়াতে, তো আপনি তা আমাকে সরতে দিলেন না।"

"ধ্যুৎ, তোমার মাথায় কিছ্ছু নেই। কে তোমার কুমরা না লাউ-এর কথা বলছে। গভর্নরের স্ত্রী তোমার সঙ্গে কি কথা বললেন না? আমি দেখলাম···।"

অশ্বিনী হেসে ফেলে। "ও সেই কথা?"

"কি বললো মশাই?"

ধ্যুৎ, ও কি আর আমাকে বলেছেন, যে পাশে থাকত তাকেই বলত—।"

টগর—"কিন্তু পাশে তো তুমি ছাড়া কেউ ছিল না।"

"আমি ভালো করে বুঝতেও পারি নি কি বলেছেন।"

টগর—"বাঃ বাঃ, তুমি ভালো করে বুঝতে পার নি, না? তাহলে এ-রকম করে নিচু হয়ে ওঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে কি বললে?"

ভট্‌চায জিজ্ঞাসা করে, "কি-রকম করে? কি-রকম করে?"

ওরা সবাই দাঁড়িয়ে যায়, টগর একটু নিচু হয়ে, ডানহাতটা সামনে নাড়িয়ে, নামিয়ে অভিনয় করে দেখায় অশ্বিনী কিভাবে গভর্নরের স্ত্রী-র সঙ্গে কথা বলেছে।

"গ্র্যাণ্ড, গ্র্যাণ্ড" বলে ভট্‌চায হাততালি দিয়ে ওঠে, "আপনি তো দারুণ অ্যাকটিঙ্‌ করতে পারেন টগর দি।"

অশ্বিনী খানিকটা মুগ্ধতা নিয়েই টগর-কে দেখে। অশ্বিনীর কথা বলা নকল করতে গিয়ে টগরের ভেতর অপরিচিত নতুনত্ব চমকে ওঠে। সেভাবেই টগরের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, "ঐ আর কি, বোধহয় অর্গানাইজারদের কনগ্র্যাচুলেট করল—"

"আপনি কি বললেন"—ভট্‌চায।

"আপনি থাকলেও সেই এক কথাই বলতেন।"

"তবু শুনি না।"

"ধন্যবাদ। আপনাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলাম—"

"ও ওয়াণ্ডারফুল!" ভট্চায হাততালি দিয়ে ওঠে। টগর সারা চোখময় বিস্ময় নিয়ে অশ্বিনীকে বললো, "তুমি বললে?"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, "অশ্বিনী-টা কেমন চুপচাপ সব জায়গায় মানিয়ে যায়, না মিঃ ভট্চায? যেন ও জন্ম থেকেই এই সব ফ্লাওয়ার শো অর্গানাইজ করে আসছে।"

"হি ইজ সিম্পলি এ জিনিয়াস, এ জিনিয়াস" বলতে বলতে ভট্চায একটু সরে যায়। টগর মাঝখানে চলে এসে অশ্বিনীর কুনুইটা দুই হাতে চেপে ধরে কয়েক পা হেঁটে ফেলে। তারপর বাঁ হাতটা সরিয়ে নেয়। আরো একটু গিয়ে ডানহাতটাও। কিন্তু অশ্বিনীর কাছ থেকে এতটা দূরে টগর সরে যেতে পারে না, যাতে হাঁটার তালে তালে আন্দোলিত অশ্বিনীর হাত বারবার এসে তার হাত ছুঁতে পাবে না। অশ্বিনীর দুলন্ত হাতের অঙুলে টগরের দুলন্ত হাতের আঙুল মাঝেমাঝে জড়িয়ে যাচ্ছিল, খুলে পড়ছিল, জড়িয়ে পড়ছিল, খুলে যাচ্ছিল। "আরে, এই যে মিঃ সান্যাল,—হেললো মিঃ সান্যাল" বলে ডানহাতটা মাথার ওপর তুলে ভট্চায ডাকে। মিঃ সান্যালের সামনে গিয়ে পড়লে ভট্চায বলে, "শুনেছেন?" "কি?" "সে কি, এখনো শোনেন নি? গভর্নরের স্ত্রী মিঃ সরকার-কে কনগ্র্যাচুলেট করেছেন।" ভট্চায অশ্বিনীকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয়। "ইজ ইট? থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ সরকার—" মিঃ সান্যাল অশ্বিনীর হাত ধরে ঝাঁকান।

মিঃ সান্যাল চলে গেলে অশ্বিনী বলে, "এ আপনারা কি শুরু করেছেন—"

"আমি আবার কি করেছি"—ভট্চায।

"তুমি চুপ কর তো অশ্বিনী, এ-সব তুমি বোঝো না—"

"না না, উনি কি আর আমাকে চিনে বলেছেন? যে-ওঁর পাশে থাকত, তাকেই বলতেন—"

"এই ভাবেই তো চেনাজানা হয়। এরপর কোথাও হয়তো দেখবে, উনি তোমাকে একবারেই চিনতে পারছেন"—টগর।

"আপনার মাথা খারাপ।"

"আচ্ছা, বেশ, তাই হলো। এখন চুপ করো। ঐ যে মিঃ ভট্চায লক্ষ্মী দি যাচ্ছেন—"

"হেললো, হেললো লক্ষ্মী দি"—ভট্চায এগিয়ে যায়।

লক্ষ্মী দি তুই হাত তুলে মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের করেন। লক্ষ্মী দি আগেই বলে ওঠেন,"গভর্নরের স্ত্রী দারুণ খুশি, বলছেন এত ভালো কালেকশন উনি রিসেন্টলি আর দেখেন নি।"

"আমরাও তো তাই বলছিলাম। উনি তো অশ্বিনীকে ডেকে বারবার থ্যাঙ্কস দিয়েছেন"—টগর বলে বসে।

লক্ষ্মী দির মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়, "কাকে?"

"অশ্বিনীকে"—টগর একটু জোর দিয়ে বলে। "ওঃ, কন্গ্রাচুলেশন্স্, কন্গ্রাচুলেশন্স্।" অশ্বিনী মুখে হাসি ফোটায়।

অশ্বিনী বুঝতে পারে, এখন, আর একটু সময়ের ভেতর এই খবর সবার কানে পৌঁছে যাবে। এটাই হবে ফ্লাওয়ার শো-র সবচেয়ে বড় খবর। আর এই খবর শোনার পর সবাই-এর মনে যে-প্রশ্নটা উঠবেই, সেটি সবচেয়ে আগে উঠল অশ্বিনীরই মনে, কিন্তু আমি তো এই ফ্লাওয়ার শো-র কেউ-ই না, আসলে দার্জিলিঙেরই কেউ নই।

"হে-লো"—টগর তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে।

অশ্বিনীর-ই সামনে অশ্বিনীকে একটা উপকথা করে দেয়া হচ্ছে—অথচ অশ্বিনীর কিছু করার নেই।

অশ্বিনী একবাব পেছন ফেরে। সেই মিঃ কুমরা কি এখনো তাকিয়ে জেনে নিচ্ছেন—আসলে অশ্বিনীর পরিচয় কি? অশ্বিনী কে?

ভট্চায আবার ডেকে ওঠে, "হেললো।"

চার

যখন রাত্রিতে বেণু জিজ্ঞাসা করে “কী কী ফুল দেখলেন,” তখন অশ্বিনীকে জবাব দিতে হয় “মানুষ দেখব না ফুল দেখব, আর তাছাড়া আমি ফুল চিনিও না ভালো।”

বেণু অশ্বিনীর জন্য রাত্রির জল ঢেকে রাখতে এসেছিল। টগর শুয়ে পড়েছে। গোবিন্দবাবু বলেন, “অশ্বিনী আজ গিয়ে তো তোমার দিদির সঙ্গে মানুষ দেখে এলে, কাল গিয়ে আবার বেণুর সঙ্গে ফুল দেখে এসো”—শোয়ার একটা আরামজনক ভঙ্গিতে পৌঁছনোর নানা শব্দ তুলে টগর বলে, “আমার বাবা কোনো দায় পড়েনি গাদাগাদা ফুলের নাম মুখস্ত করার।”

বেণু স্মিত হেসে চলে যায়। অশ্বিনীকে একটু শব্দ তুলে হাসতে হয়—যাতে ও-ঘর থেকে শোনা যায়।

অশ্বিনী সিগারেট খাচ্ছিল। বেণুর ঘর থেকে আলো টগরের ঘর পেরিয়ে বাইরের ঘরে এসে পড়েছে। ফলে ঘরটার দরজার কাছাকাছি আলোর ভাব আছে, যদিও অশ্বিনী যেখানে বসে সে জায়গাটা বেশ অন্ধকার মতোই। বেণুর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করতে ইচ্ছে হয় অশ্বিনীর। বেণু খুব আবোলতাবোল গল্প করতে পারে। একটা প্রসঙ্গ ধরে কথা বলে চলে না। ফলে কেমন অভাবিত সব প্রসঙ্গ এসে যায় যে, কথা প্রায় থামতেই চায় না। তাছাড়া বেণুর সঙ্গে কথার তো কোনো দায় নেই, উপলক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই। এত রাতে একা একা বেণুর সঙ্গে দায়হীন উদ্দেশ্যহীন হওয়ার টান বোধ করে অশ্বিনী। টগরও বলেছিল একটু গল্পগুজব করতে। কিন্তু আজকাল বেণুর সঙ্গে একলা থাকলেই ভয় হয়—এই বুঝি বেণু অজ্ঞান হয়ে গেল। তাহলে আর গল্পগুজব করবে কি করে অশ্বিনী।

এত রাতে অশ্বিনীর মনে পড়ে যায় কিন্তু কিছুতেই জানা

হলো না কেন সেদিন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। টগরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোনো নির্দিষ্ট কারণ দিতে পারে নি, বলেছিল, বোধহয় শরীর টরীর খারাপ ছিল। কিন্তু সমস্ত যুক্তিতর্ক আর ইন্দ্রিয়ের বাইরের এক অবধারিত বোধ দিয়ে অশ্বিনী বুঝতে পারে বেণুর সেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার একটা কোনো যোগ আছে।

বেণু এসে দরজায় দাঁড়ায়—"আপনার কিছু লাগবে না তো?"

"না।"

"তাহলে শুয়ে পড়ুন," বলেও বেণু দাঁড়িয়ে থাকে। অশ্বিনী আর একবার নিশ্চিত হয়ে যায় কি করে, বেণুর সেদিনের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার কোথাও একটা গভীর বা একমাত্র যোগ আছে। কিন্তু বেণু সেটা জানে?

অশ্বিনী একটু থেমে থেকে বলে, "আসুন না একটু গল্প করি।"

বেণু এগিয়ে এসে চেয়ারের মাথা ধরে, "শূন্যরাত্রিতে আবার গল্প কি?" বেণু চুলটা টান করে বেঁধেছে, একেবারে বাচ্চা মনে হচ্ছে।

"বসুন না—"

বেণু ঝুপ করে বসে পড়ে। লজ্জা ভাঙতে কোলের কাপড় সোজা করতে থাকে।

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।"

"বাব্বা, আবার কি কথা?"

"আপনি সেদিন অজ্ঞান হয়েছিলেন কেন?"

অশ্বিনীর প্রশ্নটা নেহাৎ আচম্বিত বলেই যেন বেণু তার হাত দুটো দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলতে পারে না। মুখ থেকে সহসা রক্ত সরে গেলে যেমন, বেণুর মুখ তেমনি ভাবশূন্য হয়ে যায়। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েই তাকে ফিক করে হেসে ফেলতে হয়। যেন একটা ধাঁধার জবাব দিচ্ছে এমনি স্বরে বলে, "চায়ের ধুলো মাখা ছিল তো আপনার সারা গায়ে।"

"হ্যাঁ।"

"ও যখন কারখানা থেকে আসত, সন্ধ্যাবেলায়, সারাশরীর লোহার ধূলোতে, অবিকল ঐ রকম, ঢাকা থাকত।"

"উনি বোধহয় লোহার কারখানায় কাজ করতেন?"

"হ্যাঁ, একটা স্টিল ফাউণ্ড্রিতে। পুরনো, ছোট ফার্ম।" বেণু থেমে যায়, যেন কিছু কথা বললো না বা কিছু মনে করেছে বা কিছু মনে করতে চায় না। তারপর গলা নামিয়ে অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কোনো স্টিল কারখানা দেখেছেন?"

"না।"

খুব সংক্ষিপ্ত এই জবাব দেয় অশ্বিনী যেন বেণুর কথাটাকে বাধাহীন রাখতে। বেণু খুব কম কথা খোঁজে অথচ বাধ্যতই তাকে কিছু বিস্তারিত বলতে হয়। ফলে বেণুর বিবরণটা কেমন অনিশ্চিত ঠেকে।

"কারখানায় ঢালাই বলে একটা ব্যাপার আছে। সেটাই আসল ব্যাপার।" "মানে?" "এইসব খুচরো স্টিল ফ্যাক্টরিতে যন্ত্রপাতি থাকে না। ফার্নেসগুলো থেকে নালা বেরিয়ে এসে চৌবাচ্চায় মিশেছে।" "কিসের চৌবাচ্চা?" "আসলে ঐ ফ্যাক্টরিতে সারাদিন যত ইস্পাত গলছে তার পুকুরের মতো।" "গলানো লোহার পুকুর?" "ঐ-সব কারখানায় এক একটা অর্ডার অনুযায়ী লোহা গলানো হয়, একটা ঐ ছোটখাটো পুকুরের মতো চৌবাচ্চায় প্রায় পাঁচ-ছয়টি নালা থেকে গল্‌গল্‌ করে গলানো লোহা এসে পড়ে," "গল্‌গল্‌ করে? মানে গলানো? মানে গরম? মানে লোহা জলের মতো বইছে?" "কোনো লোহার জিনিস পড়লেও সেকেণ্ডের মধ্যে গলে যায়, মানুষ তো কোন্‌ ছার," ওপরের ঠোঁটটা নিচের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে বেণু, এত, যে থুতনিটা থেঁতলে যায়, আঁকিবুঁকি পড়ে থুতনির টানটান বর্তুলে। তারপর খুব দূর থেকে শোনা যাচ্ছে এত ধীরে বলে যায়, "এই ঢালাইয়ের সময় সারাটা কারখানা-ই খুব সাবধান থাকে, মানে সারাদিনের ভেতর ওটাই

সবচেয়ে কঠিন, আসল কাজ, কোনোদিন কোনো অ্যাকসিডেণ্ট হয় না" হঠাৎ মনে হতে পারে, আসলে বেণু অশ্বিনীকে ঢালাই ব্যাপারটাই বোঝাতে চাইছে, একটা স্টিল ফাউণ্ড্রিতে ঢালাই-টা কত কঠিন আর জরুরি আর বিপজ্জনক ; যেন ঢালাই-এর সবরহস্য এখন বেণুর জানা। তারপর একটা বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে সহসা থেমে যায়। অশ্বিনী চোখ নিচু করে।

এমন কয়েকটা সেকেণ্ড কাটে যা খুব চাপা কান্নায় শেষ হতে পারত বা চেয়ার ছেড়ে বেণুর উঠে পড়ার কর্কশ শব্দে, তারপর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার দ্রুত খসখসে। বেণু ছোট্ট একটু নাক টানে, তারপর হেসেই বলে—"সেদিন সন্ধ্যায় একটু অন্যমনস্ক ছিলাম তো। আপনাকে ও-রকম দেখে কী রকম হয়ে গেল যেন!" অশ্বিনী কোনো কথা খুঁজে পায় না। শুধু বেণুর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকে—কেঁদে ফেলতে পারে নি বলে সে-চোখ দুটোর শিরাগুলো লালচে, সাদা জমিটা হঠাৎ চওড়া আর জ্বলজ্বল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বেণু আবার কথা শুরু করতে যায়, কিন্তু গলা বেধে গেলে একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলে, "এবার একটু মজার গল্প শুনুন।"

অশ্বিনী চোখ নামিয়ে আবার মুখ তুলে তাকায়। বেণু আরো একটু হেসে বলে, ফলে, বেণুর চোখদুটো ভারি দেখায় কান্না-মোছা বা ঘুম-পাওয়া, "আপনাকে আমি এইমাত্র কি বললাম ?"

"মানে ওঁর—"

"এরপর যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ওঁর কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে, আপনি কি বলবেন ?"

"কেন। অ্যাকসিডেণ্টে!" —অশ্বিনী বলে।

বেণুর হাসিতে একটু শব্দ-ও মেশে। অশ্বিনী বুঝতে পারে তার সামনে কেঁদে ফেলার লজ্জা ঢাকতে নয়,—নিজের আরো বড় কোনো লজ্জা নিয়ে নিরুপায় কৌতুকের দিকে বেণু বাধ্যত চলছে কোনো

সময় বেণুর কান্নাটা হাসিতে না-বদলে আটকে যেতে পারে, হঠাৎ দমবন্ধ হয়ে বেণু অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

"আপনি ঐ ফ্যাক্টরিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, বলবে—স্যুইসাইড করে উনি মারা গেছেন, কারণ আমার সঙ্গে নাকি বনিবনা ছিল না। আমার ভাসুরকে জিজ্ঞাসা করুন। বলবেন মারা গেছেন যখন, স্যুইসাইড নয়, এটারও তো কোনো প্রমাণ নেই।" এতক্ষণে, এই কথাটার মজায় বেণু বেশ হাসতে পারে। "আর আমি যদি ওটা মেনে নিই তাহলে কোম্পানি আমাকে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা দেবে।" গলায় বেশ রহস্যের সুর আনতে পারে বেণু।

"মানে ?"

"মানে খুব সোজা। এ-সব ফ্যাক্টরি তো আইনকানুন কিছু মানে না। যদি একবার প্রমাণ হয়ে যায় যে অ্যাকসিডেন্ট, ওরা নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা রাখে নি বলে অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছে—তাহলে কোম্পানির বদনাম, অসুবিধে। আর যদি ঠিক হয় যে উনি স্যুই-সাইড করেছেন তাহলে কোম্পানির গায়ে আঁচড়টি লাগবে না"—

"কম্‌পেন্‌সেশনের টাকাটাও দিতে হবে না"—

"না। টাকাটা কোনো ব্যাপার নয়। কম্‌পেনসেশন হিসেবে না হলেও কোম্পানি আমাকে পঞ্চাশ থেকে পচাঁত্তর, দর কষাকষি করতে পারলে আরো বেশি, টাকা দিতে রাজি আছে। শুধু এই শর্ত, অ্যাক-সিডেন্টের ব্যাপার নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। আমি রাজি হলে রিপোর্টই পাকা হয়ে যাবে যে ওর আত্মীয়স্বজন, এমন-কি স্ত্রীও বিশ্বাস করেন যে উনি আত্মহত্যা করেছেন। বিয়ের ক-বছরের ভেতর যে-মানুষ আত্মহত্যা করে, তার বৌয়ের চরিত্রে গোলমাল আছে এ-কথাতো যে-কেউ-ই বিশ্বাস করবে ?"

"আপনি কি করছেন ?"

"আমার দরখাস্ত অনুযায়ী সরকার থেকে তদন্ত করা হচ্ছে যে ওরা নিরাপত্তার সব আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছিল কি না"—

"তারপর কি হবে"—

"যদি না নিয়ে থাকে তাহলে প্রমাণ হবে অ্যাকসিডেন্টও হতে পারে। আর আমি একটা মামলাও করেছি"—

"কিসের মামলা ?"

"যে ওরা ঐ-সব দরকারি ব্যবস্থা না নেয়ায় এটা ঘটেছে। সেইজন্য তো মাঝেমধ্যে ছুটোছুটি করতে হয়। আমার ভাসুরের ইচ্ছে ছিল কোম্পানি যা দেয় তাই নিয়ে মিটিয়ে ফেলি। আমারও অনিচ্ছে ছিল না। কিন্তু শেষে ব্যাপারে যা দাঁড়াল তাতে পঁচাত্তর হাজার টাকা নিয়ে আমাকে স্বীকার করতে হয় যে আমার চরিত্র খারাপ বা স্বামীর সঙ্গে আমার বনিবনা ছিল না।"

বেণু মাথাটাকে চেয়ারের পিঠে খানিকক্ষণ রেখে বলে, "আমার কি সন্দেহ হয় মাঝেমাঝে জানেন"—

"কি"—

"আমার ভাসুরের সঙ্গে কোম্পানি কোনো ব্যবস্থা করেছে, উনি হয়তো শেষে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষীও দিতে পারেন। সেজন্যই দাদার এখানে চলে এলাম। ওখানে থাকতে ভালো লাগছিল না। কী জানি কি হবে। শেষে বদনামও নিতে হবে, টাকাটাও পাব না। মাঝেমাঝে মনে হয় মানুষটাই থাকল না, তো আমার বদনাম হলে আর কি এসে যায়, তাও তো ঐ টাকাটায়, সারাজীবনের একটা সংস্থান হতো। কিন্তু টাকাটা নিয়ে ফেললেই যেন ওর কাছে দোষী হয়ে পড়ব—আমার জন্যই মারা গেলেন !"

বেণুর স্বামীর মৃত্যুর ঘটনা শুনে অশ্বিনীর যেন মাথা ঘুরে যায়। একই মৃত্যু, বেণুব কাছ থেকে শুনলে হত্যা, কোম্পানির কাছ থেকে শুনলে আত্মহত্যা। দুটো গল্পকে একটা গল্প করার দাম পঁচাত্তর হাজার টাকা। দরকষাকষি করতে পারলে আরো বেশি। বেণু তার স্বামীর প্রতি যে অবিশ্বস্ত নয় আর ফ্যাক্টরি ল-র প্রতি কোম্পানি যে অবিশ্বস্ত নয় সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব যথাক্রমে বেণুর ও ফ্যাক্টরির।

দুটো একসঙ্গে প্রমাণ হতে পারে না। বেণুর বিশ্বস্ততা কোম্পানির বিশ্বস্ততা নাকচ করে আর কোম্পানির বিশ্বস্ততা বেণুর বিশ্বস্ততা নাকচ করে। মহামান্য ধর্মাধিকরণে বিশ্বাসের বিচার চলছে।

কিন্তু বেণুর সারা জীবনের সংস্থান কোনটা—তার সুনাম না পঁচাত্তর হাজার টাকা। তেমনি কোম্পানির সারাজীবনের সংস্থান কোনটা—তার সুনাম না পঁচাত্তর হাজার টাকা। জীবনের সংস্থান জোগাড় করতে বেণু যদি রাজি হয়ে যায় তাহলে জীবনের বাইরে যে-লোকটা চলে গেছে সে জড়িত হয়ে পড়ে। বেণু যেন এক গোলোক-ধাম খেলায় আটকা পড়ে গেছে।

কিন্তু বেণুকে তাই কি অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গে সমাজ থেকে একটু দূরে থাকতে হয়, আর তার মৃত স্বামীর ছবিতে নিয়মিত ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নমস্কার করতে হয়। বেঁচে থাকার সময় যার সঙ্গে বেণুর ভালোবাসার একটা সাক্ষী জুটছে না, মরে যাওয়ার পর বেণু কি তাকেই বা তার ফোটোকেই সাক্ষী মানছে? আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই এমন-কি খবরের কাগজের আইনআদালতের কলমে এক-এক সাক্ষীর সাক্ষ্য কাগজি নিরপেক্ষতা ভেদ করে মনে খোঁচা মারে,—বেণুর মুখে তার স্বামীর মৃত্যুকাহিনী শুনেও অশ্বিনীর কোনো করুণা বোধ হয় না। উল্টে সে যাচাই করে দেখতে চায় সাক্ষী না থাকলে ও কোম্পানি না জানলে অশ্বিনীকে বেণু দুটো আঙুল হাতে তুলে নিতে দেয় কি না, কোনো একদিন!

পাঁচ

ডগ শো-এর সময় কার্ডে দেয়া আছে এগারোটা। অশ্বিনীকে নিয়ে টগর সাড়ে দশটার সময়ই বেরিয়ে পড়ে। অশ্বিনী লম্বা লম্বা পা ফেলে, টগর খুব ছোট ছোট। টগর কাঁধের ওপর একটা জালি-জালি চাদর, গোলাপি, মোটা, ফেলে নিয়েছে। চাদরটার দুদিকে আবার ঝালর, ঝালরের শেষে ঝুমকো। ছোট ছোট পায়ে টগর

যেন ছুটে চলে, হাঁসের মতো, চাদরের ঝুমকোগুলো তার সামনে সব সময়ই দুলে যায়, মোরগের ঝুঁটির মতো। কথা বলার জন্য যখনই অশ্বিনী টগরের দিকে তাকাচ্ছিল টগরের কাঁধময় বুকময় ঐ ঝুমকোর দোলায় কখনো কখনো তার মনে হচ্ছিল টগর যেন সারাটা শরীর থরথর কাঁপিয়ে হাঁটছে। সেটা বারবার দেখে একসময় অশ্বিনীর মনে হতে শুরু করে তারা যেন কাঁপতে কাঁপতে ছুটতে ছুটতে চলেছে। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, "আমরা, যদি সবার আগে গিয়ে পৌঁছই সবাই ভাববে কি, যেন পাছে বাদ পড়ে যাই তাই ঘুম থেকে উঠেই হাজির হয়েছি।"

"তুমি যে কি বলো না অশ্বিনী, গভর্নর আসবেন, কমপিটিশন হবে, সবাই দেখবে সাতসকালে গিয়ে বসে আছে।"

"তা হোক্, তাদের হয়তো কুকুর টুকুর আছে, আমরা তো শুধু দেখতেই যাচ্ছি, আমাদের একটু দেরি করে যাওয়াই ভালো" অশ্বিনী দাঁড়িয়ে পড়ে।

টগর দাঁড়ায় কিন্তু অশ্বিনীর দিকে তাকায় না, সামনে তাকিয়ে থাকে যে-রাস্তাটা ধরে তাদের যাওয়ার কথা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে টগর বলে, "আমি বলছি তোমাকে আমাদের দেরিই হয়েছে, এর পর গিয়ে দেখব বসার জায়গা নেই।"

"না না সে সব ঠিক পাওয়া যাবে। হয় কোথাও গিয়ে বসি, নয় চলুন একটু ঘুরপথে যাই।" টগর নড়ে না। তার বাঁ হাতে ব্যাগ ঝোলানো ছিল, ডান হাত দিয়ে সে চোখের সামনে কোনো অদৃশ্য জাল সরায়। তাতে তার বুক কাঁধের ঝালর ঝুমকো আবার ঝলমল করে দুলে ওঠে। অশ্বিনীর মনে হয়, টগর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই থরথরাচ্ছে, মাঝেমাঝে। "এটা তো আপনাকে আগে কোনোদিন পরতে দেখি নি।" কথাটা শেষ না-হতেই পেছনে মোটরের হর্ন শুনে অশ্বিনী রাস্তার পাশে দু-পা সরে যায়। অশ্বিনীর কথা ও হর্ন শুনেও টগর রাস্তার ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে, রাস্তার

দিকেই চেয়ে। গাড়িটা আবার হর্ন দিতে অশ্বিনী টগরের বাহু ধরে সরিয়ে আনে। "এটা তো আপনাকে আগে কোনোদিন পরতে দেখি নি। চলুন, এই সিঁড়িটা ভেঙে উঠি, তারপর ওদিক দিয়ে নেমে যাব।"

অশ্বিনী সিঁড়ির দিকে হাঁটা শুরু করা মাত্র টগর আবার থরথরিয়ে হাঁটতে থাকে, "তোমার ভালো লাগছে, অশ্বিনী ?" "হ্যাঁ তো" বলে অশ্বিনী মানে বোঝার চেষ্টা করে,—এমনি ভালো লাগার কথা জিজ্ঞাসা করছে টগর নাকি চাদরটা ভালো লাগার কথা নাকি চাদর-টাতে টগরকে ভালো লাগছে কিনা।

"এ-চাদরটা গত বছর কেনা। কেনা নয়, একজন সিমলায় গিয়েছিল, আনতে দিয়েছিলাম। কিন্তু একদিনও পরি নি।" অশ্বিনী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সিঁড়ি ভাঙার তালে তালে টগরের কাঁধে বুকে ঝুমকোগুলো লাফালাফি করছে। যেন টগরের গলার নিচে বুক পিঠ জুড়ে ফুল গড়াগড়ি দিচ্ছে। "তুমি আসার পর তো এ-সব জায়গায় যাচ্ছি, এত বেড়াচ্ছি। আসলে এখানে কেউ একজন সঙ্গে না থাকলে না কেউ পাত্তা দেয় না।"

"তা বলছেন কেন, আপনি সঙ্গে আছেন বলেই তো আমি সব জায়গায় যেতে পারছি। নইলে আমাকে চেনে কে ?"

"সেটাও কিন্তু ঠিক মশাই !" বলে সিঁড়িটার সেই শেষ ধাপ কটা পেরতে ডান হাত দিয়ে টগর অশ্বিনীর বাহুটা চেপে ধরে, খানিকটা যেন কাছেও টানে। "আমি আছি বলেও তোমাকে এত খাতির ! একা একা হলে তুমিও পাত্তা পেতে না।" শেষ তিনটি ধাপ স্কিপিং দড়ি লাফানোর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে টগর, তার কাঁধ থেকে ঝুমকো ঝালর গড়িয়ে দুই হাতের ওপর পড়ে। ডানদিকে অশ্বিনীর বাহুলগ্ন টগরের হাতের ওপর ফুলের মালার মতো চাদরের ঝালর ঝুমুর ঝুলে থাকে—মনে হয় মালা দিয়ে কেউ বেঁধে দিয়েছে—"এখানে আসলে জুটিই আসল, ঠিক মতো জুটি বাঁধতে পারলে হলো, নইলে

গেল" টগর খিলখিল হেসে ওঠে। অথচ সিঁড়ি ভাঙার শ্রমে হাঁফিয়ে পড়ায় হাসিটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় আবার শুরু হয় আবার ছিঁড়ে যায় আবার শুরু হয়। আর হাসির সেই গমকে আর সহসা শ্বাস পতনে অশ্বিনীর আর টগরের বাহু হাত জুড়ে ফুলমালা দুলেদুলে ওঠে। ডগ্ শোতে প্রতিটি চেয়ারে কে বসবে তার নাম লেখা। আর সারা মাঠ জুড়ে কেউ কুকুর কোলে কেউ কুকুর টেনে ঘুরছে ফিরছে। অশ্বিনী ও টগর মাঠটায় খানিকটা ঘোরে। এখনো গভর্নর আসেন নি। মাঠের ভেতর কুকুর নিয়ে সবাই ঘোরাঘুরি করছে খানিকটা অলসভাবে। মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা রেখে দু-পাশে সারিসারি লোহার খাঁচা। টগর আর অশ্বিনী ঢুকেই ডানদিকে বেঁকে। সেদিকে লোহার খাঁচার ওপর দিকটায় কাঠের পাটাতন দেয়া। সেই ছোট্ট ছোট্ট লোহার খাঁচার ভেতরের পাটাতনে ছোট্ট ছোট্ট কুকুর কুঁই কুঁই করছে। কোনো কোনোটা মুখ বাড়িয়ে, কোনোটা-বা শুয়ে, কোনোটা দাঁড়িয়ে কাঁপছে। চারদিকে অসংখ্য কুকুরের ডাক উঠছে, নানা সুরে স্বরে। কোথা থেকে গম্ভীর গলার লম্বা ডাক ওঠে, কোনো কুকুরের লম্বা একটানা চিৎকার আর আলাদা করে শোনা যায় না এমন সমবেত অবিরাম ঘেউ ঘেউ রব। অশ্বিনী টগরকে বলে, "একটু চোখ বুঁজে শুনুন, মনে হবে গভীর রাত্রিতে জেগে আছেন।"

অশ্বিনীরা যে-জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, সেখানে বসে বসে কেউ কুকুরটাকে কোলে নিয়ে ব্রাশ করছে। টগর অশ্বিনীকে দেখায় "দেখো ব্যাকস্ট্রোক দিচ্ছে, যাতে লোম ফুলে ওঠে।" জনসন বেবি পাউডারেরর কৌটো উপুড় করে কেউ কুকুরের গায়ে ঢালছে—বাতাসে হোলির আবিরের মতো পাউডার আর সুবাস ওড়ে। একটা খাঁচা আবার তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। বাচ্চাকে যেমন করে হাতে ঝুলিয়ে দোলনা হয়, একটি মেয়ে তার কুকুরটাকে তেমনি দোলায় আর হাসে। অশ্বিনী একটু অবাক হয়ে দেখে কোনো কুকুরই

ডাকছে না তাহলে এত ডাক আসছে কোথা থেকে। সে টগরকে নিয়ে বিপরীত দিকে যায়।

সেখানেও দুই সারিতে লোহার খাঁচা কিন্তু পাটাতন নেই। সব বড় বড় কুকুর। এক অ্যালসেশিয়ান ছাড়া অশ্বিনী কোনো কুকুরই চেনে না। কোনো কুকুরের লম্বা লম্বা কাঠির মতো পা, পেছনের পা দুটো বেশি লম্বা, পাছাটা বেশি ঝোলা আর সারাটা গা রেশমের মতো পিছল। তাদের ভেতর আবার কতকগুলির লেজ-কাটা। অশ্বিনীর দেখতে বেশ লাগে। সে টগরকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কুকুর চেনেন না, না?" "ধ্যুৎ।" আবার শাদা রেশমি গায়ে কালো কালো ছোপ সেই ঠ্যাঙা-পেয়ে কুকুর। আবার কুচকুচে কালো লম্বা, উঁচু, খাড়া কান, রোগা লম্বা গলা। একটা কুকুরের ভোঁতা মুখ দেখে অশ্বিনী বলে, "এটা নিশ্চয়ই বুলডগ।" টগর খিলখিল হেসে, "তোমার বিদ্যে ঐ পর্যন্ত-ই" বলে আবার অশ্বিনীর বাহু চেপে ধরে। অশ্বিনীর ভালোই লাগে। সে আর টগর খনিকটা হিল্লোলিত গতিতে কুকুরেব গর্জনমুখর গভীরতর কোণের দিকে আনমনে হেঁটে যায়—লোকে সাধারণত নদীতীরে যেমন হাঁটে, দুজনে আনমনা, আত্মবিস্মৃত, নদীতীরে।

অশ্বিনী আর টগর মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল। যেন কুকুরগুলোর সঙ্গে তাদের খুব একটা সম্পর্ক নেই। তবু এক-একটা কুকুর এসে অশ্বিনীর চারপাশে ঘোরে বা গন্ধ শোঁকে যখন, তার খুব অস্বস্তি হয়। কিন্তু হঠাৎ বাঘের মতো দেখতে একটা অ্যাল্‌সেশিয়ান মাঠের সম্মুখের বাঁকোণা থেকে ছুটে এসে তার প্যাণ্ট ধরে টানাটানি শুরু করে। টগর আর অশ্বিনী দুজনই ঘুরতে থাকে, কুকুরটাও অশ্বিনীর প্যাণ্ট ছাড়ে না। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকে। প্রথমে কামড়ানোর আশঙ্কায় অশ্বিনী খানিকটা টানাটানি করছিল। কিন্তু কুকুরটা খুব আলগাভাবে তার প্যাণ্টটা ধরেছে দেখে সে একটু ঠাণ্ডা হয়। যারা খাঁচার সামনে বসে বা দাঁড়িয়েছিল তাঁদের প্রায় সবাই-ই দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে দেখে ও হাসে। অশ্বিনী খুব লজ্জা পায়। টগর অশ্বিনীর পিঠ ধরে একবার বাঁয়ে সরে, একবার ডাইনে। অশ্বিনীর হঠাৎ টগরকে খুব ধমক দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। টগর "এই এই" বলে আঁতকানো আওয়াজ দেয়। তাদের অবস্থা দেখে একজন এগিয়ে এসে বলে—"ওর সঙ্গে যান নইলে ছাড়বে না।" অশ্বিনীর প্যান্ট কামড়ে কুকুরটা গায়ে গায়ে দু-একপা এগিয়ে যেতে থাকে আর অশ্বিনী চলতে থাকে। টগর অশ্বিনীর পেছনে অশ্বিনীর পিঠ ধরে পায়ে পায়ে এগোয়। তারপর কুকুরটা অশ্বিনীর প্যান্ট ছেড়ে দিয়ে ওদের পেছনে গিয়ে গায়ে গা লাগিয়ে চলে যেন অশ্বিনীদের ঠিক পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। একটা টেন্টের সামনে যেতেই রিন্টি বেরিয়ে এসে টগরকে জড়িয়ে ধরে বলে, "বলো, টগরদি, ওবিডিয়েন্সে প্রাইজ পাব না?" রিন্টির কুকুর। রিন্টির বুকের ওপর কুকুরের নম্বর লাগানো 71। টগর বলে, "তোমার কুকুর! তাই বলো, আমি ভাবছি এতো দুষ্টু কার কুকুর হবে?" টগর রিন্টির চিবুক ধরে নেড়ে দেয়।

"কিন্তু নটি, আমার কথা শোনে নি," রিন্টি কুকুরটার কপালে, একটু নিচু হয়ে আঙুল দিয়ে টোকা মারে, "আমি বলেছি, তোমাকে রেখে মিঃ সরকারকে নিয়ে আসতে" এমন খিলখিল হেসে ওঠে রিন্টি অশ্বিনীর কিছুতেই বিশ্বাস হয় না রিন্টির বয়স টগরের চাইতে বেশি।

"ও তো আর আমাকে আনে নি, আমিই ওর সঙ্গে এসেছি", টগর বলে।

অশ্বিনী দেখে কুকুরটা একটু সরে গিয়ে মাঠে সম্পূর্ণ উদাসীন বসে। পায়ে পায়ে একটু দূরে সরে যেতে চায় সে। এই হঠাৎ অপ্রস্তুতিতে অশ্বিনী যেন ভেতরে একটু দমেই যায়। কত সহজেই জব্দ হতে পারে সে এখানে···। ভাবে, গিয়ে নিজের আসনে বসে থাকবে, কিন্তু এ-কুকুর তো আসন থেকেও তাকে টেনে আনতে পারে। রিন্টির টেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে দুপাশে অশ্বিনী যেন নতুন

করে তাকায়—সারি সারি খাঁচার রাশিরাশি কুকুর ঘেউ ঘেউ ডেকে যাচ্ছে। অশ্বিনী বুঝে ফেলে, এই মাঠের যেখানেই সে লুকোক, যে-কোনো কুকুরই তাকে নির্ভুল বের করে আনবে।

যেন অশ্বিনীকে বাঁচাতেই পেছনে রিঙের কাছের সামনের সারি থেকে মিঃ সিন্‌হা ডাকেন—"মিঃ সরকার, আসুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।"

টগর বলে, "চলো, মিঃ সিন্‌হা ডাকছেন!"

রিন্টির দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী এতক্ষণে বলার সুযোগ পায় "মিঃ সিন্‌হা ডাকছেন, আপনার শ্রীমানের কাছ থেকে একটু পারমিশন নিয়ে দিন।"

রিন্টি আবার সেই বয়স কমে যাওয়া হাসি হাসে—"অল্‌ওয়েজ, অল্‌ওয়েজ, ও কিছু করবে না। বাট ইফ ইউ মিসবিহেব উইথ মাই টগরদি এনিটাইম, হি উড্‌ জাম্প অন্‌ ইউ"—

টগর আর অশ্বিনী যে চলে আসে রিন্টির কুকুরটা তা চোখের পাতা নামিয়েও লক্ষ্য করে না। অথচ এই প্যাণ্ডেল বা মাঠের যে-কোনো কোণ থেকে অশ্বিনীকে ধরে নিয়ে আসতে পারবে—এটা ভেবে কুকুর-টাকে পেছনে রেখে চলে যেতে যেতে অশ্বিনীর ভারি অস্বস্তি হয়।

মিঃ সিন্‌হার পাশেই চেয়ারে বসেছিলেন মিঃ কুম্‌রা—কালকের ফ্লাওয়ার শোতে অশ্বিনীর পেছন থেকে বেরনো অশ্বিনীর কনুই অব্দি সেই ভদ্রলোক। চেয়ারে লাগানো নাম ও পদবীটা তাঁর মাথায় ঢাকা পড়েছিল। গভর্নরের ও তাঁর স্ত্রীর জন্য রাখা দুটি সিংহাসনের মতো চেয়ারের পাশেই মিঃ কুম্‌রার চেয়ার, তারপর মিঃ সিন্‌হার। মিঃ সিন্‌হা পরিচয় করিয়ে দেন, "এঁর সঙ্গে আলাপ করাতেই আপনাকে ডাকলাম। আপনাদের একই ডিপার্টমেণ্ট, মিঃ কুম্‌রা, দিল্লিতে আপনাদের মিনিস্ট্রির ডেপুটি সেক্রেটারি, আর ইনি মিঃ এ-কে সরকার, এখানে সেণ্ট্রাল এক্সাইজের অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়ে আছেন।" মুহূর্তে অশ্বিনীর শরীরটা ঝিম করে ওঠে। পর মুহূর্তে তার মনে

হয় সে মিঃ সিনহার কথা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ শুনতে পায় নি বা শুনলেও বুঝতে পারে নি। তার পরের মুহূর্তে অশ্বিনীর মনে হয় সে যেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। একগাল হেসে টগর নমস্কার করল—অশ্বিনীর মনে হয় তাতে যেন টগরের অনেক বেশি সময় লাগল। আরো বহু সময় চলে যাওয়ার পর অশ্বিনী খুব অস্পষ্ট বোঝে মিঃ কুম্‌রা তাকে প্রতিনমস্কার করলেন। তারও পরে মিঃ কুম্‌রা যেন কাচের দেয়ালের ওপার থেকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার নির্দিষ্ট নিয়োগটা কি?" অশ্বিনী যেন বানান বলছে এমন উচ্চারণ করে—"ই ন্ স্ পে ক্ ট র্।" মিঃ কুম্‌রার ঘাড়টা খুবই ছোট, তাই তিনি সম্পূর্ণ ঘুরতে পারছিলেন না। তদুপরি অশ্বিনী লম্বা ও দাঁড়িয়ে। মিঃ কুম্‌রা বসে বসে চেয়ারের ওপর একটু ঘোরেন তারপর বসে বসেই ঘাড়টা আরো পেছনে হেলিয়ে অশ্বিনীর মুখটা দেখেন। তারপর খুব ধীরে ধীরে তাঁর চোখটা অশ্বিনীর শরীর বেয়ে নেমে আসে। মাত্র একটা রেখায় মাথা থেকে ঘাম গড়িয়ে নামার শির-শিরানি নিয়ে অশ্বিনী পায়ের নখ পর্যন্ত তাঁর দেখাটা যাতে শেষ হয় যেন সেজন্য দাঁড়িয়ে থাকে। মিঃ কুম্‌রা নত দৃষ্টিতেই চেয়ারে ঘুরে যান। আর ফিরে তাকান না। কোনো কথাও বলেন না। অশ্বিনী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যেন সহসাই অশ্বিনী মিঃ সিন্‌হাকে মিঃ কুম্‌রার সঙ্গে কথায় ব্যস্ত দেখে, তিনিও আর ফিরে তাকান না বা কিছু বলেন না। অশ্বিনীর সামনে তখন আর সেই কাচের দেয়াল নেই। সে দেখে মিঃ কুম্‌রার হাত দেড়েক দূরত্বের ভেতর সে দাঁড়িয়ে। অশ্বিনী চোখ তুলে সামনে তাকায়—মাঝখানের মাঠে একটা কুকুরকে টেবিলের ওপর তুলে একজন তার গলার দুপাশ টিপে টিপে যেন কিছু পরীক্ষা করছে। অশ্বিনী এক-পা দু-পা করে পেছনে সরে যেতে থাকে। তারপর বেশ খানিকটা পেছিয়ে যেন আর না পেরে শেষের দিকে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। মিঃ কুম্‌রা, তাদেরই মিনিস্ট্রির ডেপুটি সেক্রেটারি। ঐ পেছনে বসে বসে অশ্বিনী যেন ইন্‌স্পেক্টর

আর ডেপুটি সেক্রেটারির দূরত্বটা মাপতে থাকে, এক বাঁও মেলে না, চার বাঁও মেলে না, দশ বাঁও মেলে না……।

ছয়

টগর ছুটে এসে বলে, "কি ব্যাপার, তুমি এসে চুপচাপ বসলে যে!" অশ্বিনী টগরের দিকে তাকিয়ে থাকে। অশ্বিনীর দৃষ্টি থেকে এক ঝটকায় তার মুখটা সরিয়ে নিয়ে টগর নিচু হয়ে চেয়ারের পেছনে লেখা নামগুলো দেখতে থাকে। অশ্বিনীর চোখের সামনে টগরের নোয়ানো শরীর ঘাড় হেলিয়ে খুব ধীরে ধীরে চলে যায়। মৃদু মেয়েলি গলায় গম্ভীর ধাতব আওয়াজ ওঠে—"পূড্‌ল্‌ টয়েস, পূড্‌ল্‌ মিনিয়েচার, নাম্বারস্‌ থ্রি, টেন, ইলেভেন, নাইনটিন, টুয়েনটি সেভেন, টু দি রিং প্লিজ।" চোখটা মেলা ছিল বলে অশ্বিনী দেখতে পায় সেই ছোট্ট ছোট্ট কুকুরগুলোকে কোলে কাঁখে নিয়ে নম্বর লাগানো এক-এক জন মাঠটার ভেতরে ঢুকে প্রায় লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। অশ্বিনীর সামনে এগুলো নিঃশব্দে ঘটে যেতে থাকে, যেন শব্দ হচ্ছে—সে শুনতে পাচ্ছে না। অথচ বাইরে কুকুরের চিৎকারে মধ্যরাত্রি। টেবিলের ওপর তোলা কুকুরটাকে আড়াল করে দুসারি সামনে টগর সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে বুঝি ভাবে অশ্বিনী এতক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তাই সে হাসে আর অশ্বিনীকে ইশারায় ডাকে। সে-ও হয়তো অশ্বিনীকে নাম ধরেই ডেকেছে—অশ্বিনী শুনতে পায় নি। টগর ইশারায় পাশাপাশি চেয়ার দুটো দেখায়। অশ্বিনী তেমনি, যেন টগরের দিকেই, তাকিয়ে, টগর সরে গেলেই যে-দৃষ্টিপথে টেবিলের ওপর কুকুরের পরীক্ষা। টগর হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে কাঁপতে কাঁপতে কাঁধে ঘাড়ে বুকে ফুল দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসে। সেই আসাটুকু জুড়ে মৃদু মেয়েলি গলায় গম্ভীর ধাতব আওয়াজ ওঠে, "জমাদার, রিংকা অন্দর আইয়ে, জমাদার রিংকা অন্দর আইয়ে।" টগর এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলে, এখানে

বসলে হবে না। আমাদের চেয়ার ওখানে।" এখন টগরকে দেখতে হলে মুখ তুলে তাকাতে হয়। অশ্বিনী তাকায় না। তাই তার সারাটা দৃষ্টি আড়াল করে টগরের পেটটুকু। গত মাত্র কয়েকটি মিনিটের মতো এত নির্ণিমেষ অশ্বিনী যেন কোনোদিন টগরকে দেখে নি, এতটা দূর থেকে বা এতটা কাছ থেকে। টগর অশ্বিনীর ঘাড়ে একটা হাত দিয়ে বলে, "ওঠো, মিঃ প্রধান কিন্তু আমাদের জন্য খুব ভালো সিট দিয়েছেন।" মিঃ প্রধানের নামটাতে অশ্বিনী টগরের দিকে মুখ তুলে তাকায়। তারপর বলে, "এখানেই বসুন না, কেউ এলে দেখা যাবে।" "ধ্যুৎ, সবাই আসবে, চলো, নিজেদের সিটে বসি, এতটা পেছনে বসব কেন?" অশ্বিনীর হাত ধরে টগর টানে। অশ্বিনী উঠে দাঁড়ায়। তারপর টগরের সঙ্গে সঙ্গে দুসারি এগিয়ে যায়। সেখানে বসে অশ্বিনী আবার মাপতে শুরু করে ডেপুটি সেক্রেটারি আর ইন্‌স্পেক্টরের ফারাক কতটা। সে হঠাৎ টগরকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা সবার চেয়ারের পেছনেই নাম লেখা আছে নাকি?" টগর তখনো দাঁড়িয়েছিল। অশ্বিনীর ওপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে অশ্বিনীর চেয়ারটার পেছনে দেখে পড়ে যায় "মিঃ এ-কে সরকার, গভর্নমেণ্ট অভ ইণ্ডিয়া।" তারপর সোজা হয়ে বলে, "হ্যাঁ, অশ্বিনী, তাহলে তুমি গভর্নমেণ্ট অভ ইণ্ডিয়া? অ্যাঁ" তারপর পাশে বসে পড়ে বলে, "রিণ্টি ইচ্ছে করেই মজা মেরেছে জানো। ও ঠিক জানে তুমি এর আগে কোনোদিন ডগ্ শোতে আসো নি, ব্যাপার-স্যাপার জানো না। সেইজন্য ইচ্ছে করে ও-রকম করল" টগর একগাল হাসে। তাহলে টগর কিছু বুঝতে পারে নি অশ্বিনী ভাবে।

"তাহলে আর একটু পরে করলেই পারত, এখনো তো সবাই আসে নি"—খুব নিরুত্তাপ গলায় অশ্বিনী বলে ফেলতে পারে।

"না, গভর্নর এসে গেলে তো আর এ-সব ইয়ার্কি চলবে না। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব রিণ্টিকে। ওর বড় বাড় বেড়েছে।"

কথাটা বলে টগর খুক করে একটু অস্পষ্ট হাসে। রিন্টির মজাটা আসলে টগরের ভালোই লেগেছে—তাকে আর অশ্বিনীকে নিয়ে এই মজাটা। মৃদু মেয়েলি গলায় গম্ভীর ধাতব আওয়াজ ওঠে, "পোমা-রেনিয়ান এ্যাণ্ড পোমারেনিয়ান মিনিয়েচার নাম্বারস ফাইভ, নাইন, টুয়েলভ্, টুয়েন্টি, টুয়েন্টি ওয়ান, টুয়েন্টি টু, টুয়েন্টি থ্রি, টুয়েন্টি এইট, থার্টি থ্রি, থার্টি সেভেন, থার্টি ওয়ান—টু দি রিং প্লিজ।" টগর গলা উঁচিয়ে দেখে। আবার সেই কুকুর কোলে বা কাঁখে মাঠে গিয়ে প্রায় লাইন দিয়ে দাঁড়ানো আর এক-একটা কুকুরকে গলা টিপে টিপে পরীক্ষা। একজন আধবুড়ো ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে ব্যাজ লাগানো এক ভদ্রলোক তাঁর নম্বরটা দেখিয়ে কিছু বললেন। ভদ্র-লোক চমকে নিজের নম্বরটা দেখেন। তারপর তাড়াতাড়ি কুকুরটাকে মাটির ওপর রেখে, দুই পায়ের চাপে আটকে পেছনের পকেট থেকে একটা নতুন নাম্বার বের করে বুকে লাগান। লাগানো হলে টগর পড়ে "টুয়েন্টি এইট।" কুকুরটা ভদ্রলোকের পায়ের চাপ থেকে বেরবার জন্য কুঁই কুঁই করে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে মুখ ঘোরাচ্ছে। টগর হেসে ফেলে বলে, "দেখো দেখো।" আর অশ্বিনী দেখে দেখতে দেখতে তার আর সামনের সারিতে মিঃ কুম্‌রার চেয়ারের মাঝখানের ফাঁকটা কত হু হু করে ভরে উঠছে। এতক্ষণে মিঃ কুম্‌রাকে শারীরিকভাবে আর দেখতে পাচ্ছে না, অশ্বিনী টগরের দিকে তাকায়। টগর ঝলমলিয়ে সোজা হয়ে বসে বলে, "গভর্নর আসছেন", "কে বললো আপনাকে?" "এই যে সবাই এসে সিট নিচ্ছে।" অশ্বিনীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে টগর পাশের ফাঁকটা, মাঠের ওদিকটা, রিঙের ভেতরটা দেখতে থাকে। কোথা দিয়ে সস্ত্রীক গভর্নর আসেন? অশ্বিনীর হঠাৎ মনে হয় সে সম্পূর্ণ অপরিচিতা কোনো মহিলার পাশে বসে আছে। আর টগরের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপের পর এই প্রথম অশ্বিনীর মনে হলো কখনো কখনো টগর তাকে দেখতেই পায় না—যেমন এখন। যেমন তখন, অশ্বিনী রক্তহীন দাঁড়িয়েছিল,

নিথর। নাকি কখনোই টগর তাকে দেখতে পায় না। এক, কোথাও যাওয়ার রাস্তাটুকু বাদ দিয়ে।

সামনের ভিড়টা চেয়ারে বসে গেলে দেখা যায় এক-একটা কুকুরকে গলার দড়ি ধরে মাঠে হাঁটানো হচ্ছে আর মালিকেরা পেছনে পেছনে দড়ি ধরে চলছেন। কুকুরগুলো খুব ছোট ছোট, তাই তাদের চার পায়ের হ্রস্ব দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গতি রেখে মালিকরাও খুব ছোট ছোট পা ফেলে ছুটছেন। তাতে তাদের শরীরের টান থাকছে না।

হঠাৎ সবাই দাঁড়িয়ে ওঠে। আর তাদের মাথার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নিশ্চয়ই গভর্নর ও তাঁর স্ত্রী সেই রিংটুকুর ভেতর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে আসছেন—পেছনে একটা ভিড় তাদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছে। তাঁরা মিঃ কুম্‌রা যেদিকে সেদিকেই আসেন। অশ্বিনী ধপ করে বসে পড়ে। টগর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

একটি লোক এসে নিচু হয়ে একটা অ্যালব্যাম এগিয়ে দেয়। কাল ফ্লাওয়ার শো-র ছবি। টগর টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকে। গভর্নরের স্ত্রী বক্তৃতা করছেন। বক্তৃতা করছেন। শ্রোতাদের নানা অংশ। কোথাওই অশ্বিনী বা টগর নেই। উদ্বোধনী শোভাযাত্রা এগিয়ে যাচ্ছে। শোভাযাত্রার নানা অংশ। কোথাও অশ্বিনী বা টগর নেই। অশ্বিনীর মনে হয় এর পরই শোভাযাত্রার সামনের সারিতে যাবার জন্য লন পেরিয়ে, পথ পেরিয়ে, করিডর পেরিয়ে তাদের দৌড়নোর ছবি থাকবে। তারপর গেটের সামনে উদ্বোধনের সব ছবি। সব ছবিতে টগর আর অশ্বিনী গভর্নরের স্ত্রীর পাশে পাশে। প্রথম দুটি-একটি ছবিতে টগরকে একটু পেছনে দেখায়। কিন্তু তারপর থেকে সে-ও জায়গা পেয়ে গেছে। অশ্বিনী দেখে কোথাও মিঃ কুম্‌রার কোনো অস্তিত্বই নেই। তাকে সম্পূর্ণ ঢেকে প্রকাণ্ড অশ্বিনী দাঁড়িয়ে। শেষের দিকে একটা ছবিতে খুব লক্ষ্য করে অশ্বিনী দেখে, পেছন থেকে দুটি হাত অশ্বিনীর কোমরের কাছাকাছি একটু ফাঁক করার চেষ্টা করছে, সেই ফাঁক দিয়ে

মিঃ কুম্‌রার কালো, পোড়া, ছোট মুখটা উঁকি দিচ্ছে—অশ্বিনী তাকে কী রকম ভাবেই না ঢেকেছিল। শেষের কটি ছবিতে মিঃ কুম্‌রা আর অশ্বিনী পাশাপাশি। কিন্তু গভর্নরের স্ত্রীর পাশে ঐ লম্বা চওড়া সুন্দর অশ্বিনীর ওপর থেকে কার চোখ যাবে ঐ বেঁটে খাটো মিঃ কুম্‌রার ওপর ?

এক-একটা ছবি দেখে টগর আনন্দে প্রায় শিউরে ওঠে। একটা উঠেছে গভর্নরের স্ত্রী ফুলের মালার বাঁধনে হাত দিয়েছেন আর ছুপাশ থেকে টগর আর অশ্বিনী এক গাল হাসি নিয়ে বাঁধনখোলা তাঁর হাত ছুটির দিকে তাকিয়ে আছে।

টগর এই ছবিটা সবচেয়ে বড় সাইজের, আর আরো ছুটো ছবি আর একটু ছোট সাইজের, ছু-কপি করে অর্ডার দেয় আর পুরো অ্যাল্‌ব্যামের ছুই সেট।

সমবেত করতালিধ্বনির শব্দে ওরা তাকিয়ে দেখে গভর্নরের গলায় মালা দেয়া হলো। গভর্নরের পাশে তাঁর স্ত্রীকে যেন টগর আর অশ্বিনীর নিকট লোক মনে হলো। লোকটা যেরকম প্রত্যেক সারিতেই অ্যালব্যামটা দেখিয়ে দেখিয়ে অর্ডার নিচ্ছে—ও তো তাহলে প্রথম সারিতেও যাবে। তাহলে তো গভর্নরের স্ত্রী দেখবেন, তেমনি মিঃ কুম্‌রাও দেখবেন—অশ্বিনী তাকে কী রকম দলেপিষে দাঁড়িয়ে আছে।

পেছনে কেউ চাপা স্বরে ডাকলে অশ্বিনী ফিরে দেখে ভট্‌চায। ভট্‌চায ইঙ্গিত করে উঠে যেতে। অশ্বিনী বলে, "চলুন, বাইরে যাই।" একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে ওরা মাথা নিচু করে উঠে যাওয়ার সময় টগর পেছন ফিরে ফটোঅলাকে ডেকে নিয়ে যায়।

অশ্বিনীর পেছনটা শিরশির করে ওঠে। তার মনে হয় এখনো মিঃ কুম্‌রা তার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

ভট্‌চায বলে, "চলুন এদিক দিয়ে কাটি।"

টগর আপত্তি করে বলে, "কাটব কেন, দেখব না ?"

"আরে, এখন তো পরীক্ষা-টরীক্ষা হবে, প্রাইজের সময় ওদিক দিয়ে সামনে চলে যাব।"

টগর ফোটোঅলাকে ডেকে ভট্‌চাযকে অ্যালব্যাম দেখানো শুরু করে। ভট্‌চায—"আরে ব্যস, ইন্‌স্পেক্টর ছমাসেই দার্জিলিঙে যে পজিশনে গেছে!"

সারা জায়গা জুড়ে তখন কেউ কুকুরকে থার্মোমিটার লাগাচ্ছে, কেউ চিরুনি চালিয়ে দিচ্ছে, কেউ একটা ডিসে তরল কিছু নিয়ে খাওয়ার জন্য কুকুরটাকে সাধাসাধি করছে। আর কুকুরগুলো উত্তেজিত ভাবে হাঁ করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কোনো একটা ব্যাপারে যেন মন দিতে পারছে না।

ভেতর থেকে মৃদু মেয়েলি গলার গম্ভীর ধাতব আওয়াজ আসে, "পিকিনিজ, নাম্বার সিক্সটি ফাইভ, সেভেনটি থ্রি, সেভেনটি ফোর, সেভেনটি ফাইভ···" অশ্বিনী একটু পেছন ফিরে দেখে, মানুষের মাথা, নীচে কুকুরের মাথা, আর সারা তল্লাট জুড়ে খেপা কুকুরের চিৎকার—যেন কুকুরের দল চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে। অশ্বিনী মনে মনে আওড়ায়, পূড্‌ল্‌, পমারেনিয়ান, পিকিনিজ—যেন কালকের সব ফুলের নাম, বা চায়ের নাম।

অশ্বিনী একবার চোখ বুঁজে চারিদিকে কুকুরের তাড়া করা বা ঘিরে ধরা আকাশ কাটানো চিৎকার শুনে নেয়।

সাত

রেসের দিন সকালে স্যানিভ্যালিতে একটা কাজ অশ্বিনীর আগেই ঠিক করা ছিল। ডগ-শোর পরই ভট্‌চায তাকে গাড়িতে স্যানিভ্যালিতে পৌঁছে দিয়ে আসে, রাতে কাজকর্ম সেরে রেখে সকালেই দার্জিলিং চলে আসতে পারে যাতে। আধ-খালি হুইস্কির বোতলটা ভট্‌চায জোর করেই অশ্বিনীর পকেটে ঢুকিয়ে দেয়—"আরে, একা একা থাকবেন, সময় কাটবে, রেখে দিন।"

সকালে, স্যানিভ্যালির গাড়ি দার্জিলিঙে বেরলো ঠিকই কিন্তু দুপুর প্রায় পার করে দিয়ে। বড়বাবুর সঙ্গে কথা ছিল, সুন্দাস গাড়ি নিয়ে অশ্বিনীকে পৌঁছে দেবে। কিন্তু ছোটসাহেব ডেকে পাঠিয়ে সুন্দাসকে বেলা বারোটা পর্যন্ত আটকে রাখে। মেস থেকে তৈরি হয়ে অশ্বিনী ফ্যাক্টরিতে সেই সকালে এসেছে। বেলা বারোটা নাগাদ অশ্বিনীর একবার মনে হয় মেসে গিয়ে স্নান খাওয়া করে নিলে হয়। কিন্তু মেসে বলা নেই সুতরাং দেরি হবে। শেষে গাড়ি নিয়ে সুন্দাস যখন এলো তখন বেলা বাজে প্রায় একটা। এখানে অশ্বিনীর স্নান খাওয়া তো হলোই না। দার্জিলিঙে পৌঁছতে এত দেরি হয়ে যাবে যে তখন আর সেখানেও স্নান খাওয়ার সময় থাকবে না।

এতে অবিশ্যি একটা উপকার হলো। স্যানিভ্যালির কাগজপত্র একটু পিছিয়ে ছিল। গাড়ির জন্য বসে থাকতে থাকতে অশ্বিনী বকেয়া কাজ সবটাই তুলে ফেলে কাগজপত্রগুলো আজকের তারিখ পর্যন্ত টেনে আনল।

কালকে সেই ডেপুটি সেক্রেটারিকে দেখে আর আজকে এত কাজ করে অশ্বিনী যেন নিজের চাকরি ইত্যাদির ভারে ঢাকা পড়ে। তার অচেতন স্তরের অব্যবহিত বাস্তবতা,—এই পাহাড়, প্রকৃতি, পথ, দার্জিলিং, রেস,—খুব উপস্থিত ছিল না।

সুন্দাসের সঙ্গে গাড়িতে দার্জিলিং রওনা হওয়ার পরও সেই ভার অশ্বিনীর মন বেশি জুড়ে থাকে, সামনের ঘোড়দৌড়ের চাইতে। রাস্তায় ছোট সাহেবের ছোট গাড়িটা অশ্বিনীর গাড়ি পেরিয়ে ছুটে যায়। রেসে যাচ্ছে।

ভট্‌চাযের বাহাদুর বলে,"বাবু ওপরে আছেন, আপনি এলে সোজা ওপরে যেতে বলেছেন।" ভট্‌চাযের ওপরের ঘরটা অবিকল নিচের ঘরের মাপে। ঘরের মাঝামাঝি ভট্‌চাযের খাট। ভট্‌চায জানলার কাছে এক আর্মচেয়ারে কম্বলে কোমর পর্যন্ত মুড়িয়ে তন্দ্রা দিচ্ছে। এই ভট্‌চায" ডাকতেই ভট্‌চায তাড়াতাড়ি সোজা হয়, "বাঃ

আমি পড়ি মরি করে ছুটে এলাম আর আপনি দিব্বি নিদ্রা দিচ্ছেন।"

ভট্‌চায দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে বলে, "আরে আমি তো আপনার জন্য অপেক্ষা করতে করতেই ঝিমিয়ে পড়লাম। কটা বাজে?"

"দুটো বাজতে চললো"—

"ওঃ এখুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি, দু মিনিট ভাই" জামা-প্যাণ্ট নিয়ে ভট্‌চায বাথরুমে ঢোকে। ভট্‌চাযের ঘরগুলোতে একটা অভিজাত তাচ্ছিল্য আছে। সবই মনে হয় দামি জিনিস। কোনো বিষয়েই মনে হয় ভট্‌চাযের কোনো আসক্তি নেই। খাটের মাথায় একটা বিরাট ছবি—একটি বিদেশী মেয়ে নাচছে, টুপি মাথায়, জামা-কাপড় প্রায় নেই বললেই চলে। ঘরের তাকে, টেবিলের ওপরে মদের খালি বোতল। খুব রঙচঙে ছবির ম্যাগাজিন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আর্মচেয়ারে বসে ভট্‌চায ডাকে "বা-হা-দু-র।" বাহাদুর এলে জুতো দিতে বলে। "বুঝলেন মশাই অশ্বিনীবাবু, দার্জিলিং-এ এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো, কোনো বাজে কাজে, এই হাত মুখ ধোয়া ইত্যাদি কোনো ব্যাপারে সময় নষ্ট নেই। অলওয়েজ রেডি। নো ঘাম নো মাছি, এই নিয়ে দার্জিলিঙে আছি।" আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতেই ওয়াড্রোব থেকে কোট বের করে বাহাদুর পেছনে ধরে। "আপনার যদি আমার বাহাদুরের মতো একটি অলপারপাজ থাকে, তাহলে তো কোনো কথাই নেই।" বাহাদুর কোটটা পরিয়ে দিয়ে পেছন থেকে একটু ঝেড়ে দেয়। তারপর বেরিয়ে যায়। ভট্‌চায চট্‌ করে একটা তাক থেকে একটা ছোট্ট, বেঁটে বোতল বের করে গেলাসে একটুখানি ঢেলে অশ্বিনীকে দেয়—"নিন, নিন, টুক করে একটু ঢেলে নিন, বা বা রেসের মাঠে যাচ্ছেন।" না, মশাই, খালি পেটে আছি—কথাটা ভেবেও অশ্বিনী বলতে পারল না। খেয়ে নিল। গেলাসের অভাবে ভট্‌চায বোতলটা থেকেই নিজের মুখে উপুড় করে ঢালে। তারপর মুখ

চোখ কুঁচকে গিলে নেয়। বোতলটার ছিপি এঁটে রাখতে গিয়ে ভট্চায বলে, "না বাবা, রেসের দিন, এ-সব জিনিস সঙ্গ ছাড়া করতে নেই, থাকো বাবা পকেটেই থাকো, নিন চলুন।" অশ্বিনী বলে, "আপনার কি সবসময় পকেটেই থাকে নাকি" "আরে মশাই দি অন্‌লি ইয়োরোপিয়ান টাউন অভ বেঙ্গল, না মশাই, আসলে ইণ্ডিয়াতেই এ-রকম টাউন আর নেই, এখানে কায়দাকানুনও সব ইয়োরোপিয়ান। থাকুন না আর কিছু দিন তাহলে আগামী বছর আপনার পকেটেও থাকবে"—

টগরদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন দিতেই টগর নেমে আসে। টগর আবার আজ গোলাপি রঙের ফারের কি একটা পরেছে, অশ্বিনী বোঝে না, কোট না স্কার্ফ না কী। "তোমাদের এত দেরি!"

"আপনার অশ্বিনীই আসতে দেরি করল টগরদি, আমি রেডি ছিলাম," টগরকে ভেতরে ঢুকে মাঝখানে বসার জায়গা দিতে অশ্বিনী নেমে দাঁড়ায় আর একবার মাথা বেঁকিয়ে দেখে জানলায় বেণু আসে কিনা।

বাজার ছাড়বার পরই গাড়ি গড়গড়িয়ে নীচের দিকে নামছিল। একপাশে বাড়িঘর, আর একপাশে খাদ, কিছু কিছু গাছগাছালি, কিছু কিছু বাড়ি। তারপর দুধারে পাইন গাছের সারিতে রাস্তা-টাকেই প্রায় অন্ধকার মনে হয়। নর্থ পয়েন্ট ছাড়ার পর গাড়ি হুহু করে নিচে নামে। টগর একবার সোজা হয়ে বসে। একবার নাক টেনে বলে, "কি ব্যাপার দুজন মিলে এতক্ষণ কি গেলাস টানা হচ্ছিল নাকি? ঈস কী গন্ধ!" প্রথমে ভট্চায হেসে উঠল, পরে অশ্বিনী। "টগরদি জানেন না মদের গন্ধ গায়ে না থাকলে রেসের মাঠে ঢুকতে দেয় না? তাই আমরা মদের সেন্ট মেখে এসেছি।" এই কথাতে অশ্বিনী হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে তার খুব ভালো লাগে। তাই হেসে যায়। ওপরে পাইন পাতার ঘন আবরণ আর নীচে পাইনগাছের পাতাছাড়া কাণ্ডদেশের ফাঁক

দিয়ে দূরের পাহাড়ের উত্‌রাই। "আচ্ছা ইনস্পেক্টর, রাঙতির ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু হয় নি, না?"

"না, আর কী হবে। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন চলছে বোধহয়। আপনার কী এত ইন্টারেস্ট মশাই বলুন দেখি!"

হো হো করে হেসে ওঠে ভট্‌চায—"এটা আপনি লাখ কথার এক-কথা বলেছেন, আমার কি ইন্টারেস্ট! আজকে রেসে যাওয়ায় আপনার কি ইন্টারেস্ট!"

"কিছুই না, মিঃ প্রধানের ঘোড়া দৌড়বে, উনি আসতে বলেছেন, আপনি আসতে বলেছেন, তাছাড়া আবার ইন্টারেস্ট কি হবে?" অশ্বিনী তার স্বভাবের পক্ষে একটু বেশি জোর দিয়েই বলে। "ব্যস? মিঃ প্রধান বলেছেন, আমি বলেছি এই পর্যন্ত? আপনার কি ইন্‌টারেস্ট?" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অশ্বিনী যেন বেশ রুখেই বলে "হয়তো নতুন একটা জিনিস দেখার আগ্রহ" "যদি তাই হয়, রাঙতির ব্যাপারেও আমার সেটুকুই ইন্‌টারেস্ট! আর যদি এর বেশি কিছু ইন্‌টারেস্ট রেসের মাঠে আপনার আছে বোঝেন, তাহলে রাঙতির ব্যাপারেও আমার সেটুকু আছে বুঝবেন? ব্যস" "বাঃ একটা অ্যান্নুয়াল সেলিব্রেশন, গভর্নর আসছেন, যাব না?" টগর বলে, তারপর অশ্বিনীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসে "তোমাকে আজ কেমন গুণ্ডা গুণ্ডা লাগছে।" ভট্‌চায হেসে ওঠে। অশ্বিনী একটু মুচকে হাসে।

খালিপেটে মদের ঢেকুর উঠছিল অশ্বিনীর। আর কানটা গরম হয়ে থাকে। অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "লেবঙের রেস কি সারা বছরই চলে!"

"ধ্যুৎ মশাই। সোলজাররা থাকে তাদের একটা রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা তো রাখতে হবে। আর খানিকটা ট্যুরিস্টদের ব্যাপারও আছে। অবিশ্যি ব্রিটিশ গবমেণ্টের তো আর টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনের কোনো দরকার ছিল না।"

"তাহলে তো এটা অনেক দিনের ব্যাপার!"

"হ্যাঁ তা অনেক দিনের। আগে বোধহয় সত্যিকারের জলুস

কিছু ছিল। সাহেবদের একটা ইন্‌টারেস্ট ছিল তো! পার্টিশনের পর থেকে দিনদিন কমে এসে এখন আবার একটা বোধহয় স্টেডি পয়েন্টে এসেছে। দার্জিলিঙের সোশ্যাল প্রোগ্রাম তো সব সেই আগের মতোই আছে। রাজধানীর প্রোগ্রাম। গভর্নর আর কাউন্সিল মেম্বার। তখনকার একটা আইটেমও বাদ যায় নি, জানেন? এমন কি ম্যালে লাটসাহেবের পায়চারি পর্যন্ত। রেসটাও দার্জিলিঙের পার্মানেণ্ট বাসিন্দে এলিট আর সাহেবদের চা-বাগানের সাহেব আর সিজন্যাল এলিটদের একটা মোটামুটি রিক্রিএশন, কিছুটা মজা. আমার তো খারাপ লাগে না। প্রায়ই আসি।"

"আপনার যে কী খারাপ লাগে সেটাই বুঝলাম না।"

হো হো করে হেসে ভট্‌চায বলে, "এটা আপনি ঠিক বলেছেন। আমি চেষ্টা করি কিছু কিছু জিনিস খারাপ লাগাতে, কিন্তু সবই ভালো লেগে যায়," "আমারও বাবা ভট্‌চাযের মতোই, একেবারেই গোমড়া মুখো হয়ে থাকতে পারি না। সবার সঙ্গে মিশব, হৈ হৈ করব," টগর বলে। টগর যেন কোনো কথাই বলে নি এমন সুরে ভট্‌চায বলে যায় "এই যেমন আপনাকে। আর ভালো লেগে গেল তো গেল, তখন আপনার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করে নিলাম"—

"আমাকে একটু ক্রেডিট দেবেন নইলে আপনাদের আলাপই হতো না"— টগর বলে।

অশ্বিনী বলে, "তা বলছেন কেন। আমি নতুন লোক, আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে তো আমারই লাভ হয়েছে"—

"টগরদি থাকার জন্যই আসলে এত তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। আর প্লেনভিউয়ের ঐ ব্যাপারটাতেই মিঃ প্রধানের চোখ আপনার দিকে যায়। অথচ আপনার সঙ্গে সেদিন দেখাও হয় নি"—

"তাতো হয়ই নি"—

"অথচ ঐ ভিড় আর গোলমালের ভেতরও আমাকে ডেকে বলে দিল আপনাকে নেমন্তন্ন করতে। এইটি দেখেছি মশাই। সব সময়

চোখ নিচু করে বসে আছে কিন্তু হি হ্যাজ অ্যান ইগল্‌স্‌ আই, ঠিক জায়গাটি ঠিক দেখতে পায়”—

রাস্তা ভরে তখন গাড়ি, গাড়ির হর্ন থেকে থেকে বেজে উঠছে। একটু আগে পর্যন্ত পেছনের গাড়ি সামনের গাড়িকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল কিন্তু এখন সারি বেঁধে চলছে। খুব কম গাড়িই নিচু থেকে উঠে আসছে। ভট্‌চায এক একবার মুখ বের করে বা হাত তুলে “হে হে” করে সামনের বা পেছনের কাউকে সম্ভাষণ জানায়।

ভট্‌চায অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে বলে, “কি ভাবছেন ইনস্পেক্টর? কায়দা-কানুন সবই আছে। ঘোড়াগুলো শুধু বেতো আর বুড়ো। তবে আজ দু-একটা ভালো খেলা দেখেও ফেলতে পারেন। আর শুনুন। আর কোনো রেসে বাজি ধরুন চাই না ধরুন মিঃ প্রধানের ঘোড়ার ওপর কিন্তু আগে থাকতেই ধরবেন।”

আট

ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে গাড়ি পৌঁছে যায়। মাঠের দক্ষিণ দিকে পুরনো ইংরেজি বইয়ের ছবির মতো টিলাছাওয়া একটা চালা। উত্তর দিক দিয়ে গাড়িগুলো মাঠটাকে ডান হাতিতে রেখে এগিয়ে মাঠের বেড়া ঘেঁষে সমকোণে সেই টিলাছাওয়া শেডের দিকে বেঁকে। চারিদিক থেকে মোটরের হর্নের আওয়াজ গতকালের কুকুরের আওয়াজের মতো অশ্বিনীকে ঘিরে ধরে। বাঁয়ে-ডাইনে সারি সারি গাড়ির দিকে তাকিয়ে ভট্‌চায বলে, “আজ কোনো মক্কেল গরহাজির নেই। আগে তো আরো সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল। তাছাড়া শীতের আগে দার্জিলিং ছাড়ার সময় শেষ খেলা খেলে নিচ্ছে। ইনস্পেক্টর, ভালো দিনেই আপনার হাতেখড়ি,” একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেখানেই ভট্‌চায গাড়িটা গুঁজে দেয়। তারপর নামার উদ্যোগ করে অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, “হয়ে যাবে নাকি এক ঢোক?” এক পা মাটিতে নামানো আর এক

পা গাড়ির ভেতরে, বোতল থেকে অশ্বিনী হাঁ করে মুখে মদ ঢালে। আর টগর গাড়ির ভেতর থেকে অশ্বিনীর মুখটা দেখতে পায় না, শুধু টানটান গলাটা দেখে। খুব খুশি হয়ে তারিফের ভঙ্গিতে ভট্‌চায বলে ওঠে, "আচ্ছা, আচ্ছা, একটা ভালো জিতুন বা হারুন তখন সেলিব্রেট করা যাবে।" অশ্বিনীর পিঠ চাপড়ে টগর বলে, "অশ্বিনী একেবারে সব জায়গার জন্য তৈরি। কোথাও ওকে মানিয়ে নিতে হয় না, ওকেই সবাই মানিয়ে নেয়।" তারপর হাতটা অশ্বিনীর কোমরে নামায়। টগর হাতটা যে সরাবে না তা যেন জানাই, এতদিনে।

সিঁড়ির ওপরেই এক বুড়ি পান আর সিগারেট নিয়ে বসেছে। সিঁড়ির তলায় তোলা-উনুনে চা। ওপরে উঠে অশ্বিনী দেখে যেটাকে সে ঘর ভেবেছিল সেটা আসলে একটা ছোট্ট গ্যালারি। বাইরে থেকে সিঁড়ি ভেঙে ওরা গ্যালারির মাথায় উঠেছে, এখন ভেতরের সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে হবে। গ্যালারি ভর্তি। কিন্তু অনেকেই দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ মাঠের দিকে পেছন ফিরে। নীচে নামার সিঁড়িটা ভর্তি। ছোট্ট এই গ্যালারির পাশেই মাঠের ভেতর অনেক ভিড়। অনেকে মিলিটারি ইউনিফর্মে। ভট্‌চায চেয়ারের সারি দেখিয়ে বলে "চলুন, ওদিকেই যাই। আমাদের সিট ওদিকেই হবে।" ভট্‌চাযের পিছে পিছে অশ্বিনী-টগর ভিড়ের ভেতর পথ করে, গ্যালারির সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে। হঠাৎ একটা সমবেত চিৎকার উঠল। অশ্বিনী থতমত খেয়ে দেখে তার চারপাশের সমস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে উঠেছে, তারা সবাই মিলে কোনো একটা দিকে তাকিয়ে, অশ্বিনী আর টগর তাদের সবার মাঝখানে পড়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলে যেন। একটা ফাঁক দিয়ে অশ্বিনীর নজরে আসে কয়েকটা ঘোড়া ছুটছে। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীও সেই ফাঁকটার ভেতর তার মুখটা গুঁজে দেখবার চেষ্টা করে ঘোড়াগুলো পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে বিপরীত

দিকের মাঠের সীমার দিকে ছুটতে ছুটতে ক্রমে যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই অশ্বিনীর ঠাহর হয় ঘোড়াগুলো ঘুরে ডানদিকে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে তারা যেন আরো অস্পষ্ট হয়ে যায়—সব-গুলো ঘোড়ার রং গতি সব মিশে একাকার। আবার ঘোড়াগুলো ডানদিকে ঘোরে। এতক্ষণে অশ্বিনীর সামনে ঘোড়াগুলো আলাদা আলাদা চেহারা নিয়ে ধরা পড়ে। সেই ঘোড়াগুলো পরস্পরকে ছাড়িয়ে অশ্বিনীদের দিকে আসবার জন্য ক্রমাগত ছুটছে। কিন্তু যখন তাদের সবচেয়ে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া উচিত, তখনই তাদের আর দেখা গেল না। অশ্বিনীর কোমরে টগরের আঙুলগুলো বেঁকে বসে, আঁকড়ে—টগর একটু পেছন থেকে অশ্বিনীর ওপর ভর দিয়ে নিজের উত্তেজনা চাপা দিতে চায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই কে যেন অশ্বিনীর ঘাড় ধরে সামনে রেলিঙটার ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। টগরের হাতটা তখন বাতাস খিমচোবার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকে আর টগর তার সামনে ঘোড়া বা কিছুই দেখতে পায় না। কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত পাখির পাখনার মতো সামনে মেলে ধরে অশ্বিনী যেন রেলিংটা থেকে উড়ে যেতে চায়। সে দেখল শাদা, লাল, কালো বিদ্যুতের কয়েকটি রেখা। তারপর শূন্য মাঠে এলোমেলো অশ্বক্ষুরধূলোর দিকে সে চেয়ে থাকে। হঠাৎ মন্দিরের মতো ঘণ্টা বেজে ওঠে ঢং, ঢং, ঢং। সামনে থেকে ভট্‌চায ঘাড় বেঁকিয়ে বললো,"আসুন মিঃ সরকার, টগরদি।" গ্যালারির আসন থেকে উঠে কিছু লোক তখন বাইরে চলে যাচ্ছে, আবার কিছু লোক আসছে। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কয়েকটা দল গল্প করছে। এক ভদ্রমহিলা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে এমন চিৎকার করছে যে পেছনে যারা তারা আর এগোতে পারে না। ভট্‌চাযও দাঁড়িয়ে পড়ে। অশ্বিনীও। তাদের পেছনে আরও অনেকে। মহিলা যখন দুই হাত নেড়ে গল্প করে যাচ্ছেন পেছনে তখন তাকে নিয়ে একটা চাপা হাসাহাসি চলছে। অবশেষে ভট্‌চায কিছু

একটা বললে ভদ্রমহিলা পেছন ফিরে ব্যাপারটা দেখতে পান আর মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খিলখিল হাসতে হাসতে সরে দাঁড়ান। চায়ের সেট নিয়ে কয়েকজন বেয়ারা একটু ছুটোছুটি করে। কয়েকটা কাপ নিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে চা চা হেঁকে যায়। ঠিক তখনই অশ্বিনী মিঃ প্রধানকে দেখতে পায় "ঐ তো মিঃ প্রধান"—

ভট্‌চায তখন তাদের নিজেদের চেয়ার খুঁজে বের করে।

"কিন্তু মিঃ প্রধানের ঘোড়া" অশ্বিনী বলে।

"ও, ভালো কথা মনে করেছেন, দাঁড়ান খোঁজ নিয়ে আসি"— ভট্‌চায উঠে যায়। ভট্‌চায উঠে যাওয়ার পর অশ্বিনীর যেন নিজেকে একটা বাচ্চা ছেলের মতো মনে হয় যে তার বাবা বা কাকার সঙ্গে জীবনে প্রথমবারের মতো কোনো মেলায় বা সিনেমায় এসেছে, চারপাশে এত লোকজন যাচ্ছে আসছে, কথা বলছে, গল্প করছে, প্রত্যেকের চোখেমুখে বেশ একটা উত্তেজনার আভাস, নানাধরনের পোশাক, নানাধরনের মুখ—কিন্তু এর কোনো কিছুর সঙ্গেই অশ্বিনী কোনো যোগাযোগ বোধ করে না। এতসব লোক তো রেসের জন্যই মাঠে এসেছে। অশ্বিনীও তাই। কিন্তু অশ্বিনী রেসের সামান্য কিছুও জানে না—একমাত্র এই রকম একটা ধারণা তার আছে যে টিকিট কাটতে হয়, টিকিট মিললে টাকা পাওয়া যায়। সে ধারণা এত অস্পষ্ট যে তা নিয়ে এখানে রেসের মাঠের সঙ্গে কোনো যোগ তৈরি করা যায় না। ফলে অশ্বিনীর এত একলা বোধ করা ছাড়া উপায়ই বা কি, বিশেষত যখন পাশে ভট্‌চাযও নেই। যদিও ইতিমধ্যে, এসেই অশ্বিনী একটা রেস দেখে ফেলেছে।

অশ্বিনী সামনের সারির চেয়ারের মাথা ধরে সোজা বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল। টগর চেয়ারে হেলান দিয়ে। টগর বলে, "তোমাকে কী রকম দেখাচ্ছে। একটু চেঞ্জ করে এলে না কেন।" টগর অশ্বিনীর ঘাড়ে একটু হাত দেয়। অশ্বিনী বোঝে টগর চেয়ারে হেলান দিয়ে, তার ঘাড়টা ছুঁয়ে তারই দিকে এখন তাকিয়ে।

কিন্তু সে ঘুরে টগরের দিকে তাকাবার উদ্যোগ নেয় না। চারপাশে উত্তেজিত মানুষজনের মুখ। একটা অনিশ্চয়তার উদ্বেগে প্রায় সবাই-ই অন্যমনস্ক। এক অশ্বিনী আর টগরেরই কোনো অংশ নেই কারণ তারা রেসের ব্যাপারটাই জানে না। আর এখানে প্রত্যেকেই এমন মগ্ন ব্যস্ত যে টগরের পক্ষে সেই ব্যস্ততায় অংশ-গ্রহণও সম্ভব নয়। ফ্লাওয়ার শোতে টগরের একটা ভূমিকা ছিল। ডগ-শো-তে অন্তত দর্শক। কিন্তু রেসে তো সবাই-ই খেলছে।

ভট্চায ফিরে আসে একটা ছাপানো কাগজ নিয়ে "এই পেয়েছি, খাম্পা রিবেল, ফিফথ্ রাউণ্ডে দৌড়বে।" ভট্চায একটা সিগারেট দেয়। সেটা ধরিয়ে অশ্বিনী বসে থাকে। অশ্বিনীর খুব হালকা লাগছিল আর মাথার ভেতরে কেমন সব কিছু গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। আসার সময় গাড়িতে ভট্চায যা সব বলেছে তার কোনো কোনো কথা, এক-এক সময় অন্য সব কথার সঙ্গে সম্পর্কহীন মনে পড়ে যাচ্ছিল, মনে পড়ে থাকছিল। মন থেকে যাচ্ছিল না। একে তো এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ, রেস খেলার কোনো কিছুই জানে না, অথচ এখানে ঢোকা মাত্র একদল ঘোড়ার দৌড়ে যাওয়া দেখে ফেলায় সেই দৌড়ে কী হয় সে বিষয়েও তার সেই সময়টুকুর জন্য একটা তীব্র কৌতূহল জেগেছিল। কিন্তু সেই কৌতূহলের সঙ্গে কোনো লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন জড়িত ছিল না বা রেসের সঙ্গে জড়িত থাকার কোনো অন্যতর উত্তেজনা। ফলে দৌড়টা তার চোখের আড়ালে চলে যেতেই মনেরও বাইরে চলে গেছে। তার ওপর আবার খালি পেটে খানিকটা মদ পড়ায় মন মাথা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অশ্বিনী শারীরিক ভাবেই সমস্ত অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নতা বোধ করে।

অশ্বিনী একটু তাকিয়ে এই গ্যালারিতে সাজানো চেয়ারগুলো যেন একটু যাচাই করে নিতে চায়। সেই সাজানো চেয়ারের সারি আর নিচে ফাঁকা সোফা সেট, ফুলের তোড়া, টেবিল-ক্লথে ঢাকা টেবিল আর তার ওপর সাজানো কাপ-শীল্ড দেখে অশ্বিনীর কালকের

ভগ্‌শোর কথা মনে পড়ে যায়! আর সেই মুহূর্তেই তার মনে হয় এই সাজানোগুছনো গ্যালারির কোনো একটা কোণে কোনো একটা চেয়ারের গর্তের ভেতর থেকে সেই মিঃ কুম্‌রা, তাদের ডেপুটি সেক্রেটারি অবধারিত তাকে দেখছেন। অশ্বিনীর মনে এ-কথা আসতেই একটা অস্বস্তি শুরু হয়। কিন্তু বেশ চোখ মেলে খোঁজার কোনো সাহস সে পায় না। বরং তাড়াতাড়ি চোখটা গুটিয়ে নিজের সামনে নিয়ে আসে। এমন হতেও পারে যে তার পেছনেই। না তা হতে পারে না। কিন্তু সামনে তো হতেই পারে। আর কালকে মিঃ সিন্‌হার মতো কেউ অশ্বিনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ডাকতেও পারেন। সামনের চেয়ারের মাথা ধরে, চোখটাও প্রায় সেখানে এনে অশ্বিনী মনে মনে তার সঙ্গে মিঃ কুম্‌রার দূরত্ব মাপতে থাকে। আর তখন তার মনে হয়ে যায় মিঃ কুম্‌রা অবধারিত এসে গেছেন, তাকে দেখে ফেলেছেন ও তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সেই অদৃশ্য দৃষ্টির নির্দেশ মেনে "আমি একটু ঘুরেফিরে দেখি, আপনারা বসুন" বলে হঠাৎ অশ্বিনী দাঁড়িয়ে পড়ে আর অশ্বিনীর ঘাড় থেকে টগরের হাত আজ এই দ্বিতীয়বার অবলম্বনহীন পড়ে যায়। পেছন না ফিরে অশ্বিনী সিঁড়ি বেয়ে গ্যালারি থেকে নেমে যায়। "গভর্নর আসার আগেই কিন্তু আসবেন"—ভট্‌চায বলে দেয়। গ্যালারির মাথা থেকে অশ্বিনী অত উঁচু সিঁড়ির নীচে তাকায়, দুপাশে তাকায়—গাড়ির লাইন আর লোকজনের ভিড়। সিঁড়ি বেয়ে তরতর নেমে যায় অশ্বিনী। সিঁড়ির নীচে তোলা উনুনের চা-অলার কাছে কিছু ভাজা আর একটা প্লাস্টিকের কৌটোর ভেতরে কিছু বিস্কুট। অশ্বিনী চারটি বড় বিস্কুট নিয়ে চায়ের সঙ্গে খায়। দুটো বিস্কুট খেতে খেতেই তার মনে হয় যেন অনেকক্ষণ ধরে চিবুচ্ছে আর অনেকক্ষণ ধরে চা খেয়ে যাচ্ছে। বাকি দুটো বিস্কুট সে ফেরত দিতে চায়। চা-অলা বলে ফেরত নেবে না, সে এঁটো করেছে। চারটে বিস্কুটের দাম চুকিয়ে অশ্বিনী দুটো বিস্কুট হাতে নিয়ে মাঠের

দিকে যায়। একটা বাচ্চা ছেলে এসে হাত পাততে অশ্বিনী দুটো বিস্কুটই দিয়ে দেয়।

অশ্বিনীর একটু নেশামতো লাগছিল। ভট্চাযের কাছ থেকে বোতলটা আনার ইচ্ছে হলো, গেল না।

নয়

এখন গ্রিনস্ট্যাণ্ডে মাঠটার বেড়ার কাছে বড় একটা কেউ নেই। সবাই আলগা আলগা ছড়িয়ে ছিটিয়ে, দু-একজন বসেও। দেখে মনে হয় যেন কোনো মেলা বা হাট। কারো কোনো উত্তেজনা নেই। সবাই-ই বেশ হাসিখুশি। অশ্বিনী ঐ হালকা নেশার মেজাজে ভেবে বসে তার দলের লোকই বেশি যারা এই রেসের কিছু জানে না, বোঝে না, এই রেসের সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

পাশে গ্যালারির দেয়াল। সেখান থেকে ইচ্ছে করলেও কেউ এখানে অশ্বিনীকে দেখতে পাবে না। অশ্বিনী তবু একবার সেই গ্যালারি আর এই গ্রিনস্ট্যাণ্ডের চার পাশটা দেখে তার অবস্থান বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিতে চায়। অলস পায়ে ঘুরে ফিরে অশ্বিনী একটা ছাপানো কাগজ কিনে এক জায়গায় বসে পড়ে। ফার্স্ট রেস, সেকেণ্ড রেস করে করে যতগুলি ঘোড়া আজ দৌড়বে তার তালিকা। ঘোড়াগুলোর নাম তুফান, ভেটার্ন, স্টর্ম ট্রুপার, ব্ল্যাকম্যাজিক, টাইফুন, হিমালয়ান স্টর্ম, খাম্পা রিবেল। অশ্বিনীর চায়ের নাম মনে পড়ে যায় অরেঞ্জ পিকো, ব্রকেন অরেঞ্জ পিকো, ফ্লাওয়ারি ও-পি। অশ্বিনীর ফুলের নাম মনে পড়ে যায়—কসমস, জিরানিয়াম, ক্যালেনডুলা। অশ্বিনীর কুকুরের নাম মনে পড়ে যায়—পূড্ল্, পমারেনিয়ান, পিকিনিজ, টিবেটান অ্যাপসস্। কাগজে ছাপা নামগুলোর ভেতর শুধু একটি নাম আলাদা রকম শোনায়, জয়দীপ। অশ্বিনী যেন ঠিক করে বসে সে যদি আজ কোনো ঘোড়াতে বাজি

ধরে তাহলে জয়দীপেই ধরবে। জয়দীপ কোন্ রেসে দৌড়বে, একবার দেখে নেয়।

অশ্বিনী উঠে আবার হাঁটতে শুরু করে। সে টিকিট বিক্রির জানলার সামনে এসে পড়ে। এতক্ষণ সর্বত্র অশ্বিনী যে শান্তি নিশ্চিন্তি অনুত্তেজনা দেখে আসে এখানে একেবারে তার বিপরীত। কিন্তু উত্তেজনাটা চাপা। টিকিট বিক্রির বিভিন্ন জানলার সামনে ভিড়। এক-একজন টিকিট নিয়ে কপালে ছুঁইয়ে পকেটে রেখে দিচ্ছে। কিন্তু জানলায় হাত বাড়াবার আগে তার সমস্ত শরীরটাই যেন ভেতরের উত্তেজনার তাড়ায় অবান্তর হয়ে গেছে। কে কাকে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, আর কে কাকে আটকে রাখছে—এসব যেন নেহাৎই অপ্রয়োজনীয় তার কাছে। সারি সারি কাউণ্টারে লেখা উইন্‌ডো সেল, উইন্‌ডো সেল, উইন্‌ডো সেল। অশ্বিনী ঘুরে যায়। ফোরকাস্ট সেল, ফোরকাস্ট সেল, ফোরকাস্ট সেল। অশ্বিনী ঘুরে যায়। ফোর কাস্ট পে আউট—একটা ফোকর। ট্রেবল রুপিস টেন, ট্রেবল রুপিস টেন, ট্রেবল রুপিস টেন।

এতগুলো অপরিচিত ব্যাপার চোখের সামনে দেখে অশ্বিনীর একবারমাত্র কৌতূহল হয় তার নিজস্ব পদ্ধতিতে ব্যাপারটা বুঝে নিতে। কিন্তু সে আর ততটা প্রেরণা বোধ করে না। অশ্বিনী যদি রেসের রীতিপদ্ধতি আয়ত্ত করতে চায়, সে জানে, খুব কম সময়ের ভেতরই সে তা করতে পারে। অশ্বিনীর যেন একটা আত্ম-বিশ্বাস জন্মে গেছে যে কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার ভেতর সে অবলীলায় সকলের অলক্ষ্যে ঢুকে যেতে পারে। অশ্বিনীর চোখে চারদিক তখন খুব হালকা দেখাচ্ছে। কোনো শব্দ বা রেখা বা রঙের কোনো অর্থ তার কাছে ধরা পড়ছিল না। কিছু শব্দ আর রেখা আর রঙ তার চোখে পড়ছিল, কানে আসছিল। অশ্বিনী বোঝে এর পরই তার নেশাটি ছুটে যাবে। অতগুলো টিকিট বিক্রির ফোকরের দিকে যেন উপেক্ষার হাসি হেসে মাতালের হঠাৎ উপস্থিত আত্মগরিমায় অশ্বিনী

হেঁটে চলে যায়। যেন, অশ্বিনী যদি ইচ্ছে করে তাহলে এ-সব রেসের বেশ কিছু বাজি সে জিতে নিতে পারে।

ঘণ্টা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র সহসা নীরবতায় অশ্বিনী চকিত হতেই দেখে নীরবতা ভেঙে মুহূর্তে কলরব তুলে সবাই হুড়মুড় করে ছুটে বেড়ার ধারে যাচ্ছে। অশ্বিনী চট্ করে দৌড়ে গিয়ে বেড়ার ধারে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় আর জেতা জেতা ভাব নিয়ে একটু হাসতেই তার পেছনে একসঙ্গে প্রবল চাপ এসে পড়ে। চাপটা প্রতিহত করার জন্য দুটো পা ফাঁক করে অশ্বিনী একটা খুঁটি দুই হাতে চেপে ধরে। আর দ্বিতীয়বার ঘণ্টা পড়ে। নিজের শরীরের ওপর এই অস্থির চাপ আর মন্দিরের মতো সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ঘণ্টধ্বনির বৈপরীত্যটা অশ্বিনীর কাছে একটু যেন বিস্ময়কর ঠেকে। অশ্বিনীর পেছনে, পাশে সর্বত্র প্রচণ্ড চিৎকার উঠছে, পড়ছে, নামছে, ছুটছে। অশ্বিনীর মনে হয় তার সমস্ত শরীর দিয়ে পেছনের এই চাপকে সে প্রতিহত করছে, করে যাওয়াটাই হচ্ছে তার একমাত্র কাজ। "হে-ই-খ-ব-র-দা-র্" প্রচণ্ড হেঁকে সে দুই হাতে খুঁটিটা ধরে পিঠটা বাঁকায়। হঠাৎ একটা খুব শক্ত হাত অশ্বিনীর কাঁধের ওপরে সাঁড়াশির মতো নেমে আসে। আর অশ্বিনীর কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত খুলে নিতে চায়। অশ্বিনী স্থির হয়ে যায়।

কয়েক সেকেণ্ডস্থায়ী হঠাৎ নীরবতায় বাঁ চোখের কোণা দিয়ে অশ্বিনী দেখে মাঠের একটা কোণ থেকে ঘোড়াগুলো দৌড় শুরু করেছে। ধূলো উড়ছে। ধূলোটা নিশানের মতো কাঁপাতে কাঁপাতে ঘোড়াগুলো ছুটছে। আর আবার সমবেত কোলাহল পাথরভাঙা নদীস্রোতের মতো ফেটে পড়ে, ছড়িয়ে যায়। অশ্বিনীর দুপাশে সবাই দুহাত ওপরে তুলে চেঁচাচ্ছে। অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে সে ছাড়া আর কেউ নেই যে হাঁ করে চেঁচাচ্ছে না। অশ্বিনীর পিঠের ওপর থেকে ভারটা সরে গেছে। তাদের ঠিক বিপরীত দিকে ঘোড়াগুলো তখন

দৌড়চ্ছে। সেই লাইন থেকে ডানদিকে বাঁক নিতেই অশ্বিনীও ডানদিকে ঘোরে। তারপর দুই হাত তুলে মুঠো করে চেঁচাতে থাকে। অশ্বিনী কোনো টিকিট কাটে নি। কোন্ কোন্ ঘোড়া দৌড়চ্ছে জানে না। কিন্তু তবু সে যেন কোনো-একটা আগে এসে পৌছুক চাইছে। ঘোড়াগুলোকে অশ্বিনী যতটা দেখতে পারছে তার চাইতে বেশি দেখে ধূলোর নিশান, সেই নিশানটার ছুটে আসাই যেন আসল। ঘোড়াগুলোর সেই তীব্রতা অশ্বিনীর দিকে যত ছুটে আসতে থাকে অশ্বিনীর মুখ তত বেশি হাঁ হয়ে যায়। সেই ধূলোর নিশান অশ্বিনীদের লাইনের দিকে ঘুরতেই সামনের একটি লোক ঘোড়াগুলোর দিকে পেছন ফিরে অশ্বিনীর দুই কাঁধ ধরে অশ্বিনীর মুখের ভেতর কান্নার মতো চিৎকার করতে থাকে, যেন সে ঐ তীব্র বেগের অনিবার্য ছুটে আসা সহ্য করতে পারছে না। আর তখনই বিদ্যুতের রেখার মতো অশ্বিনীর সামনে দিয়ে ঘোড়াগুলো ছুটে যেতে শুরু করে। অশ্বিনীকে ঢেকে ফেলা সেই লোকটার মুখের পাশ দিয়ে মুখটা বের করে অশ্বিনী দুই হাত তুলে হাঁকতে থাকে। তারপরই চিৎকারটা থেমে যায়—ঝপ করে, উড়ন্ত পাখি যেমন বন্দুকের গুলি খেয়ে পড়ে। অশ্বিনীর কাঁধের ওপরে সেই লোকটা তার মুখ চেপে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে। তার কান্নার শব্দে সচকিত হয়ে কয়েকজন তাড়াতাড়ি তাকে অশ্বিনীর কাঁধ থেকে তুলে মাঠের ভেতর শুইয়ে দেয়, অশ্বিনীও হাত লাগায়। শুয়ে শুয়ে লোকটি আকাশের দিকে মুখ করে ভেউ ভেউ কাঁদে, কুকুরের কান্নার মতো শোনায়। অশ্বিনী লোকটার পাশে বসে তার দুচোখের কোণা থেকে জল মুছিয়ে দিতে দিতে দেখে অমন আস্ত একটা পাথরের মতো মুখ কেমন ভেঙেচুরে খান্‌খান্ হয়ে যাচ্ছে কান্নায়। হঠাৎ হৈ হৈ রব তুলে লোকটির পাশে একদল লোকের নৃত্য শুরু হয়ে যায়। অশ্বিনী শোনে সেই লোকটি জিতেছে, সে আস্তে করে উঠে যায়। উঠে গিয়েও একবার পেছন ফিরে অশ্বিনী রেসজেতা লোকের আকাশ-

কাটানো কান্না দেখে নেয়, তাকে ঘিরে সঙ্গীদের চিৎকার আর নৃত্যসহ। বিদ্যাফলাতে অশ্বিনী একজন জোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে বসে "কিসে জিতেছে? ফোরকাস্টে না ট্রেবলে।" জোয়ানটি অশ্বিনীকে মুখ ভেংচে ওঠে—"এঃ-এ ট্রেবলে জিতবে? পঞ্চাশটাকা জিতেই কাঁদতে লেগেছে!" যেন ঐ লোকটা জিতে খুব অন্যায় করেছে। অশ্বিনী চলে যেতে গিয়েও ফিরে জোয়ানটার দিকে একটা আঙুল নাচিয়ে চিৎকার করে বলে, "ঠিক বলেছ, জিতলে হাজার টাকা জিতবে, অশ্বিনী সরকার ঐ সব পঞ্চাশটাকার বাজি জেতে না!" বলে নিজের বুকে আঙুলের টোকা মারে দুটো। লোকটা চোখটা কুঁচকে, ঠোঁট বাঁকিয়ে, বিরাট হাঁ করে অশ্বিনীর সমর্থনে চিৎকার করে ওঠে "ত-অ-ব!" কথাটা বলা শেষ হওয়ার পরও লোকটা মুখ অপরিবর্তিত রাখে।

বেশ উৎসাহের সঙ্গে অশ্বিনী পা চালায়—কোথাও যেন যাওয়ার আছে, জরুরি। হঠাৎ সামনে থেকে ভট্‌চায এসে ধরে, "এই অশ্বিনীবাবু"—

"দেখুন ভট্‌চায, আপনি আমার একটা নাম ঠিক করে নিন—কখনো ইনস্পেক্টর, কখনো মিঃ সরকার, কখনো অশ্বিনীবাবু—এই সব চলবে না।"

"কি ব্যাপার? খুব যে মুডে আছেন! গভর্নর এসে গেছেন।" "ও! আমাকে ডাকছেন নাকি?" বলে অশ্বিনী হেসে ফেলে। ভট্‌চাযও। "তাড়াতাড়ি সিটে চলুন। নেশা ধরেছে নাকি! এই রেসেই মিঃ প্রধানের ঘোড়া দৌড়বে। টিকিট কেটেছেন? কাটুন কাটুন: টিকিটটা আবার ফেলে দেবেন না যেন। আর একটু মুখে মুখে চালু করে দিন। নামটা মনে আছে তো। খাম্পা রিবেল"—

অশ্বিনী তাড়াতাড়ি টিকিট ঘরের দিকে ছোটে। ভট্‌চায দাঁড়িয়ে থাকে।

দশ

টিকিট ঘরের সামনে সে যেন খুব ভাবছে এই ভাবে অশ্বিনী দাঁড়ায়। ছাপানো কাগজটার কথা তার মনে পড়ে যায়। কিন্তু পকেটে কাগজটা পায় না। তাড়াতাড়ি গিয়ে আবার একটা কাগজ কিনে দাঁড়ায়। কাগজটাতে নাম পড়তে থাকে। অশ্বিনীর দিকে কেউ তাকাচ্ছে কি না সেটা অশ্বিনীর নজরেও পড়ে না। অশ্বিনী আপন মনে কাগজটা থেকে নাম পড়তে থাকে। অশ্বিনীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে অনেকে গিয়ে টিকিট কিনে আনে। ধাক্কা খেয়ে অশ্বিনী সরে যায়। যেখানে সরে যায় সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। আবার কাগজটা পড়ে যেতে থাকে।

কাগজটা চোখ থেকে নামিয়ে অশ্বিনী যেন কিছু ভাবার জন্য আকাশের দিকে তাকায়। তাকে কেউ যেন এই সব ভঙ্গি করার জন্য এখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অশ্বিনী একান্ত বাধ্য ছাত্রের মতো একটার পর একটা ভঙ্গি করে যাচ্ছে। ভাবার জন্য অশ্বিনী ঘাড় হেলিয়ে ওপর দিকে তাকায় আর দেখে সে-ই ওপর থেকে একমাথা চুল, এক মুখ গোঁফ আর মুখময় কতকগুলি মাংসপিণ্ড নিয়ে বিরাট একটা মুখ, ঠোঁট বেঁকিয়ে দাঁত বের করে চোখ পাকিয়ে অশ্বিনীর দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখের কোল ফোলা। গালের মাংস দুটো বলের মতো। অশ্বিনী খুব মনোযোগের সঙ্গে সেই গালের বল দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন বল দুটোকে গভীর নিরীক্ষণ করাই তার কাজ। জোয়ানটি খুব মৃদু ভাবে, ঘষঘষে গলায় অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করে, "কিয়া হাজার টাকা জিতনে ওয়ালে, কিয়া ট্রেবলকা টিকিট খরিদ করেঁ?" কিন্তু আসলে ঐ চেহারায় মৃদুভাবে কথা বলতে হলে মুখের এতগুলো পেশীকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় যে সেই শ্রমে ও উত্তেজনায় কথাটা শোনায় একটা চাপা শাসানির মতো যেন খরিদ করলে সে অশ্বিনীকে চিবিয়ে খাবে। অশ্বিনী চিনে ফেলে

একটু আগে এর কাছেই সে ডাঁট করে এসেছিল যে জিতলে হাজার হাজার টাকাই জিতবে। চোখ তুটো জোয়ানটির মুখ থেকে একটুও না সরিয়ে অশ্বিনী বুঝে যায় লোকটা আসলে তার সমর্থন চাইছে। অশ্বিনী অকম্পিত কণ্ঠস্বরে বলে, "জরুর। খাম্পা রিবেল—"

জোয়ানটি তাচ্ছিল্যভরে বলে, "হে, উ কভি নাহি জিতনে সেকতা"—

"হাম তোমকো খরিদ করনে বোলা কুছ?" অশ্বিনী খুব ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে লোকটিকে বলে। লোকটি কোনো জবাব দেয় না। কিন্তু তুজন চোখাচোখি মুখোমুখি তাকিয়ে থাকে।

এর ভেতরে পে-আউট ফোকর থেকে টাকা নিয়ে একদল হৈ হৈ করে অশ্বিনী আর জোয়ানটির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। যার হাতে টাকা সে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে অশ্বিনী আর লোকটির দিকে তাকাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর পিছে পিছে তার সঙ্গীরাও। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট মতো ভিড় জমে যায়। টাকা হাতে লোকটি অশ্বিনীকে চিনতে পেরে ছুটে এসে অশ্বিনীর হাত তুটো জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে ওঠে আর আহ্লাদে গলে গিয়ে হে হে হাসতে থাকে। আর অশ্বিনীকে আপাদমস্তক দেখতে থাকে যেন হঠাৎ তার বাল্য-বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে গেল। কিন্তু এতগুলো লোক ঘিরে ধরলেও আর একটি লোক তার হাত জড়িয়ে ধরে হা হা করে হাসিকান্নার রব তুলে গেলেও অশ্বিনী তার চোখ ঐ জোয়ানটার বিকট মুখ থেকে সরায় না। অশ্বিনীর হাত যে-জড়িয়ে ধরেছিল সে তখন উচ্ছ্বাসে চিৎকার করে সবাইকে বলছে—অশ্বিনীই হচ্ছে সেই লোক যার বুকে সে মুখ লুকিয়ে ছিল, যাকে ছুঁয়ে ছিল বলেই সে জিতেছে, সব এই বাবুর গুণে, সব এই বাবুর ভাগ্যে। লোকটার চিৎকার চেঁচামেচিতে আরো ভিড় হয়ে গেল। সেই ভিড়ের মাঝখানে অশ্বিনী আর সেই দশাসই জোয়ান। অশ্বিনী এত হৈ চৈ-এ-ও তার চোখ জোয়ানটার মুখের ওপর থেকে সরায় নি। এদিকে অশ্বিনীর হাত পা চারদিক থেকে

সবাই ছুঁচ্ছে আর সেই লোকটি চেঁচাচ্ছে যে অশ্বিনীকে ছুঁয়েছিল বলেই সে জিতেছে, সবাই এসে এই বাবুকে ছুঁয়ে যাক। ফলে অশ্বিনীর দুই হাত লোকের হাতে হাতে দুদিকে ছড়িয়ে থাকে, পা উরু ধরে কিছু লোক নিচু, তার পিঠের ওপর কিছু লোকের অনড় হাত আর অশ্বিনী মূর্তির মতো স্থির চোখে সেই জোয়ানটার দিকে মুখ উঁচিয়ে।

এতক্ষণ চেঁচামেচির পর সেই লোকটা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের খেয়াল হয় যে অশ্বিনী একটুও নড়াচড়া করছে না, স্থির দৃষ্টিতে সেই জোয়ানটার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা সবাই চুপ করে গিয়ে গোল হয়ে একবার অশ্বিনীর দিকে, আর একবার জোয়ানটির দিকে ঘুরে ফিরে তাকাতে থাকে। টাকা-পাওয়া লোকটি নিচু হয়ে অশ্বিনীর উরু চেপে ধরে খুব কাতর গলায় বলে ওঠে—"দেওতা, কিয়া হুয়া?" অশ্বিনী যেন দৈববাণী করছে এমন অকম্পিত গলায় বলে, "আমি বলেছি এই রেসে খাম্পা রিবেলের নামে আমি ট্রেবল টিকিট কিনব, এ আমাকে বলতে এসেছে ঐ ঘোড়া জিতবে না। আমি কি ওকে খরিদ করতে বলেছি?" অশ্বিনীর উরু ছেড়ে দিয়ে লোকটি সোজা দাঁড়ায়। তারপর তীব্র চিৎকারে তার ওপরের ঠোঁটটা যত পারে ওপরে বেঁকিয়ে জোয়ানটির দিকে চিৎকার করে ওঠে—"দেওতা বলেছে আর তুই সন্দেহ করছিস? তুই এত বড় পাপী। তুই মর্।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতটা মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে হুকুম করে দেয়, "আমরা সবাই খাম্পার টিকিট কিনব।" সঙ্গে সঙ্গে ঐ অতবড় ভিড়ের ভেতর "খাম্পা খাম্পা" রব পড়ে যায় আর সমস্ত ভিড়টা একসঙ্গে গিয়ে টিকিট ঘরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অশ্বিনীর হাত ধরে কেউ টানে। মুখ সরিয়ে অশ্বিনী দেখে ভট্চায। অশ্বিনীকে হাত ধরে টানতে টানতে গ্যালারির সিঁড়ির দিকে ভট্চায নিতে গেলে অশ্বিনী বলে ওঠে, "আমার টিকিট কেনা হয় নি"—

অশ্বিনীর হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে ভট্চায বলে, "আর

টিকিট কাটতে হবে না, চলুন তাড়াতাড়ি। যা করেছেন, এখুনি জোয়ান আর লোক্যাল লোকদের ভেতর রায়ট বেঁধে যাবে।" হাত ধরে অশ্বিনীকে গ্যালারির সিঁড়ির গোড়ায় নিয়ে গিয়ে ভট্চায হাতটা ছেড়ে দিয়ে অশ্বিনীর পিঠে হাত দেয়। অবাধ্য ছেলের মতো অশ্বিনী সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। গ্যালারিতে সবাই যে যার আসনে বসে, কেউই দাঁড়িয়ে নেই। ফলে ভট্চায আর অশ্বিনীর প্রবেশ প্রায় সকলের চোখে পড়ে যাওয়ার মতো হয়। আর অশ্বিনীর মনে পড়ে যায় ঐ সারি সারি সাজানো চেয়ারের ভেতর থেকে মিঃ কুম্রা নিশ্চয়ই তার দিকে তাকিয়ে আছেন! সে চাপা গলায় বলে, "আমি যাব না।" খুব ভর্ৎসনার সুরে ভট্চায বলে, "কি করছেন? চলুন—" তাদের সারিতে এসে আগে অশ্বিনীকে ভেতরের চেয়ারটাতে বসিয়ে ভট্চায কোণার চেয়ারে বসে।

টগর বলে ওঠে, "কী হয়েছে?"

ভট্চায বলে, "কিছু না"—

টগর অশ্বিনীর হাত ধরে বলে, "কি হয়েছে অশ্বিনী।" ভট্চায আবার বলে, "কিছু না, কিছু না।" "এতক্ষণ ও কোথায় ছিল?" অশ্বিনী একেবারে চুপ করে বসে থাকে। খানিকটা পরে ভট্চায অশ্বিনীকে সিগারেট দেয়। তারপর বলে, "আপনি যা কাণ্ড করেছেন না! খাম্পার নামই কেউ জানত না। এখন খাম্পা নিয়ে রায়ট লেগে যাবে।"

অশ্বিনী একটু ম্লান হেসে বলে, "সবাইকে খাম্পার পেছনে খেপিয়ে দিলাম, আমারই টিকিট কেনা হলো না।"

"তাতে কিছু হবে না।"

টগর মুখ বাড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। ব্যগ্রতায় সে বারবার অশ্বিনীর দিকে তাকায়। "কি হয়েছে অশ্বিনী, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে"—কথাটা এত ব্যক্তিগত স্বরে বলে যে ভট্চায তাকায় বটে, জবাব দিতে পারে না। অশ্বিনী টগরের দিকে না তাকিয়ে ভট্চাযকে বলে, "আপনার বোতলটা বের করুন না, একটু ঢালি"—

"আপনি কি পাগল হলেন মশাই, তার চেয়ে চলুন কেটে পড়ি।" অশ্বিনী শুনে যেন কারো কাছ থেকে মুখ লুকোচ্ছে এমন ভাবে টগরের দিকে ঘুরে মুখটা নিচু করে থাকে। "কি হয়েছে অশ্বিনী?" টগর প্রায় কানে কানে বলে। আর ঘণ্টা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত গুঞ্জন হঠাৎ নিম্নতম স্বরে চলে আসে। ঘণ্টা আর একবার বেজে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে পাশে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোনো চিৎকার হয় না। শুধু বড় বড় ঘন, চাপা নিশ্বাসের বিষম লয়ে শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ নিশ্বাস চাপার একটা রুদ্ধ আওয়াজ বেরিয়ে আসে। অশ্বিনী দাঁড়ায় নি। ভট্‌চায সামনের চেয়ারটায় ভর দিয়ে গলা বাড়িয়ে থাকে। একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি গলায় তীব্র কান্নার প্রথম ঝোঁকটা বেরিয়েই থেমে যায়। অশ্বিনী চোখ বুঁজে ছিল। চিৎকারটার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ঘুম থেকে প্লেনভিউ পর্যন্ত নির্জন পাহাড়ী রাস্তাটা ঝলসে যায়। একজন কেউ চাপা স্বরে কোনো শপথ উচ্চারণ করে। অশ্বিনী কানের পাশে শ্লথ, ঘন, চাপবাঁধা নিশ্বাসে উচ্চারণ শোনে, "অ-শ্বি-নী"। তারপরই মাত্র সেকেণ্ড তিনেকের জন্য সমবেত চিৎকার প্রচণ্ড উঠেই থেমে যায়—সবাই বসে পড়ে। অশ্বিনী জিজ্ঞাসামাত্র করে না কে জিতলো, কি হলো। ভট্‌চায জিজ্ঞাসা করে, "কী হলো চোখ বুঁজে আছেন যে?"

"মাথাটা খুব ধরেছে মনে হচ্ছে"—

"আচ্ছা মাথা ধরার ওষুধ আছে, দাঁড়ান সারিয়ে দেব"—

অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে তার চারপাশে আবার অসংখ্য অন্যমনস্ক মানুষে ভরে যাচ্ছে। ভট্‌চায বললো, "চলুন চলুন, আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি"—

এগার

ভট্‌চায, অশ্বিনী আর টগর বেরিয়ে চাতালে দাঁড়িয়ে থাকল। একবার অবিশ্যি অশ্বিনীর মনে হলো দাঁড়িয়ে লাভটা কি, সবাই যখন নেমে যাচ্ছে নেমে গেলেই হয়, কিন্তু সে-কথাটা সে আর বলে না। টগর, অশ্বিনী আর ভট্‌চায সিঁড়ির একপাশে দাঁড়িয়ে। গিজগিজ ভিড় সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। হঠাৎ একটু চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় যেন। দুজন সান্ত্রী এসে সিঁড়ির দুপাশে দাঁড়ায়। তারপরই গভর্নর, গভর্নরের স্ত্রী, সেই টাকমাথা ভদ্রলোক, তার পাশে মিঃ কুম্‌রা। অশ্বিনী চমকে ওঠে না। মাঠে আসার পর থেকেই এই মুহূর্তটার জন্য সে প্রস্তুত ছিল। গ্যালারি ছেড়ে গ্রিনস্ট্যাণ্ডে গিয়ে যতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষণ একটা অচেতন মুক্তিবোধ তার ভেতর ক্রিয়া করেছে। কোনো নির্দিষ্ট মুক্তিবোধ যদি না-ও হয়, অন্তত এমন কোনো বোধ ছিল না যে তাকে কেউ নিশ্চিত লক্ষ্য করছে। ফলে মিঃ কুম্‌রাকে দেখা মাত্র অশ্বিনীর ভেতর কোনো নাটকীয়তা আসে না। খুব প্রস্তুত ভঙ্গিতেই অশ্বিনী একটু সরে দাঁড়ায়। ভিড়ের জন্যই ওঁদের নামতে হচ্ছিল আস্তে আস্তে। ওঁদের আশেপাশে কোনো ভিড় না থাকতে পারে কিন্তু যারা ওঁদের জন্য পথ পরিষ্কার করছে তাদের তো ভিড় ঠেলেই এগোতে হচ্ছে। অশ্বিনীর মনে হলো মিঃ কুম্‌রা যেন তাকে একবার দেখে নিলেন। অশ্বিনী টগরের আড়ালে চলে যেতে চায়। টগর নমস্কার করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ নমস্কার ভেঙে অশ্বিনীর বাহু ধরে ফেলে, তারপর ধরেই থাকে। অশ্বিনী দেখে মিঃ প্রধান কথা বলতে বলতে গ্যালারি থেকে উঠে এসে নামা শুরু করলেন। মিঃ প্রধান যেমন চোখ নিচু করে হাঁটেন, তেমনি হাঁটছেন। পাশে একজন কথা বলে যাচ্ছে। দু-একজন তাকে ছাড়িয়ে যাবার সময় কিছু বলে যাচ্ছে—মিঃ প্রধান প্রত্যেককেই মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। মিঃ প্রধান সিঁড়িটার মুখে এসে একটু দাঁড়ালেন। তারপর নামতে

শুরু করলেন। তাঁর পিছু পিছু টগর অশ্বিনী আর ভট্‌চাযও নামতে শুরু করে। সেই উঁচু থেকে অশ্বিনী দেখতে পায় নিচে সান্ত্রী বেষ্টিত বিচ্ছিন্নতায় মিঃ কুম্‌রার ছোট্ট শরীর। মিঃ প্রধান তাদের নিশ্চয়ই দেখেছেন অথচ কোনো কথা তো বললেনই না, উনি যে দেখেছেন এমনটিও বুঝতে দিলেন না। মিঃ প্রধান সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে একবার দাঁড়ান। ভট্‌চায, টগর আর অশ্বিনীও পেছনে দাঁড়িয়ে যায়। মিঃ প্রধান একবার পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত ঘাড় ঘোরালেন। সাইরেনের আকস্মিক শব্দে সাঁ সাঁ করে দুটি তিনটি গাড়ির মাঝখানে গভর্নরের গাড়িটা বেরিয়ে গেল। গভর্নরের গাড়ি পেরিয়ে গেলে মিঃ প্রধান রাস্তাটা পার হলেন। "তাড়াতাড়ি আসুন" বলে ভট্‌চায তার গাড়ির দিকে যায়, তার গাড়িটা আগে পার্ক করা হয়েছে। টগর অশ্বিনীকে হাত ধরে টানতে টানতে ভট্‌চাযের গাড়ির দিকে ছোটে। যেন টগরের টানে অনিচ্ছুক যেতে যেতে অশ্বিনী একবার চারদিক তাকিয়ে নেয়। গাড়ির স্টার্টের শব্দ, গাড়ির চলে যাবার শব্দ, গাড়ির গিয়ার চেঞ্জের শব্দ, মানুষের হাজার রকম গলা—এই সমস্ত অশ্বিনী শুনতে পেল। আর আসন্ন সন্ধ্যায় প্রাকৃতিক আলো আর বৈদ্যুতিক আলোর মিলিত বিচ্ছুরণে মানুষের মুখের চঞ্চল দীপ্তির সরে সরে যাওয়া সেই টলমান ভিড়ের ভেতর দেখতে পায়। তার নেশাটা কেটে গিয়েছে—খুব মাথা ধরেছে। ভট্‌চাযের গাড়ির কাছে গিয়ে দেখে স্টার্ট দেয়া সারা। তারা তাড়াতাড়ি আসনে বসতেই, ভট্‌চায গিয়ার দিয়ে গাড়িটা রাস্তায় তুলতে যেতেই দেখে মিঃ প্রধানের গাড়ি আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়িটা পিছিয়ে নেয়। তারপর মিঃ প্রধানের গাড়িটা এলেই তার পিছে পিছে গাড়িটা চালিয়ে দেয়। অশ্বিনী মিঃ প্রধানের গাড়ির পেছনের লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"আপনি আজ যা কাণ্ড করেছেন না, একাই খাম্পা রিবেলকে তুলে দিলেন। মিঃ প্রধানও ভাবতে পারেন নি যে এ-রকম কাণ্ড

হবে। যখন শুনবেন কত টিকিট বিক্রি হয়েছে উনি নিজেও বিশ্বাস করতে পারবেন না। কিন্তু আপনার কাণ্ডটা যা হয়েছে না"—

"কী হয়েছে, আমাকে বলছেন না কেন!"

টগরের অভিযোগে ভট্‌চায ঘটনা ভনতে শুরু করে।

টগর প্রায় শিউরে বলে, "কী কাণ্ড, তুমি এ-সব করতে গেলে কেন?

"ধ্যাৎ আমারই টিকিট কেনা হলো না"—শেষে অশ্বিনী বলে।

"টিকিট কিনে আপনার কি হতো?"

"আপনি তো বললেন টিকিট কিনতে"—

"আরে এই রেসে মিঃ প্রধানের এই ঘোড়াটা প্রথম দৌড়চ্ছে। সবাই-ই জানে আজকের রেসে ওর কোনো চান্সই ছিল না। তবু মোটামুটি ভালো দৌড়লে, যদি কোথায় কোথায় কমতি আছে লক্ষ্য করা যায় তবে ট্রেনিং দিয়ে সামনের সিজনে ভালো দাঁড় করানো যায়। আজ ওর রিহার্সেল। তবু ওর নামে যদি একেবারে টিকিট বিক্রি না হয় সেটা খুব খারাপ। সেজন্য প্রথম দিনে নিজের লোকজনকে দিয়ে লোকে টিকিট কেনায়।" "ও" অশ্বিনী সংক্ষিপ্ততম জবাব দেয়। "প্রথম দিনে ঘোড়ার মালিক নিজে টাকা দিয়ে সব টিকিট কিনে নেয়, জানেন? ওটাও একটা ইনভেস্টমেন্ট"—ভট্‌চায ব্যাখ্যা করে।

"এলাম বটে রেসে, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতেই পারলাম না। আপনিও দিলেন খাইয়ে। সবটা ঠিক ফলো করতে পারলাম না"—

"তোমার ফলো করে দরকার নেই। ফলো না করেই যা কাণ্ড বাধিয়েছিলে। শুনেই তো আমার বুক কাঁপছে।" টগর বলে।

"ফলো আবার কি করবেন। টিকিট কাটবেন, লাক থাকলে জিতবেন, লাক না থাকলে হারবেন। আর নিয়ম অনুযায়ী খেলতে গেলে ঘোড়ার পিতৃকুল মাতৃকুলের নাম মুখস্থ করতে হয়, অত করতে গেলে মশাই লেবঙ রেসে খরচা পোষায় না। সব লাকের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। ঐ লোকটিকে দেখলেন না আপনার পায়েব

ধুলো নিচ্ছিল। কি? না, আপনাকে নাকি ছুঁয়ে ছিল, তাই জিতেছে!"

"আমি ওর সামনে ছিলাম, হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিল" "তাই হয় মশাই। আপনিও এর পরে যেদিন আসবেন আপনার লেডিলাককে নিয়ে এসে ছুঁয়ে থাকবেন, দেখবেন জিতে যাবেন।"

"আমার লেডিলাক? মানে?"

"যে লেডির লাকে আপনি লাকি, যে-লেডি আপনার লাক। এরপর যেদিন আসবেন টগরদিকে নিয়ে আসবেন, টগরদি যেটা ধরতে বলবেন, ধরবেন, দেখবেন জিতে যাবেন", ভট্চাযের কথা শুনে টগর খিলখিল হেসে বলে—"তাই নাকি?"

"একেক জনের লাক একেক জনের সঙ্গে খোলে। সবটাই তো দুইয়ের ব্যাপার, জোড়ার ব্যাপার। জুটির ব্যাপার। জুটি না হলে এই দুনিয়ার কিছু হতো? ঠিকমতো জুটিবাছাই হচ্ছে আসল ম্যাজিক। কে জানে ইনস্পেক্টরের স্টার আর মিঃ প্রধানের স্টার কম্‌প্লিমেন্টারি কিনা। প্রথম দিনেই যেরকম ওঁর ঘোড়াকে ঠেলে দিলেন!"

বিকেল শেষ হয়ে গেল। রাস্তার ওপরে আলো আছে তখনো—কিন্তু পাশে পাইনের গোড়ায় গোড়ায় অন্ধকার জমে উঠেছে। অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে ডাইনে খাদের দিকে পাইন গাছের পাতাগুলি আকাশে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। গাড়ি দার্জিলিঙে ঢুকে যায়। ভট্চায বলে, "কি? মিঃ প্রধানের বাড়িতে যাবেন তো?"

অশ্বিনী—"না, আমাদের মোড়ে নামিয়ে দিন। এখন আর কোথাও যাব না, বাড়ি গিয়ে ঘুমোব। ভীষণ মাথা ধরেছে"—

"তার চাইতে টগরদি, মিঃ প্রধানের কাছে গেলে হতো না?"

"তাহলে টগরদি যান। আমাকে নামিয়ে দিন।" টগর একবার ভট্চায একবার অশ্বিনীর দিকে তাকায়। "সে কি মশাই। আজ

খাম্পা রিবেলের জন্য অত বড় কাণ্ডটা করলেন যে আরেকটু হলে রায়ট বেধে যেত, আর আজই মিঃ প্রধানের ওখানে যাবেন না ?” অশ্বিনী কোনো জবাব দেয় না। মোড়টা এলে ভট্‌চায জিজ্ঞাসা করে, “কি, যাব নাকি মিঃ প্রধানের বাড়িতে, টগরদি বলুন।” টগরের কেমন যেন মনে হয় অশ্বিনীর কিছু হয়েছে।

“না, থাক্‌, এখানেই নামিয়ে দিন।” গাড়ি থামলে ওরা নেমে যায়। “কাল থাকলে আসবেন কিন্তু”—ভট্‌চায।
“আচ্ছা”। টগরদের বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে অশ্বিনী বোঝে তার খুব ক্লান্ত লাগছে। সারাদিন খাওয়া নেই, স্নান নেই, তার ওপর মদ গিলেছে। রেসের মাথামুণ্ডু কিছু বোঝে নি। এখন স্নান করে টগরের সঙ্গে একটু বেড়াতে পারলে যেন ভালো লাগত। কিন্তু একবার বাড়িতে ঢুকে তো আর বেরনো যায় না।

বারো

“চলুন একটু ঘুরে যাব।” “কোথায় ঘুরবে ?”

“কোথাও যাব না, এমনি ঘুরব”—

“কোথায়”—

“রাস্তায়”—অশ্বিনী খুব কেটে বলে। টগর চুপ করে যায়। ওরা রাস্তা বেয়ে ওঠে। অশ্বিনীর চেহারাটা দেখায় রুক্ষ, টগরের চেহারাতেও ক্লান্তি। হাঁটতে হাঁটতে ওরা পরস্পর থেকে যেন খানিকটা বিচ্ছিন্নই হয়ে পড়ে, যেন দুজন আলাদা আলাদা চলছে।

টগর চৌরাস্তায় যাবার বাঁক নেয়। রাস্তায় লোকজনের সংখ্যা যেন একটু কম। দোকানে দোকানে সেই একই পসরা। সব প্রায় মুখস্ত হয়ে যাওয়ার মতন। “সিজন শেষ হয়ে এলো” টগর বলে। চৌরাস্তার আলোকিত ফোয়ারা দেখা যায় আর মানুষের ভিড় আর পাশের ফোটোর দোকানের জানলার দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। টগর ছবিগুলি দেখে নি।

অশ্বিনীকে দাঁড়াতে দেখে সে-ও দাঁড়ায়। তারপর অশ্বিনীর চোখ অনুসরণ করে ফোটোর দোকানের জানলার দিকে তাকিয়েই সে প্রায় ছুটে গিয়ে জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

স্টুডিয়োর জানলায় সারিসারি সাজানো ফ্লাওয়ার শো আর ডগশোর ছবি। ফ্লাওয়ার শোর ছবিগুলোতে অশ্বিনী এবং অশ্বিনী আর টগর যেন সবাইকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ছবিটাও আছে যেখানে মিঃ কুম্‌রার কালো পোড়া মুখটা অশ্বিনীর কনুইয়ের পাশ থেকে উঁকি মারছে। টগর অশ্বিনীর দিকে তাকায়। অশ্বিনীকে ক্লান্ত দেখায়।

টগর রাস্তা পেরিয়ে ছুটে গিয়ে অশ্বিনীকে টেনে নিয়ে আসে, তারপর অশ্বিনীকে টেনে টেনে জানলা থেকে জানলায় ছুটে যায় প্রায়। অত বড় বড় ঝকঝকে কাঁচের ওপারে সমস্তটুকু আলোর কেন্দ্রে অশ্বিনী আর টগর। বেশির ভাগ ছবিতেই অশ্বিনী প্রধান, কারণ, সে সবচেয়ে প্রথমে। তার পাশে গভর্নরের স্ত্রী বা টগর বেঁটে ছোটখাটো বলে ফ্লাশ বাল্বের সবটুকু আলো অশ্বিনী গ্রাস করে নিয়েছে। কাচের জানলার ওপারে অত বড় বড় ফোটোতে ফুলে আর আলোতে আর হাসিতে ঝলমল টগর নিজের ছবির কাছ থেকে হাসি আর উজ্জ্বলতা নিয়ে অশ্বিনীর দুই হাত নিজের দুই হাতে ধরে সমবেত নাচের ভঙ্গিতে দুলে ওঠে, "ই-স, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে অশ্বিনী, কী সুন্দর!" টগর আবার আরেকটি স্টুডিয়োর জানলায় অশ্বিনীর ছবিটার দিকে উদ্ভাসিত মুখে তাকায় তারপর তার হাতে ধরা অশ্বিনীর দিকে মুখ তুলে তাকায় আর দুলে ওঠে।

টগরের উচ্ছ্বাসে অশ্বিনী মৃদু হাসে, সে-ও নিজের সেই অবিশ্বাস্য আয়তন আর অবস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকে। সারি সারি স্টুডিয়ো-গুলো, সারি সারি জানলা, সব জানলাতেই ফ্লাওয়ার শো-র ছবি।

"তুমি কি এমনি করে সবসময়ই হাসছিলে, অশ্বিনী?" টগর অশ্বিনীর দিকে মুগ্ধ চোখ মেলে। "আপনিও তো কী সুন্দর হাসছেন!"

অশ্বিনী অবশেষে একটা জানলার ছবির দিকে তাকিয়ে বলে। সেই ছবিটাতে গভর্নরের স্ত্রীর রিবনখোলা হাত তুটির ওপর তুপাশ থেকে টগর আর অশ্বিনী এতটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যে গভর্নরের স্ত্রী-কে আড়াল করা তাদের মাথায় মাথায় প্রায় ঠোকর লেগে যাচ্ছে।

"মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়েই সব ছবি, মানে তুমিই আসল লোক", ছবির জানলা শেষ হয়ে যায়, টগর বলে আর ডাকে, "অ-শ্বি-নী"—

"আমি কেন শুধু, আপনিও"—

"হ্যাঁ, তুমি আর আমি। দেখলে তো ভট্‌চায-ও বললো জুটি বাঁধাটাই আসল।"

ওরা ঠিক সেই জায়গায়, যেখান থেকে আর কয়েক পা বাড়ালেই ম্যল। অশ্বিনী থেমে গিয়ে পেছন ফেরে। এখান থেকে স্টুডিয়োর জানলার ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জানলায় যে আলো জ্বালানো তার তুতি এসে রাস্তার ঐ অংশটুকুকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। ঐ অত বড় বড় আলোকিত জানলায় জানলায় ঐ অত বড় অশ্বিনীর ছবির পর ছবি টাঙিয়ে অশ্বিনীকেই যেন দার্জিলিঙে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ম্যলের সীমানায় পা দিয়ে অত মানুষজনের ভিড় দেখে অশ্বিনী প্রায় নিশ্চিত হয় ওখানে মিঃ কুম্‌রা আছেন। জ্যান্ত অশ্বিনী যদি পালিয়েও যায় তাহলেও ফোটোর অশ্বিনী মিঃ কুম্‌রার সামনে অভ্রান্ত প্রমাণ হিসাবে জানলায় জানলায় লটকে থাকবেই। নিজের ফাঁদ থেকে বেরবার চেষ্টায় অশ্বিনী বলে, "ম্যালে বসব না"—

"কেন অশ্বিনী, কত জনের সঙ্গে দেখা হবে?"

"আমার কারো সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে নেই" শুনে টগর অশ্বিনীর হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের চাদরগোছের জিনিসটি ঠিক করে নিয়ে বলে, "তবে তুমি কোথায় যাবে?"

"চলুন না, একটু আলাদা আলাদা ঘুরি"—

ভিড়ের ভেতর দিয়ে কোণাকুণি ম্যল পেরতে পেরতে ভিড়ের

সুযোগে টগর এই প্রথম অশ্বিনীর দিকে গোপনে লুকিয়ে তাকাল, টগরের কোথাও সেই দৃষ্টির প্রত্যুত্তরের আশা ছিল না। অশ্বিনী কি তার সঙ্গে আলাদা আলাদা ঘুরতে চাইছে, তার সঙ্গে আলাদা হয়ে যেতে চায়। চারপাশে ভিড়ের ভেতর মিশে যাবার টান বোধ করতে করতে টগর অশ্বিনীর সঙ্গে ভিড় ছাড়িয়ে যায়। তারপর খামোখা বলে, "বেণুর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করো, ও বড় চাপা।"

ওরা ইস্ট ম্যল রোডের রেলিং ধরে স্টেপ অ্যাসাইডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। সন্ধ্যা নেমে গেছে। দার্জিলিঙের ভুবনখ্যাত সৌন্দর্য সামনের সব পাহাড়ের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকাও যেন এখনকার কাজ নয়। ওরা এমনিই হাঁটে। টগর স্পষ্ট বুঝে নেয়, ম্যলের জনকলধ্বনি ঝর্ণার শব্দের মতো ক্রমে দূরে সরে সরে তাদের একেবারে নিঃসঙ্গ করে দেয়। হঠাৎ অশ্বিনী বলে, "আজ একটার পর একটা কাণ্ডই হচ্ছে, কেমন!"

"কেন, কি হল?"

"এখানে ফোটো টাঙানো। মাঠে ভট্চায বললো মিঃ প্রধানের ঘোড়ার জন্য একটু কানাকানি করতে। আমি তাই নিয়ে প্রায় মারামারিই লাগিয়ে দিলাম। ফলে খাম্পার টিকিটের জন্য মারামারি পড়ে গেল" "জিতলো" "জানিনা" "সে আবার কি" "জিতলে নিশ্চয়ই জানতাম।"

"আমিও কিছু বুঝতে পারলাম না, কে জিতলো কে হারলো", টগর বলে। ওরা শেডের নিচে দাঁড়িয়ে, যেখানে এখন লেবং রেসকোর্স থাকার কথা, সেদিকে তাকিয়ে থাকে, অন্ধকারে। আবার চলে।

"তার আগে আবার কাণ্ড হয়েছে" "কি কাণ্ড" "একটা লোক যে ঘোড়াতে বাজি ধরেছিল সেটা জিতছে দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিল। পরে যখন জিতলো তখন এসে আমার পায়ের ধুলো নিচ্ছে। আমি ছুঁয়েছি বলেই নাকি জিতেছে।"

"সেটাই ভট্‌চায বলছিল? আচ্ছা, সত্যি কি এরকম হয়?"

"কি-রকম?"

"একজন ছুঁলে আরেকজন জেতে?"

"তাহলে ছুঁলেই পারে। আপনাকে নিয়ে গিয়ে একদিন পরীক্ষা করব আপনি কি সত্যি আমার লাক?"

"নিয়ে যেও। তোমাকে জিতিয়ে দেব"—

ওরা হাঁটতে থাকে। টগর কাছারি রোড ধরে নেমে গিয়ে আবার একটা সরু রাস্তা ধরে, নির্জন, মিউজিয়ামের পেছন দিয়ে, ঘুরে রবার্টসন রোড ধরে, এগিয়ে যায়, আবার ঘুরে ম্যালের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে একটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়, এগিয়ে যায়, নির্জন, ঘুরে ম্যালের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে একটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়, ছোট্ট, একটু ভিড় পেরিয়ে আবার একটা সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়, একটা বাড়ির তলা দিয়ে শুকনো শ্যাওলাধরা দেয়ালের গা ঘেষে, ঠিক মাথার ওপরে ভিড় আর আওয়াজ নিয়ে আরো একটা সিঁড়ি বেয়ে গভীরতায় নেমে যায়, আবার মিউ-জিয়ামের পেছন দিয়ে কাছারি রোডের মুখে এসে যায়, নির্জন। যেন অশ্বিনীকে নিয়ে মাঝখানে সেই জনমণ্ডলীর ভিড়টা রেখে চারপাশে পাক দিয়ে ঘুরছে টগর—তার সঙ্গে কোন্ নির্জনতা চায় অশ্বিনী, যাচাই করতে।

"এখন ফিরবে?"

"চলুন ফিরি।"

কিন্তু টগর সোজা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ফিরে লাডেনলা রোড ধরে। সেখান থেকে আবার, ছোট ছোট রাস্তা থেকে আবার রাস্তা দিয়ে দিয়ে নামতে থাকে, উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে ওরা আবার আলো, লোকজনের ভেতর এসে পড়ে। অবশেষে হিলকার্ট রোডের মোড়ের আলোতে নেমে আসে। অশ্বিনী যেন এখন অনেকটা বেকার, পরবর্তী কাজের অপেক্ষায়। কিন্তু সম্ভাব্য যে কোন ব্যস্ততার

আশঙ্কায় অশ্বিনী-ই তো টগরকে নিয়ে বেড়াতে চেয়েছিল, মিঃ প্রধানের ওখানে না গিয়ে, সেকি শুধুই এ-রকম হাঁটার জন্য—অশ্বিনী মনে করতে পারে না।

টগর চারপাশের গন্ধ নেয়ার ভঙ্গিতে বলে, "সিজ্‌ন্ শেষ হয়ে গেল।"

"কেন, এখনো তো অনেক লোক, ম্যাল ভর্তি"—

"কোথায় লোক দেখছ, এ তো নেমে গেল বলে," টগর যেন একটু মলিন হাসে।

অশ্বিনী একটু হালকা সুরে বলে, "আপনারা কি গন্ধে টের পান?" টগর মুখটা অশ্বিনীর দিকে অসম্পূর্ণ তুলে বলে, "তা পাই বই কি, সে গন্ধেই বলো আর স্বাদেই বলো"—

"এরপর—?"

"সে তো তুমি থাকছই, দেখবে"—

টগরের গতিটা একটু শিথিল হয়ে এসেছিল। অশ্বিনীকে নয়, সে চারপাশের দার্জিলিং-কে দেখে দেখে নিচ্ছিল। "কত তাড়াতাড়ি সিজ্‌ন্ শেষ হয়ে যায়।" টগর আনমনে বলে। "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, যেন আপনাকে নেমে যেতে হবে"—

টগর অন্য কোনো কথা ভাবছিল। সেই ভাবনা শেষ করে সে বলতে পারে, "আবার সেই মার্চ"—"কি?"

"সি-জ্-ন্"—

"সিজ্‌ন্‌টা তাহলে সিজ্‌নারদের নয়, আপনাদেরই"—

"তুমি তো এই শীতে থাকছ, নিজেই দেখবে—সিজ্‌ন্ থেকে সিজ্‌নে বেঁচে থাকা কী রকম, দুই সিজ্‌নের মাঝখানে, এ—ই!"

গত বর্ষার স্মৃতিতে বা আসন্ন শীতের আশঙ্কায় টগর যেন সিঁটিয়ে যায়, কথা শেষ করতে পারে না। অশ্বিনী টগরের পাশে দাঁড়িয়ে তার চার পাশের দার্জিলিঙের দিকে তাকায়—সেই স্মৃতি বা আশঙ্কার

একটা কোনো আন্দাজ পেতে যেন! বেশ কিছুক্ষণ পর অশ্বিনী বলে,—"একটু ড্রিঙ্ক করতাম"—

একটু চুপ করে থেকে টগর এদিক ওদিক তাকায়। ওপরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে খুব ক্ষীণস্বরে বলে, "আজ আমারও একটু ড্রিঙ্ক করতে ইচ্ছে করছে"—

অশ্বিনী চুপ করে থেকে এদিক ওদিক তাকায়। কখনো মনে হয় সে বুঝি শুনতেই পায় নি। অন্যদিকে তাকিয়ে খুব মৃদুস্বরে বলে, "আপনি কখনো ড্রিঙ্ক করেছেন?"

"না"—

"কিন্তু আমি তো জানি না মেয়েরা কোন্ ড্রিঙ্ক খায়?" টগর একটু ভেবে বলে, "তাহলে থাক্।"

রাস্তার মধ্যে দুজন দাঁড়িয়ে থাকে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে টগর পা বদলায়। ঘুরে দাঁড়ায়। ওপরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। নিচের রাস্তার দিকে তাকায়। অশ্বিনী মাথার পেছনে দুই হাত তোলে। তারপর মাথা ঘুরিয়ে দার্জিলিঙের রাত্রির সমতল আকাশ দেখে।

কোনো একসময় টগর বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। অশ্বিনীও।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রায় সাড়ে সাতহাজার ফুট এই উচ্চতায় শীত, এখন এই মধ্যশীতে, একটি সামগ্রিক, সর্বগ্রাসী, সর্ববিকল্পহর অস্তিত্ব।

বাগানের ম্যানুফ্যাকচারিং একেবারে বন্ধ। প্রুনিং-এর কাজ চলছে, একটু আধটু জঙ্গল সাফ করাও। সকালবেলায় যখন মজুররা কাজে আসে, তখন অতগুলো মানুষের একসঙ্গে চলায় কুয়াশাটা নাড়া খায়, জলের তলায় চোখ খুললে যেমন, তেমনি দেখা যায়,—শ শ মানুষ একটা অতি ক্ষীণ আভাসমাত্র দিয়ে চলে যাচ্ছে। কোন দিকে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কে কে যাচ্ছে—সেগুলো কিছুই ঠাহর হয় না। কিন্তু আবার জানাও যায়—এটাও ঠিক, নইলে কাজকর্ম চলে কি করে। বাবুরাও আছেন, কাজে যাচ্ছেন, বাড়ি ফিরছেন, অথচ কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। সমস্ত বাগানটা একটা ছায়া-জগৎ। কারখানা চলছে না বলে সেই ছায়াজগৎ নিঃশব্দ। কুয়াশায় কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না বলে সেই ছায়াজগৎ নিঃসঙ্গ। সবাই একা একা ঘোরে, ফেরে, কাজে যায়। কখনো হঠাৎ কোনো কারণে কোথাও কুয়াশা একটুখানি সরে গেলে নিজেকে বড় অসহায় একা লাগে—এতক্ষণ তবু ধারণা ছিল কুয়াশার ভেতর কাছাকাছি কোথাও কেউ হয়তো আছে।

ফ্যাক্টরির ভেতর কুয়াশা ঢুকে যাতে চা নষ্ট করে দিতে না পারে তার কঠিন ব্যবস্থা। ফ্যাক্টরির সমস্ত জানলা, দরজা, স্কাইলাইট সব সময় বন্ধ। সদরদরজা প্রায় সবসময়ই বন্ধ, তার ভেতর একটা ছোট দরজা কাটা আছে, সেটা দিয়েই যাতায়াত। তবুও কুয়াশা ঢুকে যায়। এমনিতে দেখা যায় না, আলো জ্বাললেই দেখা যায়, সিলিঙে ঝুলে, আনাচে-কানাচে ঘাপটি দিয়ে, কোনো মেশিনের গায়ে গা

লাগিয়ে, কোনো ফাঁকা জায়গা ভরিয়ে, অনিবার্য কুয়াশা। আলো জ্বালালে সেই কুয়াশায় আলো ঠেকে যায়। প্রতিহত আলোতে সেই সর্পিল, স্যাঁতসেঁতে, জোলো কুয়াশা জীবন্ত হয়ে ওঠে যেন আর মেঝেতে গড়িয়ে, মেশিনের ওপর দিয়ে, সিলিঙ থেকে গলে, মেঝেতে দাঁড়িয়ে কখনো সর্পিল, কখনো জলীয়, কখনো দৃঢ় গতিতে ফ্যাক্টরিময় সঞ্চরণ শুরু হয়ে যায়।

বাইরে, বাগিচায়, সকালে কুয়াশা নাড়িয়ে নাড়িয়ে মজুররা এসে কুয়াশা নাড়িয়ে নাড়িয়ে চলে যায়, তারপর কুয়াশায় ডুবে যায় এ-ঝোপে ও-ঝোপে, এ-ব্লকে ও-ব্লকে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে কুয়াশার আড়ালে আড়ালে কোনো গুপ্তঘাতকের দল বাগিচার গাছের মাথা মুড়িয়ে, মাটি খুবলে, শেকড় উপড়ে দিয়ে গেছে। কেউ কাউকে দেখতে পায় না, তবু কী করে যেন হিসেব ঠিক থাকে, কাজ ঠিক এগোয়, আকাশ মাটি জোড়া কুয়াশাকে মাটির ভেতরে সেঁধিয়ে দেয়া হয়,—সামনের ফলনে এরই ফলে লকলকিয়ে পাতা উঠবে, শিষ গজাবে, ফুটে-না-ওঠার জন্য কুঁড়ি মাথা তুলবে। তখন এই কুয়াশার হিসেব মিলবে, মিটারে-লিটারে-গ্রামে মাপা হিসেব। ভুলচুক হয় না। প্রতি কেজি চায়ের দামের সঙ্গে সেই হিসেব মিলে যাবে।

বর্ষার পর খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতর সবচেয়ে ভালো ফলন তুলতে হয়েছে। তখন বর্ষার ক্ষতি মেরামতির সময় পাওয়া যায় নি। এখন সেই মেরামতি চলছে আর তার সঙ্গে চলছে সমস্ত বাগানটাকে আগামী ফলনের জন্য তৈরি করে তোলা—আর মাত্র মাস দুই পরের পাতির জন্য। কোথাও চা-গাছের তলায় কেউ এক-জন জঙ্গল আর বুনো গাছগুলো উপড়ে ফেলে। কোথাও গাছটার হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ওঠা বন্ধ করতে নিষ্ঠুর ছুরি চলে। কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নেমে যাওয়া চা-গাছের সারির তাকগুলোর কোণা ঠিক করে দেয়া হয়—কোথাও মাটি আলগা, কোথাও পাড় ভাঙা, কোথাও পাথর ঢিলে, বর্ষার পর সময় পাওয়া যায় নি। বর্ষায়

পাথর গড়িয়ে কোনো একটি চা-গাছের কোনো একটি শেকড় থেঁতলে যায়—মাটির ভেতর থাকা সত্ত্বেও থেঁতলে যায়—মাটির ভেতর থাকা সত্ত্বেও থেঁতলে যায়, মাটির ওপর পাথরের চাপ ছিল এতই কঠিন আর ভারি,—সেই শেকড়টার ওপরের মাটি সরিয়ে শেকড়ের থেঁতলানো জায়গাটিকে কুয়াশার ভেতর খুলে রাখা হয়। কোথাও একটা ব্লকের সমস্ত গাছকে বছর তিন পর এই শীতে ডালপাতা ছেঁটে একেবারে কঙ্কাল করে দেয়া হয়।

এমন প্রকাশ্য একটা পরিকল্পনার কাজও কুয়াশায় কুয়াশায় কেমন অদৃশ্য। যত কুয়াশা পড়ে কাজ নাকি তত ভালো হয়। সবাই সবাইকে দেখতে পাচ্ছে, চারদিকে নানারঙ, রোদ ঝলমল, মেয়ে মরদ দুই দলই কাছাকাছি, পাখি পোকামাকড়ের ডাকাডাকি গুঞ্জন,—এর ভেতর দল বেঁধে কাজ হয় না। হয় না তা নয়, প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তনের পর প্রথম সাতদিন হয়। কিন্তু এই কুয়াশায় নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না, কোনো ঝোপের আড়ালে নিজের কাজটুকু ছাড়া আর কোনো কিছু সামনে থাকে না, সময়ের তুলনায় কাজটা নেহাৎই ছোট,—এ-সবই পরিমাণ আর গুণ দুদিক থেকেই খুব ভালো।

একঘেয়েমিতে নাকি কাজ ভালো হয়। প্রকৃতির নানারকম দৃশ্যে ও শব্দে কাজের ক্ষতি হয়। এরকম পাহাড়ে পাহাড়ে ঢালুতে ঢালুতে বিস্তৃত বাগিচায় রোদ, আলো আর শব্দ তো নিষিদ্ধ করা যায় না। সেক্ষেত্রে এই শীতকাল আর ঘন কুয়াশা যেন আলো, শব্দ আর সঙ্গ দূরে রাখতে প্রকৃতির নিজেরই ব্যবস্থা। যদি একবার ধরিয়ে দেয়া যায় তবে কাজটা খুব ভালোভাবে নিশ্চিত উঠে আসবে—ঐ কুয়াশার গভীরে গাছটা আর কাজটা ছাড়া যে মজুরটার সামনে কোনো কিছুই থাকে না। এমন প্রকাশ্য একটা পরিকল্পনার কাজও কুয়াশায় কুয়াশায় কেমন অদৃশ্য হয়ে যায়! মানুষ থেকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ কুয়াশার গভীরে গভীরে আত্মগোপন করে আবার প্রকৃতিতে

মানুষে ফিরে আসতে চায়। সেই প্রত্যাবর্তনে কাজটা তো সহায়। নইলে এই কুয়াশার সর্ববিলোপী গভীরতায় প্রসারিত হাতের আঙুলও যখন দেখা যায় না তখন মানুষকে নিজেরই প্রতিপক্ষ হতে হয়, নিজেরই গলায় দশ আঙুল টিপে ধরতে হয়। কারণ এ-কুয়াশা মানুষকে তার পরিপ্রেক্ষিত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, শারীরিক। বর্ষায় মেঘও এ-রকম ঘিরে ধরে বটে, কিন্তু কখনো কখনো জলধারার ফাঁক দিয়ে দিগন্ত যদি নাও হয় অন্তত সামনের পাশের দৃশ্য দেখা যায়, তাছাড়া জলধারাপতনে শব্দ ওঠে, জলধারা মাটিতে পড়েই গতি পায়, ঝর্ণার কলধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু এ-কুয়াশা সম্পূর্ণ নীরবতায়, সম্পূর্ণ ধূসরতায় এমন ঢেকে ফেলে যে দিনরাত্রির পার্থক্যটা পর্যন্ত প্রাকৃতিকভাবে লুপ্ত। শুধু এইটুকু তফাৎ, দিনের বেলায় কুয়াশা দেখা যায়, নিজেকে চারপাশের ও মাথার ওপরের কুয়াশার ভেতরে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অন্তত দেখা যায় আর রাত্রিতে কুয়াশা দেখা যায় না, আলো ফেললে আলোটা কুয়াশার গায়ে পড়ে থাকে, কুয়াশা যেন একটা কঠিন পদার্থ। নিজের সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতায় কুয়াশায় কুয়াশায় সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত থেকে মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় কখনো দিন বোঝে, কখনো রাত। এই কুয়াশার হাত থেকে ঘরের ভেতরে যেটুকু সময় আত্মরক্ষা করা যায়, সেখানেও মানুষ নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে না, নিজেকে গুটিয়ে রাখে, কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, কারণ, এই প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চতার শীতটা কোনো আবহাওয়ার ব্যাপার নয়,—যেমন মাটি ফুঁড়ে এই পাহাড় এত উঁচুতে, যেমন এই পাহাড় ফুঁড়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু ধূপ গাছ খাদের ওপরে ঝুলে, তেমনি শীত এই পাহাড় গাছ আকাশকে ঘিরে ধরে রেখেছে, এমনই ওতপ্রোত যে এই শীত না থাকলে এই পাহাড়-গাছ-মাটিও থাকত না। বৃষ্টির যেমন একটা বাইরের চেহারা আছে,—মেঘ, জল ; গ্রীষ্মের যেমন একটা বাইরের চেহারা আছে,—রোদ, আকাশ ; এই শীতের তেমন কোনো বাইরের

চেহারা না থাকায় শীতটাকে বুঝতে হয় নিজের সমস্ত শরীর দিয়ে, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি রোমকূপ দিয়ে। ফলে শীতটাকে মনে হয়, শরীরের একমাত্র ধারকশক্তি বুঝি-বা, যেন, এই শীতের প্রবল সংহতি ছাড়া রক্তপ্রবাহ শুধুমাত্র শরীরের শিরা-উপশিরার ভেতরই আটকা থাকত না, শিরাউপশিরা শুধুমাত্র শরীরের পেশী আর মাংসের ভেতর বাঁধা থাকত না। শীতের সেই সংহতির তীব্র টানে শরীরটা এমন সিটিয়ে যেতে চায় যেন শরীরের দৈর্ঘ শরীরের পক্ষে বড় বেশি দীর্ঘ। শীতের সেই সংহতির ঘন টানে রক্তপ্রবাহ এমন কেন্দ্রিত হয়ে পড়তে চায় যেন শরীরের বিস্তার শরীরের পক্ষে বড় বেশি বিস্তৃত। রক্তপ্রবাহ যতটা পারে ততটা কেন্দ্রিত থাকে বলে শরীরের প্রান্তগুলি কোনো সময়ই গরম থাকে না। শরীরের ওপর এই তীব্র সংহতি আর ঘনত্বের প্রচণ্ড চাপ যখন শরীরের সমস্ত ধারণক্ষমতার বাইরে চলে যায়, তখনো শরীরের টান ছিঁড়ে যায় না, বরং, ক্ষমতার বাইরের সেই চাপকে শরীবে নিয়ে প্রত্যেকটি অঙ্গ স্থির হয়ে যায়। রক্তস্রোতে তুষারপাত ঘটে। চাঞ্চল্যের, গতির আকস্মিক স্থিরতায় জীবাশ্মের লক্ষ বর্ষব্যাপী অপরিবর্তন ক্ষয়হীন শুরু হয়ে যায়। তীব্র, অনড় নির্বিকল্প উত্তরোত্তর কাঠিন্যে এই শীত প্রাণকে সংকীর্ণ করে আনে, যেন শুধুমাত্র নেহাৎ অপরিহার্য খাতটুকুতে রক্ত বয়, যেন শুধুমাত্র নেহাৎ অপরিহার্য অঙ্গ সঞ্চালন ঘটে। আর সেই সংকীর্ণতম পরিধিটুকুও আবো ছোট হয়ে আসতে চায়, দুর্নিবার আন্তরটানে। ক্রমসংকীর্ণ শরীরের সেই টানে চৈতন্যেব স্রোতে কখন আবর্তের সৃষ্টি হয়, তখন চৈতন্য আর প্রবাহিত হয় না, একটা কোনো কেন্দ্রের চারপাশে পাক খেতে থাকে, পাক খেতে খেতে সেটাই চৈতন্যের গতি হয়ে ওঠে, আর নিজের চারপাশে পাক খাওয়ার ফলে একটা ঘূর্ণনের সৃষ্টি হয়, চৈতন্যের সেই ঘূর্ণি-পাকের গতি সবসময়ই নিচের দিকে টানে, সেই একটিমাত্র কেন্দ্রের নিচের দিকে। যেমন কুয়াশায় চোখ চলে না, কান চলে না, নিজের

নিশ্বাস স্থির হয়ে নিজেরই নাকের ডগায় ঝুলতে থাকে, নিজের চারপাশে কোথাও কাউকে পাওয়া যায় না তেমনি এই কুয়াশায় চৈতন্যে ঘূর্ণিপাক আসে। চৈতন্যের ঘূর্ণিপাকে গতি বাড়ে, পাতালের টান লাগে, প্রথমে দৃশ্য, পরে দিক লোপাট হয়, এক শেষহীন পরম্পরাহীন চক্রগতি সূচীমুখ নেমে যায় পাতালে, অতলে। শীতের প্রবল চাপে ন্যুব্জ শরীর যত শিলীভূত হতে থাকে, চৈতন্যের ঘূর্ণির পরিধি তত ছোট হয়ে আসে আর যত ছোট হয়ে আসে তত দীর্ঘ হয়, বল্লমের মতো, কখন নিরুদ্দেশ তলের সেই গভীরে প্রোথিত হয়ে যাবে।

আর বড় জোর একমাস, দিন পনর বিশের ভেতরই কুয়াশা একটু পাতলা হতে শুরু করতে পারে। কিন্তু এই একেবারে শেষকালে আকাশশুদ্ধু যেন মাটির ওপর নেমে এসে পিষ্ট করে দিতে চাইছে। এই শেষ শীতের সময়টা পার করাই সবচেয়ে কঠিন।

দুই

অশ্বিনীর পক্ষে দিনদিন আরো কঠিন, প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে যেন।

কারণ, এখানে এটা অশ্বিনীর প্রথম শীত। তার প্রচণ্ডতা সম্পর্কে অশ্বিনীর কোনো ধারণাও ছিল না। তাই তাকে সবসময়ই অপ্রস্তুত আহত হতে হয়। আর কত, আরো কত, অশ্বিনী তার কোনো হিসেব পায় না।

এখানকার শীত সম্পর্কে সকলেরই পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় শীতের শুরুতে সকলেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থার ভেতরে চলে গেছে, সাপের যেমন শীতনিদ্রা,—অশ্বিনী কোনো আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই করে উঠতে পারে নি।

আর পূজোর সময়ের অত হৈ হৈ ঘোরাফেরার পর এমন হঠাৎ সমস্ত খালি হয়ে শীত নেমে এসেছে যে অশ্বিনী প্রায় বোকা বনে

আছে। পাহাড় থেকে প্রায় সবাই নিচে নেমে গেছে। দার্জিলিং প্রায় খালি। টগররা অবিশ্যি আছে। বার তুই তিন গিয়েছে অশ্বিনী, এর ভেতর। কিন্তু কোথাও তো বের হওয়া যায় না।

আর, কাজ না থাকার বিপদটা এক অশ্বিনীরই যেন। জমা চা যা আছে তা সময় ও সুযোগ মতো ডেসপ্যাচে পাঠানো হচ্ছে বটে কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং বন্ধ বলে গুদাম খালি করার কোনো তাড়া নেই। ফলে ফ্যাক্টরিবাবু অশ্বিনীকে দিয়ে একটা ডেসপ্যাচের ক্লিয়ারেন্সের কাজ এত দিন ধরে করিয়ে নেন যে অশ্বিনীর প্রায় মনেও থাকে না কখন সে ক্লিয়ারেন্স দিল। অন্য বাগানেও একই অবস্থা। হয় ক্লিয়ারেন্স দেয়াই থাকে, নয় বাগান ক্লিয়ারেন্সের জন্য বসে থাকে, কোনো তাগাদা নেই।

প্রায় কোনো কাজ নেই বলেই অশ্বিনী আরো নিয়মিত বাগানের ঘণ্টা অনুযায়ী চলে। সকালে ভোঁ বাজতে ফ্যাক্টরি-অফিসে গিয়ে বসে। এখন সকাল আটটায় ভোঁ বাজে। বিকেল তিনটেতে ভোঁ বাজলে আবার ফ্যাক্টরিতে গিয়ে বসে থাকে। চারটে-সাড়ে চারটেতেই শেষ ভোঁ বেজে যায়। বাড়ি ফিরে হিটারের সামনে বসে থাকা।

বাড়ি থেকে ফ্যাক্টরি আর ফ্যাক্টরি থেকে বাড়ি যাতায়াতে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে কুয়াশার ভেতর পথ করে নিতে হয়, যেন জঙ্গলের পথ। এখন কুয়াশা ঘন হয়ে গিয়ে ফ্রস্ট পড়ছে, হিম। শক্ত জলবিন্দু বড় বড় ফোঁটায় খুব ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে, আকাশ থেকে নয়, কুয়াশা থেকে, মাটির ওপরে। ফলে হিমপাত দেখা যায় না। হঠাৎ দেখা যায় জলের বড় বড় অনড় ফোঁটা,—ঘাসময়, চালময়, গাছময়—কচুপাতার ওপর যেমন জলের ফোঁটা তেমনি টলটলে। কিন্তু সব দিক কুয়াশায় ঢাকা বলে এই সমস্ত দৃশ্যটা একবারে চোখে পড়ে না। কুয়াশার কোনো আকস্মিক অবকাশ দিয়ে দেখা যায় টলটলে একরাশ জলবিন্দু। সে অবকাশ পরমুহূর্তে ঢেকে

যায়। পায়ের দিকে চেয়ে পথ চললে আলোড়িত কুয়াশাপুঞ্জের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ দেখা যায় জ্বলজ্বল হিমবিন্দু। গা ছমছম করে। মনে হয়, এই কুয়াশার আড়াল থেকে হাজার হাজার চোখ পাহারা দিচ্ছে। মনে হয়, যেন কোথাও কোনো পরিত্রাণ নেই, এই নীরন্ধ্র কুয়াশা আর শীতের পেষণ থেকে। আর কুয়াশা থেকে যত হিম ঝরে যায়, কুয়াশা তত ঘন আর চাপা হয়ে ওঠে আর অনড়।

এখন হিম পড়ছে। এরপর নাকি বরফ পড়বে। তখন আর কুয়াশা থাকবে না, আকাশ থেকে মাটি তুষারপুঞ্জে আর কণায় ছেয়ে যাবে। ফালুটে, থার্টিসিক্স্‌থ্‌ পয়েন্টে, মনেভঞ্জে, সান্দক্‌পোতে নাকি বরফ পড়ে গেছে।

তিন

ফ্যাক্টরির সদর দরজার ভেতর একদিকে কাটা ছোট দরজাটা ঠেলতে ভেতর থেকে দারোয়ান একটু ফাঁক করে ধরে আর অশ্বিনী কোনোরকমে গলে যায়। ফ্যাক্টরির ভেতর প্রথম ঢুকে খানিকটা স্বস্তি আসে। বাইরে থেকে ভেতরে এলে এতখানি খোলা জায়গায় চোখের আরাম লাগে।

বাঁয়ে, ফ্যাক্টরি-অফিসে ঢুকে অশ্বিনী দেখে কেউ নেই। তার চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে উত্তরের দেয়ালজোড়া কাচের জানলার মুখোমুখি বসে পড়ে। জানলার ওপারেই ঘন কুয়াশা, ফলে জানলাটাকে ঘষা কাচের মনে হয়। ফ্যাক্টরিবাবু কোনোদিন জানলার দিকে মুখ করে বসেন না, হয় পর্দা টেনে দেন, নয় চেয়ার ঘুরিয়ে জানলাটা পেছনে রেখে বসেন। অশ্বিনী অনেকদিনই ভেবেছে, কেন। আর ভাবনার সেই সংস্কারেই সে জানলার মুখোমুখি ছাড়া বসে না।

বাইরে পায়ের শব্দ হয়। ওভারকোটের ভেতর মাথাটাকে প্রায় ঢুকিয়ে দিয়ে ফ্যাক্টরিবাবু হনহন করে ঢুকে, সোজা জানলাটার কাছে এগিয়ে পর্দাটা টেনে দেন। অশ্বিনী বলে ওঠে, "আঃ"।

ফ্যাক্টরিবাবু অশ্বিনীর দিকে একবার তাকিয়ে আবার এক হ্যাঁচকায় পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে চেয়ারটা ঘুরিয়ে টেবিলে বসে পড়েন। বসে পড়েই ওপরে নিচে তাকান। তারপর হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপতেই টেবিলের ওপর দুটো আর তলায় দুটো হিটার জ্বলে ওঠে। টেবিলের ওপরের হিটারটা বেশ বড়, ফুলের পাপড়ির মতো, টকটকে সেই হিটারের দিকে তাকালে খুব রোদের দিনে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া মনে হতে পারে। সামনের জানলার দিকে তাকিয়ে অশ্বিনী আর ঘাড় গুঁজে ফ্যাক্টরিবাবু হিটারের ওপর নিজের হাত মেলে ধরেন।

বাইরের দরজা খোলার শব্দ হয়। লামা ঢোকে। অফিসের দরজার সামনে এসে ফ্যাক্টরির ভেতরের দিকে মুখ করে ওভার-কোটের পকেটে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর অফিসঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকে। ফ্যাক্টরিবাবু বা অশ্বিনী কোনো কথা বলে না। যে যার মতো ঘাড় গুঁজে বা জানলায় তাকিয়ে হিটারের ওপর হাত মেলে রাখে। লামা একসময় ভেতরে এসে চেয়ারে বসে। হিটারের ওপর দুই হাত মেলে ধরে ঘাড়টা ঝুলিয়ে দেয়।

অশ্বিনীর চোখের সামনে জানলার ওপারে প্রায় নিশ্চল কুয়াশা, কাচ ঘষা কাচের মতন আর ঘরের ভেতর একটা টকটকে লাল বিজলি ফুলের দিকে আঙুল মেলে ধরা ছটা হাত। ফুলটা যে আগুনের, আঙুলগুলো ফুলটাকে যে ছুঁতে পারে না, বাইরের নিরবচ্ছিন্ন ধূসরতায় এই লাল-রঙটাই যে একমাত্র রঙ—এতেই অবস্থাটা কেমন অদ্ভুত ঠেকে।

কাচের ভেতর দিয়ে অশ্বিনী বাইরের কোনো দৃশ্য দেখতে পায় না। অথচ জানলাটা খোলা থাকায় মনে হয় বাইরের কিছু দেখা যাবে হয়তো। জানলার পর্দাটা টানা থাকলে ঘরের ভেতরের এই কুয়াশাহীন ছায়াচ্ছন্নতা আর আগুনের তাপটা সম্পূর্ণ হতে পারত।

কিন্তু বাইরের ঐ কাচের ওপারে অবয়বহীন কুয়াশার ধূসর বিস্তার এই ঘরের নিরাপত্তাটুকুকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়।

তিনজনের কেউই কোনো কথা বলেন না। টেবিলের নিচে একটা হিটার থেকে একটা মৃদু উত্তাপ পায়ে লাগে কিন্তু পায়ের পাতা জুতো মোজায় ঢাকা থাকলেও ঠাণ্ডা। হিটারের তাপ মুখে এসে লাগে। আবার কখনো কখনো সামনে মেলে রাখা হাতদুটো আগুনে তাতিয়ে চোখের ওপর, কপালের দুপাশে রাখা হচ্ছে।

ফ্যাক্টরিবাবু চোখ বুঁজে তাপ নিচ্ছিলেন, লামা মাথা নিচু করে। অশ্বিনী সেই জানলার দিকেই তাকিয়েছিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে অশ্বিনী টের পায় যে কাচের জানলার গায়ে লেপ্‌টে থাকা কুয়াশা অনড় নয়। কোথাও কোথাও কুয়াশা সরে যাচ্ছে, আবার কুয়াশার নতুন পুঞ্জ আসছে। এই সরে যাওয়া আর আসাটা এমন যে মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই। অশ্বিনী টের পায় কুয়াশার একটা গতি আছে, প্রায় মেঘের মতোই কিন্তু বাতাস না থাকায় সেই গতিটা বোঝা যায় না। আর মেঘের রঙ নানারকম হওয়ায় গতি যেমন একটা আকার নেয়, কুয়াশার বেলায় সেটাও ঘটে না। সমস্তটাকে একটা জলীয়, ধোঁয়াটে বস্তু মনে হয়।

এই শীতে, এই কুয়াশায়, এই ফ্যাক্টরির অফিস ঘরে কাচের জানলার সামনে বসে অশ্বিনীর কাছে দার্জিলিং, পূজোর সময়ের হৈ হৈ, নানা জায়গায় ছোটাছুটির সেই অভিজ্ঞতা অবাস্তব মনে হয়। যেন কোনোদিন ঘটে নি। টগরের কথা মাঝেমাঝে মনে হয়, দার্জিলিঙে যেতে ইচ্ছে করে, চলেও যেতে পারে বা, এখুনি-ই, কিন্তু যেন এই এখনকার যে টগরের কাছে সে যাবে, তার সঙ্গে সেই বরাবরের টগরের কোনো সম্পর্ক নেই, মিলও নেই, এখনকার টগরের গায়ে হাতাছাড়া লম্বা ফ্রকের মতো একটা কোট, গলার কাছে মালার মতো আর স্তন দুইটির মাঝখান দিয়ে একটা নকশা নেমে এসে তলপেটের দুদিকে ছড়ানো। শীতের জামা-কাপড় কেনবার

জন্য ভট্চাযের সঙ্গে দোকানে ঢুকে দোকানির হাতে ঝোলানো নেহাৎই বালিকাদেব যোগ্য সেই কোটটা দেখে সেই নভেম্বরে অশ্বিনীর প্রথমে মনে হয়েছিল টগরের কথা। বুঝেছিল স্তন আর তলপেটটা স্পষ্ট করার জন্যই ঐ কোটের ঐ কাট্ আর নকশা। কোটটার ওপর চাদর জড়িয়ে গোবিন্দবাবুরও সামনে হয়তো টগর পরতে পারত। কিন্তু পূজোর বাজারে এত খরচের পর আবার অশ্বিনী এত খরচার টাকা পায় কোত্থেকে এই হিসেবটা যে ব্যাঙ্কের অফিসার গোবিন্দবাবু মেলাতে চাইবেন। গোবিন্দবাবু যদি ব্যাঙ্কের অফিসার না হতেন তাহলে যেন কোটটা কেনা অশ্বিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল।

পোশাকটি কিনতে না পারায় অশ্বিনীর ভেতরে ভেতরে একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়। বুক পেটে নকশা আঁটা টগরকে দেখার এতই সাধ অশ্বিনীর যে, সে টগরকে দোকানে নিয়ে গিয়ে পোশাকটা পরিয়ে একবার দেখে নেয় না, টগরকে বলেও না কিছু,—কিন্তু ভেতরে ভেতরে দুই মাস ধরে ঐ পোশাকেই টগর তার নিজেরও অজ্ঞাতে অশ্বিনীর ঘনিষ্ঠ থেকে যায়।

একটি মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে তার পোশাকসহ নানাভঙ্গি অনেকদিন জুড়ে ধীরে ধীরে কেমন যোগসূত্রহীন মনে থেকে যায়। কিন্তু মনে মনে টগরের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার জন্য পরিচিত পোশাকসহ নানা ভঙ্গিতে পরিচিত টগরকে মনে মনে অশ্বিনী এমন পোশাক পরায় যাতে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে ওঠে। নাকি, ঐ নতুন অপরিচয়ই টগরের সঙ্গে নতুনতর ঘনিষ্ঠতার টানে অশ্বিনীকে টানে। মাত্র সাত-আট মাসের ভেতর অশ্বিনীর এমন কি তাড়া যে মনে মনে টগরকে বদলে ফেলতে চায়। সম্পর্ক পাল্টানোর মতো প্রয়োজনীয় অভিঘাত সৃষ্টির মেহনত তো অশ্বিনীর পোষায় না—তাই মনে মনে চেহারা পাল্টানো, সম্পর্ক পাল্টানোর খেলায় মাতলে তাকে কে ঠেকায়।

চারদিকের এই কুয়াশায়, যখন হাতের আঙুলগুলো দেখা যায় না, নিশ্বাস ধোঁয়া হয়ে নাকের ডগায় ঝোলে, তখন অশ্বিনীর কাছে অনড় সত্য মিশরী পোশাক পরা টগর। এখন এই ঘোর শীতে সেই কল্পনার দাবিকে সরানো অশ্বিনীর ক্ষমতার বাইরে।

চার

আবার সেই মিশরী পোশাকে টগরের চেহারাটা ভেসে ওঠায় অশ্বিনী উঠে দাঁড়ায়। এক হ্যাঁচকায় জানলার পর্দাটা টেনে দেয়,—ফ্যাক্টরি-বাবু একটু হাসেন,—তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে অশ্বিনী কলবাবুর অফিসের দিকে চলে। সেখানে খানিকটা বসে ফিরবে।

কিন্তু ফ্যাক্টরির ভেতর একটু এগিয়েই অশ্বিনীকে থেমে যেতে হয়। ফ্যাক্টরির ভেতরে কোনো লোকজন নেই, ফলে অনেক বড় দেখায়। নানা জায়গায় নানা আলো, কোথায়, কত গভীরে বোঝা যায় না। কিন্তু যেখানেই আলো পড়েছে সেখানেই দলা পাকানো কুয়াশা। যেখানে আলো পড়ে নি, সে জায়গাটা বরং খানিকটা পরিষ্কার। ফ্যাক্টরির ভেতরের সেই লম্বা শেডগুলি যেন আলোকিত কুয়াশা আর কুয়াশাহীন অন্ধকারের ছককাটা। সেই ছকের কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা নেই, প্যাটার্ন নেই। ফলে ফ্যাক্টরির ভেতরটা অনির্ণেয় কতকগুলি গভীরতা আর আলোঠেকানো কুয়াশাস্তূপের শাদা দেয়ালের কঠিনতায় অশ্বিনীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ঠেকে। এর ভেতর দিয়ে পথ করে কোথাও যাওয়া যাবে না।

কোথাও কেউ চায়ের স্তূপের ভেতর বাতাস চালিয়ে ধুলো ঝাড়তে শুরু করে দিয়েছে। চায়ের মরচে-রঙা ধুলো কোনো একটা আলো-কিত কুয়াশাপুঞ্জের ভেতর ঢুকে যায়। প্রথমে জলরেখার মতো সরু, আঁকাবাঁকা, তারপর রেখাটা গলে যায় আর কুয়াশাপুঞ্জটির রঙ শাদা

থেকে বদলে যায় পাতলা মরচে রঙে। কোথা দিয়ে যে সেই মরচে-রঙা ধূলো এঁকে বেঁকে, গড়িয়ে গড়িয়ে, ওপরনিচ হয়ে, মাটির ওপর দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে আর আলোতে দৃশ্যমান কোন কোন কুয়াশাপুঞ্জের রঙ পাল্টে আবার কোন অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে, বোঝা যায় না। বিমূঢ় অশ্বিনী শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে জনমনিষ্যিশূন্য দৈর্ঘপ্রস্থের সীমালুপ্ত সেই আলোকিত কুয়াশা আর অস্পষ্ট অন্ধকারের শাদা-কালো নানা অংশের ছক মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ পাল্টাচ্ছে। যা মনে হচ্ছিল শাদা দেয়ালের মতো শক্ত, তাই হয়ে উঠল জলের মতো তরল। কোথাও সম্পূর্ণ শাদা অংশটাই একটা মরচে রঙের গোলক হয়ে শূন্যে ঝোলে, কোথাও গোলকের এক অংশ মরচে-রঙা আরেক অংশ শাদা, কোথাও মরচে রঙটা সাপের মতো কিলবিলিয়ে এগিয়ে আসছে বা কুণ্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছে। অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত ফ্যাক্টরি শেডের ভেতর এই রঙের আবর্তন দেখতে দেখতে অশ্বিনী স্বস্তি বোধ করে, কতদিন সে দৃষ্টি এমন দীর্ঘ ফেলে নি, কতদিন সে ধূসরতাছাড়া আর কোনো রঙ দেখে নি।

যখনই অশ্বিনী রঙের আবর্তনে স্বস্তি পেতে শুরু করে, তখনই তার বেণুর কথা মনে পড়ে যায়। বেণু তাকে দার্জিলিং পাহাড়ের আনাচেকানাচে কত অদ্ভুত সুন্দর জায়গার কথা কতবার বলেছে! কোথায় নাকি একটা সরু নীল ঝর্ণা আছে, ওপরে নয়, নিচে নয়, একটা বিশেষ জায়গায় অনেকখানি জুড়ে সেই ঝর্ণার জলের রঙ নীল। কোথায় নাকি একটা শুকনো নদীখাত আছে, সেখানে বহু-কাল জল নেই, দুপাশে পাহাড়, খাতভরা বালি আর নুড়ি পাথর আর নুড়ি পাথরগুলো যেন সমুদ্রের ঝিনুক, অদ্ভুত সব সুন্দর রঙ, কোনো একটি নুড়ির রঙ ও নকশার সঙ্গে আর-একটা নুড়ির রঙ ও নকশা মেলে না। কুয়াশা দেখবার জন্য বেণু অশ্বিনীকে সিঞ্চল হ্রদে নিয়ে যাবে বলেছিল। আর এইসব জায়গার গল্প করার সময়, যদিও বেণু কখনো পরিষ্কার বলে নি তবু বোঝা যায়, বেণু বলতে চায়

দার্জিলিঙে এর বাড়ি ওর বাড়ি ঘুরে কি লাভ হয়, এই মিটিং ঐ মিটিং করে কি লাভ হয়। শোনার সময় অশ্বিনী খুব মন দিয়ে শুনত আর বলত, 'এইবার আপনার সঙ্গে কয়েকদিনের প্রোগ্রাম করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে', কিন্তু কোনোবারই তা করা হয় নি। আর সেই যে পূজোর সময় সারা গায়ে মরচে রঙা ধূলোমাখা অশ্বিনীকে দেখে বেণু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে বেণু আর খুব স্বাভাবিকভাবে অশ্বিনীর সঙ্গে কথা বলে না, গল্পগুজবও প্রায় করে না। যাকে দেখে স্বামী বলে মুহূর্তের ভ্রম হয়েছিল, তার সঙ্গে বেণু আর স্বাভাবিক ব্যবহার করে কি করে। কিন্তু অশ্বিনীর তাই বলে বেণুকে মনে পড়ে যায় কেন যে কুয়াশার রঙ-বদলের এই ঘটনা আজ বেণুকে বললে বেণু কত খুশি হবে ভেবে বেণুকে আরো বিশদ বলার জন্য আরো মন দিয়ে দেখে নেয়—কুয়াশাপুঞ্জের রঙ একটাই নয়—কোথাও নীলচে, বোধ হয় টিউবের আলোতে, কোথাও কমলা, বোধ হয় ফ্লাডের আলোতে। ফলে মরচে-রঙা স্রোতের সঙ্গে মিশে কুয়াশার পুঞ্জগুলো একই রঙে বদলে যায় না। একই রঙের নানা সন্নিপাতে অশ্বিনীর চোখের সামনে আস্ত একটা সূর্যাস্তের আকাশ চলকে উঠে।

দাঁড়িয়ে থেকে কুয়াশার এই রঙ-বদলানো দেখে ধীরে ধীরে অশ্বিনী পেছন ফেরে, যেন বোঝে, এত সজীব কুয়াশার ভেতর দিয়ে পথ করে এগোনো ঠিক হবে না। এই এত রঙ আর এত বিস্তারের গল্প বেণুকে বলার মতো করে দেখা হয়ে গেছে এমন ভাবে অশ্বিনী ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে আবার ধূসর, অনড়, ভারি কুয়াশার ভেতর ডুবে কোয়ার্টারের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

কয়েক পা হেঁটেই অশ্বিনী বোঝে সে শীতের প্রচণ্ড তীব্র চাপের কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে ছিল। সেই সুযোগে বাইরে কয়েক পা-র ভেতরই শীত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। সচেতন হয়ে অশ্বিনী জোরে জোরে পা ফেলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোলাপ দরজা খুলে একটু ফাঁক করে। সেই ফাঁক দিয়ে গলে ঘরের ভেতরে ঢুকেই অশ্বিনী দরজা বন্ধ করে দেয়। অশ্বিনীর গায়ের সঙ্গে লেপটে খানিকটা কুয়াশা আর শীত তবু ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। দরজা আটকে দিয়ে অশ্বিনী ঘরের ভেতর দিকে মুখ ফেরায়, সামনে গোলাপ দাঁড়িয়ে। অশ্বিনী হাসার পর, অশ্বিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে গোলাপ হাসে, তারপর বলে, "বাইরে থেকে তো ঠাণ্ডা নিয়ে এলে, এখন আবার ঘর গরম হতে কত সময় নেবে?" বলেই গোলাপ অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে থাকে, ততক্ষণে গোলাপের চোখ থেকে অশ্বিনী চোখ সরিয়ে নিয়েছে। আর কথাটা বলা হয়ে যাবার পরও যে-হাসিটা গোলাপের মুখে লেগে না থাকলে কথাটার অর্থই পাল্‌টে যাবে সেই হাসিটা ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে মুছে যায়। ততক্ষণে অশ্বিনী গোলাপকে ছাড়িয়ে ঘরের ভেতর এগিয়ে গেছে। গোলাপ একজায়গায় দাঁড়িয়ে খুব আস্তে অশ্বিনীর দিকে ঘুরে যায় যেন অশ্বিনী কোথায় যায়, কী করে, দেখছে সে, মাত্র এইটুকু একটা ঘরেও অশ্বিনী অনিশ্চিত ঠেকে গোলাপের কাছে। সোজা গিয়ে অশ্বিনী খাওয়ার টেবিলে চেয়ার টেনে বসে পড়ে, দুই হাত একবার রগড়ে গ্লাভস খুলতে খুলতে বলে, "দাও, খেতে দাও, রান্না হয় নি?" শুনেই গোলাপ অশ্বিনীর গায়ের শীত আর কুয়াশায় ঘরের যে ফালিটুকুর বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল সে-টুকুকে আবার গরম করতে করতে খাওয়ার টেবিলের কাছে এসে যায়। "একটু দাঁড়াও, এখুনি দিচ্ছি।" গোলাপ রান্নাঘরের দিকে যায়। পেছন থেকে অশ্বিনী বলে, "আবার দেওয়া কি, তোমারটাও নিয়ে এসো।" গোলাপ দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘুরে অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে আবার

হাসে। তারপর বলে, "আহা-হা, আমার আর কাজ নেই?" বলেও গোলাপ দাঁড়িয়েই থাকে, অশ্বিনীর দিকে একটু চিবুক নামিয়ে তাকিয়ে, হেসে। অশ্বিনীও হাসি মুখেই তাকিয়েছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অশ্বিনী দেখে হাসির ভঙ্গিতে স্থির গোলাপের মুখে চিবুকের মাংসের দুটো পিণ্ড, ওপরের ঠোঁটের তুলনায় নিচের ঠোঁটটা বেশি ছড়িয়ে গেছে, ঠোঁটের দুই কোণায় দুটো গভীর ভাঁজ, চিবুকটা নামানো বলে গলায় ভাঁজ, চোখটা ওঠানো বলে কপালে ভাঁজ। হাসবেই যদি, গোলাপ পুরোপুরি হাস্থক। বা না হাসে যদি ঠোঁটটা বন্ধ করে দিক—এমন ভঙ্গিতে থাকে কেন যেন অশ্বিনী অনুমতি দিলে হাসবে আর অশ্বিনী না চাইলে হাসবে না। অশ্বিনী চোখটা টেবিলের ওপর নামিয়ে আনে। গোলাপ, তারও একটু পরে, পেছন ফিরে রান্নাঘরের দিকে যায়।

গোলাপ একবাটি গরম জল এনে রাখে। তাতে ডুবিয়ে কচলে অশ্বিনী দুহাত ধুয়ে নেয়। গরম জলের ঘন ধোঁয়া অশ্বিনীর মুখ ভিজিয়ে দেয়। আরাম বোধ করায় অশ্বিনী মুখটা একটু এগিয়ে আনে।

একটা ট্রের ওপর ভাত আর মাংসের বউল নিয়ে গোলাপ টেবিলের ওপর রাখে, এত গরম, ধোঁয়া বেরচ্ছে, টেবিলের ওপর উপুড় করে রাখা ডিসদুটো অশ্বিনী চিৎ করে দেয়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, "খোকন কোথায়?" "ঐ তো ঘুমোচ্ছে।" অশ্বিনী এতক্ষণে দেখে খোকন খাটের ওপর ঘুমোচ্ছে। "আজ যে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল?" "কি আর করবে? বেরবার তো আর উপায় নেই" —বলতে বলতে গোলাপ অশ্বিনীর ডিসে ভাত দেয়। ভাতে হাত দিতে দিতে অশ্বিনী বলে, "এখন তো একটু পড়াতে বসালে পার।" ভাত দেয়া থামিয়ে গোলাপ অশ্বিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝে নিতে চেষ্টা করে কথাটা বলার জন্যই বলা, নাকি, কোনো জবাব অশ্বিনী চায়,—সে তো খোকনকে পড়ায়ই। অশ্বিনী গত ক-মাসে

নানারকম পাল্টে গেছে, গোলাপ-ও, সুতরাং গোলাপ-অশ্বিনীর দাম্পত্যও। এই সমস্ত পরিবর্তনের প্রধান উৎস অশ্বিনী। গোলাপকে তাই অশ্বিনীর পরিবর্তনের সঙ্গতি রাখতে হয়। এমন বউলে সাজিয়ে গুছিয়ে টেবিলে খাবার নিয়ে আসাটাও গোলাপের পক্ষে নতুন,—এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। আবার, অশ্বিনীর কোনো কথা থেকে তার মন আন্দাজ করার চেষ্টাটাও গোলাপের পক্ষে নতুন,—এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে আসছে। কিন্তু এই দুটো নতুন কাজ একসঙ্গে করতে পারে না এখনো। তাই অশ্বিনীর কথার মানে বুঝতে গিয়ে ভাত দেয়া থামাতে হয়, তারপর নিজের ডিসে ভাত নিতে হয়। মাংসের বউল থেকে ঝোল-মাংস তুলে প্রথমে গোলাপের ডিসে দেয় অশ্বিনী, তারপর নিজে নেয়। তাতে গোলাপ যেন খানিকটা থতমত খায়, মাংসের চামচটা অশ্বিনী রেখে দিতেই গোলাপ তাড়াতাড়ি এক চামচ মাংস-ঝোল তুলে অশ্বিনীর ডিসে দেয়। অশ্বিনী প্রস্তুত ছিল না বলে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নেয়। এখুনি অশ্বিনী বলবে, "এত তাড়াহুড়ো কিসের," তাই গোলাপ ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে ভাতে হাত দেয়। কিন্তু অশ্বিনী মুখ না তুলে বলে, "রোজ রাঁধতে রাঁধতে মাংসরান্নাটা তোমার বেশ রপ্ত হয়ে গেল।" "আজ কেমন হয়েছে ?" "ভালো! গরম থাকলেই ভালো লাগে" "গরম নেই ?" ডিস থেকে হাত উঠিয়ে গোলাপ চেয়ারের ওপর সোজা হয়, এখুনি গিয়ে মাংসটা আবার গরম করে আনার প্রস্তুতিতেই যেন। "দেখছ তো ধোঁয়া উঠছে, নিজেও তো খাচ্ছ"—অশ্বিনী কথাটা শেষ করার আগেই গোলাপ আবার শিথিল হয়ে তাড়াতাড়ি ভাত মাখতে সুরু করে। নিজের হাতের স্পর্শের সাক্ষ্যের চাইতেও গোলাপ যে অশ্বিনীর মুখের কথাকেই অধিকতর সত্য ভাবে, সেই অস্বস্তিতে অশ্বিনী মাথা নিচু করে ভাত চিবিয়ে যায়। আর গোলাপ সমস্ত ব্যাপারটা থেকে সরে আসতে তাড়াতাড়ি গ্রাসের পর গ্রাস ভাত মুখে পোরে।

দুই

খানিকক্ষণ পর, যখন অশ্বিনী একটু হেসে জিজ্ঞাসা করতে পারে, "আজ কার মতো করে রেঁধেছ," তখন গোলাপের মুখের ভাত ভেতরে। তাড়াতাড়ি ঢোক গেলার চেষ্টায় ভাত গলায় আটকে যায়, অশ্বিনীর দিক থেকে মুখটা বাঁ-দিকে সরিয়ে গোলাপ তাড়াতাড়ি জল খায়। জল গিলতে গিয়ে বিষম লাগে। মুখটা ঢেকে কেশে নিয়ে জল খায় গোলাপ। কিন্তু জলটা বুক থেকে নেমে যাওয়ার আগেই শুধিয়ে বসে, "ভালো হয় নি, বুঝি?" বাক্যটি শুনে বোঝা যায়, খুব অব্যস্ততার ভাব আনতে চেয়েছিল গোলাপ, এই মুহূর্তে যেমনটি অশ্বিনীর ভালো লাগবে বলে তার মনে হচ্ছে। কিন্তু বিষম লাগায় কথাটা গলা থেকে বেরলো ঠেকে-ঠেকে, চোখেও একটু জল চিকচিক করে, বলার পর গলাটা একটু ঝাড়তে থাকে। ফলে কাতর শোনায়। অশ্বিনী এতক্ষণ ডিসের ওপর থেকে মাথা না তুলে ভাত মুখে দিয়ে যাচ্ছিল, যেন সে জানে মুখ তুললে গোলাপ আরো অসুবিধেয় পড়বে। এতক্ষণে মুখ তুলে একটু হেসে বললো, "রান্না খুব ভালো হয়েছে, গরম ছিল, খুব ভালো খেয়েছি, হয়েছে তো?" "কিন্তু তুমি তো আর ভাত নিলে না?" প্রশ্রয়ের সুরে অশ্বিনী বলে, "দাও, এক-চামচ, কিন্তু, এক চামচই!" গোলাপ অশ্বিনীর ডিসে একচামচ ভাত তুলে দেয়। একচামচ মাংসের ঝোল আর এক পিস্ মাংসও। "আজকের রান্নাটা একটু মিষ্টি হয়েছে, না?" "হ্যাঁ, মিষ্টি-ই তো করলাম। তুমি তো পছন্দ করো!" গোলাপের হাতে এক পিস মাংস। কথাটা বলে সে মুখে দেয়। "হ্যাঁ, ভালো হয়েছে।" গোলাপ বলে, "তুমি ওঠো না, আমার তো হয়েই গেছে।" চেয়ারে সোজা হয়ে, বাঁ হাতটা টেবিলের ওপর ভর দেয়ার ভঙ্গিতে আর ডান-হাতটা আলগোছে রেখে অশ্বিনী বলে, "হ্যাঁ। আজ আবার দার্জিলিঙে যেতে হবে।" কথাটা বলা যখন শেষ হয়, অশ্বিনী তখন

দাঁড়ানো। "এই কেটলিতে গরম জল আছে, নিয়ে মুখ ধোও। আগে বলো নি তো?" গোলাপের বাক্যের শেষ অংশটা আনত বলা, আর, এই শেষ অংশের ওপর অশ্বিনী কেট্‌লি হাতে পেছন ঘোরে। মুখ ধুয়ে কেট্‌লিটা টেবিলে রাখতে রাখতে অশ্বিনী "অফিসে গিয়ে শুনলাম, সানিভ্যালি হয়েও যেতে হতে পারে" বলে ফেলে দেখে মাংসের একটা হাড় বাঁ গাল ডান গাল করে গোলাপ আত্মমগ্ন ভাঙার চেষ্টা করছে। না বললেই হতো, কেমন কৈফিয়তের মতো শোনাল, ভাবতে ভাবতে অশ্বিনী বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়ায়—গোলাপের খাওয়া শেষ হতে দেরি হবে কিছুটা।

শোয়ার ব্যাপারটা কিছুদিন হলো পালটে গিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা থেকে অশ্বিনীকে প্রায়ই মদ খেয়ে যেতে হয়। বাড়িতে বোতল থাকে। আগে বাইরের ঘরে বসে মদ-টদ খাওয়া শেষ করে ভেতরের ঘরে যেতে হতো। সেই অসুবিধে আন্দাজ করেই ভট্‌চাজ খবর দিয়েছিল কোন্ বাগানের সাহেবের ফার্নিচার বিক্রি হচ্ছে। বিদায়ী সাহেবের এত রকম ফার্নিচারের ভেতর এই স্প্রিঙের ডিভানটাই প্লেনভিউয়ের ট্রাকে ভট্‌চায চাপিয়ে দিয়েছিল কেন, যদি সে অশ্বিনীব অসুবিধেটা প্রায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মতো না বুঝবে। এখন অশ্বিনী বাইরের ঘরে এই ডিভানের ওপবই শোয়। পাশে বেড-সাইডে কয়েকটি ছোট বড় বোতল আর গ্লাস। বেডসাইডের চাবি হয় অশ্বিনীর পকেটে, নয় ওঘরে ওয়াড্রোবের ভেতরে। সারা সন্ধ্যা জুড়ে সম্পূর্ণ একা একা দীর্ঘ মদ খেতে অশ্বিনীর ভালো লাগে। মাঝেমাঝে গোলাপ ঘুরে যায়, ভাজাভুজি দিয়ে যায়। ভালো লাগে।

তার কৈফিয়তের সুরে গোলাপ কি আস্থা পেল? তাহলে খাওয়া দাওয়ার পর এ-ঘরে আসবে না। না-এলে, এখুনি অশ্বিনী রওনা দেবে। আর, এলে, ঘুমিয়ে-টুমিয়ে বিকেল নাগাদ যাবে।

তিন

পোশাকআসাক জুতোমোজা গ্লাভ্‌সটুপি সমেত ডিভানটার ওপর অশ্বিনী চিৎপাত শুয়ে পড়ে, একটা পা তার বাইরে ঝুলে থাকে। চোখ বন্ধ করতেই অশ্বিনী রঙিন কুয়াশার রঙ-বদল দেখতে থাকে আবার, অপ্রস্তুত। আর আনুষঙ্গিক বেণুকে মনে পড়ে যায়, অব্যবহিত। সেই যে দার্জিলিঙে আসার পর বোটানিক্‌সে বেড়াতে গিয়েছিল! এতদিন পর এখন এই মধ্যশীতে অশ্বিনী সেই বোটানিক্‌সের সূত্রপাত থেকে বেণুর সঙ্গে সম্পর্কটাকে যেন স্বাভাবিক গড়ন দিতে চায়। কিন্তু বেণু কেমন একেবারে বদলে গেছে। এতবার বেণুর মুখোমুখি হয়েও যে-বদল যেন তত লক্ষ্য করতে পারে নি অশ্বিনী, এখন যেন সেই বদলগুলো অনেক বেশি করে ধরা পড়ছে। ফ্যাক্টরির অফিসঘরে টগরের সঙ্গে বেড়াবার ইচ্ছেয় দার্জিলিঙে যাবার যে-কথা প্রথমে মনে এসেছিল, তাই এখন বেণুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কতটা বদলে গেছে বেণু তা দেখবার জন্যই যেন জরুরি হয়ে পড়ল। টগর আর কোথায় নিয়ে যাবে অশ্বিনীকে? দার্জিলিঙও তো ফাঁকা। বেরতে না-বেরতেই সন্ধ্যা। আর কুয়াশা আর শীত। বরং কোথাও না বেরিয়েও ঘরে বসে বেণু যেন অশ্বিনীকে এই কুয়াশা আর শীতের শেষ চরম চাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

আসলে, অশ্বিনী নিজের ওপর চটে গেছে। সে আজ এখন দার্জিলিঙে যাবে, এ-কথাটা বলার জন্য খাওয়ার শেষে টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় একটা ভঙ্গির আশ্রয় তাকে নিতে হলো কেন। মুখ ধুয়ে ফেরার সময় কৈফিয়তের সুরে সানিভ্যালির নাম বললো কেন— সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখন গোলাপকে ডেকে তো আর বলা যায় না, আমার ইচ্ছে, আমি দার্জিলিং যাচ্ছি। কিন্তু সেটি বলতে পারলে ভালো হতো। আর গোলাপ তো কখনো এ-কথা আভাসেও অস্বীকার করে নি যে অশ্বিনীর যেমন ইচ্ছে, অশ্বিনী সে-রকমই

করবে। তাহলে অশ্বিনীর আজই এমন সন্দেহ হয় কেন যে তার কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গি থেকে গোলাপ এতদূর পর্যন্ত জেদি হয়ে উঠতে পারে যে খাওয়ার পর এ-ঘরে এলোই না। আর, এখুনি দার্জিলিং রওনা হওয়ার জন্য গোলাপের ওপর রাগ দেখাবার দরকার বোধ করে বসে কেন অশ্বিনী, আজই।

ডিভানের ওপর চিৎপাত চোখ বুঁজে শুয়ে অশ্বিনী বোঝে, আসলে গোলাপের, তার বউয়ের যেমন যেমন ভাবা বা করা স্বাভাবিক, সে সে-রকম ভাবে না, করে না,—পারে না বলেই ভাবে না, করে না। অশ্বিনীর সার্বিক স্বাধীনতা নানা সম্পর্কের জটিলতায় অশ্বিনীকে এমন করে বেঁধে ফেলে যে কোনো একটি সম্পর্কের সমস্ত কার্যকারণ বুঝে উঠতে পারে না, ব্যাখ্যা করতে পারে না—সুতরাং সেই ব্যাখ্যা বা বোঝা অনুযায়ী নিজেকে চালাতে পারে না। কোনো একটি সম্পর্কও যেখানে অশ্বিনী গড়ে তোলে নি, সেই সম্পর্কের ভেতরে টানাপোড়েনে তার কোনো ভূমিকা নেই যখন—তখন কেন তাকে গোলাপের কাছেই আজ শেষ পর্যন্ত একটা কৈফিয়ত দিতে হয়, অপ্রয়োজনীয়। নিজের ওপর অশ্বিনীর এতই রাগ হয় যে, আজ দার্জিলিঙে না-গিয়ে সে তার নিজের ওপর বদলা নেবে, সকলের সঙ্গে তার নানারকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার স্বাধীন নিষ্ক্রিয়তা রক্ষা করবে—যখন সে এ-রকমই প্রায় ভাবতে শুরু করে, তখনই এ-ঘরে গোলাপের পায়ের শব্দ পায়। মনে মনে অশ্বিনী হাঁফ ছাড়ে। কিন্তু চোখ খোলে না।

অশ্বিনী বুঝতে পারে গোলাপ তার জুতোর ফিতে খুলছে। খোলা হয়ে গেলে গোলাপ যখন জুতো ধরে টানে, অশ্বিনীও পা-টা বের করে। গোলাপ কি অচেতন অশ্বিনীর জুতো একা একা খুলতেই বেশি পছন্দ করত? গোলাপ অশ্বিনীর টুপিটা টানে, অশ্বিনী ঘাড়টা একটু তোলে। গোলাপ জ্যাকেটে হাত দেয়। অশ্বিনী হাত তুলে বাধা দেয়। গোলাপের পায়ের শব্দ এ-ঘর থেকে মেলাতে

মেলাতে ও-ঘরে যায়, ও-ঘর থেকে সরব হয়ে এ-ঘরে ঢোকে। গোলাপ অশ্বিনীর ওপর প্রথমে কম্বল, তার ওপর লেপ ছড়িয়ে দেয়। অশ্বিনীর মাথাটা বালিশের ওপর তুলে দিতে গোলাপকে ডিভানের একপাশে একহাঁটু ভেঙে আধবসা হতে হয়। পারে না যে তা কি অশ্বিনী মাথা শক্ত করেছিল বলে। জোড়াসনে বসে অশ্বিনীর মাথাটা দুহাতে নিজের কোলের ওপর তুলে নিতে হয় গোলাপকে। কিন্তু তবু গোলাপ পারে না। তখন অশ্বিনীর বুকের দুপাশে দুপা দিয়ে দাঁড়িয়ে, নিচু হয়ে, অশ্বিনীর মাথাটাকে টেনে তুলে বালিশের ওপর রাখে। কিন্তু তারপর গোলাপ নেমে আসে না। ঐ ভঙ্গিতেই অশ্বিনীর ওপর বসে পড়ে; জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেডসাইডের চাবি খোঁজে। না পেয়ে তাকে নামতেই হয়। আবার অশ্বিনীকে শুনে যেতে হয় গোলাপের পায়ের শব্দ এ-ঘর থেকে ও-ঘরে মিলিয়ে যায় আবার ফিরে আসে। গোলাপকে এমনিভাবে বসে বেডসাইডের চাবি খুঁজতে হবে জানলে আগেই চাবিটা পকেটে রেখে দিত।

অশ্বিনী ঘুমিয়ে নেই বুঝতে পেরেও তার চোখ বুঁজে পড়ে থাকার সুযোগে জুতো খোলা আর বালিশে মাথা তোলার মতো প্রায় স্বয়ংক্রিয় উদ্যমের ব্যাপারেও অশ্বিনীকে নির্ভরশীল করে ফেলার কত চেষ্টা গোলাপের আর দাঁতে দাঁত চিপে, চোখ কান বুঁজে পড়ে থেকে, শরীরের প্রায় স্বয়ংক্রিয় উদ্যমকেও বিবশ রেখে, গোলাপকে উদ্যমের স্বাধীনতায় উত্তেজিত করতে কত চেষ্টা অশ্বিনীর। এতগুলো বয়সের অভ্যাসে কিছুটা আত্মনিগ্রহের, নিদেন ভারবহনের, প্রসঙ্গযুত না-হলে গোলাপ স্বাধীন কোনো উদ্যম পায় না। তাদের দাম্পত্যের রীতি তেমনি হয়ে উঠেছে।

চার

গোলাপ এবার অশ্বিনীর ডান দিকে চলে আসে। চাবি ঘোরানোর আওয়াজ তারপর কাচের টুং টাং। তারপর, জলের তরল ধ্বনি।

গোলাপ গেলাসে মদ ঢালছে। গোলাপের জানা হয়ে গেছে একবারে গ্লাসে কতটা ঢালতে হয়, কতটা জল বা সোডা মেশায় অশ্বিনী, কতক্ষণ ধরে কতটা কখন পান করে। চাবি না খুলে বেড-সাইডের পাল্লা আবজানোর মৃদু আওয়াজ। গোলাপ ওঠে। ডিভানটা ঘিরে গোলাপের পায়ের শব্দ অশ্বিনীর বাঁয়ে আসে। এখন যদি অশ্বিনী চোখ খুলে হাত বাড়িয়ে গেলাশটা না নেয় তাহলে কি গোলাপ পাশে বসে, যেমন শিশুকে দুধ খাওয়ানো হয়, তেমনি আধাঘুমন্ত অশ্বিনীর ঠোঁট ফাঁক করে একটু একটু ঢেলে দেবে, ঝিনুক দিয়ে। নিজের মরদের সঙ্গে লিপ্ত হতে গোলাপকে মা আর শিশুর এই সাবেকি রাস্তাটাই ধরতে হয়।

অশ্বিনী চোখ খুলে প্রথমে গোলাপের দিকে তাকিয়ে হাসে। গোলাপও হাসে। আর সেই হাসিতে অশ্বিনীর অনুমোদনের কোনো অপেক্ষা নেই। কিন্তু যেই অশ্বিনী বাঁ হাতের ওপর মাথাটার ভর রেখে ডান হাতে গেলাসটা গোলাপের হাত থেকে নিয়ে একটা ছোট চুমুক দেয়, অমনি গোলাপের হাসিটা নিবে যায় আর তার মুখমণ্ডলে অভ্যস্ত সন্ত্রস্ততা ফিরে আসে। অশ্বিনী হাসিমুখে লেপটা তুলে বলে, "ভেতরে এসো"—

"না, ও-ঘরে খোকন আছে, আমি যাই" গোলাপ দরজার দিকে আধঘোরা হয় কিন্তু অশ্বিনীর আবার ডাকার সময়টুকু পেরিয়ে গেলেই সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে, বিড়ালের মতো, জোড়-পায়ের একটি হ্রস্ব দ্রুত লাফে ডিভানের ওপর উঠে তার সমস্ত পোশাকআসাকসহ লেপের ভেতর ঢুকে যায়—তার রুক্ষ বেণীটা শুধু অশ্বিনীর গলা বরাবর পড়ে থাকে। বাঁ হাতের পাতায় নিজের মাথার ভার রেখে আর ডানহাতে মদের গেলাস ধরে রেখে অশ্বিনী যেন বুঝে উঠতে পারে না সে আর কী করতে পারে।

মাত্র এই ক-মাসের ভেতর দুজনের শরীর দিয়ে দুজনাকে জানা এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেন জানার আর কিছু থাকছে না।

ফলে দুজনার কেউই জানে না কখন তাদের ভূমিকা কী হবে। বাইরে শীতের আক্রমণে পোশাক-আসাকে শরীর প্রায় হারিয়ে যায়। মানুষের চামড়া খুঁজতে কাপড়ের কত স্তর পেরতে হয়। হাতে ধরা গেলাস থেকে পচনের একটা তীব্র গন্ধ অশ্বিনীর নাকে এসে লাগে, যে পচনের গন্ধের সঙ্গে এই কুয়াশা, শীত আর উচ্চতার কোনো সম্পর্ক নেই। গেলাসটা খালি করে সে একবারে গলায় ঢেলে দেয়। এবার যেন অশ্বিনীর শরীরের ভেতরে দগদগে পচা ঘা থেকে পচনের গন্ধ উঠে আসছে—গোলাপ ব্যাণ্ডেজের পর ব্যাণ্ডেজ খুলে সেই পচা গলা মাংস উদ্ঘাটন করে দিচ্ছে। দার্জিলিঙে না পৌঁছনো পর্যন্ত এই পচনের গন্ধ থেকে ত্রাণ নেই—এই কথাটা অশ্বিনীর ক্রমমত্ত মাথায় ক্রমে চেপে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীর নিজের শরীর, তার স্ত্রী গোলাপ ও গোলাপের শরীর সব কিছুকেই একবার যাচাই করে নেবার তাড়না আসে, প্রবল তাড়না।

গোলাপের ওপর উঠে পড়ে অশ্বিনী। শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে আঘাত করার জোর সংগ্রহের জন্য গোলাপের দুই স্তনের ওপর নিজের কনুই দুটো গেঁথে দিতে হয় অশ্বিনীকে। তাই অশ্বিনীর আঙুলগুলো, দশটা আঙুল, গোলাপের গলা পর্যন্ত ছোঁয় কিন্তু কব্জা পায় না। গোঁ গোঁ শব্দে গোলাপ পায়ের আক্ষেপে একটু পেছিয়ে যায়। সেই আক্ষেপ আর গোঁ গোঁ শব্দে অশ্বিনী আরো উদ্রিক্ত হয়। তার শরীরের পেশীগুলোতে পেষণের তাড়না আসে। গোলাপের গলা কব্জা করে সেই তাড়নাটাকে শেষ ধাক্কা দেবার জন্য অশ্বিনী গোলাপের বুক থেকে কনুইয়ের চাপ না তুলেও দশটা আঙুল, গোলাপের গলার দিকে বাড়িয়ে দিলে তার সারা শরীরে একটা টান ধরে, গোলাপের কানের পাশে অশ্বিনীর মাথা নুয়ে আসে আর অশ্বিনীর পায়ুদেশে ঘন তরঙ্গিত স্পন্দন এসে যায়। দীর্ঘ শ্বাস জুড়ে অশ্বিনী গোলাপের কানের নিচে, গলায় তার মুখ ডুবিয়ে দেয়। গোলাপের গলার দিকে বাড়িয়ে দেয়া ডানহাতের দু-তিনটে আঙুল

তার গালের তলা থেকে গ্লাভস্‌সহ বেরিয়ে। বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুল গোলাপের কণ্ঠতট জুড়ে গ্লাভ্‌স্‌হীন পড়ে থাকে, শীতে শীর্ণ, যেন মায়ের বুকে শিশুর হাত ঘুমন্ত। কোনোদিন যদি অশ্বিনীর আঙুলগুলো গোলাপের কণ্ঠমূলে পৌঁছে যায় ?

বিবশ শরীরে ওরা অপরিবর্তিত থেকে যায়, আঘাতে আঘাতে পরস্পরকে জানার যেন এই নিয়ম। গোলাপকে এত নিশ্চিত করে জানার পর বা অশ্বিনীকে এত প্রামাণ্য জেনে নিয়ে অশ্বিনী-গোলাপ পড়েই থাকে। এই নিশ্চিত জ্ঞান থেকে অশ্বিনীর আবার নতুন করে নতুন সব অনিশ্চিত সম্পর্কের দিকে যাত্রা।

এতগুলো সম্পর্কের অনিশ্চয়তায় অশ্বিনী জটপাকানো মাথা আর মন নিয়ে হাতের সবচেয়ে নাগালে পেয়ে যায় সবচেয়ে নিশ্চিত-সম্পর্কের গোলাপ-কে, তার বিয়ে করা বউ-কে। গোলাপ যে তার বউ, সে সম্পর্কে বারবার নিশ্চিত হতে অশ্বিনীর বাধা কোথায় ? আর-সব সম্পর্কের অনিশ্চয়তার জন্য গোলাপের কাছ থেকেই অশ্বিনীর যত দাম আদায়।

সেই দাম দেয়ার জন্য, গত কয়েকমাস ধরে তো বটেই, বিশেষত শীতের এই কঠিন আর বিচ্ছিন্ন মাসকটিতে, গোলাপ তৈরি হয়ে গেছে।

জ্যাঠামশাইয়ের সেই বাড়ি থেকে চাকরির সূত্রে গোলাপকে এমন সম্পূর্ণ নতুন অবস্থায় অশ্বিনী এনে ফেলেছে আর টাকা-পয়সা জিনিসপত্রসহ এই সংসারটা অশ্বিনী এমন ভরিয়ে ভরিয়ে তুলছে যে, অশ্বিনীর সব কিছুই, সব পরিবর্তন বা চাহিদা বা যাচাই সন্দেহ, গোলাপের কাছে ঈপ্সিত পরিবর্তিত অবস্থারই অঙ্গ হিসেবে আসে,—অনেকটা অপরিহার্য অঙ্গ।

পাঁচ

অশ্বিনী চমকে জেগে উঠে দেখে, না, তিনটে বাজে নি। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে মোটা সোয়েটারটা বের করার জন্য ওয়াড্রোবের

দরজা খুলতেই গোলাপ জেগে উঠে দরজায় দাঁড়ায়, "সে কি তুমি এখুনি কোথায় যাচ্ছ, দাঁড়াও চা করে দি" "না, চা খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে, তিনটে বাজতে চললো, এরপর আর বেরনো যাবে না।" খাওয়ার সময় কৈফিয়তের সুরে কথা বলতে হয়েছিল বলে এখন অশ্বিনী গোলাপের দিকে না তাকিয়েই কথা বলে। "রাতে ফিরবে তো?" "এখন বেরিয়ে কি আর রাতে ফেরা যায়?" অশ্বিনী চেয়ারে বসে জুতোর ফিতে বাঁধে। গোলাপ জিজ্ঞাসা করে না অশ্বিনী কোথায় যাচ্ছে, দার্জিলিং না সানিভ্যালি। আর জিজ্ঞাসা যখন করছে না, তখন অশ্বিনী অনির্দিষ্টই রাখতে চায়।

ফিতে বেঁধে অশ্বিনী সোজা হয়ে দাঁড়ায় আর গোলাপও ওভারকোটটা নিয়ে দরজা থেকে এগোয়। দুহাত পেছনে টানটান করে ওভারকোটটা কাঁধের ওপর নিয়ে অশ্বিনী পেছনে হাত বাড়িয়ে বলে, "টুপি?" গোলাপ পাশের ঘরে গিয়ে টুপিটা ছুটে এনে দেয়। অশ্বিনী যখন টুপিটা পরতে থাকে, গোলাপ তখন দরজার ছিটকিনিটা খোলে বটে কিন্তু বাইরের ঠাণ্ডা আর কুয়াশার জন্য দরজাটা চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অশ্বিনী এসে গোলাপের পেছনে দাঁড়ায়। খুব আস্তে দরজাটা একটু ফাঁক করতেই বাইরে থেকে কুয়াশা ঠেলে ঝোড়ো বাতাস দরজার ওপর আছড়ে পড়ে। গোলাপ মুখটা দরজার আড়ালে সরিয়ে ফেললে অশ্বিনী ওভারকোটের বুকের ভেতরে প্রায় ঢুকে যায়। অশ্বিনী দরজার ডান পাল্লাটা ধরে। তারপর গোলাপকে বাঁয়ে রেখে, পেছনে ফেলে, দরজার ফাঁকটুকু জুড়ে দাঁড়ায়। একটা পা বাইরে দিয়ে অশ্বিনী থমকে যায়, বাইরে কুয়াশার ঝড় চলছে। বাতাসের প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে অশ্বিনী দাঁড়ায় বলে পেছন থেকে গোলাপ দুই হাতই অশ্বিনীর পিঠের ওপর রাখে, আটকাতে নয়, নোঙর খুলে নৌকো ভাসিয়ে দিতে গলুইয়ে যেমন দুহাত দিতে হয়, তেমনি। বাতাসের প্রথম ধাক্কা সামলে অশ্বিনী বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। তারপর ওভার-

কোটটা জড়িয়ে নিয়ে বাতাসে এলোমেলো কুয়াশার ভেতর মাথা নিচু করে লম্বা পা ফেলে অশ্বিনীর চলে যাওয়াটুকু গোলাপ দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে। বাতাসে কুয়াশা এলোমেলো হয়ে যায় বলে কখনো অশ্বিনীর কাঁধ, কখনো ঘাড়, কখনো বা মাথার টুপিটুকু মুহূর্তের জন্য দেখা যায়, ঝোড়ো কুয়াশার ধাক্কায় ধাক্কায় অশ্বিনী দ্রুততর সরে সরে যায়, কুয়াশাময়,—সকালের আলোবিচ্ছিন্ন কুয়াশালগ্নতায় নৌকোর অপস্রিয়মান পালের মতো।

এই শীতে, এই বিকেলে, এই কুয়াশার ঝড়ের ভেতর বাড়ি ছেড়ে কেউ বেরোয় না। অশ্বিনীকে বেরোতেই হয়, যেন অশ্বিনী বাড়িতে ছিল না। এত শীত, এত কুয়াশার ভেতরও অশ্বিনীকে যেন গোলাপের জন্যই আসতে হয়েছিল,—কুয়াশার ঝড়ে বিলীয়মান অশ্বিনীকে দেখে এতক্ষণে যেন গোলাপ দুপুরব্যাপী অশ্বিনীর সঙ্গটা আস্বাদ করতে পারে। এখানে আসার পর থেকে অশ্বিনী এমন দুর্নিবার বিদেশী হয়ে উঠছে! দরজার সামান্য ফাঁক ভরিয়ে গোলাপকে দেখতে হয়, অশ্বিনীকে কখন আর দেখা যায় না, তারপর একটু হাসতে হয়—রাতদুপুরে বা সকালে বা বিকেলে কখন আবার অশ্বিনী নিশ্চিতই আসবে সেই ভেবে। গোলাপ ইচ্ছে করেই জানতে চায় না, অশ্বিনী কোথায় যাচ্ছে, কখন ফিরবে।

গোলাপের কাছে কৈফিয়ত দেয়ার সুরে কথা বলে, অশ্বিনী নিজের কাছে যে খাটো হয়ে গিয়েছিল, তার পুরো শোধ তুলে সে বাড়ি থেকে বেরোতে পারে। কুয়াশার এ-রকম ঝড় বইছে অশ্বিনী তা বোঝেই নি। গাড়ি তো পাওয়া যাবে কিন্তু চালাবার ড্রাইভার পাওয়া যাবে কি না কে জানে। কুয়াশার ঝড়ের ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে অশ্বিনীর একসময় একটু ভালোও লেগে যায় যেন, আসলে বাতাসের ধাক্কায় কুয়াশার সেই অনড় চাপটা সরে যাচ্ছে বলে।

বড়বাবু শুনেই বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, কিন্তু ড্রাইভারগুলো

কেউ আছে তো?" অশ্বিনী চেয়ারে বসে আর বড়বাবু কোনো ড্রাইভারকে ডেকে আনতে একজনকে পাঠান। অশ্বিনী বড়বাবুর কাছে এসে শুধু এইটুকুই বলে, "একটা গাড়ি লাগবে, যে।" কোথায়, কি ব্যাপার বড়বাবু কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না। বড়বাবুই কথা বলেন, "এই ঝড় শুরু হলো, এর পরই বরফ পড়বে," অশ্বিনী তবু কোনো কথা বলে না দেখে বড়বাবু বলেন, "আজ রাতেও পড়তে পারে।" তিরিশ বা চল্লিশ বছরের পাহাড়ী অভিজ্ঞতা নিয়েও বড়বাবু যেন অশ্বিনীর সামনে অনভিজ্ঞই থেকে যান,—যদিও অশ্বিনী এই প্রথম শীত কাটাচ্ছে—অশ্বিনী এমনই গম্ভীর আর অনড় হয়ে থাকে। আসলে, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় অশ্বিনী অবস্থার ওপর যে-কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল, সেটা সে হাতছাড়া করছিল না, আর। বাইরে বাতাসের গর্জনের সঙ্গে মিশে কখন গাড়ির এঞ্জিনের আওয়াজ উঠেছিল—কারো খেয়াল হয় নি। বাইরে, এসে দাঁড়িয়ে স্টার্ট বন্ধ করার জন্য গাড়িটার এঞ্জিনের আওয়াজ প্রবলতর হয়ে উঠলে অশ্বিনী চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তারপর সোজা পা ফেলে বেরিয়ে যায়। পেছন থেকে বড়বাবু বলেন, "দরকার হলে গাড়িটা রেখে দেবেন।" কথার জবাবে মাথাও ঝাঁকায় না একটু, অশ্বিনী। গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দরজা খুলে ড্রাইভার বাহাদুর লাফিয়ে নেমে আসে। ঘুরে এসে দরজা খুলে দাঁড়ায়। অশ্বিনী ঢুকে গেলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাহাদুর দৌড়ে নিজের দরজার দিকে যায়। এঞ্জিনের শব্দ ডুবিয়ে বাতাস আছড়ে পড়ে গাড়ির ওপর, সামনের কাচটা ঘষে দিয়ে মুহূর্তের ভেতর কুয়াশা বনেটের ওপর থেকে গড়িয়ে যায়, এক হাতের মুঠোয় গিয়ারের মাথাটা চেপে ধরে, বাহাদুর সোজা তাকিয়ে, ওয়াইপার ঘষে যায়, বাতাস গাড়িটার ওপর হামলে পড়ে, গাড়িটা থরথর কাঁপে বাতাসেই যেন, তারপর বাহাদুর আস্তে আস্তে ক্লাচটা ছেড়ে খুব ধীরে ধীরে গাড়িটাতে একটা গতি আনে। গাড়ি খুবই আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে। উত্তরের ঢালুটার সামনে এসে

গাড়িটা দাঁড়ালে, একটা দমকা বাতাসে কুয়াশা কিছুটা সরে গিয়ে মাত্র মুহূর্তের জন্য প্লেনভিউ বাগানের অনেকখানি অশ্বিনীর দৃশ্যগোচর হয়। পরমুহূর্তেই সামনের ঢালু থেকে লাফিয়ে কুয়াশা উঠে আসে আর গাড়িটা সমস্ত শক্তিতে সেই ঢালুর ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই কুয়াশার ঝড়, এই নির্জনতা, আর এই দুর্যোগে সম্পূর্ণ একা-একা বেরিয়ে যাওয়া—অশ্বিনীকে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়। তার নিজের কাছে। এই দুর্যোগ, এই বাগান, এই সমস্ত কিছুর ওপর তার কর্তৃত্ব নিঃসন্দেহ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যেন।

অশ্বিনী কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, শুধু চোখের সামনে ওয়াইপার দুটো ছাড়া। কখনো কখনো বনেটটা দেখা যায়, আবার কখনো যায় না। অন্ধকারে গাড়ির আলো তীব্র ভেদ করে যায় বলে গতির একটা বোধ আসে। কিন্তু এখানে গতির কোনো বোধও আসে না, মনে হয়, গাড়িটা গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। চাকার ওপর দিয়েই গড়াচ্ছে—এই ঘটনাকুটুইমাত্র একটা স্বস্তি দেয়। খুব পরিষ্কার দিন হলেও বাহাদুরের হাতের চাকা এ-রকমই মুহুর্মুহু ঘোরে, এঞ্জিনের গর্জন এমনি প্রবল হয়। কিন্তু আজ, এখন সামনে কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলে আর গাড়ির গায়ে বাতাস আছড়ে পড়ছে বলে, অশ্বিনীর মনে হতে শুরু করে গাড়িটা কোথাও একটু থামলে পারত, শুধু এইটুকু বোঝার জন্য যে গাড়িটা নিজের জোরেই চলছে।

কিন্তু গাড়িটা যতই নিয়ন্ত্রণাতীত ও বাইরের ঝড় আর কুয়াশার আয়ত্তে মনে হয়, ততই অশ্বিনী বোধ করে সে আসলে পরিবেশের এই চাপটা থেকে বেরোবার জন্যই ছুটছে। এতদিন বেণুকে অশ্বিনী কোনো সময় দিতেই পারে নি। এখনো অন্তত বেণুর কাছে গিয়ে বসলে সেই প্রসঙ্গগুলো তোলা যায়, যেগুলো একসময় বেণু উত্থাপন করে রেখেছিল। সেগুলো যে অশ্বিনী ভোলে নি, সেটা যদি বেণু

বোঝে, তাহলে সেই প্রসঙ্গগুলো যখন থেকে সূত্রহীন,—অশ্বিনীকে দেখে বেণুব অজ্ঞান হয়ে যাওয়া—, তখন থেকে বেণু আবার সূত্র ধরতে পারে।

অশ্বিনীর চোখের সম্মুখে থাকে থাকে নেমে যাওয়া কুয়াশার মাইল-মাইল বিস্তার দেখা দেয়, সহসা। গাড়ির গর্জন একটু কমে আসে। কুয়াশার ঝড়টা ওপরে হচ্ছিল। নিচে কোনো ঝড় নেই। সেই জলো কুয়াশা নীরন্ধ্র। কিন্তু ঝড়ের ভেতর থেকে সেই স্থির কুয়াশার ভেতর ঢুকে একটু স্বস্তি বোধ হয়, অন্তত সেই আলোড়নটা নেই আর। অশ্বিনীর ইচ্ছে হয়, গাড়িটা থামিয়ে ওপরে তাকিয়ে দেখে ঝড়হীন অবকাশে দাঁড়িয়ে ওপরে কুয়াশার ঝড় দেখা যায় কি না। অশ্বিনী জানে, দেখা যাবে না, কারণ ঝোড়ো আর স্থির কুয়াশার ভেতর কোথাও কোনো ফাঁক নেই।

বাহাদুব বিড়বিড় করে বলে, "বরফ পড়বে, আজ কালের ভেতর।" অশ্বিনী বাহাদুরের দিকে মাথা ঘোরালে বাহাদুর বলে, "ওপরে ঝড় আর নিচে ঠাণ্ডা হলে বরফ পড়ে। বরফ না পড়া পর্যন্ত ঐ ঝড় থামবে না।"

গাড়িটা ঘুমবাজারে পৌছলে বাহাদুর তাকায়। অশ্বিনীর মনে পড়ে যায়, কোথায় যাবে তা বলাই হয় নি ; এতক্ষণ একটিমাত্র পথ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এসেছে। "দার্জিলিং"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেণুই দরজা খুলে দেয়।

সামনে ফ্লাওয়ার শো-র সেই বিরাট ছবি। একপাশে অশ্বিনী, আর-একপাশে টগর—মাঝখানে রাজ্যপালের স্ত্রী, টগর আর অশ্বিনী দুজনার থেকেই তিনি বেঁটে বলে ছবিটা জুড়ে যেন টগর আর অশ্বিনীই আছে। অশ্বিনীর কোমরের কাছে, পেছন থেকে একটা কালো, পোড়া, করুণ মুখ—সেই মিঃ কুমরা।

কম্বল মুড়ি দিয়ে কার্পেটের ওপর বসে বেণু লুস্থু-বেবির সঙ্গে লুডো খেলছিল। কম্বলের যে অংশটা বেণুর গায়ে ছিল, বেণু উঠে আসায় সেই অংশটা এলিয়ে পড়ে আছে। বেণু অশ্বিনীকে "আসুন" বলে, ভেতরে আসতে দিয়ে, দরজা বন্ধ করে, ধীর পায়ে ভেতরের দরজায় গিয়ে বলে, "বৌদি, অশ্বিনীবাবু এসেছেন।" অশ্বিনী ঠিক খেয়াল করতে পারে না, বেণু কবে 'জামাই' ডাকা ছেড়েছে।

কার্পেটের ওপর বসে পড়ে অশ্বিনী বলে, "আমি খেলব।"

"না না মেসো, এখন বোসো না, আমার ঘুঁটি পাকা হয়ে গেছে, তোমাকে এর পরের দানে নেব" লুস্থু তড়বড়িয়ে বলে। বেণু এসে দাঁড়ায়। লুস্থু বলে, "পিউমণি, বোসো।"

বেণু বসে না, দুটো হাতই তোলে যেন ঠোঁট ঢাকবে, কিন্তু বাঁ-হাতটি ডান কনুইয়ের খাঁজে আর ডানহাতের আঙুলগুলো বেণুর চিবুকের খাঁজে আটকে যায়। চিবুকের গর্ত খোঁটে বেণু।

"পিউমণি, বোসো।" অশ্বিনী ভাবে এইবার সে স্বচ্ছন্দে মুখ তুলে বলতে পারে, বসুন না। কিন্তু তাকে সময় না দিয়ে লুস্থু প্রায় কেঁদে ওঠে, "না, না, তা হবে না, তোমাকে খেলতে হবে, আমার পাকা ঘুঁটি, পিউমণি, এবার বেবির দান, বোসো।"

লুডোর ছক্কাদান নিয়ে বেবি নাড়ে। তারপর একটা দান ফেলে। লুস্থু ছক্কাটা ছক্কাদানের ভেতর ফেলে বলে, “ধুৎ, বেবিটা দান দিতেই পারে না, পিউমণি বোসো না, বেবির দানটা দিয়ে দাও।” লুস্থু বেণুর শাড়ি ধরে টানে। ধপ্ করে বসে পড়ে বেণু আঁচলে মুখ ঢাকে। তখন অশ্বিনী বলতে পারে, “নিন, তাড়াতাড়ি খেলে নিন। এ দানটা হয়ে গেলে আমি খেলব।” ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে কথাটা শুরু হয়েছিল ঠিক স্বরেই, কিন্তু আঁচলে ঠোঁট ঢেকে বাঁ হাতের ভরে শরীরটাকে রেখে বেণু এমন ঘাড় ঘুরিয়ে থাকে যে কথাটা শেষ হয় অন্য সুরে, যার সঙ্গে ‘আমি খেলব’ কথাটার কোনো মিল নেই।

লুস্থু ছক্কাটা ভেতরে ঢুকিয়ে ছক্কাদানটা বেণুর আঙুলের ভেতর গুঁজে দেয়। আঙুলের ভেতর বেণু ছক্কাদানটা নাড়ে, দান দেয় না, ঘাড় ঘোরায় না। লুস্থু একবার অশ্বিনীর দিকে আরেকবার বেণুর দিকে তাকিয়ে, অশ্বিনীকে বলে ফেলে, “তুমি পরের দানে খেলবে কি করে, তুমি তো এক্ষুণি মা-র সঙ্গে বেরোবে।” লুস্থু কথাটা শেষ করে বেণুর দিকে তাকায়। সেই কটি মুহূর্তের জন্য লুস্থুও লুডো খেলা ভুলে যায়। অশ্বিনী লুডোর বোর্ডের ছোট ছোট খোপের দিকে তাকিয়ে থেকে, চোখ নামিয়ে, খুব নিম্নস্বরে বলে, “আমি কি বলেছি আমি আজ বেরোব” কথাটা যেন শেষ হচ্ছিল না, অশ্বিনী লুডোর খোপগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে কথাটা শেষ করে। “তাহলে আমাদের সঙ্গে খেলতে হবে, উঠতে পারবে না?” লুস্থু চোখ পাকিয়ে অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করে বেণুর দিকে তাকায়। অশ্বিনী সামনের লুডোবোর্ড থেকে চোখ তোলে নি। সে এবার প্রথমেই লুডোর খোপগুলোতে আঙুল বোলায়। তাতে একটা ঘুঁটি সরে যায়। লুস্থু সেটা ঠিক জায়গায় রেখে দেয়। একই নিম্ন স্বরে অশ্বিনী বলে, “আমি তো আজ এই জন্যই এসেছি।” লুস্থু মাথা দুলিয়ে বলে ওঠে, “এটা তুমি বাজে কথা বলছ মেসো, তুমি

ওখানে বসে বসে কি করে জানলে, আমরা লুডো খেলছি? তোমার মাথায় তো আর জট নেই।"

"কিন্তু আমার তো মন আছে" অশ্বিনী একটু মজার সুর গলায় এনে লুস্নুর দিকে তাকায়। "আ-হা-হা, মন থাকলে কি হয়?" "মন থাকলে বোঝা যায়, তোমরা ঠিক মনে মনে ভাবছিলে মেসোটা এলে খুব ভালো হতো।" "হলো না, হলো না, আমরা মোটেই সে-কথা ভাবি নি।" "তুমি না-হয় ভাবো নি, আর কেউ-ও তো ভাবতে পারে" "মোটেই না, পিউমণি তুমি ভেবেছিলে? মেশোর কথা? অ্যাঁ, ভেবেছিলে? পিউমণি?"

বেণু হঠাৎ ছক্কাদান থেকে ছক্কা ফেলে দেয়। "তিন, তিন", বলে ওঠে লুস্নু, "পিউমণি, দান দাও, কোন্ ঘুঁটি দেবে? এটা কিন্তু বেবির দান, কোন্‌টা দেবে পিউমণি, এইটা?" লুস্নু নিজেই এক দুই তিন গুণে ঘুঁটিটা এগিয়ে দেয়। "পিউমণি, এবার তোমার দান দাও" লুস্নু ছক্কাটা ছক্কাদানের ভেতর ঢুকিয়ে আবার বেণুর আঙুলে গুঁজে দেয়। তারপর অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে তড়বড়িয়ে বলে, "মেসো, একটু বসো, এই পিউমণির দানের পরই আমার দান, আমার ঘুঁটি ঘরে উঠে যাবে, তারপর তোমাকে খেলায় নেব।" লুস্নু উৎসাহে হাঁটু নাচায়। বেণু এবার দান দেয়। "পাঁচ। বা-বা, পিউমণির কি লাক!" বেণু ছক্কাদানটা ফেলে দেয়। লুস্নু ছক্কাসহ তুলে নিয়ে খুব জোরে জোরে নাড়াতে থাকে। বেণু ঘুঁটি চালায়। লুস্নু খুব জোরে জোরে ছক্কাদানটা নাড়াতে নাড়াতে বলে, "গড, গড, আমার যেন তিন পড়ে," একবার ছক্কাদানটা কপালে ঠেকায়, আর একবার ক্রশ করে, বেণু আর অশ্বিনী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, লুস্নু আবার জোরে জোরে নাড়াতে থাকে, তারপর খুব আস্তে ছক্কাদানটা উপুড় করে। কিন্তু সেটা আর তোলে না, "ঈস পিউমণি আমার যদি তিন না হয়, ঈস, তাহলে কিন্তু রি দিতে হবে।" লুস্নু দানটা একটু তোলে আর উপুড় হয়ে একটু দেখে, তারপর উপুড়

হয়েই একটু একটু করে তোলে, তুলে ফেলে চোখ বুঁজে ফেলে আর বেণু আর অশ্বিনী একই সঙ্গে হেসে উঠে, হাসতে থাকে। চার। চোখ বন্ধ রেখে লুস্থু চিৎকার করে, "বলো, পিউমণি, আমার কত হয়েছে, আমি কি চোখ খুলব।" বেণু বলে ওঠে, "খোল্, চার হয়েছে।" বেণু ছক্কাদানটা তুলে নেয়। লুস্থু চোখ খুলে কান্না-কান্না ভাব করে বলে, "কেন, আমার ফোর হলো মেসো?"

দুই

টগর একেবারে তৈরি হয়ে এসে বলে, "চলো।" ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে ঘাড়টা হেলিয়ে কোটের ভেতর চুলের গোছাটা ঠিক করে। লুস্থু হাততালি দিয়ে ছড়া বলার সুরে প্রায় নেচে ওঠে, "মা, আজ তোমার যাওয়া হবে না, আজ আমরা মেসোর সঙ্গে লুডো খেলব, কী মজা!"

এর ভেতর বেণু দান দেয়। বেণু ঘুঁটি চালাচ্ছে দেখে লুস্থু জিজ্ঞাসা করে, "তোমার কত পড়েছে, পিউমণি?" বেণু বলে, "এটা তো বেবির দান ছিল, এবার আমার দান।" ছক্কাদান তুলে নিয়ে বেণু নাড়ায়।

"চলো", বলে টগর অশ্বিনীর দিকে না তাকিয়েই দরজার দিকে পা বাড়ায়, "বেণু, দরজাটা বন্ধ করে দে।" অশ্বিনী যখন ঘাড় ঘুরিয়ে টগরকে দেখে তখন টগর সমস্ত দরজা জুড়ে, ছিটকিনিতে আঙুল। পেছনে অশ্বিনী আছেই—এতে এতই নিশ্চিত টগর যে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেও না। না-বেরিয়ে যদিও লুডো খেলতে চাইছিল, তবু অশ্বিনী জানতই যে বেরোবেই। তবু এত নিশ্চিত, বোধ করে কি ভাবে টগর, অশ্বিনী সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত! অশ্বিনীকেও কি এতটা অধিকার ফলাতে দেবে টগর?

অশ্বিনী ঘাড় ঘুরিয়ে সোজা হয়ে বসে। টগর ছিটকিনি খুলে চৌকাঠ পেরোয়। বাইরে গিয়ে কোটটাতে একটু টান দেয় আর

নিচু হয়ে শাড়ির কুঁচি টানে। বেণু হাতে ছক্কাদান নিয়ে বাইরে টগরের মুখ থেকে পাশে অশ্বিনীর চোখের ওপর পর্যন্ত দেখে নিয়ে দান দিয়ে ফেলে আবার বাইরে টগরের দিকে তাকায়। লুম্বু বলে ওঠে, "তুই, তুই, পিউমণি, তুই।"

বাইরে থেকে টগর বলে ওঠে, "কি হলো, চলো।" বেণু অশ্বিনীর দিকে তাকায়। অশ্বিনী ঘাড় ঘোরায় না। বেণু বলে, "বৌদি ডাকছে।" অশ্বিনী একটু হেসে বেণুকে জিজ্ঞাসা করে, "কি ব্যাপার?" বেণু বাইরে তাকায়, অশ্বিনী তাকায় না। লুম্বু বলে, "পিউমণি, তোমার টু হয়েছে, ঘুঁটি দাও"—

বাইরে থেকে টগর আবার ডাকে, "কি হলো, চলো অশ্বিনী।" অশ্বিনী এতক্ষণে ঘাড়টা অর্ধেক ঘুরিয়ে বলে, "কি ব্যাপার?"

"চলো"—

"আমি তো লুডো খেলবো"—

"এসে খেলো। এখন চলো। এখুনি তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে," টগরের গলায় এখনো কোন অনিশ্চয়তা নেই, যেন, অশ্বিনী যাবেই। সে যে কিছুতেই যাবে না,—এমন জিদ অশ্বিনীর নেই। কিন্তু এত নিশ্চিত বোধ করে কেন টগর?

"আগে একদান খেলে, তারপর বেরোই। বসুন না—"অশ্বিনী এবার বেণুর দিকে তাকিয়ে বলে, "আপনার ঘুঁটি চালুন।" লুম্বু একবার টগরের দিকে, আরেকবার অশ্বিনীর দিকে তাকায়। বেণু তুঘর ঘুঁটি খুব নিস্তেজ চালায়।

"আরে চলো, চলো, এখুনি তো ফিরবে, এসে যত পার সারারাত লুডো খেল"—বলতে বলতে টগর চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে।

ছক্কাদানটা নিয়ে লুম্বু খুব নাড়াচ্ছিল। একবার মাথায় ঠেকাল, তারপর ছক্কাদানটা বাঁ হাতে নিয়ে ডানহাতে ক্রশ করে, "এই তো আমার ঘুঁটি পাকা হয়ে যাবে মা, তারপর মেসো খেলবে তুমি একটু বোসো না।"

বেবি বেণুর কোল ঘেষে বলে, "ঠাণ্ডা লাগছে।" বেণু খোলা দরজার দিকে তাকায়। "গড, গড, আমার যেন থ্রি হয়।" টগর দরজাটা আবজে দেয়। "তুমি যদি লুডো খেলবে, তাহলে আমাকে তৈরি হতে বললে কেন,"—টগর বলে ফেলে। জবাব দেবার জন্য ঠোঁট খুলেই অশ্বিনী দেখতে পায়, বেণু ফাঁকঠোঁটের ওপর তর্জনীটা চেপে ঘাড় হেঁট করে আছে। ফলে, অশ্বিনীর কোনো জবাব দেয়া হয় না। কান খাড়া রেখেও অশ্বিনী টগরের পায়ের কোনো শব্দ পায় না। তাহলে টগর কি চুপচাপ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। টগর বসছে না কেন। অথবা রাগ করে ভেতরের ঘরে চলে যাচ্ছে না কেন? যদি তাই যায় তাহলে অশ্বিনী আজ কিছুতেই বেরোবে না। যদি দাঁড়িয়েই থাকে, তাহলেও কি বেরোবে। এত নিশ্চিত বোধ, করে কেন টগর?

লুম্নু বলে ওঠে, "ব্যস আমার থ্রি হয়েছে, আমার ঘুঁটি উঠে—এ গেছে।" ঘুঁটি উঠিয়ে দেয় লুম্নু। "নাও, পিউমণি, নতুন দান খেলা হবে। আমার ব্লু, মেসোর গ্রিন।" টগর দু পা হেঁটে এসে বেণুর পেছনের কৌচটাতে বসে পড়ে অন্যদিকে তাকিয়ে নয়, লুডোর দিকেই তাকিয়ে।

বেণু হঠাৎ সচকিত হয়ে সোজা বসে বলে, "এই চোট্টা, তোর কখন তিন হল রে?"

"না, হয়েছে, হয়েছে," লুম্নু মাথা নাড়ায়।

"কখন হলো?" বেণু ভুরু কোঁচকায়। টগর হেসে ফেলে। "তোমরা তো তখন কথা বলছিলে—"

"হ্যাঁ, আমরা কথা বলছিলাম আর ঐ ফাঁকে তোমার ঠিক তিন-ই হয়ে গেল, না?" বলে বেণু ঘাড় হেলিয়ে টগরের দিকে তাকিয়ে বলে "দেখেছ বৌদি, কি চোট্টা—"

"ও ভীষণ চোর, একটু চোখ সরালেই ঘর এগিয়ে দেয়" টগর বেশ শিথিল স্বরে বলে। তাহলে কি অশ্বিনীর আন্দাজটাই ভুল?

আসলে কি তাহলে টগরের তেমন কোনো অধিকারবোধ নেই অশ্বিনী সম্পর্কে ?

"মোটেই না, মোটেই না, আমার থ্রি হয়েছে, তোমরা তখন দেখ নি কেন, এখন রি হবে না" লুস্থু আর মাথা নাড়ানো থামায় না।

"ওঃ, আবার আইন দেখানো হচ্ছে! যখন তোর থ্রি হলো, তুই আমাদের দেখালি না কেন"—বেণু বেশ ঝগড়াটে গলায় বলে।

"মোটেই না, পিউমণি, সত্যি আমার থ্রি হয়েছে। মেসোকে জিজ্ঞাসা করো" এতক্ষণে লুস্থু মাথা ঝাঁকানো থামায়।

টগর হেসে উঠে বলে, "এইবার ঠিক হয়েছে, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। বলো মেসো, বলো"—

অশ্বিনী একটু অন্যমনস্ক হাসে। বেণু হেসে ফেলে বলে, "মেসো বললে আর কি হবে, মেসো তো খেলছে না, খেলছি আমি। নে ঘুঁটি বের কর্।" বেণু হাত বাড়িয়ে লুস্থুর ঘুঁটি বের করে ছকে রাখে আর বলে, "আপনারা ঘুরে আসুন, আমাদের খেলা শেষ হতে দেরি আছে।" "মোটেই দেরি নেই, এইবারই আমার থ্রি হবে।"—লুস্থু ছক্কাদান নেয়। "চলো অশ্বিনী, বেণু তো পারমিশান দিয়েছে"—টগর বলে। অশ্বিনী এমন ভাবে ওঠে যে বোঝা যায় না, সে নিজের থেকেই উঠল, নাকি বেণুর কথাতে, নাকি টগরের ডাকে।

প্রথমে টগর বেরোয়। তারপর অশ্বিনী। অশ্বিনীর পিঠের ওপর দরজা আটকে দেয় বেণু।

তিন

সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি জানতেন, আমি আসব"—

ঘাড় না ঘুরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে টগর জবাব দেয়, "কি করে জানব, তুমি কি জানিয়েছিলে ?"

"আমি আসামাত্র যে রকম তাড়াতাড়ি বেরোলেন, মনে হলো তৈরি হয়েই ছিলেন।" ওরা নিচে পৌঁছে গিয়েছিল। টগর মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে, "আজ না বেরোলে তুমি কি খুশি হতে?"

রাস্তায় পা দিয়ে দুদিকে তাকিয়ে অশ্বিনীর খুব ভালো লাগে। কোনো কুয়াশা নেই। সব দিকে তাকানো যায়। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। অশ্বিনী কোনো জবাব দেয় না। আসলে, যদি টগর খুব একটা রাগারাগি করত তাহলে অশ্বিনীর পক্ষে একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা মেনে নেয়া সহজ হতো। কিন্তু টগর যেমন ভাবে গিয়ে ভেতরে চেয়ারে বসে লুডো খেলা নিয়ে হাসি ঠাট্টা শুরু করে, তাতে অশ্বিনীর এমন সন্দেহও হতে পারে যে অশ্বিনীর ওপর টগর কোনো অধিকারই বোধ করে না। ফলে টগরের অধিকারবোধের বিরুদ্ধতা করার চাইতে এখন অশ্বিনীর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে টগরের অধিকারবোধটাই।

একেবারে ফাঁকা রাস্তায় যারা হাঁটছে, তারা যেন ছুটছে। রাস্তার এই গতি অশ্বিনী আর টগরের পায়েও এসে যায়! আসলে প্রায় ছোটার মতো না-হাঁটলে পায়ের তলাটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। টগর আর অশ্বিনীর হাঁটা দেখে মনে হয় না ওরা উদ্দেশ্যহীন বেড়াচ্ছে —যেন ওদের খুব জরুরি কাজ আছে। টগর রাস্তা ছোট করার জন্য সেই সিঁড়ির দিকে বাঁক নেয়। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অশ্বিনী ভাবে, এত লম্বা ঠাণ্ডা ফাঁকা সিঁড়িটা তাকে নামতে হবে! সোজা নেমে যাওয়া সেই খাড়া সিঁড়ি টগর আর অশ্বিনী ছাড়া সম্পূর্ণ নির্জন। প্রতিধ্বনিত ওদের জুতোর শব্দ সিঁড়িটাকে জনাকীর্ণ করে তোলে।

"চারটে বাজে, কতক্ষণই বা বাইরে থাকা যাবে"—টগর।

"কেন, বেশি রাত পর্যন্ত থাকলে কি হয়"—অশ্বিনী।

"কি আবার হবে, জমে যাবে"—

"তাহলে এর চাইতে ঠাণ্ডা জায়গায় মানুষ থাকে কি করে। আমাদের বাগানই তো মনে হয় এর চাইতে ঠাণ্ডা"—

"সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়"—

"তো, এখানেও তো সে ব্যবস্থা নেয়া যায়"—

"কিসের ব্যবস্থা"—

"যাতে ঠাণ্ডা না-লাগে"—

"কি ব্যবস্থা"—

"ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করে শরীর গরম রাখলেই হয়"—

"সে তো তুমি করোই"—

"আমি করলে তো আর আপনার শরীর গরম হবে না। আপনি যদি একটু খেতেন তাহলে অনেকক্ষণ বেড়ানো যেত"—

"তুমি তো বেরোতেই চাইছিলে না, আবার এখন বলছ অনেকক্ষণ বেড়াতে"—

"ঐ জন্যই তো চাই নি। এই বেরোব আর বাড়ি ফিরব, ভালো লাগে না কি। আপনার জন্যই তো বেশিক্ষণ বাইরে থাকা যায় না"—

"একটু-আধটু খেতে তো আর আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার দাদা গন্ধ পেলে?"

সিঁড়ির তলায় ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে। টগর মুখ উঁচু করে অশ্বিনীর দিকে তাকায়। টগর ডাইনে ঘোরে। অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "এর ভেতর ভট্চাযের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?" "হ্যাঁ, দুদিন দেখা হয়েছিল, বললো, তুমি এলে যেন নিয়ে যাই"—

"তাহলে কি ওখানেই যাবেন?"

টগর একটা চড়াই রাস্তা ধরে বলে, "ধ্যুৎ, এখন ভট্চাযের ওখানে গিয়ে বসে থাকব নাকি?"

চড়াই রাস্তাটা দুবার পাক দিয়ে যেখানে ওঠে, সেখানে অশ্বিনী দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক-ওদিক দেখে বলে ওঠে, "এই রাস্তাটা থেকেই তো নিচে নামলাম?" টগর হেসে বলে, "হ্যাঁ।" "আবার এখানেই উঠে এলেন?" "হ্যাঁ।" "শর্টকাট করলেন?" টগর হাসে, বলে, "চলো, মিঃ প্রধানের ওখানেই যাই। উনি নাকি দুচার দিনের

ভেতরই কলকাতায় যাবেন, এসেম্বলি আছে” “চলুন, ঘুরে ফিরে সেই মিঃ প্রধান নয় ভট্চায” “চলো, না-হয় একটু ঘুরে যাই, কিন্তু যেখানেই যাও, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে” “আপনাদের এখানে তো তাও বেরোতে পারছেন, আমাদের ওখানে কুয়াশায় তো বেরোনই যায় না।” “বেশি বোলো না, আবার এখুনি কোত্থেকে এসে সব অন্ধকার করে দেবে।” আরে, সে তো আসবে। আর বাগানে যে হাত বাড়ালে আঙ্গুল দেখা যায় না। সেই একই ঘন শক্ত কুয়াশা, চব্বিশ ঘণ্টা। আজ আবার বিকেল থেকে কুয়াশার যা ঝড়—” অশ্বিনীর মনে পড়ে, কুয়াশার গল্প তো সে বেণুর সঙ্গে করবে। চুপ করে যায়।

রাস্তা একেবারে ফাঁকা। রাস্তাটা আরো চড়াই, আরো চওড়া, আরো কালো। দোকানপাট বাড়িঘর সব বন্ধ। রাস্তার পাশে কোনো ভিখিরি পর্যন্ত নেই।

সেই সম্পূর্ণ ফাঁকা রাস্তার উতরাইয়ের নির্জনতা ভেঙে যায় টগর আর অশ্বিনীর পায়ের প্রখর শব্দের প্রতিধ্বনিতে।

তাদের নিজেদের পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি টগর আর অশ্বিনীর পেছন পেছন অশ্বারোহীর দ্রুততায় প্রবল তাড়া করে আসে। অশ্বিনীর নীরবতার অর্থ বুঝে ফেলেই টগর যেন হঠাৎ-ই বলে বসে, “তুমি কদিন না এলে, এত মন খারাপ করে”—চড়াই ভাঙার হাঁফ কথাটার মাঝখানে পড়ে।

চার

টগর আর অশ্বিনীকে দেখে মিঃ আর মিসেস প্রধান হৈ হৈ করে উঠলেন—তাঁদের পক্ষে যতটা হৈ হৈ করা সম্ভব। সেই শুনে ভেতরের ঘর থেকে তাঁদের দুই মেয়ে, লক্ষ্মী আর চেতনা, বেরিয়ে আসে। তারা অশ্বিনীকে দেখে হাততালি দিয়ে ওঠে।

টগর আর অশ্বিনী প্রথমটা একটু ভড়কেই যায়। অশ্বিনী মনে

মনে চেষ্টা করে, এরা বাড়িশুদ্ধ তাদের দেখে এতটা হৈ হৈ করছে কেন, সেটা তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলতে।

মিঃ আর মিসেস প্রধান আগে আগে যান আর লক্ষ্মী-চেতনা পেছনে পেছনে আসে। ভেতরের বসার ঘরে পৌঁছে মিঃ প্রধান অশ্বিনীকে বসার জায়গা দেখিয়ে নিজে বসেন। টগরের হাত ধরে মিসেস প্রধান আর একটু এগিয়ে উল্টোদিকের সোফায় বসে। চেতনা একগাল হেসে মাথা দুলিয়ে বলে, "আজ কিন্তু আমরা যে-কজন আছি, তারাই নাচব।"

মিঃ প্রধান হেসে বলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, হবে, উনি এলেন, একটু বসুন," তারপর অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করেন, "মিঃ ভট্‌চাযের সঙ্গে দেখা হয় নি?" নাচের একটা ভঙ্গিতে চেতনা ভেতরে চলে যায়। টগর বলে, "না, আমরা ভাবলাম, ওঁর ওখানে গিয়ে আসতে আবার দেরি হয়ে যাবে, তার চাইতে এখান থেকে ফোন করে দেব"—

"নিশ্চয়, নিশ্চয়" মিঃ প্রধান লক্ষ্মীকে বলেন ফোন করতে। লক্ষ্মী ফোনে বেশ চিৎকার করেই বলে, "খাম্পা রিবেল ইজ হিয়ার। বাবা আপনাকে এখুনি আসতে বললেন।" শুনে মিঃ আর মিসেস প্রধান হেসে ওঠেন, ফোন করে এসে দুই হাত মুঠো পাকিয়ে চিবুকে ঠেকিয়ে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে হাসে। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীর কাছে পরিষ্কার হয়। সেই রেসের মাঠের ব্যাপার ওঁরা ভট্‌চাযের কাছে শুনেছেন, তারপর তো এই দেখা। মিসেস প্রধান বলেন, "আমরা তো অমরবাবুর কাছে শুনে খুব মজা পেলাম। কিন্তু আপনি যে ও-রকম করলেন,—রায়ট লেগে যেতে তো পারত, এখানে তো ও-রকম হামেশা লাগে—" অশ্বিনী বোঝে না ভট্‌চায কতটুকু বলেছে, কী বলেছে। তাই সে চুপ করে হাসে।

টগর জিজ্ঞাসা করে—"কি হয়েছিল, আমাকে বলো নি তো?"

"আপনাকে তো সেদিনই বললাম"—

"কি? বলতো!"

"রেসের মাঠে মারামারি লেগে গিয়েছিল"—

"ও। সেই কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ" বলে টগর হেসে প্রায় লুটোপুটি যায়। অশ্বিনী নিশ্চিত টগরের কিছুই মনে পড়ে নি।

"আচ্ছা, আপনি লোকটার দিকে কী রকম করে তাকিয়েছিলেন, একবার তাকান না" লক্ষ্মী প্রায় আব্দার করে। অশ্বিনী তার দিকে তাকিয়ে হাসে।

"আমাদের অশ্বিনীবাবুকে দেখলে চেনবার উপায় নেই। এমনি এমনভাবে থাকেন যে খুব লাজুক। কথা বলতে পারেন না যেন। অথচ আসল সময়ে ঠিক" মিঃ প্রধান মাথা নিচু করে বলেন।

টগর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে, "ও সাংঘাতিক ছেলে। দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। চিরকাল ও এরকম মিটমিটে"—

এখনকার অশ্বিনীকে নিয়ে এই মাতামাতির জন্য টগর কি বোঝাতে চায় যে সে অশ্বিনীকে অনেক বেশি জানে, অনেকদিন থেকে চেনে! যাই হোক, সেটা বুঝিয়ে টগরের লাভ কি। "জানেন না তো ও চুপচাপ কী রকম ট্রিক করে। আমাদের বাড়ির সবাই ওর ভয়ে একেবারে তটস্থ" টগর বোধহয় মনেমনে একটা গল্প ফাঁদছে। বাইরে গাড়ির শব্দ পাওয়া যায়। মিঃ প্রধান বলেন, "ভট্‌চায এসেছেন।"

ঘরে ঢুকেই ভট্‌চায বলে ওঠে, "সাবধান ইনস্পেক্টর। এর পর আপনাকে নিয়ে কিন্তু কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। সবাই আমাকে বলছে যে আমাদের ঘোড়া যেদিন দৌড়বে সেদিন অশ্বিনীবাবুকে চাই-ই চাই"—

"কিন্তু উনি তো শুধু খাম্পা রিবেল", লক্ষ্মী প্রায় নেচে উঠে বলে।

"ওঃ ইয়েস, ইয়েস, হি ইজ অনলি এ্যাণ্ড অনলি ফর খাম্পা রিবেল"—

লক্ষ্মী তার মাথা দুলিয়ে বলে ওঠে, "নো নো মিঃ ভট্‌চায। হি

ইজ এ্যাণ্ড অন্‌লি হি ইজ দ্য খাম্পা রিবেল”—কথাটা বলার পরও ঘাড়ের ওপর লক্ষ্মীর চুলগুলো ঘণ্টার মতো দোলে।

মিঃ প্রধান যেন লক্ষ্মীর কথার উত্তরে বলেন, “কিন্তু সরকারী চাকুরে এ-রকম অন্য দেশের রিবেল হওয়া কি ভালো?”

লক্ষ্মী বলে, “বাবা যে ঘোড়াটার নাম কেন এমন দিলেন আমি বুঝি নি, আমরা একটা নাম খুঁজছিলাম। শেষে বাবা এই নামটাই দিলেন। কিন্তু এখন অশ্বিনীবাবুকে দেখে, মানে সেদিনের ঘটনার পর বুঝছি, খাম্পা রিবেল ইজ খাম্পা রিবেল অ্যাণ্ড দি নেম ইজ অফুলি কারেক্ট”—

অশ্বিনী লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলে, “মানে আপনি আমাকে ঘোড়া বানিয়ে দিলেন!” হাসির রোলের ভেতরে তীব্র কণ্ঠে—“ও ইউ নটি” শুনতে পাওয়া যায়। কথাটা অমন স্বরে হয়তো টগর বলতে চায়, এখনো পারে না। মিসেস প্রধান তো পারেনই না। তাহলে এক লক্ষ্মী বলতে পারে।

ভট্‌চায অশ্বিনীকে বলে, “দেওতা, মে মাস পর রেস কো বাড়ে মে আপ কোন ঘোড়া পর আপকো কৃপা দৃষ্টি দেঙ্গে?”

“আপনি হিন্দি বলবেন না, হিন্দিওয়ালারা তাড়া করে আসবে”—মিঃ প্রধান বলেন।

“সে যদি দেখতেন মিঃ প্রধান। এই রকম করে ইন্‌স্পেক্টর তাকিয়ে আছে, মুখে একটা কথা নেই, চোখের দৃষ্টিতে একেবারে আগুন বেরোচ্ছে যেন, আর ঐ অত বড় দশাসই জোয়ান, ধীরে ধীরে কেন্নো হয়ে গেল আর ইন্‌স্পেক্টরের ভক্তের দল দেওতার চার পাশ ঘিরে আছে। আমি ভাবলাম এই বুঝি লাগল, বিদেশে বিভুঁয়ে লোকটা বেঘোরে প্রাণ হারাবে! কিন্তু কোথায় কে। সে চোখের দৃষ্টি যদি দেখতেন আপনিও ঘাবড়ে যেতেন। আর তারপর ‘খাম্পা’ ‘খাম্পা’ করে যেন টিকিট ঘরের দরজা ভাঙার উপক্রম। তাও ইন্‌স্পেক্টর সরে না। বলে আমার টিকিট কেনা হয় নি”—

মিসেস প্রধান বলেন, "আসলে অশ্বিনীবাবুর ওপর সত্যি বোধহয় সেদিন কিছু ভর করেছিলেন। সুনীলবাবু থাকলে বলতে পারতেন। আপনি যদি টিকিটটা কিনতে দিতেন তাহলে হয়তো খাম্পা ফার্স্ট হতো"—

মিঃ প্রধান "তা তো আর বলা যায় না। কিন্তু সারা মাঠে তো অত লোক ছিল। একমাত্র অশ্বিনীবাবুর মাথাতেই খাম্পা অমন চাপল কেন।"

সারাটা ঘর হঠাৎ চুপ করে যায়। ভট্‌চায যেন খানিকটা দোষী হয়ে পড়ে। অথচ অশ্বিনী জানে না ভট্‌চায কী বলেছে। গল্পটাকে জমাবার জন্য বা অশ্বিনীকে আরো একটু প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভট্‌চায এটুকু বোধহয় বলে নি যে অশ্বিনী মদের নেশায় সবটা করেছে। আর এখন ভট্‌চাযের গল্পের ওপর দাঁড়িয়ে অশ্বিনী হঠাৎ এমন একটা জায়গায় উঠে যায় সেখানে তার সঙ্গে দৈবের কারবার। ভট্‌চাযকে বাঁচাবার জন্যই অশ্বিনী বলে বসে, "সুনীলবাবু কোথায় গেছেন"—

"ওঁর তো একটু শ্বাসকষ্ট আছে। সেজন্য এই একটা মাস নিচে থাকেন। আর দিন পনের-বিশের ভেতরই আসবেন মনে হয়। আমরা তো আগামীকাল যাচ্ছি"—

"তাই নাকি ? এতদিনই থাকলেন, আর এ-কদিনের জন্য নিচে গিয়ে কি হবে ?" —ভট্‌চায বলে।

"না, আমার তো সেসন শুরু। প্রথমে চেতনা বললো এবার আমার সঙ্গে যাবে। কলকাতায় তো এখনই খুব গরম। তবু এখন ছাড়া আর কখন যাবে ? লক্ষ্মী বলছে ও-ও যাবে। তাহলে আর ওদের মা-ই বা বাদ যাবেন কেন"—

"ফিরে আসব মাসখানেকের ভেতরই। অত গরম সহ্য করা যায় না"—

"আমরাও ভেবেছিলাম যাব। কিন্তু উনি তো ব্যাঙ্কে কিছুতেই ছুটি পাবেন না। তো ঠিক হলো অশ্বিনী আর আমি যাব, এখানে

বেণু তো আছেই, আমরা একেবারে গোপালপুর অন সি-টি দেখে মাস খানেকের ভেতর ফিরব। কিন্তু এই শীতে দার্জিলিঙে আর অশ্বিনীর বদলি কে আসবে? দেখি যদি বর্ষার সময় নিচে যাওয়া যায়। অশ্বিনী আসায় আমার এই এক সুবিধে হয়েছে"—

অশ্বিনী টগরের দিকে তাকিয়ে থাকলেও টগরের গল্পটা বানাতে কোনো অসুবিধে হয় না।

পাঁচ

ভট্চায বলে, "একটু তাস হয়ে যাক না, এখন তো সাড়ে পাঁচটা মতো। কিছুক্ষণ খেলা যাক"—

"হ্যাঁ চলুন না", মিঃ প্রধান ওঠেন।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার সামনে একটা চেয়ার ছিল। মিঃ প্রধান বাইরের ঘর থেকে আর একটা চেয়ার নিয়ে আসেন। লক্ষ্মী এসে অশ্বিনীর চেয়ারের মাথা ধরে জিজ্ঞাসা করে, "তোমরা তাস খেলতে বসে গেলে, আমাদের নাচ হবে না?"

তার চুলে লক্ষ্মীর আঙুল লেগে যায়। আর সে ঘাড় ঘুরলে একেবারে মুখের ওপরে লক্ষ্মীর মুখ দেখতে পায়। অশ্বিনীর মনে পড়ে লক্ষ্মী আসার পর থেকে তার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে—সে একটা কথাও বলে নি। অথচ যেন সে ইচ্ছা করলেই, সে এখুনি ইচ্ছা করলে—এখুনি, লক্ষ্মীর সঙ্গে তার একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে—টগরের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্বন্ধের চাইতে লক্ষ্মীর সঙ্গে সম্বন্ধের গতি হবে অনেক প্রবল। "আচ্ছা তোমরা নাচো না আমরা তো আছি"—বলে মিঃ প্রধান লক্ষ্মীকে বিদায় করেন।

তাস বিলি দেখে অশ্বিনী বোঝে তিনতাস খেলা হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে একটু যেন বেশি মাত্রায় সচেতন হয়ে যায়। সে একটা তাসও তোলে না, যেন প্রথমে সে নিজের ভাগ্য যাচাই করে নিতে চায় তার তাস কেমন পড়তে থাকবে। ভট্চাযও তাস দেখে না।

মিঃ প্রধান একটা একটা করে তাস তুললেন। প্রথম ডাক হয়ে গেলে ভট্‌চায তাস তোলে। অশ্বিনী তোলে না। সে কিছুটা আলগাভাবে বসে থাকে। চতুর্থ দফায় অশ্বিনীর খেয়াল হয় তার এই এলিয়ে বসে থাকাটার জন্যই তাকে নিয়ে ওরা নানারকম কথা ভাববে—আর এমনও ভেবে বসে থাকতে পারে যে তাস খেলার ব্যাপারেও অশ্বিনীর একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে—যার সঙ্গে দৈবের যোগাযোগ কিন্তু অশ্বিনী তো আসলে এই দানটা হারবার জন্যই বসে আছে—কত হারে ও কী তাস পেয়ে হারে সেটা বোঝার জন্য।

কিন্তু তার ফলেই খেলার ভেতরে একটা অনিশ্চয়তার অস্বস্তি এসে যায়। তদুপরি এই তিনজনের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় থাকার ফলে এই অস্বস্তিটার একটা ব্যক্তিগত দিক আছে। অশ্বিনী এদের সঙ্গে এর আগে কখনো তাস খেলে নি। প্রথম থেকেই যদি অশ্বিনী ও-রকম ভাবে খেলার তাল কেটে দেয় তাহলে খেলাটা আর জমবেই না। অশ্বিনী তাস তুলে নেয়। অশ্বিনী হারতে চেয়েছিল। কিন্তু এমন তাস যে তার আর হারার উপায় থাকে না। কিন্তু হারতে গিয়ে জেতার ফলে খেলার ভেতর অশ্বিনীর প্রাধান্য প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মিঃ ভট্‌চায সিগারেটের প্যাকেটটা অশ্বিনীর দিকে এগিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় দানে অশ্বিনী প্রথমেই তাস তুলে নেয়। খেলাটাকে প্রথমে ব্যক্তিগত করাটা ঠিক হচ্ছে না। এতক্ষণ রেসের আর সুনীলবাবুর বিষয়ে গল্পের পর ঘরের পরিবেশে খানিকটা অস্বস্তিকর ভাব আছে—যেন সবাই মিলে খেলছে না, সবাই মিলে অশ্বিনীর খেলা দেখছে। অশ্বিনী প্রথমে তাই খেলার গতিটা আনতে চায়। আগে থাকতেই অশ্বিনী ঠিক করেছিল দু-এক ডাক দেখেই তাস ফেলে দেবে। আগে মিঃ প্রধান আর ভট্‌চাযের ভেতর খেলাটা জমুক। কিন্তু তাস তুলে দেখে, হাত ভালো। অশ্বিনী ডাকতে থাকে। সে দানও অশ্বিনী জিতে নেয়।

অশ্বিনী যা চেয়েছিল ঠিক তার উল্টোটা হলো। প্রত্যেকেই ভাবে হারা-জেতার ব্যাপারে অশ্বিনীর একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। আর অশ্বিনী যেন খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সব দানই জিতে নিতে পারে। অশ্বিনী খেলাটাকে কিছুতেই নিজের কাছ থেকে সরাতে পারে না। অশ্বিনী তাস না তুলে ডাক দিতে থাকে। সে ঠিক করে ফেলে চোখ বুজে থাকবে, যতক্ষণ না দান শেষ হয় ততক্ষণ সে তাস তুলবে না। চোখ বুজে থাকায় অশ্বিনী বোঝে না মিঃ প্রধানও তাস তোলেন নি। বেশ বারকয়েক ডাকাডাকির পর চোখ খুলে অশ্বিনী দেখে মিঃ প্রধান টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছেন—তাসে হাত দেন নি। অশ্বিনী খাড়া হয়ে বসে ডেকে যায়। ভট্‌চায অনেকক্ষণ আগে তাস ফেলে দিয়েছে। অশ্বিনী টেবিলের ওপর নিজের তাসগুলোর দিকে তাকায়, যেন সে উল্টো দিক থেকেও তাস চিনতে পারে। অশ্বিনী নিজের তাসগুলো তুলে নেয়। তারপর ফেলে দেয়। মিঃ প্রধান যখন কার কত মনের জোর দেখবার জন্য তাস না তুলে অশ্বিনীর সঙ্গে ডেকে যাচ্ছেন আর প্রথম থেকেই অশ্বিনী যখন হারতে চাইছে তখন নিজের তাস হেরে যাওয়ার ভঙ্গিতে ফেলে দিয়ে মিঃ প্রধানের ভেতর একটু বিজয়ীর আনন্দ সঞ্চার করে দিতে চায় অশ্বিনী, যাতে মিঃ প্রধান এর পরের দানে বেশ জোর দিয়ে খেলতে পারেন।

পরের দানে তাস তুলে নেয় অশ্বিনী। তারপর ডাক চলতে থাকে। কিন্তু কেউ-ই তাস ফেলেন না। অশ্বিনী আসলে চায় খেলাটাকে খেলার নিয়মে আনতে। নিজের নিজের তাসের জোরে খেলে যাওয়ার একটা জোর আছে। নিজের জ্ঞান আর অন্যের অজ্ঞানতা—এর ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা হয়। কিন্তু সবটাই অজ্ঞানতার ব্যাপার, এ-নিয়ে কোনো প্রতিযোগিতা হয় না। অশ্বিনী বোঝে তার হাতে অদ্ভুত কিছু একটা আছে এমনি চিন্তা থেকে ভট্‌চায আর মিঃ প্রধান ডেকে চলেছেন। অশ্বিনী মনে মনে বিরক্ত হয়। সে তাস ফেলে না। হঠাৎ অশ্বিনীর একটা জিদ চেপে যায়—

এরা যখন চাইছেই যে অশ্বিনী নানারকম কায়দায় তাসগুলো জিতে নিক, তখন অশ্বিনী খেলা বাদ দিয়ে জেতাই শুরু করবে। ওস্তাদ জুয়াড়ির মতো এতক্ষণ হারার চেষ্টা করে, নিজের খুশিতেই জেতা শুরু করে দেয় অশ্বিনী।

বাগানের ক্লাবে তিন তাস খেলার অভ্যাস অশ্বিনীর। সেখানে খেলার ভেতরেও নিজের পকেট থেকে পয়সা বের না করা আর অন্যের পকেট থেকে পয়সা বের করে নিজের পকেটে ঢোকানোর একটা প্রতিযোগিতা থেকেই যায়। তার ফলেই বোধ হয় সেখানে প্রতিটি ডাকের পেছনে হিসেব থাকে। সেই হিসেব করে খেলার অভ্যেস অশ্বিনীর। কিন্তু এখানে পয়সাটাও বড় কথা নয়, হিসেবটাও নয়। যেন খেলার ভেতরের অনিশ্চয়তার অংশটুকুকেই খেলুড়েরা একটু চাখতে চায় যেন খেলাটাকে সব বিষয়ে অনিশ্চিত করে তুলে খেলুড়েরা দেখতে চায় অদৃষ্ট কোন দিকে চলছে। বাগানের ক্লাবে কয়েকজন মিলে আধা গোপনে যে জুয়া খেলে, সেই জুয়োর হিসেবই অশ্বিনী চালিয়ে দেয় মিঃ প্রধানের বৈঠকখানায় যেখানে হিসেবটাই সবচেয়ে তুচ্ছ ব্যাপার।

একটা চাপা অথচ তীব্র আর দ্রুত গান হঠাৎ শুরু হতে অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে ওদিকে প্লেয়ার এনে রেকর্ড চাপানো হয়েছে। মিসেস প্রধান আর টগর একদিকে আর লক্ষ্মী চেতনা আর-একদিকে। অশ্বিনী ঘাড় ঘোরাতেই দেখে কাঁধের ওপর চুলের ঝুমকো দুলিয়ে লক্ষ্মী তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। অশ্বিনী যেদিন এ-বাড়িতে এসে নেচেছিল সেদিন কি লক্ষ্মীই তার নাচের পার্টনার ছিল। সে মেয়েটির মুখ তত অশ্বিনী মনে করতে পারে না। তারপর এত পূজো গেল, শো গেল কোথাও-ই তো আর সেই মেয়েটিকে অশ্বিনী দেখতে পায় নি। রেকর্ডের গানটি খুব বিষণ্ণভাবে কারো কথা যেন ভাবছে বা কোনো দুঃখের স্মৃতি রোমন্থন করছে। অশ্বিনী তাস তোলে।

একটা খুব চড়া সুরের বাজনা শুরু হয়ে যায়। অশ্বিনী আবার একগাল হেসে ঘাড় ঘোরায়। লক্ষ্মী তাকিয়ে হাসছে। লক্ষ্মীর উদ্ভাসিত হাসির দিকে তাকাতে তাকাতে অশ্বিনী টের পায় টগর তার দিকে তাকিয়ে, যেন এই হাসি টগরের প্রাপ্য ছিল। এইসব রেকর্ড বাজিয়ে বাজিয়ে লক্ষ্মী অশ্বিনীকে এই টেবিল থেকে তুলে নিতে চায়। কিন্তু দুবার যে অশ্বিনী তাকিয়ে হাসে তাতেই কি লক্ষ্মীর সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া শুরু হয়ে যায় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে কত ভাবেই শুরু হয়—অশ্বিনী প্রায় দার্শনিক হয়ে ওঠে। অশ্বিনী তাস তোলে।

অশ্বিনী বুঝতে পারে না তার পা কখন রেকর্ডের তালে তাল দিতে শুরু করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মনোযোগ সম্পূর্ণভাবে তার হাতে-ধরা তাসে। পয়সা এগোচ্ছে, পয়সা পেছোচ্ছে, তাস পড়ছে, তাস উঠছে, সিগারেটের ধোঁয়া নড়ছে না, পয়সা পড়ছে, পয়সাগুলো কেউ টেনে নিচ্ছে, অশ্বিনী পায়ে পায়ে রেকর্ডের তালে তাল দিচ্ছে, তাস তুলছে, তাস ফেলছে।

হাততালির শব্দে অশ্বিনী দেখে চেতনা আর লক্ষ্মী রেকর্ড প্লেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে একটু একটু নাচছে। লক্ষ্মী দুই হাত তুলে সারা শরীর দুলিয়ে গানের তালে তাল দিচ্ছে আর চেতনা কোমরে দুই হাত দিয়ে একটু একটু দুলছে। অশ্বিনী বলে ওঠে, "চলুন, এখন গান বাজনা হচ্ছে। তা ছাড়া যেতেও তো হবে।"

ছয়

"একে বলে খেলার কন্‌ফিডেন্স, দেখলেন। অশ্বিনীবাবুকে দেখে মনে হলো মোস্ট কেয়ারলেসলি খেলছেন, কিন্তু ওর কেয়ারলেসনেসের ওপর ভরসা করে আপনি যেই একস্টেপ দিয়েছেন অমনি ইউ আর গেটিং এ কিক"—ওরা টেবিল ছেড়ে এদিকে আসার সময় মিঃ প্রধান কথাগুলো বলতে বলতে আসেন।

"ঠিকই বলেছেন আপনি মিঃ প্রধান, অশ্বিনীবাবুর চেহারাটাই ভীষণ ডিসেপটিভ", বসতে বসতে ভট্‌চায বলে "তাই না টগরদি"—

"ওঃ ডেঞ্জারাস, জাস্ট ডেঞ্জারাস। আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না অশ্বিনী হাসতে হাসতে কী রকম ডেঞ্জারাস হয়ে উঠতে পারে" অশ্বিনী ভেবেছিল টগরের কথা এখানেই শেষ হবে, কিন্তু সে গলার স্বর একটু নিচুতে এনে বলে, "সে অভিজ্ঞতা আমার আছে।" টগরের গলার স্বরটা এমন হয়ে যায় যে কেউ তারপর আর জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারে না অভিজ্ঞতাটা কি। অশ্বিনীও না।

"কিন্তু ওর চেহারাতেই কেমন একটা যেন বিশ্বাস হয়ে যায়, না, মিসেস প্রধান?" টগরের কথা শুনে মিসেস প্রধানসহ সকলেই অশ্বিনীর দিকে তাকায়। এতগুলো চোখের সামনে অশ্বিনী কেমন অস্বস্তি পায়।

"ও-যদি কোনো খারাপ কাজ করে এসে দাঁড়ায়, বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে করবে না।" টগর বলেই যায়।

"কিন্তু এত সরল যাদের মুখ তারা কখনো খারাপ কাজ করতেই পারে না", একগাল হাসি নিয়ে মিসেস প্রধান বলেন।

"তা হয়তো ঠিক। কিন্তু ও আবার যার কাছে মুখ খুলবে তার কাছে ওর সব চাই। ওর এত চাওয়া কে পূরণ করবে বলুন" টগর যেন অশ্বিনীর মালিক হয়ে বসে, সেই অশ্বিনীর, যাকে নিয়ে এখানে সবাই একটা উপকথা তৈরি করছে। অশ্বিনীকে নিজে হাতে ধরে এখানে নিয়ে এসে টগর ছেড়ে দিয়েছে। এখন অশ্বিনীকে মাঝখানে রেখে গোল হয়ে বসে সবাই নতুন নতুন উপকথা তেরি করছে, টগর জানিয়ে দিতে চায়, সে উপকথা নতুন কিছু নয়, টগর অশ্বিনীকে আরো জানে। তাতে টগর অশ্বিনীর সম্পর্ক নিয়ে একটা নিশ্চিত সাক্ষ্য যদি থেকে যায় থাক। "ব্যস ব্যস, এখন নাচ হবে" লক্ষ্মী আর চেতনা নেচেই যাচ্ছিল। রেকর্ড বেজে চলেছে।

লক্ষ্মী তুড়ি .মেরে শরীর তুলিয়ে তাল দিচ্ছে আর চেতনা কোমরে হাত দিয়ে সারা শরীর দিয়ে তাল দিচ্ছে—এই যা নাচ। লক্ষ্মীর কথা শুনে যেমনি সবাই থমকে থেমেছে চেতনা একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে সারাটা শরীর থরথর কাঁপিয়ে তুলে আবার পুরনো তালে ফিরে যায়। বাজনাটা যেন তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে। লক্ষ্মী চেতনার সামনে দাঁড়িয়ে চেতনার সঙ্গে তাল রেখে শরীরটা কোমর থেকে সামনে বেঁকিয়ে কোমর থেকে পা পর্যন্ত অংশটা থরথর কাঁপিয়ে তোলে, অশ্বিনীর দিকে মুখ করে ছিল লক্ষ্মী, অশ্বিনী দেখে লক্ষ্মীর জামা ঝুলে পড়েছে, ফাঁক দিয়ে তার স্তনের রেখা দেখা যায়। যেন ওটুকু দেখিয়েই লক্ষ্মী ঘুরতে থাকে। একবার ঘোরা হয়ে গেলে আবার পুরনো তালে ফিরে যায়। বাজনাটা চলতে থাকে। চেতনা আর লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনার তালটা শরীরময় তোলে। বাজনাটা একটা পর্যায় উঠলে চেতনা হাঁটুটা বেঁকিয়ে পা ফাঁক করে তার শরীরের ওপরের অংশটা ঝাঁকাতে থাকে যেন একটা পাতায় পাতায় ছেয়ে যাওয়া ফুল গাছের গুঁড়ি ধরে কেউ ঝাঁকাচ্ছে, গাছের পাতায় আটকে থাকা জলকণায় আর ডালে ফুটে থাকা কুঁড়িতে এখনই যেন সবাই ভিজে যাবে। লক্ষ্মী তুলতে তুলতে অশ্বিনীর সামনে এসে দাঁড়ায়। "আসুন খাম্পা নাচবেন ন'" অশ্বিনী সাধারণত কারো মুখের দিকে সম্পূর্ণ তাকাতে পারে না। সে লক্ষ্মীর দিকে মুখ তুলে তার চোখে চোখ মিলিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

লক্ষ্মী সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে অশ্বিনীর সামনে খুব অলস দক্ষতায় নাচতে থাকে। অশ্বিনী তার মুখটার দিকেই তাকিয়েছিল। ডান আর বাঁ পাশে মুখ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে ঝুমকোঝুমকো চুল একবার ডান ঘাড়ে আর একবার বাঁ ঘাড়ে দোল খাচ্ছে। অথচ লক্ষ্মীর চুলের বিন্যাস একটুও পাল্টায় না। কোমরটা লক্ষ্মীর এত তুলে ওঠে মনে হয় এখনই কেউ এসে তার হাতের মুঠায় কোমরটাকে ধরলে লক্ষ্মী উড়ে যাবে। লক্ষ্মী ডাকে, "আসুন, কাম অন, ডান্স।" তার

পরই ঘূর্ণন আসে। লক্ষ্মী দ্রুত শরীর নাচিয়ে ঘুরতে থাকে। লক্ষ্মীর প্রত্যেকটি অংশ যেন কেঁপে উঠছে। স্পন্দনের এমন শারীরিক চেহারার দিকে অশ্বিনী নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। টগর সামনের সোফা থেকে রেকর্ডের বাজনা দাবিয়ে চিৎকার করে, "অশ্বিনী নাচো"। লক্ষ্মী এত বেগে মাথা ঘোরায় ডানদিক থেকে তার সব চুল এসে মুখের ওপরে আছড়ে পড়ে। একটা চোখ সম্পূর্ণ ঢেকে যায় আর ঠোঁটটা ঢাকা পড়ে। এক চোখে লক্ষ্মী চিৎকার করে ওঠে "কাম, কাম অন খাম্পা, ডান্স!" শোনায় যেন লক্ষ্মীর কথাটাও বাজনারই অংশ। ভট্চায হাত তালি দিতে থাকে। বলে, "সরকার, ডান্স।" অশ্বিনী কি করে বলে সে নাচ জানে না, সেদিন সে নেচে দিয়েছিল কিনা তা তার নিজেরই জানা নেই এখন তার ভীষণ ইচ্ছে করছে নাচতে কিন্তু সে নাচতে পারছে না। মিঃ প্রধানের মৃদু গলা শোনা যায়, "মি সরকার নাচবেন না?" অশ্বিনী মিঃ প্রধানের দিকে তাকিয়ে হাসে। অশ্বিনীর একবার মনে হয় যদি লক্ষ্মীর সামনে দাঁড়িয়ে বাজনার তালে তালে তাল দিতে পারে, যদি সবকিছু ভুলে বাজনা লক্ষ্মী আর তাল এই তিনটির সঙ্গে মিলে যেতে পারে তাহলে এমনকি অশ্বিনী নেচে ফেলতেও পারে বা। কিন্তু কিছুতেই সেটি হয়ে উঠছে না। দুপাক ঘুরে লক্ষ্মী যখন তার সামনে এসে দুহাত আলগাভাবে তুলে পাশে ঝুলিয়ে রেখে শরীর ঝাঁকাতে থাকে অশ্বিনীর ইচ্ছে হয় হাতটা এগিয়ে দেয়; কিন্তু এখন হাত এগিয়ে দেয়ার অর্থই হচ্ছে নেচে ওঠা। অশ্বিনী তো নাচতে পারছে না।

কিন্তু অশ্বিনীর কি নিজের ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা এতই প্রবল? লক্ষ্মী তার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে, নাচতে নাচতে ঝুঁকে পড়ে, তার দুটো হাত ধরে টানে। কিন্তু সে সারা শরীরে তো সেই নাচের ছন্দ পাচ্ছে না। নিজে ছন্দ তৈরি করে নেচে উঠতে পারে না অশ্বিনী। লক্ষ্মীর হাতে ধরা হাত দুটো লক্ষ্মীর শরীরের কম্পনের বেগ আর গতিতে ঝর্ঝর কেঁপে যেতে থাকে। আর হাত বেয়ে সেই বেগ

আর গতি অশ্বিনীর শরীরেও এসে যায়। অশ্বিনীর বুক ও শরীর কাঁপে। কিন্তু সে গতি তো কোমরের নিচে নামে না। অশ্বিনী বুঝতে পারে তার হাত ধরে লক্ষ্মী তাকে টানছে কিন্তু অশ্বিনীর অনড় কোমর তুলে ওঠে না। লক্ষ্মীর হাতের ভেতরে নিজের হাতটা একটু মুচড়ে অশ্বিনী ছাড়িয়ে নিয়ে হো হো হেসে হাততালি দিয়ে ওঠে। সে লক্ষ্মীর ঘনিষ্ঠ দাঁড়িয়ে শুধু হাততালি দিতে থাকে, ঘন ঘন হাত-তালি। চেতনা এসে লক্ষ্মীর পাশে দাঁড়ায়। তার পর অশ্বিনীর সামনে, অশ্বিনীর তালেতালেই তারা নিজেদের সারা শরীর কাঁপাতে থাকে। রেকর্ডটা বোধহয় শেষ হয়ে গিয়ে থাকবে, প্রায় কোনো বিরতি না-দিয়েই কেউ নতুন রেকর্ড চালিয়ে দেন। আর তাতে প্রথমেই একটা তীব্র সমবেত চিৎকার ওঠে। সবাই-ই কেমন হকচকিয়ে যায়। লক্ষ্মী আর চেতনা মিলিতভাবে রেকর্ডের চিৎকারের সঙ্গে কোরাসে চিৎকার করে ওঠে। গান চলতে থাকে। চেতনা আর লক্ষ্মী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কে কত বেগে শরীর কাঁপাতে পারে তার যেন প্রতিযোগিতা করে। অশ্বিনী গানের সঙ্গে দু-পায়ে তাল দেয়, হাতে তালি বাজায়, যেন তার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা কখন সে নেচে উঠতে পারবে। চেতনা আর লক্ষ্মী দুজন দুজনের দিকে মাথা নামিয়ে দেয়। ওদের থরথরানো দুটো শরীর থেকে চুলগুলো ঝুলে পড়েছে। মাথায় প্রায় মাথা লাগিয়ে দুজন ঘুরতে থাকে। অশ্বিনী তালি দিতে দিতে কোমর দোলাবার চেষ্টা করে—লক্ষ্মী আর চেতনার বিস্তৃত নিতম্ব মন্দ বাতাসের পুষ্করিণীর জলের মতো এমন থিরথির করে কেঁপেকেঁপে ঘুরছে আর অশ্বিনী তার কোমরটাও দোলাতে পারে না! রেকর্ডে পাগলের মতো চিৎকার ফেটে পড়ে আর চেতনা-লক্ষ্মী সোজা হয়ে চিৎকার করে ওঠে, গলা ফাটিয়ে, ঘাড় পেছন দিকে বেঁকিয়ে, কোমরে হাত দিয়ে, কোমরটা পেছনে হেলিয়ে। আর লক্ষ্মী এসে দাঁড়ায় অশ্বিনীর সামনে—ঠিক অবিকল ঐ এক ভঙ্গিতে। অশ্বিনী বোঝে

এই শেষ বার লক্ষ্মী তাকে নাচতে ডাকছে। আর ডাকবে না। কিন্তু কি করতে পারে অশ্বিনী যদি লক্ষ্মীর গাঢ় গলা বা স্পন্দিত তলপেট কোনোকিছুই তাকে নাচিয়ে দিতে না পারে। রেকর্ডে আবার তুমুল চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী তার পেছনে হেলানো মাথাটা তীব্র বেগে সোজা করে তুলতেই তার চুলগুলো চাবুকের মতো অশ্বিনীর গালে এসে পড়ে আর গরম হল্‌কায় অশ্বিনীর মুখ ঝলসে লক্ষ্মী রেকর্ডের সঙ্গে কোরাসে চিৎকার করে উঠলে অশ্বিনীও হাঁ করে চিৎকার তোলে—কিন্তু নিজের গলার স্বরটা নিজেরই এমন বেখাপ্পা বেসুরো শোনায়। অশ্বিনী থেমে যায়। তবু মুখে একটা মিথ্যে হাসি লাগিয়ে রেখে অশ্বিনী তাল দিতেই থাকে। লক্ষ্মী সরে যায় তার কাছ থেকে। লক্ষ্মীর কোমরটাকে সে ধরে নি এই অভিমানে একটা স্প্রিঙ দেয়া পুতুলের মতো লক্ষ্মী শরীরটাকে দূরে নিয়ে গিয়ে আকুল মোচড়াতে থাকে। রেকর্ডটা শেষ হওয়ামাত্র অশ্বিনী হাত বাড়িয়ে তুলে দেয়। তার পর হো হো করে হাততালি বাজিয়ে দেয়।

সাত

লক্ষ্মী আর চেতনা দাঁড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রমে ঠোঁটফাঁক করে হাঁফায় তারা। অশ্বিনী দেখে, লক্ষ্মীর মুখটা চকচক করছে। তাই দেখে অশ্বিনীর খুব ক্ষোভ হয় সে কেন নেচে উঠতে পারল না, একটু-খানি কোমর ঝাঁকালেই তো লক্ষ্মী তাকে লুফে নিত, তারপর তো তাকে আর কিছু করতে হতো না! সমস্ত ইচ্ছাশক্তির জোর খাটিয়েও অশ্বিনী একটুও কোমর ঝাঁকাতে পারল না! যদি পারত, তাহলে এখন সে লক্ষ্মীর পাশে ও-রকম চকচক মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাত। নিজের ব্যর্থতাটা সম্পূর্ণ বুঝতে অশ্বিনী আবার লক্ষ্মীর দিকে তাকায় আর সে যেন দেখতে পায় নাচের ফলে লক্ষ্মীর শিরাউপশিরার ভেতর রক্ত কত চঞ্চলগতি।

দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী ঘাড় হেলিয়ে হাঁফানো গলায় বলে, "নাচলেন না কেন?" অশ্বিনীকে হেসে উঠতে হয়। হেসে উঠে ভয় হয় হাসিটা বানানো শোনাল কি না। ফলে, আরো একটু হাসতে হয়। এমন হঠাৎ অশ্বিনীকে নিজের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করতে হয়! হেসেও লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়েই ছিল অশ্বিনী, এখন সে বলেও উঠতে পারে, "আর একবার হোক্" বা কিছু না বলে একটা রেকর্ড চালিয়ে দিতে পারে, তাহলেই আবার নাচ শুরু হবে। ঠোঁট ফাঁক ছিলই, পা-টা এগোতে গিয়ে অশ্বিনী আবার ভয় পেয়ে যায় যদি তার কোমর এবারও না দোলে। এতক্ষণ তো কেউ বুঝতে পারে নি যে সে নাচতে পারে নি। এর পরের বার তো সবাই বুঝে যাবে। আত্ম-গোপনের প্রয়োজনে অশ্বিনীকে হাসতে হয়।

টগর, মিসেস প্রধান সবাই-ই দাঁড়িয়ে উঠেছেন। এই সময়টুকু, যদি অশ্বিনী পার করে দিতে পারে তাহলে কেউ টের পাবে না অশ্বিনী নাচতে চেয়েছিল কিন্তু নেচে উঠতে পারে নি।

টগর এগিয়ে এসে অশ্বিনীর পাশে দাঁড়ায়। তারপর লক্ষ্মী-কে বলে, "আমি জানি ও কেন নাচে নি—" "কেন, কেন" চেতনা লক্ষ্মী দুজনই শুধোয়।

"লক্ষ্মী যে আজ নাচতে বলেছে"—

"তাহলে, আপনি বললেন না কেন", লক্ষ্মী হেসে বলে। সবাই এমন হাসে যেন কথাটা শেষ হলো। অশ্বিনী বুঝে উঠতে পারে না টগর কি বলতে চায়।

"না, না, কেউ বললেই ও নাচত না," টগর বলে, "ওর কাছে যখনই কিছু চাইবে, ও কিছুতেই দেবে না"—টগর ঘাড় তুলে অশ্বিনীর দিকে তাকায় আর অশ্বিনী যেন টগরের কথার একটা মানে আন্দাজ করতে পারে। টগর তাকে একটা সুযোগ দিয়েছে, এখন টগরকে নিয়ে হাসতে হাসতে সে বেরিয়ে যেতে পারে। "কিন্তু," টগর কথা বলে ওঠে আবার, "ও যখন যা চাইবে, তখনই তা দিতে

হবে এমন লোভী”—টগর অশ্বিনীর ঘাড়ে একটা আলতো চড় মারে, সবাই হেসে ওঠে—শুধু লক্ষ্মী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে অশ্বিনীকে দেখে তার পর ঘাড় বাঁয়ে ঘুরিয়ে চোখ সরিয়ে নেয়। “আপনিই তো দিয়ে দিয়ে ওর লোভ বাড়িয়ে দিয়েছেন, টগরদি”—ভট্‌চায বলে। আর অশ্বিনী পেছন থেকে দুই হাতে টগরের দুই বাহু চেপে ধরে টগরকে ঠেলে বাইরের দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলে, “এভ্‌রিবডি গুড্‌ নাইট।”

মিঃ আর মিসেস প্রধান দরজায় দাঁড়ান। ভট্‌চায তাঁদের পেছন থেকে ডেকে ওঠে, “আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান, চলুন, আমার গাড়ি আছে তো,” মিঃ আর মিসেস প্রধান সরে দাঁড়ালে ভট্‌চায বেরিয়ে আসে। টগর আর অশ্বিনী পেছন ফেরে। “না মিঃ ভট্‌চায, আমি আর অশ্বিনী একটু ঘুরে যাব, চলো অশ্বিনী,” —টগরের এই কথাটা জুড়ে অশ্বিনী দরজায় দাঁড়ানো মিঃ আর মিসেস প্রধানের অবকাশ দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি ফেলে, তার অনৃত্যসঙ্গিনীকে একবার দেখে নিতে। বহুদূরে কোথাও লক্ষ্মী সেই অভিনেত্রীর মতো, যার ওপর মঞ্চের আলো নিবে গেল। অশ্বিনীর ওপর প্রতিবাদীহীন দখল জানিয়ে টগর ডেকে ওঠে, “অশ্বিনী, চলো”—

আট

মিঃ প্রধানের বাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় টগর আর অশ্বিনী হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। মিঃ প্রধানের বাড়িতে হৈ হৈ তাস খেলা নাচ গানের ভেতর কারো মনেই ছিল না বাইরে দার্জিলিং এত নির্জন হয়ে আছে। তাই শরীর ছমছম করে। রাস্তাটা অনেকখানি সামনে নেমে চুলের কাঁটার মতো ডানদিকে বেঁকে গেছে। দূরের সেই বাঁকের আড়াল থেকে আলোমাখা এক পাঁজা কুয়াশা বাঁকের ফাঁকটাকে ঢেকে ফেলে বিপরীত দিকের খাদের ভেতর গড়িয়ে গেলে বাঁকটা আবার দেখা যায়। শরীর ছমছম করে। কারণ টগর আর

অশ্বিনীকে একাএকা ঐ বাঁকের দিকেই এগোতে হয়। তারা কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি হাঁটে। অশ্বিনীর মনে হতে শুরু করে, পেছনে, মিঃ প্রধানের ওখানে এখনো নাচ গান খেলা চলে—অশ্বিনী মিঃ প্রধানের ঘোড়াকে প্রায় জিতিয়ে দিয়েছিল, তাসের টেবিলে সবাইকে হারিয়েছে কিন্তু লক্ষ্মী-চেতনা হাত ধরে ডাকলেও সে নেচে উঠতে পারে নি, তার কোমরে তখন পক্ষাঘাত হয়েছিল। রাগত স্বরে অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করে, "ভট্‌চাযকে বললেন কেন, ঘুরে যাবেন, কোথায় ঘুরবেন?" "কোথায় আবার ঘুরব, ভট্‌চায যাতে সঙ্গে না আসে সেজন্য বললাম" "ওরা কি ভাবল!" "ভাববে আবার কি? যা ভাবার তাই ভাবল" "কি ভাবার?" "আমরা এখন কাউকে সঙ্গে চাই না" "এ-সবের মানে কি?" "মানে আবার কি? সবার সঙ্গে থাকলেও তোমার আমার ব্যাপারটা সবার থেকে আলাদা সেটা বুঝিয়ে দিলাম।" "আলাদা মানে?" "ওরা এমনভাবে কথা বলছিল যেন তোমার কোনো গোপন ব্যাপার ওদের ঐ ঘোড়া নিয়ে আছে" "সে-জন্য কি হয়েছে" "দেখলে না, লক্ষ্মী তোমাকে খাম্পা-খাম্পা বলে ডাকছিল" "তাতে কি হয়েছে?" "তুমি কি ওর ঘোড়া যে তোমাকে ঘোড়ার নামে ডাকবে?" "আমার তো তা মনে হয় নি" "তোমার আবার মনে হতে যাবে কেন?"

টগরই যেন অশ্বিনীকে নেচে উঠতে দেয় নি আর তারই ফলে যেন অশ্বিনীকে ওরা জিতে নিতে পারে নি, ফলে, এখন টগর অশ্বিনীর ওপর নিজের পুরো দখল কায়েম রেখে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে এতই নিশ্চিত যে কথার জবাব দেবার জন্য অশ্বিনীর দিকে তাকাবার দরকারও বোধ করে না আর অশ্বিনী দু-এক পা পেছিয়েই পড়ে —এখন টগরের সামগ্রিক কর্তৃত্ব মেনে না-নিয়ে অশ্বিনীর কোনো উপায় নেই। কিন্তু টগর এত নিশ্চিত বোধ করে কেন অশ্বিনী সম্পর্কে? অশ্বিনী কতটা নিশ্চিতবোধ করতে পারে? অশ্বিনীর একবার ইচ্ছে হয় পেছন থেকে দুবাহু ধরে টগরকে থামায়, তারপর

টগরকে ঘোরায়, সম্পূর্ণ, তারপর টগরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই এই প্রশ্নের মীমাংসা করে এখুনি। অশ্বিনী ওভারকোটের পকেট থেকে হাত বের করে, টগরের কাঁধের দিকে হাত বাড়ায়, দুকাঁধে হাত রাখে আর টগর পকেট থেকে ডানহাতটা বের করে কাঁধের ওপর রাখা অশ্বিনীর ডান হাতটা চেপে ধরে। অশ্বিনী তার বাঁ হাতটা টগরের কাঁধ থেকে নামিয়ে নেয়। তারপর টগরের কাঁধে হাত রেখে, হাতে হাত ধরে এগিয়ে যায়। দুজনের হাতেই গ্লাভস্। টগর হাত ছেড়ে দেয়। টগরের কাঁধ থেকে হাতটা তুলে নেবার সময় অশ্বিনী টগরের কোটের কলারটা তুলে দেয়।

অশ্বিনী এখন টগরের পাশাপাশি হাঁটে। এমনিতেই তারা বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটছিল শীতের জন্য অথবা টগরের মনের ভেতরের কোনো উত্তেজনায়। পাশাপাশি এসে যাওয়ার পর তারা আরো তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করে, প্রায় ছোটার মতো। অথচ অশ্বিনীর এখন অক্ষমতার স্মৃতিতে প্রায় স্থবির বসে পড়ার কথা। টগরই যেন পারে সেই জড়তা ঘুচিয়ে অশ্বিনীকে ছোটাতে।

"তোমার জন্য ওদের ঘোড়ার টিকিট বিক্রি হয়েছে, সেইজন্য এখন ওরা তোমার সঙ্গে ওদের ঘোড়াগুলোকে জুততে চায়"—টগরের কথার ভেতর হাঁফ ধরে। একটা কিছু জবাব দিতে অশ্বিনী ঠোঁট খুলেছিল, কিন্তু খুলেই তার মনে হয়, সে কী-ই-বা জবাব দিতে পারে এ-কথার আর সে জবাব দিক আর নাই দিক টগর একাএকাই কথা বলে যাবে। অশ্বিনী চুপ করে যায়। "এ-সব তুমি বুঝবে না।" তার নাচতে না পারাটা তো আর টগরের বোঝবার কথা নয়—অথচ সেটাই অশ্বিনীর কাছে সবচেয়ে গূঢ় কথা ছিল এতক্ষণ। এখন তার মনে হতে শুরু করে যে টগর গূঢ়তর কোনো সত্য, অনুমান করেছে বা জানে, তাতেই তার উত্তেজনা।

"তোমাকে চেনে না, জানে না, হঠাৎ লক্ষ্মী আজ প্রথম থেকেই তোমার সঙ্গে ও-রকম করে কেন?" অশ্বিনী টগরের পায়ে পা

মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অপেক্ষা করে কখন টগর আবার কথা বলতে শুরু করে, প্রায় আপন মনে। যেন টগরের নিদ্রালাপ শুনে ফেলেছে অশ্বিনী হঠাৎ জেগে উঠে, আর সেই শুনেশুনে বুঝে নিতে চেষ্টা করছে তার, অশ্বিনীর, জন্য কোথায় কোন্ ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। টগর অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে না। অশ্বিনী ভাবতে শুরু করে সে কিছু একটা বলে আবার সেই কথাবলাটা চালু করে দিতে পারে কি না। কিন্তু খানিকটা ভয়ও পায় অশ্বিনী, তার কথায় টগর যদি হঠাৎ চমকে উঠে প্রসঙ্গের খেই হারিয়ে ফেলে। "আসলে, এখানে সবারই একটা ঘটনা থাকে। তোমাকে বোধ হয় লাকি ভাবে। তাই এখন তোমার সঙ্গে লক্ষ্মীর কিছুদিন চালাবার চেষ্টা—"

"কি চালাবে?" অশ্বিনী শুধিয়ে ফেলে। তার জবাবে টগর ঘাড় ঘুরিয়ে, তুলে, অশ্বিনীর দিকে পুরো তাকিয়ে, হেসে, চোখ নাচিয়ে, কোটের পকেট থেকে ডানহাত বের করে আঙুলগুলো ঘুরিয়ে একটা মুদ্রা এঁকে বলে, "চ—ল্—বে।" তারপর, টগর মুদ্রাগুলি একে একে গুটিয়ে নেয়। প্রথমে হাসিটা বন্ধ হয়, তার পর ভুরুর ওপরের লাইন মুছে যায়, ভুরু সোজা হয়, চোখের হাসিটা সবচেয়ে শেষে নেবে আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাতের আঙুলগুলো পকেটে। তারপর অভিজ্ঞতা বর্ণনার নিরাবেগ স্বরে ফিরে যেতে টগরের গলা চাপা কাঁপে, "সবাই জানবে ইনস্পেক্টরের সঙ্গে লক্ষ্মীর এখন চলছে। আর তোমাদের চলবে।" অশ্বিনী জেনে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে কোথায় কী কী নকশা ছকা আছে, ছকা হয়ে গেছে আর তাকে নিশ্চিতভাবে সেই নকশার সঙ্গে মিল রেখে রেখেই চালানো হবে। অশ্বিনীর জন্য শুধু সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা।

টগর বলে ওঠে, "লক্ষ্মীর তো আর পেছুটান নেই, এইটাই ওর সুবিধে, চালানোটাই ওর কাজ।" টগর একটা হিসেব-নিকেশের ভেতর ঢুকে যায়। তাকে নিয়েই কোনো হিসেব-নিকেশে ব্যস্ত টগরের পাশে পাশে চলতে চলতে আর অপেক্ষা করতে করতে অশ্বিনী দেখে

তারা প্রায় চৌরাস্তার কাছাকাছি চলে এসেছে, এতক্ষণ যেখানে একপাশে খাদ ছিল, এখন সেখানে একপাশে দেয়াল, একপাশে বড় বাড়ি। পেছন থেকে তীব্র বেগে এক হল্‌কা বাতাস এসে টগর আর অশ্বিনীর ওপর ঝাঁপায়। গিরিবর্ত্মের মতো সেই রাস্তায় বাতাসের লক্ষ্যে এক অশ্বিনী আর টগরই ছিল। বাতাসের হলকা পেরিয়ে গেলে অশ্বিনী চোখ মেলে দেখে কুয়াশার ভেতর অস্পষ্ট হয়ে ঝুলছে কুয়াশার মতো কাচে লাল হরফ—কুয়াশায় ঢাকা। গিরিবর্ত্মের বাতাসের অনুসরণ করে টগর আর অশ্বিনী এগিয়ে দেখে "বার"। অশ্বিনী দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর টগরের পিঠে হাত দিয়ে লেখাটা দেখায়।

নয়

বার-এর দরজার দিকে এগোতে এগোতে টগর বলে, "লক্ষ্মীর সঙ্গে তোমার অবিশ্যি আরো কিছুও হতে পারে, লক্ষ্মীর তো আর পেছুটান নেই। তবে, একটা অসুবিধে, আমি আছি।" অশ্বিনীর ব্যাপারে গোলাপ কত অবান্তর, ভেবে, অশ্বিনী বারের দরজায় হাত দিয়েছে যেই, পেছন থেকে টগর তার পিঠে কিল মেরে বলে, "আর তুমিই বা এত ন্যাকামি করছ কেন, লক্ষ্মী এত বলা সত্ত্বেও তুমি তো নাচলে না, বরং, বেরোবার সময় আমাকে নিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলে!" একদিকের পাল্লা খুলে সেই ফাঁকটা গলে অশ্বিনী ভেতরে যায় আর তার গায়ে লেপ্টে যায় টগর। পেছন থেকে ডানহাতে অশ্বিনীর কোমরটা জড়িয়ে বলে ওঠে, "তোমাকে সব বেওয়ারিশ ভেবেছে নাকি। যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ এদিকে কাউকে হাত বাড়াতে দিচ্ছি না"—

ভেতরটায় আলো খুবই কম। সারি সারি চেয়ার-টেবিল সাজানো আছে, একটিও লোক নেই। বড়দিনে ঝোলানো লাল নীল কাগজের শিকল আর মাঝখানে একটা বিরাট ফুল ঘরটা জুড়ে।

দূরের এক কোণায় শিকল খুলে ঝুলছে। অশ্বিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাশে। ঘরটার বিপরীত কোণা থেকে প্রায় একটা ক্ষেত পেরিয়ে চষা ক্ষেতের মতো মুখখানা নিয়ে এসে এক বুড়ি দাঁড়ায়। অশ্বিনী একটা বড় রাম চায়। বুড়ি সেই একই গতিতে হেঁটে ঘরের বিপরীত কোণায় পার্টিশনের আড়ালে চলে যায়।

অশ্বিনী ভেবেছিল,—বারে ঢুকবে, এক চুমুকে খানিকটা খেয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে যাবে,—আসলে টগর যে ভেতরে আসবে এটা সে ভাবে নি। কিন্তু বুড়ির সেই অতি ধীর গতি অশ্বিনীর সমস্ত পরিকল্পনাটিকে বেতাল করে দিল, টগরসহ অশ্বিনীকে অপেক্ষা করতে হয়।

দুই হাতে টুংটাং বাজাতে বাজাতে সেই বুড়ি ঘরের আরেক কোণ থেকে অনেকক্ষণ ধরে এই কোণায় আসে। সাদা কাপড়ে ঢাকা টেবিলগুলো আর চেয়ারের পিঠের ওপর দিয়ে বুড়ি ভেসে ভেসে আসে—তার আসার গতিটা এত বাধাহীন সাবলীল। সবচেয়ে কাছের টেবিলটাতে বুড়ি তার দুহাত থেকে একে একে সোডার বোতল, বোতল খোলার চাকতি, গেলাস দুটো, মদের বোতল আর পেগ-টা রাখে। তার দশ আঙুল আর দুটো পাঞ্জার ভেতর এই এতগুলো জিনিস ধরা ছিল। সে প্রত্যেকটি জিনিস একেএকে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর জিনিসগুলো যেমন পর্যায়-ক্রমিক প্রয়োজনে সজ্জিত হয়ে যায়, তাতেই তার পেশাদারি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সেই শীতের সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। অশ্বিনী আঙুল দিয়ে দেখায় গেলাস আনা হয়েছে দুটো। জিনিসগুলো টেবিলের ওপর নামানো হয়ে গেলে বুড়ির হাতদুটো থরথর কাঁপে, এতটা, যে বিশ্বাসই হয় না এই কাঁপা হাতে সে এতগুলো জিনিস নিয়ে এসেছে। কাঁপা কাঁপা হাতে বুড়ি মদের বোতলটার গলা টিপে ধরে। বোতলের ভারে বুড়ির ডানহাতের কাঁপা বন্ধ হয়। বাঁ হাত দিয়ে বুড়ি খুব ধীরে ধীরে মদের বোতলের মুখটি-টা খোলে।

অশ্বিনীর ইচ্ছে হয়, বুড়ির হাত থেকে বোতলটা নিয়ে সে তাড়াতাড়ি এক পেগ ঢেলে খেয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু অশ্বিনীর ভেতরের সেই তাড়া আর অশ্বিনীর নিজস্ব ছন্দর গতি ব্যাহত করতেই বুড়ি যেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত চালের ছন্দ নিয়েছে। বুড়ি থরথর হাতে পেগ-গ্লাসটা তুলে নেয়, তারপর থরথর হাতে গ্লাসটা বোতলের মুখে লাগায়। অশ্বিনী ভাবে, এইবার মদ ছড়িয়ে পড়ে ঘরময় গড়িয়ে যাবে। হাতের কাঁপুনিতে বোতল আর গ্লাসে লেগে টুং টাং শব্দ হয়। বুড়ি ধীরে ধীরে মদের বোতলটা কাত করতে থাকে। যত কাত করে বাঁ হাতের পেগটা তত বেশি কাঁপে। এত বেশি সময় ধরে বুড়ি এই কাজটা করে যে অশ্বিনী আর দেখতে পারে না। সে অন্যদিকে তাকায়। তারপর যখন চোখ ফেরায় তখন দেখে মদের বোতলটা অনেকখানি কাত, বোতলের ভার খানিকটা পড়েছে বুড়ির হাতে ধরা পেগের ওপর, ফলে পেগটা আর কাঁপছে না, আর বোতল থেকে আস্তে আস্তে মদ গড়িয়ে পড়ছে পেগের ভেতরে, সরু ধারায়। ধীরে ধীরে পেগটা ভর্তি হয়ে উঠছে। প্রায় যখন কানায় এসে ঠেকে অশ্বিনী বলে উঠতে চায় 'থাক্ থাক্', কিন্তু বুড়ি কানাও ভর্তি করে ফেলে আর ঠিক মাঝখানটা একটু ফুলে ওঠে, যেখান থেকে মদটা গড়িয়ে পড়ে যাবে, গড়ালোও, আর সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি টেবিলের ওপর রাখা কাচের গ্লাসের ভেতর পেগটাকে উপুড় করে দেয় আর ডান হাতে মদের বোতলটা সোজা করে তুলে ধরে। এক ফোঁটা মদ বাইরে না ফেলে বুড়ি পেগটা গ্লাসের ভেতর নিঃশেষ ঢেলে আবার থরথর কাঁপা হাতে বোতলের মুখে রাখতে গেলে অশ্বিনী হাত তুলে নিষেধ করে। বুড়ি প্রথমে পেগ-গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখে। বোতলটা বুড়ির হাতে ঘণ্টার মত দোলে। সেটা তুলে রাখে। সোডার বোতলটা বুড়ি টেবিল থেকে তোলে না। বাঁ হাতে বোতলের গলাটা চেপে ধরে ডান হাতে চাকতিটা তুলে নেয়। ডান হাতটা কাঁপে বলে বুড়ি

ফাঁকটার ভেতর মুখটিটা আটকাতে পারবে না, এই অভিজ্ঞতাতে, মুখটির ওপর চাকতিটাকে চেপে সরিয়ে চাকতির ফাঁকের ভেতর মুখটিটা গলিয়ে নেয়। তারপর একটা টান, নিস্তব্ধতার ভেতর খর শব্দ তুলে মুখটিটা কোথাও গড়িয়ে যায়, ফোঁ-অ-স্ করে বোতলের ভেতরের গ্যাস বেরোবার শব্দ হয় আর তারপরই গেলাসে জলঢালার শব্দ।

গেলাস ধরার আগে অশ্বিনী পকেট থেকে টাকা বের করে বুড়িকে দেয়। বুড়ির ধীরতায় অস্থির অশ্বিনী যেন নিজের গতি ফিরে পেতে চায়। বুড়ি যতক্ষণে সেই নোট, বোতল, ছিপি খোলার চাকতি, পেগ-গ্লাস গুছিয়ে নিয়ে টুকটুক করে ঘরটা পার হতে শুরু করে, ততক্ষণে অশ্বিনী গ্লাসটা তুলে নিয়ে একটা বড় চুমুক দেয়। টগর তাকিয়ে আছে দেখে বলে, "আপনাকেও তো দিচ্ছিল।"

"দেখি, তোমারটা একটু টেস্ট করি"—

"তাহলে আরেকটা দিতে বলি, ছোট, আপনি যে-টুকু পারেন খাবেন, বাকিটুকু আমি খেয়ে নেব"—

"না, আমি খাব না, একটু জিভে ঠেকাব, মদ তো নাকি এঁটো হয় না।"

টগর অশ্বিনীর হাতের গ্লাসটা ধরে। ওভারকোটের একটা ভাঁজ সম্পূর্ণ খুলে অশ্বিনী টগরকে নিজের কোটের ভেতর টেনে নেয়। আর অশ্বিনীর বুকে মাথা ঠেকিয়ে টগর অশ্বিনীর হাতে ধরা গ্লাসটার ভেতর জিভ ঢুকিয়ে দেয় একটুখানি, শুধু জিভের আগাটুকু। টগর মুখ তুলে বলে, "উঃ, তেতো।" অশ্বিনী মাথা নিচু করে হাসে। তারপর গ্লাসটা আবার টগরের ঠোঁটের কাছে তোলে এবার আর টগরকে মাথা ততটা নিচু করতে হয় না। সে জিভটা লম্বা করে ঢুকিয়ে দেয়, একটু বেশিই, তারপর জিভটা গুটিয়ে নেয়। গেলাসটা ছেড়ে দিয়ে, চোখ মুখ কুঁচকে একটা ঢোক গিলে, "খাও" বলে

অশ্বিনীর বুকের কাছে দুই হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঁ হাতে কোটের ভেতরে টগরকে জাপটে রেখে এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করতে করতে অশ্বিনী দেখে পাওনা টাকা ফেরত দেবার জন্য বুড়ি ঘরে ঢুকেই ফিরে যায়। আর আসে না। ঠক্ করে গ্লাস রেখে "যাচ্ছি" বলে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও নয়!

দশ

বার থেকে বেরিয়ে টগর ডাইনে ঘোরে। অশ্বিনী তার বাঁ বাহু চেপে ধরে বলে, "চলুন, একটু ম্যাল ঘুরে যাই।" "এত রাতে আবার ম্যালে কি করবে"—টগর বাঁয়ে ঘোরে, তার বাহু অশ্বিনীর মুঠোতে ধরা।

রাস্তার আলো কুয়াশায় নিষ্প্রভ হয়ে আসে। অশ্বিনীর বাগানের মতো ভারি নিরেট কুয়াশা নয়, পেঁজা কুয়াশা। এতক্ষণ কুয়াশা অনড় ছিল না, পাতলা কুয়াশা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এখন কুয়াশা আর নড়ছে না, পেঁজা কুয়াশা স্থির হয়ে যাচ্ছে। যে রাস্তা দিয়ে টগর-অশ্বিনী উঠছিল—বাঁ পাশে দালানের সারি আর ডান পাশে মাথার ওপরের একটা রাস্তার দেয়ালের অন্তর্বর্তী—সেটা খুব তীব্র ঢালে অনেকখানি সরল নেমে নিচে যে-জায়গাটায় বাঁয়ে বেঁকে গেছে পেছনের সেই জায়গাটাকে এতদূর থেকে মনে হয় দালানে দেয়ালে একটা গোলকধাঁধার মতো। সেই বাঁক থেকে এক পাঁজা পাতলা কুয়াশা হঠাৎ দ্রুত উঠে আসতে থাকে। কালো, নির্জন, নিঃশব্দ রাস্তায় কুয়াশার পাঁজার সর্পিল দ্রুত উঠে আসার সঙ্গতি রেখেই রাস্তাময় পাহাড়ময় টগর আর অশ্বিনীর পদধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজে। কুয়াশার পাঁজা টগর আর অশ্বিনীর ওপর পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের টপকে যায়, তার পর তাদের সামনে দিয়ে দ্রুততর বেগে চড়াই ভেঙে ম্যালের দিকে উঠে যায়। টগর হঠাৎ থমকে থেমে বলে, "অশ্বিনী, এখন আর ম্যালে যাব না, চলো, বাড়ি ফিরি।" অশ্বিনী কোনো

কথা বলে না, হাঁটাও থামায় না। টগরের বাহু অশ্বিনীর হাতে ধরা ছিল। সেই টানে টগর-কে হাঁটতে হয়, উঠতে হয়। ম্যালের আলো-গুলোর মাথা দেখা যাচ্ছে। তারা যত উঠছে ডান হাতের রাস্তাটা তত নিচু হয়ে আসছে। আর-কয়েক পা উঠতেই তারা ম্যালের সীমানায় পা দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর থেকে হাওয়া, যেন বাঁধভাঙা এত আকস্মিক ও প্রবল, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, টগর চমকে উঠে অশ্বিনীর পেছনে চলে গিয়ে অশ্বিনীকে জড়িয়ে ধরে। অশ্বিনী ম্যালের দিকে, বাতাসের দিকে, পেছন ফিরে টগরকে জড়িয়ে রাখে। সেই গিরিবর্ত্মের মাথায়, রাস্তার মাঝখানে, উত্তরের হাওয়া এসে অশ্বিনীর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টগরকে নিয়ে অশ্বিনী খুব ধীরে ধীরে ডাইনে সরে যেতে যেতে দোকানের সারির বারান্দায় ঢুকে থামের আড়াল নেয়। থামের আড়ালে চলে যেতেই তাদের গায়ে একটু বাতাসও লাগে না। অশ্বিনী ঘুরে গিয়ে টগরকে থামের গায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়, নিজে সামনে দাঁড়ায়, টগরকে জড়িয়ে রাখে আর তারা দুজনই ম্যালের দিকে তাকিয়ে দেখে শূন্য খটখটে ম্যালে একটুও কুয়াশা নেই, হাওয়ায় হাওয়ায় হাওয়ায় পাইন বন থেকে চাবুকের শব্দ। টগর ফিসফিস কিছু বলে, হাওয়ায় শোনা যায় না।

ভানুভক্তের মূর্তির পেছনের পাহাড়ের দু পাশের রাস্তা গলে উত্তর থেকে তুষারপাতের হাওয়া ম্যালের সমতল অংশটুকু পেরিয়ে বিপরীত দিকের তিনটি রাস্তা দিয়ে দক্ষিণে ধেয়ে যায়,—ক্যালক্যাটা রোড বয়ে, জলপাহাড়ের রাস্তা ঠেলে আর শহরের ভেতরে নিচে যাবার রাস্তা বেয়ে—দৌড়ের ট্রাক মেনে রেসের ঘোড়ার ছোটার মতো। এ হাওয়া বন্যার জলরাশির মত, পাহাড়ে পাহাড়ে গিরিবর্ত্মের ফাঁক, ঝর্ণা আর নদীর খাত, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, পাইনের পত্রহীন কাণ্ডদেশের আড়ালে আড়ালে অবধারিত ছুটে যায় কিন্তু বাতাসের খাত থেকে একটু সরে দাঁড়ালে আর গায়ে লাগে না। তীরে দাঁড়িয়ে যেমন,. তেমনি দেখা যায়, পাহাড় উপড়ে নিতে পাহাড়ের

গায়ে আছড়ে পড়ে হাওয়া, তারপর খানখান হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়।

টগর বলে ওঠে, "অশ্বিনী, বাড়ি ফিরে চলো, এ-তো বরফের হাওয়া।" টগরের পেছনে থাম, সামনে অশ্বিনী, টগরের পিঠ জুড়ে অশ্বিনীর ছুটো হাত। টগরকে আরো বেশি অবরুদ্ধ করে অশ্বিনী বলে ওঠে, "আপনি কারো সঙ্গে আমাকে মিশতেও দেবেন না, নিজেও এ রকম করবেন, না?" পাশ দিয়ে যখন হাওয়ার বাঁধভাঙা বান আর পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে হাওয়া যখন খান খান তখন অশ্বিনীর এই চাপা, স্পষ্ট চিবুনো অথচ শাসানি নয় এমন কথা কেমন অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে। টগর গলা নামিয়ে অন্যদিকে চাইবার চেষ্টা করে, বলে, "না, বাড়িতে তো ফিরতে হবে।" তারপর, পেছনে দেয়াল আর সামনে অশ্বিনী—এই অবরোধ থেকে ডাইনে গলে যায়। ধীর ছু-পা হাঁটে। একটু দাঁড়ায়। সোজা তাকিয়ে থাকে। তারপর সেই তাকানোর ধারাবাহিকতাতেই পেছনে তাকিয়ে দেখে অশ্বিনী আসছে না। "কী হলো, চলো"—টগর একটু হেসে ছু-পা ফিরে গিয়ে অশ্বিনীর হাত ধরে টানে। অশ্বিনীও একটু হেসেই বলে, "চলুন। আসলে, আমি দেখতে চাইছিলাম আপনি যে এতক্ষণ কী সব বলছিলেন না, আপনি কতদূর যেতে পারেন।" এবার অশ্বিনী এগিয়ে যায়। অশ্বিনীর হাতধরা টগরের হাত খসে যায়। টগর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। "চলুন" অশ্বিনী এগিয়ে দাঁড়িয়ে বলে। টগর দাঁড়িয়ে অশ্বিনীর বিপরীত দিকে তাকিয়ে থাকে। ঋতুকালে ম্যলের জনাকীর্ণতায়, অপরিচয়ে টগরের এই ঘোরানো ঘাড়ে কারো জন্য প্রতীক্ষা বোঝাতে পারত। টগরের ঘাড়ের এই পাক খেয়ে যাওয়া অশ্বিনীর চোখে অপরিচিত ঠেকে। সহসা দ্রুত পায়ে টগর পাশে এসে বলে, "মানে, আমি কতদূর যেতে পারি?" "এই তো, আমি এখন বেড়াতে চাইছি আর আপনি এখন বাড়ি ফিরতে চাইছেন।" অশ্বিনীর কোটের ওপর একটা ছোট্ট কিল মেরে

টগর বলে, "তোমার যত দুষ্টুমি। এখন হলো বেড়াবার সময়? কোথাও জনপ্রাণী নেই—চলো, আর বাইরে থাকা যায় না"—টগর অশ্বিনীর বাঁ হাত ধরে দোলাতে দোলাতে দোকানের সারির বারান্দা দিয়ে হাঁটে যেন এখন ঋতুকাল, ম্যলে নরনারী শিশু, আর রঙিন সন্ধ্যা আর ফোয়ারার জল, যেন তার মাত্র দুই হাত বাঁয়ে গিরিসংকটে সেই বাতাস আর ছুরির মতো খর বইছে না। ধরাধরি হাত টগর এমন দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটে যেন তারা বাড়ি পৌছে যাবে। "চলুন ম্যালটাতে একটা পাক দিয়ে আসি" বলেই অশ্বিনী টগরকে পেছনে রেখে ঢাকা বারান্দা থেকে খোলা জায়গায় নেমে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ঝাপট মেরে তার মাথা নুইয়ে দেয়, মাথা নিচু করে অশ্বিনী ডান হাত দিয়ে মাথার টুপিটা চেপে ধরে, তার বাঁ হাত তখনো টগরের ডানহাতে টানটান—টগর দেয়াল, থাম আর ছাতের নিরাপত্তায়। টগরের হাত না ছেড়ে অথচ টগরকে না ডেকে অশ্বিনী ম্যলের আঙিনায় পা বাড়ায়। তাদের হাত পরস্পরের মুঠোয় ছিল না, পরস্পরের আঙুলে আঙুলে খুব আলগা লেগে ছিল, কেউ ধরে রাখে নি, খসে যেতে পারত। টগর পায়ে পায়ে বারান্দার কিনারায় আসে, তারপরও মুহূর্তের সঙ্কোচের শেষে সেই বাতাসের ভেতর বাধ্যত নেমে যায়, নেমে গিয়েই মাথা নিচু করে, যেন ডুবে ভেসে যাচ্ছে। হাওয়া টগরকে যেন ঠেলে নিয়ে যাবে। আর নিজেকে বাঁচাতে অশ্বিনীর হাত ছেড়ে দিয়ে টগর দুই হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে যায়, অশ্বিনীর চাইতেও। ম্যলের মাঝামাঝি বাতাসের ধাক্কাটা কম, টগর সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। যেন নদীর একপার থেকে আর-এক পারে কথা বলছে এমন চিৎকার করে অশ্বিনীকে বলে, "অশ্বিনী, এ বাতাসে এ-ভাবে থাকতে নেই, ফ্রস্ট বাইট-টাইট হতে পারে, নিমুনিয়া হতে পারে, এ তো বরফের হাওয়া।" তখন অশ্বিনী হাসি মাখানো চিৎকারে জবাব দেয়, "চলুন ফিরি"। ঐ বাতাস পেরিয়ে যতটুকু কথা টগরের কাছে

আসে তাতেও অশ্বিনীর হাসির গমক কিছু মিশে থাকে। টগর খানিকটা নিশ্চিতস্বরে বলে, "তুমি একটা যা তা, কখন যে কি মাথায় চাপে, চলো।" তাদের আবার বাতাসের সেই স্রোত পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। "আপনি এদিকে আসুন" টগর-কে অশ্বিনী বাঁ দিকে আনে। তার পর টগরকে আড়াল করে, বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে, টগরের ওপর মাথা নুইয়ে টগরকে হাওয়া থেকে ঢেকে নিয়ে অশ্বিনী পাশাপাশি হেঁটে আবার সেই বাতাস পেরোতে শুরু করে। অশ্বিনীর বুকের ভেতর থেকে টগর বলে, "কি? তোমার পরীক্ষায় পাশ করেছি তো?" টগর আস্তেই বলতে পারে, কারণ অশ্বিনীর কাছে পৌঁছবার আগে বাতাস তার কথা ওড়াতে পারে না। কিন্তু অশ্বিনীকে খুব জোরে জিজ্ঞাসা করতে হয়, "কি, কি"—

"সেই যে বললে, আমি কদ্দ্‌র যেতে পারি"—

"পরীক্ষা কিসের?"

"কদ্দ্‌র যেতে পারি, তুমি যে বললে"—

"সে তো এমনি"—

"তবু পাশ না ফেল?"

"পাশ, পাশ"—পরস্পরের লগ্ন থেকে একজন প্রায় ফিসফিস স্বরে আরেকজন প্রায় চিৎকার করে, এই কথা বলতে বলতে বারান্দার কাছাকাছি আসতেই দুজন ছুটে বারান্দার ভেতর ঢুকে যায়, তারপর দুজনই একসঙ্গে হেসে ওঠে। "চলো, চলো, তোমার সঙ্গে আর পারা যায় না।" টগর এগিয়ে যায়। সেই বারান্দাটা শেষ হয়েছে ঢালু রাস্তায়। সে রাস্তার ঢাল বেয়ে তখন বাতাস এমন চণ্ড ধেয়ে যায় যেন রাস্তার পিচ শুদ্ধ্‌ উপড়ে ফেলবে। বারান্দার শেষে রাস্তার শুরুতে একটা খুব সরু সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে। ওরা বারান্দা থেকে নেমেই সেই সিঁড়িতে পা দিয়ে নিচে নামতে শুরু করে। তখন সেই প্রবল ঝড় তাদের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। মাটির ওপরের ঝড় থেকে বাঁচতে ওরা মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যায় যেন।

অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে মাথার ওপর অনেক উঁচুতে পাইন আর ধূপগাছের মাথায় কি প্রবল ঝড় আকাশ থেকে, গাছ বা পাহাড়ের মাথা থেকে মাটির ওপর আছড়ে পড়ছে আর তারপর মাটি খুবলে ভেতরে ঢুকতে চাইছে। মাটির ওপর বাতাসের আছড়ে পড়ার ভয়ঙ্কর শব্দ কানে নিয়ে তারা তাড়াতাড়ি নামতে চেষ্টা করছিল কিন্তু সিঁড়ির ধাপগুলো ছোট ছোট, ফলে তাড়াতাড়ি নামতে পারছিল না। পরে, একটা বাঁক নেয়ার পর যখন হঠাৎই বাতাসের শব্দ আর শোনা যায় না, টগর বললো—"তুমি আবার ভেব না, আমি তোমাকে কারো সঙ্গে মিশতেই না করছি"—

"কারো সঙ্গে মানে"—

"মানে, তুমি হয়তো ভাবছ. আমি চাই না তুমি কারো সঙ্গে মেশো"—

"তা ভাবব কেন, আপনি কি আর আমার যাদের সঙ্গে পরিচয় আছে তাদের সবাইকে চেনেন"—

"না। তাদের কথা বলছি না। এই লক্ষ্মীর কথা বলছি, তুমি বললে তো"—

"কি বলছেন লক্ষ্মীর কথা"—

"না, ওদের সঙ্গে মিশবে বই কি, তাছাড়া মিঃ প্রধান এখানকার এত বড় লোক, ওদের সঙ্গে সবাই ঘনিষ্ঠতা করতে চায় আর তোমাকে তো ওরা নিজেরাই ডেকে নিয়ে যাচ্ছে"—

অশ্বিনী কোনো জবাব দেয় না। ওরা সিঁড়িটা শেষ করেছিল। এবারের রাস্তাটা সরু, পাশে লোহার রেলিং, নিচে তাকালে অনেক-দূর পর্যন্ত দেখা যায়, রাস্তায় আলো জ্বলে আছে, কোথাও কোনো মানুষ নেই।

"আমার তো বয়স হয়েছে—আমি কি আর তোমার সঙ্গে তোমার মতো দৌড়ঝাঁপ করতে পারি। লক্ষ্মীর মতো সঙ্গী হলে কখনো কখনো তোমার ভালো লাগাবে। তখন ওদের ওখানে যেও।" অশ্বিনী কথার

কোনো জবাব দেয় না। টগর চুপ করে যায়। ওরা সমতল রাস্তাটায় পৌঁছে যায়। খানিকটা হাঁটলেই বাড়ি। তখন ওরা আর তত তাড়াতাড়ি হাঁটে না। টগর বলে, "তুমি তো আর বেণুর সঙ্গে গল্পগুজবও করো না আজকাল, অথচ ও তোমার সঙ্গে কত গল্প করতে চায়।" ওরা বাড়ির দরজায় পৌঁছে যায়। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে টগর বলে, "আজ রাতে বেণুর সঙ্গে গল্প কোরো।" অশ্বিনী সিঁড়ি ভাঙে। "তোমার ভালো লাগবে, দেখো।" ওরা দরজার সামনে দাঁড়ালে টগর বলে, "শুধু আমার আঁচল ধরে থাকা চাই, নাকি।" দরজার সামনে অশ্বিনীর পিঠে মুখ লাগিয়ে টগর দাঁড়ায়।

আর, দুপুরে গোলাপকে আস্বাদ্যমান আঘাতে বিবশ রেখে, বিকেল-সন্ধ্যায় টগরকে নিয়ে ঝড় পেরিয়ে, এখন বেণুর দরজায় এসে অশ্বিনী ঘা দেয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খাওয়ার টেবিলে তিনজনই খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। কেউই কোনো কথা বলে না। সবচেয়ে আগে টগরের খাওয়া শেষ হয়। সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে মুখ ধুয়ে ঘরে যেতে যেতে বলে, "বেণু, আমি শুয়ে পড়ছি, অশ্বিনীর বিছানা তুই করে দিস।"

অশ্বিনীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে তবু টেবিলে বসে থাকে। বেণু তখনো খাচ্ছে। অশ্বিনী খুব শান্ত স্বরে শুরু করে—"দার্জিলিঙে তো কুয়াশাই নেই, ঠাণ্ডাও যেন কম মনে হচ্ছে।" বেণু একবার চোখ তুলে চায় তারপর খেয়ে যায়। বেণুর খাওয়া হয়ে গেলেও সে উঠতে পারে না, ডিসে আঁকিবুকি কাটে। "তবে আজ দেখলাম খুব বাতাস দিচ্ছে, ওপরে"—অশ্বিনীর কথা শুনে বেণু আবার চোখ তুলে তাকায় ও চোখ নামিয়ে নেয়। "আমাদের ওখানে অবিশ্যি কুয়াশার ঝড় চলছে, আজ বিকেল থেকে"—অশ্বিনী খুব অলসস্বরে বলে। "লোকে বলছে নাকি বরফ পড়তে পারে।"

বেণু চেয়ারে সোজা হয়ে বসে। তারপর উঠে পড়ে। বেণুর মুখ ধোয়া হয়ে গেলে অশ্বিনী ওঠে। মুখধোয়া সেরে অশ্বিনী যখন ঘর ছেড়ে যায়, তখন বেণু টেবিল পরিষ্কার করছে।

ভেতরের ঘরের দরজার আড়াল থেকে একটা ক্যাম্পখাট এনে অশ্বিনী সেটার ভাঁজ খুলে পেতে ফেলে। লেপ-কম্বলের একটা স্তূপ সহ বেণু ভেতর থেকে এসে দরজায় দাঁড়ায়। অশ্বিনীর পাতা ক্যাম্পখাটটার ওপর লেপ-কম্বলগুলো নামিয়ে বেণু তাড়াতাড়ি বিছানাটা পেতে ফেলে। "হটওয়াটার ব্যাগ দিয়ে যাচ্ছি"—বেণু দরজার দিকে মুখ ফেরায়, তারপর বেরিয়ে যায়। অশ্বিনী খাটের কাছে দাঁড়িয়ে। সেখান থেকে এগিয়ে বেণুর হাত ধরা যায় না।

আর অশ্বিনী ঠিক নিশ্চিতও নয়, এখনো সে বেণুর হাত ধরতে পারে কি না। দরজার কাছে থাকলে হাতটা বাড়িয়ে সে বেণুকে আটকাতে বা আটকানোর ভঙ্গি করতে পারত। একটা ভঙ্গির অভাবে অশ্বিনীকে অসহায় দেখায়।

দরজার দিকে পেছন ফিরে অশ্বিনী প্রথমে ওভারকোটটা খুলে চেয়ারের ওপর রাখে। তারপর একেএকে পোশাকগুলো খোলে। নিচে একটা উলের ড্রয়ার আর ফুল হাতা গেঞ্জি। সেটা খোলে না, তারপর পাজামাটা পরে নেয়। পাজামার ফিতে-তে যখন গিঁট দিচ্ছে তখন পেছন থেকে হট-ওয়াটার ব্যাগটা এসে বিছানার ওপর পড়ে। দরজায় বেণু।

"আপনি তো রাত্রিতে আগুন পোয়ান" "হ্যাঁ", এখানে আসুন না, একটু পোয়াই।" বেণু একটু দাঁড়িয়ে থেকে মুখে হাত চাপা দেয়। তারপর চলে যায়। অশ্বিনী ভাবে, বেণু যদি আগুনটা রেখে চলে যায়। যদি না বসে!

একটা ছোট উনুনে কাঠ কয়লার উনুনে আগুন নিয়ে বেণু ঘরে ঢোকে। উনুনটার হাতল ভেঙে গেছে তাই ন্যাকড়ার দুটো পুটুলি দিয়ে বেণু সেটাকে তুলে এনেছে। আঁচ থেকে বাঁচাবার জন্য মুখটা বাঁয়ে ঘোরানো। উনুনটা মেঝের ওপর রেখে বেণু কার্পেটের ওপর বসে পড়ে। বেণু হাত পা সেঁকতে শুরু করে দেয়। অশ্বিনী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তার পা দুটো একে একে কয়েকবার আগুনের ওপর ঘুরিয়ে নেয়। তারপর পা নামিয়ে একটা সিগারেট ধরায়।

চেয়ারে হেলান দিয়ে, মাথাটা একদিকে হেলিয়ে অশ্বিনী সিগারেট টেনে যায়, খুব ধীরে ধীরে। অশ্বিনী বেণুর সঙ্গে গল্প করতে চায় কিন্তু গল্পটা তাকেই শুরু করতে হবে কিনা বুঝতে পারে না অথবা গল্প শুরু করার কোনো উদ্যম পায় না। আর মদের নেশাটা তখন অশ্বিনীর মাথায় উঠেছে। মাথাটা ঝিমঝিম করে। ফলে তার সময়ের বোধটা খানিক গোলমাল হয়ে যায়। এ-সবের

ভেতরেও অশ্বিনীর আশঙ্কা হয়, কথা শুরু না করলে বেণু উঠে চলে যেতে পারে।

দুই

উনুনের দিকে চোখটা নামিয়ে রেখে বেণু খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করে, "আপনাদের ওখানে কুয়াশার ঝড় বলছিলেন—"

"হ্যাঁ, আজ বিকেল থেকে।" অশ্বিনী থেমে যায়, যেন এটুকুই তার বলার। তারপর, যে কোনো জায়গাতেই সে থেমে যেতে পারে এই রকম স্বরে বলে যেতে থাকে "কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কি করে যে গাড়ি চালিয়ে এলো?" বেণু কোনো কথা না বলে চোখ তুলে তাকায়। বেণুর সেই তাকানোর দিকে না তাকিয়ে অশ্বিনী বলে, "কিন্তু এত বাতাসেও কুয়াশা উড়ে যায় নি। বরং বাতাসের ধাক্কা ঠেকাবার জন্য কুয়াশাগুলো যেন দলা পাকিয়ে যায়।" অশ্বিনী থামলে এবারও বেণু তাকায় ও অশ্বিনী আবার কথা শুরু করলেও তাকিয়ে থাকে। তারপর চোখ নামিয়ে নেয়। "কোথা থেকে যে এত কুয়াশা আসে! এর যেন শেষ নেই। আমি ভাবলাম এই কুয়াশার ভেতর গাড়িটা নিশ্চয়ই খাদে পড়বে। কিন্তু পড়ল না"—অশ্বিনী বেণুর চোখে চোখ রেখে কথাটা শেষ করতে পারে। তারপর চোখ সরায় না। বেণু বলে, "কিন্তু দেখতে খুব ভালো লাগল, না?" অশ্বিনী একটু হেসে বলে, "জানেন, ঐ ঝড়ের ভেতর পড়ে ঝড় দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল আপনাকে গিয়ে এই ঝড়ের গল্প করতে হবে।" ম্লান হেসে বেণু মাথা নোয়ায়। অশ্বিনী বলে, "কিন্তু আপনি আজকাল যেরকম গম্ভীর থাকেন—"

"কই, না তো" —বেণু চোখ তোলে।

"না তো? এখনো তো গম্ভীর হয়ে আছেন" অশ্বিনী এমন স্বরে বলে যে বেণু একটু হেসে ফেলে। ও চোখ নামায়। হাসিটা সম্পূর্ণ

না মুছে মুখটা তুলে বলে, "আসলে, এখানে এলেই তো আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই—" "কিসের ব্যস্ত ?"

"সবার সঙ্গে দেখা শোনা। বৌদিও আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। তাই—"

"তাই আপনি আজকাল কথা বলার সময়ই পান না। আজ ঐ ঝড়ের ভেতর পড়ে আমার কিন্তু প্রথমেই আপনার কথা মনে হয়েছে—"

"মানে— ? আমার কথা ?"

"না, মানে, আপনি আমাকে সেই অদ্ভুত অদ্ভূত জায়গার কথা গল্প করতেন না ? সেই কোথায় সব পাথর নীল, কোথায় সমুদ্রের ঝিনুকের মতো নুড়ি—"

"আপনার মনে আছে সে-সব"—

"বাঃ, মনে থাকবে না। আপনি তো বলেছিলেন, আমাকে এ-সব জায়গায় নিয়ে যাবেন, তো আর যাওয়াই হলো না,"—

"আপনি ব্যস্ত থাকেন তো—তাই"—

"কিন্তু আমার তো আজকের কুয়াশার ঝড় দেখেই আপনার কথা সবচেয়ে আগে মনে পড়ল, এখানে এসেই আপনাকে বলতে হবে"—

"কই ? বললেন না তো"—এখন বেণু আর অশ্বিনীর কথাবার্তা পরস্পরের দিকে তাকিয়েই হতে পারে। বেণু আর চোখ নামায় না। অশ্বিনী আর চোখ সরায় না।

"তাই বলে আর কাউকেও বলি নি"। অশ্বিনী থেমে থাকে। বেণু আগুনের দিকে চোখ সরায়। অশ্বিনী যোগ করে "আপনার সঙ্গে কথা হলে বলব, নইলে কাউকেই বলব না—এ-রকম ভেবেছিলাম—টগরদির" একটু থেমে শেষ করার স্বরে বলে, "সবার অবিশ্যি এ-সব ব্যাপারে ইনটারেস্ট থাকে না"—

"খুব ঝড় উঠেছিল বুঝি ?"

"হ্যাঁ। মানে কখন একসময় যেন মনে মনে ঠিক করলাম আজ দার্জিলিং যাব, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সেই কুয়াশার রঙ বদলানো দেখার সময়,"

"কুয়াশার রঙ বদলানো?"

"হ্যাঁ, সে-কথা পরে বলছি। তখনো ঝড়-টড় কিছু ছিল না। কিন্তু বেলা গোটা তিনেকের সময় যখন এখানে আসব বলে বেরিয়েছি, তখন বাড়ির দরজা খুলে বেরোতে পারি না প্রায় এমন বাতাস। সে-বাতাস ঠেলে বড়বাবুর ওখানে যাব, তাও পারি না। বাতাস প্রায় ঠেলে ফেলে দেয়। ভেবেছিলাম, ড্রাইভাররা কেউ রাজি হবে না। কোথা থেকে এক ড্রাইভার গাড়ি নিয়েও এসে হাজির। তখন আর না-এসে করি কি"—

"ইচ্ছে করলেই তো না আসতে পারতেন"—

"তা তো আর হয় না, তখন মনে হয় না-আসার ইচ্ছাটাই হওয়া উচিত কিন্তু কিছুতেই সে ইচ্ছাটা হতে চায় না আর কি করে যেন আসাটাই হয়ে ওঠে, সে যতই অসুবিধে হোক্ না কেন। নিয়তি, আর কি?"

"ঐ, যা ইচ্ছে, তাই-ই নিয়তি। তারপর ঝড় কেমন দেখলেন?"

"সে তো আমি ঠিক বলতে পারব না, আপনি দেখলে ঠিক বলতে পারতেন। সেজন্যই তো ঝড়টা দেখেই আপনার কথা মনে পড়ল। মানে প্রচণ্ড বাতাসে কুয়াশা ছুটে যাচ্ছে কিন্তু কুয়াশা শেষ হচ্ছে না আর কিছু দেখা যাচ্ছে না কিন্তু গাড়ির ওপর বাতাসের ঝাপটা এত জোরে এসে লাগে যে মনে হয় গাড়িটা উল্টে যাবে কিন্তু গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ আর বাতাসের আওয়াজ মিশে ঝড়ের গর্জনটা যেন বেড়ে যায়।"

"বাঃ বাঃ, এই তো সুন্দর বলছেন, আপনি তো সুন্দর বল্লেন,"

"আসল কথাটাই তো বলা হয় নি এখনো। তারপর একটা জায়গায় এসে নিচে অনেকখানি দেখা গেল, দেখি নিচে কোনো

ঝড় নেই, কুয়াশার ছোটাছুটিও নেই। তার একটু পরেই আমরা এমন জায়গায় এসে পৌঁছুলাম যেখানে কুয়াশার ঝড় নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকিয়ে দেখি ওপরে প্রচণ্ড ঝড় চলছেই কিন্তু আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে কোনো বাতাস-ই নেই। তারপর হুড়হুড় করে নেমে এলাম। দার্জিলিং তো বেশ পরিষ্কার"—

"দার্জিলিঙে অবিশ্যি ও-রকম বাতাস ওঠে, কুয়াশার ঝড়, তারপর বরফ পড়ে"—বেণু বলে। "হ্যাঁ, সবাই অবিশ্যি তাই বলছিল, আর দার্জিলিঙে বাতাসটা আজ রাত থেকে শুরু হয়েছে।" "কোথায় দেখলেন?" "এখন বাড়ি ফেরার পথে।" "কোথায়?" "ম্যালে।" "কি-রকম।" "প্রচণ্ড বাতাস এসে ঘা মারছে, মনে হচ্ছে পাহাড়-টাহাড় উপড়ে ফেলবে।" "আপনি আর বউদি সেই বাতাসে পড়েছিলেন?" "হ্যাঁ। কিন্তু টগরদির এই সব বাতাস টাতাস এ-সবে তত ইনটারেস্ট নেই তো—তাই আপনার কথা বললেন" "আমার কথা আবার কি বললেন?" "বললেন, বেণুর সঙ্গে এইসব গল্প কোরো" "আপনি সেইজন্য এইসব গল্প করছেন?" "না, তা কেন। তবে টগরদিরও এইসব বাতাস কুয়াশা দেখলে আপনার কথা মনে পড়ে আর কি?" বেণু কোনো কথা না বলায় অশ্বিনী যোগ করে, "আমার তো পড়েই।"

অশ্বিনীর মনে হয়, সেই সকাল থেকে বেণুর সঙ্গে যে-গল্প করার কথা সে ভেবেছিল, সেই গল্প এতক্ষণে করতে পারছে। কিন্তু করতে গিয়ে দেখছে, কুয়াশার ঝড় বা ম্যালের বাতাস বর্ণনা করার ভাষা তার নেই। প্রথম-প্রথম বেণু অশ্বিনীকে নানা জায়গার গল্প করতো। কুয়াশায় বন্দী অশ্বিনীর কাছে সেই সব নানা জায়গার অনুষঙ্গ জীবন্ত হয়ে এসেছিল। আর সেই রঙিন বিবরণ অশ্বিনীকে এত মুগ্ধ রেখেছিল যে অশ্বিনী ভুলে যায় গল্পগুলো বেণু করেছিল, সে করে নি। তাই এখন বেণুকে শোনাতে গিয়ে অশ্বিনী যদিও কথার পর কথা বলে যায় কিন্তু বলতে বলতে বোঝে সে যা

বলতে চাইছে তা বলতে পারছে না। অথচ এখন তো বেণু চোখ মেলে রেখেছে অশ্বিনীর চোখে। স্বপ্নে কথা বলার বোবা গুমরনোর স্বরে অশ্বিনী কথা বলে আর বেণুর দিকে তাকায়।

তিন

তার চোখে চোখ রেখে বা তাকে এক-একটা প্রশ্ন করে বেণু যেন তাকে ভাষা দিতে চায়।

"আপনার কোন্‌টা দেখতে বেশি ভালো লাগল, ওপর থেকে নিচের পরিষ্কার অংশটা নাকি নিচ থেকে ওপরের ঝড়"—

"না, জানেন, যখন হঠাৎ দেখলাম নিচটা পরিষ্কার তখন প্রথম মনে হলো বাবা বাঁচা গেল। তারপর ঝড়টা পেরিয়ে এসে যখন ওপরে চাইলাম, তখনই আসলে কুয়াশার ঝড়টা দেখা গেল, মানে, সেই খাদ আর পাহাড় সব একাকার তো" "সব একাকার, মানে কিছু দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না" "হ্যাঁ সবই একাকার। মানে গাড়িটা যে কোনো সময় খাদে পড়ে যেতে পারে। খুব ভয় লাগে" একটু থেমে অশ্বিনী বলে "আবার ভয় লাগেও না বটে"—

"গাড়ির কথা ছাড়ুন। মানে, সব একাকার মনে হয় নাকি সব ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে মনে হয়" বেণু অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করে। অশ্বিনীর চোখে বেণুর চোখ সম্পূর্ণ। জিজ্ঞাসা করার পর বেণু চোখ নামায় না, অশ্বিনী কথা বলে না। বেণুর দুই চোখের ভেতরে অশ্বিনী আর একবার সেই ঝড়টা দেখে নেয়। তারপর অতি ধীরে বলে, "হ্যাঁ, ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে।" "কী রকম।" "খাত বেয়ে যখন কুয়াশা হু হু উঠে আসছিল, তখন মনে হচ্ছিল পাহাড়ের তলাটা ওপরে উঠে আসছে।" "আর?" অশ্বিনী আবার বেণুর চোখের ভেতর সেই কুয়াশার ঝড় দেখে নেয়। তারপর অতি ধীরে বলে, "একটা পাহাড়ের মাথা থেকে যখন হাতীর পালের মতো কুয়াশা আরেকটা পাহাড়ের মাথার দিকে ছুটছিল,

তখন মনে হচ্ছিল, পাহাড়ের মাথাটাই পড়ে যাচ্ছে।” “আর?” অশ্বিনী বেণুর চোখের ভেতর সেই কুয়াশার ঝড় দেখছিলই। “একটা আকাশসমান ধূপগাছের গোড়া থেকে কাণ্ডটা পেঁচিয়ে সমস্তটা ঢেকে দিয়ে যখন ঘন একরাশ কুয়াশা সমস্ত গাছটাকে বেড় দিয়ে উঠে মুহূর্তের ভেতর গাছটার মাথা দিয়ে ওপরে মিশে যায়, তখন মনে হয় যেন গাছটাই উড়ে যাচ্ছে—একেবারে শেকড়বাকড় পাহাড় মাটি শুদ্ধ।” বেণু এবার কোনো প্রশ্ন করে না, সে এবার অশ্বিনীর চোখে দেখতে থাকে।

একটু পরে সামান্য একটু নিশ্বাস ফেলে বেণু একটু নড়ে বসে বলে, “আপনি যে কুয়াশার রঙের কি গল্প বলবেন বলেছিলেন?” বেণুর কথা শুনে অশ্বিনী চেয়ারে সোজা হয়। কনুই দুটোকে হাঁটুর ওপর শুইয়ে সামনে ঝুঁকে বসে। উনুনের গনগন আগুন বেণু কোলের ভেতর নিয়ে বসে। আঁচে বেণুর থুতনি পর্যন্ত লাল। দুহাত বাড়িয়ে অশ্বিনী চেয়ার থেকে আগুনের ওপর ঝুঁকে পড়ে। মুখে আগুনের আঁচ লাগে। আঁচে অশ্বিনীর উলের ড্রয়ার গরম হয়ে ওঠে। বেণু অশ্বিনীর দিকে তাকিয়ে। আঁচেই বোধ হয় চোখটা একটু কোঁচকানো কিন্তু চোখের পাতা বেণু টান করে তুলে রেখেছে। অশ্বিনী ঝুঁকে পড়ে দেখতে পায় বেণুর চোখের পাতার ছায়া নিচের আগুনের লাল আভায় তার কপালে পড়েছে, ঘরের শাদা আলোতে মিশে যায় নি। অশ্বিনীর কানদুটো গরম হয়েছে অনেকক্ষণই। মদের নেশাটা মাথায় উঠেছিল, এখন বোধ হয় সরে যাচ্ছে। যেন, মাথায় একটা শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে, এমন সম্ভাবনা অশ্বিনী টের পাচ্ছে। সেই শূন্যতাটা ভরাবার জন্যই এখন অশ্বিনী আগুনের ওপর বেণুর সামনে এমন ঝুঁকে পড়েছে। কুয়াশার ঝড়ের কথা শোনার পর এখন বেণু কুয়াশার রঙের কথা শুনতে চাইছে আর সেই রঙের কথা বলার ভাষা খুঁজতে অশ্বিনী অস্থির হয়ে ওঠে। আগুনের ওপর মেলে ধরা অশ্বিনীর হাতদুটো তাপে

টকটকে লাল, যেন ঝলসানো হচ্ছে, কাঁচা মাংসে এখনো রক্তের দাগ, সামনে বেণু, তার গলায়, গালে, কপালে, কানের পাশে আলো-পাত, ছায়াপাত, হাতদুটো সেঁকতে সেঁকতে অশ্বিনী বেণুকে কুয়াশার রঙের গল্প বলতে শুরু করে দেয়।

"আজ সকালে, আমিও ফ্যাক্টরিতে ঢুকেছি, দেখি, ফ্যাক্টরির কোণায় কোণায় সব কুয়াশা, সব একেবারে চুপচাপ ঘাপ্‌টি মেরে আছে। আমি যেন দেখেও দেখি নি, এই রকম ভাব করে অফিসে ঢুকে গেলাম, অফিসের সামনে একটা এত বড় জানলা আছে—" "ঐ জানলার মতন?" "না, ওর চাইতে বড়, আর কাঁচের—', "সবটা কাঁচের?" "হ্যাঁ" "তাহলে তো দারুণ," "জানলা দিয়ে সামনে শুধু মাঠ-ভরা কুয়াশাই দেখা যাচ্ছে, নড়ে না, একটুও বদলায় না, একেবারে পাথরের মতো জমাট কুয়াশায় মাঠ-ভরা" "তার পরে" "তারপর, জানলা দিয়ে তাকালেও তো জানলাতেই চোখ আটকে যায়, জানলার ওপাশে তো কিছু নেই"—

বেণু চোখ নিচু করে অশ্বিনীর টকটকে হাতটা দেখে "তারপর?" "কিন্তু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দেখি যে কুয়াশাটা নড়ছে!" "নড়ছে?" "হ্যাঁ নড়ছে"—অশ্বিনীর গলাটা চাপা কিন্তু উত্তেজনায় ভরা—"নড়ছে, কিন্তু বহুক্ষণ বসে ও-রকম করে না দেখলে বোঝাই যাবে না" "কী রকম নড়ছে?" অশ্বিনী চুপ করে থাকে। তার গলাটা বদলে যায়। "আসলে সেটাই ঠিক বলতে পারছি না। তখন থেকে ভাবছি কী রকম নড়ছে, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না। মানে, ধরুন, সম্পূর্ণ কুয়াশাটা যদি ভেতরে ভেতরে খুব আস্তে আস্তে উল্টে যায়?" অশ্বিনী তার হাত দুটো উল্টে দেয়, বেণু সেটা দেখে আবার চোখ তুলে বলে "উল্টে যায়?" "হ্যাঁ উল্টে যায়, কিন্তু ওলোট-পালোট হয় না, একেবারে টের পাওয়া যায় না, ঈ-স, কিছুতেই মনে করতে পারছি না" "উল্টে যায়?" "হ্যাঁ, একেবারে স-ব নিয়ে উল্টে যায়, কিসের মতো আমি ঠিক মনে করতেই পারছি

না, কিন্তু আমি যেন দেখেছি ও-রকম দেখতে-না-পাওয়া ওলোট-পালোট" "সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ?" "আমি সমুদ্র দেখি নি, কিন্তু শুনেছি সমুদ্রের ঢেউ নাকি ভেঙে পড়ে, আছড়ায়, তাহলে তো সমুদ্রের মতো না" অশ্বিনী বেণুর মাথার ওপর দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকায় যেন। বেণু বলে, "আমি সমুদ্রের ঢেউ দেখেছি বিয়ের পর প্রথম পূজোয়" "ও আচ্ছা কী রকম দেখলেন, ঢে—উ ?" "না ঢেউ না, সবটাই অদ্ভুত" বেণু অশ্বিনীর চেয়ারের পাশ দিয়ে তাকায়, "আমি আর ও ট্রেনে নামলাম তো বিকেলে, ও বড় হোটেলে থাকবে, আমি কিছুতেই থাকব না, শেষে তুজনার কথাই থাকল, মাঝারি হোটেল, আমরা রিক্সা করে যাচ্ছি, অনেকক্ষণ থেকেই একটা চাপা গর্জন বা চাপা খুব জোরালো শব্দ শুনতে পাচ্ছি, এখনো শোনা যায়, তুটো কান চাপা দিন," অশ্বিনী তু কান চাপা দেয়, তারপর নামিয়ে নেয়, "সোঁ সোঁ শুনতে পেলেন না" "ও তো রাবণের চিতা" "ওটা সমুদ্রের শব্দ, যখন ঝাউবনে বাতাস যায়, এখানকার পাইন বনের ভেতরে গেলেও ও-রকম শব্দ শোনা যায়" "কিসের ? রাবণের চিতার ?" "না, সমুদ্রের, তুটো বাড়ির ফাঁক দিয়ে হঠাৎ যেন মনে হলো আকাশটা কোথাও না ঠেকে একেবারে কোথায় ছড়িয়ে গেছে যেন, এখানেও দেখা যায় ওরকম ঝক্‌ঝকে দিনে খাদের কিনারে দাঁড়ালে, তারপর দেখি কি" বেণুর সারা মুখের বিশদ হাসি আগুনের আভায় রঙিন হয় "তারপর দেখি কি সেটাই সমুদ্র" "সেটাই সমুদ্র ?" "হ্যাঁ-আ-আ, সেটাই সমুদ্র"—বেণু তুলে ওঠে, যেন বাতাসে, "আর ওর না ভীষণ সাহস ছিল, আমাকে ঐ ঢেউয়ের ভেতর ঠেলে দিত, আমি কিছুতেই যাব না, জোর করে ওকে আঁকড়ে থাকতাম, তখন ও আমাকে নিয়েই ঢেউয়ের ভেতর চলে যেত, আর সেই ঢেউ আমাকে আর ওকে এমন আছড়ে ফেলত" "তাহলে তো আপনি সমুদ্রের ঢেউ দেখেছেন" "দেখেছি মানে, ভয়ের চোটে জলও খেয়েছি" "সমুদ্রের ঢেউ তো ঐ রকম আছড়ায় ?" "হ্যাঁ। কিন্তু যখন আসে তখন

পাহাড়ের মতো আসে” “খুব জোরে?” “হ্যাঁ, একেবারে ভীষণ বেগে, দেখেই ভয় হয়, মনে হয় সব ভেঙে চুরে দেবে” “না, কুয়াশা তো এভাবে নড়ে না, কুয়াশা সবটা ওলোট-পালোট করে দেয়, কিন্তু টের পাওয়া যায় না” “তাহলে বোধহয় মাঝ-সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো?” “মাঝ-সমুদ্রের ঢেউ আপনি দেখেছেন?” “না, ও একদিন বলেছিল মাঝ-সমুদ্রে নাকি ঢেউ ভাঙে না, শুধু ঢেউ গড়িয়ে যায়, তাও খুব ধীরে ধীরে, ও বলেছিল একদিন নৌকো করে নাকি যাবে, আমার তো খুব ভয়, আমি কিছুতেই রাজি হলাম না” “তারপর?” “তাই ও-ও গেল না” “তাহলে তো মাঝ-সমুদ্রের ঢেউ আপনি দেখেন নি?” “না, আর দেখলাম কেমন করে? আমার এত ভয়!”

চার

“কিন্তু কুয়াশাটা নড়ছিল কি করে সেটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না, এক-একবার মনে হচ্ছে বর্ষাকালের কালো মেঘ বোধ হয় ওরকম করে উল্টেটুল্টে যায়” “তা উল্টোয় অবিশ্যি” “সে যাই হোক, এমন নড়ে ওঠা, যে বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না” “কেন” “কী রকম অস্বস্তি লাগে” “তারপর” “তারপর আমি পর্দাটা টেনে দিয়ে অফিস থেকে বাইরে এলাম” “কুয়াশার ভেতরে?” “না, বাইরে মানে ভেতরেই, ধরুন এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, অফিস থেকে ফ্যাক্টরির ভেতরে” “তারপর” “সেখানে গিয়ে দেখি কুয়াশারা রঙ পাল্টাচ্ছে” “রঙ পাল্টাচ্ছে?” “হ্যাঁ আমি আর এগোলাম না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখলাম” “তারপর” “ভেতরে তো সব জায়গায় কুয়াশা ছিল না, যেখানে আলো সেখানে কুয়াশা” “তারপর” “কোথা থেকে একটা মরচে রঙের স্রোত এসে ধীরে ধীরে সব কুয়াশাগুলোর ভেতর ঢুকে যেতে লাগল” “তারপর” “দেখতে দেখতে সমস্ত কুয়াশাগুলোর সেই লোহার মতো রঙ হয়ে যেতে থাকে, কী রকম ভাবে যে বদলাচ্ছিল তা আর মুখে বলা যাবে না” “কী রকম ভাবে” “মনে হচ্ছিল যেন ওখানে এমন কোনো

কাণ্ডকারখানা চলছে যে আমার এগোনো ঠিক হবে না” “আমি ও-রকম মেঘের রঙ বদলানো দেখেছি, মানুষের রঙ বদলানো দেখেছি” “কোথায়” “ওর ফ্যাক্টরির চিমনি দিয়ে সেই আঁচ বেরোত, একেবারে লাল হয়ে থাকত আকাশটা” “তারপর” “তারপর ও যখন আসত মনে হতো সমস্ত শরীর ঝলসে গেছে, পোড়া বাদামের মতো রঙ হয়ে গেছে, ঘণ্টাখানেক মাথায় বরফ চাপা দিতে হতো, আমি ঐ পোড়া চেহারা সইতে পারতাম না, আমার তো খুব ভয়” “আমিও ঐ রঙ বদলানো সইতে পারলাম না, এত ভয় করল, তাড়াতাড়ি ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে আমি বাইরের কুয়াশা-গুলোর ভেতর ডুবসাঁতার দিয়ে একেবারে এখানে পালিয়ে এসেছি” চাপা স্বরে অশ্বিনী হেসে ওঠে, বেণুও হাসে, তাদের হাসিতে আগুনের আভা পড়ে, ঝলসানো মাংসের টুকরোর মতো টকটকে হাত অশ্বিনী সরিয়ে নিতে আগুনের আভা আরো উঁচুতে ছড়ায়। অশ্বিনী আবার চেয়ারে এলিয়ে পড়ে। বেণু পা জোড়া ছড়িয়ে দেয়, দুহাত পেছনে ঠেকা দিয়ে হেলান দেয়। বেণু বলে, “এক-এক জায়গায় কুয়াশার এক-এক রকম রঙ, না?” “হ্যাঁ।” “আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন না কেন, কিভাবে রঙটা বদলাচ্ছে” “দেখলাম তো” “বললেন যে এখানে পালিয়ে এলেন,” “আমি কি আর আপনার মতো করে দেখেছি, আমি আমার মতো করে দেখেছি” “না, ভালো করে দেখে নিলে পারতেন, আর তো এমন সুযোগ না-ও পেতে পারেন, একটা বড় ঘরের ভেতর নানা জায়গায় কুয়াশা জমে আছে আর আলোতে সেই কুয়াশার রঙ বদলাচ্ছে, আমি তো ভাবতেই পারছি না, দারুণ, প্রায় টাইগার হিলের মতন” “টাইগার হিলে কি কুয়াশার রঙ বদলায়?” “কুয়াশার না, মেঘের বা বলতে পারেন আকাশের, মানে আকাশটা বা মেঘটা যেন পর্দা তার ওপর আলো ফেলা হচ্ছে আর সেই আলোয় রঙটা বদলে যাচ্ছে” “বদলে যাচ্ছে মানে?” “মানে লাল থেকে কমলা, কমলা থেকে হলুদ—

এ রকম নয়। কোনো সময়ই রঙটাকে আপনি চিনতে পারবেন না, আপনার জানা লালের মতন লাল নয় আপনার জানা কমলার মতন কমলা নয়। আর রঙগুলো দেখে ফেলার আগেই বদলে যাচ্ছে, সত্যি, আপনি একবছর হলো এসেছেন টাইগার হিলটাই দেখা হলো না।" "দেখালেন আর কোথায়, শুধু টাইগার হিল কেন কিছুই তো দেখি নি, কি যেন লেক" "সিঞ্চল," "আর একটা কি যেন ফল্‌স্ আছে" "ভিক্টোরিয়া" "কি একটা ফরেস্টের কথা বলেছিলেন," "পাইন ফরেস্ট—লেবঙের" "এ কোনো কিছুই তো দেখা হয় নি, আর জানেন এখন, এই শীতে সেই কথা খুব মনে পড়ে" "এ-সব জায়গাগুলো তো সত্যি খুব ভালো। সিঞ্চলের লেকে এখন থিকথিক কুয়াশা" "ভিক্টোরিয়ায় ?" "এখন কিছু নেই, সে তো বর্ষায়" "লেবঙে ?" "পাইনের মাথায় মাথায় কুয়াশা বিঁধে আছে।" "এখন তো এগুলো দেখা যায় ?" "গেলেই দেখা যায়" "তো এখন আমাকে নিয়ে চলুন না," "আপনি গেলেই নিয়ে যাই" "আমি যাব।"

ওরা হঠাৎ চুপ করে যায়। খুব ধীরে ধীরে বেণু পা গুটিয়ে নেয়, পা ঢেকে ফেলে। অশ্বিনী চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসে। বাঁ হাতল থেকে হাত নামিয়ে নেয়, যেন পারলে অশ্বিনী এখন চেয়ার ছেড়ে মাটিতে বসত। বেণু পা জোড়া ডাইনে মুড়ে পেছনে নিয়ে যায় আর তার সম্মুখটুকু উনুনের তাপে দেখায় যেন আগুনের তাপটা ভেতর থেকে বেরচ্ছে। অশ্বিনী পা দুটো চেয়ারের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। যে আগুনটা এতক্ষণ এদের দুজনার মাঝখানে ছিল, সেটা এখন খানিকটা অবান্তর। উনুনের আলোতে চারপাশে যে গোলাকার অস্পষ্ট লালবৃত্ত সেটা এতক্ষণে একটু আধটু বোঝা যায়, যদিও তার পরিধির অনেকখানিই বেণুর মুখের নিম্নাংশ আর অশ্বিনীর হাঁটুর তলা পর্যন্ত। অশ্বিনী আগুনের দিকে তাকিয়েছিল। বেণু-ও। চেয়ারের বসার জায়গার বাঁ কোণায় বাঁ হাতের ভর রেখে বাঁ কাঁধ

উঁচিয়ে অশ্বিনীর এমন বসা যে ডান হাতল উপচিয়ে তার ডান করতল শূন্যতায় ঝোলে আর তার আঙুলের ফাঁকগুলো উনুনের লাল তাপে ভরে যায়, যেন, ওখানে শূন্যতা নেই, যেন অশ্বিনী ঐ আঙুলগুলোতে কোনো কিছু ধরে। এমনই কুন্ঠিত বসা অশ্বিনীর যেন তাকে এখুনি উঠে অনেকদূরে চলে যেতে হবে আর, বেণুর কোমরটা বেঁকে আসে, ফলে তার মুখটা ওঠে। যেন, বেণুকে এখন এমনিভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে। যে-আগুনটা ঘিরে ওরা বসেছিল সেটা ধীরে ধীরে, খুবই ধীরে ধীরে নিবে আসে, লালবৃত্তের পরিধি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়।

কোনো একসময়, অশ্বিনী আর বেণু উঠে দাঁড়িয়েছিল। বেণুর দুই হাতে আগুনের ভাণ্ড। আগুনের তাপ থেকে বেণুর সম্মুখভাগ পেছনে হেলানো। বেণুকে তখন বলতে হয়, "আমি জানতাম, আপনি একদিন বলবেন,"

"সেইজন্যই আপনি এমন চুপচাপ থাকতেন"—

"না। তাছাড়া আপনি তো ব্যস্তও থাকতেন। তবে আমি জানতাম তো যে ঐ ব্যস্ততা একসময় শেষ হবে। তখন তো আপনাকে বলতেই হবে।"

বেণুর চোখদুটো দেখা যায় না, কিন্তু আগুনের তাপে মণিদুটো অন্ধকারের জলের মতো চকচক করে। বেণু একটু হাসে। তাতে তার চোখের মণিদুটো জলের মতো চলকায়।

অশ্বিনী নেশাতুর দেখে, দুই করতলে লাল টকটকে আগুন নাচাতে নাচাতে সামনের পর্দা নাড়িয়ে বেণু কক্ষান্তর থেকে কক্ষান্তরে চলে যায়, তার চলে যাওয়ার পেছনে সেই কক্ষান্তরব্যাপী রাত্রিতে পর্দা দুলে যায়। নেশায় অশ্বিনীর সারা শরীর ঝিমঝিম করে। সে বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে।

তার মুদিত চোখের সামনে শুধু আগুনের ফুল ফুটে উঠে নিবে

যায় যেমন, তেমনি তার সারাটা অস্তিত্বই কোনো তাৎক্ষণিকের দেয়ালে এসে লেগে আছে, অশ্বিনীর শরীর আর মনের ওপর সেই দেয়ালটা এসে চাপ দিচ্ছে, কী জাগ্রৎ, কী নিদ্রিত, অশ্বিনী যেন প্রবল একটা চাপের নিচে ছটফট করে—লক্ষ্মী ডাকলেও সে নাচতে পারে না, বেণুকে গল্প বলার ভাষা পায় না।

শিয়রে শীতের রাত, অশ্বিনী যেন রক্তভারাতুর, শুধু দেখে কোনো জলাশয়ে রক্তবর্ণ আগুনের ফুল বা কোনো সমুদ্রের ঢেউ নেচে নেচে ভেঙে যায় রক্তবর্ণ ফুলে।

পাঁচ

সকালে চায়ের টেবিলে সবাই যেন একটু চুপচাপ হয়ে যায়। টগর এমনিতে এ-সব ক্ষেত্রে কম কথা বলে। অনেকদিন হলো বেণু চুপচাপ হয়ে গেছে। এক গোবিন্দবাবু কিছু কিছু কথা বলেন আর লুম্বু-বেবি খানিকটা হৈ হৈ করে। অশ্বিনী একটু দেরিতে উঠেছে। গোবিন্দবাবু তার আগেই চা খেয়ে নিয়েছেন। ফলে আজ চায়ের টেবিলে কোনো কথা হয় না। কিন্তু অশ্বিনী দেখেছে, নানা কাজের ফাঁকে বেণু যেন দু-একবার তার দিকে পলকমাত্র চেয়েছে আর তাতেই অশ্বিনীর মনে হয়েছে—এই নীরবতাটা ভাঙা দরকার। অশ্বিনী বলে, "গোবিন্দদা অফিসে চলে গেলেই টগরদি রেডি হয়ে নেবেন, বহুদিন বেড়ানো হয় না, হাতে পায়ে খিল ধরে গেল"--

"সে, এখন কি", টগর বলে।

"না, আজ ফ্যামিলি আউটিং। গোবিন্দদা অফিস যাওয়ার পর আমরা রওনা হব, গোটা তিনেকের মধ্যে ফিরে আসব"—

"কোথায় যাবে", টগর জিজ্ঞাসা করে।

"সে আপনারা ঠিক করুন, আমি কি জানি"—

"কোথায় যাবি, বেণু"—টগর বেণুর দিকে না তাকিয়ে শুধোয়। কোনো উত্তর আসে না। বেণু আর কোনো জবাব দেবে না বলে

যখন মনে হয় তখন বেণু অন্যদিকে তাকিয়ে খুব স্পষ্ট বললো, "ঘুম্ মোনাস্টারি"। বেণুর গলায় কোনো শ্লেষ্মা ছিল না, যেন, এতক্ষণ সে জায়গাগুলো বাছছিল মাত্র,—যাওয়া নিয়ে তার ভেতরে কোনো দ্বিধা নেই। বেণুর কথাটা শোনার পর আবার সবাই চুপ করে যায়। টগর একবার অশ্বিনীর দিকে তাকায়। তারপর আস্তেই বলে, "যাও, ঘুরে এসো"—

"আপনি যাবেন না ?" অশ্বিনীর গলায় বিস্ময় তো ফোটে না।

"না, বেণু আর তুমি যাও"—এ কথার উত্তরে তেমন কোনো প্রতিবাদ ওঠে না। টগর যোগ করে, "তোমরা ফিরে এসো, তখন বেরনো যাবে।"

"পিউমণি, আমি যাব"—লুসুর কথা শেষ হওয়ার আগেই টগর বলে, "না, তুমি যাবে না"। লুসু টেবিল থেকে উঠে বেণুর কাছে চলে যায়। বেণু বাঁ হাতে লুসুকে জড়িয়ে ধরে লুসুর চুলের ভেতর মুখ ডুবিয়ে দেয়। লুসু বেণুকে জড়িয়ে ধরে। "পিউমণি, আমি যাব।" "যাবিই তো, কাঁদছিস কেন ?"

"লুসু, আজ তুমি যেও না মা, বাইরে ভীষণ হাওয়া দিচ্ছে কাল রাত থেকে, বরফ-টরফ পড়তে পারে। শেষে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে"—চেয়ারে বসে থেকেই হাত বাড়িয়ে বেণুর কোলের ভেতর ডোবানো লুসুর মাথায় হাত বুলিয়ে টগর বলে।

বেণুর কোলের ভেতর থেকে মুখটা অর্ধেক তুলে লুসু বলে, "তাহলে পিউমণি যাবে কেন ? পিউমণির অসুখ করবে না ?" টগর কোনোদিকে না তাকিয়ে বলে, "বাঃ বোকা মেয়ে, পিউমণি তো পুজো দিতে যাচ্ছে।"

এবার লুসু বেণুর কোলের ভেতর থেকে তার সম্পূর্ণ মুখটা তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, "হ্যাঁ, পুজো, এখন পুজোর কথা বলছ, আর মেসো যে তখন আউটিঙের কথা বললো।"

অশ্বিনী হো হো করে হেসে ফেলে বললো, "ভেবেছিলাম

পিউমণির পূজোও হবে, আমাদের আউটিঙ-ও হবে। তা মা যখন না করেছেন, আজ থাক্, শুধু পূজোটাই হোক। এরপর শুধু তোমার আমার আউটিঙ হবে লুম্বু"। লুম্বু মুখ গোঁজ করে বেণুর কোলের ভেতর এলিয়ে পড়ে।

এরপর একটু সময় দিয়ে টগর যেন নিষ্পত্তি করে দেয়, সে যাচ্ছে না, লুম্বু যাচ্ছে না, শুধু বেণু আর অশ্বিনী যাচ্ছে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "বেণু, তুই হাতের কাজ রাখ, রেডি হয়ে নে, তোরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যা, তাড়াতাড়ি বেরো, তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস, ওখানে যা কুয়াশা হবে।" টগর ভেতরে যেতে গেলে গোবিন্দবাবু এসে দরজায় দাঁড়ান, "কোথায় কুয়াশা হবে" "ঘুমে" "ঘুমে আবার কে যাচ্ছে" "অশ্বিনী আর বেণু" "ও" বলে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে গোবিন্দবাবু বলেন, "কীরে বেণু, তোরও কি সঙ্গদোষে ব্যাধি হলো? এ-সব তো তোর বৌদির একচেটিয়া ছিল"—গোবিন্দবাবু বাথরুমে ঢুকে যান। বেণু একটু জোরে হেসে ওঠে।

আসলে তো বেণু জোরেই হাসত ও কথা বলত। কিন্তু পূজো থেকে সে একটু চুপ হয়ে গিয়েছিল। গোবিন্দবাবুর কথায় বেণু যে জোরে হেসে উঠতে পারে, তারই সূত্র ধরে সে লুম্বু-কে কোলে নিয়ে ভেতরের ঘরের দিকে চলে যায়। টগরকে কাজেকর্মে রেখে বেণুর বেরিয়ে যাওয়া এ-বাড়িতে নতুন। তাই টগর বললেই বেণু হাতের কাজ রেখে তৈরি হতে যেতে পারে না। কিন্তু হাতের কাজ সারতে সারতে বেণু তো তার যাবার সময়টাও এই অনিশ্চিত আবহাওয়ায় পেছিয়ে দিতে পারে না।

ঘরের ভেতরে টগর বলে, "লুম্বু, এখনো পিউমণির গায়ে লেগে আছ কেন? পিউমণিকে তৈরি হতে দাও"।

"না, লুম্বু তো যাবে না বলেছে। ওর জন্য আমি পূজোর প্রসাদ নিয়ে আসব।" বেণু লুম্বুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলে। সঙ্গে সঙ্গে লুম্বু লাফিয়ে চৌকির ওপর ওঠে, বেণুর গলা জড়িয়ে ধরে,

বেণুর কানে কানে কিছু বলে। বেণু খুব জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে "হ্যাঁ, হ্যাঁ" বলতেই, লুস্নু লাফিয়ে চৌকি থেকে নেমে "বেবি" "বেবি" বলে বাইরের ঘরের দিকে চলে যায়।

টগর ডেকে বলে, "অশ্বিনী, তৈরি হয়ে নাও"। অশ্বিনী উঠে ঘরের ভেতর দিয়ে বাইরের ঘরে আসতে আসতে বলে, "এমন তাড়াহুড়ো করছেন যেন হিল্লি-দিল্লি যাচ্ছি। যাব তো এখান থেকে দুই পা"।

"দুই পা-ই হোক্, আর দশ পা-ই হোক্, যে ওয়েদার, রেডি তো হতে হবে। বেণু"—টগরের কথার জবাবে বেণু বলে, "হ্যাঁ"।

ছয়

বেণুর পরনে কোটও আছে, আবার মাথা কান ঢাকা চাদরও। মাথা নিচু করে বেণু তাড়াতাড়ি হাঁটে। ওভারকোট আর মাথার টুপিতে অশ্বিনীকে কেমন একটু অপরিচ্ছন্ন লাগছিল—বেণুকে এত বেশি তাজা দেখায়।

বাইরে বেরোনর ফলে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে পড়েও বেণু প্রকাশ করতে চায় না। চাদরের খুঁটে তার ঠোঁট ঢেকে রাখে—যেন অকারণ হেসে ওঠার ভয়ে। টানটান বাঁধা চুলের ভেতর দিয়ে তার শাদা দীর্ঘ সিঁথি যেন দীর্ঘতর হয়ে গেছে। চাদরটাকে মাথার ওপর তুলে দিতে বারবারই হাতায় ঢাকা তার হাতটা বের করতে হয়। তার নগ্ন সিঁথিটাকে কি বেণুর এতই ভয়? নির্জন, আচ্ছন্ন রাস্তা দিয়েও নিজের সিঁথি ঢেকে ছোটে বেণু।

বাজারের মোড়ে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে এসে বেণু বাসের খোঁজ করে। দুটো বাস দাঁড়িয়ে ছিল, বেণুকে কথা বলতে দেখে তার ভেতর একটির ছোকরা সামনে এসে হ্যাণ্ডেল লাগায়, যেন এখুনি ছাড়বে। ভেতরে মাত্র তিনজন যাত্রী, কম্বলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মোড়া, বাইরে থেকে চোখগুলো দেখা যাচ্ছে না। অশ্বিনী চুপচাপ দাঁড়িয়ে

থাকে। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডও ফাঁকা। দুটো বাস ছাড়া একেবারে বিপরীত দিকে একটা ছোট অস্টিন আর একটা ল্যাণ্ডরোভার। যখন বোঝে দুটো বাসের ভেতর কোনোটারই যাওয়া নিশ্চিত নয় তখন অশ্বিনী ঐ গাড়ি দুটোর দিকে এগিয়ে যায়। বেণু দাঁড়িয়েই থাকে। গাড়ি দুটোর কাছে গিয়ে, কিছু কথা বলে অশ্বিনী বেণুর দিকে তাকায়। সেই ফাঁকা স্ট্যাণ্ড জুড়ে একপ্রান্তে অশ্বিনী, আরেক প্রান্তে বেণু। অশ্বিনীর হাতছানিতে বেণু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখলে অশ্বিনী ফিরে আসে।

বেণু গাড়িতে যেতে চায় না—এত টাকা কেন খরচ করা হবে। সুতরাং অশ্বিনীকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সামনের বাসের ছোকরা বাসের গায়ের টিন বাজিয়ে দেয়। ফাঁকা স্ট্যাণ্ডে সেই টিনবাজনা তেমন জমে না। এদিকে অস্টিনের ড্রাইভারটি এসে বেণুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বোঝাতে থাকে, এ বাস কখন যাবে ঠিক নেই, তারপর বাসে না হয় যাওয়া হলো, ফেরা হবে কিসে,:আজ যা ওয়েদার! বেণুর সৌজন্যে সেই ড্রাইভারটা ভাড়া আরো পাঁচ টাকা কমিয়ে দেয়।

বেণু অন্যদিকে মুখ ঘোরায়। আরো কিছুক্ষণ সময় যায়। তারপর যে মুহূর্তটিতে যাত্রার চাইতে গাড়ির জন্য এই অপেক্ষাটাই প্রধান হয়ে উঠতে চায়, সেই মুহূর্তে বেণু স্ট্যাণ্ডের অপর প্রান্তে রাখা গাড়িটার দিকে হাঁটতে শুরু করে। অশ্বিনী পেছু পেছু হাঁটে। আর ড্রাইভারটি ফাঁকা স্ট্যাণ্ডটা দৌড়ে পেরিয়ে দরজা খুলে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। বেণু দাঁড়িয়ে পড়ে। অশ্বিনীও। ড্রাইভার গাড়িটা এনে তাদের সামনে দাঁড়ায়। বেণু আর অশ্বিনী উঠলে, ড্রাইভারটা একটা ঝাঁকি দিয়ে গাড়িটা খুব জোরে ছুটিয়ে দেয়। সেই হঠাৎ ধাক্কায় বেণুর মাথা পেছনে সিটের মাথায় ঠুকে যায়। ফিক করে হেসে ফেলতে গিয়ে বেণু ঠোঁটে চাদর চাপা দেয়, তারপর জানলা দিয়ে অশ্বিনীর বিপরীত দিকে তাকিয়ে থাকে, যেখানে খাদের ভেতর থেকে পাইনের মাথা শূন্যতা বিদ্ধ করছে।

মোনাস্টারির দিকের রাস্তার ভেতরে গাড়িটাকে তুলে দিতেই ড্রাইভারকে বেণু থামতে বলে। ড্রাইভার বলে, সে মোনাস্টারি পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে যেতে পারবে। বেণু বলে এই রাস্তাটুকু হেঁটে যাবে। ঘুম বাজারের এই জায়গাটা অশ্বিনীর প্রায় বাড়ি ঘরের মতো চেনা, এখান থেকেই বাঁয়ে বেঁকে প্লেনভিউ যেতে হয়। কিন্তু ডানদিকের রাস্তাটি তার একেবারে জানা নয়। দোকানপাট ভর্তি রাস্তাটা এঁকে বেঁকে উঠে যায়। এক-একটা দোকানের ঝাঁপ একটুখানি খোলা—তার আড়ালে ভোজালি আর ছুরি তৈরির কারখানা দেখা যায়। দেড়তলা দোতলা বাড়ির জানলায় জানলায় অনড় মুখ! বেণু কিছুতেই অশ্বিনীর পাশে পাশে হাঁটে না। একটু ঝুঁকে একটু আগে আগে চলে আর অশ্বিনী তার এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পথে বেণুকে অনুসরণ করে ওঠে।

সাত

চড়াই রাস্তাটা খাড়া উঠতে উঠতে ডান দিকে বেঁকে, সেখান থেকে পাথরের এলোমেলো এবড়োখেবড়ো সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে আর সামনে দেখা যায় পাতলা কুয়াশা মন্দিরের স্থাপত্য নিয়ে দূরে। কুয়াশায় সম্পূর্ণ মন্দিরটি ঢাকা পড়ে নি। কিন্তু কুয়াশায় সম্পূর্ণ মন্দিরের নির্মিত—এ-রকম মায়া হয়। এতটা উঁচু থেকেও ঘাড় হেলিয়ে মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকাতে হয়। মন্দিরের আদলটা শুধু পাওয়া যায়, কোনো অংশ দেখা যায় না, ফলে মন্দিরটিকে সম্পূর্ণ ভারশূন্য মনে হয়, যেন পটে আঁকা।

অশ্বিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল যখন, বেণু সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নিচে নেমে যেতে শুরু করে। মাঝামাঝি কোনো জায়গায় গিয়ে সে বুঝতে পারে পেছনে অশ্বিনী নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে মাথা হেলিয়ে সে অশ্বিনীর দিকে তাকায়। অশ্বিনী দেখে বেণুর কপাল ধবধব করে।

পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে সিঁড়ি বানানো হয়েছে—কোনোটাতে

দুটো, কোনোটাতে আড়াইটে পাথর। ফাঁকগুলো সিমেন্ট দিয়ে ভরাট, ধাপগুলো চওড়া। ধাপগুলোর পারস্পরিক উচ্চতা একমাপের নয়, কোথাও বেশি, কোথাও কম। ধাপের মাঝামাঝি খানিকটা মানুষের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গেছে। কোনো কোনো ধাপ একটু নড়ে, খট-খট আওয়াজ হয়। এরকম সিঁড়ি দিয়ে নামতে যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের একটু ধীরে ধীরে নামতে হয়, অন্য কোনোদিকে মন না দিয়ে। বেণু মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমেছিল। সেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকে যখন অশ্বিনী সিঁড়ির মাথা থেকে নামতে শুরু করে। তারপর আবার বাকিটুকু নামতে শুরু করে বেণু। পাশাপাশি কাছে দূরে কেউ ছিল না। তাই ওরা ব্যক্তিগত অভিনিবেশে অন্যমনস্কতায় খাড়া উৎরাই ভেঙে যায়।

সিঁড়ি শেষ হবার পর দীর্ঘ বিস্তৃত আঙিনাময় কুয়াশা আলগা ছড়ানো। ডান হাতে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গুম্ফা, কোনো কোনো গুম্ফার দরজা বন্ধ, কোনোটার খোলা,—কোথাওই কোনো মানুষ নেই। বাঁ দিকে খানিকটা দূরে গভীর ও বিস্তৃত খাদ। সেই খাদের তিন দিকে দিগন্তে পাহাড়ের সারির কোনো কোনো চূড়া কখনো কখনো দেখা যায়। লম্বা লম্বা লোমে সম্পূর্ণ ঢাকা একটা তিব্বতী কুকুর কুয়াশার ভেতর থেকে এসে দাঁড়ায়।

মন্দিরের চত্বরে গিয়ে বেণু দাঁড়ায় কিন্তু পেছন ফিরে তাকায় না। অশ্বিনী পাশে পৌঁছুলে তারা মন্দিরের দিকে হাঁটতে শুরু করে। কুকুরটা পেছন আসে। তারা যত এগোয়, মন্দিরটা কুয়াশার ভেতর থেকে তত বিরাট প্রকট হয়। না তাকিয়েও তারা বুঝতে পারে এখন মাথা হেলিয়েও আর মন্দিরের চূড়াটা দেখা যাবে না। তারপর, যা ছিল এতক্ষণ কুয়াশার ভারহীন নির্মাণ, তা তার সমস্ত ভার নিয়ে পর্বতের মতো স্থান অবস্থান হয়ে ওঠে আর মন্দিরের প্রধান তোরণের দুপাশে সিংহাকৃতি দুই বিশাল মূর্তির মুখব্যাদানের মাঝখানে মন্দিরের দারুণ রুদ্ধ কপাটের সামনে গিয়ে তারা দাঁড়িয়ে

পড়ে। মন্দিরের কঠিন পাথর আর তার ওপর সামান্য কিছু খোদাই। বড় বড় পাথরের চাঙড়কে একটা মাপ দেবার চেষ্টায় এবড়ো খেবড়ো ভাবে মন্দিরের ভিতটুকু উঠে এসেছে। সেই রুক্ষ পাথরের গা আর পাথরের পর পাথরের স্তরবিন্যাসের ভেতরের শারীরিক জোরটা যেন দেখা যায়, আর সেই জোরটা দেখে যেন ভয়ও হয়। অশ্বিনীর গা ছম্‌ছম্‌ করে। ঢ—অ—অ—ঙ করে একটা ঘণ্টাধ্বনি হয় আচম্বিতে, কিন্তু চমক লাগে না। কুয়াশায় আর হিমে ভারি বাতাসে সেই ঘণ্টাধ্বনি এই মন্দিরের গায়ে মাথায় চত্বরের ওপরে ঝুলে থাকে, সেই ধ্বনির অনুসরণ শেষ হয় না, যেন কুয়াশাময় শূন্যতা থেকে ধ্বনিটি মাটিতে ঝরে পড়তে পারে।

কাঠের দরজাটা খুলে যায়। বেণু আর অশ্বিনী নতশিরে সেই বিরাট দরজার চৌকাঠ পেরোয়। পেরোতে গিয়ে তারা দেখে এক তরুণ ভিক্ষু মাথা নুইয়ে কোথাও মিলিয়ে গেল, স্রোতে যেমন ফুল ভেসে যায় তেমনি তার বাসন্তী উত্তরীয় কুয়াশায় কুয়াশায় অনেক গভীরে চলে যায়।

বেণুর পাশে পাশে নয়, পায়ে পায়ে অশ্বিনী এগিয়ে চলে। চাদরটা বেণু আরো টেনে নিয়েছে, ফলে তার কাঁধ, মাথা আর পিঠ দৃঢ় ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেখায়। দুপাশে তীর্থের জলে ভরা তাম্রবাটিকার লম্বা সারি, তারপর আবার একটা, চৌকাঠ, দুপাশে জলচৌকি আর সামনে বই রাখবার ছোট ছোট আসন—সবই লাল কাপড়ে মোড়া, তারপর আবার চৌকাঠ, দুপাশে রাশি রাশি সারি সারি ত্রিপিটক, আর তারপরই বেণু আর অশ্বিনী মূর্তির একেবারে সামনে অপ্রস্তুত পৌঁছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বেণু মাথাটা তোলে, তোলে, ঘাড় বেঁকে যায়, ঘোমটা খসে পড়ে, যেন বেণুর সেই দীর্ঘ সিঁথিও তার মাথা থেকে খসে পড়বে—এত উচুঁতে বুদ্ধমূর্তির মুখটা —বিশাল, আয়ত, তামাটে, প্রাচীন। অশ্বিনীকেও ঘাড় বাঁকিয়ে মূর্তিটা দেখতে হয়। এত বিরাট মূর্তি, এত প্রকাণ্ড মুখ, বরাভয়ের

আঙুলগুলো পর্যন্ত এত বিশাল আর ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে হয় বলে, মূর্তির সামনে নিজেকে হারাতে হয়। কিন্তু বেশিক্ষণ তো আর এ-ভাবে থাকা যায় না, তাই, চোখ আবার মূর্তির শরীর গড়িয়ে গড়িয়ে চোখের জলের মতো বয়ে বয়ে নেমে আসে মূর্তির বিশাল দুটি পায়ে। মানুষ তার স্বাভাবিক দৈর্ঘে দাঁড়ালে বিশাল পায়ের সেই আঙুলগুলোই চোখের সামনে থাকে। সেই পায়ের উপর অনেক খুচরো পয়সা, কিছু নোট। অশ্বিনী দেখে বেণু ব্যাগ খুলছে। অশ্বিনী তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে দুটাকার একটা নোট বের করে কিন্তু বেণু-ও দুটাকার নোট বের করেছে দেখে অশ্বিনী একটা এক টাকার নোটও বের করে। টাকাটা দিয়ে বেণু হাঁটু ভেঙে বসে। তারপর বেণুর শরীরটা যেন লুটিয়ে পড়ে। অশ্বিনী প্রণাম করে। ঠাণ্ডা পাথর অশ্বিনীর কপাল অবশ করে দেয়। অশ্বিনীর একটা ঢেকুর ওঠে, বাসি, কালকের মদের। বেণু ওঠে। তারপর অশ্বিনী। দুই করতলে নিজের মুখটা একবার মুছে নিয়ে আর একবার বেণু মূর্তিটিকে পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিতে ঘাড় হেলিয়ে যায়। অশ্বিনী আর ঘাড় হেলায় না, মূর্তির পায়ে চোখ রেখে দেয়— এমন বিরাট দুটি পা, অশ্বিনীর সম্পুর্ণ শরীরের প্রণামও যাকে ঢাকতে পারবে না। মূর্তি থেকে চোখ নামিয়ে বেণু একবার অশ্বিনীর দিকে তাকায়, ঘোমটাহীন, সিঁথিময়। অশ্বিনী বলে না বেণুর কপালে দেবতার পায়ের সিঁদুর লেপটে আছে। আবার বাটিভরা তীর্থজলের সারি পেরিয়ে ওরা বেরিয়ে আসতেই যেন অশ্বিনীর হৃৎপিণ্ডের ভেতরই ঢং করে একটা ঘণ্টা বেজে ওঠে। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সেই তরুণ ভিক্ষুর বাসন্তী উত্তরীয় আবার চোখের আড়ালে চলে যায়। অত বড় চত্বরে অশ্বিনী আর বেণু। বেণু আবার চাদরে ঘোমটা দেয়। তারপর খুব ধীর পায়ে একটা পাথরের ওপর গিয়ে বসে। অশ্বিনী গিয়ে পেছনে দাঁড়ায়। বেণু একটু সরে জায়গা দেয়। অশ্বিনী বসে।

পাথরটা এমন জায়গায় যে একসঙ্গে সমগ্র চত্বর, মন্দির, মন্দিরের ডাইনে প্রায় অতল, অপার খাদ আর পেছনের পাহারটা সম্পূর্ণ দেখা যায়। বারবার চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ-সবকেই দেখতে হয়, না দেখে থাকা যায় না বলে। ওপারের পাহাড়ের গায়ের রঙের ধূসরতার নানা স্তর। আর এরই ভেতর মন্দিরের মাথাটা উঠেছে ঋজু, আর মন্দিরের সম্পূর্ণ চুড়াটা লাল, নীল, সবুজ, হলুদ এই সব অতি চেনা রঙে ভর্তি। মন্দিরের প্রথম চাতালের ওপর দুই দিকে মুখ করে দুটো কিম্ভূতকিমাকার সিংহ তাদের রঙিন মাথা তুলে হাঁ করে কুয়াশা আচ্ছাদিত দিগন্তের দিকে ধেয়ে।

অশ্বিনী বোঝে না যে চারপাশের ঐ উত্তুঙ্গ বিশাল ও ব্যাপক ধূসরতার মাঝখানে মানুষের তৈরি এই মন্দির পাহাড়ের কাছেও খর্ব হয়. না এত ঋজু অথচ পাহাড়ের ধূসরতা থেকে চোখ টেনে নেয় এত রঙিন। কিন্তু না বুঝেও তো সেই সম্পূর্ণ মন্দিরটার ওপরই তার চোখ ফেলে রাখে। যেন কতদিন পর এতগুলো রঙ একসঙ্গে দেখে।

মন্ত্রের চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে এক বুড়ো ভিক্ষু কুয়াশার আড়ালে চলে যায় আর আবার অশ্বিনীর বুক কাঁপিয়ে ঢ-অ-ঙ ঘণ্টা বেজে ওঠে। বেণু ওঠে। পেছনে মন্দির। পেঁজা পেঁজা কুয়াশার ভেতর সামনের লম্বা রাস্তাটা যেন বহু দূরে গেছে। বেণু অশ্বিনীর দুটো আঙুল নিজের দুটো আঙুল জড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই পথে পাশাপাশি চলে যায়। প্রণামে প্রণামে বেণুর কাঁধ এত কৃশ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

টগর দরজা খুলে দেয়। বেণু পাশ দিয়ে ভেতরে চলে যায়, খুব ধীরে।

টগর বলে, "অশ্বিনী, তোমরা বেরোবার পরই প্লেনভিউ থেকে দুটি লোক এসেছিল। ওঁর ব্যাঙ্কে গিয়েছিল। উনি এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খুব দরকারি কাজ উনি তোমাকে আসামাত্র একবার ব্যাঙ্কে যেতে বলেছেন।"

"কি ব্যাপার?" অশ্বিনী খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে। টগর বলে, "তা তো কিছুই বুঝলাম না। অমি ওদের বসতেও বললাম, তোমরা কিছুক্ষণের ভেতরই ফিরে আসবে তাও বললাম। কিন্তু কিছুতেই বসলো না।" অশ্বিনী দেখে, সামনে টগর, চিবুক তুলে। ভেতরের ঘরে ঢুকতে গিয়ে পর্দায় হাত দিয়ে অশ্বিনীর দিকে ঘাড়-ফেরানো বেণু, সত্যকুয়াশাধোয়া মুখ, মাথায় ঘোমটা, স্থির চোখদুটি যেন ধীরে ধীরে তুলে যাচ্ছে বিশদ, কপালে লেপ্টানো দেবতার সিঁদুর। বেণুর এই মুখটা অশ্বিনী আর ভোলে নি। "তাহলে একবার ঘুরেই আসি"—ওভারকোটটা কাঁধে তুলে নিয়ে অশ্বিনী দ্রুত পেছন ফিরে বেরিয়ে যায়, সিঁড়ি বেয়ে তরতর নেমে যায়।

ব্যাঙ্কে গোবিন্দবাবুর নাম বলতে বেয়ারা ঘরটা দেখিয়ে দেয়। দরজার দিকে পেছন ফিরে জানলার কাছে একটা লম্বা ম্যাপের মতো কিছু দেখছিলেন। দরজায় শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেও অশ্বিনীকে চিনতে তাঁর একটু সময় লেগে যায় যেন। চশমাচোখে গোবিন্দবাবুকে এই প্রথম দেখে নতুন লাগে অশ্বিনীর।

"এসো, এসো" বলে গোবিন্দবাবু নিজের চেয়ারে ফিরে আসেন। "বোসো।"

ওভারকোটটা একটা চেয়ারের পিঠে রাখতেই চেয়ারটা পিছে হেলে যায় দেখে অশ্বিনী ওভারকোটটাকে কোলের ওপর পাঁজা করে বসে। তারপর গোবিন্দবাবুর দিকে তাকায়।

চোখ থেকে চশমাটা একটুখানি খুলে, আবার পরেন গোবিন্দবাবু। অশ্বিনী নানারকম ম্যাপ আর চার্ট টাঙানো ঘরটা দেখে দিয়ে আবার গোবিন্দবাবুর দিকে তাকালে, গোবিন্দবাবু এবার চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে জিজ্ঞাসা করেন, "কখন ফিরলে" "এই এখুনি, টগদি বললেন, সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম, কি ব্যাপার, বাগান থেকে লোক এসেছিল বললেন টগরদি" "হ্যাঁ, সে তো এসেছিলই।" "কি ব্যাপার? তাহলে বরং আমি বাগানেই চলে যাই" "সে তো যেতে হবেই, কিন্তু তোমার তো খাওয়া হয় নি" "খেয়েই তো বেরিয়েছিলাম, কিছু খেয়ে নিলেই হবে, বাড়িতে কিছু হয় নি তো, খোকন-গোলাপের?"

"না, না, সে সব কিছু না, অফিসের ব্যাপার" গোবিন্দবাবু অশ্বিনীকে আশ্বস্ত করতে পেরে বেঁচে যান। তারপর ড্রয়ার টানেন। দুটো খাম বের করে টেবিলের ওপর রাখেন। ড্রয়ারটা বন্ধ করেন। খামদুটো একবার নিজে দেখে নেন, একটা খাম লম্বা, দুটোর রং-ই অফিসের খামের মতো। খামদুটো নিজের হাতে রেখেই গোবিন্দ-বাবু বলেন, "প্লেনভিউ থেকে এসে খামদুটি দিয়ে গেছে। তুমি পড়ে দেখো। এখানেই।"

অশ্বিনী হাতে নিয়ে দেখে ছোট খামটা টেলিগ্রামের। সে খুব আস্তে আস্তে খামটা ছেঁড়ে। নিচু হয়ে টেবিলের নিচে রাখা ঝুড়িতে, ছেঁড়া টুকরোগুলো ফেলে। তারপর ভেতরের কাগজটা বের করে। অসমান ভাঁজটা খুলে অশ্বিনী পড়ে। তারপর তাকে অর্থ বোঝবার জন্য বার কয়েক পড়তে হয়—তাকে চাকরি থেকে তদন্তসাপেক্ষ সাসপেনড্ করা হয়েছে। টেলিগ্রামটা টেবিলের ওপর রেখে এবার চিঠিটা খোলে। টেবিলের ওপর

টেলিগ্রামটা একটু একটু দোলে। আবার নিচু হয়ে টেবিলের তলায় রাখা ঝুড়িতে খামছেড়া টুকরো কাগজগুলি ফেলতে হয় অশ্বিনীকে। সাসপেনশনের বিস্তৃত বিবরণ—তার বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা। পড়তে পড়তেই অশ্বিনী বুঝে ফেলে সমস্তটাই গোবিন্দবাবুর জানা। সে চিঠিটা নামাতে দেখে গোবিন্দবাবু তার দিকে তাকিয়ে আছেন। চিঠিটা আর টেলিগ্রামটা অশ্বিনী বাড়িয়ে ধরে। খামদুটো তার হাতে ধরা থাকে। গোবিন্দবাবু প্রথমে চিঠিটা খোলেন। সেটা সম্পূর্ণ পড়েন। তারপর টেলিগ্রামটা। তারপর হাত বাড়িয়ে খাম দুটো নিয়ে চিঠি ও টেলিগ্রামটা খামে পুরে অশ্বিনীকে দিয়ে বলেন, "আমার কাছে প্লেনভিউয়ের বড়বাবু এসেছিলেন। ওঁদের কাছেও টেলিগ্রাম এসেছে। কিছু বুঝতে পারছ?"

অশ্বিনী একটু থেমে থেকে থেকে বলে, "না, কী আর বুঝব"—

গোবিন্দবাবু জানলার দিকে একটু তাকিয়ে থাকেন। সেখান থেকেই শুরু করেন—"আমি যেটুকু শুনলাম তোমাকে জানিয়ে দি। মিঃ প্রধান আর ঐ অমর ভট্চাযের নাকি চোরাই চায়ের একটা ব্যবস্থা আছে। আমি কিছু জানতাম না। তবে শুনলাম ভট্চাযের নাকি আরো নানারকম ফিসি ব্যবসাপত্র আছে। তোমার সঙ্গে আলাপটালাপ করে তোমাকেও এ-ব্যাপারে ওরা জড়িয়ে নেয়"—

"আমি তো কিছু জানি না"—

গোবিন্দবাবু চুপ করে যান। তারপর যেন খানিকটা ভেবে বলেন, "বাগানের ম্যানেজমেণ্টের দু-একজনও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। হয়তো তাদের বোঝানো হয়েছিল যে এক্সাইজের লোকও এই ব্যবসায় আছে, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। এর আগেও তো কোন্ বাগানের চা চুরির একটা কেস ধরা পড়েছিল"—

"হ্যাঁ। রাঙ্তির। পূজোর সময়"—

"পরশুদিন নাকি, সকালে কি শেষ রাতে, মনপুরনের গেটের

বাইরে একট্রাক চা ধরা পড়ে। আগে থাকতেই বোধহয় খবর ছিল। তাই ওপর থেকে তোমাদের সিনিয়র অফিসার লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করেছিল। ওঁরা সন্দেহ করেছেন তুমি এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত"—

"আমি তো কিছু জানি না"—

"না, ঐ ভট্চাযদের ব্যাপার তো, তাই তোমাকে জড়িয়ে নিয়েছে। সেজন্যই নাকি সাসপেনড্ করেছে তোমাকে। প্লেন-ভিউয়ের বড়বাবু নিজেই এসেছিলেন" অশ্বিনী চুপ করে থাকে। গোবিন্দবাবু আবার বলেন, "এখানে মিঃ প্রধান আর মিঃ সিং-এর ভেতরে খুব গোলমাল, সব পলিটিক্যাল ব্যাপার"—

"হ্যাঁ, সে তো জানি"—

"গত সিজনে, পূজোর পর তোমাদের কোন্ খুব বড় অফিসার এসেছিলেন নাকি ?"

"হ্যাঁ ডগশোর-এর দিন আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। রেসে গিয়েছিলেন, গভর্নর্স্ কাপের দিন"—

"তুমি কি রেস খেলতে ?"

"না। ঐ একদিন কার্ড পেয়ে গিয়েছিলাম"—

"যাক্। আমার কানে এলো মিঃ প্রধানকে জব্দ করার জন্য নাকি মিঃ সিং ঐ বড় অফিসারের কাছে তোমার বিরুদ্ধে বলেন যে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে মিঃ প্রধান নাকি চোরাই চায়ের ব্যবসা চালাচ্ছেন। আর ঐ অফিসারেরও নাকি তোমার চালচলন ভালো লাগে নি"—

"তাঁর সঙ্গে তো আমার কোনো কথাই প্রায় হয়নি"—

"তা না হোক। তিনি এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর মতো বড়ো অফিসার যেখানে যেখানে গেছেন, সেখানেই তোমাকে দেখেছেন, তাতেই হয়তো ওঁর রাগ হয়েছে। তোমাকে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে কে দিয়েছিল ?"

অশ্বিনী কিছুক্ষণ ভেবে বলে, "ঠিক তো মনে পড়ছে না, তবে কেন যেন মনে হচ্ছে মিসেস সিন্‌হাই টগরদিকে আর আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন। মিঃ সিন্‌হাও হতে পারেন। ওঁদের দুজনের ভেতরই কেউ, ঠিক মনে পড়ছে না। আসলে আমাদের অত বড় অফিসার দেখে আমি তাড়াতাড়ি সবে এসেছিলাম"—

"মিসেস সিন্‌হাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন?" গোবিন্দবাবু মলিন একটু হাসেন "যতদিন এন্‌কোয়ারি হবে তোমার তো অপেক্ষা করা ছাড়া করার নেই কিছু"—

"হ্যাঁ সে তো অপেক্ষা করতেই হবে"—

"তুমি বরং মিঃ প্রধানকে একটু জানিয়ে রাখো"—

"উনি তো আজই কলকাতা গেলেন"—

গোবিন্দবাবু আবার একটু মলিন হাসলেন। "তাহলেও দেখো, ওঁকে যদি জানাতে পার। তবে ওঁরা কিছু করবেন বলে আমার ভরসা নেই। ওঁরা নিজেরা জড়িত না হলে কিছু করেন না—এ সব ব্যাপারে। তোমার কাছে কোনো প্রমাণ ট্রমাণ কিছু নেই, না?"

"কি ব্যাপারে?"

"এই এ-সব ব্যবসার ব্যাপারে মিঃ প্রধান বা ওঁরা কী রকম জড়িত ছিলেন?"

"আমি তো কিছু জানতামই না"—

গোবিন্দবাবু জানলা দিয়ে আবার বাইরে তাকান। তারপর অশ্বিনীর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলেন, "তোমাকে যে কথা বলার জন্য এখানে আসতে বলেছিলাম, তুমি আর টগর তো সব জায়গায় একই সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে"—অশ্বিনী চুপ করে থাকে, বুঝতে পারে না এটা প্রশ্ন কিনা—গোবিন্দবাবু বলেন— "দার্জিলিঙেরও সবাই জানে তুমি আমার এখানে থাকো, আমাদের আত্মীয়"—এটা কোনো প্রশ্ন হতে পারে না—অশ্বিনী ভাবে, "সুতরাং এ-সব ব্যাপারে আমাদের বাড়ি সার্চ হতে পারে"—

"আমাদের বাড়ি মানে, দার্জিলিঙের বাড়ি ? কেন ?"

"নানা কারণেই হতে পারে। তোমার টাকা আমার ওখানে জমা রাখো কি না, টগরের কাছে থাকে কি না, আমি যখন এই ব্যাঙ্কের লোক, এই ব্যাঙ্কে কোনো মিথ্যে অ্যাকাউন্টে তোমার টাকা জমা থাকে কি না"—এসব প্রশ্ন তো উঠবেই,"

"এগুলো সব উঠবে"—অশ্বিনী গোবিন্দবাবুর কথার পুনরুক্তি করে।

"হ্যাঁ এত আইনের ব্যাপার, বিশেষ করে টগরকে নিয়ে নানারকম কথাই উঠতে পারে। সেজন্য তুমি এই কেসের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দার্জিলিঙে আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রেখো না, আমাদের বাড়িতেও এসো না"—

"ও-ও, আচ্ছা"—

"বাড়ি তো সার্চ হতেই পারে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি এই ব্যাঙ্কের সব অ্যাকাউন্ট চেক করতে আসে, পরে মামলায় যদি টগরকে আমাদের জড়িয়ে ফেলে, বুঝতেই পারছ, সেটা নিশ্চয় তুমিও চাও না !"

"হ্যাঁ বুঝেছি", কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অশ্বিনী বোঝে গোবিন্দবাবু আর কিছু বলবেন না। তখন বলে, "তাহলে আমি যাই"—

"হ্যাঁ, এসো, তুমি কি এখন বাগানে ফিরবে ?"

"হ্যাঁ", গোবিন্দবাবু নিজেই উঠে দরজা খুলে দেন। অশ্বিনী তার ওভারকোটটা দুই হাতে কোলের কাছে ধরে পাশ দিয়ে খুব ধীরে পায়ে বেরিয়ে যায়। আর ঠিক ওভাবেই এতটা রাস্তা হেঁটে ভট্‌চাযের বাড়িতে এসে পৌঁছয়। দার্জিলিঙে তো অশ্বিনীর একা একা হাঁটার অভ্যেস নেই—তাই তার যেন অনেকটা সময় লেগে যায়।

দুই

দোতলার সিঁড়ির দিকে পেছন করে অশ্বিনী বসেছিল। ভট্চাযের নামবার শব্দ পেয়েও ঘাড় ঘোরায় না। ভট্চায এসে বসে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে, আসলে তার পায়ের শব্দ শুনেই, অশ্বিনী বোঝে ভট্চায সব জানে। অশ্বিনী কোনো কথা বলে না। ভট্চাযের পাশ দিয়ে তাকিয়ে থাকে। ভট্চায কিছুক্ষণ স্থির থাকে। তারপর যেন একটু অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করে। তখন অশ্বিনী বলে, "পূজোর পরে আমাদের একজন খুব বড় অফিসার এসেছিলেন, না?"

হ্যাঁ, মিঃ কুম্‌রা"—

"তাঁর সঙ্গে মিঃ সিন্‌হা আমার আর টগরদির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন"—

"সিন্‌হা?"

"হ্যাঁ। তারপর একবার রেসের মাঠে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল"—

"হ্যাঁ"—

অশ্বিনী আবার চুপ করে যায়। সে ভাবে ভট্চাযের বুঝি সবই জানা। অনেকক্ষণ পর অশ্বিনী বলে, "মিঃ প্রধানকে জব্দ করার জন্য নাকি আমাকে জড়িয়ে মিঃ সিন্‌হা তাঁর কাছে রিপোর্ট করেন।"

ভট্চায কোনো কথা বলে না। আবার অনেকক্ষণ সময় কেটে যায়। আবার অশ্বিনী বলে, "চিঠিতে অবিশ্যি এটা লেখা আছে হেডকোয়ার্টার ছেড়ে বিনা অনুমতিতে আমি দার্জিলিং আসি"—

"এটা লিখেছে?"

"হ্যাঁ"—

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে অশ্বিনী। ভট্চায নিজের থেকে

একটি প্রশ্নও করে না। বাহাদুর এসে বাতি জ্বেলে দিলে ভট্‌চায বলে, "আপনি কি আজ প্লেনভিউয়ে যাবেন?" এ-কথার কোনো জবাব না দিয়ে ওভারকোটের পাঁজাটা দুই হাতে বুকের কাছে ধরে অশ্বিনী ওঠে। তারপর বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ভট্‌চায আগে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে ধরে। বাইরে অশ্বিনী গতিটা একটু শ্লথ করে দেয় কি এই কথা ভেবে যে ভট্‌চায নিজে থেকে মিঃ প্রধানকে জানাবার প্রসঙ্গটা তোলে কি না। অশ্বিনী একবার মনে করে এই রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সে নিজেই বলে দেয়। তারপর সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলে, মিঃ প্রধান তো সব জানেনই।

তিন

এখন বাগানে ফিরতে হবে। অশ্বিনী তার আগে সামান্য একটু মদ খেয়ে নেবে। সবে তো সন্ধ্যা হলো। আজ সারাদিনে এক ফোঁটা খায় নি। মদ খাওয়ার যে একটা তাড়না অশ্বিনী বোধ করে তা নয়। কিন্তু একটা গাড়ি নিয়ে প্লেনভিউ-এ যখন যাবেই তখন একটু রয়েসয়ে যেতে ক্ষতি কি এমনি ভেবেই কুয়াশার ভেতর আলোর হরফে লেখা "বার" কথাটির দিকে সে এগোতে থাকে।

কাচের দরজা ঠেলে ঢুকতে হবে। "বা-র" লেখা আলোর কিছুটা অশ্বিনীর মুখে, কিছুটা দরজার কাচে। কাচে রাস্তার একটা ধূসর প্রতিচ্ছায়া অশ্বিনীর-ও একটা প্রায় মুছে খাওয়া প্রতিবিম্বের আভাস যেন দেখা যায়। অশ্বিনী দরজা ঠেলে ভেতরে যাবার মুহূর্তটিতে মনে হলো ভেতরের সেই ছায়াজগতকে হাত দিয়ে দুভাগ করে অশ্বিনী গভীর থেকে গভীরতর ঢুকে যায়।

ভেতরে বেশী খদ্দের নেই, ছোট ঘরটায় ইতস্তত কজন ছড়িয়ে। ফায়ার প্লেসের সামনে একজন দাঁড়িয়ে। অশ্বিনী নিভৃততর একটি কোণে চলে যায়। অশ্বিনীর মাথায় পেছনেই একটি মৃদু আলো।

অশ্বিনীর ছায়া সারাটা টেবিল জুড়ে ওপাশের চেয়ার টেবিল, মেঝে ডিঙিয়ে, একেবারে ওপাশের দেয়ালে গিয়ে মাথা তুলেছে। অশ্বিনীর ছায়ার পাশে আর একটি ছায়া লম্বা হতে হতে স্থির হলে অশ্বিনী বলে "রাম—এক।" অশ্বিনীর কোলের ওপর ওভারকোটের পাঁজা, তার ওপর অশ্বিনীর হাত। চারপাশ খুব নীরব। দু-একজনের পায়ে চলার শব্দ ছাড়া কিছুই প্রায় পাওয়া যায় না। গেলাস রাখার গেলাসে মদ ঢালার, সোডার বোতল খোলার, সোডা বেরিয়ে আসার ও বোতল রাখার আওয়াজগুলো পরপর একমাত্র শব্দ হয়ে হয়ে, থেমে যায়।

শারীরিকভাবে স্থির থেকে অশ্বিনী যেন সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে নিতে চায়, গোড়া থেকে। অশ্বিনীর সামনের দেয়ালটায় অশ্বিনীর চোখ ফেলার অংশটুকু জুড়ে তার নিজেরই অদ্ভুত মাথাটা—চ্যাপ্টা, লম্বাটে, বিরাট বড়। সেদিকে তাকিয়ে অশ্বিনী ভাবতে শুরু করে দেখে, ভাবার কিছুই নেই। সে প্রায়ই হেডকোয়ার্টার ছেড়ে আসে? হ্যাঁ আসে। শত সহস্র লোক সাক্ষী। তার জ্ঞাতসারেই বাগানগুলির চা ট্যাক্স্ না-দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে? জ্ঞাতসারে কিনা জানে না। কারণ কখন যায়, কী হয়, সেসব সে কিছুই জানে না। কিন্তু যেতে তো পারেই। নইলে এত টাকা তাকে দেয় কেন। গোবিন্দবাবু বলেছেন মিঃ প্রধান আর ভট্‌চাযের চোরাই চায়ের ব্যবসা আছে? নিশ্চয়ই আছে। নইলে তার এই দার্জিলিঙে আসার প্রায় প্রথম দিন থেকে ভট্‌চায আর ভট্‌চায মারফৎ মিঃ প্রধান তাকে এত ফোলাবে কেন। অফিসারের নাকি রাগ হয়েছে? হতে পারেই। মিঃ সিন্‌হা নাকি মিঃ প্রধানকে জব্দ করার জন্য অশ্বিনীকে ধরিয়ে দিয়েছেন? দিতে পারেন। বড়বাবু গোপনে কোনো খবর দিয়েছেন? দিতে পারেন। কেউ তো বলবেই। নইলে এই পাহাড়ের খবর অতদূর পৌঁছবে কি করে। তদুপরি বড়বাবু হয়তো গুদামবন্ধের ব্যাপারে চটে ছিলেন।

গোবিন্দবাবুর বাড়ি সার্চ হতে পারে? টগরের সঙ্গে অশ্বিনীর সম্পর্ক নিয়ে কথা উঠতে পারে? উঠতে পারে। টগরকেও মামলার আসামী করতে পারে? করতে পারে, অন্তত সাক্ষী তো করতেই পারে।—ওভারকোটের পাঁজার ওপর হাত রেখে অশ্বিনীকে তার গত আটমাসের সমস্ত পরিচিত মুখগুলি তন্ন তন্ন খুঁজতে হয়। কে কে আসামী হতে পারে? কেউই না। কে কে সাক্ষী হতে পারে। সবাই-ই তো পারে! সবাই।

গেলাসের, বোতলের, বোতলের, গ্যাসের, জলের, আওয়াজগুলি প্রতিবারই প্রবলতর হয়ে ওঠে। আর সেই বার-টা নির্জনতর।

নেহাৎ আচম্বিতে অশ্বিনীর মনে এসে যায়, গোবিন্দবাবুর কাছে যা যা শুনেছে আর ভট্‌চাযের কাছে যে-যে কথার সমর্থন পেয়েছে—তাতে সে কোথাও নেই, আছেন মিঃ প্রধান আর মিঃ সিন্‌হা। অশ্বিনী যদি কোথাও প্রাসঙ্গিক, সে এক মিঃ কুম্‌রা না কোন্ অফিসারকে ঠেলে এগিয়ে গিয়েছিল! অবিশ্যিই সেটা খুব বড় দোষ, বিশেষত মিঃ কুম্‌রা যখন জানলেন যে তার হেড্‌কোয়ার্টার প্লেনভিউ হওয়া সত্ত্বেও সে দার্জিলিঙে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন তিনি অশ্বিনীকে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু সেই শাস্তি তো চা-চুরির দায় হতে পারে না! বড় জোর একটা ওয়ার্নিং হতে পারত, বা খুব বেশি হলে এনকোয়ারি। কিন্তু অশ্বিনীর পকেটের সেই লম্বা কাগজটাতে তো এমন লম্বা লিস্টি তৈরি হয়েছে, অনেকদিন ধরে অনেককিছু না-দেখলে না-জানলে যে লিস্টি বানানো যায় না।

মিঃ সিন্‌হা-ই হোক আর মিসেস্ সিন্‌হা-ই হোক্, কারো সঙ্গে-ই অশ্বিনীর কোনো ঝগড়া বিবাদ নেই, ছিলও না। এখনো যদি অশ্বিনী সিন্‌হাদের ওখানে যায়, তাঁরা যথেষ্টই আপ্যায়নও করবেন। তাঁদের তো মনে থাকবারও কথা নয় কিছু, তাঁরা তো অশ্বিনীর বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি,—যা বলেছেন বা করেছেন, যদি বলে থাকেন বা করে থাকেন—সবই মিঃ প্রধানের বিরুদ্ধে। তার মানে, এন-

কোয়ারি হবে, মামলামোকদ্দমা হবে, সাক্ষীসাবুদ হবে আর মিঃ প্রধান যদি এই সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত থাকার কোনো সাক্ষ্য রেখে থাকেন, তাহলে তিনি ছাড়া পাবার চেষ্টায় অশ্বিনীকেও ছাড়াবার চেষ্টা করবেন হয়তো! কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি কোনো প্রমাণ রাখেন নি। তাহলে আজই সারা দার্জিলিং ও কালই মিঃ প্রধানের সমস্ত এলাকায় এই প্রমাণাতীত খবর পৌঁছে যাবে যে তিনি ধরা পড়েছেন! আর সেই গুজবের একমাত্র প্রমাণ হিসেবে দেখানো হবে অশ্বিনীর বরখাস্ত। অশ্বিনীকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা করলে মিঃ প্রধানের গোপন অপরাধটাই প্রমাণিত হয়ে যাবে, সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ নীরবে এই গুজবটাকে অস্বীকার করবেন। সুতরাং অশ্বিনী নিশ্চিত হয়ে যেতে পারে, এখন তার কিছু করার নেই, শুধুই অপেক্ষা ছাড়া। গেলাস রাখার, গেলাসে মদ ঢালার, সোডার বোতল খোলার, সোডা বেরিয়ে আসার ও সোডার বোতল রাখার আওয়াজগুলি প্রবলতর হয়ে ওঠে।

প্রথমে সামনের দেয়ালে অশ্বিনীর ছায়াটা মুছে যায়। তারপর বেয়ারা এসে দাঁড়ায়। অশ্বিনী ঘড়ি দেখে, রাত নটা। দেরি হয়ে গেছে। শেষবার গেলাসটা ঠোঁটে তুলতেই, তখন একমাত্র কাউণ্টারেই আলো জ্বলছে, অশ্বিনী গেলাসের কাচের ভেতর দিয়ে দেখে —কাউণ্টারের মেয়েটির মাথার ওপরে একটা বেঢপ আঁব, নাকের দুটো বিরাট ফুটো—প্রায় মুখের মতো, একটা চোখ দেখা যাচ্ছে না—চোখের পাতাগুলোকে দেখায় যেন পাখির খাঁচা, কোনো কারণে মেয়েটি হাসায় তার দাঁতগুলো ভোঁতা, চ্যাপ্টা, গোল, করাতের মতো, হাতুড়ির মতো, সারি দিয়ে সাজানো পাথরের অস্ত্রের মতো দেখায়। অশ্বিনী গেলাসটা নামিয়ে মেয়েটির ঝরঝরে চেহারাটা একবার দেখে নিয়ে আবার গেলাসের কাচের ভেতর দিয়ে তাকে ভাঙতে চুরতে থাকে, তাকে খান্ খান্ করতে থাকে, তার মাথার চুল থেকে গলা পর্যন্ত প্রতিটি অংশকে খণ্ড বিখণ্ড বিকৃত করতে থাকে।

কাউন্টারে অশ্বিনীকে টাকা ফেরৎ দিতে দিতে মেয়েটি বলে "ওভারকোটটা পরে নাও, বাইরে খুব হাওয়া।" অশ্বিনী তার বুক থেকে ওভারকোটটা বের করে খুলে ঝুলিয়ে দেয়। প্রায় একটা আস্ত মানুষের মতো দেখতে। বেয়ারাটা পেছন থেকে ধরে—অশ্বিনী হাত গলিয়ে কাঁধে নেয়। যাবার আগে অশ্বিনী পেছন ফিরে একবার দেখে তার ছায়াটা কোথায়।

দরজার পাল্লা খুলতেই হু হু হু হু হাওয়া উৎরাই পেরিয়ে হা হা হা হা কা র তুলে ছায়াহীন অশ্বিনীকেই লুফে নেয়। পকেট থেকে টুপিটা বের করে মাথায় দিয়ে কান পর্যন্ত ঢেকে নেয়।

হাওয়ার বিপরীতে ঢালু রাস্তায় নামতে নামতে অশ্বিনীকে ফেরার একটা উপায় খুঁজে বের করার কথা ভাবতে হয়। অশ্বিনী এখন প্লেনভিউয়ে যাবে।

চার

সারাদিনের ভেতর এই প্রথম তার গোলাপের কথা মনে পড়ল। গোলাপের কথা মনে পড়তেই অশ্বিনী যেন পথ পেয়ে যায়। মিঃ প্রধান, মিঃ সিন্‌হা, ওঁদের কী খেয়োখেয়ি, টগর, ভট্‌চায, এক্সাইজের বড় অফিসার, তার গোঁসা, মিঃ সিন্‌হা মিঃ প্রধানকে হারাতে চান সুতরাং অশ্বিনীর চাকরি যাবে—স্তরপরম্পরায় যদি এতটাই আসে, তাহলে এর পরের স্তরটাও আসবে।

অশ্বিনী স্ট্যাণ্ডের দিকে বাঁক নেয়। এত রাত্রিতে যদি কোনো গাড়ি না পাওয়া যায়। কিন্তু গাড়ি তো অশ্বিনীকে পেতেই হবে, যত রাতই হোক আর যত টাকাই লাগুক। আজ রাত্রিতে অশ্বিনীর তো আর দার্জিলিঙে থাকার কোনো জায়গা নেই। অন্তত গোলাপ তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে না, দিতে পারবে না—এটা যেন অশ্বিনীর কাছে একটা খুব বড় ব্যাপার মনে হয়।

কিন্তু দার্জিলিঙের এই এত ফাঁকা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে

অশ্বিনীর মনে হতে শুরু করে, তার জন্য যেন কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, আর সেই নির্দিষ্ট ভূমিকা তাকে পালন করতেই হবে, সে চাক আর না-চাক। অশ্বিনীকে এখন অপেক্ষা করতে হবে, কখন সেই নির্দিষ্ট ভূমিকাটিতে সে ঢুকে যাবে তার জন্য। যতক্ষণ সেই নির্দিষ্ট ভূমিকাটি না-আসে, অশ্বিনীর সামনে, ততক্ষণ অশ্বিনীকে অপেক্ষা করতেই হবে। সেই অপেক্ষা করার জন্য এত রাতে এটুকু যেতে একশটাকা ভাড়া দিয়ে গাড়ি জোগাড় করে অশ্বিনীকে ছুটতে হয়।

ঘুম পাহাড়ের মাথা থেকে হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার যেন লাফিয়ে পড়ছে—এমন হাওয়া গাড়িটার ওপর আছড়ে পড়ে। ঐটুকু একটা গাড়ি আর একপাশে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়, আর একপাশে পাতালে নেমে যাওয়া খাদ। হেডলাইট বা ফগলাইটেও কিছু দেখা যায় না। মনে হয় একটা দেয়াল ঠেলতে ঠেলতে এগোতে হচ্ছে। অশ্বিনী মনে মনে হিসেব কষে যেন সে এখানে এই কুয়াশার ঝড় থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, চব্বিশঘণ্টা না আটচল্লিশ ঘণ্টা না কি কয়েকটা বছর। কিন্তু সে চলে যাবার পরও এই কুয়াশার ঝড়টা একই বেগে বয়ে চলেছে, আজ এত রাতে অশ্বিনী ফিরে আসছে বাধ্যত, নিশ্চিত: অশ্বিনীকে নিয়ে সেই ছোট্ট একটা গাড়ি সাতহাজার ফুটেরও ওপরে কুয়াশা আর হিমঝটিকার পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে ছুটে উঠে যায়,—অশ্বিনীকে রেখে আসতে। ড্রাইভার বিড় বিড় করে প্রার্থনার মতো। অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে লোকটির সারা চেহারায় কোনো প্রার্থনা নেই।

সোনার অলঙ্কারের ওপর নকশা তোলা স্বর্ণকারের মতো ড্রাইভার স্টিয়ারিঙের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। হাত দিয়ে নয়, বুক দিয়ে এই নিচ্ছিদ্র কুয়াশাটা ঠেলছে। কিন্তু স্থির ভাবে শুধু ঠেলতেও পারছে না কারণ কুমোরের চাকার মতো স্টিয়ারিঙের চাকাটা তাকে অনবরত ঘুরিয়ে যেতে হয়, ডাইনে বাঁয়ে ডাইনে বাঁয়ে একটা জায়গায় ঘুর্ণনের দেরি হলো বা ঘুর্ণন বেশি হলে হয় খাদে

গড়িয়ে কুয়াশায় ভেসে যেতে হবে, অথবা পাহাড়ে লেগে চুরমার হয়ে যাবে। গাড়িটা ক্রমোচ্চ গর্জনে ওপরে উঠে যেতে থাকে আর একসময় বোঝা যায় না, গর্জনটা বাইরের ঝড়ের না গাড়ির। ড্রাইভার বিড় বিড় করে, অশ্বিনী তাকিয়ে দেখে ড্রাইভিং বোর্ডের লাল আলো লোকটার নাকর পাশে লেপ্টে আছে আর তার ডান চোখটা জ্বলজ্বল করছে।

'আঁক' করে শব্দ তুলে ড্রাইভার এমন হঠাৎ ব্রেক কষে যে অশ্বিনী প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অশ্বিনীর দিকে না তাকিয়ে ড্রাইভার স্টিয়ারিঙের ওপর দিয়ে বাইরে চেয়েই থাকে। অশ্বিনী একটু উঁচু হলে দেখতে পায়, গাড়িটার ঠিক সামনে, ড্যাসবোর্ডের সঙ্গে প্রায় লেগে, ফগ্‌লাইটের হলদে আভার বৃত্তে একটা বেশ বড়সড় পাখি, সেই বৃত্তের বাইরের অন্ধকার আর কুয়াশার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। একবার গাড়িটার দিকে ঘাড় তুলতেই অশ্বিনী তার লাল টকটকে ঠোঁটটা দেখতে পায়, আর গাড়ির আলোতে তার চোখদুটো টলটল করে। আর-একবার ফগ্‌লাইটের আলোর বৃত্তের বাইরের কুয়াশা আর অন্ধকারের দিকে অস্থির ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাখিটা মুহূর্তের ভেতর উড়ে যায়। পাখা খুলতে না-খুলতেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় গাড়ির সামনে সেই ফগ্‌লাইটের বৃত্তটাকে কেমন নির্জন ঠেকে। গাড়িটা চালাবার জন্য গিয়ার চেঞ্জের শব্দ তুলতে তুলতে ড্রাইভারটি ফিসফিস স্বরে বলে, "লারোয়া, লারোয়া," তারপর গাড়িটা চলা শুরু করলে একবার তাকিয়ে বলে, "কে জানে পথ হারিয়েছে নাকি।" অশ্বিনীকে বলে, "উঁচু পাহাড়ের বরফের পাখি, ঝড় উঠেছে, নেমে এসেছে।" তারপর যে রাস্তা সবসময়ই জনহীন, বৃক্ষময় ও সবুজ সেই রাস্তাটাকে এই মধ্য রাত্রিতে ঝড়ের আর এঞ্জিনের গর্জনে প্রবল কোলাহলে ডুবিয়ে সবুজলোপী কুয়াশার ভেতর দিয়ে অশ্বিনী প্লেনভিউয়ে ঢোকে।

ড্রাইভারটা বিড়বিড় করে, "আজ রাতে বরফ পড়বে।"

পাঁচ

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে গোলাপ দরজা খুলে দেয়।

ঘরে ঢুকে অশ্বিনী আগে টুপি খুলে ওভারকোটের পকেটে রাখে। ওভারকোটটা খোলা শুরু করলে দরজা বন্ধ করে গোলাপ এসে ওভারকোটটা টেনে নেয়। "খেতে দাও। ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে", অশ্বিনী বলে।

"বোসো। দিচ্ছি। একটু গরম করতে হবে তো"—গোলাপ বেশ সাবলীল চলে যায়।

অশ্বিনী ভাবে, গোলাপ তাহলে শোনে নি। বাথরুমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অশ্বিনী বলে, "গরম জল আছে তো?"

"গরম জল কি আর থাকে। বোসো। করে দিচ্ছি।"

গোলাপের এই জবাবটার সঙ্গে একটু হাসি মেশানো আছে কি—অশ্বিনী ভাবে। গোলাপের কণ্ঠস্বরে কোনো ব্যস্ততা নেই। তাহলে কি গোলাপ সব জেনে গেছে। অশ্বিনী বলে, "থাক্, তুমি ভাত গরম করো, আমি জল গরম করে নিচ্ছি।"

রান্নাঘর থেকে একটানা স্বরে গোলাপ বলে যায়, "বড়বাবু সকাল বেলায় লোক পাঠিয়েছিলেন।" অশ্বিনী কোনো জবাব দেয় না, কান পেতে শোনে। "আমি তো বলতেই পারি না তুমি কোথায়।" অশ্বিনী একটু চুপ করে থেকে বলে, "কেন তুমি তো জানতে—।" ওরা এমনভাবে গল্প করে যায় যেন অশ্বিনীর আসার পথে পাহাড় পাহাড় কুয়াশার ঝড় বা গোলাপের এই ঘর প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ ঘণ্টা অশ্বিনীহীন ছিল না। "আমি বললাম দার্জিলিঙের কথা আর বললাম সানিভ্যালিতে যাবে বলেছিলে। পরে শুনলাম সানিভ্যালিতে পায় নি।" অশ্বিনী কোনো জবাব দেয় না। ভাবে, বলে দেয়, সানিভ্যালিতে যায় নি। তারপর ভাবে, এত আলাদা আলাদা করে তো সব বলা যাবে না, একসঙ্গে সবটাই বলতে হবে। অশ্বিনী যখন

হাতমুখ ধুয়ে এসে খাবার টেবিলে বসে তখন গোলাপ বলে, "এত খোঁজ করছিল কেন, বারবার লোক পাঠানো।" অশ্বিনী জবাব দেয় না। গোলাপ জিজ্ঞাসা করে, "শেষ পর্যন্ত দেখা হয়েছে তো?" এইবার অশ্বিনী বলে "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখা হয়েছে।" শোয়ার ঘরে আলো, বিছানায় খোকন, গোলাপ খাবার নিয়ে আসছে, সে এখানে বসে— অশ্বিনীর নিজেকে খুব নিশ্চিন্ত বোধ হয়। এ-রকম পরিস্থিতিতে যেন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে।

"দুপুরে তোমার জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করলাম, শেষে বেলা আড়াইটের সময় খেয়ে নিলাম।"

"তোমাকে কত বলেছি অপেক্ষা না করতে"—

"তুমি যে বলে গিয়েছিলে, ফিরবে"—

খাবার টেবিলে গোলাপ বলে, "ওরা সবাই ভালো আছে?"

"ভালোই আছে।"

অশ্বিনী ঠিক করে ফেলে শুয়ে শুয়ে ধীরে ধীরে গোলাপকে বলবে। "একদিন আসতেও তো পারে, ওরা"—গোলাপ।

"তুমিও তো একদিন যেতে পার"—

"আমি তো সবসময় যেতেই চাই, তুমিই তো নিতে চাও না।"

"পূজোর সময় গিয়ে দুদিন থেকেই তো হাঁফিয়ে উঠলে।"

ফিক করে হেসে ফেলে গোলাপ বলে, "যতই বলো বাবা, নিজের সংসার ছেড়ে বাইরে থাকা যায় না।"

অশ্বিনীর ডিসে মাংসের একটা বড় টুকরো তুলে দিলে অশ্বিনী বলে, "থাক্ থাক্ ভাল্ লাগছে না।"

"কেন? রান্না খারাপ হয়েছে?"

অশ্বিনী হেসে ফেলে, "তাহলে তো খেতেই হয়, এখন বসে বসে এত হাড় আর মাংস চিবুতে ভালো লাগছে না।"

"তাহলে থাক্, খেয়ো না"—গোলাপ অশ্বিনীর ডিস থেকে টুকরোটা নিজের ডিসে তুলে নেয়।

ঢুকিয়ে দিতে হয়। তারপর, অশ্বিনীকে নিজের শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে গোলাপের ওপর উঠতে হয়। গোলাপের দুই স্তনের ওপর দুই কনুই গেঁথে দিতে হয়। অশ্বিনীর আঙুল, দশটা আঙুল গোলাপের গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দশটা আঙুল গোলাপের গলা টিপে ধরে। অশ্বিনীর আঙুলের ফাঁকগুলো গোলাপের ফুলে ওঠা গলার নরম মাংসে ভরে যায়। অশ্বিনীর হাতের তালুতে গোলাপের গলার শিরা দবদব করে ওঠে, ক্রমেই দ্রুততর। গোঁ গোঁ শব্দে একটু পেছিয়ে গোলাপ ডিভান থেকে ঘাড়টা হেলিয়ে দেয়, যেন সেটা সঙ্গমের আক্ষেপ। গোলাপের স্তনের ওপর থেকে, কনুই দুটো তুলে, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে, গোলাপের গলাটা শরীবের সমস্ত শক্তি দিয়ে অশিনীকে টিপে যেতে হয়,—চোখ বুঁজে, দাঁতে দাঁত ঘষে, ঠোঁট কামড়ে, অতিরিক্ত শক্তি সংগ্রহ করেও টিপে যেতে হয়, গোলাপের অত বড় শরীরটার আর কোনো নড়াচড়া না-থাকলেও টিপে যেতে হয়। কথাটুকু পর্যন্ত শুরু করার ফুরসত পায় না অশ্বিনী, তার আগেই গোলাপের মাথাটা ডিভান থেকে ঝুলঝুল ঝুলতে থাকে। অশ্বিনীর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর পেশীপুঞ্জ স্বাধীন আর স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠে। সেগুলো এমনই সন্নিবিষ্ট হয়ে যায় যে অশ্বিনীর শরীরের যাবতীয় শক্তি তার দুটো হাতের বাহুসন্ধি, বাহু, পুরোবাহু, কব্জি আর দশটা আঙুলের ভেতর দিয়ে গোলাপের সরু গলাটুকুর ওপর তীব্র কঠিন একমুখী চাপে তীব্র কঠিন সংহত থেকে যায়।

অশ্বিনীর হাতদুটো এর আগে কোনোদিন এমন স্বাধীন, কঠিন ও ঋজু হয় নি।

কতক্ষণে অশ্বিনীর শরীরের এই সংহত শক্তি তার হাতের ভেতর দিয়ে তীব্র একমুখী চাপে গোলাপের গলাটাকে পিষে দিতে পারে তারও একটা হিসেব নিশ্চয়ই কোথাও আছে। সেই সময়টুকু পার হয়ে গেলেই শক্তি প্রয়োগের মূল উৎস অশ্বিনীর ঘাড়টা প্রথমে নরম

হয়ে যায়, ঘাড়ের কোনাচে হাড় দুটো আরো ওপরে উঠে আসে আর তার ফাঁক দিয়ে অশ্বিনীর মাথাটা গোলাপের ওপর ঝুলে পড়ে।

মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ার আগে শরীরের সব ভার হাতের দুই পাতার ওপর দিয়ে মানুষ যেমন, পা দুমড়ে, মাটির ওপর সর্বস্বহারা, অশ্বিনী তেমনি, গোলাপের ওপর বসে গোলাপেরই মাথার দিকে ঝুঁকে থাকে। তার সেই হাতদুটো তখন অশ্বিনীর নষ্টসাম্য ভারটুকু রাখবার ভরমাত্র!

কতক্ষণ অশ্বিনী তার শরীরের ভার এইভাবে রেখে দিতে পারে—তারও একটা হিসেব নিশ্চয়ই আছে।

অশ্বিনী গোলাপের ওপর থেকে মেঝের ওপর নামে। নেমে অশ্বিনী গোলাপের মাথাটা হাত দিয়ে নাড়িয়ে একবার দেখে—একেবারেই ঝুলঝুল করছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে অশ্বিনী ঘোরে। তারপর মাঝখানের দরজা খুলে বাথরুমে যায়।

বাথরুম থেকে অশ্বিনী এ-ঘরে ফিরে আসে। এসে দাঁড়িয়ে থাকে। সে কোনো আলো জ্বালায় নি বা নেবায় নি। আগের মতোই ও-ঘরের নীলচে আলোর আভা এ-ঘরে পড়ে আছে। সমস্ত ঘরটায় আবছায়া। ঘরের জিনিসপত্রগুলোর আকার বদলে গেছে। ডিভানের ওপর গোলাপ শুয়ে, তার মাথা ডিভানের বাইরে ঝুলঝুল করে, ফলে, গোলাপকে আর মানুষের মত দেখায় না। অশ্বিনী এখন গিয়ে ঐ ডিভানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। শুয়ে পড়ার জন্যই যেন অশ্বিনী ডিভানের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু শুয়ে না পড়ে লেপটা এমনভাবে ছুঁড়ে দেয় যাতে গোলাপ সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে। লেপে ঢাকা পড়ার পর গোলাপকে বাইরে থেকে মানুষের মতো দেখায়। অশ্বিনী ডিভানের কাছ থেকে সরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ায়।

চাপা একটা তাপ বোধ করে সে। গলায় হাত দেয়। গোলাপের থুতু তখনো লেগে আছে। গোলাপ তখনো নিশ্চয় গরম। গোলাপের তাপ বুঝবার জন্য অশ্বিনী ডিভানের দিকে ফেরে। কিন্তু সেদিকে

না গিয়ে বাইরের দরজার দিকে চলে যায়। দরজাটা খুলতেই শরীরে শিহরণ লাগে। পেছনে দরজা আবজে দিয়ে অশ্বিনী বারান্দায় বেরোয়।

কোনো বাতাস নেই। হঠাৎই বাতাস থেমে গেছে। এত চুপচাপ। বাতাসের শব্দও নেই। বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে অশ্বিনী বারান্দা ধরে এগিয়ে যায়। বাইরে কুয়াশা পাত্‌লা হয়ে গেছে। বারান্দার কিনারায় যায় অশ্বিনী। বাইরে মেঘে ঢাকা জ্যোৎস্নার মতো আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। তখন অশ্বিনীর গোচর হয়, তার কোয়ার্টারের সম্মুখে একটা গাছের ঝাড়ে শাদা ফুলের রাশি সদ্য ফুটে উঠেছে, ফুটে ফুটে উঠছে। সেই শাদা ফুল থেকে আলো খুব চাপা বিকীরিত হচ্ছে। অস্পষ্ট কুয়াশার বাতাস-হীনতায় সেই অতি আচ্ছন্ন আলো অশ্বিনীর চোখে এসে লাগছে।

অশ্বিনী তখন খুব ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে পথে নেমে যায়। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়। তখন, যতদূর দেখতে পায় অশ্বিনী দেখে, আকাশময় চাপা আলোয় আলোময় বরফ পড়ছে, পুষ্পবৃষ্টির মতো, ঝিরঝির ঝিরঝির জুঁই ফুলের মতো। বরফের অন্তর্গত চাপা আলো ফেটে পড়তে চাইছে। সেই নিশুতিতে অশ্বিনীর চোখের সামনে গাছপালা বাড়িঘর পথঘাট সমস্ত সেই চাপা আলোয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, শাদা থেকে শাদা হয়ে হয়ে অশ্বিনীর সেই পরিচিত পরিস্থিতিকে মুহূর্তে মুহূর্তে অপরিচিত থেকে অপরিচিততর করে তোলে। প্লেনভিউ নয়, অশ্বিনী নয়, গোলাপ নয়—সমস্ত পরিবেশ এক গোপন অথচ বিশিষ্ট নতুনতায় বদলে যায়। যা ছিল নিকট সবুজ বা দূর ধূসর সে সবই এক উজ্জ্বল শাদা হয়ে হয়ে গিয়ে নৈকট্য আর দূরত্ব হারিয়ে ফেলছে। যা ছিল খাড়াই-উৎরাই সে সবই এক সমতল শাদায় শাদায় উচ্চাবচতা হারিয়ে ফেলছে। যে ভূ-পৃষ্ঠের ওপর অশ্বিনী দাঁড়িয়ে, সেই ভূপৃষ্ঠটাই বদলে যাচ্ছে। বরফ অশ্বিনীর মাথায়, ঘাড়ে, গায়ে পড়ছিল, গায়ের উত্তাপে গলে

জলের রেখা তার শরীরে বইতে শুরু করলে সে শিউরে শিউরে ওঠে। আবার অশ্বিনী ধীর পায়ে বারান্দায় উঠে আসে। ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। দরজার সামনে পিছন ফিরে সেই পরিবর্তমান পরিধির দিকে আর একবার তাকিয়ে ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকে যায়। সেখানে কোনো কিছুই বদলায় নি।

বারান্দার দরজা বন্ধ করে খাম্পা নর্তকের পার্টিশনের সামনে চেয়ার টেনে অশ্বিনী বসে। একটা সিগারেট ধরায়। ও-ঘরের নীল আলোয় এ-ঘরের খাম্পা নর্তকের অবয়ব বদলে গেছে। ও-ঘরে খোকন ঘুমনো। এ-ঘরে গোলাপ শোয়ানো। বাইরে পাহাড়ময় রাত্রি। আর রাতভর তুষারপাত। অশ্বিনীর কোথাও যাওয়ার নেই। তার জন্য নির্দিষ্ট সব কাজ সে আপাতত শেষ করেছে। সে এখন এই চেয়ারে বসে অপেক্ষা করে থাকে—তার পরবর্তী ভূমিকা কখন্ নির্দিষ্ট হয়ে আসে—